সমকালীন

ষোড়শ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৭৫

বিদগ্ধ দায়িত্ব...

একটি ভাল উপন্যাস বা গল্প
আপনাকে সহজেই
আগ্রহান্বিত করে, একটি
ভাল কবিতা
মুহূর্তেই আপনাকে অনুপ্রাণিত
করে, কিন্তু একটি প্রবন্ধ?
তার দায়িত্ব অনেক বেশী।
আপনার বিদগ্ধ মনকে
সে ধীরে ধীরে
প্রভাবান্বিত করে, তাকে
বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে উত্তরণ করে'
বিদগ্ধতর করে তোলে।
সাময়িকতায় সে বিশ্বাসী নয়,
চিরন্তনতাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

We cover 36000 kilometres and fly to 63 stations everyday...
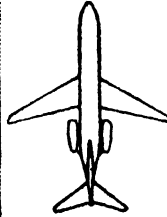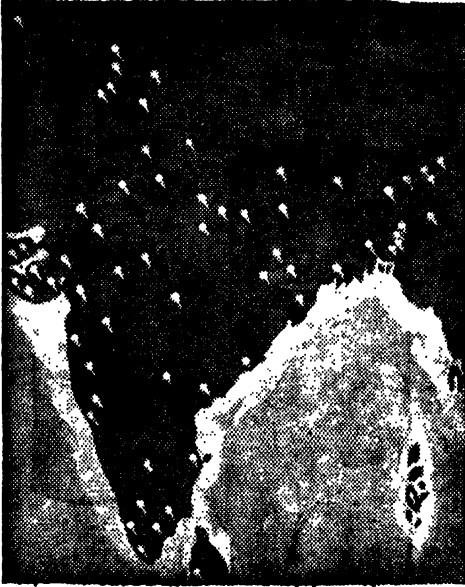
...and we do it through our 142 scheduled flights. People who fly on our services tell us that our fare is the lowest in the world. We can't deny it as we carry you on jets and turbo-props for just 38 paise or 5 cents per mile as against 52 paise or 7 cents in other parts of the world.

They also say we must be among the big ten in the world. Well, we are the 8th biggest in four continents except America.

সাইকেলে আরামের সীট বলতে

উইট্‌কপ

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সীট-এ সুনিশ্চিত আরাম

সেরা বাট্‌ লেদারে আর বিশেষ ধরনের স্প্রীং স্টীলে রকমারি টেঁকসই গড়নে তৈরি উইটকপ সীট-এ ব'সে আপনি বছরের পর বছর সাইকেল চালিয়ে আরাম পাবেন।

প্রস্তুতকারী

সেন-র‍্যালে লিঃ

সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে ভাল?

এগুলোর কোনটাতেই আমাদের দাবী নেই।
কিন্তু আমাদের গর্ব এই যে, আমরা

আপনার ব্যাঙ্ক

আপনার শুভেচ্ছাই আমাদের সবচেয়ে বড় মূলধন। আমাদের সবচেয়ে বড় পুরস্কার আপনার সন্তুষ্টি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস:
৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

কলার খোসায় পা দেবেন না
সুষম খাদ্যের জন্য ফল
আপনার বাড়ীর পেছনে বা পাশে কয়েকটা ফলের গাছ থাকা প্রয়োজনীয় এটা সৌখিনতা নয়।
এই বিষয়ে আরও বিবরণের জন্য আপনি ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার বা উদ্যান বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
davp 67/498 B.

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিনীলরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

ইনি একটা কারখানার সহকারি ফোরম্যান। এই কারখানাটির গবেষণাগারে একজন সহকারি হিসেবে যোগ দিয়ে, সাত বছরের মধ্যে তাঁর এই পদোন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি যে উন্নতি করেছি, চেষ্টা ও যত্ন থাকলে অন্যেও অবশ্য এই রকম উন্নতি করতে পারেন। তবে আমি যখনই যে কাজ করি, তা নিষ্ঠার সঙ্গে করি। আমার কয়েকজন সহকর্মীর, ছেলেমেয়ে বেশী আর তাঁদের দুরবস্থা আমি সব সময়েই দেখছি। আমার মাত্র দুটী সন্তান এবং তাদের আমি, আমার সাধ্যানুসারে মানুষ ক'রে তোলবার চেষ্টা করছি। সেই জন্যই আমি সুখী।"

ইনি সুখী।

আপনি ?

গ্রীষ্মের নকশা
পায়ে গলিয়েই বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল গ্রীষ্মের
পথচলায় এত উপভোগ্য কেন। তার আসল কারণ
এদের নকশা। এমন নকশা যাতে উপরে
হাওয়া খেলবে আর নিচে তাপ আটকাবে।
পথের যে পাথুরে বা পিচঢালা গরম, পায়ের তলায়
তার খোঁজ পাবে না। পায়ের পাতায় শুধু
হাওয়া খেলবে সারাক্ষণ—গ্রীষ্মে এর চেয়ে
সুখকর অভিজ্ঞতা আর কি হতে পারে।
বাছাই মসৃণ চামড়া, কোমল হলেও সুঠাম।
তলি, গোড়ালি, সুখতলা—সবই
বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। তার সঙ্গে
আধুনিক নির্মাণ কৌশল। ফলে
বাটার স্যান্ডাল এমন মজবুত যার কথা
সকলের মুখে-মুখে। কারখানা থেকে
মনোজ্ঞ সব নকশা এখন বাটার
দোকানে এসেছে। আজই এসে দেখে যান।
মিলি ১৬.৯৫
মেনকা ১২.৫০
Bata
এয়ারলাইট ১১.৯৫

ক্রীমটি সত্যিই ভাল!

মেয়েদের
ত্বক-সৌন্দর্যের
গোপন রহস্য

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিহার্য
কুসুম-কোমল, পাপড়ি-পেলব, যৌবন সুলভ, লাবণ্যময় ত্বক—
এইতো সাধনা বিউটি ক্রীমের সবচেয়ে বড়ো অবদান
সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশপত্র

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র :

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

ষষ্ঠ সারা ভারত বুনিয়াদী সাহিত্য প্রতিযোগিতা

ভারত সরকারের ষষ্ঠ সারা ভারত বুনিয়াদী সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় গ্রন্থকারকদের নিকট হইতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে পাণ্ডুলিপি/পুস্তক (নাটক সহ)-এর আকারে এণ্ট্রি আহ্বান করা হইতেছে :

১। সমষ্টি উন্নয়ন ও সামাজিক-অর্থনীতিক পরিবর্তন, (২) সমষ্টি উন্নয়ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা, (৩) সমষ্টি পরিসম্পৎ গঠনে পঞ্চায়তের ভূমিকা, (৪) পঞ্চায়তী রাজ এগিয়ে চলছে—পঞ্চায়তের সাফল্য কাহিনী, (৫) গ্রামোন্নয়ন ও ক্রমবর্ধিত কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ লোকবলের সদ্ব্যবহার, (৬) গ্রাম পুনর্গঠনে যুবশক্তির ভূমিকা, (৭) সামাজিক কল্যাণে নারীর ভূমিকা, (৮) ফলিত পুষ্টি কর্মসূচীর মাধ্যমে পল্লীগ্রামের অধিকতর স্বাস্থ্য ও অধিকতর সম্পদ, (৯) সমষ্টি উন্নয়নের মারফত জনসমষ্টির দুর্বলতর অংশের কল্যাণ, (১০) পরিবার পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়নের ভূমিকা, (১১) ক্রমবর্ধমান কৃষি উৎপাদনে পঞ্চায়তরাজের ভূমিকা, (১২) সমবায়ের ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের বিলোপ, (১৩) অধিকতর উৎপাদন ও কৃষকের অধিকতর উপকারের জন্য কো-অপারেটিভ ফার্মিং, (১৪) কো-অপারেটিভ ক্রেডিটের ফলপ্রসূ সদ্ব্যবহার, (১৫) কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ও প্রসেসিং, (১৬) মূল্যমান নিম্নে রাখার জন্য কনজ্যুমার্স কো-অপারেটিভ, (১৭) কো-অপারেটিভ সুগার ফ্যাক্টরী—কো-অপারেটিভ প্রসেসিং-এ অগ্রগতির নিরিখ।

প্রতিটি ১,০০০৲ টাকা মূল্যের সতেরটি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

একটি বিষয়ে একটির বেশী পুরস্কার দেওয়া হইবে না।

ভাষা ও রচনাশৈলী—নিম্নলিখিত যে কোন ভাষায় এণ্ট্রি হইতে পারিবে :

অসমিয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দী, কানাড়া, কাশ্মীরী, মালয়ালম, মারাঠী ওড়িয়া, গুরুমুখী, সিন্ধী, তামিল, তেলেগু ও উর্দু।

এণ্ট্রিগুলি এমন সহজ ও সাবলীল হইতে হইবে, যাহাতে সেগুলি সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়তীরাজ ও সমবায় কর্মসূচীর সহিত সম্পর্কিত কর্মীদের পক্ষে সহজবোধ্য ও আবেদনশীল হয় ; এগুলি তাঁহাদের জন্যই।

আকার—পাণ্ডুলিপির আয়তন হইবে প্রায় ১০,০০০টি শব্দ লইয়া অথবা মুদ্রিত হইলে অন্তত ১৬ পয়েণ্ট টাইপে ডিমাই ৮-পেজী সাইজের প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা। বই হইলে সেগুলি যথাযথ চিত্র সম্বলিত হইতে হইবে।

কপিরাইট—পুরস্কারবিজয়ী এণ্ট্রির কপিরাইট সমস্ত দায়মুক্ত অবস্থায় ভারত সরকারে বর্তাইবে। কপিরাইটের জন্য উভয় পক্ষের ঐক্যমত অনুসারে যথোপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইবে।

এণ্ট্রি ফী—রচয়িতা কর্তৃক দাখিল করা প্রতি এণ্ট্রির জন্য ৩৲ টাকা।

এণ্ট্রি গ্রহণের শেষ তারিখ—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী ও নির্দেশাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দরখাস্তক্রমে নিম্নঠিকানায় পাওয়া যাইবে :

দি ডিরেক্টর (বেসিক লিটারেচার)

মিনিস্ট্রী অব্ ফুড, এগ্রিকালচার কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড কো-অপারেশন

(ডিপার্টমেণ্ট অব্ কমিউ. ডেভে. অ্যাণ্ড কো-অপারেশন)

কৃষি ভবন, নয়াদিল্লী

ডি এ ভি পি ৬৮/৬

ষোড়শ বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

শিল্পের মূল্য

অসিতকুমার হালদার

বিলাতের শিল্পরসিক Clive Bell বলেছিলেন—'...Art should not go to the people, but people should come to art ; or leave it alone.' আসল কথা—শিল্পকলার মূল্য বোঝার দরকার আগে মানুষের, তবেই সে মানুষ শিল্পকলার কদর করবে এবং কোথায় তার সৌন্দর্য-পিপাসা মিটবে তার চেষ্টায় সে থাকবে। নচেৎ শিল্পকলার দরুণই শিল্পের কদর বা তার মূল্য সাধারণ মানুষে কখনই বুঝতে পারে না। এখনকার যুগ বিজ্ঞাপন ও ব্যবসার যুগ—তাই এখন শিল্পকলার বিষয় এই সত্যটি কতটা খাটে, তা বোঝবার ও ভাববার কথা। সারা জীবন শিল্পী সাধনা করলে তার ছবি বা গড়া সামগ্রী হয়ত সারা জীবনে দু-একজনের চোখে ভাল লাগল এবং তাঁরা তার কদর করলেন, কিন্তু সর্বসাধারণের কাছে তা রইল অজ্ঞাত। এইভাবে জগতে কত শিল্পীর সাধনার কথা সাধারণের অনুরাগ ও অনুসন্ধানের অভাবে চিরকালের জন্য একেবারে ছাইচাপা থেকে যায়।

দেশের শান্তি ও সভ্যতার লক্ষণই হল দেশের শিল্পের কদর সে-দেশে কতটা আছে। দেশের শান্তি যেখানে নেই, সেখানে শিল্পকলা কেবল শিল্পীর অনুরাগেই গড়ে ওঠে। কিন্তু তার কদর থাকে না সে দেশে। আমাদের দেশের বৌদ্ধ-যুগের কীর্তিকলাপের মধ্যে স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলারই কথা আগে জানতে পারি এবং তা থেকেই বুঝতে পারি সভ্যতার কথা। আফ্রিকায় পাই না কোনো পরিচয় সভ্যতার ও সেই সঙ্গে শিল্পের···পাই আমেরিকায়, মেক্সিকো ও পেরুভিয়াতে প্রাচীন 'Maya Art'এ। তার পরবর্তী যুগে সে দেশে আবার অন্ধকার—খোঁজ পাই না সভ্যতার। জাপান, ফরাসী, জার্মান, বিলাত প্রভৃতি স্থানের শিল্পকলার উপর দেশের লোকের অনুরাগের পরিচয় প্রথমেই পাই—সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে শিল্পকলার প্রচারের জন্য পুস্তক রচনা ও তার প্রচারের চেষ্টা দেখে। আর তারই বিপরীত ব্যাপার আমাদের দেশে। শিল্পকলার উপর পুস্তক প্রচার—যিনি কখনো চেষ্টা করেছেন, তিনিই দেখেছেন যে দেশের লোকের চাহিদা নেই বললেই
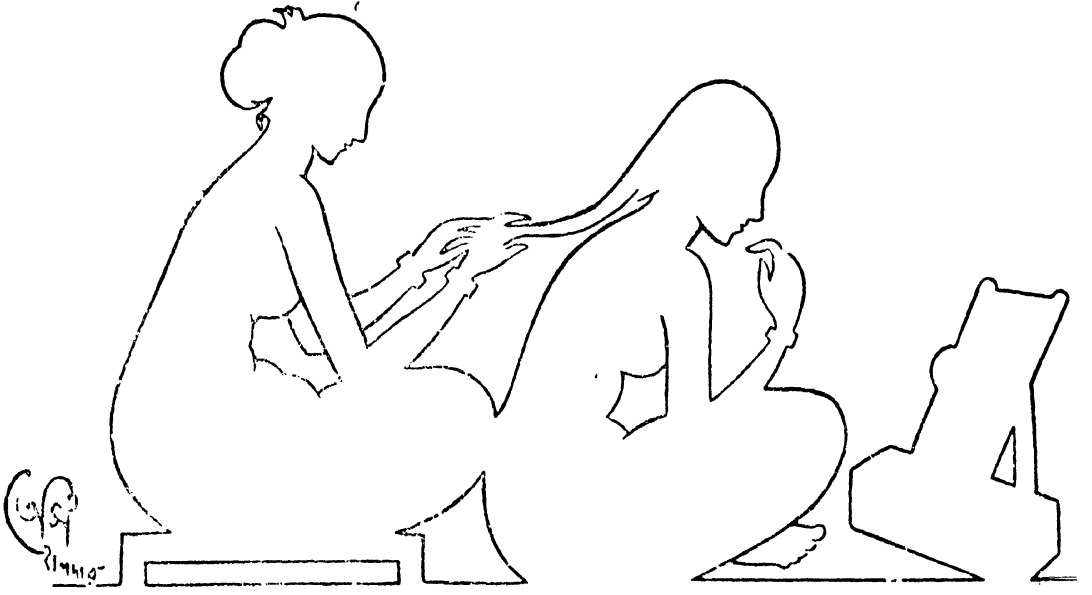
হয়। তাঁর তখন হয় অরক্ষণীয়া কন্যার মত বইগুলি। দেশের শিল্পীদের দাঁড়াতে হয় তাই একলা একলা কাজ করতে এবং তাঁরা মনের আনন্দে তাই কাজ করে যান—'মা ফলেষু কদাচনম্'! অবশ্য শিল্প-সাধনার পক্ষে হয় ভাল, কিন্তু শিল্পকলাকে দেশের লোকের বোঝবার পক্ষে হয় অন্তরায়। শিল্পের মূল্য কেবল শিল্প-পণ্য ব্যবসায়ীদের হাতেই যদি থাকে, তাহলে তার মূল্য হয় কাঞ্চন-মূল্য। কিন্তু আসলে ছবির মূল্য কি কেবলই কাঞ্চনেই আবদ্ধ? সেই কথাটাই আজ আমরা আরো সুস্পষ্ট করে দিতে চাই।

ছবি কেন লোকে পয়সা দিয়ে কিনবে? এখন এই প্রশ্নই উত্থাপন করা যাক। শিল্পীরা হয়ত বলবেন—শিল্পীদের নইলে পেট চলবে কি করে? কিন্তু কথাটা তা নয়। শিল্পীর তরফের আসল জবাব হচ্চে এই। ধরুন, যদি আমি শ্যামবাবুকে একখানি ছবি উপহার দি, তাহলে দেখবো যে শ্যামবাবু তার মূল্য 'মূল্য ধরে না দিতে হওয়ার দরুণ' ছবিটিকে দু'দিন পরে তাঁর আদুরে ভাগ্নেটির হাতে দিয়েছেন খেলা করতে এবং ছেলেটি সেটিকে নিয়ে বেশ সদ্ব্যবহার করচে ধূলোমাটি লাগিয়ে। আবার শ্যামবাবুকে যদি সেটি দু-দশ টাকায় বিক্রী করা হতো তো দেখা যেতো—তাঁর চাকরকে বলেচেন ছবিটিকে পরিস্কার রাখতে। আর যদি দাম বেশ কিছু আরো বাড়িয়ে ধরা হয়, তাহলে দেখবো যত দাম বাড়ানো হবে, সেই অনুপাতে ছবিখানির 'হেফাজৎ' আরো ভাল করে করা হবে। তাহলেই দাঁড়াচ্চে যে কাঞ্চনমূল্যের প্রমাণের উপর ছবিটির প্রাণ ও আয়ু নির্ভর করচে। তাই আজ ইতালীর মাইকেল আঞ্জিলো, র‍্যাফেল প্রভৃতির ছবির কদর এবং তার রক্ষার জন্যও ভাল ব্যবস্থা। লক্ষ টাকার ছবিকে ভাল করে লক্ষ্য করে রাখবার চেষ্টা হয় বহুবিধ এবং তাই শিল্পীরা চান যে তাঁদের শিল্পের কদর হয় দেশে আর মূল্যও লোকে দেয় লক্ষ্মীমন্তের মত শিল্পকলাকে বাঁচাবার উপলক্ষ্য করে।*

---

* শিল্পাচার্য অসিতকুমার হালদারের একটি অপ্রকাশিত রচনা ও স্কেচ

রামরাজ

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বর্তমান অসংখ্য প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্তি বিশেষতঃ দেবায়তন সমূহ ভারতের সুমহান অতীত সভ্যতার অকাট্য স্বাক্ষর বহন করিতেছে। ইহাদের সুউচ্চ শিখর, বিস্তৃত চত্বর, অতিকায় স্তম্ভযুক্ত শোভন ছাদ, সুবিস্তীর্ণ অলিন্দ, বিরাট তোরণ এবং সর্বাঙ্গীণ নিপুণ শিল্প-কর্ম যুগে যুগে দেশীয় ও বিদেশীয় জনগণের চক্ষে যুগপৎ সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের বিষয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন সূত্রে ইউরোপের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগও প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় জাতিসমূহের কোন কোন সুধী ব্যক্তি ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই সময় হইতেই তাঁহারা ভারত-বিদ্যা বিষয়ক চর্চা ও গবেষণার সূত্রপাত করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়ম্ জোন্স কর্তৃক কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারত বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার পথ অধিকতর সুগম হয়। ইহার পরবর্তী শতাব্দীতে ইউরোপের লণ্ডন, পারী, বের্লিন, বন, ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানে ভারতবিদ্যাচর্চার অনেকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আধুনিক পদ্ধতিতে ভারতবিদ্যাচর্চা প্রবর্তনের কৃতিত্ব-সর্বাগ্রে ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরই প্রাপ্য। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আধুনিক পদ্ধতিতে ভারতবিদ্যাচর্চায় যে কয়েকজন ভারতীয় মনীষী সর্বাগ্রে অগ্রসর হন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ ভাউ দাজী (১৮২১-১৮৭৪), রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-১৮৭৪), ডাঃ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর (১৮৩৭-১৯২৫) ও ভগবানলাল ইন্দ্রজীর (১৮৩৯-১৮৮৮) নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতবিদ্যার কয়েকটি বিষয়ে কি ইউরোপীয় কি দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালই প্রথম গবেষক। ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে সার্থক গবেষক হিসাবে রাজেন্দ্রলালের নাম স্মরণীয়।

উড়িষ্যার স্থাপত্য কীর্তি বিষয়ে তাঁহার 'এন্টিকুইটিস্ অফ্ উড়িশা' গ্রন্থটি দুইখণ্ডে যথাক্রমে ১৮৭৫ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলালের বহুপূর্বেই অবশ্য জেমস ফারগুসন (১৮০৮-১৮৮৩) নামীয় ইংরাজ ভারত-বিদ্ ভারতীয় স্থাপত্য-বিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যবসায় সূত্রে ভারতে আসিয়া ফারগুসন ভারতীয় স্থাপত্যের বিশেষতঃ মন্দির স্থাপত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৮৩৫ হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বহু তথ্য ও চিত্রাদি সংগ্রহ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি প্রামাণিক পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন, এই পুস্তকগুলি ১৮৪৫ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ফারগুসনের সমসাময়িক কালেই আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (১৮১৪-১৮৯৩) ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যে ব্রতী হন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রবর্তিত হইলে কানিংহামই তাহার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ফারগুসন, কানিংহাম ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই তিন পণ্ডিত প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যা বিষয়ের দিকপাল

বলিয়া পরিগণিত হইলেও এই বিদ্যার গবেষণায় ইঁহারা কেহই পথিকৃৎ নহেন। ভারতীয় স্থাপত্য বিদ্যা সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে আধুনিক প্রথায় সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষক ও পুস্তক রচয়িতার সম্মান রামরাজ নামীয় দক্ষিণভারতীয় এক পণ্ডিতের প্রাপ্য। রামরাজের জীবন কাহিনীর অল্প অংশই জানিতে পারা গিয়াছে।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তাঞ্জোরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে রামরাজের জন্ম হয়। বিজয়নগর রাজবংশোদ্ভুত হইলেও রামরাজের পিতা দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাগণের এক বংশধর বিজয়নগর রাজ্যের অধিকারচ্যুত হন। দারিদ্র্যহেতু রামরাজের পিতা রামরাজের শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধের ফলে টিপুসুলতানের অধিকার চ্যুত মহীশূর এমনকি সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রামরাজ বাল্যকালে নিজের চেষ্টায় দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া ইংরাজদের সংস্রবে আসিয়া ইংরাজী ভাষাও শিখিয়া লন। এই ইংরাজী বিদ্যার প্রসাদে তিনি মাদ্রাজ নেটিভ রেজিমেণ্টের এডজুটাণ্ট এর খাস কেরানীর পদ লাভ করেন। এই কর্মে থাকার সময়, রামরাজের বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি, ধৈর্য ও কর্মকুশলতা তৎসহ নম্র স্বভাব, গৌর বর্ণ ও প্রিয়দর্শনতা সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর তাঁহাকে এই বাহিনীর দেশীয় প্রতিনিধি বা 'ভকীল' (এজেণ্ট) নিযুক্ত করা হয়। ইহার পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামরাজ মাদ্রাজের মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অপিসে একটি করণিকের পদ লাভ করেন। এই কর্মে থাকার সময় রামরাজ সরকারী আদেশে টিপুসুলতানের রাজস্ব সংগ্রহ বিধি সংক্রান্ত মারাঠি ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনূদিত করেন। ইতিমধ্যে রামরাজ নিজের চেষ্টায় শুধু ইংরাজী নহে, সংস্কৃত, ফার্সী ও দক্ষিণদেশীয় ভাষাগুলিও উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের সহিত রামরাজ তৎকালে ইংরাজ প্রচলিত রাজস্ব সংগ্রহ বিধির তুলনামূলক আলোচনাও সন্নিবিষ্ট করেন। এই তুলনামূলক আলোচনা কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের কার্য পরিচালনায় রাজকর্মচারীদের বিশেষ সহায়ক হয়। তদানীন্তনকালে মাদ্রাজ প্রদেশের শাসনকার্য মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ হইতে পরিচালিত হইত। এই সময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলিকাতাস্থিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনুরূপ মাদ্রাজে ফোর্ট জর্জ কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামরাজের দক্ষতা ও বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া রিচার্ড ক্লার্ক নামে ফোর্ট জর্জের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁহাকে ফোর্ট জর্জ কলেজের অপিসের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। ইংরাজী ভাষায় দক্ষতার জন্য কিছুদিন পর তিনি এই কলেজের প্রধান ইংরাজী শিক্ষকের পদ লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইংরাজদের সংস্পর্শে আসিয়া রামরাজ শুধু ইংরাজী ভাষা নহে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ফোর্ট জর্জ কলেজের অধ্যাপককালে রামরাজ ভূগোল, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি বিষয়ও যত্নের সহিত অধ্যয়ন করেন। শৈশব ও বাল্যে শিক্ষালাভের সুযোগ না পাইলেও যৌবনকালে নিজের চেষ্টায় এইভাবে রামরাজ নিজেকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন। বিদ্যাবত্তা বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় নৈপুণ্যের জন্য উচ্চপদস্থ বহু ইংরাজ রাজকর্মচারীর সহিত রামরাজের পরিচয় স্থাপিত হয়।

ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন ক্যাপ্টেন হার্কনেস। বিদ্যানুরাগী হার্কনেসের চেষ্টায় রামরাজ বাঙ্গালোরের (মহীশূর) দেশীয় জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত যোগ্যতার সহিত রামরাজ ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই যুগ্ম আদালতের বিচারকের পদে আসীন ছিলেন।

রামরাজের জ্ঞান-তৃষ্ণা অদম্য ছিল। ইউরোপীয় ভারতবিদ্‌গণের ভারতবর্ষীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাফল্য দেখিয়া স্বদেশের অতীত গৌরব কাহিনী উদ্ঘাটনের জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনা জাগরিত হয়। দক্ষিণ ভারতের বিশেষতঃ কর্ণাট অঞ্চলের বিপুলায়তন দেব-দেউলগুলির সহিত বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার জন্মভূমি তাঞ্জোরের ২০০ ফুট উচ্চ গম্বুজযুক্ত বৃহদেশ্বর মন্দিরটি পৃথিবী বিখ্যাত। এই বিপুল মন্দিরগুলি নিরক্ষর শ্রমিকগণের কায়িক চেষ্টাতেই যে গড়িয়া উঠা সম্ভব হয় নাই, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। মন্দির নির্মাণ কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত গভীরভাবে আলাপাদির পর তিনি জানিতে পারেন যে এই বিদ্যা বংশানুক্রমে মন্দির নির্মাণকারীদের মধ্যে মুখে মুখে চলিয়া আসিলেও ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরা সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি হইতে এই জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। রামরাজের সমকালে যাঁহারা কাজ করিতেন সংস্কৃত না জানায় পিতা বা পিতামহের নিকট প্রাপ্ত মৌখিক উপদেশই তাঁহাদের উপজীব্য ছিল। রামরাজ নিজের চেষ্টায় দক্ষিণভারত হইতে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন—ইহাদের মধ্যে ছিল মানসার, ময়মতম্ কাশ্যপ (কাশ্যপ শিল্পম্), বৈখানস (বৈখানসীয় জ্ঞান-কাণ্ড ?), সকলাধিকার (অগস্ত্য রচিত), বিশ্বকর্মীয় (বাস্তু শাস্ত্রম্) সনতকুমার (বাস্তুশিল্পম্), সারস্বত্যম (?), পঞ্চরাত্রম (পঞ্চরাত্র প্রাসাদ প্রসাধনম্) প্রভৃতি সংস্কৃত পুঁথি। এই পুঁথিগুলির অধিকাংশই ছিল খণ্ডিত। মানসার, ময়মতম ও কাশ্যপ শিল্পম্ গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগই তাঁহার হস্তগত হয়। কোন কোন পুঁথির একাধিক প্রতিলিপিও তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রামরাজের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। ইহা সম্বল করিয়া তিনি যত্ন সহকারে পুঁথিগুলি অধ্যয়ন করেন। পুঁথির কোন অংশ অশুদ্ধ মনে হইলে এই পুঁথির অপর 'কপি' দেখিয়া তিনি শুদ্ধ পাঠটি বিচার করিয়া লইতেন, অনেক সময় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও সাহায্য লইতেন। বংশানুক্রমে মন্দির নির্মাণে নিযুক্ত স্থপতিদের সাহায্যে তিনি দুরূহ পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতেন। এইভাবে সংগৃহীত পুঁথিগুলির অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া রামরাজ অধীত বিষয়গুলি কিভাবে দক্ষিণভারতের বিভিন্ন মন্দির নির্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা বিভিন্ন মন্দির স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে থাকেন। এইভাবে অধীত বিদ্যা ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার আলোকে ছয়বৎসর কাল বিপুল পরিশ্রম করিয়া রামরাজ হিন্দুস্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত একটি বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন করেন। রামরাজের হিতৈষী সুহৃদ রিচার্ড ক্লার্ক এই সময়ে স্বদেশ ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহারই চেষ্টায় রামরাজ লণ্ডনস্থ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের 'করেসপণ্ডিং মেম্বর' পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে এই সোসাইটি স্থাপিত হয়। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অনুধাবনে ও বৈদেশিক ভাষায় এই উপলব্ধ জ্ঞানকে রূপদান করিতে রামরাজকে কি কঠোর পরিশ্রম ও পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল রামরাজ

কর্তৃক রিচার্ড ক্লার্ককে এই পুস্তক রচনাকালে লিখিত পত্রগুলি হইতে তাহা জানা যায়। রামরাজ তাঁহার রচনায় প্রথমে মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ সম্বন্ধে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া এই গ্রন্থগুলির নির্দেশ কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল তাহার ব্যাখ্যা দেন। সংগৃহীত ও অধীত পুস্তকগুলির মধ্যে রামরাজ 'মানসার'কেই সমধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির সহিত ভারতীয় স্থাপত্য রীতির তুলনামূলক আলোচনা করেন। 'মানসার' প্রাচীন বাস্তু-শিল্প সম্বন্ধে বর্তমানে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়। দ্রষ্টব্য ঃ—মানসার (মূল) ডাঃ প্রসন্নকুমার আচার্য সম্পাদিত, ১৯৩৩; ইং অনু ঃ Architecture of Mansara—Dr. P. K. Acharya; Indian Architecture According to Mansara Dr. P. K. Acharya 1927] দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত মন্দিরের তোরণ, বিমান, অলিন্দ, মণ্ডপ পীঠিকা প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের গঠন বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর রামরাজ প্রাচীন স্থপতিরা কি ভাবে সংযোজক মশলা বা 'চূণম' প্রস্তুত করিত তাহার বিবরণ দিয়া তাঁহার নিবন্ধের উপসংহার করেন। নিবন্ধের সহিত ৪৮টি চিত্র বা নক্সা প্রদত্ত হয়। নক্সাগুলির তিনটি 'পীঠিকা', ষোলটি স্তম্ভ ও ২৯টি ভিত্তিভূমি বিষয়ক। দক্ষিণভারতের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি হইতে গৃহীত এই নক্সাগুলির শিল্পশাস্ত্র সম্মত ব্যাখ্যাও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হয়। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ছয় বৎসরের বিপুল পরিশ্রমে গ্রন্থটি রচিত হইলে হিতৈষী সুহৃদবর্গের অনুরোধে ইহা লণ্ডনে প্রেরিত হয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রামরাজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ক্যাপটেন হার্কনেসের মুখবন্ধ সহ ইহা লণ্ডনস্থ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক শোভনরূপে বৃহদাকারে প্রকাশিত হয় (Essay on the Architecture of the Hindus by Ram Raz, Native Judge and Magistrate at Bangalore. With 48 Photos. Pub for Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London, 1834)।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই পুস্তক প্রকাশের পূর্বেই ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে রামরাজ বাঙ্গালোরে কর্মরত থাকাকালেই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে রামরাজ বিধবা স্ত্রী, একটি পালিতা কন্যা, এক ভ্রাতা ও বৃদ্ধা মাতাকে রাখিয়া যান।

রামরাজের মৃত্যুতে তাঁহার বিদেশস্থ ইংরাজ বন্ধুগণ বিশেষ মর্মাহত হন। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির দশম বার্ষিক সভায় তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত এই প্রতিভাবান মনীষীর অকালমৃত্যু ভারত বিদ্যাচর্চার জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির বার্ষিক প্রতিবেদনেও রামরাজের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। ইহাতে এই আশা প্রকাশ করা হয় যে রামরাজের অদ্বিতীয় ও অভিনব পুস্তক যথোচিত মর্যাদার সহিত বিদ্বৎসমাজ কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং ইহা ভবিষ্যতে বহুজনকে ভারত বিদ্যাচর্চায় অনুপ্রাণিত করিবে।

ভারত বিদ্যাচর্চায় পদক্ষেপ করার অত্যল্পকালের মধ্যেই রামরাজ পরলোকগমন করেন। দীর্ঘজীবী হইলে তিনি ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বহু স্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হইতেন সন্দেহ নাই

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রথম ভাগে ইংরাজী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে নিজের চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতীয় সুধী গ্রন্থাদি রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই শ্রেণীর মনীষীদের মধ্যে সর্বভারতের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) নাম উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক সুধী যেসকল গ্রন্থ রচনা করেন—তাহার বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম, রাজনীতি অথবা সমাজ সংস্কার। রামরাজই প্রথম ভারতীয় সুধী যিনি সর্বপ্রথম ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজ সংস্কার নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়া ভারতের অতীত গৌরবের প্রতি ইউরোপীয় তথা ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রাচীন হিন্দুরা যে শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তাতেই অগ্রণী ছিলেন না, তাঁহাদের ব্যবহারিক জ্ঞানও যে কত উন্নত ছিল প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র গ্রন্থগুলির আবিষ্কার ও মর্ম উদ্ধার দ্বারা রামরাজ সর্বপ্রথম তাহা বিশ্ববাসীর গোচরীভূত করেন। রামরাজের গ্রন্থটি হিন্দু স্থাপত্যবিদ্যা অথবা হিন্দু মন্দির-ভাস্কর্য সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ বা সর্বাত্মক গ্রন্থ নহে, তথাপিও ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে প্রাথমিক আলোচনা হিসাবে ইহার একটি সবিশেষ মূল্য আছে। মানসার, ময়মতম্, বিশ্বকর্মীয় শিল্পশাস্ত্র, অগস্ত্য-সকলাধিকার প্রভৃতি প্রাচীন বাস্তুশিল্পসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত ও গুপ্ত গ্রন্থগুলির নাম ও বিষয়বস্তু রামরাজই সর্বপ্রথম শিক্ষিতভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর গোচরীভূত করেন। বর্তমানে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার কোন কোনটি রামরাজের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার এক শতাব্দীরও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। *

হিন্দুস্থাপত্য বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থটি ছাড়া আর কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি রামরাজ রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। রামরাজের মৃত্যুর পর লণ্ডনস্থ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (জে, আর, এ, এস, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৪-২৫৭) প্রবন্ধ হিসাবে মাদ্রাজের গভর্ণরের নিকট ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত রামরাজের একটি পত্র মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত হইবার পূর্বে এই পত্রটি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সোসাইটির সাধারণ সভায় পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। এই পত্রের বিষয় ভারতে 'জুরী' প্রথার প্রবর্তন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ-শাসিত সিংহলের গভর্ণর সার আলেকজাণ্ডার জনষ্টন দেশীর ব্যক্তিদের সহযোগিতায় অর্থাৎ বর্তমান প্রচলিত জুরী প্রথায় খুন ইত্যাদী ফৌজদারী মামলার বিচার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে এক প্রস্তাব রচনা করেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে এই জুরী প্রথা পার্লামেণ্টের অনুমোদনে বৃটিশ শাসনাধীন সিংহলে প্রযুক্ত হয়। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর সার টমাস মনরো জনষ্টন কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া এই প্রথা মাদ্রাজ প্রদেশে কার্যকরী করার কথা বিবেচনা করেন। এই বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু হইলে নবনিযুক্ত গভর্ণর গ্রেম (H. S. GRAÆME) এই প্রস্তাবের উপযোগিতা সম্বন্ধে রামরাজের পরামর্শ চাহিয়া পাঠান। ইংরাজ শাসকদের নিকট রামরাজ কি পরিমাণ বিশ্বাস ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, এই ঘটনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে গভর্ণরের নিকট এই বিষয়ে লিখিত পত্রটিই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রামরাজ স্মৃতিচন্দ্রিকা নামক স্মৃতিগ্রন্থ এবং যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, পরাশর, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীন-

স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতৃদের সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া এই পত্রে লিখিয়াছেন যে রাজপুরুষ ব্যতীত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া বিচার-সভা দ্বারা বিচার কার্য সাধন প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন 'দ্বিজাতি'র মধ্য হইতেই এইরূপ বিচারকগোষ্ঠী গঠনের বিধি দিয়াছেন। রামরাজ ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে বর্তমানকালে এই বিধান মানা উচিত হইবে না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের মতই শূদ্রদেরও বর্তমানকালে শিক্ষালাভের সুযোগ আছে, সুতরাং 'জুরী' প্রথা প্রবর্তিত হইলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই 'জুরী' হইবার সুবিধা দিতে হইবে। হিন্দু জনসাধারণের মধ্য হইতে 'জুরী' নিযুক্ত হইলে ন্যায় বিচার ব্যাহত হইবে কিনা, অর্থাৎ জুরীগণ নিরপেক্ষতা দেখাইবে কিনা এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে রামরাজ লেখেন যে হিন্দু জাতির চরিত্র বহু ইউরোপীয় অতি হীনভাবে অঙ্কিত করিয়া এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন যেন হিন্দুরা জাতি হিসাবে অতি অসৎ। এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া রামরাজ বলেন যে মুষ্টিমেয় দুষ্ট হিন্দুর সংস্পর্শে আসিয়া বিদেশীরা সমগ্র হিন্দু সমাজকে হেয় জ্ঞান করেন। যেন সকল হিন্দুই লোভী, অসৎ ও বিশ্বাসঘাতক। ইংরাজ সৈন্য ও নাবিকদের মধ্যে অনেক ঘৃণিত চরিত্রের লোক আছে, ইহাদের চরিত্র দেখিয়া সমগ্র ইউরোপীয় জাতিকে ঘৃণা করা ভারতবাসীর পক্ষে যদি অসঙ্গত হয়, তবে কয়েকজন দুষ্ট হিন্দুকে দেখিয়া ইউরোপীয়গণেরও সাধারণভাবে ভারতবাসী বা হিন্দুসমাজকে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখা উচিত নহে। স্বদেশবাসিগণের প্রতি কোনও পক্ষপাত প্রদর্শন না করিয়া রামরাজ গভর্ণরের নিকট লিখিত এই পত্রে দৃঢ়তার সহিত একথা ঘোষণা করেন যে জগতের যে কোন সুসভ্য জাতির মতই হিন্দুগণ উচ্চ চরিত্রের অধিকারী ('I can boldly afirm that the Hindu character exhibibits as nicety and exquisiteness of good feelings as that of any other enlightened nation of the universe')। রামরাজের দৃপ্ত ঘোষণা হইতে মনে হয় যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হিন্দু সমাজের ব্যক্তিদের 'জুরী' হিসাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা ছিল এবং এই হিন্দুদের 'জুরী' হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধেই রামরাজের মতামত চাওয়া হইয়াছিল। প্রতিবেদনের পরিশেষে সাধারণভাবে রামরাজ জুরী প্রথা প্রবর্তনকে জনকল্যাণকর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন ও গভর্ণমেণ্টকে ইহা প্রবর্তন করিতে পরামর্শ দেন। তারপর গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিচার বিবেচনান্তে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে 'জুরী' দ্বারা বিচার প্রথা প্রবর্তিত হয়। পরে ইহা ভারতের অন্য প্রদেশেও প্রচলিত হয়। রামরাজ যে ইংরাজদের অনুগৃহীত 'জো-হুকুম' শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন না, স্বজাতি ও স্বদেশের স্বার্থে ইংরাজ শাসকদের নিকট স্বীয় মতামত নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করার নৈতিক সাহস যে তাঁহার ছিল গভর্ণরের নিকট লিখিত এই পত্র হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্র এমনকি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন স্মৃতিগ্রন্থ পঞ্চদশ শতকে প্রতাপরুদ্র রচিত সরস্বতী বিলাসেরও উদ্ধৃতি রামরাজের পত্রটিতে লক্ষিত হয়। ইহা নিঃসন্দেহে রামরাজের সংস্কৃত ভাষায় গভীর দক্ষতার পরিচায়ক।

---

* কাশ্যমশিল্পম্—আনন্দাশ্রম, পুনা; বিশ্বকর্মবাস্তুশাস্ত্রম্—তাঞ্জোর ১৯৬৮; পঞ্চরাত্রপ্রাসাদ প্রসাধনম—মাদ্রাজ ১৯৬৩; ময়মতম—ত্রিবেন্দ্রম ১৯১৯।

বস্তু-মানুষ

সম্বরণ রায়

'আমি কে?'

অনেকের মতে দার্শনিক জিজ্ঞাসার উৎস হ'ল এই ছোট্ট প্রশ্নটি। উত্তর নানা রকমের। কোনো কোনো দার্শনিক বলেছেন, 'আমি' বলে কিছু নেই। কেউ বা বলেছেন, 'আমি' ছাড়া কিছু নেই। কেউ বা আবার 'আমি'-র স্বরূপ খুঁজতে খুঁজতে এক 'মহা-আমি'-র সন্ধান পেয়েছেন। এমনতরো দার্শনিক বিতণ্ডার মধ্যে না গিয়ে যদি প্রারম্ভিক প্রশ্নটার একটা সাদাসিধে জবাব চাওয়া যায়, তবে বলতে হবে: আমি মানুষ।

এখানেও প্রশ্ন উঠতে পারে: মানুষ কে? সকলেই নিঃসংকোচে উত্তর দেবে, মানুষ ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যক্তিত্ববান সত্তা। এমন লোক নিশ্চয়ই নেই যে স্বীকার করবে তার ব্যক্তিত্বও নেই সত্তাও নেই। অবশ্য ব্যক্তিত্ব এবং সত্তা—এ দুটো ধারণাও বিতর্কমূলক, নানা অর্থ তাদের। তবে সহজ বুদ্ধিতে ব্যক্তি বলতে আমরা বুঝি—যে দেহ নিয়ে জন্মায়, সংসারধর্ম পালন করে, তারপর একদিন ছুটি নেয়। এই অর্থে আমরা সকলেই এক একজন ব্যক্তি। প্রত্যেকের সত্তার বিভিন্নতা নির্দেশ করবার জন্য আমরা প্রত্যেকেই জন্মাবার পর নাম গ্রহণ করি—রাম, রহিম, যদু, মধু প্রভৃতি। তারপর জীবনযাত্রা শুরু হয়—খাওয়া-দাওয়া লেখা-পড়া রুজি-রোজগার প্রেমকলহের নিত্যনৈমিত্তিক পালা। আমরণ জীবনযাত্রায় সুখ আছে দুঃখ আছে, আছে আশা-নিরাশা শ্রম-বিশ্রাম সাফল্য-বিফলতার তরাই-উৎরাই। এটাকে বলা চলে ব্যক্তিক জীবনের চলার ইতিকথা। আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিক সত্তা উদ্ভিন্ন হয়। ব্যক্তি বলতে তাকেই বোঝায় যে বিশেষরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। নিজেকে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তি হয়ে আমরা জন্মাই না, জন্মাই ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে। অতএব যখন ব্যক্তি শব্দ প্রয়োগ করা হয় তার যুক্তিসঙ্গত অর্থ এই যে, আমাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা আছে এবং আশৈশব জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে এই ব্যক্তি-পরিচয়ের সাধনা করি। যখন আত্মপ্রকাশ ঘটে, তখনি আমাদের ব্যক্তিক সত্তা সৃষ্টি হয়। বীজটাকে যেমন কেউ গাছ বলে না, তেমনি মানুষমাত্রেই ব্যক্তি হয়ে ওঠে না।

কেমন করে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে? নানাভাবে। কবি তার কবিতার মধ্য দিয়ে, শিল্পী শিল্পের মধ্য দিয়ে, কৃষক ফলের মধ্য দিয়ে। কবিতা কবির সৃষ্টি, মর্মরমূর্তি স্থপতির সৃষ্টি, ক্ষেতভরা ধান কৃষাণের সৃষ্টি। এগুলিকে আমরা সৃষ্টি বলি দুটি কারণে। প্রথমত, এরা ছিল অনস্তিত্বের অন্ধকারে, ছিল মানুষের কল্পনা ভাবনার রাজ্যে যেখান থেকে তারা আসে অস্তিত্বের আলোয়, রূপ পায় জগতে। অরূপ ভাবনাকে অন্তঃস্থিত সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়া সৃষ্টির ধর্ম। দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষ আপনার সত্তা আপনার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে? সে যে শুধু অস্তিমান জীব নয়, সে যে সত্য—সে সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। সৃজনের আগে বিধাতা

ছিলেন একা। তিনি অসত্তার বেদনায় নিশ্চয় অধীর হয়ে উঠেছিলেন, তাই বললেন, আমি বহু হবো।' তিনি নিজেকে বহু করে তবে আপন সত্তার চেতনা লাভ করলেন। নিজেকে বহু-করা হল সৃষ্টির কাজ। বহু করার অর্থ আপনাকে টুকরো করে ফেলা নয়, নিজেকে বহিঃস্থ করা, আমার বাহিরে একটা জগৎ সৃষ্টি করা, বাহিরে জগৎটার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। সৃষ্টির কাজই হল অন্তরকে বাহিরে রূপ দেওয়া। সেই রূপ সৃষ্ট-বস্তুর মধ্যে আকার পায়; সেই রূপই আবার আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক হয়ে দেখা দেয়।

সৃষ্টির মাধ্যম হল কর্ম। কর্মের সাহায্যে মানুষ তার সৃজনী প্রতিভাকে ব্যক্ত করে। কর্মশক্তি তাই একান্তই মানবিক লক্ষণ। পাখীর আকাশে ওড়াকে কেউ কর্ম বলবে না। পিঁপড়ের সারি বেঁধে আহার অন্বেষণ করাও কর্ম বলে বিবেচিত হয় না। কর্ম উদ্দেশ্যমূলক। আবার, শুধু উদ্দেশ্যমূলক বলে ক্ষান্ত হলে আধেক-বলার দোষ লাগবে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতনতা কর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমি কি করছি, কেন করছি, সেই বোধের অভাব ঘটলে কর্ম নিছক একটা জৈবিক শ্রমের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শিশু হাত-পা ছোঁড়ে। তার একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। কিন্তু তাই বলে কেউ তাকে কর্ম বলবে না। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ: ব্যবহারিক (বা জৈবিক) এবং আত্মিক। কর্ম যখন ব্যবহারিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সে আমাদের জৈবিক প্রয়োজন মেটায়। কিষাণ লাঙ্গল টানে, যন্ত্রী যন্ত্র বাজায়, তাঁতী কাপড় বোনে, মেথর ময়লা সরায়, বৈদ্য অসুখ সারায়। এ সবই আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। আবার, পুরোহিত পূজো করে, মাষ্টারমশাই পড়ায়, সাহিত্যিক লেখে, রূপদক্ষ আঁকে, গায়ক গান শেখায়; এগুলোকে বলা হয় আত্মিক উদ্দেশ্য। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য মানুষের জীবনযাত্রায় প্রণোদনা যোগায়। কর্মশক্তির সাহায্যে উদ্দেশ্য যখন সাকার হয়ে ওঠে, তখনি মানুষ জীবনের সার্থকতা অনুভব করে। তার সৃজনধর্মিতা চরিতার্থ হয়। অব্যক্ত ও ব্যক্তের মাঝে একটা যোগসূত্র আছে। যদি না থাকত, তবে অব্যক্ত সম্ভাবনা কখনোই ব্যক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হত না। ঐ যোগসূত্রটি হল কর্ম। কর্মের মাধ্যমে অব্যক্ত সম্ভাবনা ব্যক্তরূপ গ্রহণ করে বলেই কর্মশক্তি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, মানুষের আত্মবিকাশের একমাত্র পথ।

সমাজ কর্মশক্তিকে কি চোখে দেখে তার উপর নির্ভর করে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সমাজের ধারণা। সেটা বুঝবার জন্য সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করা দরকার।

সমাজ ব্যাপারটা 'সে—তুমি-আমি'-র ব্যাপার। সে-তুমি-আমি একসঙ্গে চলি, তাই সমাজ গড়ে উঠেছে। বুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ বলতে এই একসঙ্গে চলার কথাই বোঝায়। অবশ্য, একসঙ্গে চলা বলতে পাশাপাশি চলছি কেবলমাত্র এইটুকুই বোঝায় তা নয়। ধরা যাক, ট্রেনের কামরায় তুমি আমি পাশাপাশি বসে আছি। কিন্তু তাই বলে তো আর তোমার আমার মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে না! এমনকি, সহযাত্রিত্বের সম্পর্কটাও নয়। একসঙ্গে চলছি বটে, কিন্তু সে তো নিছক ঘটনা মাত্র। আমি তোমার দিকে চাইতে পারি, নানান কথা ভাবতে পারি। তুমিও তাই করতে পারো। কিন্তু তবু আমরা সম্পর্কহীন। তারপর ধরো, আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম মুখে রোদ পড়ছে বলে তুমি জানলাটা নামাবার চেষ্টা করছ, পারছ না। আমি তখন উঠে গিয়ে জানলাটা নামিয়ে দিলাম। তুমি হাসলে, কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ সেই হাসিতে। আমাদের মধ্যে

একটা সম্পর্কের সম্ভাবনা দেখা দিল। সহযাত্রিত্বের সম্পর্ক। তোমার কাছে টিফিন কেরিয়ারে যদি খাবার থাকে হয়তো আমাকে দেবে। আমি হয়তো তোমার জন্য ষ্টেশন হতে চা জল নিয়ে আসব। হয়তো আমাদের অপরিচয়ের আড়াল ভেঙে আলাপ শুরু হবে। এমনি করে আমরা দুজন আমাদের 'আপন হতে বাহির হয়ে' বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এই যে 'আপন হতে বাহির হয়ে' আসা—এটাই হল আন্তর্মানবিক সম্পর্কে গোড়ার কথা।

এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, সম্পর্ক সৃজনের পিছনে আছে প্রয়োজনের তাগিদ। তোমার প্রয়োজন ছিল জানলাটা নামানো। আমি যদি না নামাতাম, আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠবার সুযোগ পেত না। আবার, শুধু জানলা নামানোতেই যদি কাজ শেষ হয়ে যেত, অর্থাৎ যদি প্রয়োজন মিটলেই সম্পর্কটা সমে এসে পৌছুত তাহলেও সম্পর্কের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট হত। আমি তোমাকে দিলাম, তুমি আমাকে দিলে। এই আদান প্রদানের সাহায্যেই সম্পর্ক দানা বাঁধল। হয়ত সম্পর্কটা নিতান্তই ক্ষণজীবী, পাঁচ দশটা ষ্টেশন পর্যন্ত তার মেয়াদ। কিন্তু এই স্বল্পপরিসরের মধ্যে আমাদের আদান প্রদান ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটিয়ে যে আত্মিক যোগটি স্থাপন করল সেটাই হল সম্পর্কের প্রধান লক্ষ্য। আত্মিক যোগটি যখন দানা বাঁধে তখন বোঝা যায় তুমি আমি 'আপন হতে বাহির হয়ে' বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি; নিছক প্রয়োজনের তাগিদটাকে সচেতন সহানুভাবক সহৃদয় আদান প্রদানের কোঠায় উন্নীত করেছি। তখন আমার কাছে তোমার কথাই বড়ো। তোমার কাছে আমার কথাটা বড়ো।

আদানপ্রদান যতক্ষণ জৈবিক উদ্দেশ্যের আওতায় থাকে, ততক্ষণ তার কারবার শুধু বস্তু নিয়ে। বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে বস্তুর ভূমিকা মস্ত বড়ো। চাল-ডাল চাই, ঘর-বাড়ি চাই, কাপড়-চোপড় চাই, যন্ত্রপাতি চাই। এগুলি বস্তু এবং এই সব বস্তু উৎপাদন করে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জৈবিক প্রয়োজন মেটায়। কিষাণ ফসল ফলায়; তাঁতী-ঘরামী-কামার তাই খেয়ে কিষাণের জন্য কাপড় বোনে, ঘর বানায়, লাঙল তৈরি করে। প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভারের প্রয়োজনমতো বিনিময় ব্যবস্থা না থাকলে মানুষের বেঁচে থাকাই অসাধ্য।

বস্তুর আদানপ্রদান প্রক্রিয়ার ক্রমপরিবর্তন ঘটে। সমাজের একটা অবস্থা ছিল যখন বস্তুর বিনিময়ে বস্তু মিলত। চাষা ফসল দিত তাঁতীকে, বিনিময়ে নিয়ে আসত কাপড়। আমার তৈরি বস্তুর বদলে পেলাম তোমার তৈরি বস্তু। বিবর্তনের ফলে সমাজের গণ্ডী ক্রমশ বেড়ে চলে; তখন বস্তু বিনিময় প্রথায় আদান প্রদান অকেজো হয়ে পড়ে। বৃহদায়তন সমাজ ব্যবস্থায় বস্তুবিনিময়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান চাই, একটা নির্দিষ্ট মান চাই। তাই সমাজ যত প্রসার লাভ করে ততই হাটবাজারের চাহিদা জাগে। সেখানে অনেক বস্তুর লেনদেন অনেক লোকের সমাগম সম্ভব হয়। তারা এক অপরের অচেনা; শুধু জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদেই একজন আর একজনকে চিনতে চায়। এটাই হ'ল তাদের পারস্পরিক পরিচয়: তুমি বেচছ, আমি কিনছি। এই পরিচয়ের ভিত্তি হ'ল মুদ্রা, সেটা বিনিময়ের মান। হাটবাজার কথা কয় মুদ্রায়।

পকেটে কিছু মুদ্রা নিয়ে আমরা বাজারে যাই জিনিস কিনতে। ব্যাপারী জিনিস নিয়ে বাজারে আসে বেচতে। বাজার বলে, মুদ্রা দাও, জিনিস নাও, জিনিস দাও মুদ্রা নাও। একে

বলা চলে বিপণন বৃত্তি। বিপণন বৃত্তি একেবারে নির্জলা নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার। অনুভব বা আবেগের নামগন্ধ নেই। বিপণন বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বাজার ব্যাপারটাও একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক। সেখানে কেবল বস্তুর লেনদেন, বস্তুর বেচাকেনা। আদান-প্রদান বলতে পারস্পরিক মনের যোগসূত্রর একটা আভাস পাওয়া যায়। সেই সূত্রটি যখন বাজারের টানাপোড়েনে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তখনি বিপণিক হিসাব-নিকাশ সম্ভব হয়।

আদান-প্রদানের দুটি রূপ : বিপণিক এবং সামাজিক। সামাজিক আদান-প্রদান ঘটে, যখন মানুষের একসঙ্গে চলার কথাটা বড়ো এবং একসঙ্গে চলবার জন্যই পরস্পরের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া ঘটে। বিপণিক আদান-প্রদানে এই ধারাটা উল্টে যায়; যেন, বস্তুর দেওয়া নেওয়াটাই বড়ো এবং তারই জন্য একসঙ্গে চলতে হয়। বিপণিক আদান-প্রদান তাই লাভালাভের দাঁড়িপাল্লা হাতে করে বসে থাকে। পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার মধ্যে আমার কতটা 'লাভ' হল এই বিবেচনা যখন ঢুকে পড়ে তখন আদান-প্রদানের বিপণিক রূপ প্রকাশ পায়। তখন নিক্তি মেপে দেওয়া নেওয়া চলে; আমি তোমাকে যতটা দিলাম তার চেয়ে বেশী পেলাম কি কম পেলাম সেটা খুঁটিয়ে বিচার করা হয়। যদি কম পাই, বলি 'ক্ষতি' হল; যদি বেশী এসে থাকে মুখটা হাসিতে ভরে যায় 'লাভ' হল বলে। সামাজিক চিত্তবৃত্তি মূলত পরধর্মী; বিপণিক চিত্তবৃত্তি স্বভাবতই স্বার্থধর্মী। বাজারের দিকে তাকালেই সেকথা বেশ বোঝা যায়।

ক্রেতার কাছে মুদ্রা আছে, বিক্রেতার কাছে জিনিস। ক'টা মুদ্রার বিনিময়ে কোন জিনিসটা পাওয়া যাবে সেটা বাজারী নিয়মে স্থিরীকৃত হয়ে আছে। বিনিময়ের মান হল বহুমূল্য। যার কাছে নির্ধারিত মূল্য দেবার মতো মুদ্রা নেই মাথা খুঁড়লেও তার পক্ষে বস্তুটি জোগাড় করা অসম্ভব। ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে যে সম্পর্কটি গড়ে ওঠে তার মাধ্যম হল মুদ্রাশ্রয়ী মূল্য। বিক্রেতা যদুর সঙ্গে ক্রেতা মধুর বন্ধুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু বাজারে সে বন্ধুত্বের কোন সার্থকতা নেই। সেখানে তাদের সম্পর্কটা নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক বস্তুমূল্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধরা যাক, মধুর খুব প্রয়োজন কোনো একটি বস্তুর। কিন্তু নির্ধারিত মূল্য দেবার মতো মুদ্রা যদি তার কাছে না থাকে, তবে যদুর পক্ষে সেই জিনিসটা বিক্রি করা সম্ভব নয়। তার ক্ষতি হবে। আবার, মধুর প্রয়োজনে লাগবে না এমন কোনো জিনিস সে যদুর শত অনুরোধেও কিনবে না, কারণ তাহলে অলাভ হবে তারই। যদি দায়ে পড়ে তাদের মধ্যে বস্তুটির কোন বিপণিক আদান প্রদান ঘটে, তাহলে যার অলাভ ঘটল সে মনে মনে ভাববে, 'আমায় আচ্ছা ঘক দিয়ে গেল।' তখন বন্ধুত্বের ইমারতে ফাটল দেখা দেয়।

আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যখন বিপণিক আদান প্রদান সামাজিক আদান প্রদানের স্থান দখল করে বসে, তখন মানুষ তার মানবিক আত্মতা হারিয়ে ভেলে। মানুষ মূলত স্রষ্টা, কারণ সে কর্মশক্তির অধিকারী। কর্ম সৃজনধর্মী। কর্মশক্তির সাহায্যে মানুষ তার প্রয়োজন সৃষ্টি করছে, সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্য বস্তু সৃষ্টি করছে। আর বস্তু সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কও সৃষ্টি করে চলেছে। এই ত্রিধারা সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষ নিজেকেও সৃষ্টি করে। এটাই তার আত্মপ্রকাশের সারমর্ম। সৃষ্টির প্রাণ হল পরধর্মিতা। কবি যখন কবিতা

লেখে, রূপদক্ষ যখন আঁকে, তখন আমরা বলি সে নিজের আনন্দবিধানের জন্য ওই সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত হয়। ঠিক তা নয়। তা যদি হত, রবীন্দ্রনাথের সাতাশ ভলিউম রচনা তাঁর আলখাল্লার পকেটেই পড়ে থাকত; তিনি কখনো জিজ্ঞাসা করতেন না, 'কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি।' কাব্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি : এগুলো হল 'আমি'-র সঙ্গে 'তুমি'-র যোগসাধনের পথ। বস্তু সৃষ্টিও তাই। তাঁতীর জন্য ফসল ফলিয়ে চাষা এমন একটি যোগ স্থাপন করে যেটা তাকে আপনার বাহিরে সত্য করে তোলে। 'একাকী গায়কের নহে তো গান'। এ কথা সৃষ্টিকর্মের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আমার সৃষ্টি তখনি সার্থক যখন সেটা নিছক আমার প্রয়োজনকে ছাপিয়ে তোমাকে স্পর্শ করে। তখন আমার কাছে তুমি শুধু একটা প্রয়োজনীয় উপায় মাত্র নও, তখন তুমি আমারই মতো এক প্রাণময় ব্যক্তিত্ববান সত্তা হয়ে ওঠো। Man is an end in himself : প্রবচনটির এটাই হল প্রকৃত অর্থ।

বিপণিক আদান-প্রদানের মাঝে পরধর্মিতার অভাব ঘটে কারণ সেখানে নিজস্ব লাভ-ক্ষতির প্রশ্নটাই বড়ো। বিপণন বৃত্তি প্রত্যেক মানুষকে ব্যাপারী করে তোলে। এটাই তার স্বভাবধর্ম। স্রষ্টা এবং ব্যাপারীর মধ্যে তফাৎ এই যে, স্রষ্টার লক্ষ্য হল 'তুমি', ব্যাপারীর লক্ষ্য 'আমি'। মানুষ সৃষ্টি করে; কিন্তু সৃষ্টি করলেই তো আর স্রষ্টা হওয়া যায় না। ব্যাপারী পরিবেশটাকে অতিক্রম করেই তবে মানুষ যথার্থ স্রষ্টা হয়ে উঠতে পারে।

ব্যাপারীর কারবার পসরা নিয়ে। পসরাটা বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তু ভাবলেশবর্জিত। বস্তুর বিপণিক আদান প্রদান করতে করতে মানুষ এমন এক জায়গায় উপস্থিত হয় সেখানে সে নিজেই বস্তুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। কেমন ক'রে তা সম্ভব হয়? ঠিক যেমন করে স্রষ্টা মানুষ ব্যাপারী হয়ে ওঠে, ব্যাপারী বস্তু হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মুদ্রাসুরের মহামায়ায়।

অর্থনীতিজ্ঞেরা বলে থাকে, economic society বা আর্থ সমাজে প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য আছে। প্রয়োজন অনুসারে তার মূল্য নির্ধারিত হয়। তারা এও বলে, শুধু বস্তুই নয়, অবস্তুরও মূল্য আছে যদি তা প্রয়োজনীয় হয়; যেমন, service বা সেবা। অসুখ হয়েছে, ডাক্তার এল, ওষুধ বাতলে দিয়ে চলে গেল, যাবার সময় ডাক্তারী উপদেশের জন্য আট টাকা দক্ষিণা নিয়ে গেল। এই ডাক্তারী উপদেশ কি বস্তু? নার্স এল, নিপুণ হাতে রোগীর সেবা করল, বিনিময়ে দক্ষিণা পেল। এই সেবা কি বস্তু? মামলা বেঁধেছে, কোর্টে গিয়ে উকিল লড়ল, বিনিময়ে দক্ষিণা পেল। তাঁর আইনী কুশলতা কি বস্তু? ছেলেকে বাড়িতে এসে পড়িয়ে গেল শিক্ষক, বিনিময়ে দক্ষিণা পেল? এই শিক্ষাদান কি বস্তু?

বিনয় করে বলা হচ্ছে বটে দক্ষিণা; আসলে এটা মূল্য। ডাক্তারের পরামর্শ, নার্সের সেবা, আইনী কুশলতা, শিক্ষাদান, কবির কবিতা : এগুলির জন্য আমরা যে দাম দি তাকে দক্ষিণা পারিশ্রমিক fees ইত্যাদি শ্রুতিমধুর নাম দিয়ে থাকি। কারণ, মূল্য শব্দটা সেবার বেলায় কেমন যেন শোনায়। কিন্তু যে নামেই ডাকি না কেন, হরিই বলি বা হর-ই বলি, জিনিসটা একই। মূল্য। যেমন, ভালো জুতো কিনতে গেলে বত্রিশটাকার কম হয় না, তেমনি ভালো ডাক্তার ডাকতে গেলেও বত্রিশ টাকা ফেলতে হয়। মূল্যের দিক থেকে সেবা এবং বস্তুর মধ্যে কোনো

গুণগত পার্থক্য নেই। তারা সমীকৃত।

সমীকরণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর উৎস হল কর্মশক্তি সম্বন্ধে প্রচলিত সামাজিক ধারণা। কর্মশক্তিকে দুদিক থেকে দেখা যায়—ব্যবহারিক এবং আত্মিক। আসলে এরা পরস্পর নির্ভর। পরস্পর পরিপূরক। দুটোকে মিলিয়ে কর্মশক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। যদি একটাকে বাদ দিয়ে অপরটাকে সার্বিক রূপ বলে গ্রহণ করা হয়, তবে শুধু যে কর্মশক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি বিকলাঙ্গ হবে তা নয়, মানুষ সম্বন্ধে ধারণাটিও সেই সঙ্গে অনুপপত্ত হয়ে পড়বে। ঠিক এই ধরণের অনুপপত্তির প্রভাবেই সমীকরণ প্রতিক্রিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ব্যবহারিক দিক থেকে দেখলে কর্মশক্তির কাজ, জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী উৎপাদন করা। যাকে productive power বা উৎপাদিকা শক্তি আখ্যা দেওয়া হয়, সেটা ব্যবহারিক দিকটাকেই বোঝায়। নৃতাত্ত্বিকদের অনেকে মানুষকে tool-making animal বলে সংজ্ঞায়িত করেছে। সংজ্ঞাটি নেহাৎ অযৌক্তিক নয়। যন্ত্রনির্মাণ থেকেই মানব সভ্যতার সূত্রপাত। প্রকৃতিকে বশে আনবার যে মন্ত্র মানুষ জেনেছে সেটা যন্ত্র। যন্ত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত উৎপাদিকা শক্তি অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু উৎপাদনের সার্থকতা কি কেবলমাত্র উৎপাদনেই। কিষাণ ফসল উৎপাদন করল; ঐ উৎপাদনের সার্থকতা কি ফসলটাতেই শেষ হয়ে গেল? তাই যদি হয়, তবে কোনোমতে ধান চালটা ঘরে তুলতে পারলেই তো কিষাণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে গেল। যখন উৎপাদনের সার্থকতা শুধু উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন যে উৎপাদন করছে এবং যার জন্য উৎপাদন করা হচ্ছে তাদের মধ্যে যোগসূত্রটা নিছক প্রয়োজন নির্ভর হয়ে দাঁড়ায়, তাদের সম্পর্কটা নিছক স্বার্থপ্রণোদিত। তোমায় না হলে আমার চলবে না, তাই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো। যদি তোমায় ছাড়াই আমার চলে তবে তুমি জাহান্নামেই যাও বা যেখানেই যাও, সে খবরে আমার কোনো দরকার নেই। মানুষে মানুষে যে সামাজিক সম্পর্ক আছে, সেটা যদি কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজনের সম্পর্কমাত্র হয়, তবে ধরে নিতে হবে মানব সমাজ সৃষ্টির মূলে রয়েছে স্বার্থ-নিবদ্ধ বৈষয়িক বুদ্ধি। সামাজিক সম্পর্ককে তবে শুধু social contract হিসেবে দেখা যেতে পারে। তখন সমাজ ব্যাপারটা যেন একটা জটিল business transaction ছাড়া কিছুই নয়।

যে সমাজ ব্যবস্থা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মানুষের কর্মশক্তি আত্মবিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক উৎপাদিকা শক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে, সেখানে বিপণিক বৃত্তির প্রতিপত্তি থাকবেই। উৎপাদিকা শক্তি সেখানে সৃষ্টি শক্তির ব্যবহারিক দিক ব'লে পরিগণিত হয় না; ওটাকে শুধু খেটে খাবার ক্ষমতা বা শ্রমশক্তি ব'লে মেনে নেওয়া হয়। কেউ দেহটাকে খাটিয়ে খাচ্ছে, কেউ বা মগজটাকে। দুজনেরই প্রশ্ন, 'আমি যে খাটব, কি দেবে আমাকে তার পরিবর্তে?' যন্ত্র বিপ্লবের ফলে যে-শিল্প সমাজ গড়ে উঠল, তার উত্তর সহজ: 'টাকা দেবো।' শিল্প সমাজের বিপণিক ব্যবস্থাপনায় কর্ম মাত্রই 'মুদ্রায়িত' হয়ে উঠল, অর্থ বিদ্যায় যাকে বলা হয় monetization of daily activity। এই প্রসঙ্গে একজন অর্থনীতিজ্ঞের উক্তি উল্লেখযোগ্য: "Labour, for example, emerged as an activity quite different from the past. No longer was

"labour" part of an explicit social relationship in which one man (serf or apprentice) worked for another (lord or guildmaster) in return for at least an assurance of subsistence. Labour was now a mere quantum of effort, a "Commodity" to be disposed of on the market place for the best price it could bring, quite devoid of any reciprocal responsibilities on the part of the buyer, beyond the payment of wages. ("রবার্ট এল. হাইল ব্রোনার")। অতীতে কর্মশক্তি এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যেটুকু যোগাযোগ ছিল, শিল্প সমাজে সেটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হ'ল। কর্মশক্তি এখন আর কর্মশক্তি রইল না, হয়ে পড়ল শ্রমশক্তি, উৎপাদিকা শক্তি ইত্যাদি। মুদ্রামূল্যে বস্তুর মতো তার বেচাকেনার ব্যবস্থা হল। শ্রমের বেলাতেও বাজার সৃষ্টি হল। আমি শ্রম-ক্রেতা, তুমি শ্রম-বিক্রেতা ; বাজারে আমাদের সাক্ষাৎ হল, লেনদেন হ'ল। তুমি এসে আমার জন্য খেটে দিলে, আমি তোমাকে তার পরিবর্তে মুদ্রা দিয়ে দিলাম। চুকে গেল। শ্রমটুকুই সার। উৎপাদনটাই মোদ্দা কথা। সেই শ্রমের মধ্য দিয়ে, সেই উৎপাদনের সাহায্যে তোমার আমার মধ্যে প্রয়োজন ছাপিয়ে কোনো আত্মিক সম্পর্ক উন্মেষিত হয় না।

শুধু লেনদেন, শুধু বেচাকেনা। শ্রম-ক্রেতা ও শ্রম-বিক্রেতার বাজারে-সম্পর্ক যে কত নিষ্প্রাণ নিরাত্মক তা বর্ণনা করতে গিয়ে মনীষী য়্যালেক্‌সিস দে টোকিভিল বলেছেন : "The manufacturer asks nothing of the workman but his labour ; the workman expects nothing from him but his wages. The one contracts no obligation to protect nor the other to depend, and they are not permanently connected either by habit or by duty. মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক একেবারে নির্জলা বাজারে সম্পর্ক : টাকা দাও কাজ দিচ্ছি ; কাজ দাও টাকা দিচ্ছি। কেউ কারুর কথা ভাবতে আমাদের ব'য়ে গেছে ; যতক্ষণ উৎপাদন চালু থাকে যতক্ষণ মজুরি আসে ততক্ষণ অবশ্য ভাবতেই হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বাইরে নয়, আর উৎপাদন-মজুরির বিষয় ছাড়াও নয়।

Employment market বা চাকরীর বাজার—এই অভিধাটির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। এটা আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক আলোচনার বাগ্‌বিতণ্ডার নিন্দা প্রশংসার বিষয়বস্তু। চাকরীর বাজারের দিকে তাকালে বোঝা যায় শ্রম কেনা-বেচা ব্যাপারটা মাছ-জুতো-গাভী-বাড়ী কেনা বেচার থেকে বিশেষ কিছু আলাদা নয়। ধরা যাক কোনো এক প্রতিষ্ঠানে লেডি রিসেপশনিষ্ট দরকার। প্রয়োজনীয় গুণগুলির বর্ণনা দিয়ে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল : সুশ্রী সুশিক্ষিতা চলনে বলনে পটু হাস্যময়ী লাস্যময়ী (ইত্যাদি) যুবতী চাই। প্রার্থিনীরা নিজেদের বিক্রেয় গুণগুলির ফলাও বিবরণ দিয়ে দরখাস্ত পাঠালো। ইণ্টারভিউ বোর্ড বসল। বোর্ডের কাজ হল যাচাই করা ; ক্রেতা যেমন মাল কেনার আগে ভালো করে যাচাই করে নেয়। প্রার্থিনীরা একে একে বোর্ডের সামনে নিজেদের উপস্থাপিত করে—সাজে সজ্জায় ভাবে ভংগীতে চলনে বলনে মনোহরণ রূপে। ঠিক যেমন ব্যাপারী তার পণ্য সামগ্রীকে সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে ক্রেতার মনোহরণের চেষ্টা করে। পছন্দসই পণ্য সামগ্রীর মতো ইণ্টারভিউ বোর্ডও পছন্দসই প্রার্থিনীকে

চাকরীর জন্য মনোনীত করে। ধরা যাক, কুমারী 'ক' মনোনীত হ'ল। তখন সম্ভবত দরদস্তুর শুরু হয় (যদি বিজ্ঞাপনে মাইনের হার অনুক্ত থাকে) তিনশোর বেশী দেবো না—সাড়ে তিনশোর কমে চলবে না: এই ধরণের দরদস্তুরের পর রফা হল সোয়া তিনশোয়। তখন কুমারী 'ক' চাকরীটা পেল। চাকরী পাওয়ার মানে সে তার শ্রমশক্তিকে সোয়া তিনশো টাকার বিনিময়ে নিয়োগকর্তার কাছে বিক্রি করল, অর্থাৎ আপন কর্মদক্ষতার উপর তার অধিকার হারাল। তার শ্রী হাসি চাহনি চলন বলন ভাবভঙ্গি সাজসজ্জা আচার ব্যবহার—সব কিছুই এখন থেকে নিয়োগ কর্তার আয়ত্তগত। যদি কোনোদিন কুমারী 'ক' যথারীতি সজ্জিত হয়ে না আসে, যদি কোনোদিন কোনো স্বগত কারণে তার হাসিটায় কথাটায় যথারীতি মন ভোলানো ঝলক না থাকে, যদি কোনোদিন প্রতিষ্ঠানের কোনো পৃষ্ঠপোষক তার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগ করে, তবে নিয়োগকর্তা তাকে ডেকে বলবে: দেখুন, অফিসে আসবার সময় ব্যক্তিগত জীবনটাকে ছাড়া-শাড়ীর মতো বাড়ীতে ফেলে আসবেন। কোম্পানী আপনাকে মাইনে দিচ্ছে আপনার মিষ্টি হাসি মিষ্টি ব্যবহারের জন্য। ওগুলো ঠিক মতো না পেলে কোম্পানী আপনাকে রাখবে কেন বলুন? ন্যায্য কথা। তুমি বেছে-বুছে মাছ কিনে এনে যদি দেখো মাছটা খাবার উপযুক্ত নয় তবে মেছুনীর উপর তোমার রাগ হওয়াই স্বাভাবিক, তোমাকে সে ঠকিয়েছে, তার সততায় আর বিশ্বাস থাকে না।

কিন্তু রূপ হাসি চলন শিক্ষা দীক্ষা—এগুলো তো আর মৎস্যসদৃশ পণ্যবস্তু নয়। এরা যে কুমারী 'ক'-এর একান্ত আপনার জিনিস, তার ব্যক্তিত্বের অঙ্গ। হলে কি হবে। বিপণন-প্রক্রিয়ার মূল কথাই হল, যেটা মূল্যের বিনিময়ে ক্রীত, সেটা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে চলে আসে, তার উপর ক্রেতার স্বত্ব জন্মায়, ষোলো আনা স্বত্ব। স্বত্ব শব্দটা দ্বৈতবাদক। মানুষ এবং পদার্থ—যার স্বত্ব এবং যেটার উপরে স্বত্ব: এই দ্বিবিধ ধারণা ব্যতিরেকে স্বত্ব শব্দটি অর্থপূর্ণ হয় না। যেমন, বাড়ীওয়ালা ও বাড়ী, ফলওয়ালা এবং ফল, পয়সাওয়ালা লোক এবং পয়সা। বাড়ীওয়ালা তার বাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন, ফলওয়ালা তার ফল হতে বিচ্ছিন্ন, পয়সাওয়ালা পয়সা হতে। স্বত্ব একমাত্র সেটার উপরেই অর্সাতে পারে যেটা অধিকারী থেকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় থাকে বা বিচ্ছিন্নাবস্থায় প্রাপ্ত হতে পারে। অর্থাৎ 'হস্তান্তরিত' হতে পারার গুণ যে বস্তুতে নেই তার সম্বন্ধে স্বত্বের প্রশ্ন উঠে না। মানুষ বস্তু হতে বিচ্ছিন্ন বলে বস্তুর উপর তার স্বত্ব জন্মাতে পারে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, যা বিচ্ছিন্ন নয়, তার সম্বন্ধেও তো স্বত্ব শব্দ প্রযোজ্য। যেমন, আমার ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, সেটা আমা হতে বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু তবু তার উপর আমার স্বত্ব আছে। তা ঠিক, কিন্তু রক্তের উপর আমার স্বত্বের কথা তখনই উঠবে যখন তাকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় কল্পনা করা যাবে, তাকে বস্তু হিসেবে মূল্যের বিনিময়ে বিপণিক আদানপ্রদানের যোগ্য করে তোলা হবে। রক্ত বিক্রেয়, এই উক্তির মূলে যে পূর্বসিদ্ধান্ত আছে তা হল, রক্তকে আমা হতে পৃথক করে দেখা যায়। পৃথক্কৃতকত্ব গুণটি তাই স্বত্বের অপরিহার্য লক্ষণ। অবশ্য, বলাবাহুল্য, ওই সঙ্গে পদার্থটির বিক্রেয়তা গুণটিও থাকা দরকার; অর্থাৎ মূল্যের বিনিময়ে তাকে 'হস্তান্তরিত' করা যায়। নইলে স্বত্বের কোনো মানেই হয় না। যেমন, আমার রক্ত যদি আমার

স্ত্রীর জন্য দান করি তখন সেটা 'বস্তু' পর্যায়ে পড়ে না, সেটা বিক্রেয় পদার্থ হিসেবে গৃহীত হয় না; তাই তখন স্বত্বের প্রশ্ন ওঠে না। তখন সেই রক্ত আমার প্রেমের প্রতীক হয়ে আমার স্ত্রীর অঙ্গে প্রবাহিত হয়: আমি যেন তাঁর মাঝে নতুন করে সজীব হয়ে উঠি। কুমারী 'ক'-এর হাসি রূপ লাবণ্য লাস্য ইত্যাদি রক্তের মতোই তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার ব্যক্তিত্বের নির্দেশক। কিন্তু মূল্যবিনিময়ে যখন সেটা বেচাকেনার বস্তু হয়ে ওঠে তখন স্বভাবতই স্বত্বের কথা জাগে। কারণ, তখন ওই গুণগুলির পৃথক্‌তকত্ব মেনে নেওয়া হয়। অতএব বলা হয়, ওগুলির উপর কুমারী 'ক'-র স্বত্ব আছে এবং স্বত্ব আছে বলেই সে যথা-ইচ্ছে ওই স্বত্ব অন্যকে দিয়ে দিতে পারে মূল্যের বিনিময়ে। স্বত্ব বদল হওয়া মানে বিক্রীত বস্তুর উপর পূর্বাধিকারীর কোনো এক্তিয়ার থাকে না। অর্থাৎ বিক্রয়-ক্রিয়ার মাধ্যমে transper of proprietary rights সংঘটিত হয়, স্বত্ব হাত বদলায়। হাসিটা কুমারী ক-এর বটে, কিন্তু তার উপরে অধিকার ক্রেতার অর্থাৎ নিয়োগকর্তার। তাই ক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী কুমারী ক-কে সাজতে হয়, চলতে হয়, হাসতে হয়, কথা বলতে হয়। এমনি করে মেয়েটি নিজের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। এক অংশে সে বিক্রেতা, আর-এক অংশে বিক্রেয় পণ্য। কার্ল মার্কস এরে 'self-alienation' বলেছেন।

আর একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে-অংশ বিক্রীত হ'ল, সেটার সঙ্গে বিক্রেতা নিজেও বিক্রয়-সূত্রে বাঁধা পড়ল ক্রেতার কাছে। পড়বারই কথা। কারণ, যেটা বিক্রীত হ'ল সেটার পৃথক্‌তকত্ব গুণটি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সত্যি সত্যিই তো আর সেটা ব্যক্তি থেকে বাস্তত বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কুমারী 'ক'-কে বাদ দিয়ে তো আর তার হাসি চলন বলন শিক্ষাদীক্ষার কোনো কার্যকারিতা নেই। এই কারণে চাকরীর জগতে whole-time employee অভিধাটির প্রচলন। হোল-টাইম কর্মচারী বলতে অবশ্য এ কথা বোঝায় না যে, কর্মচারীকে চব্বিশ ঘণ্টাই খাটতে হয়। তার খাটবার সময় আইন করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ওই নির্দিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে কর্মচারীর কর্মক্ষমতার (বা উৎপাদিকা শক্তি) উপর নিয়োগকর্তার দাবি সার্বভৌম। কর্মচারী চাকরীর সর্ত অনুযায়ী ওই সময়টা কোনোরকম ভাবেই অপব্যয় করতে পারবে না। কিন্তু কাজের পরে যে অবসর সময় তার ওপর কার অধিকার? ব্যবহারিক অর্থে কর্মচারীর, কিন্তু আইনত নিয়োগকর্তার। অবসর সময় কর্মচারী তার আত্মবিনোদনের কাজে লাগাকে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ওই সময়টায় যে সে অন্য কাউকে তার শ্রমক্ষমতা বিক্রি করবে আইনত তা চলবে না। বাড়ীর মালিক কি একই বাড়ী একই সঙ্গে দু'জনের কাছে বিক্রি করতে পারে? মেছুনী কি একই মাছ দুটো ক্রেতার কাছে একই সঙ্গে বেচতে পারে? কবি কি তার একই কবিতা দুজন সম্পাদকের কাছে বেচতে পারে? একই "বস্তু" একই সঙ্গে একাধিক লোকের কাছে বিক্রয় করা চলে না; স্বত্ব নিয়ে তা হ'লে ধুন্ধুমার বেঁধে যাবে। যে লোক এই ভাবে দুবার বিক্রি করে সে ঠগ; তাকে unscrupulous trader ব'লে অবজ্ঞা করা হয়।

এমনি ক'রে "বিক্রেতা-আমি" এবং "বিক্রীত-আমি"—মানুষ-আমি এবং বস্তু-আমি—একই সঙ্গে বাঁধা প'ড়ে যাই ক্রেতার কাছে। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি শ্রমশক্তি বিক্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির অধিকারীটিও পরোক্ষভাবে কেনা হয়ে যায়। বিপণিক সমাজে আমরা

সবাই ফেরিওয়ালা—সত্তা থেকে শ্রমশক্তিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পিঠের উপর চাপিয়ে হেঁকে হেঁকে বেড়াই 'কে আমার পসরা কিনবে গো?' যে কিনবে, সে পসরা সমেত আমাকেও নিয়ে যাবে, কারণ আমার পসরা তো আর আমাকে ছাড়া ফলপ্রসূ হবে না।

বাজারে দরদস্তুর হয়। বাজার সভ্যতায় বাস করি বলে চাকরীর বাজারে দরদস্তুর চলে পুরোদমে। যে যে-ভাবে পারে মোচড় দিয়ে দর বাড়ায় কমায়। অবশ্য চাকরীর বাজারে যে-দরকষাকষি চলে তার কিছু রকমফের আছে। সেখানে আজকাল একক দরদস্তুরের বিশেষ একটা চল নেই। নিয়োগকর্তা তো আমাকে আর আমার চাহিদা-মতো দাম দেবে না। (দিতে পারে যদি তার প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি বাজারে একমাত্র আমার কাছেই থাকে।) দরদস্তুরের সাফল্যের জন্য তাই একজোট হওয়া দরকার। এই কারণে চাকরীর বাজারে ট্রেড ইউনিয়নের উৎপত্তি হয়েছে। জি. ডি. এইচ. কোল ট্রেড ইউনিয়নের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন : "A trade union is essentially a body of workers designed to do for its members by combination things which these persons, acting in isolation, could not do for themselves. It is meant especially to help them get collectively better terms of employment or service than they could expect to get if each individual had to make a private bargain." ট্রেড ইউনিয়নের বাণী হল : শ্রম-বেচনেওয়ালারা এক হও। মালিক-ক্রেতা না হলে তোমাদের যেমন চলে না, ঠিক তেমনি তোমাদের শ্রমশক্তি না হলেও তার চলে না। তার যন্ত্রপাতি মালমশলা কোন্ কাজে লাগবে যদি তোমাদের শ্রমশক্তি সে বাজারে কিনতে না পায়? তার কাছ থেকে ন্যায্য দাম আদায় করতে হলে জোট বাঁধতে হবে ; অর্থাৎ প্রয়োজনমত শ্রম সে যেন কারুর কাছ থেকেই কিনতে না পারে। তবেই ক্রেতা পথে আসবে, ঠিকঠাক দাম দেবে, তোমাদের কথামতো চলবে।" মার্কিন সমাজ-সংস্কারক হোরেস গ্রীলি কর্মীজীবনে ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন : "Capital can wait—Labour cannot—but must earn or famish. Without organization, concert and mutual support, among those who live by selling their labour, its price will get lower and lower as naturally as water runs down hill. Consequently we are in favour of trades unions or regular associations of workers in the several callings for the establishment and maintenance of fair and just rates of wages in each." সেই এক কথা—দাম আর বিক্রি। ১৮৫৩ সালে গ্রীলি যা বলেছিলেন আজকের দিনেও তা সত্য। শ্রমিক যদি জোট না বাঁধে তবে শ্রমের দাম নীচের দিকে নামে, জল যেমন নীচের দিকে যায়। ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে চাকরীর বাজারে মালিকের একচেটিয়া প্রতিপত্তি ; সেটা buyer's market হয়ে দাঁড়ায়। তখন মালিক যে দাম দেয় সেটাই যেন মোক্ষম। পৃথিবীর সর্বত্রই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মালিক পক্ষের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ buyer's market-কে seller's market করা ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্য। আজ অবশ্য ট্রেড ইউনিয়নিজ্‌ম্ আইনের পাতে উঠেছে ; কারণ রাষ্ট্র সরকার এটা বুঝেছে যে দামের প্রশ্নটা দুপক্ষে আপোষে মিটমাট করাই সমাজের পক্ষে শ্রেয়, একদিন ছিল যখন সমাজে

ট্রেড ইউনিয়নের পাত পাওয়া ভার হত ; সে যুগে শুধু নিঃস্ব বা স্বল্পবিত্ত সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন গড়া হত। কিন্তু এ যুগে আর তা নেই। মোটা মাইনের চাকুরীয়ারাও ইউনিয়ন করে। কারণ, সকলেই শ্রমবিক্রেতা, কি কলের মজুর কি হাওয়াই জাহাজের পাইলট এবং শ্রম-বিক্রেতা হিসেবে প্রত্যেকেই বুঝেছে যে, একজোট না হলে শ্রমের দাম বাড়ানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ট্রেড ইউনিয়ন বাজার সভ্যতার একটি অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

চাকরীর বাজারে দরদস্তর চলে কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীপক্ষের মধ্যে—ইউনিয়নের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের। এই দর কষাকষিকে Collective bargaining বলা হয়। টেবিলে বসে কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীপক্ষ আলোচনা চালায় কে কত দিতে আর নিতে রাজী। আগেকার মতো দর কষাকষি আর লাঠির ভাষায় চলে না। এই যৌথ দর দস্তুরের আওতায় আজকাল bill of wages বা মজুরি/মাইনে ছাড়াও অন্যান্য সুখসুবিধার প্রশ্ন এসে পড়ে। তার কারণ, শ্রমশক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষটাও ক্রেতার কাছে বাঁধা প'ড়ে থাকে। সুতরাং মানুষটার ভালোমন্দের দায়িত্ব মালিক আর কতদিন এড়িয়ে চলতে পারে! শুধু মাইনে দিয়েই মালিক পার পেয়ে যাবে আজকের দিনে তা আর হয় না। কর্মীর থাকবার জন্য কোয়ার্টার্স চাই, খাবার জন্য ক্যান্টিন চাই, চিকিৎসার বন্দোবস্ত চাই, আমোদ প্রমোদ খেলাধূলার সুখ সুবিধা চাই, ছেলে-মেয়ের লেখা পড়ায় সাহায্য চাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের বলা হয় welfare measures বা firll benefits। এরা হল মাইনের গায়ে ঝালর, দামটাকে সুদৃশ্য করে তোলার ব্যবস্থা। কর্মীর দাম বলতে আজকাল বোঝায় মাইনে+frill benefits। (এ বিষয়ে 'সমকালীন'—বৈশাখ ১৩৭৭ সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। 'ভারতের সমস্যা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।)

এমনি করে কিন্তু গোটা মানুষটাই কোম্পানীর কাছে বিকিয়ে যায়। তার বাস-বসন ভোজন-ভজন অবসর-বিনোদন: এক কথায় তার জীবনের প্রত্যেকটি দিকেই শ্রম-ক্রেতার অবদান। এই বিকিয়ে-যাওয়া মানুষটির একটি অপরূপ ছবি পাওয়া যায় য়্যালান হ্যারিংটনের 'Life in the Crystal Palace' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে। এক অভূতপূর্ব মনোমোহন ক্রীত-দাসত্বের নূতন যুগ এই ক্রিষ্টাল প্যালেসে উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। চাকুরিয়ার স্বপ্নরাজ্য ওই স্ফটিক প্রাসাদ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কর্মচারী কি সত্যিই ক্রীতদাসত্বের শিকল গলায় পরছে? এটা কি অত্যুক্তি নয়? আমার স্বাধীনতা তো আমারই আছে। আমি স্বাধীন ব্যক্তি—শুধু আইনের চোখেই নয়, প্রাত্যহিক জীবনেও। কে বলে আমি পণ্য, আমি বস্তু? পণ্যবস্তুর স্বাধীনতা নেই। আমার আছে, তাই আমি কখনো বস্তুভূত হতে পারি না। কথাটা একদিক থেকে যেমন সত্য, অন্যদিক থেকে তেমনি অসার্থক। এটা ঠিক যে, মানুষ হিসেবে আমার স্বাধীনতা আছে, এবং সে-স্বাধীনতা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে আমি কখনই বস্তুভূত হ'তে পারি না। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি আমার স্বাধীনতা বজায় আছে? যদি থাকে তবে তার স্বরূপ কি, সীমা কতটুকু?

এক হিসেবে কর্মী অবশ্যই স্বাধীন। সে যদি ইচ্ছা করে, শ্রম-ক্রেতার কাছে তার শ্রমশক্তি

বেচতে না-ও পারে। আর, যদিও বা বেচে, সেই শক্তির উপর তার আত্মকর্তৃত্ব সে তো হারিয়ে ফেলে না। তার প্রমাণ, যখন খুশী সে তার শ্রমশক্তি প্রত্যাহার ক'রে নিতে পারে। তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন আছে; সে-ই তো তার আত্ম-কর্তৃত্বের মূর্ত প্রতীক! ক্রেতা তাকে নিয়ে খুশীমতো কাজ করাক দেখি, ইউনিয়ন তাহলে তোলপাড় তুলবেই একথা সে বিশ্বাস করে। এই অবস্থায় তাকে বিকিয়ে-যাওয়া বস্তু জ্ঞান করা অযৌক্তিক হবে না কি?

এই মতামতটা ঠিক বিক্রয়-প্রক্রিয়ার যথার্থ অর্থের সঙ্গে খাপ খায় না। বিক্রয়ের অর্থ হল, বিক্রীত পণ্যবস্তুর উপর বিক্রেতার অনধিকারত্ব। সুতরাং বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তির উপর কর্মীর স্বত্ব হারিয়ে যাওয়ার কথা। ধরে নেওয়া যাক, বিক্রয়ের বিপণিক অর্থ এটাই। কিন্তু তবুও এ কথা বলা চলে না, বস্তু যে ভাবে বিক্রীত হচ্ছে, শ্রমও ঠিক সেই ভাবেই বিক্রীত হচ্ছে। বিক্রয়-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্যবস্তু মৌলিক অধিকারীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, পৃথক্‌তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ক্রেতার "কুক্ষিগত" হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্রমশক্তির বেলায় তা ঘটছে কই? শ্রমশক্তি তো আর কর্মীর সত্তা থেকে সত্যি সত্যিই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, যথার্থ পৃথক্‌তাবস্থা প্রাপ্ত হ'তে পারে না। শ্রমশক্তির লেনদেন হয় বটে, কিন্তু সেই লেনদেনের মারফৎ শ্রমশক্তি ক্রেতার অধিকৃত পণ্য-বিশেষ হয়ে পড়ে না। হ্যাঁ, সে রকমটি ঘটত বটে যখন ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। ক্রীতদাসের কোনো স্বাধীনতা ছিল না; তার উপর ক্রেতার স্বামীয়ানা ছিল ষোলো আনা। কিন্তু আজকের এই ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগে কর্মশক্তির বেচাকেনা চললেও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় না। সে বেচাকেনা চলে বিক্রেতার নিজের ইচ্ছেয়। তার "আমিত্বের" উপর ক্রেতার কোনো স্বামীয়ানা জন্মায় না।

বাহ্যত তাই বটে। যতক্ষণ চাকরী ততক্ষণ কর্মীর সময় এবং শ্রমশক্তির উপর মালিকের দাবি; কর্মি অন্য কাউকে তার সময় এবং শ্রম বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু যখন কর্মির ইচ্ছে হবে তখন সে কাজে ইস্তফা দিতে পারে (অবশ্য বিক্রয়-চুক্তির সর্ত অনুযায়ী যথারীতি নোটিশ দিয়ে)। এটা সম্ভব হতে পারে কর্মীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন আছে বলেই।

এখন প্রশ্ন হ'ল কাজে ইস্তফা না হয় দিল, কিন্তু সে করবে কি? তার নিজের বলতে যদি কিছু ব্যাংক ব্যালান্স থাকে তাতে হয়তো কিছু দিনের মতো তার খাওয়া পরা চ'লে যাবে। কিন্তু সেই স্বল্প পুঁজির মেয়াদ আর কদ্দিন। ওটা তো কুঁজোর জল, খেতে খেতেই শেষ হয়ে যাবে, আবার ভরতে হবে। কিন্তু ভরবে কেমন করে? স্থায়ী মূলধন বলতে তো একটাই—তার শ্রমশক্তি। সেটাকে না খাটালে মুদ্রা আসবে কোত্থেকে? আমি হয়তো 'ক'-কে আমার শ্রমশক্তি না বেচলাম, কিন্তু 'খ' কিংবা 'গ' একজনের কাছে তো বেচতেই হবে। আমার সক্ষমতার প্রমাণ হলো শ্রম বেচতে পারা। সুতরাং যতদিন আমি সক্ষম থাকবো, শ্রমের পসরা নিয়ে আমাকে ফেরিওয়ালা সাজতেই হবে, ক্রেতা খুঁজে বেড়াতেই হবে। তস্মার্থ, সারা কর্মজীবন ধ'রে আমার শ্রমশক্তি একজন না একজনের কাছে বাঁধা প'ড়ে থাকবেই। কানের সঙ্গে মাথা, অতএব আমিও ক্রেতার কাছে বাঁধা। এটাই বিপণিক সমাজের হাতে লেখা আমার ভাগ্য বিধান।

অনেকের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়, 'গোলামি আর ভালো লাগে না। এর চেয়ে স্বাধীন ভাবে রোজগার করতে পারলে ভালো হত।' স্বাধীন রোজগারের পথ হল ওকালতি ডাক্তারি ব্যবসা ইত্যাদি। এ সব কাজে শ্রমশক্তির উপর আত্মকর্তৃত্ব খোয়া যায় না, কর্তা আপন শ্রমের ফল আপনিই ভোগ করে। স্বাধীন রোজগারের বাসনার পিছনে সচরাচর দুটি অভিপ্রায় কাজ করে। একটি হল, স্বাধীনতার জন্য সত্যিকারের আকুতি। আর একটি হল, এ সব কাজে মুদ্রাগমের সম্ভাবনা বেশী, অর্থাৎ শ্রমশক্তির জন্য বেশী দাম পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন, কোন্ অভিপ্রায়টি ব্যবহারিক অর্থে কার্যকরী ?

ধরা যাক্, একটি যুবক ডাক্তারি পাশ করে বেরুল। তার সামনে দুটি সম্ভাবনা : ডাক্তারি চাকরি নিতে পারে কিংবা স্বাধীন ভাবে প্র্যাক্‌টিস করতে পারে। একদিকে মাস-গেলে বাঁধা মাইনে, আর একদিকে অপরিমিত রোজগারের আশা। সে কোন্ দিকে ঝুঁকবে ? ঘটনাচক্রে সে হয়তো প্রথমটাকেই বেছে নিল। কিন্তু তারপর যখন সে দেখে তারই কোনো কোনো সহপাঠী প্র্যাকটিস করে অনেক টাকা রোজগার করছে তখন তার মনে অনুশোচনা জাগে : 'মস্ত বড়ো ভুল করেছি চাকরীটা নিয়ে। এর চেয়ে প্র্যাক্‌টিশ করলে সুখের মুখ দেখতে পেতাম।' এ ক্ষেত্রে যে অভিপ্রায়টি সত্যি সত্যিই সক্রিয় সেটা স্পষ্টতই অধিক মুদ্রাগমের আকাঙ্খা, অর্থাৎ মোটা দাম পাওয়ার অভিলাষ। যদি যুবকটি আগামী দিনের চোষট্টি টাকা ভিজিটের রঙীন স্বপ্ন দেখে, তবে তার কাছে স্বাধীন উপার্জনের পথটাই লোভনীয় হয়ে উঠবে। সুতরাং, স্বাধীনতা নয়—মুদ্রাসুরের মায়াবী প্রভাবটাই তার পথ নির্বাচনের প্রেরণা জোগায়। অবশ্য এখানে মন্তব্য করা চলে, 'জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েও তো অনেকে প্র্যাক্‌টিস শুরু করে। তাদের 'পরে মুদ্রাসুরের প্রভাব কোথায় ! তারা আপন শ্রমশক্তি স্বাধীনভাবে জনকল্যাণে প্রয়োগ করতে চায়।' তা যদি হয়, তবে অবশ্য বলবার কিছুই থাকে না। কারণ, কর্মশক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য সেটাই। কিন্তু ভুয়োদর্শন বলে, আজকের আদর্শপ্রণোদিত যুবক আগামীদিনে ক্রনিন-এর 'সিটাডেল' উপন্যাসের ডাক্তার নায়ক য়্যান্‌ড্রু ম্যানসান হয়ে উঠেছে। বিপণিক সমাজ ব্যবস্থায় মুদ্রার মোহ এমনিই সর্বশক্তিমান সর্বজয়ী। শ্রমশক্তির বাজার মূল্য যতই বাড়বে ততই আহ্লাদ তা সে মাইনে/মজুরি বেড়েই হোক কি দক্ষিণা বেড়েই হোক।

আসল কথা, বিপণিক সভ্যতার লক্ষণ হল বেচা-কেনা। বেচা-কেনার জন্য বস্তু চাই। মুদ্রা ছাড়া বস্তুর বেচা-কেনা চলে না। অতএব মুদ্রা চাই। মুদ্রামূল্য তাই বিপণিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। বাজার ওঠে বাজার পড়ে। এই ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সব কিছুই উঠছে পড়ছে —তার আশা-আকাঙ্ক্ষা স্নেহ ভালবাসা মান অভিমান আত্মবিশ্বাস আত্মশক্তি ভয় ভাবনা গ্লানি বিদ্রোহ : এক কথায় তার মন বলতে যা বোঝায় তাই। পুরাণে আছে, বাসুকি পৃথিবীটাকে মাথায় করে রেখেছে, একটু নড়লেই ভূমিকম্প। তেমনি, মুদ্রামূল্যে নড়নচড়ন লাগলে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক টলে ওঠে। তাই আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির গায়ত্রী মন্ত্র হল : যে-দেবী মুদ্রারূপে চরাচরে বিরাজ করছেন, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। কাণ্ট-এর দর্শন বলে, জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে যেন Space এবং Time-এর পাকা-পোক্ত রঙিন চশমা পরিয়ে দেওয়া হয় ; সেই জন্য

তার অভিজ্ঞতা কখনো Space এবং Time-এর বাহিরে যেতে পারে না—সাদা চোখে দেখবার মতো শক্তি নেই তার চিন্তাধারার। কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে ব্যবহারিক অর্থে বলা চলে, বিপণিক সমাজ-ব্যবস্থায় জন্মাবধি মানুষের চোখে মুদ্রার রঙীন চশমা এঁটে দেওয়া হয়। তার দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা-ভাবনা শ্রেয়বোধ, জীবনবাদ—সব কিছুই মুদ্রান্বিত হয়ে ওঠে। এর বাহিরে যাবার সামর্থ তার নেই।

এই অবস্থায় মানুষ যে তার বাজার-দরটাকে সব চেয়ে বড়ো করে দেখবে, দেখতে শিখবে এটাই স্বাভাবিক। বাজারদরের উপর মানবজীবনের সার্থকতা বোধ নির্ভর করছে। দর উঠলে খুশী, সফলকাম ; দর পড়লে আর্ত নিষ্ফল ব্যর্থমনা। ছেলবেলায় যেদিন থেকে আমরা ইস্কুলে যেতে আরম্ভ করলাম, সেই দিন থেকে শুরু হল আমাদের বস্তুভূয়মানতার সাধনা। বাবা লেখাপড়া শেখায়, কর্মকৌশল আয়ত্ত করায়, সাধ্যমতো (অনেক সময় সাধ্যাতীতভাবে) ছেলের পিছনে 'খরচ' করে। এটা investment। মালটি যখন তৈরি হয়ে রোজগারের বাজারে বেরুবে, তখন তার যথার্থ মূল্য পাওয়া যাবে—এই বিপণিক স্বপ্ন বাপ-মাকে অন্তিম লাভালাভের প্রশ্নে উদ্‌গ্রীব করে করে রাখে। শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি তামিল দেওয়ার যেসব পদ্ধতি সমাজে চালু, তার একটিমাত্র লক্ষ্য : কত টাকায় মানুষ আপনাকে বাজারে বেচতে পারবে তার বাজারদর কতটা বাড়ানো যাবে।

নিজেকে মূল্যবান পণ্যবস্তু করে তোলাই আমাদের ব্যক্তিক সাধনা। চলতি অর্থে পুরুষাকারের পরিচয় এই সাধনার সাফল্যে। successful ব্যক্তিটির ছবি আমরা পত্র-পত্রিকার রঙীন বিজ্ঞাপনে রোজই দেখে থাকি। পথে ঘাটে ট্যাক্সিতে গাড়ীতে তার সাক্ষাৎ পাই অহোরহ। তার হাসি বেশভূষা চলনবলন অনুকরণ করে আমরা সকলেই বরণীয় হয়ে উঠতে চাই। আমাদের আত্মপ্রকাশের তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ হল মুদ্রামূল্য। দোকানের শো-কেসে সাজানো জুতোর মধ্যে যেটার গায়ে দামী লেবেল আঁটা, সেটাই বেশী চকচকে, সেটার উপরেই সকলের নজর। দাম যদি কম হয়, কিংবা বাজারে যদি দাম একেবারেই না পায় তবে মানুষের সার্থকতাবোধ ভ্রূণেই নষ্ট হয়ে যায়। যাকে বেকার বলা হয়—অর্থাৎ যার কোনো বাজারদর নেই—সে পরিবারের গলগ্রহ সমাজের চোখে কৃপা ও উপেক্ষার পাত্র। তার জীবন অর্থহীন অপূর্ণ। রাস্তার ধারে পড়ে থাকবার মতো আগাছা ; সমাজের নার্সারীতে তার ঠাঁই নেই।

এমনি করে আন্তঃসামাজিক সম্পর্কের বেলাতেও মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায় মুদ্রামূল্য। বাজার সভ্যতায় দামী জিনিসটার উপরে যেমন সকলের নজর, তেমনি দামী মানুষটার উপরেই সকলের লোভ। আমার আটপৌরে শাড়ীপরিহিত স্ত্রী তোমার স্ত্রীর দেড়শো টাকা দামের শাড়ীর দিকে লুব্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে। আমি তোমার মোটা মাইনে পাওয়া ইঞ্জিনীয়ার ছেলের দিকে লুব্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি। যার দাম যত বেশী তার কদর সেই পরিমাণে বাড়ে। ইস্কুলের শিক্ষক—যার কাছ থেকে তোমার আমার ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে—তার দাম কম। সেই তুলনায় অফিসের কেরাণীবাবুর রোজগার বেশি। তুমি আমি মেয়ের বিয়ের সময় পাত্র হিসেবে কাকে পছন্দ করবো ?

ডি'সিকার একটি ছায়াচিত্র আছে। নাম Yesterday Today Tomorrow চিত্রটির দ্বিতীয় কাহিনী Today একটি ধনী মহিলাকে নিয়ে। মহিলাটি একজন স্বল্পবিত্ত লেখকের প্রেমে পড়েছে।

ভালোবাসা এত গভীর যে তার অতি মূল্যবান গাড়িটাকে প্রেমিকের অপটু হাতে ছেড়ে দিতেও সে দ্বিধাবোধ করে না। গাড়ি চলছে। নায়িকা প্রেমে উচ্ছল। এমন সময় হঠাৎ একটা অ্যাকসিডেণ্ট। ফলে গাড়িটাই যে শুধু বিকল বিক্ষত হল তা নয়, মহিলাটির প্রেমও বিকল-বিক্ষত হয়ে গেল। অর্বাচীন প্রেমিককে যথেচ্ছা গালাগালি দিয়ে শেষপর্যন্ত একজন দামী-গাড়ির কদর বোঝা লোকের সঙ্গে মহিলাটি ফিরে গেল। বলা বাহুল্য, প্রেমিক পথেই পড়ে রইল। যদি কেউ মনে করে ডি'সিকা বাড়াবাড়ি করেছেন সে ভুলে যায় যে, বাজার সভ্যতায় প্রেম স্নেহ মমতা সহানুভূতি সততা ইত্যাদি মানবিক চেতনার অনুভাবগুলি মুদ্রাঙ্কিত তথা বস্তুভূত হয়ে পড়ে। মুদ্রার অঙ্কে বস্তুর মাধ্যমে মানবিক অনুভাবের প্রকাশ হয়। একেই যথার্থ বস্তুতত্ত্ব বলা যেতে পারে—বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর তাত্ত্বিক রূপ। বস্তুতত্ত্ব, বাজার-সভ্যতা, ভোগবাদী সমাজব্যবস্থা—এরা ওতপ্রোতভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত।

স্বনামধন্য মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রোম যথার্থই বলেছেন : In a culture in which the marketing orientation prevails, and in which material success is the outstanding value, there is little reason to be surprised that human love relations follow the same pattern of exchange which governs the commodity and the labour market." প্রেম একটা অনুভাব। সেটাকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না। কিন্তু তাকে যদি বস্তুধর্মী করে তোলা যায় তবে সহজভাবে তার লেনদেন সম্ভব হয়। একজন বিত্তবান যুবককে বলতে শুনেছি : 'স্ত্রীর জন্মদিনে সকালবেলা উঠে একটা মোটা চেক লিখে দি। মহাখুশী।' প্রতি জন্মদিনে স্ত্রী যদি ওই চেকটা না পায় তবে ধরে নিতে পারে স্বামীর প্রেমে ভাঁটা পড়েছে। হয়তো সত্যিই ভাঁটা পড়েছে নইলে কি আর স্বামীটি মোটা রকমের খরচা করে ভালোবাসার প্রমাণ দিত না? তাদের কাছে ভালোবাসা চেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজার সভ্যতায় বস্তু ছাড়া ভালোবাসা বাঁচতে পারে না বাড়তে পারে না। কারণ বস্তুর স্পর্শে ভালোবাসা বাস্তব হয়ে ওঠে, তাকে ধরাছোঁওয়া বোঝা যায়। তুমি যদি পূজোর সময় স্ত্রীর জন্য সাধারণ আটপৌরে শাড়ী এনে দাও তবে স্ত্রীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠবে এ আর আশ্চর্য কি? বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে শুধু যদি সাধারণ ফুল উপহার নিয়ে উপস্থিত হও, তাহলে বন্ধুর মনটা একটু বাঁকা হাসি হেসে উঠবে। বিজ্ঞাপনে দেখতে পাওয়া যায়, যুবতী ক্রীমবিন্যস্ত চুলের সঙ্গে প্রেমে পড়ছে, যুবক সেণ্ট পাউডার শাড়ীকে আদর করছে। একথা বলা বাহুল্য ক্রীম-সেণ্ট-পাউডার-শাড়ী দামী হওয়া চাই। এই বস্তুময় প্রেমাকুলতার মধ্যে মানুষের হৃদয়টাকে খুঁজতে যাওয়া বৃথা; কারণ মানুষটাও তো ওই সঙ্গে বস্তুভূত হয়ে পড়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ = গাড়ী + বাড়ী + মাইনে + রেষ্টুরেণ্ট + সিনেমা ইত্যাদি। ঘুরিয়েও বলা চলে মানুষের ক্ষেত্রে প্রেম = বাড়ী + গাড়ী + ইত্যাদি। অর্থাৎ সব একীভূত সব বস্তুভূত। 'রাজা' নাটকের একটা গান একটু বদলে নিলে আমরা বাজার সভ্যতার জাতীয় সঙ্গীত পেয়ে যাবো : 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই বস্তু-রাজত্বে।' এখানে আমাদের পারস্পরিক মিলন সম্ভব হয় বস্তুত্বের স্বত্বে এবং বস্তুত্বের সর্তে।

মানুষের কর্মশক্তি পণ্য, বেচাকেনার সামগ্রী। মানুষের অন্তর রস-অনুভাব পণ্য, বেচাকেনার সামগ্রী। মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড তার বাজার মূল্য। এমনি করে গোটা মানুষটাই

বস্তু হয়ে পড়েছে, মুদ্রার অঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এরিক ফ্রোম একটি মজার উদাহরণ দিয়েছেন। নিউইঅর্ক টাইমস্‌-এ একটা খবর বেরিয়েছিল তার শিরোনামা—'B. Sc.+Ph.D=40,000' খবরটির বিষয়বস্তু হল একজন ডক্টরেট-পাওয়া বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট তার সারা কর্মজীবন ধরে একটি বিজ্ঞানের মাত্র-গ্রাজুয়েট ছেলের চেয়ে চল্লিশ হাজার ডলার বেশি দাম পায়! মুদ্রা হি কেবলম্‌॥

ভোগবাদী সমাজব্যবস্থা কর্মশক্তিমান আত্মশক্তিমান মানুষকে শুধু যে পণ্যবস্তুতে পরিণত করেই ক্ষান্ত হয়েছে তা নয়। পণ্যবস্তু হওয়াটাই সমাজবিবর্তনের একমাত্র সুস্থ সবল সাধু উদ্দেশ্য—ব্যক্তিস্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা সেই কথা তারস্বরে প্রমাণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে সমাজ মনীষা। মূল্যবান market commodity না হওয়া পর্যন্ত Homo sapiens-এর মুক্তি নেই; ওইটাই তার সত্তালাভের পথ। আজ না হলে কাল; যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ—সুতরাং চেষ্টা করে চলো; উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।

এটাই হল বিপণিক সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতার জীবনবাদ। এখানকার সমাজসর্দার বিপণন বৃত্তির অমিল দেয় আবাল্য। তারি ম্যাও ধরে অধ্যাপক বস্তুতত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রচার করে, অর্থনীতিজ্ঞ মুদ্রাসুরের মহামায়া কীর্তন করে, মনস্তাত্ত্বিক-সাহিত্যিক লিঙ্গনৃত্য করে, গোঁসাইজী দারুভূত মুরারি রথটানা শেখায় এবং পুরাণবাগীশ বিমুগ্ধ জনতাকে শোনায়, 'মা ভৈঃ। মুদ্রাসুর নিধনের বিপ্লবী কাল সমাগত। শুনতে পাচ্ছ না? দেবী বলছেন, 'গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধুযাবৎ পিবাম্যহম্‌। মধু পানান্তে তোকে সংহার করব। গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ।' শীঘ্রই তোমরা গর্জন করবার সুযোগ পাবে।' এখানে, রক্তকরবীর ফাগুলালের ভাষায়, 'মদের ভাঁড়ার অস্ত্রশালা আর মন্দির, একেবারে গায়ে গায়ে।' এটাই সোনামুখী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু আত্মশক্তিমান মানুষ কি চিরকাল এমনি করে বস্তুভূত হয়ে থাকতে পারে? আত্মসৃষ্টি যদি তার ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হয়, তবে সেই সৃষ্টির পথ কি কেউ চিররুদ্ধ করে রাখতে পারে? এমন কোনো অচলায়তন সমাজ ব্যবস্থা কি সত্যিই থাকতে পারে যেখানে মানুষের সত্তার আকূতি চির-মৌন?

থাকতে পারে না ব'লেই বলেই বিশ্বাস। যে সমাজব্যবস্থার বিপণিক লক্ষ্য হল মানুষের বস্তুভূতি, সেই সমাজ আপন সাফল্যের মধ্য দিয়েই নিজের জন্য মারণাস্ত্র তৈরি করতে থাকে। মানুষ যতই বস্তুভূত হয়, ততই তার জীবন অন্তর্বিরোধিতায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে, অসংগতির অগুণতি চোরা গর্তের মাঝে তার মন কেবলি আছাড় খেতে থাকে। এমনি করে অসত্তার অনুভূতি জাগে, সত্তালাভের আকাঙ্ক্ষা তার অস্তিত্বের গভীরে শিকড় ছড়ায়, ঠিক যেমন বীজ তার বিপরীতধর্মী মাটির সঙ্গে লড়াই করে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এই তার আত্মসচেতনতা। উদ্বুদ্ধ-চেতন মানুষ বিদ্রোহ করে, প্রশ্নসংকুল পথে পা বাড়ায়। অনুভাবের নিষ্প্রাণতা তাকে ঘৃণায় হতাশায় দিশাহারা করে তোলে। তার ভিতরে বাহিরে দ্বন্দ্ব লাগে, ভবনে ভুবনে আধাআধি হয়ে যায়।* একদিকে তার আলোর পিপাসা, প্রাণের আলো; আর একদিকে বস্তুত্বে অন্ধ-করা স্থাবরতা। এই প্রসঙ্গে আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের একটি কবিতা মনে পড়ে:

'অনড় পল্লব নিয়ে চেয়ে আছি
মনে হয় চোখ বুঝি পাথরেতে গড়া
কিংবা মন, সেও বুঝি মৃতপ্রায়—এই পরিবেশে।'

যে উদ্বুদ্ধ-চেতন মানুষটির কথা আমরা বলছি, এ যেন তারই ছবি তারই আর্ত অভিজ্ঞতার ভাষা। মৃত্যুবোধ তাকে উদ্ভ্রান্ত করেছে। মৃত্যুবোধই সচেতনতার লক্ষণ।

মানুষ হিসেবে মানুষের মৃত্যু তার বস্তুত্বে। মূল্যবান পণ্য হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা তার সত্যিকারের মৃত্যুলালসা। মনোবিজ্ঞানে যাকে necrophilia বলা হয় অনেকটা তাই। বিপণিক সমাজের যক্ষপুরীতে নরমেধ যজ্ঞের অবিরাম হোমহুতাশন চলেছে। এই যজ্ঞের বলির দিকে তাকিয়ে নন্দিনীর মতোই বলতে ইচ্ছে করে: 'ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে।' এই দুরূহ নিয়তির হাত থেকে কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে? পরিত্রাণের কোনো পথ আছে কি?

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে: '…যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে, যৎ কর্ম কুরুতে, তদভিসম্পদ্যতে।' যার যেমন ক্রতু সে তদনুরূপ কাজ করে, যে যেমন কাজ করে সে তদনুরূপ ফল পায়। এখানে ক্রতু শব্দটি তাৎপর্যময়। শঙ্করাচার্য ক্রতুর ব্যাখ্যা করে বলেছেন: 'ক্রতুর্নাম অধ্যবসায়ঃ নিশ্চয়ঃ—যদনন্তরা ক্রিয়া প্রবর্ততে।' অর্থাৎ ক্রতু বলতে বোঝায় একাধারে অধ্যবসায় নিশ্চয় জ্ঞান এবং ক্রিয়া। আমরা দেখেছি কর্ম উদ্দেশ্যমূলক। অব্যক্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করাই তার ধর্ম। সুতরাং কর্মারম্ভে যদি অভিপ্রেত সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের সম্যক সুচিন্তিত স্বচ্ছ ধারণা বা জ্ঞান না থাকে তাহলে ক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটতে পারে না। আবার, সম্ভাবনা সম্বন্ধে শুধু ধ্রুবজ্ঞান থাকলেই চলবে না; সেই ধ্রুব ধারণাকে মূর্ত করে তোলার জন্য যদি আমরা দৃঢ়প্রযত্ন না হই, তাহলে ক্রিয়া বন্ধ্যা হয়ে যাবে। জ্ঞান এবং অধ্যবসায় এই দুয়ের সংযোগ যখন ঘটে তখনই ক্রতু ক্রিয়াময় হয়ে ওঠে। তখনি কর্ম অবিচলিত পদে নিষ্ঠাসহকারে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা পায়।

বিপণিক সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের ক্রতু মুদ্রাসুরের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই, না আছে তার আপন অমিত সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধ্রুব ধারণা লাভের আকাংক্ষা, না আছে তার অবজ্ঞায়-অবিচলিত আদর্শনিষ্ঠা, তাই প্রত্যহের কুশাঙ্কুর যখন পায়ে বেঁধে তখন সে উদ্ভ্রান্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট আত্ম বিস্মৃত হয়ে পড়ে। দশের অবজ্ঞাকে সামাজিক ভ্রুকুটিকে মেনে নিয়ে সে মুদ্রাসুরের নামাবলী গায় দেয়।

মানুষের মধ্যে ক্রতুমান পুরুষটিকে জাগাতে হবে। কিন্তু সে কি জাগবে? সুখ-ভোগ আরামের মোহ, অনুবর্তনের নির্বীর্য নিষ্ক্রিয় প্রবৃত্তি এ সবের ঘোর কাটিয়ে আমরা কি ক্রতুমান মানুষটিকে বলতে পারব. উত্তিষ্ঠত জাগ্রত? আশা করি পারব। কারণ এমন মানুষ তো আমরা দেখেছি যারা বলতে পারে।

"নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।"

তারাই প্রমাণ করে মানবের ক্রতুমান পুরুষটি আজো অবিহন্যমান।

ক্রতুমান মানুষ বাধা মানে না, লোভে ভুলে ওঠে না। পাথর-ছড়ানো স্বধর্মের পথচলায় তার নিবাতনিষ্কম্প নিষ্ঠা। বস্তুত্বের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। প্রচলিত শ্রেয়বোধকে সে তাচ্ছিল্য করে। আত্মসৃষ্টির লক্ষ্যই তার অধ্যবসায়ের অনুপ্রেরণা। তার অশ্রান্ত সাধনার উদ্দেশ্য—জৈবিক অস্তিত্বকে অতিক্রম করে আত্মিক সত্তাময় হয়ে ওঠা, সত্য হয়ে ওঠা। তার প্রার্থনা: মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আমি মৃত্যুকে পেরিয়ে যেতে চাই। আমি অমৃতের অধিকার চাই। আমি বাঁচতে চাই।

বস্তু-মানুষ যেন নারায়ণশিলা, প্রাণহীন তবু প্রাণের সম্ভাবনাময়। ক্রতুর তুলসী স্পর্শে সে প্রাণ পায়। সে ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠে।

* দ্বিখণ্ডিত মানুষটির সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে 'সমকালীন' মাঘ (১৩৭৪) সংখ্যায়। 'অসতো মা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

এই প্রবন্ধে যে গ্রন্থগুলি থেকে উদ্ধৃতি করা হয়েছে তাদের তালিকা নীচে দেওয়া হল:

Robert L Heilbrower—The making of Economic Society.

Alexis de Tocqueville—Democracy in America.

G. D. H. Cole—An Introduction to Trade Unionism.

N. W. Chamberlain—Collective Bargaining.

Erich Fromm—The Art of Loving.

,, —The Sane Society.

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—উজ্জয়িনী।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

বিশাল এবং আয়াসসাধ্য আয়োজন করে আমরা প্রতি বছর একজন কবিকে স্মরণ করতে একত্র হই—এ একটা খুব বড় কথা। কবিকে আমরা কেন স্মরণ করব? প্রতিভার যে অধিকারী তাঁর চরিত্রানুশীলন সুফলপ্রসূ নয় একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কাদের স্মরণ করা উচিত এই প্রসঙ্গে। চরিত্র সম্পদে যে ধনী তার জীবনীচর্চায় মানুষ অনুকরণীয় আদর্শ পেয়ে থাকে আর সে অনুকরণের স্বল্পতম সাফল্যও মহত কল্যাণায়। অনুকরণীয় নয় প্রতিভা—কবি, অভিনেতা বা চিত্রশিল্পীর জীবনানুকরণে কেউই কবি, অভিনেতা বা চিত্রশিল্পী হয়ে উঠতে পারবে না। বহুশ্রুত হলেও একথা সত্য যে কবিত্ব জন্মসিদ্ধ, পরিশ্রমলভ্য নয়।

তবে রবীন্দ্রস্মরণের সার্থকতা কোথায়—একথা ভেবে দেখা উচিত। দুটি মাত্র কারণ এক্ষেত্রে মনে করা যায়। এক ও প্রধানতম, কবি বলেই কবিকে স্মরণ। কবি সামান্য নন। মানবতার ঋণ কবির কাছে অপরিশোধ্য আর সেই ঋণকে আমরা কবির সৃজনী প্রতিভার নিদর্শন-গুলির চর্চা করে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। কবি অসামান্য একথা আমরা মাঝে মাঝে বললেও কথাটার গূঢ় অর্থ অনুধাবন করা উচিত। মানুষের যেটুকু না হলে তার পঞ্চভৌতিক জীবন অচল সেটুকুর মধ্যে কবিত্বের অবকাশ নেই—আর তাই মানব-সমাজের একটা বৃহৎ ভাগ কবিঋণ সম্বন্ধে সচেতন নয়। 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে আর কেউ নয়, কেবল কবি। রাজনৈতিক এই গ্লানির তীব্রতাকে লঘূকৃত করেন, কিন্তু যে অনন্ত উৎস থেকে সত্তার আনন্দ উৎসারিত তার সঙ্গে মানুষকে যোগবদ্ধ করেন কবি আর তাই কবি মানবকল্পনার পরমতম আদর্শ ব্রহ্মের সমার্থক। সুখ ও দুঃখ যা জীবনে অপরিহার্য তাকে এড়িয়ে মানুষকে আনন্দের সন্ধান দেন কবি। আর একথা এখানে স্মরণীয় যে এই আনন্দ মোহসমুখ নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর নয়। কবির বাণী মহাকবি বেদব্যাসের বাণীর সঙ্গে যুগে যুগেই সমসূত্রে বাঁধা। তিনি বলেছেন—'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্। প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ॥' সুখ, দুঃখ আর প্রিয়, অপ্রিয় এ সব দৈনন্দিনতার আওতায় পড়ে—অপরাজিত হৃদয় হলো শাশ্বত। বলাই বেশি যে এর দ্বারা সুখ দুঃখ এগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে না, অধিকতর মহত্ত্ব দেওয়া হচ্ছে অপরাজিত হৃদয়কে। কবি একাজটাই করেন আর তাই তিনি মানুষ মাত্রের স্মরণীয়।

কবিকে স্মরণ করার দ্বিতীয় কারণ হতে পারে তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মহত্ত্ব। বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রে কবি অনন্যসাধারণ নন। অন্য মনীষীর তিনি সগোত্র। কবির অনুভূতি সূক্ষ্মতর পর্যায়ের—যে ঘটনায় শতকরা নব্বই জন মানুষের হৃদয় নিস্তাপ, কবির হৃদয় তাতেই অনুরণিত হয়ে ওঠে। কবির হৃদয়কে আমরা বলতে পারি—বিশ্বভারতী—যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ ঐ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' সমগ্র বিশ্ব সেখানে যেন এক সমাবস্থিতি লাভ

করেছে। কবি হয়েছেন বলেই তাঁকে তাই মানবাত্মার অপমানে আহত হতে হয়, উৎকাক্ষার সম্ভাবনায় উল্লসিত হতে হয়, অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু—একথা ঘোষণা করতে হয়। মহাকবির ক্ষেত্র সমগ্র মানবজীবন, মানবজীবনের সমগ্রতা তাই তাঁর সৃষ্টিতে ধ্বনিত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

এমন কবির সংখ্যা জগতে বেশি না হলেও একেবারে নগণ্য নয়। জর্মণ কবি গ্যেটে, ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্তর উগো এবং ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর সাহিত্যিক যাঁরা কেবল কবিকর্মের দ্বারাই নয় কিন্তু রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও নিজকর্মের দ্বারা সমুচ্চ আসনের অধিকারী। যদি চ এই সব মিলিয়েই কবিজীবনের সমগ্রতা অনুধাবনীয় তবু প্রধানতঃ কবি রূপেই তার মর্যাদা নিরূপণ বাঞ্ছনীয়। সাময়িক প্রয়োজনের চাহিদা কোনো কবি মেটালেও সেখানেই তাঁর কবিত্ব সিদ্ধির শেষ নয়। কবির লক্ষ্য তার চেয়েও বড়। রামের ঐতিহাসিকতা গবেষণার বিষয় হলেও, মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ তাই 'পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার সম্প্রীতি, পতির প্রতি পত্নীর নিষ্ঠা কতদূর যাইতে পারে তাহার নিদর্শন।' যুগান্তরের এই আদর্শ কালান্তরে পরিবর্তিত হলেও কাব্যমূল্যের এতে অপচয় হয় না।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাহিত্য জগতের প্রথম বিচার্য তাই তাঁর শাশ্বত অবদান। কবিরূপে তিনি যা দিয়েছেন তা সর্ববিধ সংকীর্ণ পরিধিকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে আমাদের কোন বাণী শোনাচ্ছে? কবি সামাজিক জীব বলে সমাজের সীমারেখায় তিনি অবশ্যই বাঁধা, তবু সীমার মাঝেই অসীমের সুর ধ্বনিত হয়, রূপের মধ্যেই অরূপ ধরা পড়ে—একথা কবির অনুভবেই শুধু নয়, কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মরুচি মানুষের পক্ষেও তা প্রত্যক্ষগম্য সত্য। সাহিত্যকর্মী মাত্রকেই, হোন তিনি গদ্যপথিক বা পদ্যরচয়িতা, মহত্ব চিহ্নিত হবার জন্য এই যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রতি পর্যায়ে এই প্রমাণ দিয়েছেন, তাই অন্যান্য সব পরিচয়কে ছাড়িয়ে গিয়েছে তাঁর কবিপরিচয়। তিনি কবিশ্রেষ্ঠ। যাঁরা কবিকে যোগী বা মহাপুরুষ প্রমাণিত না করে তৃপ্ত হতে পারেন না, তাঁদের হীনম্মন্যতার সমর্থক আমি নই। স্বয়মেব মহৎ কবির জন্য যোগীর সম্মান অকিঞ্চিৎকর।

পরাধীন দেশের বহুবিধ দুর্ভাগ্যের মধ্যে এ ও একটা যে কবিকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রেও আসতে হয়। আমি বলছি না যে কবির পক্ষে রাজনীতি অস্পৃশ্য, তবে রাজনীতির চাহিদা মেটাতে অন্য প্রতিভার উপযোগই পর্যাপ্ত। রাজনীতি কবির দ্বারা উপকৃত হতেও পারে, যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। আবার না ও হতে পারে। তবে একথা নিশ্চিত যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির দায় স্বীকার করলে কাব্যসরস্বতীর ভাণ্ডার অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তুচ্ছতার বহুবিধ দায় হৃদয়ের ঔদার্যে স্বীকার করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথকে ক্লান্ত হতে হয়েছে, অতৃপ্ত থাকতে হয়েছে। দূরদর্শী রাজনৈতিক তিলক তাই রবীন্দ্রনাথকে যৌবনেই প্রস্তাব জানিয়েছিলেন রাজনীতি থেকে দূরে নির্বাধ সাহিত্য চর্চা করতে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের মনীষার উপেক্ষা করা এর উদ্দেশ্য ছিল না, বস্তুত সেই মনীষার স্বীকৃতিই দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সে উপদেশ স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। সমুদ্রগভীর ও আকাশ বিস্তারী যে অনুভূতির তিনি অধিকারী ছিলেন তাই তাঁকে নিরন্তর আকর্ষণ করেছে স্বদেশের

মর্মস্থলে আর স্বভাবতই তাঁকে দেখিয়েছে স্বরাষ্ট্রের বস্তুস্বরূপ—পরাধীনতার অভিশাপে যা কুণ্ঠিত ভয়বিহ্বল, এক কথায় জগৎ সভায় যে চরিত্রবলে রাষ্ট্র আপন সম্মানিত আসন অর্জন করতে পারে তার থেকে বঞ্চিত। তাই কবি হিসেবে বারবার তাঁর কাছে শোনা গিয়েছে এই মর্মের বাণী—'এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়, দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—লোকভয় রাজভয় মৃত্যুভয় আর, হীনপ্রাণ দুর্বলের যত অত্যাচার—কিন্তু কেবল এইটুকুতেই তো কার্যসিদ্ধি হবার নয়। কবির উচ্ছ্বাস ভেবে ছদ্মদার্শনিকতার আড়ালে তাঁর এ বাণীকে আমরা শুনেছি, আবৃত্তি করেছি, হয়ত ব্যাখ্যাও করেছি কিন্তু অন্তরে গ্রহণ করিনি। এ এক অশ্চর্য! যেখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত রাজনীতি করেছেন, মন্ত্রদাতার কাজ করেছেন, সেখানে তিনি কবি বলে উপেক্ষিত হয়েছেন, তাঁর 'পুণ্য চেষ্টা যত' ভাবালুতার প্রকাশ বলে বস্তুত বিড়ম্বিত হয়েছে এবং আজও হয়ে আসছে। এই প্রসঙ্গে শিবাজীকে উদ্দেশ করে কবি যা সাহস করে দেশবাসীর হয়ে বলেছিলেন—

> 'সেদিন শুনিনি কথা আজ মোরা তোমার আদেশ
> মাথা পাতি লব
> কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
> ধ্যান মন্ত্রে তব—'

সে কথা কবিকে বলার মত সৎসাহস আজও আমাদের হয়নি—অথচ এই আদর্শের সরব ঘোষণা রাজনৈতিকের মুখে বারবার শুনতে শুনতে মহান আদর্শকেই আমরা প্রায় কথায় কথায় পরিণত করেছি।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন সত্য কিন্তু রাজনীতি করেন নি। রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিক সংগ্রামের পুরোভাগে আমরা দেখি বঙ্গ-ভঙ্গ যুগে। কী উৎসাহ, কী গভীর উন্মাদনা আর কী ব্যাপক ও অন্তঃসঞ্চারী দেশপ্রেমের আন্তরিকতা নিয়ে তিনি, তাঁর পক্ষে সত্যই। রাজপথের উপর নেবে এসেছিলেন—তা ভাবলে আজকের ভঙ্গিসর্বস্ব রাজনীতির উদ্দীপনাকে মানবাত্মার অপমান বলে বোধ হয়। আমরা তাঁর কথা শুনিনি, তিনি কিন্তু তাঁর যা দেবার দিয়েছেন অকৃপণ ভাবে—অসংখ্য দেশভক্তির গান, স্বদেশী সমাজস্থাপনার বিধি বিধান, সমবায়-ভাবনার উন্মেষ। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিধি, যা হতে পারত, যাকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সদর্থক। অথচ সেই প্রকরণে মোহভঙ্গ হয়েছিল কবির। বাক্‌সর্বস্ব রাজনীতিক কোলাহল ছেড়ে তিনি একক শক্তি নিয়ে একান্তে রাষ্ট্রগঠনের বাস্তব সূত্রপাত করেছিলেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাসকে তিনি বহু রূঢ় আঘাত সত্ত্বেও হারান নি বলেই আ মৃত্যু এই মহাকবির কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা গেছে সর্ববিধ অনাচার ও ভণ্ডতার প্রতিবাদ। জালিয়ানবালাবাগ হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে মর্মপীড়িত কবির রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো থেকেই দেশপ্রেমের আন্তরিকতার অন্যতম আভাস স্পষ্ট মেলে। বার্ধক্যেও কবি এসে দাঁড়িয়েছেন মনুমেণ্টের পাদদেশে—নিজের সবল কণ্ঠস্বর জুড়ে দিয়েছেন রাজ-বন্দীদের মুক্তি দাবীর সঙ্গে। প্রচলিত রাজনীতির মান-অনুযায়ী একে রাজনীতি বলব না, বলব জীবননীতি, সত্যানুরাগ।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন যজ্ঞের আয়োজন যদি কেবল ঘৃতাহুতিতেই পরিসমাপ্ত হয়,

অতিথিদের তৃপ্তি হয় উপেক্ষিত তবে সে অগ্নিকে সার্থক বলা অসঙ্গত। রাষ্ট্রপ্রেমের প্রবল উদ্দীপনা সমস্ত দেশকে যখন ব্যাপ্ত করল, তখন তাকে সুফলপ্রসূ করার ভাবনা যে কজন মনীষীর হৃদয়কে প্রবল-ভাবে প্রভাবিত করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যকে, এমন কি ভক্তির ক্ষেত্রেও, তিনি কোনো মূল্য দিতেন না। মানবচরিত্রের উপরিতম ভাগেই উচ্ছ্বাসের স্থান, তার গভীরে চারিত্রিক দার্ঢ্য না থাকলে সে উচ্ছ্বাস কেবল শ্লোগান-ঘোষণাতেই পর্যবসিত হয়ে ব্যর্থ হয়—এর প্রমাণ আমাদের যুগে আর দেবার দরকার নেই। দেশ প্রেমের নামে যে ভাবের জোয়ার ভারতে এল তাকে তাই রবীন্দ্রনাথ সুচিন্তিত খাতে প্রবাহিত করার প্রয়াস করেছেন, যাতে সেই উদ্বৃত্ত শক্তি কল্যাণকর্মের দ্বারা স্থায়ী সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য যে ভাবপ্রধান কবির কাছে কর্মশক্তির প্রত্যাশা কেউই করেনি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অনন্য নিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তা এখনও অননুকরণীয় হয়েই আছে। শান্তি-নিকেতন, শ্রীনিকেতনের সঞ্চালন থেকে মাসিক সাহিত্যপত্র সম্পাদন পর্যন্ত যে একটি সৌষম্যমণ্ডিত সুচারু শৃঙ্খলা রবীন্দ্রনাথে দেখি প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে সর্বত্র তার প্রতিরূপ বিরল। এই সব ক্ষেত্রেই তাঁর উর্জস্বী দেশপ্রেম সুপ্রত্যক্ষ।

প্রাথমিক ভাবে বঙ্গদেশকেই তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র করেন। 'বাংলা দেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি; তার সুর চিনি।' সীমার মাঝে অসীমের অভ্যর্থনা করেছেন যিনি সেই কবি বাঙালীকে ভারতীয়তার মহৎ ঔদার্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—কতখানি সার্থক হয়েছেন তার বিচার আজকের বাঙালী করবে। তিনি নিজে বাঙালী হয়েও ভারতীয়, ভারতীয় হয়েও বিশ্বমানব; মানব হয়েও পরিপূর্ণতার অভিমুখে আত্মার নিত্য উৎক্রমণে বিশ্বাসী।

তিনি দিয়েছেন, আমরা নিয়েছি। দেবার পরিমাণ যেমন অপরিমিত, বিষয়ও অনন্ত। ভাষা, শিক্ষা, চারিত্র, সংস্কৃতি সচেতনতা, রুচিবোধ আর সর্বোপরি ভাবরাজ্যের অনন্ত বিস্তার—এ সবই তিনি অকৃপণ প্রাচুর্যে দান করেছেন। কিন্তু দেওয়া ও নেওয়া দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। ধনী দরিদ্রকে দেয়, সেখানে দান ও গ্রহণ পৃথক বলেই গ্রহীতা পেয়েও দরিদ্রই থেকে যায়; সে দান গ্রহীতার দৈন্য ঘুচিয়ে তাকে উপরে ওঠাতে পারে না। আবার গ্রহণের মানের উপর দানের মর্যাদা নিবিড় ভাবে নির্ভরশীল। পাঠকের জাগ্রতরুচি যেমন লেখককে তার সর্বস্ব দেবার জন্য প্রেরিত করে, ভালো শিষ্য যেমন জ্ঞানদানের ঔৎসুক্য সঞ্চার করে গুরুকে আনন্দময় পরিশ্রমে প্রবৃত্ত করে, তেমনি সশ্রদ্ধ গ্রহণও দাতাকে উৎফুল্ল করে। দুর্ভাগ্য আমাদের যে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণনিরপেক্ষ হয়েই দান করতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমন এককালে পাঠক ও সাহিত্য দুইই সৃষ্টি করতে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কালেও সে স্থিতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। স্বীকৃতি নিরপেক্ষ হয়ে দান করেছেন মহামূল্য সম্পদ এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়।

একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ অনুরাগী পাঠক এদেশে আদৌ ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সমগ্র বাঙালী সমাজ সামূহিক ভাবে জয়ন্তী-উৎসবের দ্বারা সে কর্তব্য শ্রদ্ধায় পালন করেছেন। রবীন্দ্রচর্চা কবির জীবদ্দশাতেই গভীরগামী হয়েছে—আজও রবীন্দ্রচর্চা নিষ্ঠার সঙ্গে হয়ে চলেছে। তবে একথা অবিস্মরণীয় যে বিশুদ্ধ নিন্দা ও ঈর্ষার বিষও

রবীন্দ্রনাথকে পান করতে হয়েছে, এবং প্রধানত স্বপ্রদেশবাসীর কাছ থেকেই তা এসেছে। দুর্নীতির আর দুর্বোধ্যতার হাস্যকর অভিযোগ কবিকে সইতে হয়েছে একথা ভাবলে আজ আশ্চর্যই হতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে যে দুর্বোধ বলে সে অবশ্যই পড়াশুনার পরিশ্রমে বিমুখ, মিথ্যাশ্রয়ী একথা স্পষ্টত প্রমাণ করা চলে। কী গভীর বেদনায় বাংলার শ্রেষ্ঠতম সন্তানকে বলতে হয়েছিল—'আমার বাঙালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেছি। আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলা দেশে আমার জন্ম না হয়।' যাঁর জন্য বাংলা ও বাঙালী গৌরবিত, কেন তাঁকে এই ভয়াবহ আক্ষেপ করতে হয়েছিল সে কথা সব আত্মসচেতন বাঙালীকে ভাবতেই হবে।

রবীন্দ্রদৃষ্টির ব্যাপকতা বিস্ময়কর, আর তাই তাঁকে তাঁর পূর্ণতায় স্মরণ করা আয়াসসাধ্য। যেখানে তিনি কবি, সেখানে তিনি পাঠকের রসাস্বাদের আন্তরিকতায় পরিতৃপ্ত হতে পারেন। আর যেখানে তিনি দূরদর্শী সমাজ-নায়ক, মার্গপ্রদর্শক, সেক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের বিচার ও প্রয়োগের দ্বারাই তাঁর সম্মাননা ও স্বীকৃতি সম্ভব। আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পর্যন্ত যিনি সঞ্চার করেছেন, তাঁর ধর্মবোধও যে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে এটাও স্মরণীয়। মানবজীবনকে তিনি সুরুচিসমুজ্জ্বল ও আত্মপ্রত্যয়ে নির্ভয় করতে চেয়েছিলেন—স্বরাষ্ট্রপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের এ রূপ অম্লান হয়ে আছে তাঁর রচনায় ও কর্মে।

বলেছি, কবিস্মরণের প্রধান কারণ এইই যথেষ্ট যে তিনি কবি। আর কেমন কবি—রবীন্দ্রনাথের মত কবি, সাহিত্যের সমগ্র ক্ষেত্র যাঁর যাদুস্পর্শে উর্বরতার আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে, অপর্যাপ্ত ফসল ও ফসলের সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সম্ভাবনাটি বিশেষ মহত্বপূর্ণ। প্রতিভা কদাচিৎ নির্বীজও হতে পারে, অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যে অনন্য হয়েও অনেক কবিকৃতি অনুগামীদের প্রেরণা জোগায় না। রবীন্দ্রনাথের রচনা অননুকরণীয় হলেও তিনি আশ্চর্য রকমে প্রেরণা জোগাতেন সকল সাহিত্যকর্মীর। সাহিত্যের রূপ নিয়ে যত রকমের পরীক্ষা চলেছে বিংশ শতকের পূর্বার্ধে তার সর্বত্র এই মহাকবির প্রতিভার স্পর্শ পড়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতা, যা নিয়ে বিতণ্ডার শেষ এখনও পূর্ণ রূপে হয়নি, রবীন্দ্রনাথের কাছে সোৎসাহ সমর্থন পেয়েছে। আধুনিক কবির প্রয়াস ও প্রবৃত্তিকে তিনি অবিশ্বাস করেননি, তার স্বরূপ ও মূল্য যাচাই করেছেন। শুধু ভঙ্গী দিয়ে তাঁর চোখ ভোলান সম্ভব ছিল না। আজও তাই আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনে রবীন্দ্রনাথই প্রথম স্থান অধিকার করেন।

উনিশের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে সর্বতোভাবে এবং সর্বক্ষেত্রে এমন ভাবেই প্রভাবিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর প্রতিভার বিপুলতায় ও অজস্রতায় বিমুগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। আর এই বিমুগ্ধতাই কবিরাজের অপ্রার্থিত রাজকর। তবে আগেই বলেছি যে মুগ্ধতা দিয়ে বৌদ্ধিক সৃষ্টিকর্মের মূল্যাংকন চলে না। সচেতনতার সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চাতের পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট কবির বিশিষ্ট অবদানের মর্যাদানিরূপণ করণীয়। সে প্রয়াস অবশ্যই হয়ে চলেছে তবে তার পূর্ণতা এখনও কাম্য। স্মরণসভার উদ্দীপনার অনুপাতে এই প্রয়াসের আন্তরিকতা নিঃসংশয়ে নগণ্য। এক্ষেত্রে বিচারকের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত তার ভক্তি বা বৈরূপ্য,

তার সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি এ সবের সযত্ন পরিহার একান্ত আবশ্যিক।

তাই রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত কবি হিসেবে বিচার করাই বাঞ্ছনীয়। তাঁর কবিধর্মকে যদি আমরা চিনে নিই তাহলে যাকিছু তার সঙ্গে অসঙ্গত সেটা উপেক্ষিত হবে অনায়াসে, এবং এ কথা নিশ্চিত যে এমন অসঙ্গতি রবীন্দ্রসাহিত্যে নগণ্য, যদি না হয় সর্বথা অনুপস্থিত। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ যোগী রবীন্দ্রনাথ, এমন কি রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে কবি রবীন্দ্রনাথকেই আমাদের চিনতে হবে, জানতে হবে এবং শ্রদ্ধায় অর্ঘ্য নিবেদন করতে হবে। কবিচরিত্রের এই সব দিকগুলিও মহত্বপূর্ণ তবে প্রাথমিক নয়, কবিত্বেরই অন্যতম প্রকাশ এগুলি—তাই এই সব ক্ষেত্রেই তিনি typical ব্রাহ্মও নন, যোগীও নন, পলিটিশ্যানও নন। তাঁর শ্রেষ্ঠতম ও প্রধানতম পরিচয় তিনি কবি, যেকবি বস্তুতই পুরুষোত্তম—অনুভূতির গাম্ভীর্যে, ভাবের বিচ্ছুরিত প্রকাশে আর মানবপ্রেমের অপর্যাপ্তিতে।

মৃত্যুর পূর্বে আলাপচারীতে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর অন্তিম সংস্কার যেন শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশে সম্পাদিত হয়। তাঁর সূক্ষ্মরুচি কলকাতার জনসংমর্দের 'জয় রবীন্দ্রনাথ কী জয়' ধ্বনির নিশ্চিত সম্ভাবনায় পীড়িত হয়েছিল। তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। অগণিত জনতার সমুদ্র তাঁর নশ্বর দেহানুগমন করেছে, সমগ্র কলকাতা সেদিন মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে অবিশ্বাস করেন নি, তবু এই শ্রদ্ধা প্রকাশ কেন তিনি বিশ্বাস করেননি তা ভেবে দেখার মত। এও সেই সহসা ভাবোচ্ছ্বাস। যেখানে হৃদয় স্বয়ং সম্মত নয়, সেখানে শ্রদ্ধা প্রকাশ কেবল আড়ম্বর মাত্র। একটা হুজুগে প্রমত্ত হয়ে 'জয় রবীন্দ্রনাথ' ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ সমাপ্ত হয় না। কেন না তিনি কবি। তিনি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করার সাধনাই আমরণ করেছেন,—আর হৃদয় নির্বাক কিন্তু অনুভূতিমুখর। তাই স্বয়ং বারবার কবি বলেছেন—আমারে দেখো না বাহিরে। অন্তরের অকৃত্রিম উপচার নিবেদনের দ্বারাই কবিপ্রণাম সার্থক হতে পারে।

এই আন্তরিকতাকে অবলম্বন না করলে আমাদের কবিপ্রণাম রাষ্ট্রগত ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ কথা দুঃখের হলেও অনস্বীকার্য যে আমাদের আয়োজনে রুচিবোধ অনেক সময়েই তৃপ্তি পায় না। সুরুচি ও নিষ্ঠায়, আন্তরিকতায় ও সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধায় নিবেদিত প্রণামই সার্থক হবে—বলা বাহুল্য কবির কৃতার্থতায় নয়, আমাদেরই রুচিসমুৎকর্ষে। যে সুন্দরের আসন জীবনে শূন্য হয়ে আছে তাকে পূর্ণ করার দ্বারাই কবিকে জানবার ও বোঝবার আমরা অধিকারী হতে পারব, অন্য পথ নেই।

আর তা যদি আমরা আজও না করি তাহলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার সদর্পে ঘোষণা করেও আমরা সে ধনে ধনী হতে পারব না। রসের অনন্ত ভাণ্ডার সত্বেও আস্বাদ-দরিদ্র থেকে যাব আমরা। আমাদের জীবনে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে কবি, সৌন্দর্যানুভবের অধিকারী হয়েই তাঁকে সার্থক প্রণাম জানানো সম্ভব। জীবনকে সব দিকে ধন্য করে যে সেই অমিতসুন্দরের প্রতীকই রবীন্দ্রনাথ।

বটতলার নিধুবাবু

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন 'অনেকেই নিধু নিধু করেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু, কি গীতের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।' কথাটি গুপ্তকবি অনেক-দিন আগে বলে গেলেও, আজও হয় তো সমান প্রযোজ্য। 'নিধু' কে আমরা প্রায়ই বলি 'নিধুবাবু' কিন্তু কেন কবে থেকে তিনি এই বিখ্যাত 'বাবু' উপাধি পেলেন তাও জানি না। 'কি সধন কি অধন সর্বসাধারণ ব্যক্তিই নিধুবাবুকে 'বাবু' শব্দে সম্বোধন করিতেন। 'বাবুর বাটি, বাবুর সুর, বাবুর গীত, বাবু এলেন, বাবু গেলেন ইত্যাদি।' কিন্তু নিধুবাবু সম্বন্ধে একটি শব্দ টপ্পা ছাড়া আর কিছুই বিশেষ আলোচনা হয় না। বটতলার ভোর বেলায় হুতোম পেঁচা বর্ণিত পাবলিক আটচালার চারণ কবি সেদিন বটতলার গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন সারা বাংলাকেই।

নিধুবাবুর টপ্পা প্রসঙ্গে তাই সর্বপ্রথম মনে পড়ার কথা বটতলার সেই পাবলিক আটচালার বর্ণনা যেখানে বসে নিধুবাবু গান গাইতেন। 'শোভাবাজারস্থ বটতলা নিবাসী ৺বাবু রামচন্দ্র মিত্র যিনি এমিরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছদ্দী ছিলেন এবং যাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত বাবু জয়চন্দ্র মিত্র, অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন, তাহার বাটির উত্তরাংশে বড একখানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল, নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সঙ্গীত বিষয়ের আমোদ করিতেন। এই স্থলে, এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত সৌখিন ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত স্বরে মুগ্ধ হইতেন।' প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার 'রামচন্দ্র মিত্র জাহাজের কাপ্তেন দিগের মুচ্ছুদ্দির কাজ করিয়া বহু অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন।' কিন্তু দানী ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে বেশী খ্যাত ছিলেন পুত্র জয়চন্দ্র মিত্র। 'জয় মিত্র' নামে খ্যাত এই শিক্ষানুরাগী সম্ভবতঃ স্বয়ং শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি বহু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তাঁর আর্থিক দানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অনেক ইংরেজী সংবাদপত্র পেতেন বাড়িতে। প্রচলিত একটি প্রবাদ 'ধরা পড়েছে জয় মিত্তির' ব্যাখা প্রসঙ্গে ডাঃ সুশীল দে লিখেছেন 'কথিত আছে, কলিকাতার কোনও ধনাঢ্য নিরক্ষর ব্যক্তি খবরের কাগজ উল্টা করিয়া ধরিয়া পড়িবার ভাণ করিতেন। ভাণ ধরা পড়িতে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন 'এরূপ অনেকেই করে, দোষ কেবল জয় মিত্তিরের বেলায়।' স্পষ্টতই এই ব্যক্তি স্বয়ং জয় মিত্র। যাই হোক, দানী ও ধার্মিক জয় মিত্র বরাহনগরে গঙ্গাতীরে কালীমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বটতলার কাছেই একটি পথের নাম আজও জয় মিত্র ষ্ট্রীট।

সে যাক ওদের বাড়ির উত্তরাংশের আটচালাটির কথাই আলোচ্য। এই আটচালাটি ছিল 'পক্ষী'দের আড্ডা বা বাসা। পক্ষীরা এখানেই 'বাসা বাঁধিতেন, ডিম পাড়িতেন, আধার খাইতেন ও বুলি ঝাড়িতেন।' এ সবের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান কাজই ছিল গাঁজা খাওয়া। অবশ্য মনে রাখতে হবে এসময় সারা কলকাতা জুড়ে গাঁজা খাওয়ার মহা ধুম পড়েছিল। 'গাঁজার গুঞ্জন' সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন 'এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিৎ পরে সহরে গাঁজা খাওয়াটা এত প্রবল হয়েছিল

যে সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঁজার আড্ডা হইয়াছিল। বাগবাজার, বটতলা ও বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে এরূপ একটা আড্ডা ছিল' স্পষ্টতই তখন বটতলার 'পক্ষি'দের গাঁজার আড্ডার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। 'নিমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত ৺রামনারায়ণ মিশ্র মহাশয় সেই দলের কর্তা হইয়া সকল ব্যয় নির্বাহ করিতেন।' বস্তুত আটচালার পক্ষীর আড্ডাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক মিত্র মহাশয় হলেও কার্যকরী সভাপতি ছিলেন স্বয়ং নিধুবাবু। এখন 'পক্ষী' কারা সেটা আলোচনা করা দরকার। 'পক্ষীর দলে পক্ষী সকলেই ভদ্র সন্তান ও বাবু এবং সৌখিন নামধারী সুখি ছিলেন। পাখির দলেরা নিধুবাবুকে কর্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিত।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বটতলার আটচালায় প্রতিষ্ঠিত আড্ডাটির কাউন্টার প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা রামনারায়ণ মিশ্রের নাম উল্লেখ করলেও তা অবিসংবাদিত নয়। মহারাজ নবকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু বাগবাজারের শিবচন্দ্র ঠাকুরের মতে এ কৃতিত্ব অনাথকৃষ্ণ দেবের প্রাপ্য। অনুমান. বটতলা ও বাগবাজারের দুটি আড্ডার মধ্যে গুলিয়ে ফেলার জন্যই এই বিভ্রাট! তাছাড়া বাগবাজারের আড্ডাটির হিসেবে শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু এ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট হতেন অন্যজন। বটতলার নিধুবাবুর মত বাগবাজারে ছিলেন রূপচাঁদ পক্ষী।

সহরের সৌখীন সুখী বাবু ইচ্ছে করলেই যে পক্ষীদলভুক্ত হতে পারতেন না দস্তুর মত স্বয়ং নিধুবাবুর কাছে যথারীতি ইন্টারভিউ দিতে হত তার বহু উল্লেখ পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য পরীক্ষাটা হত গাঁজা খাওয়ার পরিমাণ সম্বন্ধে। 'এমত জনরব যে এক ব্যক্তি পক্ষিদলের ভুক্ত হওনের অভিপ্রায়ে আসিয়া একাসনে বসিয়া একেবারে উপরি উপরি ১০০ একশত ছিলিম গাঁজা খাইলেন, এইমাত্র অপরাধ ও বীরত্বের হানি হইল যে শেষ ছিলিম টানিবার সময়ে একবার একটু খানি খুক খুক করিয়া কাসিয়াছিলেন, এই লঘুদোষে পক্ষিরাজ (নিধুবাবু!) তাহাকে গুরুদণ্ড করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার নাম 'ছাতারে' পাখী রাখিলেন। ইহাতে সে ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন বদনে বিস্তর বিনয় করিয়া কহিলেন 'ধর্মাবতার'। এই যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র দোষেই কি আমাকে এত অপমান করা কর্ত্তব্য হয়।' এতদ্বাক্যে খগেশ্বর কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া উত্তর করিলেন ওরে মূর্খ! জানিস্ তো, এখন আমি আর কি করিতে পারি? হাকিম ফেরে ত হুকুম ফেরে না। ভাল তোর স্তবে আমি তুষ্ট হইলাম, কিন্তু 'ছাতারে' নাম একেবারে রহিত করিতে পারিব না, অতএব তোর নাম 'স্বর্ণছাতারে' রাখিলাম।' এমন 'অগ্নি পরীক্ষা'র পর নিধুবাবুর দলে নাম লেখান যেত। কিন্তু তবুও ধনী ও সৌখীন বাবুদের আকর্ষণ কম ছিল না। সিনেমা থিয়েটার তখন দূর অস্ত আনন্দ উপভোগের একমাত্র উপায় পশ্চিমী সঙ্গীত লহরী। তাই 'Young men, having a Penchant for music clustered around him (নিধুবাবু). Unlike Professional songsters, he unreservedly gave them lessons in vocal music. Some of the young-men afterwards become good singers. ...এইভাবে 'Ram Nidhi (নিধুবাবু) established a society composed mostly of youngmen for the cultivation of music chiefly of vocal music.

কিন্তু এই যে নিছক ও পবিত্র সঙ্গীত সাধনা হত সে সঙ্গীতটি কিন্তু আখড়াই গান।

'সর্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে'—লিখছেন ঈশ্বর গুপ্ত। ১৭৫২ সালে স্বয়ং ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরে লিখছেন 'নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব, নূতন নূতন ঠাঠে খেঁড়ু শুনাইব'। এই খেঁড়ু গানই ছিল নিধুবাবুর 'আকর্ষণ' যা ভীড় জমাত। গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের 'হাফ-আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস' অনুযায়ী আখড়াই গান শান্তিপুর থেকে কলকাতায় এসেছিল। চুঁচড়ার দল ২২ বাইশ যন্ত্র সহযোগে গান গাইতেন বলে তাদের 'বাইসেরা' বলা হত। এই বাইসেরা আখড়াই গান ছিল বটতলার প্রাণ। বিশেষ ভাবে শান্তিপুরের আখড়াই গানের প্রতি নিধুবাবুর আকর্ষণবোধের কারণটিও আলোচনার খোরাক হতে পারে। 'আখড়াইয়ের সৃষ্টি কর্তা কোন ব্যক্তি আমরা স্থির রূপে ইহার নিশ্চয় করিতে পারিলাম না,' ঈশ্বর গুপ্ত লিখছেন, 'কিন্তু অনেকেই শেষে ৺কুলুই চন্দ্র সেন মহাশয়কে ইহার জন্মদাতা রূপে নির্ণয় করিয়াছেন।' ভোলা ময়রার এক লহরে জানা যায় 'আখড়ায়ের সৃষ্টি কোল্লে কুলুইচন্দ্র সেন।' এখন এই কুলুইচন্দ্র সেন হলেন নিধুবাবুর মামা। সম্ভবতঃ মামার কাছ থেকেই নিধুবাবু এ ব্যাপারে প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন।

পরবর্তী কালে বটতলায় জনপ্রিয় হয়েছিল আখড়াইয়ের বিকৃতি হাফ-আখড়াই। হুতোমের বর্ণনা অনুযায়ী হাফ আখড়াইয়ের জন্ম আখড়াই থেকেই। কিন্তু স্বয়ং নিধুবাবু আখড়াইয়ের এই পিতৃত্বের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

প্রসিদ্ধ পাবলিক আটচালায় পক্ষীরা নিছক আখড়াই সাধনা করতেন না। 'এইখানে এসে পাকি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন।' নিধুবাবু তাঁর পৈতৃক বাড়ী নিকটস্থ কুমারটুলী হলেও থাকতেন আটচালাতেই, সদা সর্বদা। বস্তুত পক্ষীদের পক্ষে সর্বদা এই আটচালতে বসবাস বাধ্যতামূলক বিষয় ছিল। যাঁরা তাঁদের গান শুনতে চাইতো তাঁরা শহরের প্রধান পথের ব্যস্ত চৌরাস্তা বটতলার আট চালায় এসে তাঁদের গান শুনতেন। বস্তুত শহরের ডালহৌসী পাড়াতেই তখন আমোদ প্রমোদ পতিতা ও সঙ্গীত সাধনা কেন্দ্র। তাই 'নিধু বাবুর সঙ্গীত বিদ্যার অনুরাগ এবং নাম সম্ভ্রম সুন্দররূপে প্রকাশ হইলে বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান লোকেরা কলিকাতায় আগমন করত তাহার গান শুনিয়া সমূহ সন্তোষ লাভ করিতেন। ইঁহারা তাবতেই বাবুর নিকট আসিতেন, কিন্তু বাবু প্রায় কখনোই কাহারো নিকট গমন করিতেন না ; কারণ তিনি স্বাধীনতা সম্মানের উপর নিয়তই দৃষ্টি রাখিতেন, তোষামোদাদি উপাসনাকে হেয়জ্ঞান করিতেন।' অর্থাৎ নিধুবাবুর গান শুনতে হলে রাজামহারাজাকেও বটতলার আটচালাতেই আসতে হত। 'কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি কহেন' বর্দ্ধমানাধিপতি মৃত মহাত্মা ৺তেজচন্দ্র রায় বাহাদুর এতন্নগরে শুভাগমনান্তর কোনরূপ কৌশল ক্রমে তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন'। এছাড়াও 'মুর্শিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায়বাহাদুর এখানে আসিয়া বহুদিন আমোদ প্রমোদ করিতেন!' প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার এই মহানন্দ রায় যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখনই মহারাজের শ্রীমতী বারাঙ্গনার সঙ্গে নিধুবাবুর পরিচয় হয়েছিল। বারাঙ্গনা অর্থে উপপত্নী রক্ষিতা। সেকালে রক্ষিতা সামাজিক সম্ভ্রমের আনুষঙ্গিক ছিল। রক্ষিতার জন্য পাকাবাড়ী করে দেওয়া আর্থিক

সম্ভ্রমের চূড়ান্ত ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন যে দুটি অপরিচিত ভদ্রলোকের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় সে যুগের রীতি ছিল বলা যে ইনি রক্ষিতার জন্য পাকাবাড়ী তৈরী করে দিয়েছেন। বস্তুত সামাজিক নোঙরবিহীন নাবিক বণিকরা পতিতা সন্ধান করত দৈহিক প্রয়োজনে কিন্তু ধনীবাবুরা সংরক্ষিত উপপত্নী ব্যবহার করতেন সামাজিক সম্ভ্রমের জন্য। মফঃস্বলের ধনীরা কলকাতা আসবার সময় সঙ্গে সুন্দরী রক্ষিতাকেও নিয়ে আসতো, সে যাত্রা মহেশের স্নানযাত্রা উপলক্ষে নৌকাবিলাস হলেও বটে আবার নিছক ব্যবসায়িক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও বটে। যাই হোক্ মহানন্দ রায় যখন নিধুবাবুর গান শুনতে কলকাতা এসেছিলেন তখন সঙ্গে শ্রীমতীকে এনেছিলেন। 'উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধি শালিনী বারাঙ্গনা ছিল, ঐ বারবিলাসিনী রামনিধিবাবুকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিলেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেশ্যা।' ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন শ্রীমতীর বাসস্থান ছিল গরাণহাটা ষ্ট্রীটে অর্থাৎ বটতলার অতি নিকটে। এবং ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত লিখছেন, 'কিন্তু অনেকে একথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন তিনি (নিধুবাবু) লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস, কাব্য আলাপ গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন এবং সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ রাগ সুরবদ্ধ করিয়া তাহারি একটা টপ্পা রচনা করিতেন।' সম্ভবতঃ ঈশ্বর গুপ্ত নিজের যুক্তির জালেই তাঁর প্রমাণিত সিদ্ধান্তকে অসংলগ্নতার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। মহারাজার সুন্দরী প্রিয়তমা রক্ষিতা গরাণহাটায় থাকতেন এবং নির্মল প্রণয়ের বশ্য হয়ে নিধুবাবু শ্রীমতীর অন্তকরণের ভালবাসার জন্য প্রায় প্রতি রজনীতেই তার গৃহে গিয়ে হাস্য পরিহাস গীতবাদ্য করতেন, বস্তুতঃ এর দ্বারা গুপ্তকবি যেন বিপরীত শিবিরের মতকেই পরোক্ষ সমর্থন করেছেন। মনে রাখতে হবে ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুর জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন নিধুবাবুর তৃতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান জয়গোপালের কাছে। নিধুবাবুর মৃত্যুর দুবছর আগে তাঁর গানগুলো গীতরত্ন নামে প্রকাশিত হয়। ১২৬৩ সালে অর্থাৎ নিধুবাবুর মৃত্যুর পর জয়গোপাল 'গীতরত্নের' ২য় সংস্করণে পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনীও জুড়ে দেন। 'গীতরত্নের' একটি কপি সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। ঈশ্বরগুপ্ত রচিত রামনিধি গুপ্তের জীবনীর সঙ্গে জয়গোপালের রচনা আক্ষরিক ভাবেই মিলে যায়। অনুমান করা যেতে পারে গুপ্তকবি এই জীবনী রচনার ক্ষেত্রে নিধুবাবুর পুত্র কর্তৃক কিছুটা শ্রীমতী প্রসঙ্গে প্রভাবিত হয়ে থাকতেও পারেন। এমন কি জয়গোপাল তাঁর পিতার জীবনীতে 'প্রায় প্রতি রজনীতেই' শব্দটি বাদ দিয়ে গুপ্তকবির আক্ষরিক অনুসরণ করেছেন বলা যেতে পারে, অন্ততঃ শ্রীমতী প্রসঙ্গে। শ্রীমতী সংবাদের বদলে জয়গোপাল শ্রীমতী গৃহে রচিত নিধুবাবুর টপ্পাগুলির ওপরেই বেশী আলোকপাত করেছেন। সম্ভবতঃ জয়গোপালের এই প্রচেষ্টাতেই প্রভাবিত হয়ে বরদা প্রসাদ দে লিখেছেন যে নিধুবাবু শ্রীমতীর প্রণয় মুগ্ধ ছিলেন না। বরদা প্রসাদ জানাচ্ছেন 'I say this on the

authority of one who was on familiar terms with Ran Nidhi।' সন্দেহ হয়, এই familiar oneটি স্বয়ং জয়গোপালই।

প্রসঙ্গত আরও জানা দরকার মহানন্দ রায় ধনী মহারাজ। মুর্শিদাবাদের নিজামতের দেওয়ান মহানন্দ মহারাজ নন্দকুমারের নিঃসন্তান পুত্র গুরুদাসের ভাগিনেয় ও বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। এসব ধনীর প্রিয়তমা রক্ষিতা শ্রীমতীর সঙ্গে পবিত্র প্রণয় ও আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে নিধুবাবু নিশ্চয়ই বটতলার সঙ্গে শুধু শ্রীমতীকে জড়িয়ে রাখেন নি বরং বটতলা সাহিত্য সম্ভারে তাঁর দান টপ্পারও সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছেন। নিধুবাবুর ভাল ভাল টপ্পা রচিত হয়েছে এই শ্রীমতী গৃহে যাপিত সন্ধ্যায়। এই সব 'প্রেম সঙ্গীত' বটতলার পক্ষী সদস্যরাও মেনে নিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ বলে। জয়গোপালও স্বীকার করেছেন এই সব গানের শ্রেষ্ঠত্ব। আর লঙ্ সাহেব বলে রেখে গেছেন "Nidhu, a century ago Composed Poems sung to this day ; he was said to have written the best when he was drunk"। অর্থাৎ নিধুবাবুর শ্রেষ্ঠগান রচিত হত শ্রীমতীর গৃহে এবং মত্ত অবস্থায়! নিধুবাবুর সঙ্গীত রচনার উপলক্ষ্য সংক্রান্ত কাহিনীও প্রকাশ করেছেন গরাণহাটার সরকার এ্যাণ্ড কোম্পানী ১২৯৪ সালে 'প্রেমসঙ্গীত' গ্রন্থে।

নিধুবাবু শ্রীমতী গৃহে যে গান রচনা করতেন তা গাইতেন পরদিন বটতলার আটচালাতে। লোকনাথ ঘোষ লিখেছেন Ram Nidhi wrote and sang and sang and wrote. His fame as a singer spread for (far !) and wide। বরদাপ্রসাদও তাই লিখেছেন "At Calcutta he Passed his days & pleasantly for many long years. He wrote and sang sang and wrote. His fame as a singer spread far and wide।" ডঃ ভবতোষ দত্ত নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীতে কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ ও রেঁনেসা অনুভব করেছেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীত দেহাতীত নয় 'তবু...'। এই 'তবু'র কথা আমাদের আলোচ্য নয় তবে নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীতে যে মহারাজার প্রিয়তমা বেশ্যার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের নিবিড় উত্তাপটুকু ক্ষেত্র বিশেষে অক্ষয় সেই উপলব্ধিতেই 'প্রেম সঙ্গীত' পাঠককে হতাশ করতে পারে শ্রীমতী প্রসঙ্গে।

সে যাক্, পক্ষীর দল কখনও বটতলার আটচালা ছেড়ে অন্যত্র গাইতে যেতেন না। ময়রা, ঠাকুর, বৈষ্ণবদের মত তারা বায়না নিয়ে দেশ বিদেশে তরজা আখড়াই কবির লড়াই শোনাতে যেতেন না, এইটেই ছিল নিধুবাবুর দলের বৈশিষ্ট্য। তখন গান গাইতে যাওয়া মানে কোন রাজবাড়ীতে যাওয়া যার অর্থ নিধুবাবুর কাছে ছিল 'তোষামোদাদি'। কিন্তু নিয়ম মাত্রেই ব্যতিক্রম থাকে। আর এই ব্যতিক্রমেই বটতলার পক্ষীদের অন্যতম প্রচারিত গুণ 'আধার খাওয়া'র গল্পটি স্পষ্ট হতে পেরেছে। স্বর্গত ৺মহারাজ গোপীমোহনদেব বাহাদুর পক্ষির দলের কৌতুক দেখিবার মানসে (গান শুনবার জন্যে নয়, কৌতুক দেখতে।) বিস্তর যত্ন করাতে পক্ষিগণ কহিল 'আচ্ছা আমরা যাইব, রাজা খাঁচা পাঠাইয়া দিল। রাজা 'পাল্কী' নামক খাঁচা পাঠাইয়া দিলেন, পাখিয়া তাহাতে আরোহণ করত রাজভবনে উপস্থিত হইল, বিহঙ্গ ব্যূহের

অন্তঃকরণে স্থিরতা ছিল যে অগ্রে নৃত্যগীত করিয়া পরে 'আধার লইবে' (অর্থাৎ কৌতুক অর্থে তাহলে নৃত্য ও গীত।) রাজা বাহাদুর তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অগ্রেই আধার প্রস্তুত করিয়া দিলেন, ইহাতে সকলেই আধার করত ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ করিয়া একে একে খাঁচা অর্থাৎ পাক্ষির মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, কি গো, তোমার দিগের আমোদ প্রমোদ ও নৃত্যগীত দেখিতে ও শুনিতে আমার এত যত্ন, তাহাতো কিছুই হইল না। পাখি সকল উত্তর করিল, আমরা আধার পাইলে আর কি থাকিতে পারি? অমনি হজম করিতে হইবে, আপনি যদি আগে আধার না দিতেন তবে সকল প্রকার রঙ্গ ভঙ্গ দেখিতে পাইতেন। 'এই বাক্য শুনিয়া রাজা অমন হইয়া রহিলেন। পাখিরা ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শুধু রাজা মহারাজা নয়, সমব্যবসায়ী অনান্য কবি পাঁচালী ওয়ালাকেও নিধুবাবুর গান শুনতে হলে বটতলাতেই আসতে হত। নিধুবাবু কখনও কোথাও যেতে চাইতেন না। 'এক দিবস প্রসিদ্ধ পাঁচালীওয়ালা ৺গঙ্গানারায়ণ নস্কর পক্ষির দল দেখিবার অভিপ্রায় তাহার দিগের আটচালা নামক বাসার দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল পক্ষী জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ? নস্কর কহিলেন, 'গঙ্গানারায়ণ নস্কর আমি তোমাদের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।' পাখি বলিল 'আচ্ছা এইখানে বৈস, আমি সংবাদ করি, রাজার আজ্ঞা হইলে যাইতে পারিবে' এই বলিয়া গিয়া সংবাদ দিল' মহারাজ একজন নস্কর আসিয়াছে'। রাজা কহিলেম 'সেকি! একজনে নস্কর। সে জন্তু না মানুষ? উত্তর। মানুষ, প্রশ্ন। হিন্দু না মুসলমান। উত্তর। হিন্দু, গলায় পৈতে আছে' রাজা কহিলেন 'একজনে নস্কর, সে আবার হিন্দু, সূত্রধর, এ কেমন হৈল' এতচ্ছ্রবণে একটা প্রধান পাখি কহিল "দ্বিজরাজ, আমি এখনি কয়েকটি অক্ষরের কোটা অনুসন্ধান পূর্বক নির্ণয় করিয়া দিতেছি' (প্রসঙ্গতঃ নিধুবাবুর নাম রামনিধি গুপ্ত, তিনি জাতে বৈদ্য, এখানে দ্বিজরাজ অর্থে তাঁকে পক্ষীরাজ বলা হয়েছে, কারণ পাখি দ্বিজ) এই বলে সেই পাখি কস্কর, খস্কর, গস্কর, করে কুলুজী পাঠ করে বল্ল মহারাজ তস্কর থস্কর দস্কর ধস্কর নস্কর অতএব তস্করের ঘরে নস্করের বাস! (তস্কর অর্থাৎ 'ত' বর্গে)। গঙ্গানারায়ণ নস্কর এই বাক্য শুনিয়া অম্বলচাচা ভোম্বল দাসের ন্যায় ফ্যা ফ্যা করিতে করিতে অমনি উঠে ছুটে প্রস্থান করিলেন। পাখির দল দৃষ্টি করা তাঁহার মাথার উপরে রহিল।' অথচ ডঃ সুশীল দের মতে গঙ্গানারায়ণ নস্কর is some times regarded as the founder of this new type of panchali. দাশরথি রায়েরও আগে পাঁচালী গানের স্রষ্টা গঙ্গানারায়ণ এইভাবে বটতলায় পক্ষিদের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতে এই নস্করের সঙ্গে লক্ষীকান্ত বিশ্বাস (ল'কে কানা) এর প্রায়ই কবির লড়াই হত।

উপরিউক্ত কাহিনী থেকে পক্ষীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'বুলি ছাড়া'র কিছু নজির পাওয়া যাবে। যথা। পক্ষির বুলি। (১) ভিখিন, কিটি কিটি, কিম ফিসিন (২) চুকু মুকু, চুক চুকুণ (৩) কিচিমিচি বিচি কিরিন কিন (৭) কু কু রামশালিকে কু কু গঙ্গা বিসং, কু কু গাংশালিকে, কু গঙ্গাবিসং ইত্যাদি। এই সব দুর্বোধ্য বুলি সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন 'এই সমস্ত দ্বিপদ পক্ষির আকাশ ভেদি বুলি সকল দ্বিপদ পক্ষিরাই বুঝিতে পারিতেন অন্যের বুঝিবার সাধ্য কি? অবশ্য

গুপ্তকবি একটি বোধ্য উদাহরণও দিয়েছেন—

'ছোট বিলের পাখি মোরা, বড় বিলের কে।
উড়িতে না পেরে পাখি পোষ মেনেছে ॥

এর অন্তর্নিহিত অর্থ অবশ্য পরিপ্রেক্ষিত সাপেক্ষ মনে হয় তবুও অর্থহীন শব্দ সম্ভারের তুলনায় এ ছড়ার শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত পরিচিত বলা চলে। প্রথমতম সংবাদপত্র, বটতলার বই, টপ্পালহরী, আদিম বৃত্তি-ব্যবসাকেন্দ্র, প্রথম স্কুল প্রভৃতি শহর কলকাতার প্রথম পর্বের মূল কাহিনীকে যে গ্রন্থি নিকটতম আত্মীয় করে নিঃসন্দেহে তা বটতলা। বলা বাহুল্য নি-স্প্রাণ বস্তু বটতলার পক্ষে এই প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব রয়েছে কয়েকটি পুরুষের উপস্থিতিতে। কলকাতার বটতলা পুরনো সহরের সভ্যতা সংস্কৃতিতে যে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তার প্রধানতম কারণ এর প্রাণ পুরুষ রামমোহন রায়ের উপস্থিতির জন্য। প্রথমতম সংবাদ পত্রের ক্ষেত্রে রামমোহনের হাতের অস্তিত্ব আজ আর গোপন নয়। সেই রামমোহন ও বটতলার মধ্যে প্রথম সর্ব রুচির পার্থক্য অসীম। বস্তুতঃ প্রথম বিচারে রামমোহন ও বটতলা কে দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দাও মনে হতে পারে।

কিন্তু এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছিল নিধুবাবুরই নেতৃত্বে। আমরা আগেই বলেছি নিধুবাবু কোথাও যেতেন না। তার গান শুনতে ইচ্ছা হলে তাঁকে আসতে হত বটতলার আটচালায়। অবাক হইনা যখন এই নিধুবাবুর গান শুনতে একদিন বটতলার আটচালায় হাজির হতে শুনি স্বয়ং রামমোহনকে। মানিকতলা থেকে প্রায়ই রামমোহনকে প্রিয় বন্ধু ও শিষ্য দ্বারকানাথের জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আসতে হত। পরবর্তী যুগে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের সাহচর্য্যে তাকে বটতলাতেও আসতে হত। বোধকরি সে আসার শুভসূচনাই করেদিলেন স্বয়ং নিধুবাবু। স্বপক্ষে জনমত গঠনের জন্য বাহনসন্ধানী রামমোহনের সেদিন শুভলগ্ন। ব্রহ্মসভার ভোরেও রামমোহনকে এই বটতলাকেই নির্ভর করতে হয়েছিল। গরাণহাটার কবিদল থেকেই তিনি সভার প্রথম গায়ক সংগ্রহ করেছিলেন। 'গরাণহাটাস্থ বাবু কৃষ্ণমোহন বসাথ অনেকবার দল করিয়াছিলেন, তাঁহার দলে গোবিন্দ নামে একজন মালা সুর করিত, সে ব্যক্তি এ বিষয়ে অত্যন্ত নিপুণ ছিল এবং রামমোহন রায়ের সময়ে সে ব্রহ্মসভায় ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিত।'

সবচেয়ে বড়কথা রামমোহন আটচালাতে আসতেন বলেই বোধহয় 'রামনিধি শেষ জীবনে রামমোহনের সংস্পর্শেও আসিয়াছিলেন।' নিধুবাবুর পুত্র জয় গোপাল লিখছেন 'ব্রহ্মসমাজের পুর্ব উপাচার্য ৺উচ্ছাবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহোদয় এক দিবস রামনিধি বাবুকে আদেশ করিলেন 'মহাশয় একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতে হইবে সেই সেই অনুরোধে বাবু তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া এই গীত রচনা করিয়া শুনাইলেন, যথা, রাগ বেহাগ, তাল অড়া। পরম ব্রহ্ম তৎপরাৎপর পরমেশ্বর নিরঞ্জন নিরাময় নির্বিশেষ সদাশ্রয়, আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বধর। ইত্যাদি। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই গীত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন বাবু তুমি সাধু, তোমার অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি কারণ এ প্রকার গীত পূর্বে কখনও রচনা করেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এমন রাগ শুনা যায় নাই, যাহা হউক এই গীত দেওয়ানজীকে অর্থাৎ রামমোহন রায় মহাশয়কে দেখাইয়া ব্রহ্ম সমাজে গান করাইব, এই কথা

বার্তার পরে কোন বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়া এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন এ কারণ অনুমিত হইতেছে এ গীত সমাজের গীতে ভুক্ত হয় নাই অপ্রকাশ রহিয়াছে'।

সময়ে স্নান ভোজন শয়ন করে নিধুবাবু সাতানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন। সে সময়ে বাংলাদেশের এই অন্যতম দীর্ঘজীবী ১২৪৫ সালের একুশে চৈত্র পুত্রকন্যা পৌত্র দৌহিত্রাদি রেখে 'জাহ্নবী তীরে জ্ঞানপূর্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মারা গেলেন।' ১৮৩৯ সালের ১১ই এপ্রিল ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত হল। A Native Lyric poet Nidhu Baboo, who was at the same time one of the oldest inhabitants in Bengal is just dead at the age of eighty। নিধুবাবুর বয়স তখন আশীরও বেশী। বেশী বয়সের জন্য নিধুবাবুর মৃত্যুর গুজব সে দিনের কলকাতাতে প্রায়ই উঠত। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন "মহাশয়ের মৃত্যুর ২০ কিম্বা ২৫ বছর পূর্বে অনেকেই কহিত 'তিনি জীবিত নাই।' এই সূত্রে পরস্পর কত বাজী রাখা হইয়াছিল। এবং এই উপলক্ষ্যে কেহ কেহ তাঁহারি নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'মহাশয় কি অদ্যাপি অজীব আছেন?'

বটতলা প্রসঙ্গে আট চালার সম্রাট নিধুবাবু নিশ্চয়ই উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু সেই টুকুই কি সব? ঈশ্বর গুপ্তের কবি জীবনীর সম্পাদক ভবতোষ দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতচন্দ্র এর দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিনিধি হিসেবে নিধুবাবুকে নির্বাচিত করেছেন। অবশ্য এই সম্পাদনায় ভূমিকাতেই ডঃ সুশীল দে এই নির্বাচনে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন 'সঙ্গতি রক্ষার খাতিরে এরূপ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মোটামুটি ঠিক হইতে পারে, কিন্তু টপ্পা রচয়িতা রামনিধি গুপ্ত বা তাঁহার সমসাময়িক কবিওয়ালারা কেবল অরাজক বাংলা সাহিত্যের আসর জমাইয়া রাখিয়াছিলেন, প্রতিনিধি হিসাবে বসিবার প্রতিভা বা যোগ্যতা তাঁহাদের ছিল বলিয়া মনে হয় না।' ডঃ দে স্বীকার করেছেন নিধুবাবু সে যুগের অরাজক বাংলা সাহিত্যের আসর জমিয়ে রেখেছিলেন, বলা বাহুল্য সে যুগের সাহিত্য মানে সদ্য সাক্ষরের অন্ধকার সাহিত্য। বিদেশীর সংস্কৃতির সহবাসে আমরা পুঁথির আর রাজার যুগ কাটিয়ে 'জন-সভার সাহিত্যে' প্রথম পদক্ষেপ করছি। নিরক্ষর জনতাও বটতলার যুগকে অস্বীকার করতে পারেনি কারণ তখন এটাই ছিল ডালহৌসী ও চৌরঙ্গী পাড়ার সংমিলন। ধনী বাবুদের বাসস্থান ছিল এই পাড়া জুড়ে। অ-শিক্ষিত চাটুকার ভাঁড় পার্ষদ দালাল কাপ্তেনদের পক্ষেও তখন সাহিত্যের চেয়ে সহজ হয়ে উঠল সঙ্গীত। চটুল সঙ্গীতের সাহায্য নিয়ে তারা দাতার মরম মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করলেন। তাই অক্ষরের মুদ্রিত সাহিত্যের আগে নগর কলকাতায় যে সার্বিক চেতনা এসেছিল তারই সুবিধাবাহী হয়েছিল নিধুবাবুর জনপ্রিয় টপ্পা লহরী। তাই ভবতোষ দত্ত যদি নিধুবাবুর রচনায় রেঁনেসা ও রবীন্দ্রনাথের অনুভব নাও পেতেন তবুও নিধুবাবুর একটি ঐতিহাসিক কৃতিত্বকে কোন মতেই অস্বীকার করা যেত না। তিনি বাংলা দেশে মাস্ কমিউনিকেশনের অগ্রদূত। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আগেও কলকাতাতে বটতলাই একমাত্র স্থান ছিল যেখানে বহু মানুষ একদা একই সময়ে সমবেত হত। পরবর্তী কালে কবির গান লড়াই আখড়াইয়ে সাম্প্রতিক ঘটনার ছায়া পড়ত বটে কিন্তু নিধুবাবুর গানে নিছক কাব্য ও শব্দ সুরেরই প্রকাশ থাকত। শুনতে আসতেন

ধনী দরিদ্র যুবা বৃদ্ধের দল। শহর কোলকাতার ভোর বেলায় এ হেন বিচিত্র শ্রেণীর জনতার জমায়েতের গুরুত্ব রামমোহন অনুভব করেছিলেন। তাই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের আগে তিনি হয়ত নিধুবাবুকেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

নিধুবাবুর গান সংবাদ-ভিত্তিক বা মত-প্রচারক ছিল না বটে যা রামমোহনের প্রয়োজন ছিল কিন্তু 'নিধুবাবু যে প্রকার রাগ, সুর ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, মিলের প্রতি সে প্রকার দৃষ্টি করিতেন না। এ কারণ তাঁহার কোন কোন গান সুর করিয়া গাহিলে মানুষের মন যে প্রকার আর্দ্র করে, মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্ত সুখকর হয় না।'

বোধকরি এখানেও নিধুবাবুর পরোক্ষ কৃতিত্ব। গান শুনতে শ্রোতাদের দলবেঁধে সমবেত হতে হত বটতলার আটচালাতে। এই সুবিধাটুকুও রামমোহন লক্ষ্য করে ছিলেন মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে বটতলার আটচালাটির ইতিহাসটুকুও বলা দরকার পরিণতি হিসেবে। আটচালায় গাঁজা খাবার ধূম ক্রমশই এত বেড়ে গিয়েছিল যে এক সময় মিউনিসিপাল কমিশনার আটচালাটি ভেঙে দিয়েছিলেন। আটচালা ধ্বংসের কারণ হিসেবে হুতোম পেঁচা লিখছেন—'এখন আর পক্ষীর দল নেই···পাকিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন। আড্ডাটি মিউনিসিপ্যাল কমিশনারেরা উঠিয়ে দেছেন, এখন তার রুইন মাত্র পড়ে আছে।'

অবশ্য বটতলার আটচালা রুইনড হয়ে যাবার পরও নিধুবাবু নিঃশেষ হয়ে যায় নি। বাগবাজার নিবাসী ৺দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও সাহায্যে রসিকচাঁদ গোস্বামী বাগবাজারে আটচালা প্রতিষ্ঠা করেন সেখানেও নিধুবাবু 'আমাদের ব্যাপারে অতি বাহুল্য' রূপে পালন করেছিলেন। কিন্তু সে স্বতন্ত্র ইতিহাস। বটতলার আটচালার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বটতলা থেকে নিধুবাবুর ইতিহাস শেষ হয়ে গেল।

গোর্কী : জীবন ও শিল্প

গোর্কীর আসল নাম আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ। 'গোর্কী' শব্দের রাশিয়ান অর্থ হলো 'তিক্ত'। যে মানুষটি জীবনারম্ভের থেকেই সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতার সান্নিধ্যে এসেছিলেন; দুঃখ কষ্ট, ঝড় জল, আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে লালিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছিলেন, তাঁর পক্ষে 'এর থেকে আর অর্থবহ নাম গ্রহণ করা কিইবা হতে পারতো? মুখে রুপোর চামচ দিয়ে কোন ঐশ্বর্যবানের ঘর থেকে পৃথিবীর আলো দেখা সম্ভব হয়নি গোর্কীর পক্ষে। মন্দমলয়ের মৃদু মৃদু আঘাতে আন্দোলিত হওয়াও সম্ভবপর হয়নি। শৈশবেই বাবাকে হারাতে হল। মা পুনরায় বিবাহ করলেন। মানুষ হতে লাগলেন দিদিমার কাছে। কিন্তু সেখানেও স্বস্তি মিলল না। দুর্দান্ত মাতাল মাতামহ। অকথ্য তার অত্যাচার। গোর্কী তার ফলে মাত্র আট বছর বয়সেই রুটি রোজগার শুরু করলেন। পাঁচ মাস মাত্র পড়েছিলেন একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

এখন থেকে গোর্কীর শুরু হল জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাল—এমন একটা বয়সেই রুটি রোজগারের জন্য তিনি পৃথিবীর পথে পথে ঘুরতে লাগলেন, যে বয়সে তরুণ তরুণীরা পর্যন্ত, অন্য দেশে তো বটেই, আমাদের দেশেও চিন্তাহীন আনন্দময় জীবন যাপন করে থাকে। সামান্য কিছু অর্থের জন্য গোর্কী একাজ সেকাজ করে যেতে লাগলেন; এ পথে সে পথে, কখনো বিস্তীর্ণ ভাঙ্গা উপত্যকায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরতে লাগলেন করুণ কান্নার উপলখণ্ড সংগ্রহ করে; কালক্রমে কাঁচাবয়সের কুক্কুটটি একদিন পরিণত হলেন সর্বহারা আন্দোলনের ঝড়ের পাখি হয়ে। চোর, বাটপাড়, বেশ্যা, অকর্মণ্য, নানারকমের ভবঘুরেদের সান্নিধ্যে আসতে লাগলেন তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াবার সময়। এদের জীবনের সান্নিধ্যে কখনো গোর্কী হয়েছেন হতাশ, নিরাবেগ। কখনো আনন্দ আবেগে ভরপুর; পুলকিত, উচ্ছ্বসিত। জীবন যন্ত্রণার রূপ কী, একদিন তা জানবার জন্য গোর্কী গুলির আঘাতে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কী সৌভাগ্যক্রমেই হোক এ কাজে তিনি অকৃতকার্য হন। সারাটি জীবন শ্বাসযন্ত্রে এক ক্ষত লাভ করেন। কিন্তু এ ঘটনা তাঁকে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণে বাধ্য করে :—'বড় হলে আমি মানুষকে সাহায্য করব, সেবা করব মানুষের।'

গোর্কীর জীবন ও শিল্প যেন এই প্রতিজ্ঞার মধ্যেই মুখর বাণীবদ্ধ হয়েছে। মানুষের প্রতিটি সংগ্রামের সাথী হয়েছেন গোর্কী। প্রতিটি কান্নার হয়েছেন কাহিনীকার। সেইসব মানুষের মিছিলের মাঝখানে তিনি এসেছেন তাদের কথাই তিনি লিখেছেন। তারাই হয়েছে তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য।

গোর্কীর জীবনে যেমন মানুষের সংগে মেলামেশার ব্যাপারে কোন রকম ফাঁক ছিল না,

তাঁর শিল্পজীবনেও তেমনি পড়েনি কোন ফাঁকি। দেখেছেন তিনি বিস্তর। লিখেছেনও অনেক। কিন্তু কোথাও জীবনে জীবন যুক্ত না হয়ে সাহিত্যের গানের পসরা কৃত্রিম পণ্যের ভারে ব্যর্থ হয়ে যায়নি। ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হলো গোর্কীর অসামান্য রচনা চেলকাশ। একটি বড় গল্প। এখানে মানুষের অবাধ স্বাধীনতার প্রতি গোর্কীর যে স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল তাই অভিব্যক্ত হয়েছে। বন্দরের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, চাষি গাব্রিলার কথা, গ্রিশকা চেলকাশের মুক্ত অবাধ জীবন ইত্যাদি এই গল্পে সর্বহারা জীবনের যে ভাষ্য রচনা করেছে, তার তুলনা মেলে না বিশ্বসাহিত্যের আর কোথাও। জীবনদরদী গোর্কীর 'মানুষের জন্ম' গল্পটিও কী অসামান্য? কী নিবিড় মমতায় আর্দ্র, ঘনীভূত! গোর্কীর প্রায় প্রতিটি লেখার মধ্যেই এই মমতা স্মরিত হয়েছে দেখা যায়।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো আর্ট থিয়েটারে যখন তাঁর নীচের মানুষ নাটকটি অভিনীত হল তখন চারদিক থেকে এত দর্শক জমা হল যে তা কহতব্য নয়।

গোর্কী মানুষের প্রতিটি গণসংগ্রামের সংগে নিজের আত্মার যোগ অনুভব করতেন। তাই ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিল পুলিশ ভেঙে দিলে গোর্কী লেখেন তাঁর বিখ্যাত রচনা ঝড়ের পাখি। গোর্কী গণআন্দোলনের অগ্রদূত কমরেড লেলিন ও স্তালিনের মতন কারাবাসও করেছেন বহুবার। ১৯০৫-এর বিপ্লবের ঝড়ে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত গোর্কী পীটাসবার্গের কুখ্যাত পীতর-পাভেল দুর্গে কারারুদ্ধ হন। তারপর দেশ থেকে বাসস্থান উঠিয়ে নিয়ে ইতালীর কাপ্রি দ্বীপে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু সেখানে থেকেও তিনি বলশেভিক আন্দোলনকে যথোপযুক্তভাবে সহায়তা করে গিয়েছেন। ইটালীর জাহাজী শ্রমিদের ইউনিয়নের সংগে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে তিনি এই সময় ওডেসাতে বিপ্লবী ইস্তাহার যাতায়াতের ব্যবস্থাটি ঠিক করে দেন। কাপ্রিতে গোর্কী বলতে গেলে অত্যন্ত ব্যস্ত জীবনযাত্রাই পরিচালিত করেছেন। এই সময়ই বিপ্লবীদের জন্য তিনি একটি ট্রেনিং স্কুল পরিচালনা করেন। মোটামুটি ১৯০৭ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত গোর্কী কাপ্রিতে কাটান। এই '৯০৭ সালেই প্রকাশিত হয় বিশ্ববন্দিত উপন্যাস 'মা'। এই উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯০২ সাল। রুশিয়ার এদিকে স্তোলিপিন প্রতিক্রিয়া সুস্থির হচ্ছে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নাস্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। গোর্কীর লেখার চড়াসুর, কড়া মেজাজ তাঁদের ভাল লাগছে না। না লাগারই কথা। জীবন বিমুখ স্বপ্নচূড়ার অধিবাসী তাঁরা। মানুষের সংগ্রামের সংগে সাযুজ্য বর্তমান রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব কী করে? মানুষের সংগে দূরব্যবধান বজায় রেখেই যে তাঁরা মগ্ন থাকতে চান। নির্মম সময়গ্রন্থী তাঁদের জাগাতে চাইলেই যে মুশকিলের কথা। কিন্তু জনসাধারণ যখন গোর্কীর প্রতি অস্থির অনুরাগী তখন তাদের সংগে ব্যবধান বজায় রেখে কোন মতেই চলে না। কমিউনিষ্টদের সর্বত্র মিল না হলেও গোর্কীর কমিউনিষ্টদের কাগজে লিখতে কোন রকম বাধা ছিল না।

গণজীবনের বিকার বিক্ষোভ, মনোবিকলন ইত্যাদি সবকিছুই গোর্কী দেখেছিলেন। জীবনের কাঁচা ও কঠিন রূপ তাঁর অভিজ্ঞতাতে সঞ্চিত হয়েছিল। এই পর্বের লেখা মাকার চুদরা (১৮৯২), ঝড়োপাখির গান, কুমারী ও মৃত্যু, আমার সহযাত্রী মালভা, ভেলায়, আর্তমানেভ ব্যবসায়

ইত্যাদি সর্বহারা জীবনের অভ্রান্ত ভাষ্য রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে গোর্কীর জীবনযন্ত্রণা ও জীবন জিজ্ঞাসা তার যথার্থ স্বরূপ ধরা দিয়েছে। বাস্তবাদিতা, বিপ্লবের প্রতি আস্থা, খ্রীষ্টীয়দাস্যবাদ, আত্মনিগ্রহ ও আত্মসমর্পণের প্রতি ঘৃণা গোর্কীর এইসব লেখার মধ্যেই অনুভব করা যায়। এখানে মানুষ ও তার সমাজকে যেন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন গোর্কী। কিন্তু কোথাও মানুষকে ঘৃণা করেননি তিনি। মানুষের মহিমাকেই সর্বদা মহিমান্বিত করেছেন।

ফোমা গরদেয়েভ (১৮৯৯) গ্রন্থে রুশ পুঁজিতন্ত্রের ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন গোর্কী।

তারপর ১৯০৭-১৯১৭র বিপ্লবের বছরগুলি। গোর্কী নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত নিয়তির মতন এখানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সময় বার হয় তাঁর জীবন কথার দু'খণ্ড। এই জীবন কথায় গোর্কী এঁকেছেন তাঁর দিদিমার চরিত্রটি। চারিদিককার নিষ্ঠুরতার মমতায় আর্দ, মানবতায় ঘনীভূত চিরন্তন নারীচরিত্র। ছোটছোট তুচ্ছকথা, সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে ডায়ারির নোটসে অসংখ্য অনামিকার কথা বলেছেন গোর্কী।

রিক্ততা, দারিদ্র্য, নিষ্ঠুরতা,—এই পটভূমিকাতেই গোর্কীর প্রায় সব লেখাই বিস্তৃত। অকুরোভশহর, ম্যাথুকোঝোমিয়াকিনএর জীবন গোর্কীর আত্মপ্রত্যয় ও ভবিষ্যৎচিন্তার অভ্রান্ত দর্পণ। ক্র-দুটি রচনার মধ্যে দিয়ে আমরা গোর্কীর স্বদেশের প্রতি দুর্মর ভালবাসার দিকটি লক্ষ্য করে থাকি।

গোর্কীর শেষ পর্বের লেখা আর্তমানেভ ব্যবসায়, ক্লিমঘামাগিনের জীবনী। এতেও গোর্কীর সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসার দিকটি উপেক্ষিত হয়নি।

সর্বহারাদের প্রতি অগাধ আস্থা ছিল তাঁর। শুধু শ্রমিক কৃষাণ নয়, আদিম প্রাণপুষ্ট সকল মানুষের প্রতিই। মতের স্বাধীনতা, জীবনের অবাধ স্ফূর্তির কথা গোর্কী বহুবার উচ্চারণ করেছেন।

রাশিয়ার বিপন্ন লেখকদের জন্য গোর্কীই খুলেছেন জনানীয়ে (জ্ঞান) প্রকাশালয়। তাতে বহুলোক কাজ পেয়েছে। জীবিকা অর্জন করেছে।

জীবনের সংগে গোর্কীর চিরকাল যোগাযোগ এতই অব্যাহত ছিল যে পরবর্তীকালে যখন তিনি সোভিয়েত সাহিত্যনীতি প্রস্তুত করেন তখন 'সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার' দিকে দৃষ্টি দিতে একবারও ভুল করেন না।

শিল্পী হিসেবে গোর্কীর সার্থকতা নিতান্ত কম নয়। তার কারণ হল, যে জীবনকে তিনি দেখেছেন, যে জীবনের সান্নিধ্যে তিনি বারবার এসেছেন তাকেই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। গোর্কী কোন কালেই জীবনকে বাদ দিয়ে শিল্পের কথা ভাবেননি। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকর্মে যেন আমরা তাই সমকালীন রাশিয়াকেই খুঁজে পাই। যে জীবনকে তিনি দেখেননি, যার কোন কথাই তিনি চিন্তা করেননি তার বিষয় লেখেনও নি। ভাবালুতার সূতাজাল বিস্তার করে কোথাও তিনি তাই তাঁর বিষয়বস্তুকে আচ্ছন্ন করবার কথা চিন্তা করেননি। মানুষের মুখর মিছিলে গোর্কী গল্প খুঁজে পেতেন। নীচের তলার মানুষের প্রতি প্রচণ্ড প্রেমে গোর্কীর হৃদয় উদ্বেলিত ছিল। তাদের জীবনযাত্রার প্রতি ছিল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলেই তিনি কলম ধরেছিলেন। (১)

গোর্কীর জীবনের সঙ্গে শিল্প মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। জীবনের বাস্তবরূপায়নই হয়েছে তাই তাঁর স্বষ্ট সাহিত্যকর্ম। এ ব্যাপারে শিল্পী হিসেবে গোর্কীর কোথাও স্বধর্মচ্যুতি ঘটেনি। কল্পনার ডানামেলে কোন দূর নক্ষত্র লোকে রোমান্টিক বিহার নেই তাঁর লেখায়। জীবনবাদী লেখক ছিলেন তিনি। আর এই জীবনও মূলতঃ শোষিত শ্রেণীর জীবন। সর্বহারাদের একবারে নিজস্ব লেখক ছিলেন তিনি। মূঢ় ম্লান মূক মুখের মুখর কলরব ছড়িয়ে আছে তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই। নিত্যই যারা ঘৃণিত ও পদানত তাদের কথাই ভীড় করে এসেছে গোর্কীর লেখাতে। জীবনের প্রতি অনুরাগে তিনি অনিবার্যশক্তি প্রবল লেখক। (বিংশ শতকের রক্ত প্রভাব : গোর্কির দান ॥ রুশ সাহিত্যের রূপ রেখা ॥ গোপাল হালদার ॥ পৃঃ ২৭.)

গোর্কী শিল্পসাহিত্যে এক নূতন রোমান্টিকতা আনয়ন করেন। এ রোমান্টিকতা বাস্তবেরই ভূমিতে জন্মলাভ করেছে। বিপ্লবীর রক্তে রাঙা হয়ে নবরূপে প্রকাশিত হয়েছে। একেই সম্ভবত বলা হয়েছে "বিপ্লবীরোমান্টিকতা"।

বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে গোর্কীর দান কতটুকু, সে বিচার একদা হয়েছে। আজও হচ্ছে এবং আগামী ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ভাবে হবে। কিন্তু গোর্কী মানবতার ইতিহাসে যে একটি উজ্জ্বল অবদান,—এ বিচার সমাপ্ত এবং সর্বসংবাদী।

আগামী দিনে পৃথিবীতে যে দিন সর্বহারাদের জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্ধারিত হবে এবং অধুনাতম শোষকগোষ্ঠি কোণঠাসা হবে সুনিশ্চিত, সেইদিন একমাত্র গোর্কীই হবেন ভবিষ্যৎ পথিকৃৎদের সহায় ও সম্বল এবং যথোপযুক্ত স্থির এবং স্থায়ী উত্তরাধিকার।

এখন আমরা তারই পূর্বসূত্ররূপে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রমাগত নিয়ে আসতে থাকবো মানবতাবাদের মহতী সংক্রামক। বারবাব নিয়ে আসতে থাকবো।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

১. মানুষের প্রতি তার শ্রদ্ধার অন্ত নেই, নীচের তলার মানুষের প্রতি বিশ্বাসের থৈ পাওয়া যায় না।

: ঋণস্বীকার :

১। The Novel and the People : Ralph Fox

২। Maxim Gorkey and his Russia : A Kann. New York 1931, London 1932

৩। The Concise Encyclopaedia of modern world Literature : Edt Geoffrey Griegson, Hutchinson.

৪। রুশসাহিত্যের রূপরেখা : গোপাল হালদার।

ভারতী নিবেদিতা ॥ মালতী গুহ রায়। বাক্‌-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
মূল্য : ছয়টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষ স্বমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে সারা বিশ্বের দরবারে তার স্বতন্ত্র আসন অধিকার করেছিল একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য। এই স্বতন্ত্র আসনে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কত মহাপ্রাণ বাঙ্গালী, তথা ভারতবাসীকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে; স্বদেশের জন্য স্বদেশবাসীর আত্মত্যাগ—এতো স্বাভাবিক। কিন্তু এই অধঃপতিত, পরাধীন ভারতের নির্বাপিত দীপশিখাকে প্রোজ্জ্বল করার অভিপ্রায় নিয়ে যে কত বিদেশী মহাপ্রাণ তাঁদের অস্থি দিয়ে বজ্রাগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন সে ইতিহাস অনেকেরই অজানা। বিদেশিনী এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল এমনই একজন মহাপ্রাণা মহিয়সী নারী যিনি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দুঃখী ভারতমাতায় চোখে প্রসন্নতার দীপ্তি এঁকে দিয়েছিলেন। এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল স্বামী বিবেকানন্দের এক অমূল্য আবিষ্কার। সুদূর আয়র্লণ্ডের কন্যা পরবর্তী কালে বেলুড় মঠের দীক্ষিতা ব্রহ্মচারিণীরূপে ভারতবর্ষের সেবায় শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে গেছেন। স্বামীজীর দিব্য দৃষ্টিতে এই বিদেশিনীর ভবিষ্যত ধরা পড়েছিল, তাই দীক্ষান্তে যথার্থই তার নামকরণই করেছিলেন—নিবেদিতা। 'নিজেকে এমন করিয়া নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই'—স্বামী বিবেকানন্দের প্রদত্ত নামের ব্যাখ্যা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে সার্থক ভাবে লক্ষ্য করা যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও বলেছেন—'এত বড় স্রষ্টা গুরুর এত বড় দ্রষ্টা শিষ্যা জগতে আর হয়েছে বলে জানি না।'

সারা ভারত পরিভ্রমণ করে স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের লুপ্ত গৌরব, মহান্ ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার অর্থাৎ দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করছে ভারতীয় নারী জাগরণের ওপর। অথচ এই বৃহৎ নারী সমাজ কুসংস্কারের বেড়াজালে, অজ্ঞতার অন্ধকারে আবদ্ধ। শিক্ষার মন্ত্র ছাড়া এ জাগরণ অসম্ভব। শিক্ষার প্রদীপ হাতে স্নিগ্ধ এক কল্যাণময়ী নারীর প্রতিমূর্তি গড়েছিলেন মনে মনে স্বামীজী। নিবেদিতার মধ্যে তারই প্রতিভাস দেখে বিবেকানন্দ তাঁকে আহবান জানিয়েছিলেন ভারতবর্ষে।

ভারতীয় নারী জাতির প্রকৃত শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন তিনি নিবেদিতার ওপর। সুদূর ইংলণ্ড থেকে নিবেদিতা শিক্ষাব্রতী রূপে এলেন ভারতবর্ষে। কিন্তু শুধু ভারতের স্ত্রীশিক্ষাচিন্তাতেই তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন নি। ভারতের অন্যান্য সমস্যার দিকেও নিবেদিতার দৃষ্টি পড়েছিল। যেখানে যা কিছু অভাব সেখানেই এগিয়ে গিয়ে নিজের সাধনায় তা পূর্ণ করেছেন। ভারতের শিল্প-সাহিত্য বিজ্ঞান নিবেদিতার সাহচর্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ

অসিত-নন্দলাল, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্র সবাই স্বীকার করেছেন নিবেদিতার শুভ নির্দেশ ও ঐকান্তিক প্রেরণার কথা। রাজনীতিতে নিবেদিতার ভূমিকাও একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। নেপথ্যে থেকে শ্রীঅরবিন্দকে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছেন। এই ভাবেই দেশের সকল কাজে নিজেকে জড়িয়েছেন নিবেদিতা।

স্বামীজীর মত বাগ্মিতা-শক্তিতেও নিবেদিতা ছিলেন অসাধারণ। তাঁর বাগ্মিতাগুণেই ভারতবাসীর জড়জীবনে এসেছিল প্রাণের স্পন্দন। লেখনীশক্তিও তার কম ছিল না। নিবেদিতার সাহিত্য-সাধনা নিছক কল্পনাবিলাস নয়। তাঁর রচনার মধ্যেই সমাজচেতনার পরিচয় পরিস্ফুট, জন শিক্ষাই ছিল তাঁর সাহিত্য-সাধনার অন্যতম অঙ্গ। গুরুমন্ত্রে দীক্ষিতা হয়ে গুরুকে গভীরভাবে ভালবেসে একজন বিদেশিনী নারীর পক্ষে যে তাঁর গুরুর জন্মভূমিকেও এত আন্তরিকভাবে ভালবাসা যায়, তা নিবেদিতার লেখা বই না পড়লে ধারণা করাই সম্ভব হয় না; নিবেদিতার' Foot falls of Indian History ও The Web of Indian life—এই গ্রন্থ দুটি ভারতীয় জীবন ও সাধনার অমূল্য নির্যাস।

বহুমুখী প্রতিভা, অসীম কর্মশক্তি, অসাধারণ ত্যাগ, অপূর্ব সংযম, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র ও কৃচ্ছ্রতা বরণের বিচিত্র কথাই নিবেদিতার সমগ্র জীবনের ইতিকথা। তিনি স্বদেশ, স্বজন, স্বধর্ম ও সংস্কৃতি সবই বিসর্জন দিয়ে তাঁর মৃত্যুহীন প্রাণটুকুই নিঃশেষে ভারতবাসীকে দান করে গেছেন। মহীয়সী নিবেদিতার মৃত্যুহীন প্রাণের মন্ত্র রচনা আজও ভারতবাসী করতে পারেনি। মাত্র শতবর্ষ পরে নতুন করে তাঁর মহান জীবন-চর্যা সুরু হয়েছে। ভারতমাতা নিবেদিতার পরম পবিত্র উৎসর্গীকৃত জীবন নিয়ে সম্প্রতি যে কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীমতী মালতী গুহরায়ের 'ভারতী নিবেদিতা' শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

'ভারতী নিবেদিতা' ষাটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত প্রায় তিনশো পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একটি সুলিখিত জীবনীগ্রন্থ। ভগিনী নিবেদিতার বিচিত্র কর্মবহুল জীবনকথা রচনায় শ্রীমতী গুহরায় প্রকৃতই নিষ্ঠা ও শ্রমের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আয়র্লণ্ডের ভোগবাদী খ্রীষ্টান পরিবেশে এলিজাবেথ মার্গারেট নোবলের জন্ম ও শৈশবাবস্থা থেকে পরবর্তীকালে ভারতীয় ব্রহ্মচারিণী ভগিনী নিবেদিতার জীবনের সমগ্র ও সর্বাঙ্গীণ ইতিহাসটি কালানুক্রমিক রীতিতে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। যে কোন ব্যক্তির জীবনী রচনায় সার্থক হতে হলে লেখককে সেই ব্যক্তির সমকালীন পরিবেশে অর্থাৎ দেশের তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার; কেননা, যুগের প্রভাব কখনই উপেক্ষা করা যায় না। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি জীবনের স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পেতে পারে। এদিক দিয়েও শ্রীমতী গুহরায়ের গ্রন্থটি বৈশিষ্টমণ্ডিত। তিনি একদিকে যেমন মার্গারেটের শৈশব ও যৌবনের প্রারম্ভকালীন আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ডের পরিচয় দান করেছেন, তেমনি অপরদিকে ভগিনী নিবেদিতার শেষ দিন পর্যন্ত কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের তৎকালীন আবহাওয়ার কথা অত্যন্ত সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত করেছেন। ফলে জীবনীগ্রন্থ ঐতিহাসিক ঘটনায় সমৃদ্ধ হয়ে তথ্যনিষ্ঠ হয়েছে। গ্রন্থটিতে মাঝে মাঝে লেখিকার অতিরিক্ত আবেগে রচনাগত ভারসাম্য শিথিল হলেও একটা গভীর কৌতূহল পাঠক মনে শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে। ঘটনা

নির্বাচনে ও সজ্জীকরণে লেখিকার নাটকীয় কৌশলের কৃতিত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। আর একটি বিশেষ গুণে শ্রীমতী গুহরায়ের জীবনীগ্রন্থটি মূল্যবান, তা হল এই যে, ব্রহ্মচারিণী সাধিকা বিশ্বমনা, মহীয়সী দেশব্রতী নিবেদিতার রূপ ছাড়াও ঘরোয়া মানুষের সুখে দুঃখে সমব্যথী নিবেদিতার মানুষ রূপটিকেও তিনি বেশ নিপুণভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন।

শ্রীমতী গুহরায়ের শিল্পমণ্ডিত রচনাগুণে 'ভারতী নিবেদিতা' বাংলা জীবনীগ্রন্থের ভাণ্ডার যে সমৃদ্ধতর করবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

অধীর দে

কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়—অমল মিত্র॥ প্রকাশভবন, কলকাতা। মূল্য—ছয় টাকা।

একদা কলকাতা সহরের ভ্রূণাবস্থায় ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানীর মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁদের সামাজিক প্রয়োজনে ও অবসরবিনোদনের উদ্দেশ্যে কলকাতা সহরে প্রকাশ্য রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন না ছিল খবরের কাগজ, না ছিল তাঁদের বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা, না ছিল উপযুক্ত পরিবেশ, কিন্তু তবুও বৈচিত্র্যাভিলাষী রসপিপাসু ভাগ্যান্বেষী সুসভ্য ইংরেজ সওদাগরেরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তার পরিণতি সুদূর প্রসারী। আজ সেই প্রাসাদনগরী কলকাতা জনগণের শিক্ষা, রুচি, সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষ সাধনে নবনাট্য আন্দোলনের যাত্রাপথে সমগ্র ভারতের অগ্রদূত। বাংলা ভাষার প্রসার করেছিলেন মার্সম্যান কেরী প্রভৃতি ইংরেজ, শিক্ষার প্রসার করেছিলেন ডেভিড হেয়ার, আবার জনশিক্ষার বাহন নাট্যশালার দ্বার খুলেছিলেন কয়েকটি ইংরেজ সংস্থা। সেটা ১৭৫৩ সাল, তখন নবাব সিরাজদ্দৌলা সবেমাত্র রাজত্ব শুরু করেছেন। দুশো বৎসরের পূর্বেকার বিদেশী বণিকদের এই বাংলা তথা কলকাতার বুকে নাট্য আন্দোলনের মূল্যবান চমকপ্রদ ইতিহাস সত্যিকার নাট্যরসপিপাসুর কাছে পরম কৌতূহলের বিষয় এবং গ্রন্থকার সেই বিলুপ্ত ইতিহাস উপযুক্ত প্রামাণিক তথ্যাদিসহ পরিবেশন করে নাট্যামোদীমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। বিবিধ তথ্যের পরিবেশনে তাঁর বর্ণনাভঙ্গিও চমৎকার। গ্রন্থকার যে সরস ইতিহাস দিয়েছেন, তার থেকে বুঝা যায়,—ঐ সময়ে ইংরাজী কায়দায় ইংরাজী নাটকই অভিনয় হত; প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাটকের অভিনয়ের পথ প্রশস্ত করলেন রুশ ভ্রমণকারী হেরাসিম লেবেডেফ্ চল্লিশ বছর পরে ১৭৯৪ সালে। তার পরিণতিতেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা গিরিশ অর্দ্ধেন্দুর মত প্রতিভার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। অনেক অজ্ঞাত তথ্য উপন্যাসের মত সাবলীল ভাষায় পরিবেশন করেছেন।

ভারতের নিজস্ব নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যপ্রয়োগ বিজ্ঞানের সুপ্রাচীন ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও বাঙালী ইংরেজের অনুকরণে বিলিতী কায়দায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেন কেন,' এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ভারতের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের প্রয়োগবিজ্ঞান দেশকাল ও সমাজের আদৌ উপযোগী ছিল না।

সেই প্রাচীন ধারার সমর্থন পেয়েছে বর্তমান যাত্রা অপেরাদির সংশোধিত কারুকর্মে। প্রকৃত নাট্যাভিনয় বা থিয়েটারের জন্মদাতা বিদেশী কলারসিকগণ কারণ-এর মধ্যে প্রকৃত নাট্যশিল্প, সাহিত্য ও মননশীলতার প্রয়োগবিজ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্র প্রসারিত। এজন্য আমাদের গৌরবহানিকর কিছুই নাই, বরং এই নাট্যকলাই জাতির অগ্রগতির পরিচায়ক। তখনকার দিনে প্রায় ১২৫ বছরের মধ্যে ইয়োরোপীয়ান কালচারের জোরে যে নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত হল—তার সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিত ধনী বাঙ্গালীরাই সহযোগিতা করেছিলেন ; অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের কোন যোগসূত্র ছিলনা বটে, কিন্তু প্রকৃত নাট্যপ্রতিভাশালী বঙ্গসন্তানেরাও নিজেদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির প্রভাবে তাঁদেরই আদর্শে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন ; ইংরেজী শিক্ষিত মাইকেল মধুসূদন-এর পথ বেঁধে দিয়েছিলেন।

এই গ্রন্থের লেখক ও সংকলক সেই বিলিতী আমলের নাট্য আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় রসপিপাসু যুবকযুবতীর আভ্যন্তরিক সমাজে যে বিরহ প্রেম ও রসোল্লাসের বর্ণনা দিয়েছেন তাও বর্তমান বাঙালী সমাজে উপভোগ্য। নটশ্রেষ্ঠ গ্যারিক প্রমুখ ইয়োরোপীয় নটনায়কগণও যে তৎকালীন কলকাতার নাট্যআন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন এবং তৎকালীন ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি যেভাবে ঐ নাট্যআন্দোলনের গঠনমূলক সমালোচনা করতেন সেই মূল্যবান তথ্যগুলিও আজকার দিনে দারুণ শিক্ষাপ্রদ। ইংরেজী থিয়েটারের বহু তথ্য, বহু আন্দোলনের ধারা ও দুস্তর তপস্যার কাহিনী নিপুণ গ্রন্থকার এমন সরসভাবে বর্ণনা করেছেন এবং প্রাসঙ্গিক অসংখ্য উদ্ধৃতি পরিবেশন করেছেন, তার থেকে এই গ্রন্থখানি বর্তমান নাট্যামোদীগণের কাছে মূল্যবান সম্পত্তিরূপে গণ্য ও জনপ্রিয় হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই গ্রন্থে অসাধারণ প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী মিসেস লীয়ের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বিদায়কালীন মর্মস্পর্শী সুন্দর কবিতাটি (পৃ: ৭০-৭৩) অনেকবার পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। সেই সংশ্রবে তুলনীয় নটশ্রেষ্ঠ গিরিশচন্দ্রের অনবদ্য কবিতাটির আংশিক উদ্ধৃতিটুকু দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি—

'যদি ধন প্রয়োজন না হইত কদাচন
　　রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন ?
বিমল কবিত্বআশে কেহ রঙ্গালয়ে আসে,
　　কেহ-হেরে কামিনীর কটাক্ষ লক্ষণ।
আসি এই রঙ্গস্থলে কতলোক কতবলে
　　সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন।
কাব্যে যার অধিকার, দাস তার তিরস্কার—
　　অকপটে কহে, করে মস্তকে ধারণ।
সুধীজন পদধূলি রাখি আমি মাথে তুলি
　　তিরস্কার তাঁর দোষবারণ কারণ।
এন্‌কোর ক্লাপে যাঁর আছে মাত্র অধিকার
　　তাঁরো আজি করি আমি চরণবন্দন।

সবিনয়ে কহে ভৃত্য, নহে বারাঙ্গনানৃত্য।
মেঘনাদে বীরমদে বিপুলগর্জন।'

কবিতাটি মাইকেলের মেঘনাদ বধের সংশ্রবে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন। তার বাংলার নাট্যশালার জন্মদান সার্থক হয়েছে। নাট্যশালার সংগঠনের যুগে নাট্যামোদীদের মনোমালিন্যে ব্যথিত গিরিশচন্দ্র দর্শকদের কাছে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যে মর্মস্পর্শী গানটি লিখেছিলেন, সেই করুণ সংগীতটী শ্রীঅমল মিত্র মশাইএর এই বই পড়তে পড়তে বারবার মনে হল—

'কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়
সাধি ওহে সুধীব্রজ ভুলোনা আমায়।
এসভা রসিক মিলিত হেরিয়ে অধিনীয়িত
আধপুলকিত চিত, আধ হতাশ শুকায়।

নির্মাইয়া নাট্যালয় আরম্ভিব অভিনয়
পুনঃ যেন দেখা হয়—এ মিনতি পায়।'

গ্রন্থকারের কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় বই পড়ে আমাদের সেকেলে স্বদেশী রঙ্গালয়ের নবযুগের অনেক কাহিনী মনের মধ্যে ভিড় জমাচ্ছে।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 May '68 (0'50) Central Regd.No. R.N.2602/57 SAMAKALI

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ষোড়শ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

আনন্দে
উৎসবে
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিণামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

জ্যৈষ্ঠ তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

রূপে
রসে
গন্ধে
ভরা
সুন্দর মিষ্টি গন্ধ
আপনার মন ভরে
দেবে সহজ খুসীর
স্নিগ্ধ আনন্দে।
Basant Malati
বসন্ত
মালতী
সি কে সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
KALPANA B.M.128

জ্যৈষ্ঠ
তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন

ষোড়শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

বটতলার বইগুলো

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বটতলার বইয়ের যুগ শুরু হয়েছিল ১৮২০ সালের কাছাকাছি। বটতলার বিভিন্ন বইয়ের নামোল্লেখ করতে গেলেও মহাভারতের সৃষ্টি হবে। আমরা বটতলার বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ কয়েকটি 'ঐতিহাসিক' বইয়ের কথা বলব। প্রথমেই বটতলা ও 'বাবু' যুগের সহজসান্নিধ্য প্রসঙ্গে বাবু চরিত্রের লক্ষণাক্রান্ত বইয়ের কথা ধরা যাক। রামমোহনের সম্বাদকৌমুদী থেকে মতান্তরের ফলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করতে থাকেন। ১৮২২ সালের ২৩শে মার্চের আগেই তাঁর সমাচার চন্দ্রিকার দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ভবানীচরণের জীবনী অনুযায়ী 'নববাবু বিলাস' তাঁর প্রথম রচনা। ভবানীচরণের দ্বিতীয় রচনা 'কলিকাতা কমলালয়' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৩৭ সাল বঙ্গাব্দ ১৮৩০ সালে। অর্থাৎ নববাবু বিলাস প্রকাশিত হয়েছিল তার আগেই। অবশ্য ১৮৫৩ সালের বটতলা সংস্করণের আগে নববাবু বিলাসের কপি আজও 'আবিষ্কৃত' হয়নি। তবু লক্ষণীয় শ্রীরামপুরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ১৮২৫ সালের প্রকাশিত সংস্করণের সমালোচনা করে লিখেছেন 'the Amusements of the Modern Babu a work in Bengali, Printed in Calcutta. নববাবু বিলাসে ভবানীচরণ 'হঠাৎবাবু'দের চরিত্র চিত্রণ করেছিলেন। লঙসাহেবের তালিকা অনুযায়ী নববাবু বিলাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৩ সালে। মুনসী আবদুল জরিমের মতে নববাবু বিলাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৮ সালে। অর্থাৎ আলালের ঘরে দুলাল রচনার অনেক আগেই নববাবু বিলাস প্রকাশিত হয়ে একাধারে বটতলা ও বাবুর ঐতিহাসিক প্রথম সাক্ষী হয়ে রয়েছে। স্বয়ং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই বহু সচিত্র বই প্রকাশ করেছেন কিন্তু 'বাবু' সম্পর্কে বটতলায় এই প্রথম লিখিত

আলোকপাত। ১৮৫৫ সালে লঙ তাই নববাবু বিলাসকে one of the ablest Satires on the Calcutta Babu, as he was 30 years ago বলেছেন। নববাবু বিলাস যে বটতলারই অবদান তার পরোক্ষ প্রমাণ এর অজস্র সংস্করণ। শুধু তাই নয় ১৮৫৭ সালে এর বটতলা সংস্করণের সঙ্গে এর একটি নাট্যরূপ প্রকাশিত হয়ে-বটতলার ব্যবসাভঙ্গীকে উজ্জ্বল করেছে।

বটতলার বইয়ের বিষয়বস্তু (plot) বুঝতে গেলে চিৎপুর রোড, সোনাগাছি ইত্যাদির সামাজিক গুরুত্বও জানা দরকার। পৈতৃক ধনে ধনীবাবুর কুৎসিত ভোগবিলাসের সঙ্গে বটতলারই পড়সীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, উপরন্তু বাবুদের বসবাসও সারা চিৎপুর রোডের ধারে ধারে। খিস্তি খেউড় খেমটা আখড়াইয়ের আটচালাও এই পল্লীতেই।

এই ভৌগোলিক আত্মীয়দের পরিচিতি, সুস্পষ্ট হতে পারলে বাবুকে চিনতে সুবিধা হবে বিলক্ষণ। 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমীদান, আড়িযুড়ি কানন ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ।' এই উপদেশে দীক্ষিত করে নতুনবাবুকে উপদেষ্টা, 'উত্তম বুদ্ধিমতী পরম ধার্মিকা বকনাপ্যারী'র কাছে নিয়ে যায়। 'জনসমাজ পূজ্যা বারাঙ্গনা ধন্যা' প্যারী নামটি বটতলার বইয়ের বহু পতিতা চরিত্রেই স্থান পেয়েছে। এযুগে বটতলাতে লেখকরা বড় বেশি কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে বাস্তব অনুসরণ করতেন বলেই প্যারীর অস্তিত্বে কৌতূহল হয়। ১৮৭০ সালে গরাণহাটা ষ্ট্রীটেই লক্ষ্মীরাণী প্যারীর উল্লেখ মধুসূদনও 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় করেছেন। যাই হোক 'দীক্ষান্ত ভাষণ'টি 'ঐতিহাসিক'। 'যত প্রধানা নবীনা গলিতা যবনী বারাঙ্গনা আছে ইহাদিগের সর্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবা, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনাদিগের (যাহাদের) বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা, কারণ পলাণ্ড অর্থাৎ পৈয়াজ রসুন যাহারা আহার করিয়া থাকে তাহাদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবা এমত কোন কিছুতেই পাইবা না। যদি বল যবনী বেশ্যা গমন করিব ইহাতে পাপ হইবেক তাহা কদাচ মনে করিবা না। সুখজনক কর্ম করিলে যদি পাপ হইবে তবে কি শ্রীশ্রী৵ সুখসাধন ইন্দ্রিয়কে সজনক কর্মে নিযুক্ত করিতেন।...অতএব বাবু তোমাকে কহিতেছি তুমি সর্বদা যবনী বারাঙ্গনা সম্ভোগ করিবা'। যবনী সম্ভোগ সম্বন্ধে মাইকেলও বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ তে একই বক্তব্য বসিয়েছেন ভক্তপ্রসাদের মুখে। শোনা যায় যবনী সম্ভোগের এ রীতি মাইকেল তাঁর কোন পরিচিত চরিত্রে লক্ষ্য করেছিলেন। ভক্তপ্রসাদ নাকি তাঁর কোন আত্মীয়। অবশ্য রামগতি ন্যায়রত্ন ব্রাহ্মণের নামে এই অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন ব্রাহ্মণ বহু কুকাজ করলেও এ ধরনের 'জাতিভ্রংশকর' কিছু করতে পারে না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মাইকেল ভক্তপ্রসাদকে সমর্থন করেছেন।

নববাবু বিলাস নিয়ে আর আলোচনা করার দুঃসাহস না থাকায় বোধ হয় এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে সমগ্র বইয়েই এই বক্তব্য, আর ভবানীচরণের নববিবি বিলাস, দূতীবিলাস বই দুটি আরও অশ্লীল। অবশ্য গ্রন্থ রচয়িতা ভবানীচরণের বিপরীত সত্তার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর রক্ষণশীল প্রয়াস 'শুদ্ধ' ভাবে শ্রীমদ ভাগবৎ প্রকাশনায়। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মন নিয়ে ভবানীচরণ সেখানে ব্রাহ্মণ কম্পোজীটার ও গঙ্গাজলে গোলা কালি দিয়ে ছাপান বইয়ের দাম করেছিলেন চল্লিশ টাকা। ব্যবসায়ী ভবানীচরণই বটতলার আসল রূপায়ন। বটতলার একদিকে আদিরসের ঘোলাটে নর্দমা

অপরদিকে অনাদিরসে প্রেষ্টিজ পাবলিকেশন। একই নদীর এই দুই তীরের মাঝে তরী-বটতলা একচক্ষু হরিণের মত কেবল লাভের লোভে বই ব্যবসায়।

বটতলার প্রথম ব্যবসায়ী গঙ্গাকিশোর এবং স্কুমার সেনের মতে শেষ শিল্পী কালীপ্রসন্ন সিংহ। কালীপ্রসন্নও মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন তাঁর নক্সার সঙ্গে। যদিও প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর ভবানীচরণ সুলভ লাভের উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্র ছিল না। কিন্তু ডঃ সেনের মতে 'ভক্তেরা কি বলিবেন জানি না ভবানীচরণ ও কালীপ্রসন্ন একই ধরনের সাহিত্যিক ছিলেন'। সম্ভবতঃ এটা স্থূল বিশ্লেষণ কারণ ভবানীচরণ লোভী ব্যবসায়ী, কালীপ্রসন্ন ধনী ও ঘোর 'বাবু'। তাই কালীপ্রসন্ন মহাভারত বিলিয়েছেন, নকসাও বিক্রী হয়েছে পয়সায় দুখানা। কালীপ্রসন্নের এই মহাভারতই বটতলায় ধর্মগ্রন্থের দাম টেনে নামিয়ে এনেছে। কালীপ্রসন্নের আশ্রিত এক বালক (প্রতাপচন্দ্র রায়) এই বই বিলোবার দৃশ্য দেখে পরবর্তী জীবনে বটতলার ধর্মগ্রন্থের এক বিরাট পাবলিসার হয়ে উঠেছিলেন।

বটতলায় এই ধর্মগ্রন্থের আয়োজনের পিছনে এক সুদীর্ঘ প্রয়োজনের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। বটতলায় তখন ধর্মগ্রন্থ বলতে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থই বোঝাত। লঙ সাহেবের তালিকায় ধর্মগ্রন্থ বলতে প্রায় সব বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থই বুঝিয়েছে। শ্রীরামপুরের পাদ্রী পুস্তক আলো ছড়াতে চাইতো কলকাতার আলোকিত ধনী মহলে, কিন্তু রক্ষণশীলতার দুর্গে অর্গল বদ্ধ হিন্দুধর্ম তখন আচারসর্বস্ব কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে—যার অপব্যাখ্যায় পুঁথির প্রয়োজন পড়ে না। কূপমণ্ডুক চণ্ডীমণ্ডপীয় হিন্দু বইয়ের নিন্দা করত কারণ বইয়ের চেয়ে বড় লোকপরম্পরা যুক্তিবিহীন বিশ্বাস যা তর্কে বহু দূর। 'আসল কথা এই যে সেকালে বাংলা সাহিত্যের খাঁটি খরিদ্দার ছিল বৈষ্ণব ঘরের লোকেরা। ভেকধারী বৈষ্ণবীরা ত বটেই, গৃহস্থের মেয়েরাও তখন লেখাপড়ায় দুরন্ত ছিলেন।'

এই প্রসঙ্গে বাংলার সামাজিক বিবর্তনের একটি বিরাট দিক লক্ষণীয়। এ যুগে 'বাবু' পুরুষেরা আমোদ প্রমোদের উপকরণ পেয়ে পরিতৃপ্ত—যার অভাবে চিকের আড়ালে অন্দরমহলের বাসিন্দারা স্বভাবতই কড়ি খেলা এবং পরে বই পড়ার দিকে মন দিয়েছিলেন। জীবনের ধর্ম অনুযায়ী এই সব আনন্দ বঞ্চিত নারী আদিরসাক্রান্ত বইয়ে আকর্ষণ সাধারণত বেশী করতেন না।

সবচেয়ে বড় কথা স্ত্রীশিক্ষার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার কিছু আগে থেকেই অন্দর মহলে শিক্ষার আলো অনুপ্রবেশ করছিল। আর এই লেখান পড়ানর দায়িত্ব পড়েছিল বৈষ্ণবীদের কাঁধে। পিতৃস্মৃতিতে সৌদামিনী দেবী লিখেছেন, 'আমাদের বাল্যকালে মেয়েদের লেখাপড়ার চর্চা বড় একটা ছিল না। বৈষ্ণব মেয়েরা কেহ কেহ বাংলা এমনকি সংস্কৃত শিক্ষা করিত তাহাদের নিকট শিখিয়া রামায়ণ মহাভারত এবং সেকেলে দুই একখানা গল্পের বই-পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করা হইত।...আমাদেরও প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম, এবং কলাপাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পর্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইয়াছিল।' বস্তুত এই বৈষ্ণবীরাই অন্দরমহলে ধর্মগ্রন্থের এক চাহিদা সৃষ্টি করেছিল। বলাবাহুল্য শিক্ষিতা বৈষ্ণবীরাই সংস্কৃত পুঁথি নকল করে বটতলাকে দিতেন।

লঙ সাহেব কলকাতায় এক বাংলা ও সংস্কৃত জানা বৈষ্ণবী বিধবার কথা উল্লেখ করেছেন যিনি পুঁথি নকল করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

মোটামুটি ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে লক্ষণীয় এর সামাজিক চাহিদা, বিক্রেতার অব্যবসায়িক মনের জন্য অল্পদাম যার ফলশ্রুতি অস্পষ্ট মুদ্রণ ইত্যাদি।

বটতলার অন্য শ্রেণীর বইগুলো রুচির প্রশ্নে আজ অশ্লীল হলেও ঐতিহাসিক আঙ্গিকে সেসব বইকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় কিনা সন্দেহের বিষয়। মনে রাখতে হবে এযুগে সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটেনি অথচ ফিরিঙ্গি বণিকের সহবাসে আমরা কিম্ভূত দেশী ইংরেজী জানায় অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়েছি। এই আধো-অজানার কুয়াশায় অর্দ্ধশিক্ষিতদের সদ্য জাগ্রত নবীন ক্ষুধা সর্বপ্রসঙ্গে। বলাবাহুল্য গঙ্গাকিশোর তখন প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করলেও ঠিক সংবাদপত্র পাঠের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়নি বরং প্রতিবেশীর (মানুষ দেশ সবকিছুই) সংবাদ জানতে আমরা উদ্‌গ্রীব। বিশেষতঃ সে সংবাদ যদি হয় আদিরস গঠিত এবং অকৃত্রিম পরচর্চার খোরাক। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক অত্যাচার—কয়েকজনের বিদ্রোহ, বৃদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপের হুংকার ও অবশেষে পরাজয় এই ইতিহাস ধারা সেদিন বটতলাকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। বহু সামাজিক আচারের বিবর্তনের সেই transition period-এ বটতলাই সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়েছিল, অবশ্য এ অত্যন্ত ক্ষুদ্র স্কেলে। সেযুগের সামাজিক সমস্যা কৌলীন্য প্রথা, অসমবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, এবং সর্বোপরি সতীদাহ থেকে বিধবাবিবাহের বিদ্রোহকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আলোচনা করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে। প্রথমেই বলে রাখা দরকার সতীদাহপ্রথা রোধের আন্দোলনে রামমোহন বটতলার সাহায্য পাননি। তবু সফল হয়েছিলেন। সতীদাহপ্রথা থেকে মুক্তা (১৮২৯ সাল থেকে) বহু বিধবা তখন সমাজে আরও বড় সমস্যার কার্বঙ্কল সৃষ্টি করলেন। বাংলাদেশের চরম সামাজিক বিকার পতিতাপ্রবাহ বস্তুত এদিক থেকেই সবচেয়ে বেশী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। অমৃতবাজার পত্রিকার (১৮৬৮ সাল) প্রথম সংখ্যাতেই দুশোটি পতিতার ইনটারভিউ প্রকাশিত হয়েছিল। এতে জানা যায় তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিধবা। অত্যাচার, দারিদ্র্য, জীবিকা—প্রণয়ী নির্বাচনে ভ্রান্তি, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই বিধবারাই সেদিন পতিতা পল্লীতে আশ্রয় পেয়েছিল। বলাবাহুল্য বটতলা সমাজ সংস্কারক প্রতিষ্ঠান নয়, বইয়ের ব্যবসায়ী মাত্র তারা পতিতার অতীত ইতিহাসকে আদিরসের কড়া ভিয়েনে চাপিয়ে উত্তেজক বই প্রকাশ করেছে বহু কিন্তু সমস্যা সমাধান করতে চায়নি বিন্দুমাত্র।

সমাজের বিভিন্ন ব্যভিচারের মধ্যে বোধকরি সর্বপ্রধান যৌনসমস্যা। এরমধ্যে অস্বাভাবিক বিবাহ, প্রেম প্রণয়, পতিতা সবগুলিই পড়বে। অস্বাভাবিক বিবাহ বলতে আমি যে বিবাহে কৌলীন্য প্রথা ইত্যাদি সামাজিক প্রথাগুলি অনিষ্ট করে তার কথাই বলছি। ইতিহাস গত ভাবে সংবাদপত্রবিহীন সেদিনের কলকাতায় সমাজের ব্যভিচার পরচর্চার খোরাক হিসেবে প্রথমেই স্থান পেত বারোয়ারী তলার সঙে। অশিক্ষিত মানুষেরা অন্যায়কে প্রতিবাদ করার প্রত্যক্ষ সাহস না থাকলে সাধারণত এ রীতি নিয়ে থাকে বলেই আজও গ্রামের মেলায় গাজনের সঙে গ্রামের ব্যভিচার স্থান পায়। মনে রাখতে হবে সে যুগের নীতির মানদণ্ড ছিল সম্পূর্ণ পৃথক।

পতিতা ও রক্ষিতা সম্পর্কে আজকের মত একই impression ছিল না। তারচেয়ে বড় কথা সেদিন গোপনতা গুণ বলেই বিবেচিত হত। যৌন সমস্যার সবচেয়ে নিন্দনীয় অধ্যায় ছিল 'ধরা পড়া'। এ সমস্ত প্রসঙ্গগুলো আলোচনার পক্ষে স্পষ্টতই অস্বস্তিকর বরং আমরা বারোইয়ারীতলার বিভিন্ন সঙের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলেই বটতলার বইয়ের নাম (title) ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা পাব।

যৌনসমস্যার যে প্রধান অঙ্গ অস্বাভাবিক বিবাহ তার জন্ম সমাজের অর্থহীন আচার ও অনুশাসনে। কৌলিন্য প্রথার তখন সর্বত্র জয় জয়কার। 'বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা' প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের দুর্দশা যে কতদূর হয়েছিল তার বিবরণ তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকট। 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় জানা যায় পূর্ববঙ্গে বারজন কুলীন আছেন তাঁদের সর্বসমেত ৬৫২টি বিবাহ। একজনের বিয়ে সর্বাধিক ৮০টি এবং আরেকজনের সর্বনিম্ন ৪০টি। সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন চূড়ামণির বয়স তখন সত্তর বছর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ' গ্রন্থে জানিয়েছেন পঞ্চাশ জন ব্যক্তি গড় পড়তায় পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে ১৬৬৮টি বিবাহ করেছিলেন। অর্থাৎ সেযুগে একশ্রেণীর কুলীনদের পক্ষে বিবাহ ছিল বৃত্তি। সম্বাদ ভাস্করে চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন অনেক কুলাভিমানী একটি পরিচারক রাখতেন তার স্ত্রীর সংখ্যা-তালিকা রাখবার জন্য। ভৃত্যের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি এক এক শ্বশুর বাড়ি যেতেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন-কুল সর্বস্বে জানা যায় যে শ্বশুরালয়ে ভিজিট দিলেও একটা নির্দিষ্ট ফী (ব্যভার) না পেলে স্ত্রী সহবাস করতেন না তাঁরা। এইভাবে 'বিবাহ বণিক' কুলীনদের কল্যাণে বাংলাদেশের কুলীন মেয়েরা এক নিদারুণ অতৃপ্তির জালে জড়িয়ে যেতেন—এবং কেউ কেউ 'উত্তর সাধক' পেলে গৃহত্যাগ ও পরিণতিতে পতিতাবৃত্তির পথ নিতেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে কৌলীন্য বংশগত রূপ থেকে অর্থগত রূপে বিবর্তিত হয়েছিল। বস্তুত কৌলীন্য ও পণপ্রথার সাঁড়াশী আক্রমণে সেদিনের বাংলার কুমারীরা যে দীর্ঘনিঃশ্বাস আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তারই শ্মশানভূমি ছিল বটতলা ও সোনাগাছি, যথাক্রমে সাহিত্যে ও জীবনে। প্রথমদিকে আদিম যুগের মত কৌলীন্য প্রথার ঠিক বিপরীত মতে মেয়ের বাবাই টাকা পেতেন পণ হিসাবে। কিছুদিন পরেই উলটে গেল মতটা বলেই কুলীন বৃদ্ধরাও 'দামী' হয়ে উঠলেন। কৌলীন্য ও পণপ্রথার ফসল হিসাবেই বাংলাদেশে তখন বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ অসমবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক দুর্বিপাক এবং সেই সঙ্গে ভ্রূণহত্যা, অনাচার, প্রভৃতি যৌন দুর্নীতি।

বটতলার প্রথম পর্বের বইগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি কিন্তু বটতলার স্বর্ণযুগে সামাজিক সমস্যাগুলো যে বটতলার বই-ব্যবসা শুরু হয়েছিল সেগুলোই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে মেয়ের মা পণপ্রথা বাবদ টাকা পেতেন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের রীতি অনুযায়ী। বাংলাদেশের নিচু জাতের সঙ্গে এই মাতৃতান্ত্রিক প্রথাটি একদা প্রচলিত ছিল।

বাল্যবিবাহ সমস্যাকে 'সমস্যা' রূপে বিবেচনা করাটাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক মত। স্পষ্টতই বোঝা যায় এ ক্ষেত্রে ফিরিঙ্গী সভ্যতার প্রভাবে পড়ে শিক্ষিত বাঙালী বাল্যবিবাহকে সমস্যা মনে করেছে ১৮৬০ সালের পর। ১৮৬০ সালেই শ্যামাচরণ শ্রীমানি বাল্যোদ্বিবাহ নাটক রচনা

করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে যখন consent bill গৃহীত হয় তখনই বটতলা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বারো বছর আগে কোন স্ত্রীর পক্ষে স্বামী সহবাস নিষিদ্ধ করার এই প্রস্তাবে রক্ষণশীল সমাজ চঞ্চল। '১৫ জ্যৈষ্ঠে যেমন আম পাকে না' তেমনি কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন মেয়ে সহবাসযোগ্যা হয়ে ওঠে না এই ছিল তাঁদের মত। অতএব এটা কোম্পানীর পক্ষে নাগরিকের শোবার ঘরে অনুপ্রবেশ। ১২৯৭ সালে সংবাদপত্রে জানা যায় এই বিলের বিরুদ্ধে গড়ের মাঠে বক্তৃতা ও কালীঘাটে যাগযজ্ঞও হয়েছিল। এই সময় বটতলায় বইয়ের স্রোত। রসরাজের 'সম্মতি সঙ্কট' থেকে হরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আইন বিভ্রাট' (১৮৯০) পর্যন্ত।

বাল্যবিবাহের পর অসম বিবাহ। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান যদি অস্বাভাবিক হয় তবে তা যৌন অতৃপ্তির কারণ হতে পারে। আমরা বিধবা বিবাহ আইন চালু হবার আগের সমস্যা নিয়ে যা বলেছি এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। বটতলা জানাল এইভাবে অতৃপ্তির থেকেই অনেক নারী নাকি পতিতাজীবন গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য কৌলীন্য প্রথা ও পণপ্রথা অসমবিবাহের কারণ। কুলনারীর ব্যভিচার ও অবৈধপ্রণয় দেখতে গেলেই বটতলা তাই অসমবিবাহের যুক্তি দেখিয়ে বাজার চাইত। 'এমন বরে বিয়ে দিয়েছে গোঁফ দাড়িটা পাকা' এহেন অজস্র ছড়া থেকে বোঝা যায় অসমবিবাহ সমস্যা একদিন মেয়েদের মুখে মুখে লোকসাহিত্যেও স্থান পেয়েছিল। 'খুড়ো দিলে বুড়ো বর' অথবা 'এত টাকা নিলে বাবা দুরে দিলে বিয়া' ইত্যাদিও বহু প্রহসনের টাইটেলে ব্যবহার করতে হয়েছে।

কৌলীন্য ও পণপ্রথার ফলে 'আপনা হতে জ্যান্তে মরা' বৃদ্ধের দল চিতায় শোয়ার লগ্ন পর্যন্ত বিয়ে করে চলতেন। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' ১৮৭৪ সালে এক অজ্ঞাত লেখকের প্রহসনের নাম। ১৮৭৬ সালে কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার রচনা করেন 'রামের বিয়ে'। বস্তুত এই সব অজস্র প্রহসনে সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত থাকত না বরং কুলনারীর ব্যভিচার, বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রীর মদ্য পান, অবৈধপ্রণয়, আত্মীয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, 'ব্রাহ্মমতে পুনর্বিবাহ', ইত্যাদিই বেশী স্থান পেত। অবশ্য এই সঙ্গে কুলীন বিবাহ-বণিক ব্রাহ্মণের ব্যভিচারও স্থান পেয়েছে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'আক্কেল গুড়ুমে বা কুলের প্রদীপে' (১৮৮২)। ১৮৮০ সালে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'অযোগ্য পরিণয়', শম্ভুনাথ বিশ্বাস 'কচকে ছুঁড়ীর গুপ্তকথা' (১৮৮৩) অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী 'কৌলীন্য কি স্বর্গ দেবে' এ সময়েই রচিত হয়। মনে রাখতে হবে অসমবিবাহের পরিণতি শুধু স্ত্রীর যৌন অতৃপ্তি নয় বৃদ্ধ স্বামীর স্ত্রৈণতাও বটে। ১৮৮৪ সালে রামকানাই দাস 'মার্গ সর্বস্ব' রচনা করেন। এই সময়ে বটতলার প্রফুল্লনলিনী দাসীর 'ষষ্টি বাঁটা প্রহসন' প্রকাশিত হয়। রচনার আধুনিকতায় আশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুমান রচনাটি কোন ছদ্মনামী পুরুষের। সেক্ষেত্রে এটি বটতলার অন্যতম 'stunt'। স্ত্রৈণ বৃদ্ধ প্রসঙ্গে ১৮৯০ সালে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'বুড়ো বাঁদর'-ও উল্লেখযোগ্য। ১৮৯২ সালে বটতলাতেই কৃষ্ণবিহারী রায় 'পশ্চিম প্রহসন' রচনা করেন।

এইভাবে বটতলা আপন ব্যবসায়িক স্বার্থে সেযুগের বহু সামাজিক সমস্যা নির্ভর করে বই প্রকাশ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজে সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার বহু বিচিত্র পরিস্ফুটন

হয়েছে বটতলার বইয়ে বইয়ে। অসম বিবাহের আরো একটি 'আধুনিক' কারণ পণপ্রথা। পণপ্রথাকে কৌলীন্য প্রথার মত 'পুর্বপুরুষীয়' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলেই আজও আইন রচিত হয় এ প্রসঙ্গে। বস্তুত শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সমস্যার হ্রাস হলেও পণপ্রথার উগ্রতা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। গেট বলেছেন 'the degree of B. A. is a very valuable asset in the matrimonial market। আগে কৌলীন্য প্রথার নামে যে অত্যাচার চলত, নাম বদলে এ যুগে তাই হল 'পাশ করার ডাকাতি'। মোহিনীমোহন সেনগুপ্ত তাই রচনা করলেন, 'পাশকরার ডাকাতি বা বরকন্যা বিক্রয়'। 'বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ববিদ্যালয়' এই গানটি বটতলার প্রহসন 'চোরের উপর বাটপাড়ি'-র অন্তর্গত। 'বহুবিবাহ' গ্রন্থে চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন 'এই ব্যবসায়ে যে ব্যক্তির পুত্র আছে সে অতি ভাগ্যবান কেননা এ উপার্জনে পরিশ্রম নাই, ইহাতে রাজস্ব নাই, রাজকর নাই।'

'বিয়ে ফাঁদতে কড়ি, ঘর বাঁধতে দড়ি' এই প্রবাদবাক্যে পণপ্রথার অশুভ দৌরাত্ম্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রসরাজ অমৃতলাল বসুর গানে 'পাঁঠা পাঁঠীর মত বেটা বেটী বেচাবেচি' নিন্দা করা হল। পণপ্রথার পরোক্ষ প্রভাবে আর এক অসম বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হল অযোগ্য পাত্রে অর্থলোভে কন্যাদান। অবশ্য এ ক্ষেত্রে পণপ্রথাটি আদিম। যখন কন্যার পিতাই কন্যা বিক্রয় করতেন এবং বরকর্তা ছেলের বিয়ে দিতেন marriage by purchase প্রথায়। ১৮৬৩ সালে কবি হরিশচন্দ্র মিত্র 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে' প্রহসনে এই ধরনের উদাহরণ দিয়েছেন। অর্থলোভে অপাত্রে কন্যাদানের উজ্জ্বল উদাহরণ দিয়েছেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলী বাঁধে' প্রহসনে। ভোলানাথ প্রসঙ্গ পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। ১৮৭৯ সালে হীরালাল ঘোষ 'রোকাকড়ি চোকামাল', গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'এই কি সেই' এবং দুর্গাচরণ রায় 'পাশকরা ছেলে' প্রহসন প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ সালে 'জনৈক শোত্রিয় ব্রাহ্মণ' প্রকাশ করেন 'অসুরোদ্বাহ' প্রহসন। এ সময়ই ১৮৭৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ 'নয়শো রুপেয়া', ১৮৭৯ সালে দুর্গাচরণ রায়ের 'পাশকরা ছেলে' ১৮৮৬ সালে রাধাবিনোদ হালদার 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' ১৮৯০ সালে রাজকৃষ্ণ রায় 'লোকেন্দ্র গবেন্দ্র প্রহসন', ১৮৯৩ সালে যতীন্দ্রচন্দ্র শর্মা 'কন্যাদায়', ১৮৯৬ সালে দুর্গাদাস দে 'ছবি' এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও 'কন্যাদায়' প্রহসন রচনা করেন এই পণপ্রথা প্রসঙ্গে। ১৮৮০ সালে রাধাবিনোদ হালদারের 'পাশকরা জামাই' প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সালে রসরাজের 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক বহু সমস্যার মধ্যে বটতলা কেবল নারীঘটিত সমস্যা (পণপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা ইত্যাদি) আলোচনা করেছে। শুধু তাই নয় এই সব সমস্যা তারা ভাঙ্গিয়ে ব্যবসা করতে চেয়েছে সমস্যা সমাধানের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। বটতলার ব্যবসায়ী মনের এই ধর্ম।

বটতলা নারীঘটিত সামাজিক সমস্যা অবলম্বন করে আধুনিক plot সমন্বিত কাহিনী বিন্যাস করলেও মূল লক্ষ্য ছিল তার যৌনসমস্যা। যৌনসম্পর্কের অস্বাভাবিকত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে উপাদেয়—বইয়ের hot saleএর ক্ষেত্রে সিওর সাকসেস মেড ইজি। বাংলার সামাজিক সমস্যা যে বটতলার লক্ষ্য ছিল না তার প্রমাণ বটতলায় বহুবিবাহ সংক্রান্ত বই প্রকাশিত

হয়নি। অথচ এ যুগে সমাজে বহুবিবাহ একটি মারাত্মক সমস্যা ছিল। কিন্তু এ সমস্যার পরিণতি হিসেবে সতীসাধ্বীর দেশে বিশেষ কিছু প্রকাশ্য বিদ্রোহ লক্ষিত হয়নি। কোন কাহিনীও শোনা যায় না যে সতীনের জ্বালায় কোন নারী পরপুরুষ অবলম্বন করেছে। সতীনদের মধ্যে জঘন্যতম 'বোন-সতীন' সম্পর্কে কুমারীকন্যা অজস্র ছড়া গেয়ে ব্রত পালন করেছে বটে কিন্তু কার্যকালে 'সুয়োরাণী দুয়োরাণীর' রূপকথা মত ঘাড় গুঁজে সংসার করে। বড়জোর আত্মঘাতিনী হয় কিন্তু পথে নামে না। বলা বাহুল্য বাংলার নারীর এই 'সতীত্বপনা' বটতলার চোখে লাভজনক বিবেচিত হয়নি। সমাজের এই উজ্জ্বল দিকটিই বটতলার অন্ধকারে তাই অসূর্যম্পশ্যা রয়ে গেছে।*

আমরা বার বার বলছি বটতলা সমস্যাকে ভাঙিয়ে পয়সা পিটতে এসেছে—সমাজ সংস্কার তার উদ্দেশ্য ছিল না। ১৮৬০ সাল নাগাদ মাইকেল মধুসূদন দত্তের নেতৃত্বে সমাজ-সংস্কারক গোষ্ঠীর সৃষ্টির সঙ্গে বটতলার স্বর্ণ যুগের অবসান হয়ে গিয়েছিল তবু বটতলা কোনদিন স্বধর্মচ্যুতির নাশ করেনি। আর বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার ব্যাখ্যায় যারা প্রথমে নেমেছিল বটতলায় তাঁরা কেউই ব্যবসায়ী ছিলেন না উপরন্তু নিজেরাই বাবু, নব্যবঙ্গ ছিলেন। বটতলা ব্যবসার সম্ভাব্য ক্ষতি আশঙ্কা করে এদের বহুভাবে ব্যঙ্গ করে নিরস্ত করতেও চেয়েছিল তাদের নতুন বইয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশে ইংরেজীয়ানার অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে। বিদেশী সভ্যতার সেই উত্তেজক মোহ বাঙালী যৌবনকে বলাবাহুল্য বিভ্রান্ত করেছে। চণ্ডীমণ্ডপীয় রাজত্বে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে 'উত্তাল মাতাল' নব্যবঙ্গেরা। সামাজিক বিন্যাস রীতি নীতি বিশ্বাস ইত্যাদি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। তাই চণ্ডীমণ্ডপ কখনই নব্যবঙ্গের অসভ্যতাকে স্বাগত জানাতে পারেনি। নতুন ও পুরনোর এই দ্বন্দ্বকেও বটতলা কাজে লাগিয়েছে। transition period এর ধর্ম অনুযায়ী এই পরিবর্তনের যুগটিও সমসাময়িক ব্যঙ্গ সাহিত্য ও প্রহসনে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে।

বটতলার সে সমস্ত বইগুলোর শ্রেণীবদ্ধরূপ ও বর্গীকরণ করতে গেলে নব্যবঙ্গের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নব্যবঙ্গের কাছে ডিরোজিও প্রথায় মদ্যপান কালচারেরই অঙ্গ। 'কারণ'-অধ্যুষিত দেশে অল্পস্বল্প মদ্যপান 'বিদ্রোহ' বলে বিবেচিত না হতেও পারতো, কিন্তু নব্যবঙ্গের উদ্ধত ভাবটাই ছিল তীব্র আপত্তিকর, যে-যুগে আশীবছরের বৃদ্ধও নব্বই বছর বয়স্ক গুরুজন দেখলে পিছন ফিরে হুঁকো খেতেন সেযুগে এই প্রকাশ্য কালচারচর্চা বলা বাহুল্য অসভ্যতা নয়—'বিদ্রোহ'। গোমাংস, মুসলমানের 'বণ'রুটি এবং মদ তখন পঙ্গুধর্মের শিকলকাটার প্রথম ধাপ। চোখ বন্ধ উন্নতিকামী ডিরোজীয়ানরা অন্ধ আবেগে সেদিন এইগুলোকেই শিক্ষার অঙ্গ ঠাউরে যে উন্মাদনার প্রকাশ করেছেন তা রাজনারায়াণ বসু (স্বয়ং অন্যতম নব্যবঙ্গ হলেও) 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে উপহার দিয়ে গেছেন। 'কলিকাতার যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী কি বড় মানুষ কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।' লিখছেন প্যারীচাঁদ মিত্র। সুরাপান নিবারিণী সমিতির নেতা প্যারীচাঁদ মিত্র সেদিন 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' প্রহসনের রচয়িতা। রাজকোষে এক্সাইজকর বাবদ আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানী নাকি শহরের যত্রতত্র মদের দোকান খুলতে অনুমতি দিয়েছিলেন এসময়।

কিন্তু শুধু মদ্য পানের বিদ্রোহ, বটতলায় লাভ নেই তাই সেই, স্ত্রীস্বাধীনতার বিকৃত ফলাফল

পাঞ্চ করে বটতলা জানালেন নব্যবঙ্গ নাকি স্ত্রীকে মদ্যপানে অভ্যাস করান কালচার মনে করেন। 'কলিকাতায় কোন কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত লোক আপন স্ত্রীকে মদ্যপান করাইতেন এবং স্ত্রী তাহা অস্বীকার করিলে প্রহার করিতেন।' অবশ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা হয়ে অনেক নব্যবঙ্গ নারীও মদ্যপান করতেন। বটতলার মতে তারা 'নেকাপড়া জানা' অথবা 'বেম্মজ্ঞানী'। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত 'সমাজ-সময়-সংস্করণ' প্রহসনে জানা যায় এক একজন গৃহবধূ নাকি মদ্যপানে স্বামীকেও টেক্কা দিতেন। অনেক নব্যবঙ্গ স্বামীর কাছে এ ঘটনা ফুলিয়ে গর্ব করে পাঁচজনকে শোনাবার মত বলেও বিবেচিত হত। নব্যবঙ্গে মদ্যপানকে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যঙ্গ করলেন অন্যতম নব্যবঙ্গ স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। বটতলায় অবশ্য তখন বইয়ের স্রোত শুরু হল। রামচন্দ্র দত্তের 'মাতালের জননীর বিলাপ', গোপালচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবার দাঁতে মিশি' প্রভৃতি প্রহসনে মদ গাঁজা ইত্যাদি বিবিধ নেশায় আসক্তির কথা বলা হল। স্ত্রীলোকের মদ্যপান প্রসঙ্গে কুঞ্জবিহারী বসুর 'তুই মা অবলা' (১৮৭৭) উল্লেখযোগ্য। সুরা ও সাকীকে বটতলা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে টুইষ্ট করেছে। মদ্যপান ও পতিতাগৃহে যাতায়াত সেখানে পাশাপাশিই ঘটেছে। ভৌগোলিক আত্মীয়কে বটতলা এইসব প্রহসনে যথাযোগ্য স্থান দিতে কোনদিনই ভোলেনি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে!

কৌলীন্য প্রথা পণ প্রথা প্রভৃতির জন্য বাংলাদেশে যে বাল্যবিবাহ অসমবিবাহ তা অস্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহের জনক। এছাড়া সতীদাহ প্রথা রোধ ও বিধবা বিবাহ চালু হওয়ার আগে পর্য্যন্ত অসংখ্য বিধবা সমাজে স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বস্তুত এইভাবে বাংলার ঘরে যৌনসম্পর্কের সম্ভাব্য দুর্বিপাককেও বটতলা কাজে লাগিয়েছে। ভ্রূণহত্যা, বিধবা আশ্রিতা আত্মীয়া সম্ভোগ ছাড়াও অনাচার (incest) ও বটতলার বইয়ে আশ্রয় পেয়েছে। হুতোমের নক্সার নকলে যে সাপ্তাহিক নক্সা প্রকাশিত হত তাতে ভ্রূণহত্যা প্রসঙ্গটি কুৎসিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বারোইয়ারী তলায় অন্দরমহলে এইসব কুৎসিত গোপনতাকে অবলম্বন করে সঙও বেরোত। বটতলা সবচেয়ে চালু সঙকে title করে বইও প্রকাশ করত। ১৮৬৭ সালে নিমাইচাঁদ শীল প্রকাশ করেন 'এরাই আবার বড়লোক' দুবছর পরে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রকাশ করেন 'চক্ষুদান'। মনে রাখতে হবে 'চক্ষুদান' শব্দটির লৌকিক একটি চলতি অর্থ থাকলেও বটতলায় শব্দটিতে 'চোখ ফোটান'র সাধু ভাষারূপে ব্যবহার করা হয়েছে। স্মর্তব্য, চক্ষুদান নামেই বটতলায় একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে।

সতীদাহ প্রথা রদ (১৮২৯) হবার পর বিধবা বিবাহ প্রথা চালু হবার আগে পর্য্যন্ত বাংলার ঘরে ঘরে বিধবারা যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন তা ইতিহাসগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখের বিষয় বটতলার অশ্লীল বইগুলো ছাড়া সে সমস্যার উত্তাপ অনুভব করার আর কোন উপায়ও নেই। এই বিধবাদের কেউ কেউ অন্দরমহলে নৈতিক ব্যাভিচারের কারণ হয়েছিলেন। কেউবা বিদ্যাসাগরের মতে উত্তর সাধকের সন্ধান পেয়ে গৃহত্যাগও করেছিলেন—বলাবাহুল্য উভয় ক্ষেত্রেই পরিণামে অপেক্ষা করত কলঙ্কিত পতিতা জীবন। অন্তত বটতলা সেইভাবেই এদের পরিণতি বর্ণনা করেছেন।

১৮৭১ সালে বিপিন বিহারী দের 'একাদশীর পারন' ১৮৭৩ সালে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মা এসেছেন', শ্রীনাথ চৌধুরীর 'আমি ত উন্মাদিনী' (১৮৭৪), রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুসরণে শ্যামলাল বসাকের 'ইহারই নাম চক্ষুদান (১৮৭০) প্রভৃতি বটতলার বই এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছে উত্তেজকভাবে। এই প্রসঙ্গে ১৮৮১ সালে রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'গোলক ধাঁধা' (১৮৮২) বেচুলাল বেনিয়ার সচিত্র 'হনুমানের বস্ত্র হরণ' (১৮৮৫) উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখেছি কি বিচিত্র পরিবেশে গৃহবধূ বা কুমারীকন্যা পতিতা জীবন গ্রহণ করে। বটতলায় তা দেখিয়েছে। এবার বটতলা তার সবচেয়ে বড় বইয়ের বাজার নিল পতিতার প্রসঙ্গে বই প্রকাশ করে। ১৩০২ সালের মাঘ মাসে ভারতী পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রঙ্গভূমির কর্তব্য প্রবন্ধে লিখেছেন 'অনেক বঙ্গীয়' যুবক যে বারাঙ্গনালয়ে গতিবিধি করেন, তাহা আধুনিক বঙ্গ সমাজে একটি বিশেষ অভাব অনুভব করিয়া। বাঙালী সমাজে অবরোধ প্রথার জন্য যুবক নিজের স্ত্রী ভিন্ন বিশেষ অন্য কোন রমণীর সহিত সদালাপ করিতে পান না। মাতা ভগিনী কন্যার সহিত শুদ্ধ কাজের কথা ভিন্ন কোন প্রকার ক্রীড়া রহস্য, বন্ধুভাবে তর্ক ও গল্প চলে না— সঙ্গীত চর্চার কথা দূরে থাকুক।...ইহার অভাব সে বড় বেশী অনুভব করে। এ অবস্থায় সে সৎনারীর সহিত সদালাপ ও সৎসংসর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া যদি কু-নারীর সহিত কাদালাপ ও কুসংসর্গ করিতে যায় বিচিত্র কি !' নিশ্চয়ই বিচিত্র নয়। বাবুদের এবং নব্য বঙ্গের ক্ষেত্রে এ তথ্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ঘরে স্ত্রী, বাঈজী, ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তারা যে পতিতাপল্লীতে যেতেন তা সর্বদা দৈহিক প্রয়োজনে নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় নারীকণ্ঠ, নারী হৃদয়, নারীচরিত্রের বিচিত্র আকর্ষণ তাঁদের টানত। যে-যুগে থিয়েটারে স্ত্রীচরিত্র মেয়েলী পুরুষ ও বালক দিয়ে অভিনয় করান হত। চিকের আড়ালে অন্দর মহলে অনেক ফোটা ফুল অনাঘ্রাতা অবস্থায় শুকিয়ে যেতেন। সেযুগে পতিতার প্রয়োজন পড়ত বিভিন্ন কারণে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে মাইকেল দেখিয়েছেন নব্যবঙ্গ পতিতা সংসর্গ করতো নিছক কালচারের জন্যই।

পতিতা গৃহে যাতায়াত যে কৃষ্টি ও কালচারের লক্ষণ তার প্রমাণ পাওয়া যায় আরও 'স্কুলবালকের বেশ্যাগমনে'। রাজনারায়ণ বসু দুঃখ করেছেন যে স্কুল বালকেরা সে সময় পতিতা গৃহে যাতায়াত করত নিয়মিতই। বটতলার স্কুলটি পতিতালয়ের নৈকট্যজনিত অসুবিধা থেকে মুক্ত হক এই সমস্যা একদা আলোচিত ও স্বতন্ত্রভাবে পুনরালোচনা সাপেক্ষ। স্কুলবালকের বেশ্যাগমন অবলম্বনে বটতলার বহু বই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। হরিহর নন্দীর 'শিখছ কোথা, ঠেকছি যথা', গোবর্ধন মুখোপাধ্যায়ের 'তুই যে সর্বনেশে গোবর্ধন', মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'ষ্টুডেণ্ট রহস্য' দ্বারকানাথ মিত্রের 'মুষলম কুল নাশনম' নলিনীলাল দাশগুপ্তের 'ভালবাসার মুখে আগুন' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অর্থাৎ পতিতার প্রতি আকর্ষণ এযুগে দৈহিক নয় 'সামাজিক' ও কৃষ্টিগত। রক্ষিতার বাড়ি করে দেওয়া যে যুগে সামাজিক সম্ভ্রম সে যুগে পতিতা নিন্দনীয়া ছিলেন কিন্তু অনালোচ্য নয়। পতিতার অতীত জীবন সে যুগের বটতলায় বেষ্ট সেলার। সধবার একাদশীর শেষাংশ অনুসরণ করে ১৮৭৯ সালে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'আমি তোমারই' রচনা করেন। শৈলেন্দ্রনাথ

হালদার লেখেন 'কলির শেষ' (১৮৮০) দীননাথ চন্দ লেখেন 'কমলাকাননে কলমের চারার আঁটি' (১৮৮০) পতিতার সঙ্গে প্রেম অবলম্বনে 'কেউ আঁধারে আলো' রচনা করতে না পারলেও পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য 'বিচিত্র অন্নপ্রাশন', সুধামাধব দাস 'দিল্লী কা লাড্ডু' অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'গাধা ও তুমি' (উপেন দাসের 'দাদা ও আমি' অনুকরণে) রচিত হয়েছে।

পতিতারা বটতলার বইয়ে সাধারণত অতীত জীবনে গৃহস্থ কুলবধূ হিসাবে চিত্রিত হয়ে থাকে। এর ফলে গৃহবধূ হিসেবে অন্দরমহলে অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক, পরে বাড়ির বাইরে কোন উত্তর সাধকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় ও পরিণতিতে পতিতা জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ কাহিনী রচনার সুবিধাও হত। ১৮৭০ সালে বটকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'কলির কুলটা প্রহসন', ১৮৮১ সালে অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'কলির মেয়ে ছোট বৌ ওরফে ঘোর মুখ', ১৮৮৩ সালে বিনোদ বসুর 'সরসীলতার গুপ্তকথা', ১৮৮৪ সালে নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'তিন জুতো', ১৮৮৫ সালে আশুতোষ বসুর 'সমাজ কলঙ্ক' ১৮৮৬ সালে অজ্ঞাত লেখকের 'কচকে ছুঁড়ীর গুপ্তকথা,' ১৮৮৬ সালে এস, এন, লাহার 'গোপালমণির স্বপ্ন কথা', ১৮৮৮ সালে মণিলাল মিত্রের 'শান্তমণির চূড়ান্ত কথা' ও হারানশশী দের 'কলিকালের বস্তির মেয়ে' ১৮৯৫ সালে শরৎচন্দ্র দাসের 'এ মেয়ে পুরুষের বাবা' বইয়ে পতিতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

অনাচার (incest) বা নিষিদ্ধ সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে যৌনাচারের বর্ণনা পাওয়া যায় ১৮৬৮ সালে অজ্ঞাতলেখকের 'হেমন্ত কুমারীতে'। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় কালীপদ ভাদুড়ীর 'গুণের শ্বশুর' ও মহেশচন্দ্র দাসের মামা ভাগনীর নাটক'। এ সময় নটবর দাসের 'মকেল মামা'ও প্রকাশিত হয়। অবশ্য এ ছাড়াও বহু বইয়ে অনাচারের বর্ণনা, বিকৃতি, উল্লেখ, ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গটি এত অস্বস্তিকর যে বটতলা এই কুৎসিত দিকটির কি অশ্লীলতম ব্যাখ্যা করে বাজার নিতে চেষ্টা করত তা ব্যাখ্যা করা অসুবিধাজনক।

বটতলার বই পতিতা ছাড়া আরেক বিষয়ে নির্ভর করত তা হল সমসাময়িক ঘটনা। বাজারে যে ঘটনার আলোচনা বিতর্ক সবচেয়ে বেশী চালু থাকত বটতলা তার সুযোগ নিত। মুখরোচক পরচর্চার মত উপাদেয় চলতি বিষয় আর নেই। যথা চিৎপুর রোডের কোন ধনী গৃহে ভ্রূণহত্যার সংবাদের স্কুপ্ পাওয়া মাত্র বটতলা তাকে অবলম্বন করে বই প্রকাশ করত। সম্মানহানির দায় এড়াবার জন্য নাম বদলাত বটে কিন্তু ঘটনা একই থাকায় উদগ্রীব পাঠক লোলুপ রসনায় তা কিনতেন। ধনী গৃহের সংখ্যাল্পতা ও বসবাসজনিত নৈকট্যের জন্য লোকশ্রুতি জটলাও এ ব্যাপারে সাহায্য করত। Current ঘটনা নির্ভর কাহিনী রচনার ঢেউ তো বটতলায় যুগ যুগ ধরেই চলেছে। তারকেশ্বরের 'মাহান্তের বিচার সে যুগে সমাজে আলোড়ন এনেছিল। বহু নাটক অভিনীত হয়েছিল এ বিষয়ে। রসরাজ বলেছেন বটতলার বইওয়ালারা অনেক পয়সা রোজগার করেছেন এই উপলক্ষ্যে। 'তারকেশ্বর নাটক' অর্থাৎ 'মোহান্ত লীলা,' 'মোহান্তের কি এই কাজ', 'মোহান্তের কি এই কি দশা' ইত্যাদি বহু বই তার উদাহরণ। ভাওয়ালের সন্ন্যাসীর মামলা, জাল প্রতাপচাঁদের মামলা উপলক্ষ্যেও বটতলা বহু বই প্রকাশ করেছে। আজ বটতলার সীমিত বাজার ম্লান হয়ে আসায় কীলার, মনরো, নানাবতীর উপাদেয় খোরাক থাকা সত্ত্বেও

বটতলা এ সুযোগ নেয় না, নিতে পারে না। সে কাজ আজ কলেজ ষ্ট্রীট ও সংবাদপত্র বিশেষ নিজেদের মধ্যেই বণ্টন করে নিয়েছে।

সংবাদপত্রবিহীন কলকাতা তথা চিৎপুর রোডে শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বটতলার শুরু থেকেই। সাধারণ মানুষ know thy self এর সঙ্গে অপরকেও জানতে চেয়েছে। প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের চর্চা করে অংশ নিতে চেয়েছে। তাই সে যুগে চণ্ডীমণ্ডপ পেরিয়ে আমরা বারোইয়ারী তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। বারোইয়ারী তলায় তখন নিত্য নতুন সঙ। নব্যবঙ্গের যুগের কয়েকটি সঙের নাম হুতোম আমাদের উপহার দিয়েছেন 'ক্ষুদে নবাব', কি মজার গুডফ্রাইডে, কি মজার শনিবার, হদ্দমজার রবিবার, কি দুঃখ সোমবার এ ছাড়াও 'ইয়ং বেঙ্গল'? বলা বাহুল্য চতুর বটতলা তার বইগুলোর টাইটেল করেছে এরই আশ্রয় নিয়ে। সমাজে বহু পরচর্চা প্রথম আশ্রয় পেত বারোইয়ারীতলার সঙে, তারপর তেমন হলে বটতলার বইয়ে। বিশেষতঃ বটতলার প্রথম পটে শতকরা নব্বইটি বইয়ের নামকরণ হত বারোইয়ারী তলার সঙের নামে। পরে অবশ্য বটতলা আধুনিক হতে থাকে এবং নিত্য নতুন নামকরণের পন্থা আবিষ্কার করতে থাকে।

আমরা আগেই বলেছি বটতলার স্বর্ণযুগ ডঃ সুকুমার সেনের মতে ১৮৪০ থেকে ১৮৬৫ সন পর্যন্ত। আমরা এতক্ষণ ১৮৬০ সাল থেকে প্রকাশিত বটতলার কয়েকটি দিগনিদর্শন বইয়ের আলোচনা করলাম দু-এক কথায় কিন্তু তার আগের বইয়ের আলোচনা করতে পারিনি। বটতলার বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮২০ থেকেই। ১৮২০ থেকেই বইও প্রকাশিত হয়েছে। যেসব দিনের বইয়ের বর্ণনা আমরা পাই না। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য যেসব সচিত্র বই প্রকাশ করেছিলেন তার অধিকাংশই পৌরাণিক ও ধর্মীয়। কোনটাই সামাজিক নহে। সেসব বইয়েরও কোন বিস্তৃত বর্ণনা আমরা পাইনি। কোন পাঠক হয়ত জানিয়েছেন গঙ্গাকিশোরের সচিত্র বেতাল পঞ্চবিংশতি তিনি দেখেছেন কিন্তু বটতলার বই প্রসঙ্গে এ ধরনের বিক্ষিপ্ত বইগুলোর আলোচনা শুরু করলে কয়েক খণ্ড মহাভারতের প্রয়োজন পড়বে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে বলাবাহুল্য বটতলার একচক্ষু হরিণটির প্রয়োজন পড়বে। এযুগে একমাত্র সাহিত্য বটতলার সাহিত্য। যুগধর্মের তাড়নায় অশ্লীলতার কড়াপাকে বটতলা পরিপূর্ণ হলেও সেই একপেশে দৃষ্টিকে অস্বীকার করা যাবে না। যদিও বটতলার দৃষ্টি সমাজ সংস্কারে নয়—সমস্যাকে ভাঙিয়ে অর্থোপার্জন, তবুও বটতলা একক অনন্য। সংবাদপত্রের অগ্রদূত বটতলার এই সব বইয়ের plot-এ তাৎকালিক ঘটনার প্রভাব পড়েছে—সংবাদপত্রবিহীন কলকাতার সমসাময়িক ঘটনাগুলোর বিবরণ পাবার একমাত্র উপায় বটতলার বই।

অশ্লীলতার অপরাধে বটতলার সব বইকে অস্পৃশ্য করে রাখলে আমরা শুধু আমাদের সামাজিক ইতিহাসের ক্রম-ধারা থেকে বিচ্যুত হব তাই নয়, transition period এর প্রধান ফসল যে ব্যঙ্গ সাহিত্য তার বিবর্তন ধারাও অনুসরণ করতে পারবো না এবং বাংলা নাটকের বিবর্তন যাঁদের পাঠ্য বা গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁরাও বটতলার গুদামজাত হাজার হাজার প্রহসনকে বিন্দুমাত্র অস্বীকার করতে পারবেন না। ডঃ সেনের ভাষায় 'উঁচু কপালে' দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা বটতলার বইকে

ঘৃণায় এড়িয়ে চলবেন তাঁরা এমনি অজস্র বিবর্তন ধারাও অনুসরণ করতে পারবেন না। বটতলার বইয়ের লেখকদের কথাও আলোচনা করা দরকার। এর মধ্যে বহু জ্ঞানী গুণীদেরও পাওয়া যাবে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকই বটতলায় বই প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা রামমোহনের কয়েকটি বইও বটতলা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে।

বটতলার বইয়ের জগতে উপেক্ষিত চরিত্র তার প্রকাশকরা। শেক্সপীয়র রচনাবলীর প্রথম প্রকাশক জনডাষ্টারকে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত বটতলার প্রকাশকদের নিয়ে কোন পৃথক আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

বটতলার প্রেসে ছাপা হলেও কয়েকটি দিগনিদর্শক বই এসে পরবর্তী কালে সমাজসংস্কারের ব্রত কাঁধে নিয়েছে। বলা বাহুলা তা বটতলাকে ভাতে মেরেছে। বটতলা সমস্যাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে কিন্তু চাকে হাত দেয়নি। কিন্তু কয়েকজন সে পথ ত্যাগ করেছেন। বলা বাহুল্য কালের কুটিল স্রোত অবহেলা করে এদের কয়েকটি আজও টিকে রয়েছে এবং মজার কথা আজ আর তাদের গায়ে বটতলার দুর্গন্ধ নেই। কুলীনকুল সর্বস্ব, নবনাটক, সধবার একাদশী, জামাই বারিক, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ এবং সর্বোপরি হুতোম পেঁচার নক্শা প্রভৃতি বইগুলোকে আজ বটতলার বই বললে অনেকেই অসন্তুষ্ট হবেন। তবুও এই সব বড়লোক আত্মীয়ের হাত ধরেই যদি বটতলার সমগ্র পুস্তক সম্ভার সবার সামনে অনাহুত অতিথির মত উপস্থিত হতে পারে তাতে বিব্রত হবার কিছু নেই।

* বহু বিবাহের মতই বটতলায় অস্বাভাবিক বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও অসবর্ণ বিবাহ উপেক্ষিত রয়ে গেছে। অসবর্ণ বিবাহ সাধারণত প্রণয়ের পরিণাম। বটতলা অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন তো দূরের কথা প্রতিবাদও করেনি। এর বোধকরি প্রাথমিক কারণ বটতলা পণপ্রথার রোগের মূল সন্ধান করেনি, করতেও চায়নি।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

সৌহার্দ্যে রাজনীতির ছায়াপাত

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নি, কিন্তু অন্যান্য ভুলবোঝাবুঝির চেয়ে অনেক বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দূরত্ব রবীন্দ্রনাথ ও বন্ধু রোটেনষ্টাইনের মধ্যে প্রায় অলঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করেছিল। প্রথম দিকে কিন্তু দুজনের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিনিময়ের কোনো প্রমাণ পাই না; অথচ পরের দিকে কেন তা এত প্রকট হয়ে উঠলো তা ক্রমশ আলোচ্য। প্রথম যে চিঠিতে ঘটনার উল্লেখ পাই সেটি (৩০ ডিসেম্বর ১৯১২) আর্বানা থেকে লেখা। দিল্লিতে বড়লাটের শোভাযাত্রাকালে সন্ত্রাসবাদী রাসবিহারী বসু ও তাঁর সঙ্গীরা হার্ডিঞ্জের হাতির উপর বোমা নিক্ষেপ করেন এবং লেডি হার্ডিঞ্জ আহত হন। এই ঘটনা বিদেশ থেকে জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে লেখেন—

The news of the outrage at Delhi has come to us with a great shock. The man who is too lazy for earning honest livelihood takes to burglery and only those who are disinclined to serve country with useful works and patient heroism try these violent and cowardly methods and bring down fearful nemesis upon their countrymen.

রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই পেশাদার রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি বারবার রাজনীতির নিকট পরিমণ্ডলে এসেছিলেন কারণ তাঁর অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত স্বদেশের সামান্য অসম্মানেও তীব্র আঘাত পেতো। প্রথমবার বিলাতের দিগ্বিজয় অন্তে যখন রবীন্দ্রনাথ বন্ধুসমভিব্যাহারে বন্দরে এসেছিলেন ভারতযাত্রার পথে জাহাজে ওঠার জন্য, তখন তিনি জানতে পারলেন বাংলার বন্যার খবর বিলাতের সংবাদপত্রে ছাপা না হলেও জার্মান কাগজে ছাপা হয়েছিল এবং এই প্রসঙ্গে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের নিকট তীব্র মন্তব্য করেছিলেন। Manchester Guardian-এ এই ঘটনার মন্তব্য করা হয়েছিল,

We do not deserve his Gitanjali if we do not care about the people.

বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বাহ্নে ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে অভিযোগে যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংরেজ জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ছায়াপাত হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডে অভূতপূর্ব সমাদর ও খ্যাতি অর্জন করায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যভূমিতে হয়ে উঠলেন ভারতবর্ষের বেসরকারী দূত। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর সেই পদে তাঁর প্রতিষ্ঠা অবিসংবাদিত হলো। আপনা আপনি এসে গেল বিশ্বসভায় স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করায় দায়। দেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক ঘটনায় তাঁর মন যতই বিরূপ হোক, বাহিরের কাছে অপমানিত স্বদেশকে

সমর্থনের দায়িত্ব তিনি স্বভাবতই গ্রহণ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত।

Rabindranath personified to the West not only his poetry and his message, but also India.

এমন কি বন্ধুর সঙ্গে পত্রালাপকালেও তিনি হয়ে উঠলেন ব্যক্তির চেয়ে বড়ো, ভারত প্রতিনিধি। বন্ধুত্বের মধ্যে এই প্রতিনিধিমূলকতা এসে যাওয়ার কারণ, দুজনে ছিলেন এমন দুই দেশের নাগরিক, যার একটি শাসক, অপরটি শাসিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যেমন ভারত প্রতিনিধি মনে করেছেন, তেমনি ইংরেজ জাতির বা পাশ্চাত্য জাতির বিরুদ্ধে চিঠিতে অভিযোগ করার সময় রোটেনষ্টাইনকে ইংরেজ জাতির বা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিনিধি হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তাছাড়া যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ফলে তিনি স্বদেশের বাণীমূর্তি বলে বিদেশে সম্মান পেলেন সেই পুরস্কারের ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কী পরিমাণ রাজনৈতিক কলুষাবর্ত ঘুলিয়ে উঠেছিল তা আমরা দেখেছি। অশ্বেতকায় জাতির লোকের পুরস্কার লাভে শ্বেতকায় জাতির যে কদর্য মূর্তি প্রকাশ পেয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের মত স্পর্শকাতর মানুষের মনে রেখাপাত না করলেই অস্বাভাবিক হত।

ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেল পর্যায়ক্রমে যে রবীন্দ্রনাথ এক দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ইংরেজ জাতির বিচারবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা হারাতে বসলেন, এবং অন্যদিকে দুই দেশের তিক্ততা তাঁকেও স্পর্শ করলো। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যদিও তিনি আশা প্রকাশ করলেন,

আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

তথাপি পাশ্চাত্যের যে জাতীয় অহমিকা এই আত্মঘাতী মারণযজ্ঞের জন্য দায়ী তাতে রবীন্দ্রনাথ হতাশ বোধ করেছিলেন। সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সর্বনাশা ভয়াবহতা যুক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার ক্রমান্বয় উন্নতির উনিশশতকী বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দিল, আবার দেশের মধ্যে ছোটবড় ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকশাসিতের মধ্যে দূরত্ব বর্ধমান হলো। অধ্যাপক ওটেনের প্রহারের ঘটনায় তিনি 'ছাত্রশাসনতন্ত্র'কে যেমন নিন্দা করেছেন, তেমনি যে অপমানে উত্তেজিত হয়ে ছাত্ররা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছিল সেই অপমানে তিনিও বেদনা বোধ করেছিলেন। তারপর ছিল বর্ণবিদ্বেষ। জাপান হয়ে মার্কিনদেশে যাত্রার পূর্বাহ্নে (২৮ এপ্রিল ১৯১৬) তিনি রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন,

Doors are closing against us everywhere in the world. Indians going towards Japan or America are either disallowed or interned in Singapur.

পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন মহাযুদ্ধে নখেদন্তে ভয়াল হয়ে উঠেছে সেই সময় জাপানে রবীন্দ্রনাথ 'রণকণ্ডূয়নের ও সাম্রাজ্যস্ফীতির লক্ষণসমূহ' দেখে উত্তেজিত হয়ে জাতীয় অহমিকার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন; আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতামালার প্রধান বিষয়ই হলো 'Cult of Nationalism.'

We have felt its iron grip at the root of our life, and for the sake of

humanity we must stand up and give warning to all, that this nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age, and eating into its moral vitality.

যে পাশ্চাত্যসভ্যতা এই স্বাজাত্যবোধের জনক, রবীন্দ্রনাথের সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার নঞর্থক দিকের প্রতি দৃষ্টি পড়লো, অথচ তিনি উপলব্ধি করলেন সভ্যতার এই প্রলয়কালে প্রাচ্যের হাতেও সঞ্জীবনী নেই। তিনি মার্কিন দেশ থেকে ফিরে এসে লিখলেন (৬ জুলাই ১৯১৭)

I am afraid the West has lost its foothold of the inner life and has been hopping with one leg, revelling in the very jerkiness of its difficult movement because that has the appearance of power. Unfortunately the East has gone to the other extreme, and instead of using the inner life as the source of all harmonious movements has used it as a retreat for its practice of Liberation. But I, who have the amphibious duality of nature in me, whose food is in the west and breath air in the East, do not find a place where I can build my nest.

মার্কিনদেশে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর জন্য একদিকে যেমন তিনি পাশ্চাত্যে সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছিলেন, স্বদেশেও তেমনি চিত্তরঞ্জন প্রমুখ দেশনায়ক তাঁর তীব্র নিন্দাবাদ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে কবি জড়িয়ে পড়লেন। রাজদ্রোহের অপরাধে শ্রীমতী বেসান্ত অন্তরীণ হলে তার প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী বেসান্তের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন। এই কথা কাগজে পড়ে কোনো ইংরেজ বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে চিঠি দেন এবং রবীন্দ্রনাথ তার জবাবে যে খোলা চিঠি লেখেন সেটি রবীন্দ্রজীবনী-হতে উদ্ধৃত হয়েছে। যুবশক্তির উত্তেজনার কারণ তিনি দেখালেন ও শ্রীমতী বেসান্তের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের কারণও তিনি বিবৃত করলেন।

The constant conflict between the growing demand of the educated community of India for a substantial share in the administration of their country, and the spirit of hostility on the part of the Government, has given rise among a considerable number of our youngmen to methods of violence bred of despair and distrust (১)···what I consider to be the worst out come of this irresponsible policy of panic is the spread of the contagion of hatred against everything Western in minds which were free from it. In this crisis the only European who shared our sorrow, incurring the anger and derision of her countrymen, is Mrs. Annie Besant. This was what led me to express my greatful admiration for her noble courage.

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক বিখ্যাত রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে ও সাধারণ সভায় পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ শাসকশক্তির চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন।

সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধ সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে ব্যাখ্যা করে এবং সাম্প্রতিক এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন (২৬ অক্টোবর ১৯১৭) তার থেকে উদ্ধৃত করছি,

I had my fear that my American lectures, especially those about nationalism, might give offence to my readers in England. Possibly to some extent they have done so……it seems to me that the word nation in its meaning carries a special emphasis upon its political character. Politics becomes aggressively selfconscious when it sets itself in antagonism against other peoples, specially when it tends its dominion among alien races. This convulsive intensity of consciousness is productive of strength but not of health. The rapid growth of nationaliam in Europe begins with her period of foreign exploration and exploitation. Its brilliance shines in contrast upon the dark back ground of the subjection of the other peoples. Certainly it is based upon the idea of competition, conflict and conquest and not that of co-operation.

এর পরের অনুচ্ছেদে তিনি স্বদেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে লিখলেন—

By some unexpected freak of fate I was caught in a duststrom of our politics. I have just come out of it nearly choked to death.

প্রত্যুত্তরে ১৯১৮-র আগষ্ট রোটেনষ্টাইন আশা প্রকাশ করেন (Speaight-এর জীবনী দ্রষ্টব্য), that Tagore would not allow the politicians to make use of him and uttered a warning against all forms of extremism.

যুদ্ধান্তে ভারত সরকার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দমনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি কমিটি বসান, সেই কমিটি রৌলাট কমিটি নামে কুখ্যাত। এই কমিটি ভারতীয় দণ্ডবিধির যে সমস্ত সংশোধন সুপারিশ করে সেগুলি গ্রাহ্য হলে ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে এই আশঙ্কায় দেশব্যাপী প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু প্রতিবাদ উপেক্ষা করে আইন পাশ হলো। গান্ধিজির আবেদনে হরতালের পর হরতাল হলো ; শেষ পর্যন্ত যে পাঞ্জাবের অধিবাসী যুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরাজের স্বপক্ষে লড়েছিলেন সেই পাঞ্জাবে জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো। হত্যাকাণ্ডের পর জঙ্গীশাসনে যে অপমান ও লাঞ্ছনা চললো তা আজ সুপরিজ্ঞাত। এবং সুপরিজ্ঞাত রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া—তিনি নাইট উপাধি (২) পরিত্যাগ করে উপদ্রুত দেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। এতে শুধু 'Englishman'-এর সম্পাদকের মত চড়া সাম্রাজ্যবাদী চটলেন না যিনি লিখেছিলেন 'Whether this Bengali poet remained a Knight or a plain Babu' তার উপরে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে না, সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে বিরূপ হলেন যাঁরা পৃষ্ঠপোষকের মনোভাব নিয়ে ভারতবন্ধু বলে নিজেদের দাবী করতেন।

এই ঘটনার পর ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন পুনরায় ইংল্যাণ্ডে গেলেন তখন দেখলেন

পূর্বের অনেক বন্ধুতায় শৈত্য প্রবেশ করেছে। রোটেনষ্টাইনের প্রাগুক্ত জীবনীকার স্পষ্টই লিখেছেন—

Tagore had returned to London in June 1920 but his visit was not a succes. Indian nationalism, fanned by the doctrine of self determination, was now moving into an acuter phase, and Tagore had his share in it.

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এই ভ্রমণের ব্যর্থতার জন্য দায়ী বলতে যেয়ে এই জীবনীকার বিশেষ করে নাইট উপাধি ত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও উপাধি ত্যাগের কারণটি সযত্নে গোপন করেছেন। যাই হোক ৫ই জুন প্যাডিংটন ষ্টেশনে সপরিবারে রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করে Kensingtion Palace Mansion-এর বাসাবাড়িতে নিয়ে গেলেন, যে বাসাবাড়ি তিনিই রবীন্দ্রনাথের জন্য ভাড়া করে রেখেছিলেন। নৈশাহারে তিনি এলে পুরোনো বন্ধুদের খোঁজখবর নিতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ। পরের দিন সকালে কন্যাদের নিয়ে রোটেনষ্টাইন আবার এলেন ; দুই বন্ধুতে যে আলোচনা হল তার বিবরণ আছে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়—

Conversations turned on whether artists writers and intellectuals who were alive to the weaknesses of the government and resented its spirit of greed and exploitation should co-operate with it. Rothenstein evidently favoured co-operation ; he thought the intellectuals could not very well refuse to do their best, when they were appealed to by the state to help in the reconstruction of the country ; that the idea of 'service' was so deep-rooted in modern man, that his salvation lay through it, and that in the case of artists, specially, they could no longer depend for their living and the preservation of their art on the patronage of a few rich individuals ; since more and more the rich would have less surplus to spend on the arts. The artists therefore must work for democracy through the state. Father pointed out that artists, of all persons, must have absolute independence, that it is not healthy for them to be under any restraint.

দুজনের মতের দূরত্ব এই কথোপকথনের বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এবং মনে রাখা দরকার এই সংলাপের পশ্চাৎপটে বর্তমান জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও কবির প্রতিক্রিয়া। দুজনের মতপার্থক্যের অনেকটা কারণ পরিবেশগত। বিদেশীশাসনের চণ্ডনীতিতে দেশবাসী যেখানে অপমানিত সেখানে রবীন্দ্রনাথের বাস, স্বভাবতই তাঁর মনোভাব সরকার বিরোধী। অপরপক্ষে রোটেনষ্টাইন ১৯২০ সালের পর থেকে শাসক গোষ্ঠীর, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়, Establishment তার অঙ্গ হয়ে উঠেছেন ক্রমেই। তিনি Royal College of Art-এর অধ্যক্ষ পদে ও শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Civic Art-এর অধ্যাপকপদে বৃত হয়েছেন, House of Commons-এর ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের জন্য সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছেন ; প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের বন্ধু তিনি, সম্রাট পঞ্চম জর্জের সামনে তাঁকে উপস্থিত করিয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া

হয়েছে এবং সর্বোপরি তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার পুরস্কার হিসাবে, যে নাইট উপাধি রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করে সরকারের বৈরী বলে গণ্য হয়েছিলেন। সুতরাং দুজনের মধ্যে মতে, ধ্যানধারণায় যে পার্থক্য দেখা দেবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তবু রোটেনস্টাইন ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। তাঁর বাড়িতে তিনি পূর্ববারের মতোই রবীন্দ্রনাথের জন্য সুধীসম্মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে দিলীপকুমার রায়ের গানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেখানেই হাঙ্গেরিয়ান বেহালাবাদিকা D' Aranyi-র সঙ্গে কবির পরিচয় হয়, যাঁর অনুপ্রাণিত বেহালাবাদনের কথা কবির স্মৃতিতে বহুকাল জাগরূক ছিল। কিন্তু অন্যেরা রাজনৈতিক মতভেদের জন্য ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হলেন না। যেমন, অকস্‌ফোর্ডে কবির বক্তৃতাসভায় উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ পেয়ে রাজকবি ব্রিজেস এলেন না। তিনি লিখলেন (রবীন্দ্রজীবনী ৩ দ্রষ্টব্য),

…am sorry that I do not feel able to accept the invitation which I have just received, to speak at the meeting in Oxford on Friday (25 June, 1920). I am writing especially as I never sent any answer to your several communications since the last disturbances in India. I began a long letter, but I feared that you might misunderstand it even more than you could misinterpret my silence, and in England we could not at first rely on the press reports of events.

এর পর পার্লামেন্টসমূহের মাতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের আলোচনার ধরণে কবি মর্মাহত হলেন, যদিও ভারতসচিব মন্টেগু তাঁর উদারমনোভাবের জন্য কবির ধন্যবাদের পাত্র হয়েছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ড ত্যাগের পূর্বাহ্ণে রোটেনস্টাইনকে লিখলেন (৩১ জুলাই ১৯২০)—

It was fortunate for me to have been able to secure our lodging near your place and meet you once again as I believe this is going to be my last visit for this country. For I am growing old and things are changing fast making all communication difficult between different peoples.

মূল ইউরোপ ভূখণ্ডে কবি সম্বর্ধনায় নন্দিত হলেন বিপুলভাবে। রাজনৈতিক কারণে অতি সম্প্রতি তিনি যে উপেক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার পাশে রণবিধ্বস্ত ইউরোপের এই সাদর আহ্বান কবিকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল এবং ইংল্যাণ্ডের উপেক্ষা সেই কারণে বোধহয় কবির মনে আরো গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। ব্রাসেলস থেকে (৬ অক্টোবর ১৯২০) রোটেনস্টাইনকে লেখা নিম্নোদ্ধৃত দীর্ঘ তীব্র চিঠিটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে লিখলেন সম্বর্ধনার কথা—

The continual enjoyment of sympathy and fellowship with which I have been surrounded since I came to the Continent makes it difficult for me to sit down and write a letters. I can hardly realise how it has become possible

for me to have occupied the heart of these people to which I could only find access through a very meagre and imperfect medium of translation. The welcome which has been accorded to me in all the centres that I have travelled in Europe has been deeply genuine and generous to the extreme. This makes it delightfully easy for me to give out the best that I have in me in an easy flow of communication.

ইংল্যাণ্ডে যে মনোবিনিময়ের ধারা আর নাব্য নেই, ইউরোপে এসে দেখলেন সেই ধারা সাবলীলভাবে প্রবাহিত। তিনি লিখলেন, মূল ইউরোপ ভূখণ্ডের সঙ্গে তাঁর স্বার্থশূন্য স্বাভাবিক সম্পর্ক, অথচ ইংরেজ জাতির সঙ্গে তাঁর সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না, মাঝখানে রাজনীতির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। তিনি জানালেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু যখন বিচারের পবিত্র তরবারি হত্যায় ব্যবহৃত হয় তখন,

I cannot say to myself, 'Poet, you have nothing to do with these facts, for they belong to politics.' This politics assumes its fullest diabolical aspect when I find it hideous acts of injustice find moral support from a whole nation only because it wants to enjoy in comfort and safety the golden fruits reaped from abject degradation of human races. What hurts me most is the fact that your people is ready to judge others while they shield themselves from the judgment of history by all means of moral camouflage, by obliteration of evidence of by misdeeds with scientific efficiency and farsightedness which were not within the means of our former rulers. But all the same judgment will come when the time is ripe; and because your politicians are conscious of the fact they are nervously busy in tightening their grasp upon the present situation, thinking that by doing so they will keep that future as their captive....But you must know that the downfall of your Empire is immient when the moral downfall of your people is proceeding in a rapid pace. It is right and natural that you will put more and more faith upon brute force for holding together your unwieldy Empire, making it so monstrously ugly that the whole outraged world will pull it down in disgust. Your bloated prosperity is a barrier that prevents you to see what beares of doom are silently marshalling their forces against you till the sudden signal is given from the dark.

রোটেনষ্টাইনকে উপলক্ষ করে ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে তপ্তলাভাস্রোতের মত এই ক্রোধজ্বালাপূর্ণ অভিযোগ উদ্গীরণ করে কবি ভাষার তিক্ততার জন্য মার্জনা প্রার্থনা করেছেন। বৎসরব্যাপী নীরবতা পালনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এর পর মাত্র তিনটি চিঠি লিখেছিলেন, তৃতীয়টিতেও

(৮ মে ১৯২১) ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ পাই।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ মার্কিনদেশে গেলেন বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহে। এখন শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, সমগ্র অ্যাংলো-স্যাকসন বিশ্বে তিনি উপেক্ষিত। স্যার উপাধি ত্যাগ করায় ইংরেজ রাজশক্তি তাঁকে প্রতিপদে বাধা দানে নিযুক্ত। মার্কিনদেশে ব্রিটিশ শক্তির কাছে বাধা পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে মনে স্বভাবতই আরো বেশি তিক্ততা জন্মেছিল, এবং সেই তিক্ততা তিনি কিভাবে রোটেনষ্টাইনের কাছে প্রকাশ করেছিলেন সে প্রসঙ্গের অবতারণা পূর্বেই করেছি যখন ইংরেজ শক্তির ব্যবহারে তাঁর চিত্ত বিরূপ তখনো অথচ তিনি এনড্রুজকে লিখেছেন—

With all our grievances against English nation, I cannot help loving your country, which has given me some of my best friends.

মার্কিনদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইংল্যাণ্ড হয়ে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় গেলেন ইউরোপ মহাদেশে—সেখানে পেলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সম্মান।

ফরাসীদেশে ও সুইডেনে জয়যাত্রা সমাপ্ত করে কবি এলেন জার্মানিতে এবং সেখানে দেখা গেল বীরপূজার চরম নিদর্শন। গেলেন অভিনন্দন মুখর ভিয়েনায়, গেলেন প্রাগে। ইউরোপ ভূখণ্ডে এই সম্বর্ধনার নানা কারণ অনুমিত হতে থাকলো এবং ফলে ব্যবধান বেড়ে যেতে থাকলো। এই বিজয়াভিযানের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে কৌতূহলী পাঠককে আরনসনের লেখা 'Rabindranath Through Western Eyes' গ্রন্থের 'Political Ambiguities' অধ্যায় পাঠ করতে হবে। একদিকে বাস্তবিকই জার্মানির জনসম্বর্ধনা অনেকাংশে রাজনৈতিক উদ্দেশে সংগঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে সেই সম্বর্ধনার মধ্যে সর্বদাই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কূটচাল খুঁজে বেড়াচ্ছিল —যুদ্ধোত্তর ইউরোপের রাজনৈতিক জঙ্গলে রবীন্দ্রনাথের শুভ-ইচ্ছা এইভাবে দুই দিক থেকে শিকার হয়েছিল। ইউরোপের নগরভ্রমণকালে তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক দপ্তর, রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা। জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রায় ইংল্যাণ্ডের শাসকবর্গ কোনো সময়ই সুখী ছিল না ; সুকৌশল ইঙ্গিত, অস্পষ্ট গুজব এবং রয়টার প্রচারিত বিকৃত খবরের দ্বারা একটি রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াসে তারা ব্যস্ত হয়েছিল। যুদ্ধে যারা ছিল প্রতিপক্ষ, সেই ফরাসি ও জার্মান জাতি এখন রাজনৈতিক কারণে গ্রন্থাদি উপহার দিয়ে কবিকে তোষামোদ করতে আরম্ভ করলো। জার্মানিতে রবীন্দ্রপূজার চূড়ান্ত হল কাইজারলিঙের ডারমস্টাডস্থ 'School of Wisdom'-এ রবীন্দ্রসপ্তাহ পালনের সময়। একদিন (রবীন্দ্রজীবনী ৩ দ্রষ্টব্য),

চার হাজারের বেশি লোক একটা জায়গায় বনের ধারে টিলার উপর সমবেত হইয়াছে ; কবি আসিলে তাহারা এক সঙ্গে গান গাহিয়া উঠিল ; সে সব গান জার্মান লোকসঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত।

আরনসন দেখিয়েছেন এই গান স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, অনেক দিন ধরে তার মহড়া দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত অনুষ্ঠান জার্মানির জাতীয়তাবাদী দলগুলি নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। ১৯২১ সালেই নাজি পত্রিকায় প্রশ্ন উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ কি আর্য? উত্তরে বলা হচ্ছে,

He certainly is not Semitic race, and that would qualify him to wear a swastika, although his pacifism might give rise to suspicion.

১৯২৫ সালেও ইতালিতে তিনি উন্মত্ত সম্বর্ধনার সম্মুখীন হয়েছিলেন—জেনোয়া ভেনিস মিলান ব্রিন্দিসি Viva la Indian, Viva Tagore ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল এবং সেই অনুরাগের প্রদর্শনীও যে সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না তা রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি।(৩) এর পর ফমিকি ও তুচ্চির প্ররোচনায় ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ইতালি ভ্রমণ করেন এবং কিভাবে মুসোলিনির চতুর আপাতঃ সৌজন্যে বিভ্রান্ত হয়ে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের দ্বারা ব্যবহৃত হন, এবং অবশেষে কীভাবে রোঁলা প্রমুখ বন্ধু তাঁকে ফ্যাসিতন্ত্রের সত্যরূপ বুঝতে সাহায্য করেন তা সকলেরই জানা। রবীন্দ্রজীবনী ৩-এর ২৯৬ থেকে ২৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। ফ্যাসিতন্ত্রের সঙ্গে এই ক্ষণস্থায়ী বন্ধন সহজেই ছিন্ন হলো এবং হিটলারের প্রচারসচিব গোয়েবলস্ ১৯৩৭ সালে নুরেনবার্গের দলসমাবেশে স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারকে সমর্থনের জন্য তীব্রভাবে যখন বিশ্বের উদারপন্থীদের আক্রমণ করেন তখন অন্যান্য অগ্রণী উদারপন্থীর মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেন। এইভাবে দেশের গোঁড়া জাতীয়তাবাদী; ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদী সকলের আক্রমণের লক্ষ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বের প্রতি তাঁর বাণী হলো বিকৃত ব্যাখ্যা ও আক্রমণের বিষয়। এই প্রবণতা আরো উদ্দাম হলো যখন ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসভায় অপাংক্তেয় রুশদেশে গেলেন। সেখানে 'ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব' দেখে রবীন্দ্রনাথের যে মুগ্ধতা তা স্বভাবতই সকলকে খুশি করেনি। বাংলা 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত সরকারী নিষেধাজ্ঞা তার বিরুদ্ধে জারি করা হয়নি। কিন্তু ১৯৩১ সালের 'Modern Review'-তে একটি মাত্র চিঠি 'The Soviet System' নামে প্রকাশিত হলে, ভবিষ্যতে এই রচনা যেন মুদ্রিত না হয় বলে সম্পাদককে সতর্ক করা হয়। নিষেধাজ্ঞার অমান্য করে ১৯৩৫ সালে শশধর সিংহের করা আর একটি তর্জমা 'On Russia' নামে ছাপা হলে উক্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হয়। কারণ এই রচনা, সহকারী ভারতসচিব বাটলার পার্লামেন্টে জানান,

Was clearly calculated by distortion of the facts to bring the British Administration in India into contempt and disrepute...

যাই হোক, বৎসরকালব্যাপী মনোভঙ্গের ফলে যে পত্রবিনিময় ধারা অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, বন্ধুত্বের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল মৌনের প্রাচীর, সেই প্রাচীর ভেঙ্গে বন্ধুত্বস্রোতকে পুনঃ প্রবাহিত করলেন প্রথম রোটেনষ্টাইন, যখন রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের বন্দনায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তিনি লিখলেন (১ জুন ১৯২১),

I think it would be a pity if, travelling in triumph through Europe, you gave up for the praise of all men the affection of a single friend.

একজন বন্ধুর নিবিড় ভালোবাসা যে খেয়ালী জনতার সম্বর্ধনার চেয়ে মূল্যবান এই কথাও বোধহয় রোটেনষ্টাইন ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছিলেন। রোটেনষ্টাইনের চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর থেকে যেন এক গুরুতর ভার নেমে গেল ; দেশে ফিরে তিনি লিখলেন (১৩ জুলাই ১৯২২)

কেন ঐভাবে তীব্র আক্রমণাত্মক চিঠি তিনি বন্ধুকে লিখেছিলেন। বললেন, ব্রিটিশ প্রচারশক্তি বিশ্বভারতীর জন্য মার্কিনদেশে অর্থসংগ্রহে নানা উপায়ে বাধা সৃষ্টি করেছিল, এবং

I was in a bitter state of mind in consequence of this when your letter came to me with the suggestion that a board should be appointed in England with the object of selecting the students and lectures who were to come to us from the West.

এবং আরো লিখলেন—

But all this is not to discuss the subject but to offer you an explanation of my conduct. Now that is given it helps me to feel ashamed and sorry for having indulged in a fit of fretfulness so long and resume the natural thread of our friendship too precious to be allowed to weaken for any cause whatever. The interruption in our relationship has been growing a burden to me and I am deeply grateful to you for being the first to break it. When once an obstruction is formed in stream of communication which was natural and deep flowing it takes some time to discover how thin it is and made of debris that are casual and incongruous.

দেশে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মিলন ঘটাতে যেয়ে, পাশ্চাত্যের বন্ধু হিসাবে তার দুর্বলতা দেখাতে যেয়ে, প্রাচ্যের মানুষ হিসাবে প্রাচ্যের সমালোচনা করতে যেয়ে, সর্বত্র তিনি বিক্ষোভ জাগিয়েছেন। ভাগ্যের এই পরিহাস সম্বন্ধে তিনি নিজেই যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আছে এই চিঠিতেই।

Our people in a fanatical mood of resentment were ready to repudiate the West altogether and any proposal of the co-operation with the Western humanity in any from was considered almost as an act of sacrilege. I made myself conspicuously hateful to my countrymen by protesting against such an irrational outburst of passion. It was an irony of fate which while it drew upon my venture (অর্থাৎ বিশ্বভারতী) the mighty power of suspicion of the British Government also aroused antagonism in my own people against it. The onslaught of non-cooperation fell on me from both the opposing sides.

কলম্বো থেকে লেখা (২০ অক্টোবর ১৯২২) পরবর্তী চিঠিতেও একই বক্তব্যের পুনরুক্তি পাই—

The time is not at all favourable in India for me to persuade our people of the importance of reconciliation of the East and West.

পাঁচ বছর পরে লেখা চিঠিতে (২০ এপ্রিল ১৯২৭) তিনি জানিয়েছেন অরাজনৈতিক বলে বিশ্বভারতীর কাজে তিনি স্বদেশে কোনো সাহায্য বা সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারছেন না;

বিরোধী পরিবেশের এই নিঃসঙ্গতা তাঁর পক্ষে দুর্বহ হয়েছে,

And I never pretend to say that I can dispense with human sympathy.

যে ইংল্যাণ্ড বিশ্বের দুয়ার তাঁর সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, যে দ্বীপে সমধর্মা কয়েকটি বন্ধু অর্জন করেছিলেন সেই ইংল্যাণ্ডের প্রতি আকর্ষণ তাঁর কমেনি ; বারবার বলেছেন এই শেষ আগমন কিন্তু আবার তিনি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সেই ইংল্যাণ্ড শাসকের দেশ হওয়ায়, তিনি শাসিত জাতির মানুষ হওয়ায়, যে অনিবার্য রাজনৈতিক ব্যবধান দুইয়ের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তার জন্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ঔদার্যগুণে দূরত্বের দায় নিজে নিয়েছেন, কিন্তু দোষ ছিল অবস্থার। এই বিষয়ে তিনি রোটেনষ্টাইনকে ১৯২৬ সালে লণ্ডনে বাসকালে লিখলেন (৭ আগষ্ট)—

Unfortunately for me I have lost the place that I once chanced to gain in the heart of your country and today I feel that I merely drift on the current of a crowd, superficial existence that fires me every moment.

তারপর লিখলেন সর্বজয়ী বন্ধুত্বের কথা—

But one thing I have discovered lately that my love for you has sent its roots in the underground depth of my being and it is sure to survive all the changes of outward circumstance. My heart aches today when I remember our close and constant companionship in the early days of acquaintance so richly endowed by the unstinted generosity of your love. I am immensely thankful for this experience and also for the help you rendered unexpectedly in introducing Europe to me in whose shore, like a migratory bird, I have my second nest.

ইংল্যাণ্ডের হৃদয়ে যে আসন তিনি একদা তিনি লাভ করেছিলেন সে আসন হারানোর জন্য তিনি নিজেকে দায়ী করলেও তিনি যে দায়ী ছিলেন না তার প্রমাণ পাই যখন দেখি ১৯৩০ সালে শেষবার বিলাতভ্রমণের সময় শোলাপুরে গান্ধিটুপি পরার জন্য পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে, নিরীহ মানুষের উপর ইংরেজ শাসন কেমন 'cruel and arbitrary punishment' চাপিয়ে দেয় সে কথা বলতে হচ্ছে।

রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে সাবধান করেছিলেন, প্রবক্তার পথে অনেক প্রলোভনের ফাঁদ। রবীন্দ্রনাথ জর্জরিত বিশ্বকে রোগমুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তাঁর আদর্শ ও বাণীকে সেই উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের সামনে তুলে ধরেছিলেন, কারণ মানুষের শুভবুদ্ধির উপর ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। বর্তমান বিশ্ব সেই সহজ আশাবাদের কতদূর পরিপন্থী তা তিনি দীর্ঘকাল বুঝতে পারেননি। ইংল্যাণ্ডে সন্দেহের রাজনীতি, ইউরোপ সম্বর্ধনার মধ্যে রাজনীতি, মার্কিনদেশের গুজব ও কৃপণতা, দেশে বিরোধী পরিবেশের নিঃসঙ্গতার সম্মুখীন হয়ে কবি শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন ; প্রবক্তার ভূমিকা পরিত্যাগ করতে উন্মুখ হয়ে তিনি ১৪ এপ্রিল ১৯২৬ তারিখে রোটেনষ্টাইনকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে যেন ওথেলোর হতাশ হাহাকারের প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

With the breaking down of my health I have lost my occupation while gaining back the leisure which constantly reminds me of the natural field of my life now lying buried under the debries of my work. It brings today to my memory all the surprises of that fruitful time of rich idleness, that apic era of divine inutility to which your thoughts belong so intimately.

অপচয়িত দিনগুলি যেসব কারণে তিনি ব্যয় করেছেন সেগুলি আবর্জনাস্তূপের মতো পড়ে আছে অথচ মানুষের কল্যাণের সম্ভাবনায় এখনো তিনি দেশে দেশে ভ্রাম্যমান, শুভবুদ্ধির জাগরণে এখনো উৎসুক; অথচ তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে জেনিভা থেকে রোটেনষ্টাইনকে লিখছেন (২৪ আগষ্ট ১৯৩০)—

The rich luxury of leisure is not for me while I am in Europe—I am doomed to be unrelentingly grod to humanity and remain harnessed to a cause. The artist in me ever urges me to be naughty and natural—but it requires good deal of courage to be what I truly am.

রাজনীতিতে তিনি ক্রমেই নিস্পৃহ হয়ে উঠছেন, এই নিরাসক্তির প্রমাণ শান্তিনিকেতন লেখা ২৪ মার্চ ১৯৩১ তারিখের চিঠির কয়েকটি বাক্যে—

You will be surprised to learn tbat I hardly know anything about the recent political development in India I do not read newspapers for I have my own work which I consider to be important and I cannot allow my minds to be waylaid by discussions that are outside my scope.

প্রবক্তার ভূমিকা ত্যাগ করে যেমন তিনি শিল্পীর স্বধর্মে ফিরে এলেন, তেমনি সমস্ত রাজনৈতিক মতবিরোধের ঊর্ধ্বে মূল্য দিলেন বন্ধুকে, বন্ধুত্বকে। দার্জিলিং থেকে লেখা চিঠির (২৬ জুন ১৯৩১) পুনশ্চে যা লিখলেন তার মধ্যে পাই ক্ষমাপ্রার্থনার সুর, রাজনৈতিক কারণে যত ভুলবোঝাবুঝি জমেছিল তার সমস্ত চিত্তগ্লানিকে মুছে দিতে চেয়েছেন—

I know that during my contact with you I occasionally displayed moods must have caused you pain, but I hope you realise that they never represented my deeper normality, that they were proved by some jerks of time which for the moment was passing over a road badly out of repairs.

রোটেনষ্টাইনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব 'jerks of time'-কে অতিক্রম করতে পেরেছিল ; সেই বন্ধুত্বের কী মূল্য তাঁর কাছে ছিল তার প্রমাণ পত্রাবলীতেই বর্তমান।

১। পূর্বোদ্ধৃত একটি চিঠিতে বড়লাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপের জন্য রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদীদের নিন্দা করেছিলেন। এখানে তিনি সন্ত্রাসবাদের সত্য কারণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। অনেক পরবর্তী একটি চিঠিতে (১৫ নবেম্বর ১৯৩১) তিনি রোটেনষ্টাইনকে সন্ত্রাসবাদের জনক যে দমননীতি এই কথাই বলেছেন—'A very long period of suffering is

before our people, the continual strain of which is sure to drive a number of our youngmen to desperate deeds of violence creating a vicious circle of an alternate repression and defiance.'

২। পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে ৩ জুন ১৯১৫ তারিখে তিনি নাইট উপাধি পান এবং পেয়ে রোটেনস্টাইন-তনয়া রাচেনকে ২ জুলাই ১৯১৫ তারিখে লেখেন (Speaight-এর জীবনীতে উদ্ধৃত). তাঁর সম্মানপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ হবে না 'till I go to Far Oakridge to receive my homage from the dear maidens who dwell by the pinewood nursing baby rabbits. Keep my wreath of wild roses for the next summer when I shall alight from my milk-white horse at your gate and blow upon my horn three times. I hope all your baby pets will grow up sufficiently by that time to allow you some leisure for your Knight, who, of course, cannot pretend to have the same claim upon your attention as the immature rabbits.'

৩। অসুস্থ অবস্থায় মিলন থেকে রোটেনস্টাইনকে লিখলেন (২৭ জানুয়ারি ১৯২৫)—'I have fallen ill. I almost feel guilty that it should have been so—for I have been met with such an outburst of welcome that it grieves my heart not to be able to respond to it in an adequate manner. Twice I have been able to appear before the public and the enthusiasm of the people has made me feel humble—I only wish I could do something to them to deserve this.'

কবি দান্তে

সত্যভূষণ সেন

ইওরোপের সাহিত্যে হোমার এবং ভার্জিলের পরেই দান্তের স্থান, কালানুক্রমিক হিসাবে তার পরে আসেন শেক্সপীয়ার, মিল্টন এবং গ্যেটে, হোমার গ্রীক সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয়, যেমন ভার্জিল ল্যাটিন সাহিত্যের। দান্তের জন্য তেমন কোনও সমৃদ্ধ ভাষা তৈরী ছিল না; যে ভাষা তার মাতৃভাষা তা ছিল ইতালী দেশের অপর কয়েকটি জনপদ ভাষার অন্যতম। দান্তের প্রতিভাপ্রসাদে সেই ভাষাই সমৃদ্ধ হয়ে কালক্রমে নিখিল ইতালীর ভাষা হয়ে দাঁড়ায়, সেই ভাষাই এখন ইওরোপের সাহিত্য সংসারে ইতালীর ভাষা বলে পরিচিত। দান্তের প্রতিভার এ অবদানও বিশেষ লক্ষণীয়।

দান্তে ছিলেন ফ্লোরেন্স নগরীর অধিবাসী, এ জন্য কবির গর্ববোধের অন্ত ছিল না। আবার তার সমগ্র জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই ঘটনাই ছিল তাঁর জীবনের সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের মূলীভূত কারণ—যে তিনি সে সময়ে এই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ে সমগ্র ইতালীব্যাপী কোন সার্বভৌম রাজা বা রাজত্ব ছিল না। কিন্তু ফ্লোরেন্স তখন দেশের অপরাপর নগরের ন্যায় একটি সাধারণ নগরী মাত্র ছিল না; ফ্লোরেন্স তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি স্বতন্ত্র যেন একটি সার্বভৌম বস্তু; তার নিজস্ব জাতীয় পতাকা ছিল, সেনাবাহিনী ছিল, অনেক দেশে এই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দূত ছিল, বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল এবং নিজস্ব মুদ্রা; ফ্লোরেন্সের এই মুদ্রা ফ্লোরিন কালে কালে ডলার এবং পাউণ্ডের ন্যায় দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মুদ্রা হয়ে দাঁড়াল।

ফ্লোরেন্সের মত এমন একটি নগর রাষ্ট্রের অধিকার লাভ সকলেরই কাম্য হতে পারত। এই স্বাধিকার লাভের কামনায়ই দেশের দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না। দুর্গসম নিজ নিজ প্রাসাদে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যারণগোষ্ঠী ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর দল ঘিবেলাইন, তাদের প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠায় তাদের দম্ভের সীমা ছিল না। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গুয়েলফ যখন তাদের বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিভার প্রভাবে অভূতপূর্ব বলের অধিকার লাভ করতে লাগলেন তখন তারা অভিজাত সম্প্রদায়ের দম্ভ এবং প্রাধান্য সহ্য করতে পারলেন না। একটি নারীর প্রতি ব্যক্তিগত অত্যাচার কাহিনীকে উপলক্ষ করে যে কলহের সৃষ্টি হয় তাই গিয়ে দাঁড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের সংঘর্ষের ইতিহাসে গুয়েলফ এবং ঘিবেলীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘর্ষ, বার বার ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে ১২৬০ সালে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে গুয়েলফরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, ছয় হাজার লোক নিহত এবং ষোল হাজার লোক বন্দী হয়ে যায়, ফ্লোরেন্সের অস্তিত্ব যেন বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু গুয়েলফরা আবার শক্তি সংগ্রহ করে ১২৬৬ সালে শেষবারের মত শত্রুপক্ষকে বিপর্যস্ত করে দেয়।

এই ঘটনার পূর্ববর্তী বৎসরে ১২৬৫ সালের মে মাসের শেষভাগে দান্তের জন্ম হয়, নিম্ন অভিজাত এবং সাধারণ নাগরিক পরিবারের মিশ্রণের ফলে দান্তে ছিলেন গুয়েলফ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পরিবারও নিশ্চয়ই নিজেদের দলের এই বিজয়ের উৎসবে অংশ গ্রহণ করে থাকবেন।

দান্তের মত সংবেদনশীল শিশুচিত্তে সাম্প্রতিক বিগত কালের যুদ্ধ জয়ের নানাপ্রকার কাহিনী নানাভাবে রেখাপাত করে থাকবে ; যার পরিচয় পাওয়া যায় তার মহাকাব্যের প্রথম দুই খণ্ডের স্থানে স্থানে—The Divine Comedy, The Inferno, The Purgatory.

দান্তের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিবরণ অল্পই পাওয়া যায় যেমন তাঁর সমসাময়িক লেখক বোকাচিওর ক্ষেত্রেও অনেকটা কিম্বদন্তী এবং শোনা কথার উপরে নির্ভর করতে হয় এবং কিছু কিছু অনুমান বা সিদ্ধান্ত করে নিতে হয় তার কাব্য সাহিত্য থেকে। অতি অল্প বয়সে মাতার মৃত্যুর পরে তাঁর পিতা আবার বিয়ে করেন, ফলে পিতা মাতার স্নেহ বাৎসল্যের জন্য তাঁর স্বাভাবিক কামনা অতৃপ্ত থেকে যায়, তাঁর কিছু কিছু পরিচয় তাঁর মহাকাব্যে The Divine Comedy থেকে খুঁজে বার করা যায়। তাঁর স্তরের সাধারণ পরিবারের সন্তানদের মত শিক্ষা তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন এবং সম্ভবত তার চেয়ে কিছু বেশিও, কারণ তাঁর অন্তরে মননশীলতা এবং সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় ছিল নিঃসন্দেহ। তিনি কিশোর বয়সে যে সকল কবিতা রচনা করেছিলেন তা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে অল্প বয়সেই নিজ ভাষার গীতি কবিতার প্রতি তাঁর আগ্রহ বোধ ছিল, যে ভাষা ছিল বহুল পরিমাণে প্রভেনকল ভাষার নিকট ঋণী। এই সাহিত্য অনুশীলনের ফলেই তাঁর কতকটা অগ্রজ প্রতিভাসম্পন্ন কবি ক্যাভালকান্তির সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার সূত্রপাত।

দান্তের যৌবনকাল সম্পর্কে আমরা যতটা ধারণা করে নিতে পারি তাঁর অধিকাংশই সংকলিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে—১২৯২ সালে রচিত La Vita Nuava—The New Life. দেশীয় ভাষায় রচিত এই কাব্যগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনায় কবি ক্যাভালকান্তির অনেকটা অংশ ছিল। এই কাব্যের ভিত্তির মূলে ছিল তাঁর জীবনের বাল্যকালের এমন একটি ঘটনা যা তাঁর জীবনে তখনই এমন রেখাপাত করে যার প্রভাব তাঁর সমস্ত জীবন থেকে কখনও বিলীন হয়ে যায়নি। এই ঘটনার স্মৃতি তাঁর সমগ্র জীবনকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করে এবং তারই পরিণতি ফল তাঁর মহাকাব্য The Divine Comedy. এই ভিটা নুওভা কাব্যের মধ্যে ছিল কতকগুলি সনেট এবং বহু বৎসর পূর্বে যে অবস্থার মধ্যে এই সকল কবিতা রচিত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা হিসাবে সংযোগসূত্র স্বরূপ কিছু গদ্য রচনা আমাদের দেশের সাহিত্যে যেমন চম্পূ কাব্য।

দান্তে যখন নয় বছরের বালক তখন কোনও স্থানে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে একটি বালিকার উপরে যার বয়সও ছিল নয় বছরের কাছাকাছি। কাব্য সাহিত্যে এবং সাংসারিক জগতেও প্রথম দম্পতি প্রেমের কথা বহু প্রচলিত ; এ শুধু প্রেম নয়, এ যেন সম্মোহন সুন্দর বা অসুন্দর কোনও বিচারবুদ্ধি হয়তো তার মনেও ওঠেনি, তিনি বালিকাকে দেখে অতিমাত্রায় মুগ্ধ যেন একবারে সম্মোহিত হয়ে পড়লেন, তার চিত্তে এই বালিকার সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি যে রেখাপাত করল তা আর কখনও বিলীন হল না। দান্তের বয়স যখন আঠার বৎসর তখন এই বালিকার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ হয় এবং হয়তো আলাপ পরিচয় সূত্রে সামান্য কথাবার্তাও হয়ে থাকবে, তার বেশি নয়। এই বালিকার নাম ছিল বিচে পোর্তিনারি কিন্তু এই নাম দান্তের মনোমত না হওয়াতে তিনি এর নামকরণ করলেন বিয়াত্রিচে এবং দান্তের জীবন এবং তাঁর কাব্য সাহিত্যে সম্পর্কে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে রইলেন। সকল ঘটনা জানা যায় না। কিন্তু

দেখা যায় যে যথাকালে অপর একজন অভিজাত বংশের যুবকের সহিত বিয়াত্রিচের বিয়ে হয়ে যায় এবং অনতিকাল পরেই তার মৃত্যু ঘটে, যখন তার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। এই ঘটনায় দান্তের মত সংবেদনশীল কবিচিত্তে যে কত মর্মন্তুদ বেদনার অনুভূতি জেগেছিল তা কল্পনার বিষয়। দান্তের বয়স যখন সাতাশ বৎসর তখন আর একবার দেখতে দেখতে পেলেন তার বিয়াত্রিচের অলৌকিক মূর্তি—স্বপ্ন কল্পনায় অথবা দিব্য দৃষ্টিতে এই একবার মাত্র। তার পর থেকে কবি এবং প্রেমিক চিত্তের কল্পনা অনুভূতি ছাড়া দান্তের জীবনে বিয়াত্রিচের আর কোনও যোগাযোগ দেখা যায় না। দান্তে বিয়াত্রিচের প্রেম কাহিনী প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ইতালী দেশেরই আরও তিন জন কবি বা সাহিত্যিকের কথা তাদেরও প্রত্যেকের জীবনে একটি নারী আবির্ভূত হয়ে অনুরূপ প্রেম কাহিনীর সৃষ্টির কারণ হয়েছিল এবং তাদের জীবনে বিবিধ রেখাপাত করেছিল ; পেত্রার্কের লরা, বোকাচিওর ক্ষেত্রে ফিয়ামেত্তা এবং ট্যাসের লীওনোরা।

দান্তে যেমন ছিলেন অনুভূতি পরায়ণ এবং সংবেদনশীল কবিচিত্তের অধিকারী তেমনই তিনি আবার ছিলেন ঘোরতর বাস্তববাদী। বিয়াত্রিচে সম্পর্কে ভাবাবেগের নিদারুণ আতিশয্যেও তিনি নিঃশেষে অভিভূত হয়ে পড়েননি। দেখা যায় ১২৮৯ সালে তিনি যুদ্ধযাত্রায় এবং দেশ জয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের সূত্রপাত হয় ১২৯৫ সালে নানা কর্মচেষ্টার পরে ১২৯৯ সালে তিনি একটি রাজপ্রতিনিধি দূতের পদে নিয়োজিত হন। ইতিমধ্যে জেমা নামে এক তরুণীকে বিয়ে করেন, যার এক ভাই ছিলেন রাজনীতি ক্ষেত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ফোরেসে দোনাতি এবং অপর এক ভাই কর্সো দোনাতি।

তারপরেই দেশে আবার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জেগে ওঠে। এবারও একটি ব্যক্তিগত খুনের ঘটনা উপলক্ষ করে সংঘর্ষ ঘটে। ১৩০০ সালে সাদা এবং কালো দুই দল নগরের পথে পথে যুদ্ধ করে। এই সময়ে দান্তে রাজনীতি ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন, ছয় জন সর্বোচ্চ শাসনকর্তার একটি পদে তিনি নির্বাচন লাভ করেন। তাঁর এই দুই মাস কাল পদাধিকারের মধ্যে তাঁর দু'জন আত্মীয় বন্ধুর নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞায় তিনিও সমর্থন জানাতে বাধ্য হন—তাঁর শ্যালক কর্সো দোনাতি এবং প্রথম বন্ধু ক্যাভালকান্তি, যারা ছিলেন যথাক্রমে কালো এবং সাদা দলের নেতৃস্থানীয়। এই নির্বাসনের অতি অল্পকালের মধ্যেই রোগে পড়ে ক্যাভালকান্তির মৃত্যু ঘটে।

'কালো' দল তখন গিয়ে পোপের শরণাপন্ন হন, তিনি যেন যথাযোগ্য শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। পোপ উল্লসিত হয়ে উঠলেন, তাঁর আশা হল যে এই সূত্রে টাসকানি প্রদেশে তার আধিপত্য গড়ে উঠতে পারে। তিনি চার্লস নামক তাঁর মনোনীত এক ব্যক্তিকে পাঠালেন ব্যবস্থা গ্রহন করবার জন্য। পোপের গোপন নির্দেশ কি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন চার্লস এসেই (১৩০১ সালের নভেম্বর) নির্বাসিত কালোদের দেশে ফিরে আসবার অনুমতি দিলেন এবং সাদাদের উপর নির্যাতন শুরু করলেন। দুর্নীতি প্রভৃতি অপরাধের জন্য যাদের উপর দণ্ডাজ্ঞা হল তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দান্তে। তাঁর উপরে দণ্ড বিধান ছিল জরিমানা, অনাদায়ে প্রাণদণ্ড। দান্তে তখন অন্যত্র ছিলেন, জরিমানা যখন এসে পৌছল না তখন আদেশ হল দান্তেকে

ধরে আনতে পারলে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে। ফলে ১৩০২ সালের প্রথম থেকেই দান্তে স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে রইলেন।

নির্বাসিত জীবনে এসে পড়লেন দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের অনিশ্চয়তার মধ্যে। তাঁর অর্থসম্বল তো ছিলই না। তেমন নির্ভর যোগ্য অর্থপ্রতিপত্তিশালী বন্ধুও কেউ ছিল না, তখন পর্যন্ত তাঁর কবি খ্যাতি লাভ হয়নি। ইতালীর বিভিন্ন স্থানে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি অভিজাত পরিবারের আশ্রয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়; বলা হয় যে এরই মধ্যে কোনও সময়ে তিনি প্যারিসে এমনকি অক্সফোর্ডে গিয়েও অধ্যয়ন করেছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কাটে র‍্যাভেনার এক বিশিষ্ট পরিবারের সম্মানিত অতিথি হিসাবে। এই সময়টা অপেক্ষাকৃত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ তাঁর জীবনে ঘটেছিল। এখানে থেকেই তিনি কোনও রাষ্ট্রনৈতিক দৌত্যকার্যে প্রেরিত হয়েছিলেন ভেনীসে। সেখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বস্থানে ফিরে আসার পরেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। নির্বাসন কালের এই উনিশ বৎসরের জীবনের দুঃখকষ্ট দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা যে কি নিদারুণ হয়েছিল, বিশেষতঃ তাঁর মত একজন সংবেদনশীল কবির পক্ষে তাঁর আভাস পাওয়া যায় তাঁর কাব্য গ্রন্থে ডিভাইন কমেডি, প্যারাডাইস ১৭শ খণ্ডে—পরানুগৃহীত অন্ন গ্রহণ এবং পরের ইচ্ছার অনুসরণে পথ চলার দুর্ভাগ্যের কথা।

দান্তে শুধু একজন সংবেদনশীল কবি ছিলেন না, তার উপরে তিনি ছিলেন একজন অধ্যয়নপরায়ণ এবং মননশীল দার্শনিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ভিটা নুওভা রচনার কিছুকাল পরে থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিপর্যয়ের আগে পর্যন্ত তিনি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন, তার ফলে তিনি বুঝতে পারলেন যে মানুষের জীবনের সুখ শান্তি লাভের পথে প্রধান বাধা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অরাজকতা। তিনি তখন 'সাদা', 'কালো', 'গুয়েলফ', 'ঘিবেলীন', সকল দলের সংস্রব ত্যাগ করলেন। তিনি ধারণা করে নিলেন যে তিনি নিজেই স্বতন্ত্র একটি দলের প্রতিভূ বা প্রতীক। তিনি বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। ল্যাটিন সাহিত্যে এবং ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত সকল গ্রন্থ—প্ল্যাটো, সিসেরো, ভার্জিল, ওভিড, হোরেস, স্টাটিয়াস প্রভৃতি। তাকে সাহায্য করবার জন্য কোনও শিক্ষাদাতা ছিল না, গ্রন্থাদি সংগ্রহ করাও তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেনওনি। তিনি একজন শিক্ষিত লোক, তথাপি তাঁর পক্ষে সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট উপলব্ধি কতকটা কঠিন বোধ হত; তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন এবং ভাবতে লাগলেন যে আরও যে সকল লোক এসব অধ্যয়ন করতে আগ্রহান্বিত, তাদের মধ্যে যাদের তাঁর নিজের মত জ্ঞান বুদ্ধি বা মননশীলতা নেই তাদের পক্ষে এসকল অধ্যয়নে চূড়ান্ত ফল লাভ করা আরও কত কঠিন।

দান্তে আরও উপলব্ধি করতে লাগলেন যে এসব বিষয়ে জনগণের শিক্ষাদানের কোনও ব্যবস্থা নেই। কে এই দায়িত্বভার নিতে পারে? এক আছে চার্চ; তারা নেবেন না, কারণ তারা গতানুগতিক ভাবে কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলেছেন, জনগণের সুখশান্তির জন্য যে এসব প্রয়োজন সে বিষয়ের প্রাধান্য স্বীকারের কথা ভাবতেও তারা অভ্যস্ত নন। এই ব্যাপারটা দান্তের নিকট একটা সমস্যা বলে মনে হল। তখন তিনি ভাবলেন যে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত তাঁর সকল

অধ্যয়নের ফল এবং সকল সমস্যা নিয়ে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করবেন। এই গ্রন্থে তাঁর সকল অধ্যয়ন ও মননের সকল ফলাফল সপ্রকাশিত এবং সংগ্রথিত থাকবে এবং ল্যাটিন ভাষায় না লিখে তিনি এই গ্রন্থ লিখলেন দেশীয় ভাষায় যাতে জনসাধারণও এর মর্মগ্রহণে সমর্থ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশীয় ভাষায় বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনার কল্পনা ছিল অনেকটা বিদ্রোহ বিপ্লবের মত ব্যাপার। এই থেকেই বোধ হয় দেশীয় ভাষার প্রথম মর্যাদা লাভ ঘটল, এই ভাষারই পরিণতি ফল বর্তমান ইতালীয় ভাষা। এই ভাষার সমর্থন করতে গিয়ে দান্তে তখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন —এক নতুন আলোকের আবির্ভাব, এক নতুন সূর্য্যের অভ্যুদয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন অতিপরিচিত সূর্য্যের ল্যাটিন ভাষার অস্তগমন; ল্যাটিন ভাষা জনসাধারণকে আলোক দান করতে পারেনি, এই নতুন ভাষা তাদের পথ প্রদর্শন করবে। দান্তের সেদিনকার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি।

'ব্যাঙ্কোয়েট' নামে এই পরিকল্পিত গ্রন্থে থাকবে পনেরোটি খণ্ড, প্রথম খণ্ডে ভূমিকা এবং অবশিষ্ট চৌদ্দটি খণ্ডে তাঁর বক্তব্য দর্শনের কথা থাকবে কাব্যে গ্রথিত; প্রত্যেক খণ্ডের শেষে থাকবে গদ্য ভাষায় ব্যাখ্যা রচনা। এই গ্রন্থের প্রথম চারটি খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় আর অগ্রসর না হওয়ার পক্ষে দুটি কারণের কথা বলা হয়; প্রথমতঃ রচনা কবির নিজের নিকট আশানুরূপ সার্থক বলে বোধ হয়নি, কতকটা যেন মধ্যযুগসুলভ অস্পষ্টতা তার মধ্যে রয়ে গেছে; দ্বিতীয় কারণ এই গ্রন্থে দর্শনতত্ত্বকে এরূপ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে সেটাকে সেযুগে প্রচলিত ধারণার পক্ষে বিদ্রোহই বলা চলে, এতে সামাজিক ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে, সকল দিকে বিবেচনা করে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন, কোনও দিকে যেন পথ দেখতে পেলেন না। তাঁর এই সময়কার মনোভাবই যেন তাঁর প্রধান কাব্য ডিভাইন কমেডির প্রস্তাবনায় অন্ধকার বনভূমি বলে চিত্রিত হয়েছে।

দান্তে যে সে সময়কার সমাজ জীবনের নানাপ্রকার দুর্নীতি এবং তাঁর ফলে অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন তার পরিচয় রয়ে গেছে এই 'ব্যাঙ্কোয়েট' কাব্যের মধ্যে। কিন্তু তাঁর দর্শন মতবাদের পূর্ণ বিস্তৃতি দেখা যায় তাঁর সেই সময়কার শেষ গ্রন্থে 'দে মনার্কিয়া।' তাঁর তত্ত্বপ্রচারক গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থই ছিল সর্বসম্পূর্ণ এবং সুগঠিতও বটে। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে এই গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় রচিত। নানা দিক বিবেচনা করে তিনি এইটেই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। দান্তের কয়েক বৎসর পরে পোপের নির্দেশে এই গ্রন্থ খুঁজে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেই সময়ে ক্ষীণবল সম্রাটের আধিপত্য থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা চলছিল। তারা প্রচার করেছিলেন যে চন্দ্র যেমন সূর্যের উপর নির্ভরশীল তেমনই রাজাও পোপের উপর নির্ভরশীল। 'দে মনার্কিয়া' গ্রন্থে অগ্রাহ্য করে দান্তে বললেন যে রাজা এবং পোপ উভয়েই স্ব স্ব প্রধান যেন সূর্য এবং তারা। উভয়েই একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভরশীল এবং উভয়ের লক্ষ্য মানুষের জন্য ইহজগতে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পরলোকে আত্মার মুক্তিসাধন। সেকালের সেই ধর্মীয় অনুশাসনের যুগে দান্তের স্বচ্ছ স্বাধীন মতবাদের মূল্য উপলব্ধি করবার মত মনোবৃত্তির অভাব ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালের কষ্টি পাথরে দান্তের মতবাদের মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

দান্তের 'দে মনার্কিয়া' গ্রন্থের যেরূপগতিই হয়ে থাক তাতে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কারণ

এই গ্রন্থের মূল ভাবনা চিন্তা প্রায় সবই তাঁর অমর কাব্য 'ডিভাইন কমিডি'তে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে বিবৃত হয়ে রয়েছে কোথাও স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে কোথাও বা অন্য প্রসঙ্গের সহিত জড়িত হয়ে। সেই হিসাবে তাঁর 'ব্যাঙ্কোয়েট' কাব্যগ্রন্থ যে অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রইল তার জন্যও দুঃখ করবার কারণ নেই, তাঁর যত অর্জিত বিদ্যাসম্পদ এবং মননশীলতা যা তিনি সুষ্ঠু সুন্দরভাবে প্রকাশ করে উঠতে পারছিলেন না, তাও 'কমিডি' গ্রন্থে প্রত্যয়সিদ্ধরূপে অপরূপ গরিমায় প্রকাশ লাভ করেছে। এমনকি বিয়াত্রিচের সহিত তাঁর প্রেমের ভাবাবেগের অনুপ্রেরণা তাঁর কিশোর বয়সে রচিত কবিতাগুলি গ্রথিত করে তাঁর প্রথম জীবনের যে সুচারু কাব্যগ্রন্থ 'ভিটা নুওভা' তাও যেন তাঁর 'ডিভাইন কমিডি' কাব্য গ্রন্থে প্রসারিত হয়ে গরিমাময় রূপ লাভ করেছে। যেখানে 'পারগেটোরি' পর্বতের স্বপ্নদেশে এবং শীর্ষদেশে বিয়াত্রিচে এসে দেখা দিলেন এবং দান্তেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। এই মহাকাব্যের মধ্যে কবির সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান সম্পদ, তাঁর সমীক্ষা নিরীক্ষা ধ্যান ধারণা এবং তাঁর সমস্ত জীবনের সকল অভিজ্ঞতা যেরূপ সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাও এক পরম বিস্ময়ের বিষয়।

দান্তের সমগ্রজীবন যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখদুর্গতিরও কাহিনী, নিদরুণ জীবনঅভিজ্ঞতার দুঃস্বপ্ন যেন একটা ট্র্যাজেডি। কিশোর বয়সে তাঁর জীবনে যে প্রেমের আবেগ অনুভূতি এবং মোহময় স্বপ্ন কল্পনা এসে দেখা দিল, তাঁর সার্থকতা লাভ দূরে থাক, অঙ্কুরোদগমের পূর্বেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, কিন্তু তাতে তাঁর জীবনে যে রেখাপাত করে গেল তার কখনও বিলুপ্তি ঘটে নি। পরবর্তী জীবনে তিনি পত্নী গ্রহণ এবং সন্তান লাভও করেছিলেন বটে কিন্তু দাম্পত্য জীবনের বা পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি লাভ তাঁর অদৃষ্টে ঘটে নি। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে বহুকালব্যাপী যে যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল তাঁর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ তাঁর জীবনের অর্ধেককাল কেটে গেল দুঃখ বিপাকের অভিজ্ঞতায় জর্জরিত অবস্থায়। তার পরের অভিজ্ঞতা আরও নিদারুণ; রাজনীতির বিপর্যয় সঙ্কটে তার অদৃষ্টে ঘটল দেশ থেকে চির নির্বাসন, ফলে তাঁর সমগ্র জীবন যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেল কিন্তু তাঁর জীবনের ব্যাপক এবং গভীর দুঃখ দুর্গতির অভিজ্ঞতায়ও তার প্রাণশক্তি এবং তার প্রতিভা নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। তিনি দেখতে পেলেন, রাজনীতির বিপর্যয়ের ফলে দেশের সমাজজীবনও নানা দুঃখ দুর্দশায় জর্জরিত, তাতে আবার ইন্ধন যুগিয়েছে রাজশক্তির সঙ্গে ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের বিরোধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সমাজজীবনের এই সকল সঙ্কট সমস্যার সমাধান কল্পে দান্তে অধ্যয়ন মনন গবেষণা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ হল না। সর্বাপেক্ষা তাঁর এই মহাকাব্য রচনা যেন তাঁর সমগ্র জীবনের এবং মানস জগতেরও সকল দুঃখ জ্বালায় অগ্নি দহনের পরিশুদ্ধির পরিণতিতে ফুটে উঠল তার জীবনসাধনার এই সার্থক সৃষ্টি। দান্তে এই কাব্যের নামকরণ করেছিলেনThe Comedy ; পরে ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্য রসজ্ঞদের অভিমত অনুসারে এই মহাকাব্য The Divine Comedy নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই মহাকাব্যের বিষয় বস্তুর আলোচনার পূর্বে কাব্যের গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবার কথা নয়। দান্তের আমল ছিল ক্যাথলিক ভাবধারার যুগ, দান্তের জীবনও এই আদর্শ এবং পরিবেশেই গড়ে উঠেছিল। এই ধারার মূল কথা ছিল, সমস্ত বিশ্বব্যাপার

এক সর্বজ্ঞ এবং সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর বা ভগবৎ শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বিধৃত, এই ভাবাদর্শর মধ্যে আবার দুটি ধারা, একটি অদ্বৈতবাদ এবং অপরটি ত্রিত্ববাদ—ত্রিত্ববাদের মূল কথা পিতা, পুত্র এবং আত্মিক শক্তির সমবায়ে ঈশ্বর বা ভগবৎ শক্তির কল্পনা বা এই দুই ধারার প্রতীক হিসাবে 'এক' এবং 'তিন' এই সংখ্যা দুটিকেও লক্ষণীয় বলে গণ্য করা হ'ত।

দান্তের চিন্তাধারায় সামঞ্জস্য এবং মাত্রাজ্ঞান ছিল বিশেষ লক্ষণীয়—তার ডিভাইন কমিডির গঠন পরিকল্পনায় তার পরিচয়ও খুব স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। পিতা, পুত্র এবং আত্মিক শক্তি, এই তিনের সমবায়ে যেমন ভগবৎ শক্তি বা পরমঈশ্বর তেমন নরক বা কৃতকর্মের ফলভোগ বা প্রায়শ্চিত্তের স্থান বা প্রেতপুরী এবং স্বর্গ-রাজ্য এই তিন খণ্ডের সমবায়ে তার মহাকাব্য; কাব্যের এক একটি খণ্ড যেন ত্রিত্ববাদের এক একটি অংশInferno-তে পিতার শক্তি, Purgatory-তে পুত্রের জ্ঞান গরিমা এবং Paradise-এ আত্মিক শক্তির প্রেম বা করুণা। কাব্যের এক একটি খণ্ডে আছে তেত্রিশটি সর্গ বা অধ্যায়; তিন খণ্ডে মোট নিরানব্বই অধ্যায়, তার সঙ্গে ভূমিকার এক অধ্যায় যোগ করে হয়েছে মোট একশত সর্গে কাব্য সমাপ্ত। 'একশত' সংখ্যাটি 'দশ' সংখ্যার বর্গমূল। প্রত্যেক 'দশ' সংখ্যার মধ্যে আছে, 'তিন' সংখ্যার বর্গমূল এবং আরও 'এক' সংখ্যা। ত্রিত্ববাদের প্রতীক 'তিন' এবং সেই তিনের সমবায়ে যে এক পরমেশ্বরের কল্পনা তার প্রতীক 'এক'। আবার সমস্ত কাব্যে রচনার একই ধারা তিনটি পঙক্তিতে এক একটি স্তবক। দান্তের ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ তিনটি ঘটনা। বিয়াত্রিচের প্রথম দর্শন লাভ হয় দান্তের বয়স যখন নয় বৎসর, দ্বিতীয়বার দর্শন লাভের সময় দান্তের বয়স ছিল আঠার বৎসর এবং বিয়াত্রিচের অলৌকিক দর্শন লাভের সময় দান্তের বয়স ছিল সাতাশ বৎসর। লক্ষ্য করবার বিষয় এই তিনটি সংখ্যাই তিন সংখ্যার গুণিতক।

এই মহাকাব্যের বিশদ পরিচয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়, এ স্থলে শুধু কাব্যের বিষয়বস্তুর একটু নির্দেশ বা মূল কথা জানান যেতে পারে। ডিভাইন কমিডি একটি রূপক কাব্য; রূপক কাব্যের থাকে বাস্তব জগৎ সুলভ একটা আখ্যায়িকা অংশ এবং আখ্যায়িকার অন্তরালে ফল্গুধারার মত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে একটি গভীর অর্থ দ্যোতনা। দান্তে যেন অন্ধকার বনভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। সূর্যোদয় হলে দেখতে পেলেন একটি মনোরম পর্বতের দৃশ্য। পর্বতের দিকে অগ্রসর হওয়ামাত্র তার পথ রোধ করে দাঁড়াল একটি চিতা বাঘ, একটি সিংহ এবং একটি নেকড়ে। এমন সময় দেখতে পেলেন একটি ছায়ামূর্তি। ভার্জিলের প্রেতমূর্তি এগিয়ে এসে বললেন তোমার প্রতি সহানুভূতি বশতঃ বিয়াত্রিচে আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে তার নিকটে নিয়ে পৌঁছে দেবার জন্য; কারণ কোনও জীবিত মানুষের সাধ্য নেই এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে পারে। ভার্জিল দান্তেকে নিয়ে চললেন নরকের পথে এবং নরক রাজ্যের মধ্য দিয়ে; পথের বিভিন্ন স্তরে পরলোকগত বহুজনের সঙ্গে দেখা হল। প্রথম স্তরে তারা দেখতে পেলেন। হোমার, হোরেস ওভিড, লুকান-এরা খৃষ্টের জন্মের পূর্বে জীবিত ছিলেন, সেজন্য তারা খৃষ্টধর্মের জ্যোতি বা করুণা-কল্যাণ লাভ করতে পারেন নি, সেজন্য তারা অনন্তকালের জন্য এখানে আবদ্ধ হয়ে আছেন। কিন্তু পাপীদের মত তাদের কোনও প্রকার শাস্তি বহন করতে হয় না। এক স্তরে এসে দেখলেন ইন্দ্রিয়-

দেহ ভোগ বিলাসীদের মধ্যে আছেন সেমিরেমিস, ডিডো, ক্লীওপেট্রা, হেলেন, একিলীস, প্যারিস, ট্রিষ্টাম, পাওলো, ফ্রানসেস্কা। পাপের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে নরক রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে পূর্বপরিচিত দান্তের অনেক আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা হল।

নরকের বিস্তৃত রাজ্য অতিক্রম করে তারা গিয়ে পৌঁছলেন দ্বিতীয় সর্গে—প্রেতভূমি পারগেটোরিতে যেখানে পাপীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে থাকে। এখানেও অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এবং নিয়তি, পুরুষকার প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হ'ল। পারগেটোরির শেষের স্তরে এসে বিয়াত্রিচের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভার্জিল বিয়াত্রিচের হাতে দান্তেকে পৌঁছে দিয়ে তিনি নিজে অন্তর্হিত হলেন, কারণ তার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। বিয়াত্রিচে দান্তেকে নিয়ে পৌঁছে দিলেন বারনারড-এর হাতে, তার বেশি উর্দ্ধগতি দান্তের পক্ষে এখনও সাধ্য বা সম্ভব ছিল না। বিয়াত্রিচে স্বস্থানে ফিরে যাবার পূর্বে দান্তেকে যথাসম্ভব উর্দ্ধগতির পথে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। প্রসঙ্গত: গ্যেটের 'ফাউষ্ট' কাব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে : মার্গারেট পিতা পুণ্যবলের প্রসাদে স্বর্গরাজ্যে পৌঁচেছেন, কিন্তু ফাউষ্টের উদ্ধার সাধন না হওয়া পর্যন্ত স্বর্গ-রাজ্যে গিয়েও তার মনে আনন্দ নেই, চিত্তে শান্তি নেই। দান্তের এই মহাকাব্যের তাৎপর্য ক্যাথলিক মত অনুসারে মানবাত্মার নরক, প্রায়শ্চিত্তের প্রেতপুরী এবং স্বর্গরাজ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কল্পনা। মৃত্যুর পরে মানবাত্মার অবস্থার চিত্র কল্পনা।

আজকের কবিতা ও পাঠক

আজকের পাঠকের মুখেও যখন সাম্প্রতিক কবিতার দুর্বোধ্যতার কথা শোনা যায় তখন তাকে মনে হয় সেই পুরোনো ঘটনারই অনুসরণ। আজকের পাঠক নিঃসন্দেহে বুদ্ধিজীবী। তার মনের কাঁচা মাটিতে এখন অনেক রোদ-জল-ঝড়ের আঘাত পড়েছে। মাটিও শক্ত হয়েছে। তবুও কবিতার ক্ষেত্রে পাঠকের এই অনুদারতা একদিক থেকে বেদনাদায়ক। পাঠকের দিক থেকে দেখা যায়, কাব্য পাঠকের চেয়েও গল্প-উপন্যাসের পাঠক-সংখ্যা বেশি। সাম্প্রতিককালে যখন ছোটগল্প উপন্যাসও নতুন পথে যাত্রা করেছে এবং ছোট গল্প যেখানে কবিতার নিকটতর প্রতিবেশী, সেখানে পাঠকের মন কাব্যপাঠের প্রস্তুতি পেয়েছে আশা করা যায়।

কিন্তু উন্নাসিক কিছু কবিকুল যদি পাঠককে অগ্রাহ্য করে কাব্য রচনা করতে চান, এবং নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমিত পাঠক রাখেন তবে তাঁরাও ভুল করবেন। কেন না সাহিত্য যতই উদ্দেশ্যহীন হোক, পাঠক নিরপেক্ষ নয় কখনোই। কবিতা রচনা করবার সময় সামনে পাঠকের উপস্থিতি কবিকে অনুভব করতে হয়। আমি একথা বিশ্বাস করি, জনসাধারণের সাহিত্য বলে কোনও উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য নেই। সাহিত্য বস্তুটি বিশেষ শিক্ষিত মনের (তথাকথিত শিক্ষিতের কথা বলছি না) অনুভবের বস্তু। সাহিত্যরসবোধ ব্যাপারটি কিছু কিছু মনের অধিকারমাত্র। সর্বক্ষেত্রে তাকে পাওয়া যায় না। তবুও কবিতার চারপাশের পরিবেশের মধ্যে পাঠক অন্যতম— বলা যায় উদ্দীপন বিভাগ। সুতরাং পাঠকের প্রতি কবির একটি দায়িত্ব আছে। কবির উন্নাসিকতা এবং পাঠকের অনুদার মন, এই দুয়ের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে জন্ম আজকের কবিতায়।
আমি আধুনিক কবিতা শব্দটি ব্যবহার করতে চাই না। কেন না আধুনিক কথাটার কাল সীমা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এক হিসেবের যে-কোনও কবি বা কাব্যই তাঁর কালে আধুনিক। হেমচন্দ্র কিম্বা নবীন সেন তাঁদের কালে আধুনিক বলেই গণ্য হতেন। কাজেই বলতে চাই আজকের বা সাম্প্রতিক কবিতা এবং সাম্প্রতিক পাঠক।

কাব্যে আধুনিকতা বস্তুটি কি? অধুনা থেকে আধুনিক। যে কাব্যে বিশেষ যুগ-কাল প্রকাশ পায় তাই আধুনিক। সাম্প্রতিক সমালোচকের ভাষায় শুনেছি: কবিতার পরিচ্ছদ বা রচনাকাল কোনও কবিকে আধুনিক আখ্যাত করে না। যিনি তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তির দ্বারা ছিন্ন ব্যক্তিসত্তাকে উপলব্ধি করেন তিনিই আধুনিক। আধুনিক কবি অবনত মানুষের বৈরাগ্য ও যন্ত্রণাকে পাশাপাশি রেখে দেখতে চান।

কিন্তু এই ব্যাখ্যায় আধুনিকতা বিষয়টি কি স্পষ্ট হলো? সাহিত্য দেববাদ থেকে ব্যক্তিবাদে পৌঁছনো মাত্র যে কবিতার জন্ম হলো, তখন থেকেই এক আত্মানুসন্ধানের কাজ চলেছে। নিজেকে

জানো এবং জানাও—এই মন্ত্রই কবির মন্ত্র। কবির মধ্যে আত্মঘোষণার আকাঙ্ক্ষাই আধুনিক কবিতার জন্ম দিয়েছে, কাব্যশিল্পের উদ্ভাবন, দেখিয়েছে। এই কাজ বলা চলে কবির। তিনি প্রাচীন হতে পারেন (যেমন বিহারীলাল) আধুনিক হতে পারেন। বিহারীলাল আজকের দিনে আর আধুনিক নন। যন্ত্রণা ও বৈরাগ্যকে পাশাপাশি রেখে দেখার দৃষ্টি সাম্প্রতিক কবির, হয় তো বা আধুনিক কবিরও। কিন্তু ওটিই আধুনিকতার সংজ্ঞা নয় আধুনিক কবি তাঁর কাল থেকে বিচ্ছিন্ন নন কখনোই। তিনি সমকালে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে আত্মঘোষণা করেন। আসলে পাঠকের পক্ষে বিপদের কারণ এইটেই, সাম্প্রতিক কবিতায় যখন যুগের ঝড়ঝঞ্ঝা তাণ্ডবলীলা ধারণ করে, তখন সেই অস্থির অবস্থা তার মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। আধুনিক হওয়ার দুর্বার প্রয়াস কবিদের মধ্যে প্রায়ই লক্ষণীয়। পাঠককে তারই খেসারৎ দিতে হয়। এই আধুনিকতা একটা ফ্যাসনের নামান্তর। যুগপ্রভাব বজায় রাখতে গিয়ে এখনকার বহু কবিতায় রক্তপাত, শবাধার, চিৎকার, আত্মদহন, ছিন্ন, স্খলিত ইত্যাদি শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায়। একই শব্দ যখন বিভিন্ন কবির হাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে প্রকাশ পায় তখন শব্দটি শক্তিমান হয়ে ওঠে। কিন্তু অর্থের বিশেষ তারতম্য না হলে শব্দ বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে আধুনিকতা ফ্যাসনেরই নামান্তর। কবিতা যুগ-কাল-সময় উত্তীর্ণ হয়ে চিরায়ত হয়ে উঠলে আধুনিক বা সাম্প্রতিক হয়ে ওঠে না। তখন তা শুধুই—একান্তই কবিতা।

কাব্যে যুগ-জীবনের প্রতিফলন একটা স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে কাব্যরস নামক একটি অশরীরী বস্তু আছে। সেটি অনুভব করবে পাঠক। কবিতা যদি শুধুমাত্র কবির নিজস্ব উপলব্ধি এবং নিজস্ব বোধের বস্তু হয়, তবে তাকে বিকৃত মস্তিষ্কের প্রকাশ বলা অসঙ্গত নয়। কবিতার কোনও সংজ্ঞা নেই, কিন্তু কবিতার একটি মানসিক মূর্তি আছে। ব্যাকরণের মতো কোনোও সংজ্ঞা দিয়ে তাকে প্রকাশ করা অসম্ভব। তবুও, এটুকু বলা যায়, কবিতার মধ্যে একটি বক্তব্য থাকবে, এবং তার মধ্যে কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর তার ঘোষণা রাখবে। একটা আশ্চর্য ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে সেই ভাব, সেই বক্তব্য। এজন্য কবিতায় ব্যঞ্জনা ও ইমেজের এতো প্রয়োজন। বিশেষ শব্দের চাকচিক্য, ছন্দের দোলন কোনওটিই কবিতা নয়। এগুলি তার বাইরের আবরণ। ব্যঞ্জনা ইমেজ সব কিছুকে নিয়ে এবং সব কিছুকে ছাড়িয়ে একটি সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠাই কবিতার কাজ। আজকের কবিতায় যে ফাঁকটুকু থাকে, তা পাঠককে সমীহ করার ফল। ওটুকু ফাঁক পাঠকের বুদ্ধিতে পূরণ করা চলে। কবি সবটুকু প্রকাশ করেন না। ওই অপ্রকাশটুকুই কবিতার ব্যঞ্জনা। তাকে বোঝা যায়, বুঝিয়ে দেওয়া কষ্ট। এক্ষেত্রে আমরা সামান্য উদাহরণের সুযোগ নিতে পারি।

১) আমাদের ঘাসের সমুদ্রে অনেক সবুজ শঙ্খমালার জন্মদিন।

২) সমুদ্র দেখলে জন্মদিনের সকাল মনে পড়ে যায়।

৩) কিম্বা অতি বর্ষণের | রুগ্ন ময়ূরের দল ভিড় করে রাজপথে।

৪) তোমার বাউল দিনের মাটিই আমার প্রথম স্বদেশ

৫) কোন পাখি অসুখের মতো করে বেঁধেছিল ঘনিষ্ঠ সংসার।

৬) এই মৃত নগরীর মধ্যে | দীর্ঘদিন কোনো পান্থশালা কোনো হাহাকার আছে | যাকে

আমি কোনোদিন খুঁজে পাইনি | ……আমি শুনি | দূরের ঘণ্টার ধ্বনি নিজেকেই ডাকে বারে বার।

সাম্প্রতিক কালের কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই লাইনগুলি সহৃদয় পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারেন। এর মধ্যে যেটুকু অস্পষ্টতা আছে তা প্রয়োজনীয়। পাঠকের মনে চিন্তার ছবি অনায়াসে ফুটে উঠে। এগুলিই কবিতার ব্যঞ্জনা ও ইমেজ। অনেকটা জলরঙা ছবির মতো, ধোয়া ধোয়া রং, আবছা তুলির টান, অথচ ভালোলাগার আকর্ষণ সজীব রাখে।

প্রায়ই দেখা যায়, অজস্র ভিড়ে কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত। একই ধরণের ইমেজের বহুল ব্যবহার এবং আপন কণ্ঠকে উচ্চ গ্রামে তুলতে গিয়ে কবিতার ফাঁকগুলি এত বেশি চওড়া হয়ে পড়ে যখন অস্থির পাঠক কবিতার ওপর সেই দুর্বোধ্যতার অভিযোগ চাপিয়ে শান্তি লাভ করেন।

অথচ সাম্প্রতিক কবিতার ছোট খাটো বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাঠককে সমীহ করবার অজস্র প্রতিশ্রুতি আছে তার মধ্যে। (ছোট খাটো বৈশিষ্ট্যের কথাই বলছি, যেহেতু বিস্তৃতভাবে সাম্প্রতিক কবিতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার সুযোগ এখনও আসেনি)। একজন সমকালীন পাঠক হিসেবে বলতে পারি যে কবিতা আমাকে ভাবায় না, তাকে কবিতা বলতে অস্বীকার করবো। পাঠকের বুদ্ধির এবং অনুভূতির দরজায় কবিতাকে পৌঁছে দেওয়াই তো কবির কাজ।

আর একটি ছোট উদাহরণ হাতের কাছে পাওয়া যায়, সেটি হলো, বহুক্ষেত্রেই কবিতায় যতিচিহ্নের অব্যবহার। এটিও পাঠকের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই উদ্ভূত। পাঠক অনায়াসেই যথাস্থানে যতিচিহ্ন বসিয়ে নিতে পারে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

পথে পথে সহরের ঘূর্ণিভিড়ে সহরতলিতে
আমার বন্ধুবর আমি
　　　　কখন হঠাৎ
আমাদের বয়সের ছায়া নেমে আসে
শব্দের ধূসর সারি স্বপ্নের ধূসর ক্লান্তি আর
সমস্ত পথের মোড়ে থমকানো আলো।

কবিতার এই স্তবকটিতে উপযুক্ত ছেদচিহ্ন আমরা অনায়াসেই বসিয়ে নিতে পারি।

পাঠকের কানকে পীড়িত না করার জন্যই অভিনব শব্দপ্রয়োগ, ছন্দের বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য এটা ঠিক নতুন ঘটনা নয়। কবিরা চিরদিনই পাঠককে সম্মুখে রেখে কবিতা লিখেছেন। আজকের কবি সেক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বেশিই সমাদর করেছেন।

পাঠক ও কবির মধ্যে সহৃদয় হৃদয় সংবাদের প্রয়োজন, নইলে কাব্যরচনা নিরর্থক। জীবন যতোই জটিল হোক কবিতা তার নিজস্ব মণিদীপ্ত কক্ষে থাকবেই। জোর করে কবিতায় রূঢ়-নগ্ন বাস্তবতা আনলে নতুনত্ব আসতে পারে কিন্তু কাব্যেরও মৃত্যু ঘটে। পূর্ণিমা চাঁদকে 'ঝলসানো রুটি'·বললে অভিনবত্ব দেখা যায়, যুগজ্বালাও প্রকাশ পায়—কবিতা চিরায়ত হয়ে ওঠে না। যুগে যুগে এক্সপেরিমেন্ট চলতে পারে, কিন্তু যথেচ্ছ শব্দ ব্যবহারের গুরুচণ্ডালী দোষ কবিতায় কোনও

স্থায়ী আসন পাবে না। কালের খতিয়ানে সেই সব কবিতা কতো কাল টিঁকে থাকবে বলা শক্ত।

কিন্তু পাঠকের মনকেও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দেওয়ার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর জন্য আরো কবিতা পাঠের প্রয়োজন। (আমি আরো কবিতা পড়ুন আন্দোলনের কথা বলছি না। আন্দোলন করে কবিতার প্রচার হয় না)। সর্বসংস্কারমুক্ত শিক্ষিত পাঠকমন তৈরি হলে কবিতাও দুর্বোধ্যতার মুখোশ খুলবে। যে জিনিস একবার পড়ে ভালো লাগেনি দ্বিতীয় তৃতীয়বারে তা ভালো লাগতে পারে। আসলে নতুন জল হাওয়া সহ্য হতে সময় নেয়। পাঠকের বুদ্ধিতে মরচে না পড়লে অন্তত কিছু সাম্প্রতিক কবিতা অপাঠ্য হয়ে উঠবে না বলে আশা করা যায়।

ইদানীং কবিতার পাঠক সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বাকিরা কবি এবং কবি পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত গ্রহ উপগ্রহ। এই নিয়ে কি বাংলা কবিতার পাঠক তৈরি হবে? বাংলা কবিতা কি জীবনানন্দ দাশের পর থেমে যাবে? এমন ভ্রান্ত ধারণা পাঠকের মন থেকে মুছে দিতে পারেন পাঠকই, যিনি সত্যিকার সহৃদয়। বাংলাদেশে আজ কবি ও কবিতাপত্রিকার অভাব নেই। এই ভিড়ে পাঠক হোঁচট খেতে বাধ্য হবেন। কবিতার গুণাগুণ নির্ণয়ে হয়তো দিশেহারা হয়ে পড়বেন। তবে অজস্র খারাপ জিনিসের মধ্যে ভালো জিনিসের স্বাদ অবশ্যই মিলবে। অন্তত এ বিশ্বাস আমাদের এখনো আছে।

সুচেতা ভট্টাচার্য

আকাশ প্রদীপ ॥ সুখরঞ্জন রায়। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ—কলিকাতা-১২। মূল্য ৩'০০।

বর্তমানকালের মানুষ প্রতিমুহূর্তে বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। সে তার আপন কল্পনাতেও আস্থা স্থাপন করে থাকতে পারে না; কারণ সেক্ষেত্রেও বাস্তবতার সংঘাতে আঘাতপ্রাপ্তির আশঙ্কা বিদ্যমান। ফলতঃ অন্তরাবেগের অভিব্যঞ্জনা, কেবল বিতৃষ্ণা আর অবিশ্বাসের অভিব্যক্তিই সে সকল কাব্যে ফুটে ওঠে। আধুনিক কবিতার যেখানে এহেন অবস্থা সেখানে সুখরঞ্জন রায়ের 'আকাশ প্রদীপ' এর মত একটি পরিপূর্ণ রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থ বর্তমান যুগের মনন-ধ্যানকে কতখানি ব্যক্ত করতে পারবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। বস্তুত আকাশপ্রদীপ একটি পথিকের আত্মিক আরোহণের কাহিনী। এ পথিক সার্বজনীন পথিক—উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ, প্রথমপুরুষ, যে কেউই এ পথিক। প্রত্যেক মানুষেরই নিগূঢ় বাসনা কোন এক অতীন্দ্রিয় চিরন্তন সত্যের দিকে ধাবমান। তাঁর কাছে জাগতিক ভোগ একসময় অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্যও, শিশুর চুষিকাঠির ঝুমঝুমির মতো অবাঞ্ছিত, অতিরিক্ত বলে মনে হয়। তখন তার পিয়াসী মন সন্ধান পেতে চায় এমন কিছুর যা হবে অশেষ অনন্ত অভঙ্গুর অপরিবর্তনশীল। প্রতিটি মানব মনে রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা বাসা বেঁধে আছে। 'আকাশপ্রদীপ' সেই চিরাচরিত আকাঙ্ক্ষার কথা স্বচ্ছন্দে এবং স্বচ্ছন্দে ব্যক্ত করেছে।

পথিকের ঊর্ধ্বযাত্রার বিবরণ দিতে গিয়ে কবিকে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন রূপকের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইত্যাকার মাধ্যমে কবি হয়তো বিভিন্ন ধরনের লোকের সঙ্গে পথিকের সংস্পর্শকে বোঝাতে চেয়েছেন। সেসব মানুষ কখনও অন্ধবিশ্বাসে জর্জরিত ভীত সন্ত্রস্ত, আবার কখনও অজ্ঞানতার অন্ধকারের আবরণে ঢাকা কৃত্রিম ও আবেগশূন্য। এরই মধ্যে থেকে পথিক খুঁজে নিতে চাইছে আপনার ঈপ্সিতাকে। কিন্তু প্রাপ্তির পরেও পথিকের মনে হলো এ পাওয়া পরিপূর্ণ করে পাওয়া নয়। বুঝতে পারল রমণীর সাথে মিলনে একটা সাময়িক সুখের আস্বাদন পাওয়া যায় বটে তবে সেটাকে তার সাধনার একমাত্র মোক্ষ বলা যায় না। পথিকের আকাঙ্ক্ষা : 'অমর প্রেমের ছুটি।' রমণীর প্রেমে অমরত্ব নেই, তা কখনও ভাবনায় উজ্জ্বল, কামনায় উদ্বেল আবার কখনও পঙ্কে কলঙ্কিত অপ্রত্যাশিতের আঘাতে জর্জরিত। কবির এ প্রত্যয়ও চিরন্তন ও সার্বজনীন। সুতরাং তাঁর কাব্য কল্পনাশ্রিত হলেও মানব জীবনের চিরাচরিত রীতিনীতিকে ব্যক্ত করেছে।

বলাবাহুল্য 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ও হেমচন্দ্রের 'ছায়াময়ী'র প্রভাব পরিলক্ষিত। তৎসহ শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' এবং 'দি মারচেন্ট অফ ভেনিস' নাটক দুটিকেও যোগ করা যেতে পারে :

১। 'আকাশ প্রদীপ'-এর ভূত তাড়ানোর মন্ত্রটি (পৃঃ ৮) মনে করিয়ে দেয় ম্যাকবেথের

ডাইনীদের প্রায় একই ধরনের মন্ত্রোচ্চারণ :—

...Eye of newt and toe of frog

Wool of bat and tongue of dog

...etc (IV, 1, 14...36)

২। পথিক ও রমণীর পরস্পর প্রেমাবৃত্তিতে (পৃ: ৫৬।৫৭) 'দি মারচেণ্ট অফ ভেনিসের' লোরেনজো জেসিকার প্রেমালাপ বাক্যের পুনর্ব্যবহারের প্রক্ষেপ বিদ্যমান—

Lor. ...in such a night...etc.

Jes. In such a night...etc.

(V, 1, 1...20)

কাব্যের ছন্দ, ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্র বিশেষে কখনও লিরিক ধর্মী আবার কখনও অমিত্রাক্ষর। গতি সাবলীল ও নিরলস। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে পাঠ করতে পারলে কাব্যের আবেগ পাঠকের হৃদয়-দ্রাবণে সফল হবে।

অর্ধশতাব্দীর পর বইটির পুনর্মুদ্রণ হলো। বর্তমান গ্রন্থটির সামনে এবং পিছনের দিকে বিশিষ্ট সাহিত্য নেতৃবৃন্দের মিছিলের মাঝখানে কাব্যকাহিনীটিকে স্থাপন করে গ্রন্থনায় পারিপাট্য আনা হয়েছে। এতে কাব্যটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য, কিন্তু এটি সাধারণ পাঠকের কতখানি চিত্তাকর্ষণ করবে বলা কঠিন। কারণ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার সম্ভব তাতে হৃদয়-বিজয় হয় না।

পরিশেষে বলব, আধুনিক জীবন যাপনের জটিলতায় আমরা যতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি না কেন মাঝে মাঝে 'আকাশ প্রদীপ'-এর মতো রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থ সে জটিলতা থেকে আমাদের ক্ষণিকের জন্যও মুক্তি দেয়। অর্থলোলুপতা, সময় স্বল্পতা, অবিশ্বাস, হতাশা ইত্যাদি আমাদের পারিপার্শ্বিক বাতাসকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে রাখলেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি, মাথার উপর এখনও সুনির্মল আকাশ রয়েছে, পাখিরা এখনও গান গায়।

শোভন গুপ্ত

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 June '68 (0'50) Central Regd.No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

বিদগ্ধ দায়িত্ব...

একটি ভাল উপন্যাস বা গল্প
আপনাকে সহজেই
আগ্রহান্বিত করে, একটি
ভাল কবিতা মুহূর্তেই
আপনাকে অনুপ্রাণিত করে,
কিন্তু একটি প্রবন্ধ ?
তার দায়িত্ব অনেক বেশী।
আপনার বিদগ্ধ মনকে
সে ধীরে ধীরে
প্রভাবান্বিত করে, তাকে
বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে উত্তরণ করে'
বিদগ্ধতর করে তোলে।
সাময়িকতায় সে বিশ্বাসী নয়,
চিরন্তনতাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

গল্প কবিতা বা উপন্যাস নয়,
বিদগ্ধ ও মননশীল প্রবন্ধাবলী
যদি আপনাকে
আকর্ষণ করে তাহলে
প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা
স ম কা লী ন
আপনার অবশ্য পাঠ্য।

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

ইনি একটা কারখানার সহকারি ফোরম্যান। এই কারখানাটির গবেষণাগারে একজন সহকারি হিসেবে যোগ দিয়ে, সাত বছরের মধ্যে তাঁর এই পদোন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি যে উন্নতি করেছি, চেষ্টা ও যত্ন থাকলে অন্যেও অবশ্য এই রকম উন্নতি করতে পারেন। তবে আমি যখনই যে কাজ করি, তা নিষ্ঠার সঙ্গে করি। আমার কয়েকজন সহকর্মীর, ছেলেমেয়ে বেশী আর তাঁদের দুরবস্থা আমি সব সময়েই দেখছি। আমার মাত্র দুটী সন্তান এবং তাদের আমি, আমার সাধ্যানুসারে মানুষ ক'রে তোলবার চেষ্টা করছি। সেই জন্যই আমি সুখী।"

ইনি সুখী।

আপনি ?

davp 67/144

ষোড়শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

শিল্পীর কাজ

অসিতকুমার হালদার

শিল্পীরাও যে মানুষ এবং তাঁদেরও যে সাধারণ লোকের মত সুখ-দুঃখ বোধ আছে, সে-কথা ভুললে চলবে না। শিল্পীরা জীবনের যে নয়টি রস আছে, সেই নব-রস নিয়ে তাই কারবার করেন। কেবলই সূক্ষ্ম-মধুর রস—যাকে ইংরাজীতে রোমান্টিসিজম বলা হয়, তাই নিয়েই তাঁরা থাকেন না। জন-মনের বেদনা তাঁকেও স্পর্শ করে···জন-মনের ভীষণ, রুদ্র, হাস্য, ভয় ও বীভৎসতার মধ্যেও তাই তাঁরা অনেক কিছু দেখতে পান। তবে সে-সব তিনি নিপুণ রচনায় ঢেলে সাজিয়ে রূপে-রসে পরিণত ও পরিবেশিত করেন। জাপানের বিখ্যাত শিল্পী হকুসাই হিংস্র-জন্তু বাঘের ছবি আঁকার কালে এমন আত্ম-অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিলেন যে তাঁকে দেখে তাঁর আশপাশের লোকদের আতঙ্কের উদয় হয়েছিল। মানুষের সভ্য-সুশীল মনোভাবকে ক্রুর-কঠোর রস-ভাবে পরিণত না করতে পারলে তিনি বাঘের সেই বিকট হিংস্রক-রূপটিকে চিত্রপটে ধরে দিতে পারতেন না। তেমনি আবার শিল্পীরা দয়া-বিগলিত ধর্মের ভাবপ্রবণতার পরিচয়ও রেখে গেছেন বৌদ্ধযুগে তথাগত বুদ্ধের জীবনীর চিত্রাবলী এঁকে, খৃষ্টদেবের জীবনীর উৎকৃষ্ট চিত্রাবলী রচনা করে। আবার দেখা যায়—গ্রাম্য-শিল্পীদের হাতে আলিপনার লতা-মণ্ডপের মধ্যে হাতা-বেড়ি খুন্তির চিত্রেও রূপকারেরা রূপলেখার পরিচয় রেখে যেতে ছাড়েন নি। শিল্পীদের কাজ আহার সংস্থানের উপযোগী কেজো-কাজ না হলেও, মনুষ্য-জীবনের কোনো কথাই তাঁরা ভুলতে পারেন না—জীবনের সকল অভিজ্ঞতা অনুভূতিকেই রচনার রসে রূপায়িত করেন। অজন্তার চিত্রে তাই দেখেছি, রান্নাঘরের ছবিটিতে শিল-নোড়ায় মশলা পিষতে গিয়ে গৃহিনী চোখ রগড়াচ্ছেন লঙ্কার ঝাঁজ চোখে লাগায়। যা জীবনের রোমান্স, তা শিল্পীর বিষয়বস্তু—তাই নিয়েই আঁকাজোকা চলে। তবে জীবনের রোমান্স কেবল

আরাম-কেদারায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্নলোক তৈরি করা তো নয়? তাই শিল্পীরা জীবনের সকল রকম দুঃখ, সুখ, ভয়ের awe-inspiring romanceকে অবলম্বন করে চিরকালই চিত্র ও ভাস্কর্যকলা গড়ে গেছেন। মানুষের রোমান্স আরম্ভ হয় জীবনের প্রারম্ভ থেকেই। সে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম আলো যখন দেখে, তখনই তার রোমান্স শুরু হয়। খেলনা নিয়ে শিশু কত কি অনুভব করে—সে-কথাও শিল্পীরা ভোলেন না। তাই মাতৃমূর্তির সঙ্গে শিশুদের ছবি সব দেশের শিল্পীরাই এঁকেছেন—শিশুদের অন্তরের ভাব-রস…সত্য বস্তু আস্বাদের অনুভূতি-উপলব্ধির বিষয় দেখাতে গিয়ে। শিশুরা ও আদিম মানুষেরা আঁকাজোকা করে…সেই হিজিবিজি আঁকাজোকার মধ্যেই শিল্পীদের শিল্প-রোমান্সের বীজ আমরা দেখতে পাই। মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আজ তাই এই অস্ফুট বীজের মধ্যে কত কি স্ফুরণের সন্ধান পান। শিল্পীরা কিন্তু কাজ করেন এই বৈজ্ঞানিক সন্ধানের কথা না ভেবেই। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়—সখের জন্যই ছবি আঁকেন। আনন্দাভিষিক্ত সৌকুমার্য ছবি-আঁকায় আসে এই সখটি থাকলে। 'শিল্পকলা' গড়ছি বা 'Art for art's sake' কাজ করছি, এ-সব কথা শিল্পীরা ভাবেন না। এ-সব কথা শিল্প-রসিকরা খোঁজেন তাঁদের কাজে। যেমন, ভাষা আগে হয়েছে, তারপর ব্যাকরণ—এও তেমনি।

সব দেশেই প্রাগৈতিহাসিক-যুগের গুহাচিত্র থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত ছবি-আঁকার এই সখের পরিচয় আমরা পাই চিত্রকলায়। ইউরোপের শিল্পীদের 'ব্যাজাণ্টাইন', 'গথিক' ও 'রোমানাস্ক' চিত্রকলায় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রকৃতির বাহ্যিকরূপের দিকে নজর না দিয়ে আন্তরিকভাবকেই রেখা ও রঙে ফোটাবার চেষ্টা হয়েছিল। প্রকৃতির এই আন্তরিক ভাবটি শিল্পীর মনেই প্রতিফলিত হয় এবং বাহ্যিক রূপটি ফোটাতে হলে বৈজ্ঞানিক উপায়ের দরকার। ক্রমশ ইউরোপীয় শিল্পীরা গেলেন এই বাহ্যিক রূপটিতে মজে এবং হুবহু নকল করার নানান পন্থা আবিষ্কার করে ফেললেন পারিপ্রেক্ষিক ও শারীর-তত্ত্ব বিজ্ঞানের অনুসরণ দ্বারা। তেমনি আবার আমাদের দেশে চিত্রকলাকে 'ব্যাজাণ্টাইনের' মত পটের কোঠায় রেখা ও রঙের আদিম উপায়কে অবলম্বন করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন শিল্পীরা মোগলযুগ পর্যন্ত। প্রকৃতির বাহ্য-রূপের পূজা আমাদের শিল্পীরা করেন নি। এইখানেই ইউরোপের সঙ্গে এশিয়া ভূখণ্ডের আর্ট ভিন্নপন্থী হয়ে পড়েছিল। ভারতের চিত্রকলার প্রভাবে সারা এশিয়া-খণ্ডের চিত্রকলার এই বৈশিষ্ট্য আজও আছে। খোটান, মীরাণ, তুরফান, বামিয়ান থেকে নিয়ে চীন-জাপান পর্যন্ত যাবতীয় বৌদ্ধযুগের চিত্র-ভাস্কর্যে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব সুস্পষ্ট আছে। আমাদের দেশের শিল্পীরা দেশী-বৈশিষ্ট্যের দিকেই লক্ষ্য করে পুনরায় এগিয়ে যাবার উপায় খুঁজছেন। এখন আবার অতি-আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীরা ক্যামেরা-সিনেমার যুগে মনস্তত্ত্ববিদের মনোভাব নিয়ে চলেছেন আদিম-মনোভাব দিয়ে শিল্প-রসকে ধরতে Sur-realist আর্টের দ্বারা। আমাদের তাই সমস্যা…ইউরোপীয় আর্টিষ্টদের সমস্যাকে সমাধান করার চেষ্টা নয়। 'আর্টের জন্য আর্ট' করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ইউরোপীয় শিল্পীরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন 'ব্যাজাণ্টাইন' শিল্পকলার পরে প্রকৃতির হুবহু অনুকরণের পন্থা আবিষ্কার করে। আমরা সে জায়গায় চাচ্ছি—মন থেকে আঁকা প্রকৃতির রূপ-শরীরের ছন্দ-মাধুর্যকে রেখা ও রঙে ধরতে। ঘনত্ব বা ত্রি-আয়তন আকার ফোটাবার জন্য তাই আর কিউবিজম্-এর সাহায্যের দরকার নেই

আমাদের বা হার্বার্ট রিড-এর Sur-realist Art-এর ওকালতিরও মূল্য নেই। তবে ভয় এই যে রাস্কিনের বই পড়ার বহরে আমাদের দেশের শিল্পরসিকেরা এককালে দেশের শিল্পকলায় যেমন প্রকৃতির হুবহু নকল দেখতে চেয়েছিলেন, বিংশ শতাব্দীতেও হয়ত তেমনি আবার হার্বার্ট রিডের বই-পোড়োরা আজ চাইবেন Abstract Sur-realismকে দেখতে আমাদের দেশীয় শিল্পকলার মধ্যে। তাঁদের হয়ত গায়ে জ্বালা উপস্থিত হবে—শিল্পীরা শিল্পকলার জন্যই শিল্পচর্চা করতে যাচ্ছেন দেখে।

আমার মনে হয়, শিল্পীদের কাজ যদি উপকারে লাগাবার জন্যেই হতো তো শিল্পকলা একটি বিশেষ ছাঁচে ঢালা হয়ে বেরুতো—তার রূপ-ছন্দের কোনোই বৈচিত্র্য থাকত না। শিল্পীদের মনের নানা 'ইমোশন' বা ভাবকে রূপ দেওয়ায় এত বৈচিত্র্য তাঁদের কাজে সম্ভব হচ্ছে। আমার মনে আছে—বাইশ বছর পূর্বে নিবিড় বরষায় মনের মধ্যে একটি গুরুভার জমে ওঠায় দুঃখ-দুর্গতির একটি ছবি এঁকেছিলাম। সেই ছবিটির নাম পূজনীয় কবি রবিদাদামহাশয় (বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) দিয়েছিলেন—'দুর্দিন'। সেই দুর্দিনের ছবিটি দেখে আজ দুর্ভিক্ষ-ব্যথিত বাঙালীর জন-মন সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেনি। অথচ, ছবিখানি জনতন্ত্রবাদের কথা ভেবে কোনো কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে আঁকা হয়নি। এমন অনেক ছবি শিল্পীরা এঁকেছেন, যা গোড়ায় কাজে না লাগাবার জন্যে আঁকলেও, পরে কাজে লেগেছে। সম্প্রতি আমার বহুকাল আগেকার আঁকা 'রাসলীলা' ছবিটিকে ক্যালেণ্ডারের অঙ্গসজ্জার কাজে লাগানো হয়েছে দেখে, এই কথা মনে হচ্ছে। দেশ-বিদেশের বড় বড় শিল্পীরা যে-সব ছবি এঁকে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন, তাঁদের সে-সব কলাসৃষ্টি কাজে লাগানোর জন্য না হলেও, মানুষের মনের ও রুচির যে যথেষ্ট উপকারসাধন করেছে, সে-কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। তাজমহল দেখলে আজও যে দীর্ঘশ্বাস মানুষের পড়ে, তাতেই প্রমাণ মেলে তার সার্থকতার !

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

রবীন্দ্রনাথের বন্ধুর সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু নির্বাচিত—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ সেন, জগদীশচন্দ্র বসু—অন্যরা অনুরাগী বা ভক্ত। এই নির্বাচিত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে একজন মাত্র বিদেশী আপন আসন করে নিতে পেরেছিলেন, উইলিয়াম রোটেনষ্টাইন। রোটেনষ্টাইনের বন্ধুত্ব অর্জনের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এবং অন্যদের জানিয়েছেন পাশ্চাত্যদেশে এই রকম সহৃদয় বন্ধু লাভের ঐশ্বরিক সৌভাগ্যের কথা, জানিয়েছেন এজন্য নিয়তির কাছে তিনি কতটা কৃতজ্ঞ। বন্ধুত্বের সূত্রপাতের সামান্য দিন পরে লণ্ডনের সাউথ কেনসিংটন থেকে শ্রীযুক্ত রোটেনষ্টাইনকে পল্লীনিবাসে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন (২৯ এপ্রিল ১৯১৩) তার উচ্ছলিত কৌতুকের মধ্য থেকে হৃদয়গত নৈকট্যে পরিমাণ অনুমান করা যায়—

So long as you are away we feel we have not come to England. Unless you think it fit to surrender yourself to us in London I shall storm your solitude in the country and firmly occupy a position in the very heart of your home from which you will find it difficult to dislodge me. Please do not take it as a joke—I seriously mean it and I give you a fair warning. However, as there is the chance of our meeting next week I hope we shall be able to come to terms so as to avoid such extreme measures.

রোটেনষ্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় যদিও ভারতবর্ষে, তবুও বন্ধুত্বের পর আর রোটেনষ্টাইন আর ভারতে এলেন না। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেকবার দুঃখ করেছেন, অনেকবার বন্ধুকে ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ করেছেন, বলেছেন তাঁর সত্য পরিচয় পেতে হলে স্বকীয় পরিবেশের পটে তাঁকে দেখা প্রয়োজন। ১৯১৩ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি লিখলেন (২০ অক্টোবর)—

My dear friend, I wish I had not to write to you letters but could have you by my side—for I know you would have enjoyed everything I have here arond me...As I sit writing to you all the doors of my room are wide open and the stainless golden light of this late autumn is pouring in from all sides flooding my brains with its quivering stream of radiance. The glistening green of the heavy foliage of the tall sal trees soaring in the clear blue sky seems to be like an outburst of music from the heart of the earth...I cannot but wish from the depth of my heart that you could come to us in our ashrama and share our simple lives filling your leisure with utmost peace and beauty. Of all the friends I have in the West I think of you as the one who ought to have been born as my brother

in this country...

আপন ভাইয়ের তুল্য মনে হয়েছিল রোটেনষ্টাইনকে রবীন্দ্রনাথের, সামান্য আলাপে উবে গিয়েছিল সভ্যতার ব্যবধান, পরিবেশের দূরত্ব, কারণ (২০ আগষ্ট ১৯১৫ তারিখের চিঠি)—

It was the breadth of freedom and depth of sympathy all about you that captivated me so much when I came to know you. And my mind always turns back to you whenever I feel the need of a perfect combination of solitude and company in one.

অথচ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই, যাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে পেয়েছিলেন সজনতা নির্জনতার বিরল সমাবেশ। তাই অন্য একটি চিঠিতে দেখি (৬ জুলাই ১৯:৭) রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধাবসানের অপেক্ষায় রয়েছেন—

Life is moving and we are unconsciously falling apart and after intervals we must renew our friendships, making alterations in our doors and windows of communication...therefore I am waiting for the time when we shall sit face to face and fill with life the few gaps may have appeared between our past and the present.

যুদ্ধান্তে দেখা গেল দূরত্ব বেড়েছে। রাজনৈতিক কারণে যে ভুলবোঝাবুঝি আরম্ভ হয়েছিল সেই ভুলবোঝাবুঝিতে সাহিত্যিক ও ব্যক্তিগত কারণের অবদানও যে কম নয় তা পূর্বেই দেখেছি। স্বদেশে-বিদেশে নানা কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ আস্থা হারিয়েছেন, অপরপক্ষে রোটেনষ্টাইন শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। কিন্তু সম্পর্কের সমস্ত উত্থানপতনের মধ্যে যখনই রোটেনষ্টাইনের চিঠি পান তখনই ইংল্যাণ্ডে চলে যেতে ইচ্ছে করে বন্ধুর সান্নিধ্যলাভের জন্য, অথবা বন্ধুকেই স্বগৃহে আমন্ত্রণ করেন সৌহার্দ্যের সুস্বাদের প্রত্যাশায়। রামগড় থেকে লেখেন (২ জুন ১৯১৪)—

This is just the place in the world for you. My house here will wait for you even if it is in vain. I cannot imagine that you will never visit Santinikotan and this little nest of our among the hills. It seems perfectly absured to think that you have never seen Shilida and never lived in boats with us in the lonely sandbanks of the Padma.

এমন আমন্ত্রণ লিপি তিনি একবার পাঠাননি, বারে বারে পাঠিয়েছেন (১৭ জানুয়ারি ১৯১৭, ৩১ জুলাই ১৯২০ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য)।

আবেগতীব্র প্রণয়ে যেমন প্রেমিক প্রেমিকা ভাঙনের মতো ভালবাসে এবং সামান্য আশাভঙ্গে তীব্র আঘাতে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি আঘাত-প্রত্যাঘাত ঘটেছে এই বন্ধুত্ব ইতিহাসের মধ্যবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে। যে পাশ্চাত্যের উপর কবির একদিন পরম আস্থা ছিল, রোটেনষ্টাইন ছিলেন কবির চোখে সেই পাশ্চাত্যের সর্বোত্তম গুণাবলীর প্রতিনিধি। ফলে

পাশ্চাত্য সম্বন্ধে কবি যেদিন হতাশ হলেন সেদিন পাশ্চাত্যের মুখপাত্র হিসাবে ধরে নিয়ে বন্ধুকে আক্রমণ করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি। তারপর যেমন হয়, প্রবল প্রেম ও প্রচণ্ড আঘাত যখন কালপ্রভাবে বয়সহেতু রক্তের মন্থরগতি ও শৈত্যের সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে আসে, তখন প্রেমিক-প্রেমিকা প্রণয়ের উত্তুঙ্গ শিখর ও অতল খাদ সব কিছুর জন্যই নিয়তির কাছে কৃতজ্ঞ হয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথ উত্তেজনার অন্তে শান্ত হয়েছেন এবং এই বিদেশীর বন্ধুত্বের জন্য ধন্যতা অনুভব করেছেন। ., শান্তিনিকেতন থেকে তিনি লিখছেন (১৪ এপ্রিল ১৯২৬)—

My dear friend, how very nice to get your letter after such a long spell of silence. It deeply touches my heart, especially in the present state of my existence when I seem to be living in the dusk of a dimmed existence. The memory of a dawn of friendship in a strange horizon revealing an unproved depth of radiance in its wealth of colours that struck my mind with wonder moment after moment often comes back to me when I sit alone in my easy chair with no other claim of the world upon me but to be supremely lazy and forget all my absurd pretensions to be its benefactor.

তিনি অনুভব করেছেন রোটেনস্টাইনের প্রতি তাঁর বন্ধুত্বের মূল চলে গেছে সত্তার গভীরতম তলদেশে, তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন প্রবক্তা হয়ে সর্বজনের উপকার করতে যেয়ে তিনি এই বহুমূল্য বন্ধুত্বের প্রতি অনেক সময় অবিচার করেছেন।

বার্ধক্য এসেছে, জরাপ্রভাবে দেহ এখন বিরলক্ষমতা। যে সম্রাট ছিল তাকে যখন রাজদণ্ড ভেঙে ফেলতে হয় তখন তার মতো বেদনার কিছু নেই। বৃদ্ধ কবি লিখছেন (১৭ নবেম্বর ১৯৩৩)—

But the last few miles in the road I am passing along is dry and grey and I am reconciled to its inefficient unevenness. I am cultivating the wisdom of indigence and I hardly ever now make mistake by claiming credit in my bank when the overdraft is fast reaching its limit. I have grown careful about the expenditure of my energy...

বার্ধক্যের কথা, বার্ধক্যজনিত নিঃসঙ্গতার কথা এবং শিল্পজগতের প্রগতিতে পিছিয়ে পড়া জন বলে গণ্য হওয়ার দুঃখের কথা রোটেনস্টাইন লিখেছিলেন, উত্তরে (১১ জুন ১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ জানালেন—

Your letter invariably bring to me the fragrance of the world, the shores of which are fast receding from us. You, sturge Moore, and Ernest Rhys are perhaps my only link with that world and I can quite realise that you do not exactly fit in with the modern scheme of things. I myself sometimes feel quite anti-dated (১) in my country even though I try to keep abreast of modern

tendencies in our world of thought and action ; strange gods have been put on the altar, strange incantations are being mumbled. But I do not grumble for each generation has its own problems to face and its own set of values. Only we out of place.

হুটন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত চিঠিগুলির সর্বশেষ তারিখের আগের তারিখে যেটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (১২ মার্চ ১৯৩৮) তার মধ্যে এই বন্ধুত্বের জন্য ভাগ্যের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা আবার পাই ; কিন্তু বার্ধক্য ও দূরত্বের ফলে বন্ধুত্বকে নূতন করে সঞ্জীবিত করার আর উপায় নেই বলে বিমর্ষতা পাই এবং এই বেদনাই প্রমাণ করে বন্ধুত্বের গাঢ়তা।

Your letters recall many happy days and contacts for which one feels grateful to life. Oakridge will always remain associated with these. I am glad to hear that it remains the same as it was. Here is another sad consequence of old age, that while age and distance enhence the charm of old associations they disable one from renewing it.

এর পরে রবীন্দ্রনাথ আর মাত্র চিঠি লিখেছিলেন (জুন ২৫, ১৯৩৯) এবং রোটেনষ্টাইনের পল্লীনিবাসে ইংল্যাণ্ডের গ্রামের যে দৃশ্য দেখেছিলেন সেই উচ্চাবচ সবুজ প্রান্তরের স্মৃতি তাতে রোমন্থন করেছেন। It is now a quarter of a century that stands athwart my mind' কিন্তু আজো তিনি 'luscious green of the meadows' ভুলতেও পারেননি। এই অতীতের কথা লিখেছেন, আর লিখেছেন বর্ষায় শান্তিনিকেতনের আকাশে 'reven-black clouds'-এর রাজসিক সৌন্দর্যের কথা। এই চিঠিই বোধহয় দুই বন্ধুর শেষ যোগাযোগ। একজন বন্ধুর মৃত্যু হয় ৭ই আগষ্ট ১৯৪১, অপরজন এর পর বেশি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। তাঁর মৃত্যু হয় ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫।

১। বানানের, শব্দব্যবহারের এই জাতীয় ভুল মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা এ জন্য দায়ী—যেমন ৬ জুলাই ১৯১৩ চিঠিতে লিখেছেন 'peace of flesh and bones'. Preposition-এর ভুলের কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

বটতলার অন্তরাগ

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পল্লীবাংলার আঁতুর ঘর বলতে ঠিক যা বোঝায় তার ধারণা স্পষ্ট না হলে ঠিক কি পরিবেশে বটতলার বই মুদ্রিত হত তা বোঝা সহজ হবে না। পতিতাকেন্দ্রের নৈকট্য এবং 'বাবু'র চাহিদা মত ঘন আদিরস এ দুই কারণেই রাতের অন্ধকারে ছাপানর 'অপকর্ম'টিই দিনের আলোয় 'অশুচি' বিবেচিত হত। ডিহি কলকাতার প্রধান সদর রাস্তায় তখন গ্যাসের আলো ও দূর অস্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের কল্যাণে কলের জলও পৌঁছয় নি। ·

সবচেয়ে কৌতূহলজনক, বটতলার প্রকাশনা ছিল দুধরনের ১। প্রতিষ্ঠিত ধর্ম রসাত্মক বই যার লেখক বলে সাধারণত কেউ নির্দিষ্ট ছিল না—থাকলেও কপিরাইটের প্রশ্ন উঠবার সম্ভাবনা ছিল না আদৌ। যথা রামায়ণ মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। বলা বাহুল্য এগুলো তথাকথিত প্রেষ্টিজ পাবলিকেশন্স। তবুও এতে যুগধর্ম অস্বীকৃত হয়নি। পুরোপুরি, উদাহরণ হিসাবে ভারতচন্দ্রের রচনাকেই উল্লেখ করা যেতে পারে।

২। ঘন আদিরসের বই। কুৎসিত অশ্লীল রস ছাড়া এর অপর কিছু মহৎ বক্তব্য ছিল না। তবু আদিরসেরও শেষ সীমা আছে। সম্ভবতঃ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এই সময়ে সচিত্র পুস্তক প্রকাশের রীতি শুরু করেন।

এছাড়াও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দু একটি বই প্রকাশিত হত বইকি। মেয়েদের ব্রতকথা, লতাপাতার গুণ, দিন লগ্ন নির্ঘণ্ট সহ পঞ্জিকা এবং গোপালভাঁড়ের রঙ্গকথা। ইতিহাসগত ভাবে এসময় রাজাদের অর্থকোষে ভাঙ্গন ধরায় ভাঁড়েদের জনসভায় নেমে আসতে হয়েছিল। 'বাবু'দের পারিষদ অনেকেই এসময় সরস রসিকতাকে 'জনসভার সাহিত্যে' উদ্গার করতে থাকেন। রঙ্গ রসিকতা কৌতুক ব্যঙ্গ বাণের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ চিরন্তন বোধ করেই বটতলা এ ধরনের বই প্রকাশে আগ্রহ পেয়েছিল। কিন্তু গোপালভাঁড় চরিত্রটি কোথা থেকে এল! ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, 'নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ এবং হাস্যরসিক হিসাবে অনেকে গোপালভাঁড়কে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসে তো দূরের কথা উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক পর্যন্ত গোপাল ভাঁড়ের নাম কোথাও পাওয়া যায় নাই।' আধুনিক 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার উল্লেখ থাকলেই অবশ্য গোপালভাঁড়ের সরস অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের কোন প্রামাণিক তথ্য নেই। 'বটতলা হইতে প্রকাশিত রহস্য গল্পের ও চুটকি ঠাট্টার বইগুলিতে গোপাল ভাঁড়ের প্রকাশ্য আবির্ভাব ঘটে।' বলাবাহুল্য ধাঁধা হেঁয়ালী রসিকতা ইত্যাদি মৌখিক লোক সাহিত্য। খনার বচন নামে প্রচারিত সকল প্রবাদের সৃষ্টি যেমন খনার মুখে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া না তেমনি বটতলা থেকে প্রকাশিত কালিদাসের একশত আট হেঁয়ালীর জনকও যে স্বয়ং কালিদাস তাও প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কালিদাস কোনদিনই ছিলেন না। কালিদাস কখনও জামাই ঠকান ধাঁধার

সৃষ্টি করতে জানা যায় না কিন্তু বটতলায় এ ধরনের বহু বইয়ের লেখক হিসেবেই তার নাম প্রচার হয়ে থাকে।

আমরা ডঃ স্কুমার সেনের বিদ্রোহী মন্তব্য পুরোপুরি স্বীকার করতে পারি না কারণ আমরা শুনেছি গোপাল ভাঁড় কৃষ্ণনগরে স্বীকৃত বংশের ঐতিহাসিক অধিকারী। গোপাল ভাঁড়ের কোন পুত্রসন্তান না থাকলেও মেয়ের তরফ থেকে তার বংশধররা আজও টিকে রয়েছে। এমনকি কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে গোপাল ভাঁড়ের একটি তৈলচিত্রও রক্ষিত রয়েছে।

প্রসঙ্গত আমাদের দেশে গবেষণার একটি 'পিছুটান' (draw back) আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে রামমোহনের ঘুষ খাওয়া, যবনীর সন্তানের পিতা হওয়া ইত্যাদি বিতর্কিত প্রসঙ্গ আলোচনা করাও নিন্দনীয়। এদেশে চণ্ডীদাস কোথাকার মানুষ তা প্রমাণ করতে গেলে আমরা যুক্তি খুঁজি না বরং প্রবন্ধকারের জন্মস্থানের সন্ধান করি। সেই একই হিসেবে বর্ধমানবাসী ডঃ স্কুমার সেন যে নদীয়ার গোপাল ভাঁড়ের ঐতিহাসিকত্ব অস্বীকার করবেনই এ ধরনের চণ্ডীমণ্ডপীয় যুক্তি বিন্যাসের আশ্রয় আমরা নেব না বরং বলব গোপাল ভাঁড় ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তাঁর নামে বটতলায় যেসব রসিকতার প্রচলন হয়েছে সেগুলো বটতলারই সৃষ্টি, তার সঙ্গে গোপালের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ঐতিহাসিক খ্যাত নাম বা সামাজিক দুর্বিপাক অসামাজিক দুর্ঘটনার আশ্রয় নিয়ে গ্রন্থ রচনার প্রবণতা বটতলা শুরু থেকেই গ্রহণ করে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বটতলা গোপাল ভাঁড়ের নামের ইমেজ গ্রহণ করেছিল এই কারণেই। শার্লক হোমসের মত একটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে খ্যাত করে তোলার মত সাহস এবং ক্ষমতা বটতলার ছিল না। ডঃ স্কুমার সেন অবশ্য অনুমান করেছেন 'বটতলার আসরে যখন গোপাল ভাঁড়ের সজ্জা হইতেছিল তখন কলিকাতায় গোপাল উড়ের যাত্রার খুব পসার। হয়তো এই সূত্রেই কোন অঞ্চলের গোপাল নামক বাক্যবাগীশ রসিক গোপাল ভাঁড়ের সাজ পাইয়াছিলেন।'

এই কষ্ট কল্পিত অনুমানের পর প্রশ্ন উঠতে পারে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যদি গোপাল ভাঁড় না থেকে থাকে তবে এ অদ্ভুত গুজব-সামঞ্জস্য উঠেছিল কেন? ডঃ সেন বলছেন, 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় ছিল না বটে কিন্তু এমনই একজন সভাসদ ছিলেন। তিনি ভাঁড় ছিলেন না ছিলেন শক্তিশালী সাহসী চতুর ও বাগ বিদগ্ধ ব্যক্তি। ইহার নাম শঙ্কর তরঙ্গ।'

শঙ্কর তরঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্রের পার্শ্বচর দেহরক্ষী। ১৮১৮ সালে দিগ্‌দর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম সংস্করণে শঙ্কর তরঙ্গ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ পড়ে বটতলার তীক্ষ্ণধী প্রকাশক শঙ্কর তরঙ্গের বাকবৈদগ্ধ্যের সুযোগে এই চিত্রের পুনরুজ্জীবন করে থাকতে পারেন। এমনকি 'কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার সভায় ঘটিত গোপাল ভাঁড়ের কোনও কোনও চুটকি গল্প আসলে শঙ্কর তরঙ্গেরও হওয়া সম্ভব।'

বয়সের সঙ্গে বটতলা আধুনিক পোশাক পড়ে '১০০১ সচিত্র প্রেমপত্র' এবং হত্যা রহস্য ডিটেকটিভেরও আশ্রয় নিয়েছে। তাই বটতলার পুস্তকসম্ভার যেমন বৃহৎ তেমনি বৈচিত্র্যেও পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার অগ্রগতির ফলে বটতলার বর্তমান প্রাণ—নাটক।

বটতলার বইয়ের মুদ্রণনীতিও আলোচনা করা যাক্ এবার। কলকাতায় তখন সদ্য আনীত

কাঠের মুদ্রাযন্ত্র, সবচেয়ে কম বেতনভুক কম্পোজীটর ইত্যাদির সঙ্গে থাকত সস্তা দরে বই বিক্রীর অভিশাপ 'পচা ও গুঁচা' কাগজ! এই তিনটির সংমিশ্রণে যে কিম্ভুত 'অবদানে'র সৃষ্টি হত তারও বর্ণনা রেখেছেন ডঃ সুকুমার সেন। 'গলৎ কাষ্ঠ স্খলদক্ষর' বটতলার এই ছাপাকে উপহাস করিয়া এককালে প্রবচন প্রচলিত হইয়াছিল 'শবন কাবল ভুষি ভুষি সে কাবল'। 'শ' ও 'স' অক্ষর কোনটাই পর্যাপ্ত নেই তাই দুইই চালাতে হয় নির্বিচারে। পেটকাটার (অসমীয়া অক্ষরের মত) হরফের মাঝের ক্ষয়ে গিয়ে 'র' হয়েছে ব। সেকালে ণ ও ল একই রকম লেখা হত এবং কোথায় ণ কোথায় ল হবে অশিক্ষিত কম্পোজীটারের বিদ্যায় তা কুলোত না। ক্ষীণ দৃষ্টি বৃদ্ধ কম্পোজীটরের সঙ্কীর্ণ গলিপথের অল্প আলোয় 'তু' ও 'ভু' অক্ষরের তফাৎটুকু নজরে আসত না। 'ম' হরফ কম পড়ত বলে কাছাকাছি 'ষ' অক্ষর বসান ছাড়া উপায় কি? অতএব 'সকল কারণ তুমি তুমি যে কারণ' হয়ে দাঁড়াত 'শবল কাবল ভুষি ভুষি যে কাবল'। লক্ষ্যণীয় এই লাইনটি একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্গত। বটতলার অস্তরাগ বর্ণনা করতে গিয়ে এই ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রভাব বর্ণনা করতেই হবে। বস্তুতঃ ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোডের আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসই বটতলার শেষ ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়েছে। প্রসঙ্গটি আমরা পরে আলোচনা করব। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বটতলার একটা ছাপাখানার একটু বর্ণনা দিয়েছেন। মুদ্রাযন্ত্র কাঠের ও পঙ্গু। প্রত্যেকবার ছাপবার সময়ই সন্দেহ হয় অদ্যই শেষ রজনী। বহুকাল ব্যবহৃত টাইপের সূক্ষ্ম টানগুলি প্রায়ই ভেঙ্গে ক্ষয়ে গেছে, 'টাইপগুলি গালাইবার কালও কবে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।...ছাপিবার কাগজ শীর্ণ চোতা টুকরা মাত্র, মাঝে মাঝে ভাতের মাড় দিয়া জোড়া।' ছাপার খরচও কম 'বড় চারিখানা কোয়ার্টা পৃষ্ঠা কম্পোজ করিয়া মেসিনে পাঠাইবার খরচা একটাকা মাত্র।'

পাঠকের কৌতূহল হতে পারে এত মুদ্রণ-প্রমাদ সত্ত্বেও বটতলার বই তাহলে বিক্রী হত কি করে। ডঃ সেন বলেছেন বটতলার চলতি বইয়ের অধিকাংশ ছিল বৈষ্ণবগ্রন্থ। সদ্য জাগ্রত অর্ধ-সাক্ষরদের কাছে তখন ধর্মগ্রন্থই দৌড়ের প্রান্তসীমা। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লঙ্ সাহেব বাংলা বইয়ের যে তালিকা দিয়েছিলেন তার উনিশটির মধ্যে আটটিই ছিল বৈষ্ণব গ্রন্থ। বলা বাহুল্য এইভাবেই বোঝা যায় বিলেতী বটতলার ক্ষেত্রে যা প্রেসটিজ পাবলিকেশনস্ কলকাতাতে তাও 'বাম্পার সেল' দিয়েছে।

সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখে তখনও পুঁথির স্মৃতি, তাই অতিভক্তির ঘন আড়ষ্টতা। মুদ্রিত অক্ষর মাত্রেই তখন 'বেদবাক্য' তাই ভরে ঢুলু ঢুলু চোখে মুদ্রণ প্রমাদ নজরেই পড়ত না। ভক্তি নির্ভর বইগুলোর বাজারও ছিল অধিকাংশ নিরক্ষর পল্লীবাংলায়। কয়েকজন সদ্য-সাক্ষর চণ্ডীমণ্ডপে বসে যা পড়ে শোনাতেন তাই ভক্তি দিয়ে সেই 'অমৃত কথা' শুনে পুণ্যবান! ভক্তি-অশ্রু-রসাপ্লুত মুদ্রিত নয়নে নিরক্ষর শ্রোতা সেই 'অমৃতের সমান'গুলি কান দিয়ে মরমে ঢুকিয়ে নিতেন ধর্মের দোহাই দিয়ে। অর্ধ-শিক্ষিত মোড়ল বা চণ্ডীমণ্ডপের 'মাথা'রাও 'পাঠ' করার সময় দ্রুত শব্দোদ্ধার করতে না পারলে 'আণ্ডায় গণ্ডা' দিয়ে দিতেন। গ্রামীন রসিকতা আছে, কথকতা পাঠে কথক বলছেন 'এরপর শ্রীরাম কি বললেন? (পরবর্তী বক্তব্য উদ্ধার করতে না পেরে) যা বলবার তাই বললেন।

কিন্তু বটতলার বইয়ের তালিকায় যাদের নাম উঠত, নাম-না-ওঠার সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। সেই আদিরস পুষ্ট বইগুলোতেও যথারীতি মুদ্রণ প্রমাদ থাকত যথেষ্ট। Urban মহলের বাবু বিবিরা অবশ্য এটা বাধা বলে গণ্যই করতেন না। পারিষদরা তাঁদের পড়ে শোনাতেন মুদ্রণপ্রমাদের ক্ষেত্রে আপন চেতনার রঙে আরও কড়া পাক আদিরস ঢেলে দিতেন পাঠক। পরের মুখে এই অবৈধ আচারের কড়া ঝাল সহ্য করে আদিম উত্তেজনার শিহরণ অনুভব করতেন বাবু বিবিরা।

ধর্মগ্রন্থ পল্লীবাংলাতে বেশী বিক্রী হলেও আদিরসাক্রান্ত বইগুলো বেশি বিক্রী হত সুতানুটির পাড়ায় পাড়ায়। বইয়ের ফেরীওয়ালারা সহরেও ক্রেতার গৃহদুর্গে হানা দিতেন বইয়ের বোঝা নিয়ে। নেটিভ কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় বই ফেরীর বর্ণনা পাওয়া যায় এমা রবার্টসের বইয়ে। বইওয়ালারা নাকি সরাসরি বাবুর বাড়ীতেই হানা দিতেন। 'বটতলার বইয়ের ফেরীওয়ালারা লঘুভার পুস্তিকা সমূহের গুরুভার স্তূপ ঘাড়ে মাথায় চাপাইয়া নেটিভ কলিকাতার পথে পথে হাঁকিয়া ফিরিত।' বাড়ী অর্থে কেবল 'গৃহ দুর্গ নয়, ধনী বাবুরা যখন বৈকালিক ভ্রমণে বেরুতেন তখন তাদের পাল্কী অথবা ঘোড়ার গাড়ির দরজা জানলাতেও বইওয়ালারা মুখ বাড়াতেন। ডঃ আদিত্যকুমার ওহেদদার তাঁর বই যে কর্ণেল ডবলিউ. এফ. বি. লরীর এক স্মৃতি কথার উল্লেখ করেছেন এতে বটতলার বই ফেরীওয়ালারা কিভাবে কলকাতার white অংশে বই বিক্রী করত তা জানা গেছে। সাহেব ঘর্মাক্ত দিনের কাজের শেষে বাড়ীতে বসে বই ফেরীওয়ালার একটানা সুর শুনেছেন। বই ফেরীওয়ালারা দুহাতে চটকদার ছবির বই, তার পেছনে বইয়ের বোঝা সহ একটি কুলী। বইওয়ালা সাহেবকে 'সেক্সপীয়র' বিক্রী করতে চাইল। সাহেব আশান্বিত এই অজগ্রামে বসে সেক্সপীয়রের পুরো ভল্যুম কিনতে পাওয়া যাবে শুনে। উৎসাহে ও আবেগে একখণ্ড সেক্সপীয়ার ছিনিয়ে নিয়ে সাহেব দেখলেন বইটি সেক্সপীয়র হিন্দুস্থানী ডিকসনারী!

'কলিকাতায় সারা হইয়া গেলে তাহাদের (ফেরীওয়ালাদের) অভিযান পরিচালিত হইত পাড়াগাঁয়ে।' এইভাবে 'কলিকাতার টাটকা ছাপা বই পল্লীবাসীর হাতে পৌছিত দুই-চারি মাসের মধ্যে।' মনে রাখতে হবে তখনও আমাদের দেশে সংবাদপত্র স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি বিশেষতঃ মফঃস্বল সংস্করণ ত তখনও অজানা! অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই সব appointed agents-দের কাছ থেকে books were purchased with great aridity. ফলশ্রুতি হিসেবে ফেরীওয়ালার উপার্জনের পরিমাণটাও কম হত না। অন্ততঃ লঙ্ সাহেবের মতে সেযুগে একজন ফেরীওয়ালা মাসে একশ টাকারও বেশি উপার্জন করত।

এই প্রসঙ্গে বলি, এইসব ফেরীওয়ালারা শুধু বিক্রেতা ছিল না তারা বটতলার প্রকাশকের কমিশনভুক্ত agentও ছিল। Chief town ও villageএ তারা কেবলই বই বিক্রী করতে যেত না, ক্রয়েচ্ছু দরিদ্র চাষীদের কাছ থেকে অন্য রসদও গ্রহণ করত অতি অল্প দামে।

বটতলার বই প্রায়ই current topic নির্ভর। চৈত্রের গাজনের সঙ অনুসারে নামকরণ করে সে বই আশ্বিন মাসের আগে গ্রামে বিক্রয় করা সম্ভব হত না। এর মধ্যেই টাটকা খবরের উত্তেজনা প্রকাশিত হয়ে যেত। ফলশ্রুতি বইটির চাহিদা যেত কমে দামও হ্রাস পেত। গ্রামে

তাই বইয়ে কমিশনের সঙ্গে দেওয়া হত রিবেট! তবু দরিদ্র চাষীর আর্থিক সামর্থ্য পাওয়া যেত না। মুদ্রিত মূল্য অপেক্ষাও কম দামে কেনার শিহরণ অনুভব করার জন্য সে আরও দাম কমাবার জন্য চেপে ধরত। এইভাবে বটতলার বইয়ের কমিশনের হার বীভৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজও বটতলায় একশ্রেণীর উপন্যাসে বিক্রেতাকে প্রকাশকরা শতকরা পঞ্চাশভাগ কমিশন দিয়ে থাকেন! আর ক্রেতার কাছে বটতলার বইয়ে কমিশন পাবার রেওয়াজ আজ ঐতিহ্যে পরিণত হতে চলেছে!

সে যাক গ্রাম্য ক্রেতা যখন নগদ পয়সা দিয়ে বটতলার বই কিনতে পারত না সে তখন ফেরীওয়ালাকে গৃহসঞ্চিত পুরোন পুঁথি দিয়ে বিনিময়ে রঙীন চটকদার বই কিনত। পল্লীগ্রামের ক্রেতা অসম বিনিময়ে অভ্যস্ত। পৌষ মাসের ক্ষেতে বসে এক শলি ধানের বদলে তারা এককুড়ি বেগুনও কিনতে পারে। গুজব আছে—সভ্যতার প্রথম যুগে তারা একটি গরুর বিনিময়ে একটা গামছা কিনতেও নারাজ হত না। বলাবাহুল্য ফেরীওয়ালারা পয়সার বদলে ধান পছন্দ না করে এই ধরনের পুরনো পুঁথি পছন্দ করতেন। ফিরিঙ্গী সভ্যতার শুরুর সঙ্গে পল্লীবাংলায় সংস্কৃত চর্চায় ভাটা শুরু হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর বহু রচনায় পুঁথি-সর্বস্ব সংস্কৃত পণ্ডিতদের কথা লিখেছেন। একের পুত্র পুত্রবধূর কলুষস্পর্শে কিভাবে পুঁথিগুলো ধ্বংস হত তাও তিনি লিখেছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এই সময় বটতলার ফেরীওয়ালারা মূর্খ উত্তরাধিকারীর হাত থেকে এই সব অমূল্য পুঁথির বেশ কিছুটা নিয়ে আসতে পেরেছিল। বিদ্বান পণ্ডিতের অকালকুষ্মাণ্ড যেমন অভিভাবকের গ্রন্থাগারের অমূল্য সংগ্রহকে পুরনো কাগজের দরে বিক্রী করে সিনেমার টিকিট কাটে তেমনি নিরক্ষর কৃষকও অমূল্য পুঁথির বদলে সচিত্র বটতলার বই কিনতেন।

সৌভাগ্যের কথা, এই সব সংগৃহীত পুঁথি হারিয়ে যায়নি। এর আগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ট্রাভেলিং পণ্ডিত নিয়োগ করে পুঁথি সংগ্রহে নজর দিয়েছেন। 'বটতলার হকাররা পাড়াগাঁয়ে বই বেচিতে গিয়া অনেক সময় নগদ মূল্য না পাইয়া ছাপা বইয়ের বদলে পুরানো পুঁথি লইয়া আসিত।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখছেন 'তখন নগেনবাবুও আমার মত পুঁথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুঁথি সংগ্রহ অন্যরূপ, তিনি ঘরে বসিয়া পুঁথি কিনিতেন'। ডঃ সুকুমার সেন লেখেছেন 'বাংলা পুঁথির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভাণ্ডার, যাহা এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ইহাদেরই (হকারদের) তিল সঞ্চিত বল্মীক শৈল।' বস্তুতঃ প্রথমত সংবাদপত্রের পরই এই কীটদষ্ট অমূল্য গ্রন্থ-সংগ্রহই বটতলার অন্যতম পরোক্ষ কীর্তি। বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়ার গ্রামের এক গোয়ালের চালের বাতায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন—আর হকাররা এমন বহুশত পুঁথি 'আবিষ্কার' করেছিলেন।

এইভাবে দামে, বিনিময়ে বটতলার চটী বই সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ধর্মগ্রন্থ ত বটেই আদিরসের বইয়ের চাহিদাও নগরের বাইরেও নাড়া দিয়েছিল ক্রমশ। ১৮৬৫ সালে বটতলায় তাই প্রকাশিত হল এক চূড়ান্ত অশ্লীল বই। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে 'অশ্লীলতার বিতর্ক প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি ইতিহাসগতভাবে আলোচনা করা যেতে পারত। লঙ সাহেব লিখে রেখে গেছেন যে সরকার আইনের সাহায্যে বইটিকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু লঙ সাহেব বলছেন

আইন হবার আগের বছরেই বইটির তিরিশ হাজার কপি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। বইটির দাম ছিল চার আনা। আইনের দরবারে তিনজন প্রকাশক (প্রকাশক, মুদ্রক ও লেখক ?) হাজির হতে সুপ্রীম কোর্ট জরিমানা ঘোষণা করলেন তেরশ টাকা।

সুকুমার সেন লিখেছেন 'বটতলা ছাপাখানার স্বর্ণযুগ ১৮৪০ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।' অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত অশ্লীল বইটির জন্যই বটতলার বাজার পড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বয়স চার হতেই বটতলায় ঢল নেমেছিল। অবশ্য শিশু রবীন্দ্রনাথ নয় বৃদ্ধ রাজরোষই বটতলার উচ্ছেদের কারণ।

কিন্তু বটতলা ত কয়েকটি ছাপাখানার ভৌগোলিক বিবরণ নয় একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ যুগ। সে যুগের মূলেও ছিল একটি রোগ—সদ্য সাক্ষরদের নবীন ক্ষুধা। এ আবেগ কেটে যেতেই রোগেরও প্রশমন হয়েছিল।

মূলতঃ সুতানুটির সভ্যতা তখন দক্ষিণ অভিমুখে আরও এগিয়ে চলেছে। বটতলার আটচালার তখন রুইন মাত্র অবশেষ। পতিতা পল্লীর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান আন্দোলন। স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ আন্দোলন করছেন। সভ্যতার কলঙ্ক যে অবাধ মদ্যপান সেই সুরাপানের বিরুদ্ধেও তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা বটতলার বুক চিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজয় পতাকা গৌর আঢ্যের স্কুল। অবশ্য গৌরমোহন আঢ্যের এ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা মার্চ। (স্কুলের দরজায় বর্তমানে একথা লেখা আছে) শ্রী আঢ্যের জন্ম ১৮০২ সালে মৃত্যু ১৮৪৬ সালের ৩রা মার্চ এই এই মফতাবখানাটি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গরানহাটা স্ট্রীটে। এই সময়ের সংবাদপত্রের পাতায় জানা যায় পতিতাপল্লীর কেন্দ্রে এ ধরনের বিদ্যালয়ের আয়োজন নানাদিক থেকে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। বটতলায় এই উত্তেজক প্রসঙ্গনির্ভর বহু বই প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু আন্দোলন করেছিলেন কেবল কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা।' পাঠশালা সন্নিকটে হীনমতি বেশ্যাবর্গের ব্যসনকার্য বালকবৃন্দের বিদ্যাবিষয়ক ক্রটিকর বিবেচনা করে সংবাদ প্রভাকর ও ইংলিশম্যানে পত্রাঘাত হল। কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৮ সালের ১৯শে নভেম্বর জানালেন পতিতাপল্লীকে সোনাগাছির সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তিনি 'লেজিসলেটিভ কৌন্সিলে' আবেদনপত্র পেশ করবেন তাঁর সভার তরফ থেকে। এই আবেদনের কপি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিতও হয়েছিল। ২৩শে মে বিদ্যোৎসাহিনীর সভা আহ্বান করা হয়। সংবাদ প্রভাকর এইদিন সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। মোটামুটি এইভাবে কালীপ্রসন্ন পরোক্ষভাবে বটতলার প্রভাব মুছে দিতে চেয়েছিলেন।

১৮২০ সালে বটতলায় বই প্রকাশ শুরু হয়েছিল আর ১৮৬২-৬৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল হুতোম পেঁচার নক্সা। আগেই বলেছি বটতলার স্বর্ণযুগ শেষ হয়েছে ১৮৬৫ সালে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী দু-তিন বছরটি তীব্র উত্তেজনাময় ছিল। নকশা প্রকাশের আগে বটতলার বইয়ের বাজারে একটা depression শুরু হয়েছিল। আদিরসের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে পাঠক তখন ক্লান্ত বোধ করছিল। হঠাৎ হুতোম এসে বাজার মাত করলেন। বলা বাহুল্য, নকশা বটতলায় প্রকাশিত হলেও বটতলার জাত-বৈশিষ্ট্য এতে নেই। অশ্লীলতার প্রচার বই বিক্রী ও লাভ করা ধনী লেখকের

উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তবু নকশা বিক্রী হল খুব। দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকায় হুতোম লিখেছেন 'যে সময় এই বইখানি বাহির হয়, সে সময়ে লেখক স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশ্যে) পড়বেন।' বটতলার ছাপাখানাওয়ালারা (প্রকাশক নয়) দেশের সমস্ত লোকের কেনার উৎসাহের সুযোগও নিলেন। 'হুতোমের নকশা অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানাওয়ালারা প্রায় দুইশত রকমারী চটি বই ছাপান।' এমনই একটা বই ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ।' (প্রথম খণ্ড)। এ বইটি কেমন চলেছিল সে কথা লেখক নিজেই বলেছেন 'আপনার মুখ আপনি দেখ' পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া পাঠক সমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হইবে, পূর্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় অনেকানেক পাঠক মহাশয়েরা উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া 'দেশাচার সংশোধন পক্ষে পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে' এমত বলিয়াছেন ; তাহাতেই শ্রম সফল এবং পরম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।'

এ থেকে মনে হতে পারে বইটি খুব চলেছিল। হয়ত কথাটা সত্যি কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বইটি লেখকের পক্ষে লাভজনক হয়েছিল। তার কারণ বটতলার বহুপ্রচলিত রীতি অনুযায়ী নকল বইয়ের ক্ষেত্রে কমিশন উচ্চহারে না থাকলে বই বিক্রী হয় না। 'বটতলার পাইকারেরাও বইখানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর বলে হুতোমের নকশার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বইখানি বিক্রী করেন।' অর্থাৎ নকশার নকল হিসেবে এটা বিক্রী হত, নিজ গৌরবে নয়। এর ফলে বইটি লেখকের পক্ষে বিশেষ লাভপ্রদ হয় নি। হুতোমকে নকল করেই ভোলানাথ বই লিখেছিলেন আবার সে বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য হুতোমের কাছে অর্থ প্রার্থনা করে বেয়ারিং চিঠিও দিয়েছিলেন। ১২৭৪ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠের চিঠিতে তিনি নিজেকে নিঃস্বভাব বলে অর্থ ভিক্ষা করা সত্ত্বেও হুতোম সম্মত হন নি কারণ তার মতে 'হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করে সাগর বারিতে আপনার মুখ আপনি দেখে জ্ঞাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয় তার প্রার্থনা করেছিলেন ; উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক!' হুতোমের মতে 'পত্র দ্বারা ভিক্ষা করে পরপরীবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্তব্য নয়।' শোনা যায় এই সময় কালীপ্রসন্ন ও ভোলানাথের মধ্যে একটি উপভোগ্য 'মসীযুদ্ধ' হয়েছিল। বস্তুতঃ ভোলানাথের বইটি পড়লে হুতোমের প্রভাবের চেয়ে নকল করাটাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। এসময় টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরে দুলাল খ্যাত গ্রন্থ—বলাবাহুল্য স্বাভাবিক ভাবেই বটতলাতে নকল টেকচাঁদের আবির্ভাব হয়। টেকচাঁদ ঠাকুর (পুর্ণিয়ার) তাঁর বই 'কলকাতার লুকোচুরী' উৎসর্গ করে দিলেন এই ভোলানাথকেই।

হতভাগ্য ভিক্ষুকের 'ভিক্ষাপাত্র'টি ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রকাশ করে হুতোম তাঁর ইতিহাসগত দায়িত্বটি পালন করেছেন কারণ সুকুমার সেনের মতে 'বটতলার বাজারের অবনতির গৌণ কারণ এই বইটি' আর সেই হুতোমের নকশার সঙ্গে 'আপনার মুখ আপনি দেখ'র ভাগ্যও অনির্দ্দেশ্য সুতোয় জড়িয়ে গেছে। নকল করার এ রেওয়াজ বটতলা থেকে আজ সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে।

বটতলার ইতিহাসে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে বটতলার প্রথম সার্থক বই নববাবু বিলাস থেকে নকশা ও তার নকলগুলো সবই সুতোয় বাঁধা। নববাবু বিলাসের প্রভাব আলালের ঘরে

দুলাল (১৮৪০) অস্বীকার করেনি। নকশা (১৮৬০) আলালের ঘরে দুলালকে অস্বীকার করতে পারে না। কালীপ্রসন্ন সিংহ ধনী সন্তান ও ঘোর বাবু। তাঁর জীবনী বা কীর্তি আমাদের আলোচ্য নয় কিন্তু তাঁর নব্যবঙ্গ ভাব ও বিদ্যোৎসাহিনী সভাটি বটতলা যুগের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার সদস্য ছিলেন সেকালের বহু নব্যবঙ্গেরা।

নীলদর্পণ নাটক সম্বন্ধে পাঠকদের কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এই নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয় লঙ সাহেবের নামে। শোনা যায় মূল অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন। এই অনুবাদের জন্য লঙ সাহেবের যে জরিমানা হয়েছিল তা দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন। মাইকেল মধুসূদনকে প্রথমতম সংবর্ধনাও জানিয়েছিলেন কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা। অথচ ডঃ সুকুমার সেনের ধারণা সেই মধুসূদন দত্ত কালীপ্রসন্ন ও তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী সভাকে ব্যঙ্গ করে তাঁর একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসনে কালীচরণ ও জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা এঁকেছেন। কিন্তু এটাই বড় কথা নয়। কারণ সে যুগে বারোইয়ারীতলা থেকে চলতি সঙের নামে যেমন বটতলার বইয়ের নামকরণ হত তেমনি খ্যাতনামা রচয়িতা বা পরিচিত চরিত্র থেকেই নাটকের চরিত্র সন্ধান করতেন। শোনা যায় সধবার একাদশীর মাতাল নিমাইচাঁদ চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে নাট্যকার দীনবন্ধু স্বয়ং মধুসূদনকেই আশ্রয় করেছিলেন। (হুতোমও তাঁর নকশায় বহু পরিচিত চরিত্রকে কাজে লাগিয়েছেন।) অবশ্য এ গুজবের বিরুদ্ধে নাট্যকার দীনবন্ধুরই উক্তি 'মধু কি কখনও নিম হয়' প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু সে যুগে নিন্দা শুনতে লোলুপ নয় এমন লোক বিরল ছিল।

কালীপ্রসন্ন বটতলা যুগের শেষ প্রহরী। প্রদীপ নিভবার প্রাগ-মুহূর্তে যে জ্যোতি সেটুকু যুগিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল হুতোমের নকশা। বলা বাহুল্য, নকশা একটা বইয়ের নাম নয়, বটতলা যুগের শেষ ধাপের নাম। নকশার অনুকরণেও ব্যঙ্গ করে বহু বই এ সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ হুতোমের চলতি ভাষার নতুন কলমবাবু সভ্যতাকে চিরে তার অসামঞ্জস্যকে ফুটিয়ে তুলেছিল। এই সময় বাবুদের মধ্যে বদল শুরু হয়েছিল। প্রথমতঃ বাবুর সংখ্যা তখন বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপরন্তু পুরনো বাবুদের প্রদীপের তেলও ফুরিয়ে এসেছিল—সে স্থান নিয়েছিল এক নতুন শ্রেণীর বাবু। তারা অর্থের সঙ্গে শিক্ষারও স্পর্শ পেতে শুরু করেছেন। তারা বাবু হবার চেয়ে 'এজু' হতে চাইতেন। এই নবশিক্ষিত বাবুরা ফিরিঙ্গী সংস্পর্শ ও শিক্ষার আলো পেয়ে চরিত্রের দিক থেকে বিশেষ উন্নত না হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করলেন। তাঁরা মিলটন শেক্সপীয়র পড়লেন কিন্তু নেটিভ বাংলাকে পাত্তাই দিলেন না। মদ ও গোমাংস তখন নতুন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন শুধু রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' বইটি পড়াই যথেষ্ট।

নতুন শিক্ষার আলো স্থায়ী ভাবে পড়তেই বটতলার বাজার সীমিত হয়ে এল। বটতলার বইয়ের শহুরে খদ্দের তখন নেই বললেই চলে। কেবল স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার স্লোগানের ফলে তখন অন্দর মহলে দু একটি বটতলার বই অনুপ্রবেশ করতে লাগল। আমরা আগেই বলেছি বটতলাকে বাঁচিয়ে রাখে সদ্য-সাক্ষর অশিক্ষিতরা। শহর কলকাতায় এদের সংখ্যা হ্রাস পেতেই

বটতলার প্রদীপ নিভে আসতে থাকল। চিকের আড়ালে দু একটি বই বিক্ষিপ্ত ভাবে বিক্রী হলেও তা বাজার টিকিয়ে রাখতে পারল না।

গ্রামজীবনের শান্ত নির্মলতা গিয়ে শহরের জীবনের কোলাহল আসন স্থায়ী করল। দিকে দিকে বিবর্তন। এর মধ্যে বটতলাকে আঘাত দিল শিক্ষার বিস্তার ও গভীরতা এবং স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা। উনবিংশ শতাব্দীর এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগটির নাম transition Period। এযুগের প্রধান ফসল হবে ব্যঙ্গ সাহিত্য। সদ্য শিক্ষিতের স্বল্প অক্ষর পরিচয় যে নবীন ক্ষুধার সৃষ্টি করে তাই মেটাতে বটতলার আবির্ভাব কিন্তু ব্যঙ্গসাহিত্যেই তার অবসান।

তবু প্রথমদিকে বটতলা আত্মরক্ষার তাগিদে আপ্রাণ প্রয়াসের ত্রুটি করেনি। ব্যবসাদার বই বিক্রেতা নয় ধনী বাবু যখন স্বয়ং 'বাবু' হুজুগের মূলে কুঠারাঘাত করলেন তখন উত্তেজিত ছাপাখানাওয়ালারা দুটি উপায়ে এ সমস্যার মোকাবিলা করলেন। (১) উত্তেজিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অজস্র নকল নকশা বই বা পত্রিকা প্রকাশ করে তাৎক্ষণিক লাভের দিকে লোলুপ নজর দিলেন। (২) বাবুদের এই 'সাধু' প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘস্থায়ী টোটকা হিসেবে হুতোমকে উপহার দিলেন 'আপনার মুখ আপনি দেখ'। বাবু-অশ্লীলতার দিকে আঙুল তোলার দুঃসাহস সে যুগে কেবলমাত্র বাবুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। আর যুগের দৌলতে কোন 'বাবুই' সেযুগে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ও আলোচনার উর্দ্ধে ছিলেন না। তাই তাঁরা আশা করেছিলেন এই মুষ্টিযোগের আশঙ্কায় কোন দুঃসাহসী বাবু এর পর আর বিব্রত হবার ভয়ে এই দুঃসাহস করবেন না। এর ফলে বাবুদের ঘোর কাটবে না বটতলার বাজার থাকবে অটুট।

কিন্তু বটতলার ব্যাপারী জানতেন না, ভোররাতের অন্ধকারকে কৃত্রিম ভাবে টিকিয়ে রাখাই মুসকিল। ব্যবসার প্রয়োজনেও নয়। হুতোমের নকশায় বাবুদের ঘোর কাটল। সামাজিক বিবর্তনের জোয়ার এসেছে তখন। তাই আপনার মুখ আপনি দেখ বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে লেখকের ভিক্ষাপাত্র।

বটতলার আবির্ভাব থেকে অবসানের একটি ভৌগোলিক মানচিত্র আঁকা যায়। খোলা হাটে সুতার নুটি কিনতে দেশী বিদেশী ব্যবসায়ী যাতায়াত থেকেই শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠা। এর পর ইতিহাসের স্রোত রয়েছে দক্ষিণ অভিমুখে। সোনাগাছি পেরিয়ে বটতলা। কিন্তু বটতলার মোড়েই স্থাপিত হয়েছে গৌর আঢ্যের ওরিয়েন্টাল মেসিনারী।

এর পর সভ্যতা সংস্কৃতি যতই দক্ষিণ অভিমুখে এগিয়েছে বটতলার অস্তরাগ ততই স্তিমিত। আদি ব্রাহ্ম সমাজ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি স্ত্রী-শিক্ষার স্কুল, অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুল, সবচেয়ে বড় কথা ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোডের আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রামমোহন দ্বারকানাথের নতুন সূর্য উঠেছে বটতলা পেরিয়ে। বটতলার নিশ্ছিদ্র কুৎসিত অন্ধকার তাই কেটে আসছে। বাবু বিবিরা বন্দরের বেলা শেষ করে ফুরিয়ে যাচ্ছেন, হারিয়ে যাচ্ছেন। গণিকারা যাচ্ছেন ছড়িয়ে। উনবিংশ শতাব্দী তার বয়ঃসন্ধিকাল পেরিয়ে প্রমাণ করছে বটতলার অন্ধকার রাতগুলোই কলকাতার যৌবনকে করেছে ত্বরান্বিত, সুপ্রমাণিত। শীতের রুক্ষ কনকনানি কাটিয়ে দিলে বসন্তের আবির্ভাব ঠেকিয়ে রাখা যায় কি ?

গ্রীক নাট্যকার অ্যারিষ্টোফেনীস

সত্যভূষণ সেন

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে দেখা যায় সেখানে মানব জীবনের প্রায় সকল বিষয়েরই অনুশীলন হয়েছিল এবং বিকাশলাভও ঘটেছিল ; সে দেশের সাহিত্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যেও তারা সকল বিষয়ে সচেতন ছিলেন, জীবনের এবং মানব সমাজের কোনও কিছুই তাদের আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি। গ্রীসের মহাকবি হোমার পাশ্চাত্য জগতের অদ্বিতীয় সাহিত্য প্রতিভা। হোমারের পরে নাট্য সাহিত্যের যুগ। নাট্য সাহিত্যে গ্রীক প্রতিভার বিশিষ্ট বিকাশ দেখা যায় মানব জীবনে নিয়তির নির্মম কঠোর বিধান এবং জীবনের দুঃখ বেদনার করুণ কাহিনী চিত্রণে ; গ্রীক ট্রেজিডি প্রবাদ বাক্যে পরিণত। গ্রীক ট্রেজিডি নাট্যের রচয়িতা হিসাবে ঈসকাইলাস, সোফোক্লীস এবং ইউরিপিডেসের নামে গ্রীকদেশ গৌরবান্বিত। কিন্তু জীবনের দুঃখ বেদনার কাহিনীই তো সব কথা নয়, অপর দিকে আছে জীবনের আনন্দ উল্লাস এবং চপলতার লঘু দিক যা নিয়ে হয় কমিডি নাটক। কমিডি নাটকের ক্ষেত্রে প্রধান পুরুষ অ্যারিষ্টোফেনীস।

অ্যারিষ্টোফেনীসের জন্ম হয় ঢোডস দ্বীপে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪৫০ সালে। কিন্তু তিনি জীবনের প্রথম থেকেই এথেন্সে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং ঐতিহ্য মণ্ডিত এই দেশের প্রতি তার অনুরাগও জন্মে। তার বয়স যখন উনিশ বিশ বৎসর তখনই নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে তার সচেতনতা জাগে। তখন সেখানকার জাতীয় জীবনে নানা দিকে অনেক শিথিলতা এসে পড়েছিল, অ্যারিষ্টোফেনীসের যেমন ছিল প্রতিভা তেমনই তার ছিল সংস্কারক মনোবৃত্তি। তিনি পরিকল্পনা করলেন যে নাট্য রচনার মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবনের সংস্কার সাধন করতে হবে ; প্রথমে তিনি তাদের তিরস্কার করবেন, তাদের অপদস্থ করবেন, তারপর তিনি তাদের উন্নত জীবনের পথে পরিচালিত করবেন। এজন্য তিনি বেছে নিলেন নাট্য কাব্যে কমিডির ধারা।

এথেন্সে তার জনপ্রিয়তা ছিল ; জনগণের মধ্যে দলাদলি এবং তাদের জীবনের লঘুচপলতার দিক তার কাব্যে উপজীব্য হল। এথেন্সে তদানীন্তন জনগণের জীবনের ছোট বড় সকল দিকই তার নাট্যকাব্যে প্রতিফলিত হতে লাগল। সমাজ জীবন, রাজনীতি, রাষ্ট্রনেতা, সৈনিক, দল-প্রবক্তা, সাধারণ নাগরিক সকলের উপরেই তার নির্মম কষাঘাত চলতে লাগল অকুণ্ঠিতভাবে। পরবর্তীকালে আইনের বিধি বিধানে কমিডির যথেচ্ছাচার কতকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, কিন্তু অ্যারিষ্টোফেনীসের আমলে এথেন্সের জনগণকে সবই সহ্য করতে হত। এই প্রতিভাভঙ্গীও লেখকের রচনায় অনেক স্থুল রসিকতাও ছিল যা ছিল আপত্তিজনক কিন্তু তার চিত্র ছিল সম্পূর্ণ-ভাবেই জীবনের আদর্শসঙ্গত ; জনগণের জীবনের চিত্রের ইতিহাসের কতকালে যেন রক্ত মাংস এবং আকার সৌষ্ঠব দানে এবং রং-এর প্রলেপে যেন সেকালের গ্রীক জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র ; পতির নিকট পত্নী যেন খেলার পুতুল, পিতা-পুত্রের অমিতব্যায়িতায় জর্জরিত, তার্কিকের কূটতর্কে

হীনতাও মহিমান্বিত, জনজীবনের পাপে এবং স্থিরবুদ্ধিহীনতার প্রসঙ্গে দল প্রবক্তার জয়-জয়কার—এরূপ নানাপ্রকার যে সকল পাপ ও চরিত্র শিথিলতার জন্য একটা গরিষ্ঠ জাতির পতন ঘটেছিল, তারই পরিপূর্ণ আখ্যায়িকা যেন অত্যন্ত দরদের সহিত চিত্রিত।

অ্যারিষ্টোফেনীসের রচনা প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ না করে পারা যায় না। কমিডি রচনাতে তিনি জনগণের চিত্তবিনোদনে অনেক আনন্দ বিধানের ব্যবস্থা করতেন বটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্থূল রসিকতার রুচিহীনতা এবং কোথাও বা জীবনের পঙ্কিল ক্লেদাক্ত দিক এমন কুণ্ঠাবিহীন নগ্নভাবে প্রকাশ করতেন যে তা রীতিমত নক্কারজনক হয়ে উঠত। শুধু আমাদের বর্তমান যুগের রুচির পক্ষেই অসহনীয় নয়, প্রাচীন গ্রীসেও অনেকের নিকট এসব অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হত এবং পরবর্তীকালের সাহিত্যরসিক সমাজেও সমালোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, দেশের জনগণকে তামসিকতার মোহ থেকে উন্নত জীবনাদর্শের অভিমুখে উদ্বুদ্ধ করা। সেজন্য উদ্দেশ্য বিবেচনায় অনেকে তার এই অবগুণকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছেন। একজন কবি সমালোচক R. P. Downes বলেছেন—

> We rather in his scornful ire
> Dicern a patriotic fire
> Which only stung that it might bless.

ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং বলেছেন—Such aims-alone, no matter for the means Declare the unexampled excellence of their first author—Aristophanes. এ ছাড়া অ্যারিষ্টোফেনীসের চিত্তে যে সম্ভ্রম বোধেরও অভাব ছিল এ কথাও অস্বীকার করা যায় না—তিনি দেবদেবীদের নিয়ে রহস্যবিদ্রূপ করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। উদ্দেশ্য বিবেচনায় তার অবগুণকেও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা যায় তার পরিচয় স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এসটি. জন ক্রাইসোস্তোম নামে একজন স্বনামখ্যাত ধর্মযাজক অ্যারিষ্টোফেনীসের রচনা পড়ে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তার নিজের রচনায় তিনি অ্যারিষ্টোফেনীসের ভাষার অনুকরণ করতেন। অ্যারিষ্টোফেনীসের যে সকল নাটক কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে এসেছে তার জন্য অনেকটা কৃতিত্ব এই ধর্মযাজকের প্রাপ্য।

প্রাচীন গ্রীসের তদানীন্তন জাতীয় নাট্যউৎসবে অ্যারিষ্টোফেনীস অন্ততঃ ৩৭ বৎসরকাল নাটক যুগিয়েছিলেন, তার মধ্যে এগারোখানা নাটক পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া গিয়াছে। যে সকল নাটকের খণ্ডিত অংশ মাত্র খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু যেগুলির নাম বা আখ্যাপত্র পাওয়া যায় না তার সংখ্যা অন্ততঃ পঞ্চাশখানা। তার নাটকের উৎকর্ষের মূলে রচনার পদলালিত্য এবং কবিজনোচিত ভাবাবেগও অনেকটা অংশ ভাগী। একজন সমালোচক আর. পি. ডাউনস যথার্থই বলেছেন তার রচনা পড়তে পড়তে মনে না হয়ে পারে না যে একদিকে তিনি যেমন বিদূষকের ন্যায় হাসাতে পারতেন বা ক্রূর সর্পের ন্যায় দংশন করতে পারতেন আবার তারই মুখে দেখা যেত দেবোপম হাসির দীপ্তি। তার রসিকতার সাবলীলতায় যদি তাকে ভলটেয়ার বা সুইফটের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে তার কবিত্বের ভাবকল্পনায় এবং কাব্যের সুর ঝঙ্কারে অনেক স্থলেই শেলী

বা বায়রণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভাবলালিত্যে এবং কবিত্বের মোহবিস্তারে শেক্স্‌পীয়ারের কথাও মনে হয়।

অ্যারিষ্টোফেনীসের সর্বোৎকৃষ্ট দুখানা নাটক, 'মেঘদল' এবং 'পাখিদল'; ভাবকল্পনার ভাষার সৌন্দর্যে এবং নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক বিষয়ের প্রাচুর্যে এই দুখানা নাটক যে কোনও যুগের কমিডি নাট্য সাহিত্যে অতুলনীয় এরূপ বললেও অত্যুক্তি হবে না। একজন সমালোচক জে. এস. সাইমণ্ডস অ্যারিষ্টোফেনীসকে যথার্থই বলেছেন—The greatest comic poet of the world.

'মেঘদল' নাটকের বিষয়বস্তু সফিষ্ট সম্প্রদায়; এথেন্সে সেই সময়ে সফিষ্টরা ছিলেন এক শ্রেণীর শিক্ষক; ভাবব্যঞ্জনার চাতুর্য্যে এবং কূটতর্কের প্রসাদে এরা যে কোনও বিষয়ে নিজের খুশিমত যা কিছু প্রমাণ করতে পারতেন; অর্থের বিনিময়ে এরা সেইভাবেই জনগণকে শিক্ষা দিলেন। 'মেঘদল' কাব্যে লেখক সফিষ্টদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে সত্যের প্রতিষ্ঠার চেয়ে ভুল খুঁজে বার করবার জন্যই এদের আগ্রহ বেশি, সমস্যা উপস্থাপিত করা, কিন্তু যার সমাধানের জন্য এদের কোথাও উৎসাহ নেই, সত্যের প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করতে পারলেই এদের আনন্দ। এই নাটকের প্রধান উপজীব্য এই সফিষ্টদল; এই পরিপ্রেক্ষিতে নাটকখানার নামকরণ সার্থক। মেঘের প্রবৃত্তি বা ধর্ম চঞ্চলতা, অস্থিরতা যা ধরা ছোঁওয়া যায় না, আয়ত্তে আনা যায় না, তার মধ্যে সৌন্দর্য থাকলে সেই সৌন্দর্যের মধ্যেও স্থিরতা নেই; অনেক সময়ে স্বর্গকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, পৃথিবী এবং আকাশের উপরেও মায়া বিস্তার করে। সফিষ্টদের চরিত্রের মধ্যেও যেন এই সকলেরই সমাবেশ।

'মেঘদল' নাটকের মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে কাব্যসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা যে-কোনও শ্রেষ্ঠ কাব্যের সহিত তুলনীয় হতে পারে। কাব্যের সৌন্দর্য অনুবাদে সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে না, তথাপি রচনার নমুনা হিসেবে কয়েকটি ভাবানুবাদ দেওয়া হল।

নাটকের এক অঙ্কের যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে মেঘদলের সমবেত সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে।

আমরা মেঘদল,
কালের প্রবাহে আমরা চিরন্তন;
কল্লোলমুখর সাগর আমাদের পিতৃভূমি,
যেখান থেকে আবির্ভূত হই
মানুষের দৃষ্টি সীমায়
রবিকরস্নাত শিশিরের ন্যায় দীপ্ত মূর্তিতে।
বনভূমিবেষ্টিত পর্বতশীর্ষ থেকে
আমরা দৃষ্টি প্রসারিত করি
যেখানে ধরিত্রীর উর্বর ভূমিতে
আমরাই ফলিয়ে তুলি শস্য সম্ভার।
সেখান থেকে শুনতে পাই
চিরপ্রবাহিত নদ-নদীর তরঙ্গ কল্লোল।

যার প্রবাহ গিয়ে লয় পেয়েছে
গর্জনমুখর সাগরে।
সূর্যকরকালে আমাদের ঝড়ঝঞ্ঝার
আবরণ উন্মুক্ত,
আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি
নীচেকার পৃথিবীর দৃশ্য।

মেঘদলের সঙ্গীত আরও নিকটবর্তী হয়ে আসছে, তারা সঙ্গীতের মাধ্যমে অর্ঘ্য দান করছে গ্রীসদেশের উদ্দেশ্যে—

আমাদের ভগ্নীদল
নিয়ে এসেছে বৃষ্টিধারা
আমরা সকলে মিলে অভিবাদন জানাই
গ্রীসদেশকে,
বীরত্বের অবদানে যে দেশ গৌরবান্বিত
ভক্তি ও সম্ভ্রমবোধ
যেখানে পূর্ণরাজত্বে দীপ্যমান,
অবিশ্বাসীর পদক্ষেপ যেখানে অপ্রত্যাশিত,
যেখানে ধর্মকর্মের জন্য মন্দির দ্বার অবারিত,
দেবতাদের উদ্দেশ্যে সাদরে প্রদত্ত হয় অর্ঘ্য,
উচ্চারিত হয় প্রার্থনা মন্ত্র,
সমুন্নত মন্দির ঊর্ধ্বাকাশে প্রসারিত,
দিকে দিকে দেবোপম সুন্দর মূর্তি শোভমান,
তিথিতে তিথিতে দিকে দিকে
ভক্ত মন্দির অভিমুখে বয়ে চলে
আনন্দ সঙ্গীতমুখর শোভাযাত্রা।

এ সকল স্থলে লঘু চপলতা এবং রসিকতার মনোবৃত্তি যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে কবিত্বের ভাবাবেগের প্রকাশে।

এই নাটকের মধ্যেই একস্থলে নীতি শিক্ষা দানের প্রয়াসও দেখা যায়। ম্যারাথন যুদ্ধবিজয়ী গ্রীক বীরদের আদর্শ স্মরণ করে কবি একজন অলস নিষ্ঠাবিহীন যুবককে উদ্দেশ করে বলছেন—

আমার সঙ্গে এসে বেছে নাও যেথা সৎপথ;
পরিহার কর আরাম বিলাস এবং নিস্ফল
বাক্‌বিতণ্ডার অভ্যাস। যা কিছু লজ্জাজনক
তার জন্য লজ্জাবোধ করো। বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ
এসে পড়লে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে সম্মান প্রদর্শন করো,

পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হও। কোনও
হীন প্রবৃত্তিতে যেন মতি না যায়। শ্রদ্ধা ভক্তির
আদর্শ অন্তরে মুদ্রিত রেখো, ইত্যাদি।

এ সকল ছাড়া অপর পক্ষে রসিকতার উজ্জ্বল দীপ্তিতে নাটকখানা পরিপূর্ণ; সেই সফিস্ট সম্প্রদায়—যাদের তিনি আখ্যায়িত করেছেন এথেন্সের নীতিনিষ্ঠাবিহীন শয়তানের দল বলে, তাদের উপরে তীব্র তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে তিনি নানাভাবে তাদের জর্জরিত করেছেন।

'পাখিদল'—এই নাটকেও অপরূপ কল্পনার অভিনবত্ব ও প্রসার বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। এই নাটকখানাতে আছে বহু বিচিত্র কল্পনা ও আনন্দমুখরতা এবং সরল রসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ। সেই সময়কার এথেন্সের গণ-মানসের চরিত্রদৈন্য এবং নীতিনির্বিকার অভাবকে লক্ষ্য করেই এ সকল শ্লেষ বিদ্রূপের সৃষ্টি যে অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সিসিলির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালান হয়েছিল যার ফলে এথেন্সের শক্তি পর্যুদস্ত হয়েছিল, বিশেষ করে সেই প্রসঙ্গই ছিল নাটকের আক্রমণ স্থল।

এথেন্সের দুজন নাগরিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের এই সকল অপচারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অভিযানে বের হয়ে পড়লেন এমন কোনও আদর্শ দেশের সন্ধানে, যেখানে মামলা মোকদ্দমা নেই, প্রতিপক্ষ নেই, অবিবেচনাপ্রসূত যুদ্ধ নেই, কোনও ধর্মযাজক নেই, কবি নেই, আইনজীবি নেই, পদলেহন মনোবৃত্তিধারী কেউ নেই এবং যেখানে সকল ব্যবস্থা ন্যায় নীতি এবং সুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। এই অভিযানে তারা পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করলেন দুটি পাখিকে। এই পাখিরা তাদের নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করল পাখিদের রাজ্যে। সেখানে তারা প্রথমে বরং বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করলেন, কারণ এতকাল পাখিরা মানুষদের হাতে যে নির্যাতন সহ্য করে আসছে তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই পাখিরা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। কিন্তু এথেন্সের নাগরিকদ্বয় পাখিদের তুষ্ট করবার জন্য বললে, জগৎসৃষ্ট সকল প্রাণীদের উপরে পাখিদের সর্বময় প্রাধান্য সর্বজন স্বীকৃত। তখন পাখিরা তৃপ্ত হয়ে দুজন অতিথিকে গ্রহণ করল তাদের মধ্যে। অতিথিদের তারা যে বাক্যে অভিবাদন জানাল তার মধ্যে কবিত্বের সঙ্গে শ্লেষেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

শোন হে মানুষ দল
যাদের জীবিতকালের সীমা
দিনের পর দিন
দুঃখ বেদনার ভারে যেন দীর্ঘায়ত;
পালকবিহীন নগ্ন তোমাদের দেহ
রুগ্ন এবং দুর্বল দেহ মাটিতে তৈরি;
অতৃপ্ত তোমাদের মন
সদা অভিযোগমুখর।
অবধান কর তোমরা পাখিদের বচন,
যারা সর্বাধিপতি, যারা অমর,

আকাশ রাজ্যের স্বাধিকারে যারা গৌরবান্বিত,
যারা উপর থেকে তোমাদের দেখছে
কৃপার দৃষ্টিতে
দুঃখ বেদনার ভারে
জর্জরিত তোমাদের জীবন সংগ্রাম,
শিক্ষালাভ কর আমাদের নিকট থেকে,
হয়তো সুগম হবে পথের সন্ধান।

মানুষ অতিথিরা পাখিদের পরামর্শ দিলেন যে, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত তাদের সকল শক্তি সংহত করে তারা একটা বড় রাজ্য যাতে সংগঠন করে তুলতে পারে। তাদের উচিত আকাশ রাজ্যে একটা নগরের প্রতিষ্ঠা করা, সেখানে থাকবে তাদের নিজেদেরই আদর্শ রাজ্যনায়ক এবং দেবতারা। এই পরামর্শ তাদের মনপূত হল এবং এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবার জন্য এক জনসভার আহ্বান করা হল।

এস সব পাখির দল : যারা উড়ে বেড়াও, যারা গান করে সকলকে আনন্দ বিতরণ কর, যারা অস্ফুট কাকলিতে নিজেকে প্রকাশ কর, যারা মাঠেঘাটে ঘুরে শস্যবীজ থেকে খাদ্য গ্রহণ কর, যাদের সুমধুর কাকলি শুনতে শুনতে চাষীরা মাঠে হাল চালনা করে, যারা পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে নানা প্রকার ফল খুঁজে বেড়াও, যারা লাল চেরীফলের আস্বাদ গ্রহণ কর, যারা জলাভূমিতে গিয়ে মশা কীটাদি খেয়ে বেড়াও, যারা মানুষের বাগানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর, যারা সাগর বক্ষের উপর উড়ে বেড়াও ; তোমরা যে যেখানে আছ সকলে এস। মানুষের দেশ থেকে এক বিচক্ষণ প্রতিনিধি নিয়ে এসেছে এক সুন্দর পরিকল্পনা। তোমরা সকলে এসে সেই কথা শোন।

এই পরামর্শ সভায় সকলে এসে মুখর হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে মানুষ দুটির দেহেও ডানা জুড়ে দেওয়া হল যাতে তারা এই নতুন পরিবারের উপযোগী হতে পারে। পৃথিবীর উপরে আকাশে এক অভিনব নগরের প্রতিষ্ঠা হল—'মেঘপাখিনগর'। এই পাখিনগরকে উপলক্ষ করে আছে তীব্র সূক্ষ্ম শ্লেষ বিদ্রূপের ছড়াছড়ি—যেন পাখিনগর থেকে এথেন্সের উপরে বাণ বর্ষণ। এই বাণসমূহের লক্ষ্য ছিল প্রধানত আন্দোলনকারী ষড়যন্ত্রের নায়ক মূর্খের দল, তোষামোদীর দল, যারা অ্যালসিয়াডিসের নায়কতায় সিরাকিউজের বিরুদ্ধে এক অভিযানে প্ররোচিত হয়েছিল, যারা আশা করেছিল এই অভিযান গ্রীসের জন্য এনে দেবে কার্থেজের উপরে জয় এবং ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য।

পাখিদের রাজা এবং তার প্রজাগণ যদি তাদের অতিথি এথেন্সের এই মানুষ দুটির পরামর্শ গ্রহণ করে তবে বিশ্বজগতে শক্তির সমতা রক্ষা হতে পারে।

তোমাদের এই সুউচ্চ প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে তোমরা মানুষকে শাসন করতে পার এবং তাদের সর্বাংশে বশে রাখতে পার—যেমন তোমরা করে থাক পতঙ্গ এবং পঙ্গপালের বেলায়। যদি দেবতারা তোমাদের বিরোধিতা করে তবে তোমরা তাদের অবরোধ করে এবং ক্ষুধায় তাদের জর্জরিত করে তাদের বাধ্য করতে পার তোমাদের নিকট আত্মসমর্পণে।

সিসিলির বিরুদ্ধে অভিযানে ফলে গ্রীসদেশের জীবনে যে দুর্দৈব এসেছিল তার বিরুদ্ধেই

অ্যারিষ্টোফেনীসের এই শ্লেষবাণী।

অ্যারিষ্টোফেনীসের যে সকল নাটক সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে তিনখানা নাটকের উপজীব্য বিষয়—নারী-সমাজ জীবনে নারীর স্থান। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় এটা একটা তুর্বলতা বলে গণ্য করা যেতে পারে যে, নারীকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হত না। অ্যারিষ্টোফেনীসও দেখা যায় সমসাময়িক যুগের নির্ধারণ ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। নারীর চরিত্র অঙ্কনে তাকে বরং অবিচার করতেই দেখা যায়। তথাপি যে যুগে নারী মোটের উপর কেবল তুচ্ছতাচ্ছিল্যই লাভ করত সে যুগেও অ্যারিষ্টোফেনীস সমাজ জীবনে নারীর ক্ষমতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একটি নাটকে নারীদের মুখে একটি সমবেত সঙ্গীত দেখা যায়। তাতে যেন অ্যারিস্টোফেনীসের যুগের মেয়েরা বর্তমান যুগের ভাষায় কথা বলছে।

তারা কেবলই নারীকে তিরস্কৃত করছে—পুরুষ জীবনে
নারী যেন একটা তুর্দৈব, তারা বলে আমরাই
যত অনিষ্টের মূল ; বার-বার বলে, যুদ্ধ-বিবাদ,
রক্তপাত যা কিছু ঘটুক সকল অনিষ্টের মূলেই আমরা।
তাই যদি হয় তবে তোমাদের জিজ্ঞাসা করি,
তোমাদের মতে আমরা যদি তোমাদের তুর্দৈবই হয়ে থাকি
তবে তোমরা আমাদের বিয়ে কর কেন ; আমাদের জন্য
এত আদর যত্নই বা কেন তোমাদের—আমরা এক
মুহূর্তের জন্য বাইরে গেলে তোমরা বিচলিত হয়ে
ওঠ। তোমাদের তুর্দৈব যদি বাইরে চলে যায় তবে তো
তোমাদের ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত, তা না
করে তোমরা খুঁজে বেড়াও, আমার তুর্দৈবটি আজ
আবার কোথায় গেল।

অ্যারিস্টোফেনীসের আর একখানা নাটক প্লুটাস—ধনদেবতা ; প্লুটাস চিত্রিত হয়েছে যেন ক্রোধের প্রতিমূর্তি। কারণ মানুষ তাকে মর্যাদা দেয় না, যে কৃপণ সে ধন-সম্পদ শুধু যক্ষের মত মাটির নীচে সমাহিত করে রাখে, ভোগ করে না। অপর পক্ষে যে অমিতব্যয়ী সেও ধন-সম্পদের সদ্ব্যবহার করে না, যথেচ্ছভাবে নষ্ট করে ফেলে। দেবতার বিধানে প্লুটাস আবার অন্ধ যাতে সে অসৎ লোকের ভিড় থেকে সৎ লোক বেছে নিতে না পারে। নাটকে আছে এথেন্সের একজন নাগরিক প্লুটাসকে আমন্ত্রণ করল তার গৃহে আসবার জন্য, প্রথমেই সে প্লুটাসকে আশ্বাস দিল যে সে একজন সংযমী চরিত্রের লোক! প্লুটাস আশ্বস্ত হতে পারলেন না ; মন্তব্য করলেন সকলেই ঐ কথা বলে, আমাকে একবার আয়ত্তে পেলে তখন সকলেরই সংযম ভেসে যায়। কথা প্রসঙ্গে অর্থের শক্তির কথা ওঠে, আশ্চর্য সকল জিনিসেই এক সময়ে মানুষের তৃপ্তি লাভ হয়। অর্থ লাভের বেলায় কারও তৃপ্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, যত পায় ততই আরও পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।

কারিও এবং ক্রেমীলাস তুই বন্ধু প্লুটাসকে অভিযোগ জানাতে লাগল যে এথেন্সের যত কিছু

দুর্দ্দৈব প্লুটাসই সকলের মূলে।

কারিও—পারস্যের লোকেরা যে এত অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে সেজন্য তুমিই অপরাধী নও কি ?

ক্রেমীলাস—তোমার সহায়তা লাভেই তো লোকে পার্লামেণ্টে গিয়ে আসন লাভ করে।

কারিও—নৌ শক্তির জন্য ব্যয় বরাদ্দ সঙ্কীর্ণ করে তোলে সে তুমি ছাড়া কে ?

ক্রেমিলাস—বিদেশীয়দের অর্থ দিয়ে সাহায্য করে সেও তো তুমি ?

কারিও—আমাদের বন্ধুকে কারাগারে যেতে হচ্ছে সেও তো তোমার সহায়তার অভাবের জন্য।

ক্রেমিলাস—অসৎ উপন্যাস রচিত হয় কেন ? সেও তো তোমারই জন্য।

কারিও—মিশর দেশের সহিত ঐ ষড়যন্ত্র তাও তোমারই যোগসাজসে সম্পন্ন হয়নি কি ?

ক্রেমীলাস—লায়েস একটা অসচ্চরিত্রকে ভালবাসে, সব তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে।

কারিও—আমাদের নতুন নৌসেনাধ্যক্ষের প্রাসাদ—

ক্রেমীলাস—(কারিওকে) তোমার মাথার উপরে ভেঙ্গে পড়ুক (প্লুটাসকে) সংক্ষেপে বলতে গেলে, যা কিছু ঘটেছে সবই তোমার জন্য নয় কি ? ভাল হোক মন্দ হোক সকলের মূলে তুমি। আর যুদ্ধের ব্যাপারে তুমি গিয়ে যার দিকে ভার অর্পণ করবে তাদের জয় সুনিশ্চিত।

প্লুটাস—সত্যই কি আমার ক্ষমতা এমন সর্বাত্মক ?

ক্রেমীলাস—তার চেয়েও বেশি। সংসারে প্রেম, সঙ্গীত, বীরত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সম্মান প্রতিপত্তি, সকল বিষয় সম্পর্কেই এক সময়ে না এক সময়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ঘটে। কিন্তু তোমার দানে কখনও কারও তৃপ্তি লাভ হয়েছে এমন দেখা যায় না।

অ্যারিষ্টোফেনীসের মৃত্যু ঘটে সত্তর বৎসর বয়সে। তার যে কখানা নাটক সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে তার দেশের সে যুগের জীবনের চিত্র সুপরিস্ফুট। মানুষ হিবাবে এবং কবি হিসাবে তার সার্থক প্রতিষ্ঠার মূলে আছে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং চরিত্রনিষ্ঠা ও বীর্যের প্রতি তার সম্ভ্রম বোধ। এথেন্সে সেই সময়ে ছিল পতনের যুগ, জাতি হিসাবে তাদের মূল্যমান যে ক্রমশঃই অধোগতি লাভ করছিল ; তার নিরন্তর চেষ্টা ছিল, তার বাক্ প্রতিভা এবং লেখনী সাহায্যে যাতে তার দেশ আবার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—যখন ম্যারাথনের যুদ্ধে তারা শত্রুপক্ষকে জলে স্থলে পরাজিত করে তাদের বিতাড়িত করেছিল ; দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি যাদের দেশের শত্রু বলে মনে করতেন সেই সব পাপমনোবৃত্তিধারী এবং অসার বাকবিতণ্ডাকারীদের বিরুদ্ধে নিরলস ভাবে শ্লেষ বিদ্রূপ বর্ষণ করতেন। স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের বিশবর্ষব্যাপী ধ্বংসাত্মক সংগ্রামের পরে স্থায়ী ভাবে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় তিনি তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে গ্রীক দেশ সঙ্ঘবদ্ধ হোক, তার জাতীয় জীবনে দেখা দিক সরলতা; তার দেহের শক্তিতে এবং কাব্য সাহিত্যে দেখা দিক বীর্যের পরিচয়। তার চেষ্টা ফলবতী না হলেও তিনি যে সেজন্য আজীবন নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন তাতে মানুষ হিসাবে এবং কবি হিসাবেও তার নিজের পরিচয় রেখে গেছেন।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

মাণিকলাল (রাজঃ ৩।৩) ॥

'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঐতিহাসিক চরিত্রের ভীড়ে মাণিকলাল সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। মাণিকলাল প্রাণশক্তিতে চঞ্চল। ঘটনার চমকে তার বিস্ময়কর উপস্থিতি।

মাণিকলালকে প্রথমে আমরা দস্যুরূপে দেখি। রাজসিংহের হাতে ধরা পড়ে সে প্রাণভিক্ষা চেয়েছে নিজের জন্য নয়, একমাত্র মাতৃহারা কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। মাণিকলালের এই স্নেহপরায়ণ পিতৃহৃদয়ের জন্য, তার দস্যুতার সব অপরাধ ক্ষমা করতে আমাদের বেশি সময় লাগেনি। তাছাড়া মাণিকলাল স্বহস্তে অঙ্গুলিচ্ছেদন করে নির্বিকারভাবে যন্ত্রণা সহ্য করে যেভাবে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই সম্পন্ন করেছে তাতে তার প্রতি একটা বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগে।

তারপর আমরা প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত মাণিকলালকে দেখি। কখনো সে কৌশলে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেছে, কখনো সে দৌত্যকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেছে। মাণিকলালের চতুরতাই হচ্ছে তার সাফল্যের অন্যতম উপাদান। দস্যু অবস্থাতেও তার পরামর্শের মধ্যে বুদ্ধির ছাপ আছে কিন্তু পরবর্তীকালে সে অবিশ্বাস্যরূপে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। মাণিকলালকে ঠিক বীর আখ্যা দেওয়া যায় না, সে চতুর।

মাণিকলালের জীবন নির্মলকুমারীর সঙ্গে যেভাবে জড়িয়ে গেছে তাকে প্রেম বলা যায় না। তবে মাণিকলাল তার কন্যার মা হিসাবে নির্মলকুমারীকে গ্রহণ করলেও হৃদয় না দিয়ে পারেনি। প্রখর বুদ্ধিমতী নির্মলের কাছে মাণিকলালের আনুগত্য মাণিকলালকে যেন অনেকটা ব্যক্তিত্বহীন করে ফেলেছে। মানিকলাল মবারককে বাঁচিয়ে এক অতিলৌকিক বিত্তাবত্তার পরিচয় দিয়েছে। মবারককে বাঁচাবার পিছনে তার চিত্তের দয়ালুতা বা অন্য কোন ভাব প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা সঠিক বোঝা যায় না।

মাণিকলালের চরিত্রে অন্তর্মুখীনতা নিতান্তই অল্প, ঘটনার চমকেই তার কর্মময় উপস্থিতি। অবিশ্বাস্য হলেও পাঠকহৃদয়ে মাণিকলালের অধিষ্ঠান চিরন্তন।

মাণিকলালের পিসী (রাজঃ ৩।৯) ॥

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের জায়ের খুল্লতাত পুত্রী ছিল। সৌজন্যবশতঃই হউক আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত।' (৩।৯)। সুতরাং এই পিসীর মাণিকলালের প্রতি কোন আন্তরিক টান না থাকাই স্বাভাবিক। তিনি অর্থলোভী। মাণিকলালের কাছে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় যেভাবে তিনি খরচের ফর্দ দিয়েছেন, তাতে চরিত্রটি জীবন্ত হয়েছে।

মাধবাচার্য (মৃণাঃ ১।১)॥

মাধবাচার্য আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী চরিত্র। তিনি যবনসেনা কর্তৃক দেশ অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। এইজন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। তিনি নিজ শিষ্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে যবন বিতাড়নের কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় হলেন হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের সাহায্য তাঁর এতো বেশি প্রয়োজন যে তিনি হেমচন্দ্রের মনকে অন্যদিকে নিবিষ্ট করতে চান না। তাই মৃণালিনী হেমচন্দ্রের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জেনেও, তাকে ছলনায় পিতৃগৃহ থেকে বের করে এনে এক শিষ্যগৃহে গোপনে রেখে দেন। এই কাজ মাধবাচার্যের চরিত্রমাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করেছে। শুধু তাই নয়, শিষ্যগৃহে মৃণালিনী কেমন আছে তার খোঁজ নেওয়াও তিনি প্রয়োজন মনে করেননি এবং অনায়াসেই মৃণালিনীর চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটনায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আসলে মাধবাচার্য সন্ন্যাসী। তাই নারীচরিত্রের মহত্ব. সতীত্ব ও দৃঢ়তা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত নন। তাই মৃণালিনীর প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেননি। মৃণালিনীকে তিনি গ্রহণ করেছেন হেমচন্দ্রকে দিয়ে তাঁর কার্যসিদ্ধির উপায়রূপে। শেষপর্যন্ত অবশ্য মাধবাচার্য সৎবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সকল বৃত্তান্ত 'শুনিয়া মাধবাচার্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, 'বৎস বড় প্রীত হইলাম। তোমার প্রিয়তমা এবং গুণবতী ভার্যাকে তোমার নিকট হইতে বিযুক্ত করিয়া তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি। এক্ষণে আশীর্বাদ করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল একত্র ধর্মাচরণ কর। যদি তুমি এক্ষণে সস্ত্রীক হইয়াছ, তবে তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কামরূপ যাইতে অনুরোধ করি না। আমি অগ্রে যাইতেছি। যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপাধিপতি দূত প্রেরণ করিবেন। এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া মথুরায় গিয়া বাস কর— অথবা অন্য অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও।' (৭।১২)।

বঙ্কিমচন্দ্র মাধবাচার্যকে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীরূপে অঙ্কন করেছেন। এই চরিত্রেরই ক্রমবিকাশ দেখা যায় 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে।

মাধবীনাথ সরকার (কৃঃ উঃ ২।২)॥

ভ্রমরের পিতা 'মাধবীনাথ সরকারের বয়স এক চত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত—এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।' (২।২)।

তিনি গোবিন্দলালকে বহু পরিশ্রম করে খুঁজে বের করেছেন, তাকে বুদ্ধিবলে খুনের দায় থেকে বাঁচিয়েছেন। চরিত্রটি তৎকালীন জমিদারদের সার্থক প্রতিভূ। কন্যার প্রতি তাঁর যথেষ্ট স্নেহ ছিল।

মানসিংহ (দুর্গেঃ ১।২)॥

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্র। অম্বরপতি বিহারী মল্লের পুত্র ভগবান দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র তিনি। ভগবান-

দাস ছিলেন আকবরের শ্যালক, আবার মানসিংহ ছিলেন আকবর-পুত্র জাহাঙ্গীরের শ্যালক। এই কারণে মোগল রাজদরবারে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আবার রাজপুতপতির কাছে তিনি ছিলেন কলঙ্কস্বরূপ। বাংলায় পাঠানেরা বিদ্রোহী হলে আকবর মানসিংহকে সুবাদার করে পাঠান। ইনি কয়েকবার পাঠানদের সংঙ্গে যুদ্ধ করে বাংলায় শান্তি স্থাপন করেন। ১৫৮৯ খ্রীঃ থেকে ১৬০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত মানসিংহ ছিলেন বাংলার সুবাদার। জাহাঙ্গীরের সময় তিনি বাংলায় বারোভুঁইঞাঁদের বিদ্রোহ দমনের জন্য আসেন।

'দুর্গেশনন্দিনী, উপন্যাসে মানসিংহের স্থান নিতান্ত গৌণ চরিত্র হিসাবে তাঁর বিশেষ কোন থহিমা প্রচারিত হয়নি। জগৎসিংহের পিতা হিসাবে তাঁর মর্যাদা। ঐতিহাসিক মানসিংহকে বঙ্কিমচন্দ্র যথাযথভাবে সংক্ষেপে চিত্রিত করেছেন। তবে জগৎসিংহকে যুদ্ধে প্রেরণ করার কালে তাঁর পিতৃহৃদয়ের পরিচয় ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হয়েছে।

মারকুইস্ অব হেষ্টিংস্ (দেঃ চৌঃ ২।১০)॥
ইনি পিণ্ডারী নামক কুখ্যাত দস্যুদলকে দমন করেছিলেন।

মালতী গোয়ালিনী (বিষঃ ১৯ পরিঃ)॥
দেবেন্দ্রবাবুর অনুগত এই স্ত্রীলোকটি হীরা ও দেবেন্দ্রের মধ্যে দূতীর কাজ করেছে। বেশ বোঝা যায়, এর চরিত্র ভাল নয়।

মালী (কৃঃ উঃ ১।১৬)॥
গোবিন্দলালের বারুণী পুষ্করিণী তীরের উদ্যানের উড়িয়া মালী। রোহিণী জলমগ্ন অবস্থায় তার ব্যবহারে একটি পরিচ্ছেদেই সে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কিঞ্চিৎ হাস্যরসেরও অবতারণাও সে করেছে। গোবিন্দলাল তাকে রোহিণীর মুখে ফুঁ দিতে বললে সে বলেছেন—'সেটি পারিব না মুনিমা!'

মাহরু (দুর্গেঃ ২।৬)॥
ওসমানের বাল্যকালের নাম। (দ্রঃ ওসমান)।

মাহতাবচন্দ্র জগৎশেঠ (চন্দ্রঃ ২।৬)॥ দ্রঃ জগৎ শেঠ।

মিনহাজউদ্দীন (মৃনণাঃ ৪।৪)॥
'যবন ইতিহাসবেত্তা।' এঁর তথ্য অবলম্বনেই বঙ্কিম 'মৃণালিনী' উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচনা করেন। কিন্তু তিনি যথার্থ বুঝেছিলেন যে স্বজাতিপ্রীতির জন্য ইনি সত্য ঘটনাকে বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত করেছেন।

মিস্ টেম্পল (বিষঃ ৫ম পরিঃ) ॥
'নগেন্দ্রের পিতা মিস টেম্পল নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া লিখাইয়াছিলেন।

মীরকাশেম (চন্দ্র ১।১ ॥
'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে, ঐতিহাসিক চরিত্র মীরকাশেম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। মীরকাশেম ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বাংলার দ্বিতীয় নবাব। তিনি ছিলেন মীরজাফরের জামাতা। ১৭৬০ খ্রীঃ—১৭৬৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজত্বকাল। তিনি চেয়েছিলেন এদেশ থেকে ইংরাজ-কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইতে। তাই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাবার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মীরজাফরের সময় থেকে ইংরাজেরা যে এদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করছিল, তাকে কেন্দ্র করেই মীরকাশেমের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ বাধে। ইংরাজগণ পাটনা অধিকার করে নেন। তখন মীরকাশেম যুদ্ধ করেন এবং তিনবার যুদ্ধে পরাজিত হন। এর মধ্যে উদয়নালা বা উধুয়ানালার যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তারপর তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার ও মোগল-সম্রাট শাহ-আলমের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রীঃ বক্সারে ইংরাজের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ঐ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি পলায়ন করেন, তারপর তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

(ইতিহাসের মীরকাশেমকে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র 'মীরকাশেম' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মীরকাশেমকে রক্তমাংসের মানুষ রূপে অঙ্কন করেছেন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে। মীরকাশেম এবং দলনীর উপাখ্যানটিকে বিস্তৃত স্থান দান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। দলনী বেগমের প্রতি মীরকাসেমের সন্দেহ ও সেই সন্দেহের অবসানে মীরকাসেমের পরাজয়ের অন্তর্নিহিত কারণও সূচিত করে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন—'ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাশেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাশেম প্রথমই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুরগণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ ফকির প্রেরিত দলনীর সংবাদ পৌছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে হুতাহুতি পড়িত। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী ? আর সহিল না। (৬.২)।

একদিকে বাইরের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে অন্তরের এই শূন্যতা মীরকাশেমের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে।

ইতিহাসের মীরকাশেমের মত উপন্যাসের বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে আগাগোড়া ইংরেজবিদ্বেষীরূপে অঙ্কন করেছেন।

গুরগণ খাঁকে মীরকাশেম চিনতেন। কিন্তু তিনি জানেন যে এখন গৃহশত্রু সৃষ্টি করলে অসুবিধা হবে, তাই তিনি চেয়েছিলেন আগে গুরগণকে দিয়ে ইংরাজদের হঠাতে, তারপর গুরগণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। এই ধরণের চিন্তা মীরকাশেমের বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দেয়।

এ উপন্যাসে মীরকাশেমের যে হস্তরেখা বিচারের ঘটনা আছে তা'ও অনৈতিহাসিক নয়। যে 'সয়ের মতাক্ষরীণ' এর ইংরাজী অনুবাদ পড়ে বঙ্কিম এই উপন্যাস লিখতে প্রবৃত্ত হন, তাতে গণক মীরকাশেমের পরিচয় আছে। তাছাড়া—'মীরকাশেমের উপর গুরগণ খাঁর অসামান্য প্রভাব, ইহাতে অপরাপর কর্মচারীও অসন্তোষ, ইংরেজ কর্তৃক আজিমাবাদের পথে মুঙ্গেরে অস্ত্র বোঝাই নৌকা প্রেরণ, ইহা লইয়া 'অমিয়টের সঙ্গে নবাবের বাদানুবাদ' নবাবের আদেশ মত মুর্শিদাবাদে তকি খাঁ কর্তৃক ছল করিয়া অমিয়টের সহিত বিবাদ এবং নবাব ফৌজের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে অমিয়ট ও তাঁহার সহচরবর্গের মৃত্যু, সন্দেহ প্রযুক্ত শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে মুঙ্গেরে নজরবন্দী রাখা—এ সকলই ইতিহাসের কথা।' (উপন্যাসসাহিত্যে বঙ্কিম—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত)।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে স্বতন্ত্র উপকাহিনীর নায়ক হিসাবেই নয়, চন্দ্রশেখর শৈবালিনী কাহিনীতেও মীরকাশেমের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি, উপন্যাসে এই চরিত্রটিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাদান করেছে।

মীরজাফর (আনন্দঃ ১।৭) ॥

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মীরজাফরের উল্লেখমাত্র আছে। অন্বন্তরের সময়ে মীরজাফরের উপর রাজ্যভার ছিল এ কথা বলা হয়েছে। মীরজাফর সম্বন্ধে উপন্যাসে আছে—তিনি 'পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক'। 'মীরজাফর ওাত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়।' (১।৭)।

মীরজাফরের এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য ইতিহাস সমর্থন করে। সয়েরউল মুতাক্ষরীণে আছে—"...who once duly seasoned with his dose of bang, he (Mirdjafor-qhan) was incapable of attending to business, specially after his meal." (Vol II. Sec IX, P. 258)

তবে বঙ্কিম একটি ভুল করেছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সংগে মীরজাফরের কোন সম্পর্ক ছিল না। কারণ তার পাঁচবছর পূর্বে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মীরজাফরের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র সৈয়েফুদ্দৌলার সময় মন্বন্তর হয়। মন্বন্তরের বছর তিনি মারা যান (১০ই মার্চ, ১৭৭০ খ্রীঃ)। তখন তাঁর ভ্রাতা মুবারেফুদ্দৌলা নবাব হন।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায় (চন্দ্রঃ ২।৩) ॥

ইতিহাসে মীরকাশেমের বিশিষ্ট হিন্দু কর্মচারী নায়েব নাজিম রাজা রামনারায়ণ রায়ের নাম আছে। ইনি বঙ্কিমের হাতে মুন্সী রামগোবিন্দ রায় হতে পারেন। ব্রহ্মচারীবেশী চন্দ্রশেখর দলনীর চিঠি মীরকাশেমকে দেওয়ার জন্য প্রথমে এঁর হাতে দেন।

মুরলা (সীতা: ২।৪) ॥

সীতারামের রাজঅন্তঃপুরের দাসী। সীতারামের অনুপস্থিতিকালে তাঁর পত্নী রমা এই দাসীকে দিয়েই গঙ্গারামকে ডাকিয়ে আনতেন। মুরলার অর্থলোভ ছিল, তাই রাণীর কিছু পেয়েও গঙ্গারামের কাছে থেকে কিছু পাবার আশা করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত গঙ্গারামের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় সে কিছুটা খুশিই হয়েছিল, তাই গঙ্গারামকে পাঁচকথা শুনিয়ে দিতে কসুর করেনি। নন্দার চেষ্টায় মুরলা রমার হয়ে রাজসভাতে সত্য সাক্ষ্যই দিয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিম মুরলার জন্যে একটু বেশি শাস্তির ব্যবস্থাই করেছেন—"রাজা মুরলাকে মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, নগরের বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। সে হুকুম তখন তামিল হইল। মুরলার নির্গমনকালে এক পাল ছেলে, এবং অন্যান্য রসিক লোক দল বাঁধিয়া করতালি দিতে দিতে এবং গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।" (৩।৪)।

মুরশিদকুলি খাঁ (সীতা: ২।১) ॥

উপন্যাসের সংগে প্রত্যক্ষ যোগ নেই, ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে নামোল্লেখ আছে।

বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনাকালে আমাদের কাছে যে বিরাট ক্যানভাস উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একটি জিনিস সহজেই অনুমেয় যে, প্রায় প্রত্যেকেই মানুষ এবং সমাজ-সম্পর্কিত আলোচনাকালে বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং অসমতার যন্ত্রণার জন্য অন্তত কিছুটা চিন্তিত—অবশ্য এই বিচ্ছিন্নতা বা অসমতার যন্ত্রণা মানুষের বহিরঙ্গ ব্যাপারই শুধু নয়, কারণ যে-কোন সচেতন মানুষ এ বিষয়ে চিন্তিত এবং তাদের দ্বারা সমস্যাটি আলোচিতও হয়েছে। যদিও প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, সমাজের এই বিচ্ছিন্নতা বা অসমতার যন্ত্রণার অনুভূতি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সকলের সমান নয়। মানুষের সামাজিক ইতিহাস-চেতনার বিষয়ে কাহলের সঙ্গে মার্কসের তুলনার সময় আপাতদৃষ্টিতে মিল দেখা গেলেও সুক্ষ্ম-বিচারকালে তর্কের অবকাশ থাকে। মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম কবে এবং কেন হয়েছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ সকলেই একমত নন। তবে সোসাল কন্‌ট্রাক্ট থিওরি ভাল করে আলোচনা করলে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সামাজিক চুক্তিমতবাদের বক্তব্যের মিল এক জায়গায় অন্তত পাই—সেটা মানুষের প্রাথমিক অবস্থার বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্বের যন্ত্রণা। বিবর্তনবাদের ইতিহাসেও তো মানুষের একাকীত্বের যন্ত্রণাকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বার্জেসের মতে রাষ্ট্রের জন্মকাল নির্ধারণ অসম্ভব ব্যাপার হলেও সমাজতাত্ত্বিকদের মানুষ-স্বভাব সম্পর্কিত দুটি দিকের নির্দেশ, অ্যাসোসিয়েটিভ এবং ডিসোলিয়েটিভ নেচার, মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার কিছুটা সদুত্তর দিতে পারে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাস সমাজতত্ত্ববিদদের এই নির্দেশের মধ্যেই পাওয়া যাবে। রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। আর এই রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থা তথা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ বা একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের জন্ম। কিন্তু যৌনতা, অর্থনীতিক প্রয়োজন এবং সামাজিক চেতনা মানুষকে, অন্তত বহিরঙ্গ দিক থেকে, বিচ্ছিন্নতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেয়নি—একাকীত্বের যন্ত্রণা বা বিচ্ছিন্নতা মানুষের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলেও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এর বাহ্যিক প্রতিফলন তো হবেই। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ আসে সাধারণতঃ আর্থনীতিক কারণেই। মার্কস তাঁর ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিলসফিকাল ম্যানাস্ক্রিপ্টে বিচ্ছিন্নতার মূলানুসন্ধানে এই তত্ত্বটিই আবিষ্কার করেছেন যে, বিচ্ছিন্নতাই হচ্ছে দ্বন্দ্বময় শ্রেণীর অভিশাপ।

যাই হোক, মানুষের এই বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্বের যন্ত্রণা শিল্প-সাহিত্যেও পরিস্ফুট। অবশ্য এ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীদের অভিমত কি এবং সেই মতামতের মূল্যায়নকালে মানুষের বিচ্ছিন্ন সত্ত্বার কোন্ অভিপ্রায়টি সবচেয়ে বড় হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয় তারও বিচার-বিবেচনার

প্রয়োজন আছে। মার্কস শ্রেণী-সংঘর্ষের অভিশাপরূপে যে বিচ্ছিন্নতাকে দেখেছেন তা সার্ত্রের দৃষ্টিতে—যদিও সার্ত্র এবং মার্কসীয় চিন্তাধারার মূল সূত্রটি প্রায় এক এবং তা সার্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত, কারণ সার্ত্র নিজেই মার্কসবাদকে স্বীকার করে নিয়ে এই বক্তব্যই তুলে ধরেছেন যে মার্কসের পরবর্তী চিন্তাবিদগণ যাঁরা মার্কসীয়তত্ত্বকে সরল করে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের মতামত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রান্তপ্রসূত—ব্যক্তির 'অভাববোধ', অর্থাৎ যার থেকে বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্বের সৃষ্টি হয়। এই 'অভাববোধ' আর্থনীতিক অব্যবস্থা এবং শ্রেণী-বৈষম্যের জন্য। আর বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্ব-বোধ উদ্ভূত হয় ঐ শ্রেণী-বৈষম্য এবং আর্থনীতিক অব্যবস্থার জন্য। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যাপারটার মূল ভিত্তিই হচ্ছে সামাজিক-আর্থনীতিক কারণ। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতার কারণ নির্ণয়কালে কি শিল্পী বা সাহিত্যিকের সমাজ অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তা বা চাপই প্রধান কথা, না অন্য কিছু? উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে, বিশেষ করে মার্কসের ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিলসফিকাল ম্যানাস্ক্রিপ্টে যে বক্তব্য পরিস্ফুট, আমরা জানতে পারছি যে, যেহেতু শ্রম শ্রমফল এবং ব্যক্তিগত সত্বার অধিকার সবকিছু থেকে সাধারণ শ্রেণী বিচ্ছিন্ন সেজন্যই তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ বা একাকীত্বের যন্ত্রণা প্রকট হয়। তবে একজন শিল্পী বা সাহিত্যিক কি এ সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তাঁর শিল্প-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রকাশ হবে?—না যুগমানসের প্রচ্ছায়ায় এই বিচ্ছিন্নতা দেখা যাবে? আর্থনীতিক যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের সার্বিক চৈতন্যের যে দ্বন্দ্ববাদ শিল্প-সাহিত্যে রেখাপাত করে তা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ না থেকে একাকীত্বের যন্ত্রণায় বিস্তার লাভ করে অনেকটা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে, অর্থাৎ দুদিকের দুটি বিন্দু দুটি সমকোণের উৎপত্তি করে একই ত্রিকোণের সীমায় সীমিত হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একাকীত্ব নয়—এ দুটি একই ক্ষেত্রের দুটি ক্ষেত্রফল। তবু বিচ্ছিন্নতা এবং একাকীত্বের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ আছেই। তাই কোন শিল্প-সাহিত্যে 'বিচ্ছিন্নতা' এলেই একাকীত্বের যন্ত্রণা কম বেশী ফুটে উঠবে। এই বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্বের যন্ত্রণাই প্রকাশ মাধ্যমকে করে তোলে জটিল। মানুষের যন্ত্রণাময় বা বিচ্ছিন্ন চিন্তার দৃশ্যপটকে ধরতে অধিকাংশ সময়েই অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মের আশ্রয় নিতে হয়।

বিচ্ছিন্নতাকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনাকালে রুশোর কণ্ট্রাক্ট সোসালের—দ্য পিপল ইজ নট অ্যাণ্ড ক্যাননট বি রিপ্রেসেণ্টেড বাই ডেপুটিস—উক্তিদ্বারা ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে পরে মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের একটি দিকের কথা। বলা বাহুল্য, বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কিত আলোচনা সম্পূর্ণই সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা, আর খুব সঙ্গত কারণেই, যেহেতু অর্থনীতি এবং সমাজনীতি এই বৃত্তে সহাবস্থান করে, এটা আর্থনীতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত—এ সম্পর্কে মার্কসীয়-তত্ত্ব বা রুশো-হেগেল চিহ্নিত এসট্রেন্জমেন্টের রূপটিতে আমরা দেখেছি। এই যে 'বিচ্ছিন্নতাবোধ' একে আরো একটু পরিষ্কার করে আলোচনা করা প্রয়োজন। শুধু সমাজবিজ্ঞানে মানুষ বা সমাজ কেমন করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সেই আলোচনাই যথেষ্ট নয়—মানসিক বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে একাকীত্ব এবং তজ্জনিত যন্ত্রণার উদ্ভব প্রসঙ্গ আলোচনা করাও প্রয়োজন। বলতে চাই, বিচ্ছিন্নতা-বোধ থেকে একাকীত্বের যন্ত্রণা এবং তার থেকে সৃষ্টি হয় সম্ভবত মানুষের শূন্যতাবোধ—যে শূন্যতাবোধ ব্যক্তি থেকে শুরু করে গোটা সমাজকে ক্রমশ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। দৈহিকশক্তি প্রয়োগের ফলে

সমাজে যে ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয়—ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম বাণী—মেন আর বর্ন বার্থ ফ্রি অ্যাণ্ড ইক্যুয়াল ইন রাইট—বা প্রাচীন গ্রীসের স্টোইকদের আদর্শদ্বারা সমাধা হয়নি, কিন্তু লক্ষ্যণীয় ঐ বাণীই একটি বিপ্লবকে—যে বিপ্লবের মূলমন্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর বাঁচার অধিকার আদায় করে নেওয়া—প্রজ্জ্বলিত করেছিল। কিন্তু আত্মসচেতনতা জাগলেও ধনবৈষম্য দূর করতে পারে নি। আর্থনীতিক সাম্যের ভিত্তিমূল সামাজিক সাম্যবোধ। সমাজ-অর্থনীতিক্ষেত্রে যখন সাধারণ মানুষ সাম্যর দৃঢ়ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হয়, তখন সাধারণতঃ ইনফিরিয়ারিটি সেন্টিমেণ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কিছুকাল পরে ফ্রাসট্রেশন আসে—এই শূন্যতা-বোধই গোটা সমাজটাকে সমূলে গভীর জলে নিক্ষিপ্ত করে। মানুষ চিন্তাধারার ইক্যুলিব্রিয়াম হারানোর সঙ্গে সঙ্গে যে-কোন একদিকে ঝুঁকে পড়বেই—তখনই তার মধ্যে একাকীত্বের যন্ত্রণা এবং শূন্যতার হাহাকার সমগ্র সমাজ তথা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্য সমাজবিজ্ঞানীগণ চিন্তিত।

বিচ্ছিন্নতায় মানুষের নির্জনতা বা চরম একাকীত্বের প্রকাশ, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসে, ঘটে কেমন করে তার দৃষ্টান্ত রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ। রামমোহনের ইংরাজ-নির্ভর নব্যচিন্তা বা বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংগঠনমূলক কার্যাবলীর পরিণামে যে ব্যর্থতা তা নিঃসন্দেহেই প্রতীকী, আর এর ফলে শুধু ব্যক্তির মধ্যে নয়, সমস্ত সমাজটা বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় ক্ষয় হতে থাকে—যার ফল আজও আমরা ভোগ করছি। বঙ্কিমচন্দ্র গোড়া থেকেই বিচ্ছিন্ন থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। কিন্তু তিনি পথ হারিয়ে আরো গভীর অন্ধকারে একাকীত্বের যন্ত্রণায় আত্মতৃপ্তির জন্য আশ্রয় নেন। বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিসম্মত কিন্তু তিনিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তৎকালীন যুগের সামাজিক ও আর্থনীতিক কারণে।

ইদানীং মার্কিন মুল্লুকের 'বিচ্ছিন্নতা' এবং একাকীত্বের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায় ছড়িয়ে পড়েছে—এর কারণ কিন্তু আর্থনীতিক চাপ নয়। অতিরিক্ত আর্থিক সাচ্ছল্যের (?) জন্যই দেখা দিয়েছে উচ্ছৃঙ্খলতা। তাই তারা বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত থেকে, এল. এস. ডি. খেয়ে ভুলতে চায় একাকীত্বের যন্ত্রণা। সমাজের মূল গ্রন্থি দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রসঙ্গত মার্কিনী-সমাজের দ্বয়ী-ইকনমির কথা বলে রাখা ভাল—একদিকে জীবন রাখতে জীবনান্ত, অপরপক্ষে চরম ভোগ করেও হাতে প্রচুর অর্থ। সুতরাং বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা দুদিক থেকেই আসতে পারে।

সমাজে নানা কারণেই বিচ্ছিন্নতার জন্ম হতে পারে। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে একাত্মতার অনুভূতি বা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গাণিতিক ফল, যা একমাত্র বন্ধনময় সামাজিকতার ফলশ্রুতিতে দৃষ্ট, থেকে বিভ্রান্তি আসে—যদিও বিচ্ছিন্নতা একাত্মতার বেষ্টনে আবদ্ধ হয় ক্ষেত্রবিশেষে। পরিসংখ্যানতত্ত্বে বা বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে একটি ব্যাপার দেখা গেছে যে, বিচ্ছিন্নতা থেকেই প্রথম শ্রেণীর ক্ল্যাসিক সৃষ্টি, যা শিল্প-সাহিত্যে দেখতে পাই, হয়েছে। পিকাসো আধুনিক চিত্রকলার জগতে যে মহৎ শিল্পকে উপহার দিয়েছে তা তো বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু সমাজ-জীবনে এই বিচ্ছিন্নতাবোধের ভূমিকা কি? বিচ্ছিন্নতাবোধ, তা গোটা সমাজ-জীবনেই হোক বা ব্যক্তিগত জীবনেই হোক, আসবেই—কারণ মানুষের কেন্দ্রীভূত মনোভাব একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বক্ষণ

আরোপিত হতে পারে না—অনেক সময়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর একটি ভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত হয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী হলেই একাত্মতা থেকে মানবিকসত্ত্বা নির্বাসিত হয় না। কিন্তু মুশকিল হয় যখন মানুষ হতাশ হয়ে শূন্যতার যন্ত্রণায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্নতার ফলে সে তার চতুর্দিকে একটা আবরণের সৃষ্টি করে—যার ভেতর সে চরম একাকীত্বের যন্ত্রণায় ক্ষয় হতে থাকে। এই শূন্যতাবাদীদের পরিসংখ্যান নিলে হয়ত দেখা যাবে আধুনিক সমাজের অনেকেই আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার চাপে বা নিষ্পেষণে, স্পষ্ট করে বলতে গেলে সামাজিক অবহেলা বা অবজ্ঞায় ক্রমে ক্রমে একটি নিজস্ব বৃত্তে বন্দী হয়ে পড়ছে—এর ফলেই সামাজিক বিচ্ছিন্নবাদের সৃষ্টি।

প্যারাডাইস লস্টে আদম ইভের স্বর্গচ্যুতি হলে তারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ল—তেমনি নতুন ধর্মশিল্প আন্দোলনের ফলে য়ুরোপের নবজাগরণের কালে মার্টিন লুথার যে বক্তব্য তুলে ধরলেন তার ফলশ্রুতি স্বরূপ প্রেটোস্টান্টইজমের জন্ম এবং এর ফলে কিছু লোক পুরনো সমাজব্যবস্থা থেকে অন্তত কয়েকটি বিষয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, কিন্তু তারা কি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার জালে জড়িয়ে পড়েছিল? ঠিক এরকম সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আবার এলো যখন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হল—যার ফলে সমাজব্যবস্থা এবং মানবিকতা দ্বিখণ্ডিত হল। একটি শ্রেণী নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রভুত্ব করতে লাগল অপর একটি শ্রেণীর ওপর। ক্যাপিটালিস্ট ও প্রলেতারিয় শ্রেণীর জন্ম হল। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশেও প্রায় একই অবস্থার সৃষ্টি হয়—তখন থেকেই রায়তদের ওপর আর্থনীতিক চাপটা প্রকটভাবে আসতে লাগল জমিদার শ্রেণীর পক্ষ থেকে। যদিও শ্রেণী বিভেদ এর আগেও ছিল তথাপি এ সময় থেকেই যেন আর্থনীতিক চাপের ফলে তীব্র শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল। উভয় শ্রেণীর সীমারেখা গভীরভাবে অঙ্কিত হল। সমাজে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম হল। এই বিচ্ছিন্নতার জন্যই শোষিতশ্রেণীর মধ্যে শূন্যতাবোধের জন্ম এবং এই শূন্যতাবোধই ক্রমে একাকীত্বের বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলতে লাগল। অবশ্য এই বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্বের যন্ত্রণা আরো প্রকট হল ইণ্ডাষ্ট্রির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে।

বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির পেছনে—সমাজ বিন্যাসের ফল, আত্মচ্যুতি, অস্তিবাদী দার্শনিকের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ পাঠক-সাধারণের হতাশার সৃষ্টি প্রভৃতি কারণ নিহিত আছে। সমাজ-বিচ্ছিন্নতার ফলে মানুষ তার স্বাভাবিক সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলে। অনেক সময়েই তার কাছে মনে হতে পারে বেঁচে থাকার পেছনে কোন যুক্তি নেই, বেঁচে থাকা নিরর্থক।

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি ॥ শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া, এম. এ. ডি. ফিল। সাহিত্য সংসদ। ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। মূল্য : ১০·০০।

আজকের দিনে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের স্তিমিতপ্রায় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এ কথা উপলব্ধি করা দুষ্কর যে অতীতে একসময় বাংলা দেশেই এই ধর্মের বিস্তৃতি ও প্রভাব তুঙ্গ অবস্থায় পৌছেছিল। পালরাজগণের যুগকেই বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ বলা যায়। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন—পালরাজগণের চারিশত বর্ষব্যাপী রাজ্যকাল বাঙালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ।

পালরাজগণের পরবর্তী যুগে সেন রাজাদের আমলেও বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব মোটামুটিভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল বলা যায়। সেন রাজাদের সময়েও জনসাধারণ প্রধানত বৈষ্ণব, শৈব ও বৌদ্ধতান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন। (রত্নমালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন—পৃঃ ৫৮) ভারতের মতই বাংলা দেশেও ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতা বরাবর বর্তমান ছিল। আর সেইজন্যই ভারতবর্ষে ও বাংলা দেশে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। গুপ্ত সম্রাটদের পূর্বকাল থেকেই বাংলা দেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখা যায়। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবির্ভাবের পরেও জৈন ও বৌদ্ধদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কোন বিরোধ বাধেনি। বর্তমানে যেমন হিন্দুধর্মের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব মত নিয়ে কোন সামাজিক দ্বন্দ্ব নেই, তেমনি পাল-সেন আমলের সেই মধ্যযুগেও বাংলা দেশে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত নিয়ে সাধারণ মানুষ পাশাপাশি বসবাস করেছেন। (প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—পৃঃ ২৪, ২৯-৩৩ দ্রষ্টব্য। অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন—পৃঃ ৯)।

শুধু ধর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলাই নয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বৌদ্ধধর্মের কাছে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথা অনস্বীকার্য যে একদা বৌদ্ধধর্মের ক্রোড়েই বাংলা সাহিত্য জন্মলাভ করেছিল। পণ্ডিতগণের মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'ই হল বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন। পরবর্তী যুগেও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় সার্থক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

জাতিভেদ ও আচারসর্বস্বতার উর্ধ্বে মানবজাতির মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন বুদ্ধদেব। সন্দেহ নেই বৌদ্ধধর্ম মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু তাই বলে এ কথা স্বীকার্য নয় যে প্রাক্-বুদ্ধযুগে ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় মানুষের মূল্যায়ন অনুপস্থিত ছিল; মানুষ ছিল অবহেলিত এবং অবজ্ঞেয়। ঔপনিষদিক ভাবধারার সঙ্গে যাঁরই কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তিনিই এই মন্তব্যের যাথার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন। (আলোচ্য গ্রন্থের ৯২-৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

প্রায় সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যখনই কোন ধর্মের বিস্তার ঘটেছে এবং কোন ধর্ম

প্রাধান্য লাভ করেছে তখনই একদল স্বার্থান্ধ ও সুবিধাবাদী মানুষ সেই ধর্মে নিজেদের একাধিপত্য বজায় রাখার জন্যে নানারকম অনুশাসন, আচার বিচার ও বিধিনিষেধ প্রবর্তন করেছেন। বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য কিংবা হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও আমরা সেইরূপ পুরোহিততন্ত্র এবং জাতিভেদ প্রথার নির্মম অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছি। সামাজিক জীবনের সেই অরাজক পটভূমিতে নবাবিষ্কৃত প্রজ্ঞার আলোকে মানুষের মূল্যায়ন নতুন করে স্থির করলেন বুদ্ধদেব—এখানেই বুদ্ধদেবের জন্মের সার্থকতা, এখানেই বুদ্ধের বুদ্ধত্ব। আর সেইজন্যেই স্বামীজী বুদ্ধদেবকে 'বৈদিক ধর্মের বিদ্রোহী সন্তান' বলে অভিহিত করেছেন।

পৃথিবীতে দেখা যায় যে কোন ধর্মই রাজশক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। রাজা অশোককে আশ্রয় করার পর থেকেই বৌদ্ধধর্মের যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মহামতি অশোককেই প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রাণ বলা যায়। কাজেই বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে অশোকের নাম অপরিহার্য। সেইজন্যেই রবীন্দ্রসাহিত্যেও অশোকের মহিমা অত্যুজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত।

আলোচ্য গ্রন্থটি যে বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন তাতে সন্দেহ নেই। এই গ্রন্থে লেখক বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ও পরিণতির একটি সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস, বাংলা দেশের সমাজ মানসের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবদান, রবীন্দ্র চেতনায় ও কার্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অভিব্যক্তি, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও অশোকের চরিত্র মহিমার প্রকাশ, রবীন্দ্রচিন্তায়, ভাবাদর্শে, শিক্ষাদর্শে ও সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিফলন এবং রবীন্দ্রাদর্শে বৌদ্ধধর্মে সাদৃশ্য ও পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থ প্রণয়নে লেখকের আত্যন্তিক শ্রম ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠার পরিচয় বর্তমান।

বৈদিক ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় লেখক বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্রতার একটি উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত প্রাণসত্তাকে যেভাবে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন লেখক, তাতে মনে হয় লেখকের জীবনে ও মননে বৌদ্ধধর্মে উপলব্ধ জ্ঞান ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান। আত্মা, পরলোকতত্ত্ব, নির্বাণ এবং ব্রহ্মবিহার প্রসঙ্গে লেখক যে আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর বৈজ্ঞানিক এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনের সন্ধান পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই, অনেকেই হয়ত লেখকের মতের সঙ্গে একমত হবেন না, কিন্তু তাঁর বিচারনিষ্ঠ অভিমতও একেবারে উপেক্ষা করতে পারবেন না তাঁরা। পরন্তু বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সংস্কারজাত ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখক এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন বলে তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

অশোকের জীবনের গোড়াকার ঘটনা সম্বন্ধে লেখকের মত প্রণিধানযোগ্য। প্রাক্-বৌদ্ধ অশোকের জীবনের প্রচলিত কাহিনীগুলি সম্পর্কে লেখক ভিন্নমত পোষণ করেন দেখা যাচ্ছে। (আলোচ্য গ্রন্থের ৯৭ পৃঃ) কিন্তু একমাত্র ডক্টর স্মীথের বইয়ের উল্লেখ ছাড়া তাঁর মতের স্বপক্ষে তিনি খুব জোরাল যুক্তি উত্থাপন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। অথচ অশোক যে নির্বিঘ্নে এবং ঠিক সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করতে পারেন নি এবং তিনি যে অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন সে-কথা ডক্টর স্মীথও স্বীকার করেছেন। (Dr. Smith observes,

the fact that his formal consecration or coronasion (obhisheka) was delayed for some four years until 269 BC. confirms the tradition that his succession was contested, and it may be true that his rival was an elder brother named Susima.' Political History of Ancient India—page 30?) । অবশ্য অশোকের প্রথম জীবনের ঘটনা সত্য হক কিংবা মিথ্যা হক তাতে তাঁর মহত্ত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। তবে কলিঙ্গ যুদ্ধের বিবরণ থেকেই অশোকের বিরাটত্ব ও ভয়ঙ্করত্ব বোঝা যায়। ("One hundred and fifty thousand persons were carried away captives. One hundred thousand were slain, and many times that number died." Violence, slaughter, and seperation from their beloved ones befell not only to combatants, but also to the Brahmanas, ascetics and householders—Political History of Ancient India—page 306) এই বিবরণ প্রথম জীবনে অশোকের চরিত্রের নির্মমতা, রাজ্যলিপ্সা এবং হিংস্র মনোভাবের পরিপোষক। কলিঙ্গ যুদ্ধের উপরিউক্ত ঘটনা থেকে পরবর্তী জীবনে অশোকের চরিত্রের মহত্ত্ব অনুমান করা সহজ হয়ে ওঠে। প্রথম জীবনে অশোক অত ভয়ঙ্কর ছিলেন বলেই পরে অত উদার হয়েছিলেন—হয়েছিলেন এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমিক। এ যেন দস্যু দলের সাধু দলে পরিণত হওয়ার কাহিনী।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের মানবতাবাদ এবং অশোকের জীবনে ও কর্মে সেই মানবতাবাদের প্রতিফলনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব এবং অশোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ অবতার হিসেবে দেখেন নি, দেখেছিলেন মর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে। এখানেই বুদ্ধদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রদৃষ্টির বিশেষত্ব। বুদ্ধদেবের ত্যাগের মহিমা এবং সম্রাট অশোকের বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ কবিকে বৌদ্ধকাহিনীর ভিত্তিতে সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনেও বৌদ্ধসংস্কৃতির চর্চা ও বৌদ্ধভাবধারার প্রভাব বর্তমান ছিল। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের চিত্রটি সামগ্রিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বৌদ্ধভাবধারার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটেছিল বলে পরবর্তী জীবনে তিনি বৌদ্ধজাতক এবং অবদানের নানান কাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য, গান ও নাটক রচনা করার অনুকূল মানসিকতা লালন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের উদার এবং সর্বজীবের প্রতি কল্যাণতম স্পর্শ রবীন্দ্রমানসে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর প্রতি এক অনন্যসাধারণ মমত্ববোধের সঞ্চার করেছিল। বৌদ্ধধর্মের আলোকে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তা নতুন করে মানুষের মূল্য নির্ধারণ করল। লেখক সুধাংশুবিমল বড়ুয়া বৌদ্ধকাহিনী ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে সার্থক আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রবক্তা হিসেবে পরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল চিত্রটিও তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন ইতিহাসের আলোকে। শুধুমাত্র রবীন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৌদ্ধসংস্কৃতির অবদানের একটি প্রামাণিক এবং ইতিহাস-সম্মত বিবরণ লেখক আলোচ্য গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় ইতিহাসবোধের পটভূমিকায় এবং বৌদ্ধধর্মের আলোকে রবীন্দ্রসাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভূমিকাটি গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থটিকে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দান করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লেখককে ডি. ফিল. উপাধিতে ভূষিত করেছেন। গ্রন্থে উদ্ধৃতির পরিমাণ আরও পরিমিত হলে ভাল হত। গ্রন্থশেষে উৎস নির্দেশটি একটি মূল্যবান দলিল। গ্রন্থের মুদ্রণ পারিপাট্য এবং প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। তবে আয়তনের তুলনায় গ্রন্থের মূল্য আরও সুলভ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

মানব বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিনিাসরমনীয়
কেশতেল
কেশরঞ্জন

সমকালীন

ষোড়শ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৭৫

এভারেস্ট ও
কাঞ্চনজঙ্ঘার দেশ
দার্জিলিঙ
চারিদিকে শৈলমালা, পদপ্রান্তে ভাসমান
মেঘখণ্ড, সূর্যোদয়ের অনন্ত দৃশ্য, সবুজ বনানীর
মাঝে ছোট ছোট ঘর, পাহাড়ীয়া নাচগানের
জমকাল আসর, নিপুণ হাতের নিখুঁত কুটীর শিল্প
— এই হচ্ছে দার্জিলিঙ।
দার্জিলিঙে লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজ (ফোন ৬৫৬)
কিংবা ইকনমি লজ 'শৈলাবাসে' (ফোন ৬৮৪)
ওঠাই আপনার সুবিধে। অপেক্ষাকৃত নির্জন
পরিবেশে কালিম্পঙেও একটি লাক্সারি ট্যুরিস্ট
লজ (ফোন ৩৮৪) আছে।
বুকিং এর জন্য লজের ম্যানেজারদের সঙ্গে অথবা
নীচের যে কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
ট্যুরিস্ট ব্যুরো
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
দার্জিলিঙ (ফোন ৫০, টেলিগ্রাম : DARTOUR) কিংবা
৩/২, ডালহৌসি স্কোয়ার ঈষ্ট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭৯ টেলিগ্রাম : TRAVELTIPS
নির্দিষ্ট তারিখের ১৫ দিন পূর্বে কলিকাতা
ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে বুকিং বন্ধ হয়।
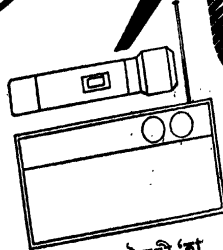
আরো উজ্জ্বল
আরো দীর্ঘস্থায়ী
বিশ্বের বিস্ময়
হান্‌সা
HANSA
TRADE MARK
Leakproof
BATTERY
টর্চ ও
ট্রানজিস্টরের জন্য
সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে তৈরী 'হা ব্যাটারী দীর্ঘদিন উজ্জ্বল আলো দেয়; আপনার ট্রান-
বিশেষ শক্তি সম্পন্ন। 'হান্‌সা দিন ধরে জিস্টর যাতে দীর্ঘদিন স্বচ্ছন্দে সচল থাকে।
শক্তি সঞ্চয় করে রাখে, যাতে আপনার
ইউনাইটেড কার্বন প্রোডাক্ট
১১, গিরিশ চন্দ্র কলিকাতা-১৪
হান্‌সা — অনেক বেশী শক্তি
IPC/I-B/810-B

ষোড়শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

পরিভাষা ও স্বর্ণকুমারী দেবী

পশুপতি শাশমল

বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক শাস্ত্রীয় আলোচনায় স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) যে সকল পরিভাষা সৃষ্টি বা ব্যবহার করেছেন তা সঙ্গত কারণে বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তীগণের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রয়াস সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেও সেই প্রচেষ্টা একেবারে সমালোচনার উর্দ্ধে নয়।(১) দুর্বোধ্যতা এবং আড়ষ্টতা, সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র ও ব্যুৎপত্তি ব্যাপারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগের ফলে এই বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। অবশ্য তাঁরও পূর্ববর্তী "ফেলিক্স কেরী ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় (১৮১৯) নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে সমস্ত পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা অধিকতর জড়তাগ্রস্ত।" (২) ফেলিক্স কেরীর বিদ্যাহারাবলী ১ম খণ্ডের (১৮১৯ অক্টোবর, সম্পূর্ণ ১৮২০) মধ্যে পরিভাষা ও সংজ্ঞা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা পাওয়া যায়। গ্রন্থটির পরিভাষার ব্যবহারে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার। সতর্কতার সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিভাষা ব্যবহার করেন সম্ভবত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এ সম্পর্কে তাঁর A scheme for the rendering of European Scientific Terms into the Vernaculars of India (১৮৭৭) নামক প্রস্তাবটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

পরিভাষার ক্ষেত্রে নতুন শব্দসৃষ্টিতে প্রতিশব্দের শ্রুতিমাধুর্য ও সরলতার প্রতি স্বর্ণকুমারীর আগ্রহ ছিল সমধিক। প্রয়োজনবোধে ব্যাকরণগত জটিলতাকে পরিহার না করেও বরং তার সমূহ অনুশাসন স্বীকার করে শব্দটিকে একটি মনোহর আভিজাত্যের মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর সমকালে এই ক্ষেত্রটি বহুকর্ষিত ছিল না, সেকথা স্মরণ রেখে বলা চলে পরিভাষা সৃষ্টি এবং তার প্রয়োগে তিনি যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তা তৎকালীন বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণের অনুমোদন

লাভ করেছিল। গোমস্তর্ধাধান-জুগোপিষা-ব্যক্তিগ্রাহিতা-নির্মিমিৎসা প্রভৃতি শব্দের বিভীষিকা তাঁর পরিভাষা ভাণ্ডারে নেই বললেও চলে, কিংবা যেখানে ঐরকম কোন অভিপ্রায় অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে সেখানে তিনি শ্রুতিসুখকরতার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন; অক্ষয়কুমারের মৈস্মরতত্ত্ব (mesmirism) স্বর্ণকুমারীর পরিভাষায় 'শক্তিচালনা' রূপ নিয়েছে। অবশ্য প্রতিশব্দের দিক থেকে 'শক্তিচালনা' শব্দটি অসার্থক, তবু তাঁর পূর্ববর্তী ব্যক্তির প্রযুক্ত শব্দটির এমন বিকল্প রূপ তিনি চিন্তা করেছেন যা অসঙ্গত নয় বরং যথোপযুক্ত অন্তত এর সারল্য বা সরলীকৃত রূপটি অনস্বীকার্য। সার্থক প্রতিশব্দ সৃষ্টির এই অভিপ্রায় যে কোথাও জয়যুক্ত হয়নি তা নয়; পর্ণীতরু (fern), বালখিল্য (pygmy), মোহিষ্ণু (sensitive) প্রভৃতি প্রতিশব্দ নির্ণয়ে তাঁর কৃতিত্বের বিভিন্ন দিক প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আগ্নেয়গিরির পরিবর্তে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত জ্বালামুখী শব্দটি তিনি প্রথম প্রয়োগ করেন, এ সম্পর্কে তিনি ভারতী পত্রিকায় ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যার এক স্থানে বলেছেন, 'সচরাচর বাংলা ভাষায় আগ্নেয়গিরি এই নতুন সৃষ্ট কথাটি volcano-র প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু সংস্কৃত শকুন্তলায় জ্বালামুখী শব্দ যখন ঐ অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায় তখন তাহার পরিবর্তে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই।' আবার পৃথিবী (১৮৮২) নামক বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ সঙ্কলন গ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকা মন্তব্য করেছেন, 'সচরাচর অগ্ন্যুদ্গারী পর্বত সকল আগ্নেয়গিরি বলিয়া উল্লিখিত হয়; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের জ্বালামুখী শব্দে যখন ঐ অর্থটি আরো সুস্পষ্ট হয় তখন সে কথাটিও বা বঙ্গভাষায় চলিবে না কেন?' পরে পাদটীকায় জানিয়েছেন, 'বোধহয় এ কথাটি অসঙ্গত হয় নাই। আশ্বিন মাসের ভারতীতে পৃথিবীর পরিণাম শীর্ষক প্রবন্ধে প্রথম ইহা ব্যবহার করা হয়। তাহার পর মাসে দেখিলাম চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত লেখক শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহও ঐ অর্থে উহা ব্যবহার করিয়াছেন।' নতুন শব্দ রচনা অপেক্ষা পুরাপ্রচলিত যথার্থ প্রতিশব্দকে আবিষ্কার করা ও তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে তাঁর পরিভাষা সম্পর্কিত চিন্তা ও ব্যাকুলতাপূর্ণ নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতিশব্দের একার্থকতার উপর রামেন্দ্রসুন্দর যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন (৩) স্বর্ণকুমারীর পরিভাষায় সেই আদর্শানুসরণ লক্ষিত হলেও তার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। যেমন substance ও matter শব্দদ্বয় 'পদার্থ' নামক একটি প্রতিশব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। মস্তিষ্করেণুতরঙ্গাঘাত ও মস্তিষ্করেণুতরঙ্গ, উত্তপ্ত ধাতুদ্রব্য ও ধাতুস্রোত, গ্র্যানিট ও গ্র্যানিট প্রস্তর যথাক্রমে brain wave, lava, ও granite এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিকল্প প্রয়োগ একদিকে প্রমাণ করে যথার্থ শব্দটির অভাবের কথা, অপরদিকে সার্থকতর শব্দনির্ণয়ের অবকাশও এরই মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হয় পরিভাষা সংক্রান্ত চিন্তার অপরিণত স্তরে উপযুক্ত প্রয়োগাবলী তেমন বিভ্রান্তিকর কোন অসুবিধা সৃষ্টি করেনি।

পরিভাষা সম্পর্কে লেখিকার পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায় পৃথিবী গ্রন্থের ভূমিকায়, 'বাংলায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক সঙ্কলন সম্বন্ধে প্রধান অসুবিধা পারিভাষিক শব্দের অভাব। এ পুস্তকে পূর্ববর্তী লেখক মহাশয়দিগের ব্যবহৃত শব্দ প্রায়ই গ্রহণ করা হইয়াছে, তবে

দু-একটি প্রচলিত শব্দের স্থানে অন্য শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।⋯ যে-যে স্থানে পারিভাষিক শব্দের অপ্রতুল হইয়াছে সেই সেই স্থানে নতুন শব্দ রচনা করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। সকল নতুন রচিত কথাগুলিই যে গৃহীত হইবে তাহা প্রত্যাশা করি না। জীবজগতেও যেমন শব্দজগতেও তেমনি, যাহা যোগ্য তাহাই জীবিত থাকিবে। যদি বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলি সকল ভাষায় একই রাখা যায় তাহাতে ক্ষতি নাই বরং ভাষার উন্নতি হয় দেখিয়া যেস্থানে মনোমত প্রতিশব্দ না পাওয়া গিয়াছে সে স্থানে ইংরাজী মূল শব্দই রাখা হইয়াছে।" তাঁর বক্তব্যকে সংক্ষেপে তিনটি ভাগে বিন্যাস করা যায়: (১) পূর্বপ্রচলিত শব্দগ্রহণ—প্রয়োজনানুসারে ঈষৎ পরিবর্তনসহ; (২) শব্দ রচনা; (৩) মূল শব্দ স্বীকরণ। প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত জ্বালামুখী-পুষ্যা-তড়িৎ-তীর-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর পূর্ববর্তী আধুনিক যুগের লেখকগণকর্তৃক প্রযোজিত কেন্দ্রানুগ-কেন্দ্রাতিগ-বৃত্তাংশ প্রভৃতি শব্দকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে আগ্নেয়গিরি বা অগ্ন্যুদ্গারী পর্বত অপেক্ষা তিনি জ্বালামুখী শব্দটির প্রতি অধিকতর আগ্রহান্বিত ছিলেন; শব্দটির সরলতায় শ্রুতিমাধুর্যে, সংক্ষিপ্ততায় ও তজ্জনিত সঙ্কেতময়তায় তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিনা কে বলতে পারে? arc-এর পরিভাষা প্রতিশব্দরূপে বৃত্তাংশ ব্যবহারের একটি কৌতূহলোদ্দীপক কথা জানা যায়। ভারতীয় ১২৮৭ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত পৃথিবীর উৎপত্তি নামক প্রবন্ধে কেবল arc শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮০২ শকের পৌষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি যখন পুনঃ প্রকাশিত হয় তখন প্রতিশব্দ রূপে 'বৃত্তাংশ' ব্যবহৃত হয়েছিল এবং পৃথিবী গ্রন্থে প্রবন্ধটির মধ্যে arc ও বৃত্তাংশ উভয়েই স্থান লাভ করেছে। সম্ভবত ১২৮৭ সালের কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যে ঐ শব্দটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, প্রাগুক্ত তথ্য থেকে তা-ই সমর্থিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত পরিভাষার ক্ষেত্রে শব্দ রচনা বা উদ্ভাবিত শব্দাবলী সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন না; শব্দ উদ্ভাবনা ও তার প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে সার্থক না হলেও এবিষয়ে তাঁর যে ক্ষোভ ছিল না সেকথা স্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্যে প্রকাশিত। যে উদ্যম ও অধ্যবসায় তিনি শব্দৈষণায় ব্যয়-নিয়োগ করেছেন তার ব্যর্থতা সার্থকতা সম্বন্ধে তিনি সহিষ্ণুভাবে সচেতন ছিলেন। চূড়ান্ত সাফল্যলাভের জন্য এই আপাত অসার্থকতাকে তিনি মেনে নিয়েছেন, সেখানে তাঁর হৃদয়ের প্রসার ও মহত্ত্বের পরিচয়। তাছাড়া কোন কোন পরিভাষা রচনায় তাঁর সার্থকতাও পরিলক্ষিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৮৪ শকের কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত ভূতত্ত্ববিদ্যা নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধটির এক স্থলে প্রবন্ধে-ব্যবহৃত কতিপয় বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা ও পরিচিতি প্রদত্ত হয়। প্রবন্ধটির বিষয় স্বর্ণকুমারীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও পরিভাষা-রচনা ব্যাপারে লেখিকার স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্য লক্ষণীয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অজ্ঞাত লেখক limestone শব্দটির স্থলে 'সৌধশিলা' ব্যবহার করেন, স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধে বলা হয়েছে 'চুনপাথর'। পরিভাষা সৃষ্টি ও তার প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে শেষোক্তটির আধিপত্য অনস্বীকার্য। তৃতীয় শ্রেণীস্থ পরিভাষার ক্ষেত্রে অনায়াসে অবিকৃতভাবে বিদেশী শব্দ স্বীকারের প্রসঙ্গে তিনি অতিশয় আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। মাতৃভাষাপ্রীতি ও তার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত এই অতিসাহসিকতা দেখা গিয়েছিল। কেবল

তাই নয়, প্রতিশব্দ সৃজনের মহান কর্তব্য পালনে তিনি ছিলেন সত্যাগ্রহী। দর্শনশাস্ত্রীয় কোন পরিভাষা ব্যবহারে ত্রুটি নিরীক্ষণ করে তিনি ভারতী ও বালক পত্রের ১২৯৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত গোপালচন্দ্র সোমের অহংজ্ঞান শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় বলেছিলেন, "কোন দার্শনিক পদ ভাষান্তরিত করার পক্ষে অনেক প্রত্যবায় আছে। অহংজ্ঞান শব্দকে self-consciousness পদের দ্বারা অনুবাদ করিলে তাহা যথার্থ ভাব-প্রকাশক হয় না। অহংজ্ঞান মানবের প্রকৃত সত্তাসম্বন্ধীয় জ্ঞানকেই বোঝায়। কিন্তু ইংরাজী self-consiousness পদটি তাহা নহে।' কঠোর ভাষায় এর সমালোচনা করে তিনি তৎসম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন, এইরূপ পরিভাষা প্রণয়নের ব্যাপারে কোনরকম শিথিলতার প্রশ্রয় তিনি দেন নি।

প্রচলিত শব্দব্যবহার এবং অভিনব শব্দ নির্মিতির সঙ্গে বিচিত্র উপায়ে পরিভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। এরকম কয়েক প্রকারের নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে।

১। মূল শব্দ ইংরাজী হরফে লিখিত, পাশে বাংলা উচ্চারণ, কোন প্রতিশব্দ নেই; মনোমত প্রতিশব্দের অভাবে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, marsupial মারস্যুপিয়াল, elk এল্ক, ziphius জিফিউস, granite গ্র্যানিট, laurentian লরেনসিয়ান, cambrian ক্যাম্ব্রিয়ান, eocen ইয়োসীন, silurian সাইল্যুরিয়ান, devonian ডিবোনিয়ান, permian পারমিয়ান, jurassic জুরাসিক, cherbourg সারবর্গ. miocene মায়োসীন প্রভৃতি। এই রীতি সম্বন্ধে প্রথম দিকনির্দেশ করেন জন ম্যাক। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত Principles of Chemistry বা 'কিমিয়া বিদ্যার সার, প্রথম খণ্ড' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় রসায়ন শাস্ত্রীয় শব্দের বাংলার নামান্তরণ সম্পর্কে বলেছিলেন, I have preferred, therefore, expressing the European terms in Bengalee characters, and merely changing the prefixes and terminology so as decently to incorporate the new words into the language. ভারতীয় ভাষায় অপরিচিত এবং ইউরোপীয় ভাষা থেকে আগত শব্দগুলিকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে কিংবা ঈষৎ বিকৃত করে গ্রহণ করার এই প্রয়াসটি সম্পর্কে তিনিই প্রথম সচেতনভাবে আলোচনা করেছিলেন, স্বর্ণকুমারী এক্ষেত্রে সেই ঐতিহ্যের দ্বারা পরিপোষিত হয়েছেন।

২। মূল শব্দের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণ সহ সম্ভাব্য প্রতিশব্দ ব্যবহার করে পরিভাষার শব্দরচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন লেখিকা। যেমন, brachiopoda ব্র্যাকিওপোডা বা বাহুপদী, carboniferous কর্বনিফেরাস বা অঙ্গারজনক, trilobites ট্রাইলোবাইটীস বা ত্রিকুণ্ডলী orthociratites অর্থসিরেটাইটিস বা ঋজুশৃঙ্গ, infrasilurian ইনফ্রা-সাইল্যুরিয়ান বা প্রারম্ভকাল ইত্যাদি।

৩। আবার মূল শব্দ আদৌ ইংরাজিতে নেই বাংলা হরফে মূল শব্দ এবং তার প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, অমোনাইট—মেষশৃঙ্গের ন্যায় বক্রাকার, বেলেমনাইট—তীরবৎ সূক্ষ্মাগ্র,

লায়াস—কর্দমময় চুনস্তর, ওয়োলাইট—ডিম্বাকার প্রস্তরস্তর, ব্রেনওয়েব থিয়োরী-মস্তিষ্করেণু তরঙ্গাঘাত মত ইত্যাদি।

৪। মূল শব্দের সংক্ষিপ্ত প্রতিশব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার না করে ব্যাখ্যামূলক প্রতিশব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, কখন কখন মূল শব্দের উচ্চারণ বাংলায় লিখিত। যেমন, মাশটডন—হস্তীজাতীয় আর একরূপ স্থূলচর্মীকে মাশটডন (অর্থাৎ স্তনিভাকার দন্তবিশিষ্ট) কহা যায়; stalagmite—উপর হইতে জল চুয়াইয়া পড়িয়া গৃহ অভ্যন্তরে যে চুনেমাটি উৎপন্ন হয় তাহার নাম ষ্ট্যালাগমাইট; marsupial—মাতার উদরের নিকটস্থ একটি চর্মের থলিয়ায় অবস্থিতি করে এবং সেইখান হইতে স্তন্য পান করিয়া বড় হইলে বাহির হয়, যেমন আধুনিক কাঙ্গারু। এইরূপ স্তন্যপায়ী জীবকে মারস্যুপিয়াল (mersupial) জাতি কহে।

এগুলিকে যথার্থ প্রতিশব্দ বা পরিভাষা বলা যায় না, কারণ অধিক ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের ফলে পরিভাষার সঙ্কেতময়তা কোথাও ঘনীভূত হয়ে আত্মকাশ করেনি। তবে মাশটডন, মারস্যুপিয়াল প্রভৃতি শব্দ বাংলায় গ্রহণের পূর্বে তাদের সম্বন্ধে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে পরিভাষার প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও মূল শব্দটি অবিকৃতভাবে বাংলায় গৃহীত হলে কোন অর্থ প্রকাশ করবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বর্ণকুমারীর ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিভাষা ও তার বাংলা প্রতিশব্দের একটি তালিকা এখানে প্রদত্ত হল :—

Absolute অনন্য-সাপেক্ষ, admiration আশ্চর্য, age of fishes মৎস্যযুগ, age of mammals স্তন্যপায়ী যুগ, age of men মনুষ্যযুগ age of reptiles সরীসৃপ যুগ alternate deposit of sedimentary rocks—বহুদূরব্যাপী স্তরসংস্থিতি; ember—হলদে ধুনা; anomalistic year—সৌরব্যবধান বৎসর; arc—বৃত্তাংশ; argillaceous schists—সমুদ্র কর্দম; articulated—স্ফুটাঙ্গ; as a whole—সমানভাবে; asteroid—গ্রহখণ্ড; aura—আভা; azoic—জীবশূন্যসময়; block—চাপড়া; bosjesmen or bushmen—জংলা; brachiopoda—ব্র্যাকিওপোডা, বাহুপদী; brain wave—মস্তিষ্করেণু-তরঙ্গাঘাত, মস্তিষ্করেণুতরঙ্গ, cainozoic—নব্যজীব; cambrian—ক্যাম্ব্রিয়ান; carboniferous—কার্বনিফেরাস, অঙ্গারজনক; cell—প্রকোষ্ঠ; centrifugal—কেন্দ্রাতিগ; centripetal—কেন্দ্রানুগ; chromosphere—বর্ণমণ্ডল; circumpolar—ধ্রুবতারা-পরিবেষ্টক; coast—তীর; conduction—উত্তাপের সঞ্চালন; conservation of energy—শক্তিসংরক্ষণ; cretaceous—ক্রুটেসস, ক্রিটেসস, চা-খড়ি; cryptogam—পুষ্পহীন; crystalline—দানাদার; deduction—অবরোহ; defferential attraction—আকর্ষণের বৈষম্য; density—ঘনত্ব; devonian—ডিবোনিয়ান; efferent fibre—অভিবাহী সূত্র; elk—এল্ক; energy—শক্তি; eocene—ইয়োসীন; equinox—সমান রাত্রিদিন; erputive rocks—উৎপাতজনিত মৃত্তিকা; ether—ঈথর; femur—পার্শ্বাস্থি; fern—পর্ণীতরু; focus—অধিশ্রয়; formanifera—ফরমানিফেরা; fundamental gneiss—মৌলিক মৃত্তিকা; ganoid—গ্যানয়েড; glacial action—হিমশৈলের কার্য; glyptodon—

খোদিত দন্ত ; granite—গ্র্যানিট, গ্র্যানিটপ্রস্তর ; gulf stream—উপসাগরিক স্রোত ; hercules—পুষ্যা ; horizon—দিগ্বলয়, দৃষ্টিব্যাপিকা ; hypnotism—স্বাপ্নিকতা ; induction—আরোহণ ; infra-silurian—ইনফ্রা-সাইল্যুরিয়ান বা প্রারম্ভকাল ; insure—বন্ধক ; interogation—জিজ্ঞাসা ; jurassic—জুরাসিক ; laurentian—লরেনসিয়ান ; lava—উত্তপ্ত ধাতুদ্রব, ধাতুস্রোত ; law of development—বিকাশপদ্ধতি ; law of exchange—আয় ব্যয়ের নিয়ম ; lepedodendrous—শল্কদেহী বৃক্ষ ; limestone—চুনপাথর ; local cause—স্থানীয় কারণ ; magnetic aura—আকর্ষণ আভা ; matter—পদার্থ ; medium—উপায় ; megalony—লম্ব-নখর ; mental physiology—মানসিক শারীরবিধান ; mesmirism—শক্তিচালনা ; mesozoic—মধ্যজীব ; metamorphosed—রূপান্তরিত ; middle age—মধ্যযুগ ; miocene—মায়োসীন, monocotyledon—একপত্র ; moter nerve—গতি উৎপাদক স্নায়ু ; muscular movements—মাংসপেশীর অবস্থান্তর ; mylodon—জাগদন্ত ; nearly perpendicular to the ecliptic—কক্ষের উপর প্রায় সোজাভাবেস্থিত ; nebula—জলন্ত বাষ্পময় নীহারিকারাশি ; nerve—স্নায়ু ; nerve cell—স্নায়ুপ্রকোষ্ঠ ; new red period—নতুন লোহিতপ্রস্তর যুগ ; nutation—মেরুলক্ষ্য পরিবর্তনগতি ; optical—দৃষ্টিভ্রম ; orthoceratites—অর্থসিরোটাইটীস বা ঋজুশৃঙ্গ ; pachyderm—স্থূলচর্মী জন্তু ; paleozoic—আদিজীব ; passing accident—দৈবঘটনা ; pendulum—দোলকযন্ত্র ; penumbra—উপচ্ছায়া ; permian—পারমিয়ান ; phenomenon—অবভাস জগৎ ; philosopher—তত্ত্বজ্ঞানী ; photosphere—আলোকমণ্ডল ; pleiocene—প্লায়োসীন ; pore—ছিদ্র ; practical hypothesis—আনুমানিক সিদ্ধান্ত ; precession of the equinoxes—ক্রান্তিপাতের বক্রগতি ; pygmy—বালখিল্য ; radiant matter—কিরন্ত পদার্থ ; radiation উত্তাপের বিকিরণ ; reflex action—প্রত্যাবর্তিত ক্রিয়া ; refraction—তির্যগ্‌গতি ; sedimentary rocks—স্থিতান মৃত্তিকা ; senoory nerve—ঐন্দ্রিয়িক স্নায়ু ; sensitive—মোহিষ্ণু ; sidereal year—নাক্ষত্র বৎসর ; silurian—সাইল্যুরিয়ান ; solar spots—সূর্যবিম্ব ; spectroscope—রশ্মিনির্বাচক ; spectrum—বিশ্লিষ্টবর্ণসমূহ ; spirit of mature—প্রকৃতির আত্মা ; substance—পদার্থ ; summer solstice—উত্তরায়ণ দিন ; temperature—উষ্ণতা ; tertiary epoch—তৃতীয় যুগ ; theory—বৈজ্ঞানিক মত ; triassic—ট্রায়াসিক, ত্রিস্তর ; trilobites—ত্রিকুণ্ডলী ; tropical—সৌরবৎসর ; umbra—ছায়া ; uniformity of natural laws—প্রাকৃতিক নিয়মের নিত্যতা ; universe—বিশ্বাকাশ ; unstratified deposits—লণ্ডভণ্ড মৃত্তিকাস্তর ; vertebra—অস্থিগ্রন্থি ; vertebrata—সমেরুজীব ; vertically—লম্বভাবে ; volcanic—অগ্নিসম্ভূত ; volcano—আগ্নেয়গিরী, অগ্ন্যুদ্গারী পর্বত, জ্বালামুখী ; winter solstice—দক্ষিণায়ন দিন ; xiphodon—স্থূলচর্মী জন্তু ; ziphius—জিফিউস।

১। "অক্ষয়কুমার এমন কিছু পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন যাহা পরবর্তী কালে অপরিগৃহীত অথবা পরিত্যক্ত। যেমন, 'অখাত' (আধুনিক উপসাগর, bay), 'ক্ষুদ্রাখাত'

(small bay), 'কোল' (lagoon), 'উপদ্বীপ' (আধুনিক 'দ্বীপ', island), 'ডমরুমধ্য' (আধুনিক 'যোজক', isthmus), 'প্রায়োদ্বীপ' (আধুনিক 'উপদ্বীপ', peninsula) 'হিন্দী মহাসাগর' (Indian Ocean) ইত্যাদি।"—সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য়, ১৬৮৯, ৪৯৩।

অক্ষয়কুমারের আরও কয়েকটি পরিভাষার নিদর্শন এরূপ: আত্মাদর (selb-esteem), গোমসূর্যাধান (vaccination), জিজীবিষা (love for life), জুগোপিষা (adhesiveness), নির্ম্মিমিৎসা (constructiveness), প্রতিবিধিৎসা (combativeness), ব্যক্তিগ্রাহিতা (individuality), শিল্পযন্ত্র (machine) প্রভৃতি।—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৫৯, ২৮৬-৭।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ২৮৭।

৩। "প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে; সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না।"—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০১, ২য় সংখ্যা।

বট-তলানি

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অতীতের অবশেষ স্মৃতিভারে পড়ে থাকে। প্রত্নতত্ত্ববিদ কিন্তু মহেঞ্জোদাড়োর সে ম্লান ধ্বংসস্তূপকেও রেহাই দেন না। ইতিহাসের পরিহাসই এই যে, বিস্মৃতির ধূলা যখন তানপুরার 'তারগুলা'কে ভুলে যাওয়ার জালে জড়িয়ে ফেলে তখনও সে ম্লান মুখ অতীতকে 'কথা কও' অনুরোধ করে। উচ্ কপালে বা উন্নাসিক শ্লীলতাবাদীর কথা স্বতন্ত্র কিন্তু পদ্মের কোষ্ঠীবিচার করতে গেলে ঘোলাটে পঙ্কিলতায় পা ফেলতে হবে বইকি! সমকালীন বটতলার সেই থিতিয়ে আসা তলানি—অতীত ফসলের ফসিলটুকুও তাই ইতিহাসে স্থান পাবে। বর্তমান বটতলার বোন-সতীন কলেজ ষ্ট্রীট বলা বাহুল্য সাহিত্যের হাটে বটতলাকে উপেক্ষিতা দুয়োরাণী করে রাখলেও বটতলার 'রুইন' আজও রবীন্দ্রসরণীর ধারে ধারে ক্ষীণ স্মৃতির সলতে জ্বালিয়ে রেখেছে। বলা বাহুল্য, একদা বটতলার ব্যাপ্তি বৈঠকখানা রোড পর্যন্ত হলেও ফোলানো বেলুনে সাময়িকতার হাওয়া নিঃশেষ হতেই চুপসে সে আজ সঙ্কুচিত শিখার মত রবীন্দ্রসরণীর কয়েকটি মাত্র বিক্ষিপ্ত লাইব্রেরীতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

আজকের বটতলার বইগুলো বিশ্লেষণ করলে সেখানে সিংহভাগের দাবীদার নাটক। বিশেষতঃ যাত্রা, পালা ইত্যাদি তথাকথিত লোকনাট্য। গ্রামীণ সংস্কৃতির কোন স্পর্শ নেই এ নাটকে, নাগরিক সভ্যতার মাঝে লালিত শহুরে নাট্যকার বরঞ্চ বিপরীতই করে থাকেন এসব যাত্রা নাটকে সাধারণত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি বঙ্গরঙ্গমঞ্চ অভিনেত্রীর প্রয়োজন বোধ করতে থাকে। গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখলেন বালক দিয়ে স্ত্রীচরিত্র অভিনয় সার্থক হতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন পৃথিবীর সেরা সৃষ্টি নারীর রূপ কণ্ঠ চরিত্রের স্পর্শ বালকের দ্বারা অভিনয় সম্ভব নয়। কিন্তু এ তো পরের কথা। ডিরোজীয়ান 'এজু' নব্যবঙ্গ বনাম রক্ষণশীল চণ্ডীমণ্ডপের তরজা লড়াই উনবিংশ শতাব্দীতে বহুবার বহু কারণে ঘটেছে, কিন্তু অবুঝ নাট্যকার মাইকেল মধুসূদনের নাবুঝ আবদার, অভিনেত্রী সংগ্রহ না করলে তিনি নতুন নাটক লিখে দেবেন না বেঙ্গল থিয়েটারকে। বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছাতুবাবুর দৌহিত্র নব্যবঙ্গ শরৎচন্দ্র ঘোষ। এই ছাতুবাবুরই দেওয়ান রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম যাত্রাদলে অভিনেত্রী নেওয়া শুরু করেন।

কিন্তু 'নাট্যাধ্যক্ষেরা রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক আনিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সমাজে অভিনেত্রীরূপে কুলস্ত্রী কোথায় পাইবেন?' গিরিশচন্দ্রের এ প্রশ্ন অনুযায়ী বঙ্গদেশে অভিনেত্রী সংগ্রহ শুরু হল বটতলার আত্মীয় সোনাগাছি থেকে। চণ্ডীমণ্ডপের কাছে এ 'বেশ্যাগমনে'র তুল্য! কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল বলে বসলেন, তবে তো আরও ভাল! পতিতালয়ে না গিয়েও এই পতিতা সংসর্গ বঙ্গ যুবকের কাছে 'সেফটি ভালভে'র কাজ করবে। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী সংগ্রহের রেওয়াজ শুরু করলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ বিতর্কের মাঝখানে। এদিকে হিন্দু পতিতার কাছে তখন চরম প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিমী বাঈজী। নবকৃষ্ণের দল বাঈজীদের আনতেন সাহেবদের মনোরঞ্জনার্থ, কিন্তু রক্ষিতার

যৌবনে অল্প ভাঁটা ধরতেই তাকে পতিতা-জীবন শুরু করতে হত। 'যবনী বারাঙ্গনা গমন' তখন পতিতা গমনের বিপরীত এক কুৎসিত অপরাধ। নবাগতা যবনী পতিতারা ব্যবসার সঙ্গে নাচ গানও [গান বলতে টপ্পা ঢপ আখরাই আর নাচ বলতে খ্যামটা] বিতরণ করত বাবুকে। ফলে সোনাগাছির সন্ধ্যায় পতিতাদের মধ্যে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। বস্তুত নৃত্যগীত-পটিয়সী পশ্চিমী একদা বাঈজীরাই সোনাগাছিতে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ঢেউ তুলতে পেরেছিলেন। এর ফলে অন্যান্য পতিতাদেরও ব্যবসায়িক কারণে নাচ গানে নজর দিতে হল। আর নাচ গানের এই বিকৃত উৎসবে বটতলার বইয়ের বাজারটি ঐতিহাসিকভাবে জড়িয়ে রয়েছে কারণ হাফ-আখড়াই আর খেমটা নাচ-গানের ফাঁকেই গড়ে উঠল অপেরা যাত্রা ও থিয়েট্রিকাল পার্টি। কারণ এইসব পতিতারা ইতিমধ্যেই রঙ্গমঞ্চে ডাক পেয়েছেন। বাবুরাও এই নতুন নাটক গড়ার আমোদে বিলোল বিহ্বল।

অর্থ দেবেন বাবু—নাচ গানের নায়িকা পতিতা, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন একটা প্লট বা কাহিনী—যেটাকে ভিত্তি করে নাটক বা যাত্রা অভিনয় হবে। সেজন্যেই প্রতিবেশী বটতলার স্মরণ নিতে হল। বটতলায় তখন প্রস্তুত হল নাটক। মনে রাখতে হবে নাট্যাভিনয় তখন নগর কলকাতায় প্রচলিত হলেও তাতে পয়সা উঠত না—পয়সা দিতেন বাবু, যে বাবুর নাট্যমণ্ডপে 'গানে'র আয়োজন হত। এই বিলাস-বাবুদের স্মরণে রেখে নাট্যকার নাটকের চেয়েও নজর রাখতেন আমোদ প্রহসনে। উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ মার্কা সামাজিক নাটক তখন কোটিকে গুটিক। বেশির ভাগই বটতলার ধর্ম অনুযায়ী টপ্পাশ্রয়ী প্রহসন। একদা বটতলার 'বুম' পিরিয়ডের ফসল। সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটকের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে পরে।

বলা বাহুল্য, সমকালীন বটতলায় সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। তবে প্রহসনের বাজার পুরো ধূলিস্মাৎ হয়েছে—সবচেয়ে বেশি চলেছে সামাজিক নাটকের স্রোত। পতিতার জীবিকার চাহিদায় বটতলায় যে নাটক-যুগের সৃষ্টি সে-যাত্রা আজ কলকাতায় উদ্বাস্তু। সোনাই-দীঘি বা বাঙালীমার্কা কয়েকটি নাটক রেকর্ড-রেডিও-সিনেমার সাহায্যে জনচিত্তজয়ী হলেও যাত্রার রামরাজত্ব আজ সংক্ষিপ্ত ও প্রায় শুধু মফস্বলেই সীমিত। মেদিনীপুর ও বর্হিবঙ্গ আসাম উড়িষ্যায় আজও এর সামাজিক চাহিদা রয়েছে বটে কিন্তু বাংলা দেশের চা-বাগিচা ও কোলিয়ারীতে যাত্রার চাহিদা সামাজিক নয় বটে, তবু অশিক্ষিত মজুরদের সময় কাটানোর অল্প অর্থের মাধ্যম ভাবাই ভাল। সুশিক্ষিত ম্যানেজার তাই আজও 'কৃষ্টি' যাত্রাকে বাধ্য হয়েই সেফটি উইকের লোকনাট্যের নামে আনন্দ উৎসবে জড়িয়ে রাখেন।

বটতলার নাটকের সৃষ্টি ও ব্যাপ্তি ও বর্তমান বাজার ব্যাখ্যা করা গেলেও নাটকের নাম লেখা সম্ভব নয় অন্তত হাজারখানেক অষ্টোত্তরী শতনামে সে এক নতুন নামায়ন বলে। নাটকের অসম্পূর্ণ তালিকা রেখে লাভ নেই এবং দুঃখের কথা তেমন উল্লেখযোগ্য নাটকের সংখ্যাও এখানে এত কম যে তারও আলোচনা চলে কিনা সন্দেহ।

বর্তমান বটতলার ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের শিক্ষিত সম্রাট নাটক হলেও প্রকৃত একচ্ছত্র সেনাপতি হল আদিরসাক্রান্ত বই। রসের শুরুতেই যে আদিরসের ভিয়েন তাই নিয়েই বটতলার ব্যবসা

এবং বটতলার সৃষ্টি থেকেই সেই আদিরসের প্রস্রবণ বয়ে চলেছে সেখানে তবু আমি আদিরসকে প্রথম আলোচ্য করিনি সমকালীন বটতলানিতে পরিকল্পিত ভাবেই। কারণ বটতলার সৃষ্টিপর্বে যে ভারতচন্দ্রীয় বাবু-বিকৃতির ভাঙন শুরু হয়েছিল তা হঠাৎ থমকে থেমে গিয়েছিল উত্তর পর্বে। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে যুবক মহলে যে উত্তেজনা ও বিদ্রোহের চেতনা-বন্যা বাংলাদেশে বয়েছিল তা আদিরসের বাজারের প্রতিকূল। ধনীবংশের উত্তরাধিকারী চরিত্রহীন বাবুকে কর্মহীন ঐশ্বর্য ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়—অপব্যয়ের বহুমুখী স্রোতে ঘড়ার সে জলও নিঃশেষপ্রায়, উপরন্তু দেশব্যাপী স্বাধীনতার অদম্য ক্ষুধা বোধে দিশাহারা বাবু অবশেষ ও জনচেতনার মুখোমুখি দাঁড়াতে ব্যর্থ। দেশনায়কের রণভেরীর কল্যাণে যুবক যুবতী নতুন নেশায় স্বাধীনতার ব্রত-প্রতিজ্ঞায় বাঁধা পড়েছে। এদিকে স্বাধীন ভারতে এল জমিদারী প্রথা বিলোপের আইন মৃতপ্রায় পরভৃতের প্রতি শেষ বাণ। বেকার একদা জীবিকার সন্ধানে হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনখানে পাড়ি দিলেন। বটতলায় প্রকাশিত হতে থাকল শ্রীসাধনানন্দের লেখা 'ব্রহ্মচর্য' সাধন। সদ্য-সাক্ষরের নবীন ক্ষুধা চাগিয়ে উঠবার আগেই গোড়োবাড়ির অন্ধকারে স্বাধীনতার নেতারা শপথ বাক্য পড়ালেন মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পতন।

কিন্তু এই নিশ্ছিদ্র নিরাশা কখনই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আসন পাড়তে পারে না কোথাও। হতাশ বটতলার 'ছাপাখানাওয়ালা'রা শুরু করলেন ১০০১ সচিত্র প্রেমপত্র, বিবাহিত দম্পতীর আসন বর্ণনা, বাৎসায়নের কামসূত্র ইত্যাদি। এ সবই বিবাহিত ও প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য আদিরসাক্রান্ত বইগুলো তখন উপন্যাসের পেলব মোড়কে 'যৌবনের ডাক', 'একান্ত গোপনীয়', 'দেহে এল যৌবন', 'বিয়ের পরে' ইত্যাদিতে। মনে রাখতে হবে এসমস্ত বই কেবলমাত্র বিবাহিত দম্পতীর জন্য, কারণ স্বাধীনতার আগে বিয়ে না করার ব্রতে দীক্ষা নেওয়া অবিবাহিতের দল তখন লুকিয়ে যে বই পড়ে তা ম্যটসিনি গারিবল্ডী, মাষ্টারদা, ক্ষুদিরামের জীবনী হতে পারে, কিন্তু বটতলার আদিরস নয়।

অর্থাৎ বটতলা তখন দুভাবে আদিরসে বেঁচে থাকতে চাইল। ১। কেবলমাত্র বিবাহিত দম্পতির মার্কেট নিয়ে—তাই প্রিয়ার চিঠিতে প্রেমপত্র লিখতে শেখাবার বিজ্ঞাপন দিয়েও দেখা গেল প্রেমিকা মানে সেখানে বিবাহিতা স্ত্রী মাত্র। ২। স্বীকৃত সংস্কৃত শাস্ত্র পুনর্মুদ্রণ। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রব্যাখ্যার নিস্পৃহ নিরপেক্ষতায় এখানে কেবল বাৎসায়নের কামসূত্র মার্কা যৌবন শাস্ত্রই পুনর্মুদ্রণ করা হত। এ সময় অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অস্পষ্ট আইনে কিছু বলা না থাকলেও বটতলার জ্ঞানী অপরাধীরা সে ঝুঁকি নিতে চায় নি। তাই একটা বইয়ের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, 'কামরত্ন তন্ত্র—সুপ্রসিদ্ধ নাগভট্ট বিরচিত—আদালতের অনুমোদিত অনুসারে ইহাই একমাত্র প্রচারিত বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

কিন্তু বটতলা বোধ করি জানত, এক মাঘে শীত যায় না এবং মাঘের রুক্ষতাই আনে বসন্তের আগমনী। সরকারী সাহায্যে আজ পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন ছোটদের খেলাঘরেও অনুপ্রবেশ করেছে। তাই সাম্প্রতিক বটতলাতেও অকাল বসন্তের আবার জোয়ার বয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ—জন্মনিরোধের বর্ণনার মোড়কে বটতলাও তাই তাদের পুরোনো মালিকেরই রিপ্রিন্ট শুরু করেছেন। স্বাধীন দেশের বিহ্বল সরকার আপন প্রচারেরই শিকার হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু মাভৈঃ উচ্চারণের দায়িত্ব নিয়েছে বটতলারই একান্নবর্তী কলেজ স্ট্রীট। এতকাল কলেজ স্ট্রীটের অস্পৃশ্য

বলে কথিত এই আদিরসের ব্যবসাই সেখানেও আজ আদরণীয়। বহু পত্র-পত্রিকা সেখানে আজ সরাসরি ভাবেই যৌনপ্রসঙ্গ নির্ভর। কিছু বিবসনা চিত্রতারকার ফটো—জন্মনিরোধের সচিত্র উপায় আর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সঙ্গেই তারা খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক উপন্যাস জুড়ে দিয়ে বটতলার আকাঙ্ক্ষিত বাজারকেই গুপ্তহত্যা করেছে। যুগযন্ত্রণা, আধুনিকতা, বিদেশী ভাবনা, ধর্ষিতার বেদনা ইত্যাদি শব্দ জড়িয়ে তারাও উলঙ্গ ভাবেই নেমে পড়েছেন এ ষ্ট্রীপট্রিজে।

সাম্প্রতিক অশ্লীল-সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে বটতলার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটিও তার বিশেষ দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে।

বটতলার বর্তমান বাজার নাটক নিলেও তা বটতলার ভোরবেলায় উপস্থিত ছিল না। আদিরসাক্রান্ত বই ভোরবেলাতে হাজির থাকলেও মাঝে ক্যাজুয়াল লীভ নিয়েছিল। কিন্তু সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত 'ষ্টিল গোয়িং ষ্ট্রং' হল ধর্ম পুস্তক। গঙ্গাকিশোর থেকেই বটতলায় ধর্মপুস্তকের বাজার। অবশ্য ভবানীচরণ তারই মধ্যে ব্রাহ্মণ কম্পোজীটর, তুলট কাগজ, গঙ্গাজলে গোলা কালির অতিরিক্ত আকর্ষণ জুড়ে একদা ধর্মসভার পত্তন করেছিলেন বটতলাতেই। আজও বটতলার ধর্মপুস্তকের চাহিদা কনষ্টান্ট রয়েছে মফস্বল মহলে। অবশ্য এর সবচেয়ে বড় কারণ ভবানীচরণের 'খাঁটি' জিনিস নয় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সুলভ' প্রচার। কালীপ্রসন্ন পয়সায় দু'খানা মহাভারত প্রচার করে বটতলায় ধর্মপুস্তকের এক স্থায়ী চাহিদা সৃষ্টি করে গেছেন। বস্তুতঃ মফঃস্বলে দেখেছি বটতলার বই বলতে সস্তায় লক্ষ্মীর পাঁচালীমার্কা ধর্মপুস্তকই বোঝায় অনেকের কাছে।

সম্ভব না হলেও টপ্পা চপ হাফ-আখড়াই আর খেমটার সামনে এই ধর্মসঙ্গীতকে নিষ্কলুষ বেশিদিন রাখা যায়নি। (আখড়া সহ) রসকীর্তন, নগর কীর্তন, দোহাবলী, গীতরত্নাবলী, পদরত্নমালা, মহাজন পদাবলী এরই অন্তর্গত। প্রসঙ্গত বলে রাখি ধর্মগ্রন্থের দুটি ভাগ; (ক) থিয়োরীটিকাল—যথা রামায়ণ, মহাভারত, বেহুলা, সাবিত্রী-সত্যবান, কৃষ্ণলীলা, জগন্নাথ লীলা, রামলীলা, কল্কিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, এমনি আরও। ধর্মগ্রন্থের পাঠক বহু শ্রেণীর ধনী দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত। সেইজন্য এখানে সাধারণ, সুবেশ, বিলাতি বাঁধাই, রাজ, সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণের রেওয়াজ রয়েছে। (খ) প্র্যাকটিকাল—ট্রেনিংয়ের জন্য এই বিভাগে থাকবে সর্ব দেবদেবী পূজাপদ্ধতি, নিত্যকর্ম পদ্ধতি, শ্রাদ্ধকাণ্ডবারিধি, বিবাহ উপনয়ন চূড়াকরণ পদ্ধতি এবং পুরোহিত দর্পণ। প্রসঙ্গত বলি, পুরোহিত দর্পণ বইটি হিন্দুমতে সকলরকম পূজার পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে যা পুরোহিতের বৃত্তির পক্ষে ফার্ষ্ট হ্যাণ্ড গাইড। এই দর্পণেরই দাম দশ টাকা—বটতলায় এধরণের বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম। প্রকাশকদের কাছে শুনেছি বইটি 'টাকশাল' বিশেষ। পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম্য পুরোহিত এর রচয়িতা—তিনি শুনেছি অতি সামান্য নগদ অর্থের বিনিময়ে বটতলায় বইটি বিক্রয় করে দেন। রচয়িতার উত্তর পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জেনেছি, পুরোহিতটির শেষ জীবনে আর্থিক অবস্থা হীন জেনেও বটতলার প্রকাশক তাকে কোন সাহায্য করে নি। বস্তুত লেখক সম্পর্কে বটতলার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সব ক্ষেত্রেই এরকম যান্ত্রিক।

সি. ই. এম. জোড বলেছেন ধর্মের ভিত্তি ভয়। প্রাচীন যুগের মানুষ যে প্রাকৃতিক ঘটনারই ব্যাখ্যা করতে পারত না সেখানেই দেবতার আরোপ করত। বরুণ-পর্জন্য-অগ্নি দেবতার জন্মও

নাকি এমনি করে। কিন্তু নাগরিক সভ্যতা থেকে দূরে এই ভয়-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা তুক-তাক, তিলতত্ত্ব, পেত্নী বিশ্বাসের এক আধিভৌতিক জগৎ বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে রয়েছে। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, চাঁদসী চিকিৎসার বৃত্তের বাইরে যে বৃহৎ টোটকা কি ঝাড়-ফুকের বাজার রয়েছে বটতলা তাকেও রেহাই দেয় নি। 'কামাখ্যা দেবীর শত বৎসরের পুরাতন পাণ্ডুলিপি দর্শনে মুদ্রিত' লাল কালিতে ছাপা 'কামাখ্যা মন্ত্রসার' এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এই মন্ত্রতন্ত্রের বই বটতলা প্রায়ই লাল কালিতে ছাপিয়ে থাকে আকর্ষণ হিসেবে। ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, পেঁচা, ডাইনি, সর্পদেবতা, উপদেবতা প্রভৃতির দয়া ভিক্ষা, বিষ ঝাড়া, ভূত নামান, বাটি চালা, হাত চালা, বাণ বিদ্যা, সর্প আনয়ন, ইত্যাদি 'দৈব' চিকিৎসার মোহিনী মন্ত্র এসব বইয়ে থাকে। কামাখ্যা মন্ত্রসার, অদ্ভুত মায়াজাল, কজ্জপদর্পণ তন্ত্র, অদ্ভুত ইন্দ্রজাল, ধন্বন্তরি তন্ত্রশিক্ষা, ডামরতন্ত্র, কামরূপ তন্ত্রসার, গুপ্ত মন্ত্র, রাক্ষসী তন্ত্র ইত্যাদি বহু বই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেই সঙ্গে শশিভূষণ পাল সংগৃহীত (লিখিত নয়) 'অদ্ভুত সাঁওতালী মন্ত্র'—যা ভূত-প্রেত-ডাইনী-পেঁচা-তাড়ানো, ফিকবেদনা, সুখ প্রসব, জলপড়া, তেলপড়া, মাটিপড়ার সাঁওতালী মন্ত্র সংগ্রহও কৌতূহলজনক। এই পর্যন্ত এসে এ ধরণের বই দুটো স্বতন্ত্র স্রোতে ভেসে গেছে। কেউ ডাকিনী-যোগিনী তাড়াতে উচাটন মন্ত্রই বরণ করে নিয়েছে। সাধনা সিদ্ধি রেচক কুম্ভকের সঙ্গে বরাহ মিহির ডাক, খনার বচনের মারফৎ গর্ভস্থ সন্তান গণনা, সতীত্ব বিচার, নক্ষত্র বিচারের ফাটকা খেলায় নেমেছেন।

অবশ্য এর সবটাই বিশ্বাসের বদলে বই নয়। জ্যোতিষ ও পঞ্জিকা এর ব্যতিক্রম। বটতলার আগে থেকেই হয়ত এদেশে পাঁজি প্রকাশের রেওয়াজ ছিল। ১৮১৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে জানা যায় 'এতদ্দেশে নবদ্বীপ, মৌলা, বাবইয়ালী, বাকলা, খানাকুল, বজরাপুর, বালি, গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়'। প্রথম পাঁজি রচনা হয় সম্ভবত কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ও বালির পণ্ডিতগণ দ্বারা। বটতলার প্রথম ছাপাখানা বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় বাংলা ১২২৭ সালের পাঁজি রচনা করেন শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। 'নবদ্বীপ সম্মত' এ পাঁজির খবর ১৮২০ সালের ১১ই মার্চ সংবাদপত্রে জানা যায়। বর্তমান বাংলা দেশের একটি প্রখ্যাত পাঁজির আসন্ন জন্মশতবার্ষিকীর শুভ লগ্নে পাঁজি মুদ্রণের বিচিত্র ইতিহাস বিস্তৃতভাবে রচনার প্রয়োজন রয়েছে।

পঞ্জিকার পর জ্যোতিষ। ১৮২০ সালের ২১শে মার্চ সংবাদপত্রে জানা যায় এবং খড়দহের শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস পশ্চিম দেশীয় একজন পণ্ডিত দ্বারা নানা জ্যোতিষ গ্রন্থ বিবেচনা করিয়া ব্যবহারোপযুক্ত তাবৎ জ্যোতিষের ব্যবস্থা একত্র সংগ্রহ করিয়া নিরানব্বই পত্রে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিয়াছেন ও সে-পুস্তক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন, সে-পুস্তক অতি সপ্রয়োজনক।' কিন্তু জ্যোতিষ করকোষ্ঠী বিচার গ্রহগণনা থেকে অচিরেই তিলতত্ত্বে নেমে এল বটতলাতে 'কোষ্ঠী লিখন প্রণালী' জ্যোতিষ রত্নাকর, হস্তরেখা বিচার প্রণালী, নামের দু-একটা মাত্র বই পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি, ঝাড়ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্র চিকিৎসার অপর ধারা নেমে আসে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পথে। এদিকে প্রথম বই, বোধহয় ম্যাটিরিয়া মেডিকা। অবশ্য এর আগেই কবিরাজী চিকিৎসা

পর্যায়ে দ্রব্যগুণ বিজ্ঞান, অনুপান দর্পণ, সিদ্ধমুষ্টিযোগ, নিদানার্থ প্রকাশিকা, নিদানার্থ চন্দ্রিকা, নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা, দ্রব্যগুণ পরিচয় ও সহজ কবিরাজী চিকিৎসা প্রকাশিত হয়। তারপর হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা, হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা হোমিও ব্রহ্মাস্ত্র প্রকাশিত হল। এ্যালোপাথিক ডাক্তারী চিকিৎসায় অবশ্য একটি লাইব্রেরী মনোপলি উল্লেখযোগ্য। মেটিরিয়া মেডিকা রোগনির্ণয় ইঞ্জেকশন, শিশু ও স্ত্রীচিকিৎসা, প্র্যাকটিস অব মেডিসিন (দুখণ্ডে) কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা, টেক্সট বুক অব এ্যানাটমী (বাংলায়) তারাই প্রকাশ করেছেন।

ডাক্তারী বইয়ের ক্ষেত্রে বটতলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, বটতলার কুখ্যাত কমিশন প্রথা এখানে ম্লান। এমনকি বিক্রেতাদেরও তাঁরা এ বইয়ে কমিশনের ক্ষেত্রে ঈষৎ অনুদার। বোধ করি তাঁদের ধারণা এ বইয়ের নিজস্ব গুণেই এরা বিক্রীত হয়। গ্রামজীবনের জরুরী যথা লতাপাতার গুণ এবং সর্বোপরি গোধনের চিকিৎসাও বটতলাতেই প্রকাশিত হয়। দুর্যোধন তো বিরাট রাজার গোশালে গরু চুরি করতে গিয়েই ধরা পড়েছিলেন, তাই মানুষের চেয়ে যে গরুর দাম বেশি তা অজানা নয়। বৃহৎ পশু চিকিৎসা, গো-পালন পদ্ধতি (সচিত্র), গোজীবন বইগুলো এরই অন্তর্গত। প্রসঙ্গত বর্তমান বটতলার ক্রেতার বিবর্তন আলোচনা করা যেতে পারে। বটতলার বই আজ কলকাতায় কেউ কেনেন বলে মনে হয় না। বটতলার নাগরিক ক্রেতারা সাধারণত আদিরসাক্রান্ত বই আগে কিনতো আজ তার জন্য বটতলার অন্ধকারের প্রয়োজন নেই, কারণ তা আজ লুকিয়ে কিনে পড়বার নয়। গল্প উপন্যাসের প্রথম ক্রেতা ধনীগৃহের স্ত্রীশিক্ষার শিকার অন্তঃপুরিকারা। কিন্তু সিনেমাপত্রিকা বেঁচে থাক—তাঁরা বটতলার বই আর কেনেন না। তবু বটতলার একটা চাহিদা আছে। সস্তায় বিয়ে, জন্মদিন অন্নপ্রাশনের উপহার দেবার জন্য বটতলার বেশি কমিশনের বই অনেক খুচরো ক্রেতা কেনেন। বটতলার প্রকাশকের মুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনেছি রজনীগন্ধার ষ্টক চালু হবার পর থেকেই বটতলার সস্তা বই এবাজারেও উদ্বাস্তু হতে চলেছে। কারণটা অবশ্য আরও সুগভীর এবং সামাজিক। অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনের কল্যাণে চা-ডালমুট খাইয়ে যেখানে অতিথি বিদায় ঘটে সেখানে বইয়ের ব্যয়ও বেশি মনে হয়। উপরন্তু নীলকণ্ঠের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে রাখার কথা—আজকাল বই উপহার নিয়ে গেলে খেতে ডাকছে বড় দেরী করে।

কিন্তু বটতলার রয়েছে নিজস্ব মনোপলি গ্রামীণ ক্রেতায়। পল্লীবাংলার সেই বৃহৎ বাজারে কলেজ স্ট্রীটের ক্যাডিলাক ঢুকতে পারে না, কারণ গঙ্গকিশোরের ভগীরথ আগে পথ প্রস্তুত না করলে বড় গাড়ী ঢুকবে কি করে। পাঁচকড়ি দে, দীনেন রায় আগে না গেলে বিমল মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্তের বাজার তৈরি হবে কি করে। বিশেষতঃ বটতলার যাত্রার বই আজও গ্রাম বাংলার হটকেক। অপেরা পার্টিগুলো পাশের পাড়ায় রিহার্সাল দিলেও তাদের একচক্ষু হরিণের তীক্ষ্ণ নজর পড়ে থাকে গ্রামের দিকেই।

তবে ভুল বলেছি, বটতলার রোমাঞ্চ সিরিজের ক্রেতা কিন্তু কলকাতার কিশোরেরই। গঙ্গাকিশোরের যুগে গ্রামে বই ফেরীর কথা শুনেছি কিন্তু বর্তমান বটতলা গ্রামের ক্রেতাকে কলকাতায় ডেকে আনতে চান। অথবা ডাকমাশুল ফ্রিতে বই ভি পি করে দেন গ্রামে, কিন্তু তবুও বই ফেরীতে জোর পান না। আমি একটি প্রকাশকও পাইনি যিনি গ্রামে মাইনে করা ফেরীওয়ালার

ব্যবস্থা করেন। প্রকাশকদের কাছে এ প্রসঙ্গে শুনেছি আজকালকার আধুনিক কাস্টমার পাঁচটা বই হাতে নেড়ে দেখতে চান—তারপর দাম কমিশন লেখকের নাম, মলাটের রং বাজিয়ে তবে কিনতে চান। যাঁরা যাতায়াতের ঝামেলা এড়াতে চান তাঁরা বিজ্ঞাপন দেখে বইয়ের অর্ডার দেন, মণিঅর্ডারসহ অথবা ডাকযোগে বা ভি পি-তে বই পান গ্রামেই বসেই। যাঁরা বই বাছতে চান তাঁরা কলকাতায় দোকানে এসে দশটা বই দেখতে পারেন। ফেরী পর্ব না থাকলেও গ্রাম্য মেলাতে বটতলা স্টল ভাড়া নিয়ে থাকেন। বোলপুর, বৈরাগীতলা, জয়দেব প্রভৃতি বহু মেলাতেই এমনকি গুরুত্বপুর্ণ সাপ্তাহিক হাটেও তারা কোথাও কোথাও মাঝে মধ্যে গিয়ে থাকেন। বলে রাখা ভাল, সাধারণত এসব বই হয় পুরোনো বস্তাপচা—এঁদের ভাষায় লটের বই। যা ওজন দরে বিক্রি করার কথা গ্রামের খদ্দের তাই টাটকা মনে করে কেনেন, এই প্রবঞ্চনা সম্পর্কে প্রকাশকের স্বীকারোক্তি গ্রামের লোকেরা বড্ড বেশি কমিশন চান যে!

আগেই বলেছি, বটতলার বই আর বিক্রির দোকান একাত্মক। এখানে প্রকাশক মাত্রেই হুতোমের ভাষায় ছাপাখানাওয়ালা অর্থাৎ নিজের প্রেসের প্রিণ্টার ও পাবলিশার। এছাড়া তিনি তার প্রকাশনার বই বিক্রিও করেন নিজের দোকানে। এখন বটতলার বই বিক্রি কমে গেলেই দোকানের আয়ও যায় কমে। অথচ অস্তিত্বের সংগ্রামে বটতলার প্রকাশককে তখন নিছক দোকানদার হিসেবে বিশ্বভারতীর বইও রাখতে হয় চাহিদামত। বলা বাহুল্য, পঁচিশে বৈশাখের কবিপক্ষে যখন অতিরিক্ত কমিশন ঘোষণা করা হয়, সে-সময়ে বই কিনে রেখে সারা বছর বিক্রি করেন তাঁরা।

বস্তুত বটতলার বই, প্রকাশক, মুদ্রাকর ইতিহাস একই কিন্তু সমকালীন বট-তলানিতে বটতলার লাইব্রেরী নামক দোকানগুলির পরিচয় ক্রমশই পাল্টে যাচ্ছে। এখন তারা নিছক দোকান মাত্র। নিজের প্রকাশনার বইয়ের সঙ্গে কলেজ ষ্ট্রীটের বই রেখে সে জীবন সংগ্রামেও স্বধর্মভ্রষ্ট।

অতিসম্প্রতি কলকাতার সদ্যসাক্ষর কিশোরদের বটতলার প্রভাব থেকে ছিনিয়ে নেবার একটি লক্ষণীয় প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এটা শুরু হয়েছিল সংবাদপত্রে ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী পরিবেশনে। বর্তমানে একটি আবাঙালী প্রতিষ্ঠান এই সব চিত্র কাহিনীকে রং ছড়িয়ে নিয়মিতভাবে পরিবেশন করছেন। সস্তা ডিটেকটিভ বই যারা পড়ে তারা আগাথা ক্রিষ্টি বা কোনান ডয়েল পেলেও বটতলাকে ভুলত না কিন্তু এ বিদেশী খুন ধর্ষণ উত্তেজনা জড়ানো চিত্রকাহিনী পেয়ে বটতলার রোমাঞ্চ সিরিজকে ক্রমশ ত্যাগ করতে চলেছে।

বটতলার একদা প্রধান ফসল ছিল আদিরসাক্রান্ত বই। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের আবেদনপত্রে জানা যায় 'শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় লোকের মুদ্রিত পুস্তকের প্রচার করিলেও এতদ্দেশীয়েরা তৎপথপ্রজ্ঞ হইয়া কামসংবর্ধক নানাবিধ রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর কামশাস্ত্র প্রচার করিয়া বালকদিকের মনশ্চাঞ্চল্য করিয়া কুপথ দৃষ্টিই বৃদ্ধি করিতেছিলেন'। একথা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্টে (১৮১৯-২০) সালেও উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু বটতলার স্বর্ণযুগ অস্তে বিপ্লবী বাংলা দেশে আদিরসের চাহিদায় ভাঁটা ধরেছিল একথা আগেই বলেছি। প্রচলিত আদিরসিকতার বন্ধ্যা প্রহরগুলোর গুপ্ত সিঁড়ি ঘুরেছে অন্দরমহলের সুড়ঙ্গে। কলকতার সামাজিক ইতিহাস অনুযায়ী

এ সময় গোপনচরণে স্ত্রীশিক্ষা বৈষ্ণবী ও পাদ্রীদের কল্যাণে চিকের আড়ালেও অনুপ্রবেশ করেছে। বিবিধ বিতর্ক সমন্বিত সে-যুগের সংঘাত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে' অনুসন্ধিৎসুরা পেতে পারবেন। মনে রাখতে হবে স্ত্রীশিক্ষা সে সময় সর্বজনস্বীকৃত নয়, স্ত্রীস্বাধীনতা তো দূর অস্ত্। থিয়েটারেও পতিতা অভিনেত্রী আগমনের ফলে পাবলিক থিয়েটারে অন্দরমহলের জেনানারা দেখতে যাওয়ার অনুমতি পেতেন না। স্বল্পশিক্ষিতা মেয়েদের তৃষ্ণা নরনারীর মধ্যে আলাপ পরিচয়ের সহজ স্বাভাবিক পথে তৃপ্তি পাবার সুযোগ ছিল না। ধনী একান্নবর্ত্তী গৃহের রেওয়াজই ছিল স্বামীও স্ত্রীর মহলে প্রবেশের পাশপোর্ট পাবেন কেবলমাত্র রাত্রে। শুধু তাই নয় স্বয়ং স্বামীও যদি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে নববিবাহিতা সহধর্মিণীর আলাপ করিয়ে দিতে চান তবে তাকে কত প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হত তা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী দুজনেই লিখে রেখে গেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীর পক্ষে আপন বিবাহিতা স্ত্রীর বিছানায় রাত্রিযাপনের প্রশ্নটি আলোচনা করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর বাবু বিকৃতির কল্যাণে 'বারুণী বাগান বারাঙ্গনার' যুগে কোন বাবু 'স্বামীই' বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে রাত্রে শুতে যেতেন না এবং এ প্রস্তাবকে তাঁরা সধবার একাদশীর নিমচাঁদের মতো, 'অপমান' বলেই বিবেচনা করতেন। কোন কোন বাবু আবার স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন বলে সন্ধ্যায় বাগানবাড়ি যাবার আগে স্ত্রীকে ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখে যেতেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যেদিন বাবুর খুব টাকার টানাটানি হত সেদিন তিনি স্ত্রীর কাছে শুতে আসতেন এবং ভুলিয়ে স্ত্রীর গহনাগুলো হাতিয়ে নিতেন। সতীর প্রার্থনা থাকত স্বামী শুধু বলবেন যে তিনি রাত্রে বিবাহিতা স্ত্রীর কাছেই শোন। 'অথ বাবুর সতী বিলাপে' ভবানীচরণ তাই বলছেন, বিবাহের পরে আসি, শ্বশুর ঘরেতে বসি, দিবানিশি থাকি একাকিনী। নবীন যৌবন ভরে, চিরকাল কামজ্বরে, পুড়ে মরি দিবস রজনী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে দেখিয়েছেন বাবু যুবতী বোনের মুখ চুম্বন করেন তবুও স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না, 'সভ্য' হবার জন্য। দীনবন্ধুও সধবার একাদশীতে প্রায় একই ধরনের চিত্র উপহার দিয়েছেন সতীর পতিবিলাপের। স্পষ্টতই এইভাবে বোবা অন্দরমহলে বহু ক্ষুধিত পাষাণের সৃষ্টি হত। তাঁরা কেউ কুলীন প্রথার শিকার, কেউ সতীদাহ এড়িয়ে 'যুবতী বিধবা' এবং অতি অবশেষে ঘরজামাইয়ের যন্ত্রণা [জামাই বারিক দ্রষ্টব্য] বিধাতার পরিহাসে এই সব তৃষিতা মেয়েরা বাইরের পুরুষের দেখা পেতেন কেবল সামাজিক উৎসবে। ক্ষণিক সাক্ষাৎ-আলাপের মধ্যে আত্মীয়তার সৌরভ পাওয়া যেত যদি বিবাহ উৎসবের আয়োজন হত। মেয়েলী আচার নামে কিছু অনুষ্ঠান মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকত।—আর পুরুষ বলতে সেখানে থাকতেন কেবল নববিবাহিত জামাই স্বয়ং। পুরুষেরা বেশ্যাদিগের সহিত আলাপ করিয়া এ অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। কুলবালাগণ কেবল নিজ পরিবারের বা অতি সন্নিহিত স্বসম্পর্কীয় প্রতিবেশীর নূতন জামাতার সহিত আলাপ করিয়া আমোদিত হইতেন। সে আলাপও আপন ভগ্নীপতি বা স্বামীর ভগ্নিপতি ভিন্ন অন্যের সহিত ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না। কোন সুশীল সরল স্বভাব ও মিষ্টভাষী জামাতাকে দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। চন্দ্র দেখিলে চকোর যেমন পুলকিত হয়, বা বহুকালের দরিদ্র অপর্য্যাপ্ত ধনলাভ করিলে যেরূপ

আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ কুলস্ত্রীরা সুশ্রী ও তরুণ বয়স্ক জামাতৃদর্শনে আহ্লাদিত হইতেন।...কি বালিকা কি যুবতী, কাহারও হৃদয়ে কোন অপবিত্র ভাবের উদয় হইত না। তাঁহারা অতি নির্মল চিত্তে ঐ জামাতার সহিত আলাপ করিতেন।' বলা বাহুল্য, বাসরঘরে একা জামাইকে পেয়ে এই নির্মল আলাপ যে কতদূর গড়ায় তার পরিচয় কেউ কেউ পেয়ে থাকবেন নয়ত শুনে থাকবেন। কর্ণমর্দন থেকে আরো অনেক কিছুই এ অনুষ্ঠানের অঙ্গ বিবেচিত হত। জামাইকে ঠকানোর বিকৃতি রসগোল্লায় আলপিন দেওয়া পর্যন্ত গড়াত। সবচেয়ে চলতি যা তা হল জামাই ঠকানো ধাঁধা বলে বোকা বানানো। মনে রাখতে হবে ধাঁধা, রস, রসিকতার পরিবেশনে সীমাজ্ঞান সর্বদা বজায় রাখা সার্কাস্' গার্লের পক্ষেও শক্ত। উপরন্তু এদিনে মেয়েদের বাড়াবাড়িতে কিছু সামাজিক মানসিক পটভূমিকা রয়েছে বলে মনে করি।, অভিভাবকেরা উৎসবের আয়োজনে বিব্রত—সামাজিকতা ও মেয়েলী আচারের নামে শাসন শিথিল, তাছাড়া বিবাহিত মেয়ের প্রকৃত অভিভাবক কে, বাবা না শ্বশুর, সে কমপ্লেক্সটাও ভাববার মত। ইত্যাদি কারণে অল্পবয়স্কা সদ্যবিবাহিতা উদ্দাম আনন্দে সেদিন অধীরা হয়ে পড়তেন। মেয়েলী বুদ্ধির সীমিত সামর্থ্যে বাসরশয্যায় বা ফুলশয্যায় যে সমস্ত রসরসিকতা পরিবেশন করতেন তার অধিকাংশই ধাঁধা। এসব ধাঁধার পরিবেশক হতো বটতলা—কালিদাস বীরবল গোপাল ভাঁড়ের নামে। গোপাল ভাঁড়ের ঐতিহাসিকতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি বটতলা কিভাবে ধাঁধা, ভাঁড়ামি, রঙ্গের প্রয়োজনে এ বৃত্তি নিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এসব ধাঁধায় ক্রমশ নাগরিকতা আদিরস ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটতে থাকল। একদিনের স্ফূর্তিতে মেয়েরাও এই perversionকে সাদরে বরণ করত প্রথমদিকে অজান্তেই। আজকাল বটতলায় অবশ্য এসব ধাঁধা, হেঁয়ালির বাজার নেই কারণ গোটা মেয়েলী আচারটাই আজ 'পাশবিক' সন্দেহে উদ্বাস্তু। উপরন্তু স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার দুধর্ষ অগ্রগতিতে আজ পুরুষসঙ্গ মেয়েদের কাছে পৃথক কোন মূল্যই পায় না।

বটতলার প্র্যাকটিকাল বই প্রসঙ্গে আমরা আগে আলোচনা করেছি। সহজ কোষ্ঠী লিখন প্রণালী, পুরোহিত দর্পণের সঙ্গে নাটকপর্বে ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত ও মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা লিখিত যাত্রা ও থিয়েটারের সচিত্র 'অভিনয় শিক্ষা'ও উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কুটীরশিল্প শিক্ষা, বেকার সংস্থান বা স্বদেশী শিল্প শিক্ষা, মোটর শিক্ষক, ফটো তোলা, ডার্করুম শিক্ষা, মাষ্টার অব প্রিন্টিং, কম্পোজীটর্স ম্যানুয়েল ইত্যাদি এরই অংশ। কিন্তু এধরনের সবচেয়ে বেশি বই বেরিয়েছে গান-শিক্ষা সম্বন্ধে। জানি না, সেযুগের নিধুবাবুর পরোক্ষ প্রভাব এর কারণ কিনা। সঙ্গীত পরিচয় বা সরল হারমনিয়ম শিক্ষা, সহজ বাঁয়া তবলা শিক্ষা ও এসরাজ শিক্ষা, কীর্তনগীত শিক্ষা, সহজ গৎ শিক্ষা (দু খণ্ডে), সুরের সিঁড়ি, তবলা তরঙ্গিনী, বেহালা শিক্ষা এ প্রসঙ্গে অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আগেই বলেছি অভিনয় জগতে যুবতী পতিতার চাহিদা থাকলেও বৃদ্ধা পতিতার সম্বল ছিল 'আগে বেশ্যা পরে দাস্যে বৃদ্ধা তপস্বিনী' প্রবাদ অনুযায়ী পাঠ, কথকতা, কীর্তন ইত্যাদি। মুসলমান পতিতা নৃত্যপটিয়সী হলেও হিন্দু পতিতা তা ছিল না বলেই তাকে শেষ বয়সে ধর্মকেই নির্ভর করতে হত। বটতলার বৈষ্ণব প্রভাবের পরিণতিতে যে অজস্র কীর্তন গানের বই প্রকাশিত হয়েছিল এর পেছনে তাদের প্রভাব কম নয়।

শুধু সঙ্গীত শিক্ষার আসর নয় বটতলাতে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল বই মাধ্যমে। উর্দু ফারসী, ইংরেজী ও সর্বশেষ সাম্প্রতিক রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, সব ভাষা শেখার বই সেখানে পাওয়া যাবে। বৃত্তি-জীবিকা ব্যবসায় সাহায্যকারী আরও বইয়ের দেখা পাওয়া যায়। গৃহস্থ মেয়েদের দাবীতেই কিনা জানি না বটতলার প্রথমযুগেই সেখানে প্রকাশিত হয়েছে পাকরাজেশ্বর :—তারই বিবর্তন আজকের সহজ পাকপ্রণালী। এছাড়া আধুনিক সেলাই ও বোনা (ফ্রী স্কেল সহ) ও তারা প্রকাশ করেছে। বটতলায় আজ নতুন ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বইকি। যেমন ধরুন, ধনী প্রকাশকের শিক্ষিত ও আধুনিকমন্য সন্তান অতিসম্প্রতি পেপার ব্যাকও প্রকাশ করেছেন। একবার শুধু যাত্রার নাটক-নির্ভর এক মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি কিন্তু ক্ষণপ্রভার আলো যে আঁধার বাড়িয়ে দেয় কবির কথাই এ প্রসঙ্গে সত্যি হয়ে ওঠে। মূলতঃ বটতলায় আজ টিকে থাকার সঙ্কট বেঁচে থাকবার ভাবনা। তবু এরই মাঝে দু-একজন তরুণ যে আধুনিকতার ব্যর্থ চেষ্টা করে বটতলাকে 'কলেজ স্ট্রীটের জাতে' তোলার চেষ্টা করেছেন এ কথাটাই উল্লেখযোগ্য। একাধিক কালারের ঝকঝকে মলাটের আধুনিক বাঁধাই (মাদুর, খাদি বস্ত্র ইত্যাদি, নতুন লে-আউট ইত্যাদিতে তারা ব্যর্থতা দিয়েই কলেজ স্ট্রীটের কাছে নিজেদের অন্তসারশূন্যতা প্রমাণ করেছেন।

বটতলার ব্রহ্মা গঙ্গাকিশোরের যুগে লক্ষ্যণীয়ভাবে শিশুসাহিত্যের উন্নতি ঘটেছিল সেখানে। আগেই বলেছি সদ্যসাক্ষরের ব্যক্তিগত বয়স আলোচ্য নয়। তারা নতুন পড়তে শিখেই বেতাল পঞ্চবিংশতি, হিতোপদেশ, চাণক্য শ্লোক, তুতিনামা, হাতেমতাই-এর গল্প পড়েছে বয়স নির্বিশেষে। বিদেশী সভ্যতার সময় শহর কলকাতার বাসিন্দারা তখন সবে পড়তে শিখেছেন তাই নবীন ক্ষুধাটি শিশু সাহিত্যের অনুকূল।

আর যাই হোক, শিশুসাহিত্যে আদিরসের ফোড়ন দেওয়া চলে না। বর্তমান বটতলায় শিশুসাহিত্যের দিগন্ত বিবর্তিত হয়েছে হয়ত সেই কারণেই। উপরন্তু এসব বইয়ের বেশির ভাগই ডিটেকটিভ বই। অজস্র সহস্র তার উৎপাদন—পাঠক সাধারণত কিশোর কিশোরী। 'কলেজ ষ্টুডেণ্ট' 'যুবক-যুবতীর জন্য' এই সব বই প্রকাশিত হয়ে সদ্যসাক্ষর কিশোরদের চাহিদা মেটাচ্ছে।

বটতলার লেখক সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বটতলায় লেখকরা কেউ স্বতন্ত্র পৃথক নয়। এদের মধ্যে নাটকের ক্ষেত্রে অবশ্য বটতলার নিজস্ব লেখক রয়েছে। তারা নামের পাশে ডিগ্রী (থাকলে অবশ্য) সহযোগে নাটক রচনা করেন এবং সাধারণত সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে যাতায়াত করেন না। এমনকি কলেজ স্ট্রীটে যেহেতু যাত্রার নাটক চলতি নয় তাই তাঁদের নামও কলেজ স্ট্রীটে শোনা যায় না। এখানে সন্দেহ হতে পারে বটতলার প্রাণবায়ু যাত্রার নাটকের ক্ষেত্রে কেন কলেজ স্ট্রীট লোলুপ হচ্ছে না। এর কারণ স্থানীয়। বটতলার নিকট-আত্মীয় সোনাগাছির কাছাকাছি যাবতীয় অপেরা পার্টির আয়োজন রয়েছে পূর্ব-বর্ণিত কারণে। এখন যে নাটক কোন অপেরা অভিনয় না করে তার বাজারদর মফঃস্বলে নেই। আর অপেরাকে 'যাত্রা' ধরাতে বটতলা স্থানীয় সুবিধাটা পেয়ে থাকে। কলেজ স্ট্রীটের ইণ্টেলেকচুয়াল প্রকাশকের পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়।

যাই হোক, বটতলায় নামী লেখকের বইও পাওয়া যাবে। সাধারণতঃ পাঠকের রুচি

হুজুগ নির্ভর। অতি সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের হুজুগ উঠেছিল। তখন কলেজ ষ্ট্রীটের বহু সাহিত্যিক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। এর পর শ্লীলতা-বিতর্কযুক্ত উপন্যাসের জোয়ার আসতেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাজার থিতিয়ে গেছে। এখন এমন কেউ যদি থাকেন যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছেন কিন্তু অশ্লীল উপন্যাস লিখতে নাক কুঁচকে ফেলছেন তার স্থান নেই কলেজ ষ্ট্রীটের যৌবন-বাসরে। বাধ্য হয়ে তাকে বটতলার আশ্রয় নিতে হয়। একদা বিখ্যাত এক ঔপন্যাসিক বর্তমানে এই ভাবেই বটতলাকে বরণ করে নিয়েছেন। বটতলা সাধারণতঃ কলকাতায় পরিচিত নামের লেখকের বই মফঃস্বলে নিয়ে বিক্রি করেন, এছাড়া কপিরাইটের দাম পড়তি লেখকের ক্ষেত্রে কম তাই বইয়ের দামও তারা কমিয়ে দেন। কুৎসিত মলাট, অস্পষ্ট মুদ্রণ, বাজে কাগজ ও বাঁধাইয়ের ফলে বইয়ের দাম তাদের কমাতেই হয়। বিয়ের উপহার দিতে যারা 'দুটাকা দামের উপন্যাস' কমিশনে কিনতে চান তারা এ ধরনেরই একদা নামী লেখকের কমদামী বই বটতলাতে পান। অর্থাৎ বটতলা, নামী লেখকের শেষ জীবনে 'হাঁড়ি চাপিয়ে' বই লেখার একমাত্র উপায় হিসেবে আজও বজায় রয়েছে।

সমকালীন বটতলাতে আমি অন্তত একটি সাহিত্য সম্রাটের সন্ধান পেয়েছি। বটতলার বর্তমান বাজারে অন্যতম হট্‌কেক রোমাঞ্চ সিরিজের রচয়িতা হিসেবে তার ছদ্মনাম সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর অক্টোপাশ-আক্রমণের হাত থেকে গোটা বটতলাই রেহাই পায় নি। এতদিন পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন বটতলা কোনদিনই সততার দাবী করেনি। সেক্সপীয়রের নামে তারা ডিক্সনারীও বিক্রি করেছে। কপিরাইট বাবদ লেখককে দাম দেওয়া দেশ-বিদেশের বটতলায় বোকামি বলেই ধরা হয়। লেখক ঠকানোই এ ব্যবসার গোড়ার কথা। ১৮২৯ সালের ১৫ই আগষ্ট সমাচার চন্দ্রিকায় এ ব্যাপারে প্রথম উল্লেখ পেয়েছি। বিজ্ঞাপন। চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্রকে প্রকাশ পত্রের দ্বারা আমরা সম্বাদ দিতেছি যে ১২৩৬ সালের গত ২৭শে শ্রাবণ তারিখের তিমির-নাশক নামক সমাচার পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে তিনি চন্দ্রকান্ত নামক পুস্তক কোন ব্যক্তির অনুমত্যনুসারে মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যোগী করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে জ্ঞাত করাইতেছি যে ঐ পুস্তকে আমারদিগের দ্বারা রচনা হইয়া এবং অর্থ ব্যয়ের দ্বারা বিক্রয়ার্থে ছাপা হইয়াছে এক্ষণে তাহার ৯০০ পুস্তক আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে, তাহা বিক্রয় হয় নাই। যদ্যপি তিনি ঐ চন্দ্রকান্ত পুস্তক পুনর্বার ছাপা করেন, তবে আমারদিগের ঐ প্রস্তুত পুস্তকের বিক্রয়ের নিশা তাঁহাকে করিতে হইবে এবং একের রচিত গ্রন্থ অন্যব্যক্তি তাহার অনভিমতে ছাপা করিলে তদ্বিষয়ের যে আইন নিরূপণ আছে তদনুসারে উচিত ফলপ্রাপ্ত হইবেন জ্ঞাপনমিতি তারিখ ২৬শে শ্রাবণ ১২৩৬ সাল। শ্রীদেবীচরণ প্রামাণিক। তবে চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গে অসততা সম্ভবত ভুল বোঝাবুঝি সঞ্জাত, কারণ এ বিজ্ঞাপন দেখে অপর পক্ষও চ্যালেঞ্জ করেন পরের সপ্তাহেই। পাঠকমহাশয়েরা জ্ঞাত থাকিবেন এবং জ্ঞাত কারণ লিখিতেছি যে ৪০৬ সংখ্যার চন্দ্রিকাতে যাহা প্রকাশ হয়। চন্দ্রকান্ত নামক গ্রন্থ তৃতীয়বার হইবার অস্তে কোন ব্যক্তির শৌর্য্যের দ্বারা অধৈর্য্য হইয়া আইন দর্শাইয়া স্বগুণ প্রকাশ করিয়াছেন যখন তিনি রিপ্রিণ্ট বাহির অর্থাৎ তৃতীয়বারে আপনি ছাপিয়াছেন তখন তাঁহার আইন দরিয়াপ্ত গুপ্ত ছিল। সে যাহা হউক, এক্ষণে জ্ঞাত হইয়াছেন কিন্তু যে ব্যক্তির অনুমতি

অনুসারে ছাপিতে আরম্ভ করিতেছি তিনি ঐ আইন বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন এবং আদি পশ্চাৎ নিবারণোদ্যোগ পত্র পাঠ মাত্র চমৎকৃত হইলাম।'

কপিরাইটের এই বটতলা সুলভ অসৎবৃত্তি আজও সমানে চলেছে বরং বেড়েছে। সমকালীন বটতলার প্রকাশকরা বলাবাহুল্য ম্লান হলেও অতীত স্বর্ণযুগের ব্যবসাদারদের বংশধর বা আজও ঐতিহাসিক আঙ্গিকে আকর্ষণীয় উপাদান। দুঃখের বিষয় এইসব বংশধরদের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। বলা বাহুল্য, এইসব বংশধরেরা আজ অনেকেই দুঃখের দীর্ঘশ্বাস সম্বল করে হাঁপাচ্ছেন। উপরন্তু তাঁদের পূর্বপুরুষেরাও বলবার মত অবশিষ্ট কিছুই রাখেন নি। সবচেয়ে অস্বস্তিজনক হল যে, সে-যুগের বিলাসপর্বটি আজকের দৃষ্টিতে কুৎসিৎ বিকৃতি মাত্র। সাক্ষাৎ নিতে গিয়ে আমরা প্রায়ই ধনী পূর্বপুরুষের কথা টানতে গেলেই এই ম্লান বংশধরেরা শামুকের মত খোলে লুকিয়ে পড়েছেন। তবু সাদামাটা ভাষায় বলা যেতে পারে স্বর্ণযুগের অবসান হতেই এরা বটতলার ব্যবসা তুলে দিয়েছিলেন, বিকৃত বিলাসের এলাহী খরচে এখন ঘড়ার জলও নিঃশেষ। শুধুই মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা সম্বল করে এঁরা খোঁয়াড়ি ভেঙ্গেছেন—উত্তর পুরুষের জন্য রেখে গেছেন হাহাকারের সুর। কয়েকজন যে এখনও বটতলার বইয়ের ব্যবসায় জড়িয়ে রয়েছেন সে কেবল আকস্মিক অন্যান্য সংঘটনবশতঃই। বটতলার একটি চালু 'পাঁজি'র উৎপাদক একদা ধনীর বংশধরেরা আজ কেবলই পঞ্জিকার ব্যবসাটা টিকিয়ে রেখে গেছেন। এঁদের মুখে অবশ্য পূর্বপুরুষের ধিক্কার নেই বরং দরিদ্র অথচ উদ্যোগী পূর্বপুরুষ কেমন করে হাওড়া ষ্টেশনে নিজহাতে পঞ্জিকা ফেরী করেছিলেন সেই পুরনো ঘিয়ের গন্ধ পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, পঞ্জিকাটি আজও দুগ্ধবতী গাভী বলেই এঁরা পূর্বপুরুষকে স্মরণ করছেন এবং দোকানে প্রতিষ্ঠাতার অয়েলপেন্টিং টাঙিয়ে ধুপ জ্বালিয়ে রেখে দিচ্ছেন।

নতুবা বটতলা যুগের বাবুপর্বে এই সব ব্যবসায়ীরাও মদ-মেয়ে-মাংস এর শিকারই হয়েছিলেন। ঘোড়ার ল্যাজে আতর গুঁজে এরা বেশ্যাবাড়ি যেতেন—বইয়ের ব্যবসা ছাড়াও তাঁদের সৎ অসৎ অন্যান্য বহু ব্যবসা ছিল—সাদা চামড়ার কৃপাদৃষ্টিতে সে-সব ব্যবসায় লাভও হত প্রচুর। তাই দিয়ে তাঁরা বাবুগিরির হদ্দমুদ্দ সাজতেন। বটতলার বই ব্যবসা বিকৃতি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে গেলে এইসব বংশধরদের সাক্ষাৎকার তাই প্রয়োজনীয়। কিন্তু ঘোষিত সাক্ষাৎকারের পন্থায় তাঁদের পাওয়া যাবে না স্বাভাবিক ভাবেই, তাই এদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্ব পাতিয়ে এই পুরনো তথ্য ইতিহাসের অন্ধকার গর্ভ থেকে বার করে আনতে হবে। বিশেষতঃ এ কাজ অবিলম্বে শুরু করা বাঞ্ছনীয়। ভ্রাতৃবিরোধ ঘরোয়া ঝগড়া আজ তাঁদের মামলার উপকূলে নিয়ে চলেছে। এর ফলে আর্থিক ক্ষতির চেয়ে সর্বনাশ হচ্ছে এদের মন থেকে পূর্বপুরুষের ইমেজ প্রসঙ্গে সমস্ত শ্রদ্ধা ক্রমশই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পূর্বপুরুষের তথ্য তাঁদের কাছে অনাবশ্যক অতিশয্যের স্তূপ। সেকথা জানতে গেলে তাঁরা মনে করেন তাঁদের বর্তমান দারিদ্র্যের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বড়জোড় পুরনো ইতিহাসের প্রতি অতিরিক্ত পুঁথিগত আগ্রহ। স্বভাবতই ময়নাতদন্তের শবব্যবচ্ছেদকারীকে কেউ আন্তরিকতা দিয়ে আহ্বান জানতে পারেন না।

তবু বলব পুরনো বটতলার এঁরাই বর্তমান জীবন্ত ক্ষীণ সূত্র। এঁরা যদি শুধু ধনী বা দরিদ্র

হতেন, সাংবাদিক বা গবেষকেরা তাতে অসুবিধা বোধ করতেন না কিন্তু এঁরা যে একদা ধনী 'বাবু'রই বংশধর এ অভিমানটা ভুলতে পারেন না, আবার বর্তমান দারিদ্র্যটাও অস্বীকার করতে পারেন না। বাঙালী একদা ধনী পরিবারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এঁরা দাম্ভিক ও নির্জন। এঁদের অভিমানের বরফ গলিয়ে কার্যোদ্ধার করার জন্য উৎসাহী গবেষকের প্রয়োজন রয়েছে আজও। বলে রাখা ভাল, এঁদের অনেকেই পূর্বপুরুষের অধঃপতনের কারণ হিসেবে চিৎপুর রোডের সঙ্গে বটতলার ব্যবসাকেও জড়িয়ে ফেলেছেন, ফলত এরা বিষাক্ত সর্পের মত বইয়ের ব্যবসা থেকে সর্বদা শত হস্তেন দূরে থাকেন। কেউ হয়ত অবাঙালী সওদাগর অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী কেউ হয়ত পিতৃপুরুষের দানে গড়ে ওঠা হাসপাতালেরই ডাক্তার। এমনি আরও কত বিচিত্র বৃত্তিতে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। সেই সব বংশধরদের খুঁজে বার করে দীর্ঘদিনের আন্তরিকতার উত্তাপে এই অভিমানের বরফ গলাতে হবে নয়ত সমকালীন বট-তলানির সবচেয়ে জরুরী অংশ থেকেই আমরা বঞ্চিত হব। বটতলার বর্তমান প্রকাশদের সম্পর্কেও দু-একটি কথা বলে রাখি। প্রাচীন যৌবন অবশেষ শুধু কড়া প্রসাধন করে বোন সতীনের যৌবনের সঙ্গে অক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে এঁরা সর্বদাই অতীতকে এড়িয়ে যেতে চান। এঁদের অতীতের সুদিনগুলোও দুর্গন্ধময় আত্মীয়ের ব্যভিচারপূর্ণ তাও তাঁদের অজানা নয়। সবচেয়ে বড় কথা জীবিত অবস্থায় কেউই মিশরের মমি সাজতে চান না। অশোভন কৌতূহল নিয়ে কেউ এগিয়ে এলেই এরা মনে করেন কলেজ ষ্ট্রীটের ছোকরা বুঝি মিউজিয়ামে এসেছে নিজের বংশতালিকা পড়তে। এক সুতীব্র বেদনা ও অভিমান নিয়ে তাঁরা ব্যবসার হাটে পঙ্গু প্রতিযোগিতা করছেন এবং হেরে যাচ্ছেন এই ব্যর্থবৃত্তি তাঁদের আরও ইনফিরিয়রটি কমপ্লেক্সে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

মানুষ যৌবনে যতই অভিজাত সম্ভ্রান্ত হোন না কেন আঁতুড় ঘরকে অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তাঁরা ইতিহাস সন্ধানের নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে হলুদ রঙের ফীচার লিখতে গিয়ে সাধারণত উগ্রতা, অশোভন প্রশ্ন এবং বটতলার অন্ধকার যৌন দিকটা নিয়েই বার বার আঘাত করেছেন এঁদের। ডঃ সুকুমার সেনের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু সাপ্তাহিক ফিচার লিখবার আগ্রহে যাঁরা এখানে এসেছেন তাঁরা ভবিষ্যতের আগন্তুকদের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে রেখে গেছেন। আমি বলছি না, বটতলার সব প্রকাশকের মানসিক অনুভূতি এই স্রোতবাহী অথবা গত দশকের সকল গবেষকই পাইকারী হারে এই ক্ষতি করেছেন কিন্তু দুপক্ষেরই ভুল বোঝাবুঝির ফলে আজ সম্পর্কটা হতাশাজনক হয়ে উঠেছে।

বস্তুতঃ আজকের জীবন যৌবনে একথা সুপ্রমাণিত বটতলা ও কলেজ ষ্ট্রীট ঘনিষ্ঠ আত্মার আত্মীয়, অতএব বটতলার প্রকাশকদের অহেতুক এই আড়ষ্টতা এবং অভিমান। বরং কলেজ ষ্ট্রীটের চটুল চঞ্চলতাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও মূলহীন—সেদিক দিয়ে বনেদী বটতলার ট্রাডিশন দস্তুরমত ঐতিহাসিক। এদিক দিয়েও প্রকাশকেরা গর্ববোধ করতে পারেন। আর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি গবেষকের সৌজন্যের অভিজ্ঞতায় তাঁরা যদি গুটিয়ে ফেলেন নিজেদের, তবে আগামী দিনের নিরপরাধীকেই হতাশ করা হবে। ঠিক কথা, ব্যবসায়িক নিরপেক্ষতায় ইনটারভিউ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ পূর্বপুরুষের ব্যভিচার আলোচনা করতে পরচর্চাপ্রিয় বাঙালীও অস্বস্তি

বোধ করে (তাই এ দোকানের কুৎসিত ইতিহাস ফোড়ন সহযোগে জানা যায় পাশের দোকানে) তবু বটতলা পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার আগে তাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় করে রাখার চেষ্টায় তাদের সহায়তা করা উচিত বোধকরি স্বীয় স্বার্থেই। গোটা উনবিংশ শতাব্দীর ধনী বাঙালী পরিবারমাত্রেই ব্যভিচার-পূর্ণ ইতিহাস প্রায় সর্বত্র। কারণ সে যুগের কালচারকে আমরা এযুগের বিচারে ব্যভিচারই বলি। সেখানে শুধু বটতলার পুরনো প্রকাশকের অহেতুক আড়ষ্টতায় কোন লাভ নেই।

বলা বাহুল্য, বটতলার বর্তমান সকল প্রকাশকই অ-সহযোগী মনোভাবে আচ্ছন্ন নন তবু বটতলার কয়েকটি ধনী দোকানের বংশ বা পরিবার যদি একটু উৎসাহী হন তবে হয়ত বটতলার আলোচনা সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। সাম্প্রতিক বটতলার কুণ্ঠিত ফসলের তল্লাস তদন্ত করতে গিয়ে এদের এই নির্মম আবেগহীনতা বড্ড কঠিন বাধা বলেই মনে হয়েছে। অথচ একথা অনস্বীকার্য ইতিহাস, পুরনো বই পুঁথি হাতড়ে যে তথ্য আমরা পাব তাতে যদি এদের সহযোগিতার ফোড়নটুকু না পড়ে তবে নিঃসন্দেহে আমাদের প্রয়াস 'জীবন্ত' হয়ে উঠবে বলা চলে না।*

* বটতলা সম্বন্ধে রচিত এই প্রবন্ধগুলোয় যাঁদের রচিত গ্রন্থ প্রবন্ধ ও মতামতের সাহায্য নিয়েছি সুবিধামত তা যথাস্থানেই উল্লেখ করেছি। কেবল গ্রন্থাগার হিসেবে সাহিত্য পরিষদ ও চৈতন্য লাইব্রেরীর অক্লান্ত সাহায্য স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করলাম। স্থানীয় প্রকাশক শ্রীরবীন শীলের সহযোগিতাও অনস্বীকার্য।

মধুসূদনের স্বাদেশিকতা

শ্রীমন্তকুমার জানা

স্বাদেশিকতা আধুনিক সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়। অবশ্য পূর্বে মধ্যযুগের সাহিত্যে এই জিনিসটি' যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল তা নয়। তবে সে সময় সামগ্রিক ভাবে মানুষের জীবনচর্চার সঙ্গে ইহা কোনো আদর্শগত বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি। না করার কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগে মানুষের ভৌমচেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জাগেনি এবং বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। ফলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের সহজ উপায় না থাকায় মানুষ সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মধ্যেই স্বদেশ তৈরী করেছে। পরে যখন কোনো দেশ যেকোনো ভাবে পরজাতির সংস্পর্শে এসেছে তখন তার স্বদেশ চেতনার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। য়্যাংলো, স্যাকসন, জুট প্রভৃতি জাতির সংস্পর্শে ইংলণ্ডে বৃহত্তর স্বদেশ চেতনার সূত্রপাত ঘটেছিল। গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপের দেশগুলিতে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয় তাতে দেশগুলি জীবনাদর্শের দিক থেকে বৃহত্তর মহিমা লাভ করে।

ভারতবর্ষের সভ্যতা বারে বারে পরজাতির সংস্পর্শে এসে পরিপুষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন জীবনাদর্শের সংমিশ্রণে তা জীবনীশক্তির পূর্ণতা পেয়েছে।—'হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন, | শক হুন দল, পাঠান মোগল | এক দেহে হল লীন।' চৈতন্য, দাদু ও কবীর প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদিগের দ্বারা ভারতীয় এই ঐক্যাদর্শ সমাজ জীবনে বেশ কার্যকরী ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে একে গ্রাস করে ফেলে অন্ধ আচার সংস্কার অনুশাসনের মরুবালি। এর মূলে বহু কারণ বর্তমান থাকলেও প্রধান হচ্ছে দুর্বল মোগল রাজশক্তি এবং সমাজ জীবনের জড়ত্ব। অতঃপর বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হলে ইংরেজ শাসনকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গহৃদয় থেকে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হল তা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ভারতবর্ষে। মোহিতলাল মজুমদারের এই উক্তি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—"উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ইতিহাস সারা ভারতবর্ষেরই ইতিহাস।'" ১

ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে আমাদের জীবনের পরিমণ্ডল ও মানসিকতার বিরাট পরিবর্তন আসে। আমরা বুঝতে পারলাম কোথায় আমাদের মহত্ত্ব, কোথায় আমাদের ত্রুটি। এই সক্রিয় জীবনবোধ থেকেই দেশকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সুরু হলো। দেশে স্থাপিত হল নানা প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীগণ এসবের মাধ্যমে দেশীয় ভাষা, ধর্ম ও নানা বিদ্যাচর্চার দ্বারা জনশিক্ষায় ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মে ব্রতী হন। প্রথমে এঁরা মনে করেছিলেন যে দেশের উন্নতির কাছে ইংরেজ হবে সহায়ক বন্ধু—তাই এদের নিকট ইংরেজ শাসন বিধাতার আশীর্বাদের ন্যায় মনে হয়েছিল।

কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল শাসক ইংরেজ 'ছোটো ইংরেজ'। তার কাছে আদর্শবাদ বলতে

জিনিসের মূল্য গৌণ। পরজাতি পীড়ন করে তাকে শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে হবে অর্থনৈতিক মুনাফা সংগ্রহের জন্য। এর ফলে অচিরেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তৈরী হল ভারতীয় মন সংগ্রামী চেতনায়।

বিদেশী শাসকাধীন দেশে প্রত্যেক মানুষের চিন্তায় ও কর্মে দেশচেতনা স্বভাবতঃই প্রবল থাকে। তাই ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে প্রত্যেক কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের স্বাদেশিকতাবোধ কমবেশী জাগ্রত ছিল।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে স্বাদেশিকতাবোধ প্রচারের ভোরের পাখী ঈশ্বর গুপ্ত। স্বাধীনতার স্পৃহা ও স্বদেশের উন্নতি ভাবনা তিনিই প্রথম কাব্যে সঞ্চারিত করেন। 'মাতৃভাষা', 'স্বদেশ', 'ভারতের অবস্থা', 'ভারতের ভাগ্য বিপ্লব', 'ভারত সন্তানগণের মাতৃভাষা', 'ভারতের দুর্দশা' প্রভৃতি কবিতাগুলি শুধু বাংলাসাহিত্যের নয়, বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম উদ্বোধন সংগীত বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাদেশিকতা জাতীয় ঐতিহ্যচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর রঙ্গলালের কবিতায় জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ ও পরাধীনতার গ্লানিজনিত শৌর্যবীর্যের উন্মাদনা ধ্বনিত হল। তাঁর—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়'—বহু পরিচিত কবিতা।

রঙ্গলালের পরই আষাঢ়ের মেঘমন্দ্রের ন্যায় বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব। সমকালীন জীবনে ও সাহিত্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতি মধুসূদন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা তাঁর অন্তরাত্মাকে তিক্তবিরক্ত করে তুলেছিল। সমকালীন জীবনে ও সাহিত্যে উচ্চআদর্শ না থাকায় বিদেশী ভাষা, সাহিত্য ও সমাজের প্রতি তিনি প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সাহিত্য সাধনার প্রারম্ভে ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ করলেও—এর জন্য পরে মধুসূদনের অনুশোচনার অন্ত ছিল না—'মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'। স্বদেশ-অন্তপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে ইংরাজীতে উপন্যাস রচনা করেন। এটা আর কিছুই নয়, সে-সময় ইংরাজীআনার বিদ্যুৎচমক সকলেরই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল—কিন্তু কবি সাহিত্যিকদের স্বপথে ফিরতে বেশি সময় লাগেনি।

মধুসূদনের দেশাত্মবোধ অকৃত্রিম ও গভীর। মধুসূদনের কাছে দেশ বলতে ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশ দুই-ই। 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নাটকে মধুসূদনের প্রথম দেশপ্রীতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমকালীন যাত্রাগানের কদর্যতা ও নাটকের দুরবস্থা মধুসূদনের চিত্তকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। অবাস্তব কাহিনী ও কুরুচিপূর্ণ নাট্যাভিনয়ের প্রভাব জাতীয়জীবনের অধঃপতনের কারণ একথা অবশ্য স্বীকার্য। মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভূমিকায় লেখেন।—

'শুনগো ভারতভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর, হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে, বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো জাগো বিভু স্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হক্ তব তনয় নিচয়।'

মধুসূদনের স্বদেশ প্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকে। ভারতের দুর্দশায় ভীমসিংহের খেদোক্তির মধ্যে সেকালীন বাঙ্গালী মনের কথাই প্রতিবিম্বিত।—

'(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে। এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলো, আমরা যে মনুষ্য কোনো মতেই তো এ বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারিনে। হায়! হায়! যেমন কোন লবনাম্বু তরঙ্গ কোনো সুমিষ্ট বারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবন দলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হতে কখনও অব্যাহতি পাবো।'

মধুসূদনের দেশাত্মবোধের পিছনে সক্রিয় ছিল একটা বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ। কোনো প্রকার জড় কুসংস্কারের বন্ধন, অন্ধবিশ্বাস ও ভক্তির আতিশয্যকে জীবনে যেমন তিনি সহ্য করতে পারেননি, অন্যদিকে তেমনি সমাজে মানুষের অনৈতিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে তার শাণিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপও বর্ষিত হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৫৯) নামক প্রহসনে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার ধারক ও বাহক নব্যবঙ্গীয়দের উৎকট সাহেবিয়ানার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা এবং 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯)-এ ধার্মিকতার ছদ্মবেশধারী প্রাচীনদের গোপন লাম্পট্যের যে পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন তা পরোক্ষভাবে মধুসূদনের বলিষ্ঠ জীবনাদর্শগত স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে।

১৮৬১ সালে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে আদ্যন্ত একটা বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত। এই বিদ্রোহ সমাজের সেই সমস্ত সংস্কার ও বন্ধনের বিরুদ্ধে যা মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মবিকাশের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিষ্ক্রিয় ও অবদমিত রাখে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশের পথ লক্ষ্মণকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের আক্ষেপ ও অন্তর্জ্বালাপূর্ণ প্রদীপ্ত ভাষণের মধ্যে গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে।—

'নিজগৃহ পথ তাত, দেখাও তস্করে?…
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভুঞ্জিব আহবে।"

রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে যা বলেছেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণ যোগ্য—

'মেঘনাদ বধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই।...ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সুক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মাল্যখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।'

'চতুর্দশপদী কবিতা বল'তে (১৮৬৬) মধুসূদনের দেশাত্মবোধ আরো ব্যাপক ও গভীর এবং আন্তরিকতায় প্রীতিস্নিগ্ধ। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পৌরাণিক মাহাত্ম্য, ঐতিহাসিক গৌরব, দেশের প্রাচীন কবি ও কাব্য, দেশের দেব দেবী, পালপার্বণ, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ঘটায় চতুর্দশপদীতে মধুসূদনের দেশাত্মবোধ একটা সামগ্রিক মর্যাদা পেয়েছে।

স্বদেশের প্রতি কবির অনুরাগের নিদর্শন পাওয়া যায় 'পরিচয়' কবিতায়। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুন্দর বর্ণনা দিয়ে মধুসূদন জানিয়েছেন যে এই দেশে তাঁর জন্ম।—

'যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বনে আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ;···
যে দেশে কুহরে পিক্ বসন্ত কাননে ;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতি ;—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-কাননে ;—
সে দেশে জনম মম।'

'ভারতভূমি' কবিতায় কবি ইতালীর সঙ্গে ভারতবর্ষের সাদৃশ্য জ্ঞাপন করে ভারতবর্ষের দুঃখের কারণ নির্ণয় করেছেন। ভারতবর্ষ ধনসম্পদে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী দেশ। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যই ভারতের দুঃখদুর্দশার কারণ। ঐশ্বর্যের লোভেই বিভিন্ন জাতি ভারতকে পদানত করার জন্য অগ্রসর হয়। ভারতের পরাধীনতার জন্য কবিহৃদয়ের বেদনা এই কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত। ভারতবাসী দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি বলে কবির ক্ষোভের অন্ত নেই—

'হায়লো ভারতভূমি! বৃথা স্বর্ণজলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ নয়নি,
বিধাতা? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, সতনি!
পাইস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি;...
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনী,
চন্দন হইল বিষ, সুধা তিত অতি?'

এই কবিতায় পরাধীনতার ফলে ভারতের যে অগৌরবের আভাস রয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়েছে 'আমরা' কবিতায়। প্রাচীন ভারত সভ্যতায় সংস্কৃতিতে ও বীর্যবলে গৌরবমণ্ডিত ছিল। বর্তমানে ভারতীয়েরা নিবীর্য। অতীত যুগের মহাশক্তিধর পূর্বপুরুষদের কোনো গুণেরই অধিকারী বর্তমান ভারত হতে পারেনি। ভারতবাসীর অধঃপতিত অবস্থা কবিকে অত্যন্ত পীড়িত ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।—

'আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণবলে
নির্ম্মিল মন্দির সারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কিহে আমরা সকলে?
আমরা দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে?
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?'

কিন্তু শুধু আক্ষেপ নয়, ভারতবর্ষ যে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করবে, মৃতকল্প ভারতবাসীরা যে পুনরায় নববলে বলীয়ান হয়ে উঠবে—এ আশা মধুসূদনের অন্তরে জাগরূক ছিল—

'রে কাল, পুরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রসশূন্য দেহ তুই? অমৃত আসারে
চেতাইবি মৃত কল্পে? পুনঃ কি হরষে
শুক্লকে ভারত-শিল্পী ভাতিবে সংসারে?

'সমাপ্তে' কবিতায় মধুসূদন বাগদেবীর নিকট তাঁর কবিকর্মের পরিচয়টুকু নির্মাল্যরূপে অর্পণ করে প্রার্থনা করেছেন যাতে তাঁর গৌরবান্বিত ও শ্রীসম্পন্ন হয়ে ওঠে।—

'এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে।'

মধুসূদনের অন্তিম প্রার্থনা বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ। নিজের সমস্তপ্রকার ভাবনা চিন্তা এমন কি তাঁর অতি প্রিয় আশা—অনির্বাণ কবিখ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে স্বদেশের মঙ্গল চিন্তাকে প্রধান করে রেখে গেছেন। অবশ্য এখানে বাংলা দেশের কথা থাকলেও সে বাংলা 'ভারত-রতন'—ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রদেশ নয়। তাই মধুসূদনের দেশপ্রেমে সঙ্কীর্ণতা বা স্থূলতা স্থান পায় নি। বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষকে একসঙ্গেই তিনি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৬ সালে আশ্বিন মাসে 'মহাজাতি সদনে'র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন—

'বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষীতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক,··· বাঙালীর বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না।'

মধুসূদনের 'সমাপ্তে' কবিতার উদ্ধৃতাংশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীই দৃঢ়সংবদ্ধ ও কাব্যশ্রী মণ্ডিত হয়ে রয়েছে—'জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে'।

১। 'বাংলার নবযুগ'

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

মৃণালিনী (মৃণা : ১।১) ॥
মৃণালিনী একজন শ্রেষ্ঠীর কন্যা। একদিন তিনি মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে যমুনায় জলবিহারে গিয়ে প্রবল জলবৃষ্টিতে নদীতে নিমজ্জিতা হন। তখন হেমচন্দ্র তাঁকে উদ্ধার করেন ও বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহ কথা গোপন থাকে। মৃণালিনী পুনরায় পিতৃগৃহে গিয়ে কুমারীভাবেই বসবাস করতে থাকেন। একদা হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের আঙটি দেখিয়ে মৃণালিনীকে পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে এসে তাঁর এক শিষ্যের বাড়িতে রাখেন। মাধবাচার্যের মৃণালিনীকে লুকিয়ে রাখার কারণ, দেশোদ্ধারের কাজে হেমচন্দ্রকে একাগ্র করা। কিন্তু মৃণালিনীকে সে গৃহ ত্যাগ করে আবার বেরিয়ে পড়তে হল। নবদ্বীপে এসে হেমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। অনেক বাধা বিপদের পর মিলন হল—হেমচন্দ্র মৃণালিনীর।

মৃণালিনীর জীবনে এমনি বহু ঘটনার ঘনঘটা। কিন্তু এত ঘটনা সত্ত্বেও চরিত্রটি সক্রিয় নয়, ঘটনার স্রোতে ভাসমান পদ্মমাত্র। মৃণালিনী চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল—স্বামীপ্রেম। হেমচন্দ্রের প্রতি গভীর ভালবাসার জন্যই তিনি সমস্ত দুঃখকষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করেছেন। এমনকি এই শান্ত নির্বিরোধ নারী, যখন তাঁর দৈহিক পবিত্রতা ব্যোমকেশের হাতে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে, তখন প্রবল শক্তি সঞ্চয় করে—'সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন।' মৃণালিনী হেমচন্দ্রের জন্য পথে বেরুলেন। কিন্তু সেই পথের চরিত্র জীবনসংগ্রামে ব্যক্তিত্বময় হয়ে ওঠেনি। গিরিজায়া নামক সঙ্গিনী চরিত্রটির পটুতায় মৃণালিনী অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মৃণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের অমূলক সন্দেহে, মৃণালিনীর মনে কোনও রাগ বা বিদ্বেষ দেখা দেয় নি। বরং গিরিজায়ার মুখে হেমচন্দ্রের বিরূপ আচরণের পরিচয় পেয়ে গিরিজায়াকেই দোষারোপ করেছেন। সবশেষে, নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে অশ্রুবর্ষণে শীর্ণা হয়েছেন। আবার হেমচন্দ্রের সামান্য আহ্বানেই তাঁর স্কন্ধে মাথা রেখে ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখেছেন।

এই চরিত্রটি সাধারণ পতিগতপ্রাণা বাঙালী নারীরূপে দেখা দিয়েছে। এই চরিত্রের নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করা হলেও, চরিত্রটি তেমন বিশিষ্টতা লাভ করতে পারেনি।

মৃন্ময় (সীতা : ১।৯) ॥
ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি ছিলেন রাজা সীতারাম রায়ের প্রধান সেনাপতি। তাঁর প্রকৃত নাম মৃন্ময় হলেও, 'মেনা হাতী' নামেই তিনি সম্যক পরিচিত। এরূপ নামকরণ হওয়ার কারণ—'মৃন্ময়' থেকে অপভ্রংশে 'মেনা' এবং হাতীর মত বলশালী বলে তাঁকে 'মেনাহাতী' বলা হত। বঙ্কিমও বলেছেন—'বলে ও সাহসে মৃন্ময়' সীতারামের সহায় ছিলেন। উপন্যাসে এই বীরযোদ্ধার নীরব আত্মদান লক্ষ্য করা যায়।

বটতলার নিধুবাবু

বৈশাখ সংখ্যা সমকালীনে শ্রীজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'বটতলার নিধুবাবু' শীর্ষক প্রবন্ধে নিধুবাবুর প্রাত্যহিক আড্ডাজীবন এবং সমসাময়িক কলিকাতার বাঙালী সমাজ তাঁর সাঙ্গীতিক প্রভাব ও সুখ্যাতির বর্ণনা করেছেন।—শোভাবাজারের আদি বটতলার আড্ডা যেটি 'পক্ষী'দের আড্ডা নামে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেই আড্ডার মধ্যমণি নিধুবাবু পক্ষীরাজ সম্মানে ভূষিত হয়ে পক্ষীরাজ্যে আধিপত্য করতেন। নিধুবাবুর অবিসংবাদী আধিপত্যের কারণ তিনি একে সঙ্গীতরসিক তায় আবার অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। সঙ্গীতের আসর এবং রসিক সংসর্গছাড়া তাঁর এক মুহূর্তও চলত না। আবার বাংলা সঙ্গীতে শোরি মিঞার টপ্পার অনুরূপ সঙ্গীতধারা তিনিই করেছিলেন। 'টপ্পা' নামে এই নতুন অনুপানের সাহায্যে বাংলা সঙ্গীতরসের একটা নতুন আস্বাদ বাঙালী রসিক সমাজে পরিবেশন করে সকলকে আপ্যায়িত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে টপ্পা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। একে নিধুবাবু সুকণ্ঠগায়ক তার ওপর তাঁর টপ্পাগানের গীতিকার তিনি নিজেই, বাংলা টপ্পা সঙ্গীতের আঙ্গিক ও শৈলীর প্রবক্তাও তিনি নিজে। অতএব তাঁর সৃষ্ট মধুর আকর্ষণে অনেক রসপিয়াসীই যে তাঁর কাছে ছুটে আসত তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 'নিধুবাবুর সঙ্গীত বিদ্যার অনুরাগ এবং নাম সম্ভ্রম উত্তমরূপে প্রকাশ হইলে বঙ্গদেশের নানান স্থান হইতে প্রধান প্রধান লোকেরা কলিকাতায় আগমন করত তাঁহার নাম শুনিয়া সমূহ সন্তোষ লাভ করিতেন। ইঁহারা তাবতে বাবুর নিকট আসিতেন কিন্তু বাবু প্রায় কখনোই কাহারো নিকট গমন করিতেন না।'

'Young men having a penchant for music clustered around him. Ramnidhi established a society composed mostly of young men for the cultivation of music.'

'আবার পরবর্তী যুগে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সাহচর্যে রামমোহন (রাজা রামমোহন রায়) বটতলায় সঙ্গীত আসরে এসেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব উপাচার্য উচ্ছবানন্দ বিদ্যাবাগীশের অনুরোধে রামনিধিবাবু একটি ব্রহ্ম সঙ্গীতও রচনা করিয়া শুনাইয়াছিলেন এবং এই সঙ্গীত রামমোহন রায়কে শুনাইবার ইচ্ছাও উচ্ছবানন্দ মহাশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।'

গরাণহাটা অঞ্চলের এক আটচলায় পূর্বকথিত পক্ষীদের আড্ডা ছিল। এই আড্ডার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন সভাপতি বাবু জয়চন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ মিশ্র, অনাথকৃষ্ণদেব আবার পরবর্তীকালে শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাগবাজার আটচলার নতুন পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। এই দুই আড্ডারই 'পক্ষীরাজ' ছিলেন নিধুবাবু। এঁকে কেন্দ্র করেই আটচালায় সঙ্গীত চর্চা হত। এই দুই আড্ডাতেই সঙ্গীত সম্বন্ধে নিধুবাবুর নানারকম পরীক্ষাকার্য চলত। এই পর্যন্ত নিধুবাবুর

সঙ্গীতজীবন ও সমকালীন বাঙালী ভদ্রসমাজে তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ তিনি নিজে গান রচনা করে গাইতেন এবং তাঁর অনেক মুগ্ধ ভক্তও ছিল। কিন্তু যখনই বলা হয় যে, বটতলার 'পক্ষী'দের প্রধান কাজই ছিল অহোরাত্র গাঁজা খাওয়া এবং এই গাঁজাখোরদের গুরু ছিলেন নিধুবাবু, তখনই আমাদের মন সংশয়াকুল না-হয়ে পারে না। আবার নিধুবাবুর পরিচয়ে তাঁকে শুধু গাঁজাখোরদের গুরু বলেই ইতি করা হয়নি। তাঁর গুরুগিরিকে বেশ রং চং করে লোকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, যেমন 'পক্ষী'র দলে ভর্তি হতে হলে, নিধুবাবুর কাছে গাঁজা খাওয়ার যথারীতি পরীক্ষা দিতে হত এবং বলা বাহুল্য পরীক্ষাটা হত গাঁজা খাওয়ার পরিমাণ সম্বন্ধে—অর্থাৎ দু-এক ছিলিম গাঁজাখোররা নিধুবাবুর কাছে পাশমার্ক পেত না। তাহলে ধরে নিতে হবে, নিধুবাবু নিজেও একজন প্রচণ্ড গঞ্জিকাসেবী ছিলেন। আর তাঁর বটতলার আড্ডায় এমনি গাঁজা খাওয়ার ধুম ছিল যে, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার সাহেব শেষে বটতলার আড্ডা তুলে দিতে বাধ্য হন। নিধুবাবুর সম্বন্ধে আরো প্রচার যে, তাঁর শ্রেষ্ঠ গান রচিত হত দেওয়ান মহানন্দ মহারাজের রক্ষিতা শ্রীমতীর গৃহে মত্তাবস্থায়। মত্তাবস্থায় বা গাঁজা খেয়ে 'বোম্' অবস্থায় নিধুবাবু সঙ্গীত রচনা করতেন একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। যে আড্ডায় গেলাসের পর গেলাস মদ চলছে বা যেখানে মুহুর্মুহু গাঁজার কলকে হাত বদল হচ্ছে, সেখানে নিধুবাবুর মতো সঙ্গীত সাধনার অবসর কোথায়, একথা কারো মনে কোনোদিন উদয় হয় নি। কারণ নিধুবাবুর রচিত গানের মধ্যে এমন অনেক গান আছে যেগুলি যথার্থ কাব্যসৌন্দর্যে মহৎ। সৌন্দর্যের নিবিড় অনুভূতি কাব্যে রূপ পায় কাব্যকারের সুস্থির সমাহিত হৃদয়বোধের মাধ্যমে। নিধুবাবুর জীবনস্বভাব ও সৃষ্টির মধ্যে যে অসঙ্গতি, সেটা কোনো জীবনীকারই তলিয়ে ভেবে দেখেন নি। ভেবে দেখেন নি যে, মাতালের অস্থিরচিত্ত বা গাঁজাখোরের মানসিক বিভ্রম সার্থক সৃষ্টির পক্ষে কখনোই সহায়ক নয়। নিধুবাবুর প্রাত্যহিক জীবন ও সৃষ্টির মধ্যে যে অসঙ্গতি, সেটা জীবনীকারদের চোখে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু না পড়বার কারণ নিধুবাবুর গীত রচনার মধ্যে যে সার্থক পরিচয় রয়েছে, সেটা কেউ বোঝবার চেষ্টাই করেন নি। অশ্লীল ও খেউড় গানের রচয়িতা নিধুবাবুর পরিচয়টাই খুঁজে নিয়েছেন, এবং এ হেন রচয়িতা সে মাতাল গাঁজাখোর হবে সেতো স্বতঃ সিদ্ধ। 'সময়ে স্নান ভোজন করে নিধুবাবু ৯৭ বছর বয়স পর্যন্ত সুস্থশরীরে বেঁচে ছিলেন এবং সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করেছিলেন।' একজন দুর্দান্ত মাতাল গাঁজাখোর ৯৭ বছর বাঁচে কী করে এবং সে লোক সময়ে স্নান ভোজন শয়নই বা করে কী করে এ কথাও কারো মনে হয়নি। সংবাদপ্রভাকরে নিধুবাবুর জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত গীতরত্নের প্রারম্ভে পুনর্মুদ্রিত করেন। তাতে জানা যায় যে, যদিও মৃত্যুকালে নিধুবাবুর বয়স ৯৬ বছর পার হয়ে গিয়েছিল তবু মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তাঁর মনের ও চক্ষু কর্ণের কোনো বৈলক্ষণ ঘটেনি। জীবনের শেষ কয়েকদিন তিনি নানাবিধ বাংলা ও ইংরেজী বই পড়ে সময় কাটাতেন। চিকিৎসাশাস্ত্র মতে অতিরিক্ত মদ গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে মানুষের দেহ অল্পদিনেই জীর্ণ হয় এবং পরে স্নায়বিক বৈকল্য উপস্থিত হয় বোধবুদ্ধি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব নিধুবাবুর ক্ষেত্রে কি এই প্রমাণ হয় না যে, তাঁর অপরিমিত মদ গাঁজা সেবনের যে দুর্নাম তা কেবল

জনশ্রুতি ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ নিধুবাবুর স্বাস্থ্যশক্তি, মননশক্তি ও সাধনশক্তি বিষয়ে পর্যালোচনা করলে, তাঁর দুর্নাম অহেতুক বলে মানতেই হবে। ছাপরায় তাঁর জীবনের কয়েক বছর বিচার করলে দেখা যাবে যে, তিনি একজন সৎ ও নির্লোভ পুরুষ ছিলেন। কালেক্টারের দেওয়ানীর পদের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে ঐ পদের দাবী তিনি ত্যাগ করে সামান্য কেরানীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। উপরি উপার্জনের কুপরামর্শের জন্য ঐ কালেক্টারের সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হওয়ায় তিনি কাজে ইস্তফা দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। তিনি যে গভীর ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন তার পরিচয়ও তাঁর ছাপরার জীবনের মধ্যেই পাওয়া যায়। দক্ষিণদেশীয় সাধক ভিখন্‌রাম-এর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করে অনেক সময় সাধনভজনও করতেন। ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি পরে 'পরমব্রহ্ম তৎপরাৎপর পরমেশ্বর নিরঞ্জন নিরাময় নির্বিশেষে সদাশ্রয়, আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বাধর—ব্রহ্মসঙ্গীতটি রচনা করতে পেরেছিলেন। এই ধরনের সঙ্গীত একান্ত ঈশ্বরপ্রেমী ছাড়া কারো পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। নিধুবাবুর মতো এরকম স্রষ্টা সাধকের নামে এত কলঙ্কের কারণ কি? কারণ আর কিছু নয়, শুধু জীবনীকাররা আসল নিধুবাবু মানুষটিকে কেউ দেখেন নি। কতকগুলো নেশাখোর মানুষের ভিড়ের মধ্যে মজলিস প্রিয় এই সুকণ্ঠ গায়ককে দূর থেকে দেখেই, তাঁর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে একটা হীন ধারণা করে ফেলেছিলেন। একথা কেউ ভেবে দেখেন নি যে, নিধুবাবু যদি এমন হীনস্বভাবের লোক হতেন এবং সব সময় নীচ সংসর্গে মেতে থাকতেন তাহলে আচার্য উচ্ছবানন্দের মতো ধার্মিক মানুষ তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মালোচনা করতে বসতেন না। শুধু তাই নয়, রাজা রামমোহন রায়ের মতো ধর্মপ্রচারক সমাজসংস্কারক লোকও বটতলার আসরে এসে নিধুবাবুর সঙ্গীতসুধা পান করতেও কুণ্ঠিত হন নি। রামমোহন রায় নিশ্চয়ই নিধুবাবুর কাছে অশ্লীল খেউড় গান শুনতে আসতেন না। এ কথাও প্রকাশ যে, নিধুবাবুর সমসাময়িক স্বনামধন্য বহু লোকই বটতলার আসরে তাঁর গান শুনতে আসতেন, তিনি কারো বাড়িতে যেতেন না। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, হয় নিধুবাবুর গাঁজার আড্ডায় এই সব ভদ্রলোকদের যাতায়াতের প্রচার নিতান্তই মনগড়া, নয়তো নিধুবাবুর গাঁজাখোর দুর্নাম বিশেষ রকমের অপপ্রচার। দুটি ব্যাপার একসঙ্গে কিছুতেই সত্য নয়। নিধুবাবুর দুর্নাম তিনি নাকি কেবল অজস্র অশ্লীল গান রচনা করে হীনরুচির লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করতেন। তাঁর জীবদ্দশায় এ দুর্নাম তো ছিলই মৃত্যুর পরে এ দুর্নাম বহুল প্রচারিত হয়ে সাহিত্য সমাজে তিনি একঘরে হয়েছিলেন। এখনও সাহিত্য সমাজে তিনি অন্ত্যজ হয়েই আছেন। তখনকার লোকের ধারণা ছিল টপ্পাগান মানেই আদিরসাত্মক গান। সেই ভুল ধারণা আজও ঠিক তেমনি আছে। এরকম ধারণার কারণ কবির দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে লেখে, এক একজন জাতক গ্রহবৈগুণ্য নিয়েই জন্মায়। নিধুবাবুও ঠিক ঐ ধরনের জাতক। তিনি যত গান রচনা করেছিলেন তার মধ্যে কালের প্রভাবানুযায়ী দু-একটা আদিরসাত্মক থাকলেও সবগুলিই যে ঐ জাতের তার প্রমাণ নেই। নিধুবাবুর জীবদ্দশায় যে গীতরত্ন পুস্তক মুদ্রিত হয়, সেইটির তৃতীয় সংস্করণ তাঁর পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত প্রকাশ করেন। জয়গোপাল গুপ্ত ঐ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখছেন: 'কবিবর ১২৪৪ সালে তাঁহার রচিত গীতগুলি গীতরত্ন নাম

দিয়া প্রথমবার মুদ্রিত করেন।—বর্তমান সংস্করণে উক্ত প্রথম মুদ্রাঙ্কন উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করা হইতেছে। এই সংস্করণের সহিত প্রথম সংস্করণের অবিকল মিল আছে, পত্রাঙ্কও প্রায় একরূপ। কেবল ইহাতে নিধুবাবুর কিঞ্চিত জীবনী, সাতটি আখড়াই সংগীত, একটি ব্রহ্মসংগীত একটি শ্যামা বিষয়ক গীত ও একটি বাণীবন্দনা বেশি দেওয়া হইয়াছে।' তাহলে দেখা যাচ্ছে, নিধুবাবু শ্যামা সংগীত, বাণী বন্দনা এবং ব্রহ্ম সংগীতও রচনা করে সুরে তালে গান করতেন। তাঁর এই সব গানের প্রচার না হয়ে দু-চারটি খেউড় গান নিয়ে মাতামাতি হয়েছে। এর কারণ মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে। ভালো জিনিস সহজে কেউ গ্রহণ করে না। নিধুবাবুর উচ্চস্তরের রচনাগুলি সম্বন্ধে কারো আগ্রহ দেখা যায় না। কেবল তাঁর আদিরসাত্মক কয়েকটি গান বাছাই করে, তাঁকে নিন্দা করবার উপায় খুঁজে নেয়া হয়েছে। বটতলা থেকে ১২৫৭ সালে বনমালী ভট্টাচার্য গীতরত্নের আর একটি তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেটা নাকি বিশেষরূপে সংশোধিত। বইখানায় অনেকগুলি আদিরসাত্মক গান আছে, তার মধ্যে অনেকগুলি আসল গীতরত্নের নয়, অন্য বই থেকে নেয়া এবং আরো অনেক বইয়ের টপ্পা নিধুবাবুর রচিত বলে সংস্করণের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে অপরের পাপ নিধুবাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে নিধুবাবু সেকালের এবং একালের সাহিত্য পাঠক সমাজে অন্ত্যজ বলে দাগা হয়ে গেলেন। সাহিত্য সন্ধিৎসা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে নিধুবাবুর অন্ত্যজ দুর্দশা স্খলন হবে নিশ্চয়। ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রমাণ নিধুবাবুর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে। সেগুলি খুঁজে খুঁজে আমাদের পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরা উচিত। নিধুবাবুর টপ্পা সংগীত রচনার মধ্যে যে কাব্যমন ও কাব্যইচ্ছা অন্তর্নিহিত, সেটিকে আমাদের খুঁজে নিতে হবে। তা করতে পারলেই আমরা নিধুবাবুর প্রতি অবিচারের পাপ থেকে মুক্ত হব। নিধুবাবুর টপ্পা গানের কয়েকটি অশ্লীল তা স্বীকার করতেই হবে। তবে এইসব অশ্লীল রচনার কারণ যুগের হাওয়া। নিধুবাবু যখন টপ্পাগান রচনা করে গাইতে আরম্ভ করেন তখন একদিকে ভারতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে কবিগানের পূর্ণ গৌরব ও সমৃদ্ধির সময়। নিধুবাবু তখন উনিশ-কুড়ি বছরের যুবকমাত্র। ভারতচন্দ্রের নাম ও প্রভাবের মধ্যেই তাঁর জন্ম ও শিক্ষা।এই প্রভাবের জের চন্দ্রকান্ত, কামিনীকুমার, প্রভৃতি বিদ্যাসুন্দর ধরনের বিকৃত রুচির কাব্যের ভেতর দিয়ে ইংরেজী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মদনমোহন বাসবদত্তায় প্রকটিত দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে রাসু, নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, হরু ঠাকুর, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির মতো পুরাতন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালারা সকলেই নিধুবাবুর সমসাময়িক। ইহাদের কবিগান অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট ছিল না যদিও তবে পরবর্তিকালে মানুষের রুচি পরিবর্তনের ফলে একশ্রেণীর অর্বাচীন কবিয়ালের হাতে পড়ে কবিগান অশ্লীল গানের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। কবিগানই পরে খেউড়রূপ নিয়ে এক শ্রেণীর ইতর রুচির লোকের আসর জমায়। একদিকে বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ, অন্যদিকে খেউড় জাতীয় কবিগান ইত্যাদির কোনো দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে নিধুবাবু হিন্দী খেয়াল টপ্পা ভেঙ্গে বাংলায় নতুন ধরনের প্রেম সঙ্গীত রচনা করতে আরম্ভ করলেন। তখনকার দিনে ভারতচন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে, কবিগান রচনা না করে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গান রচনা করা কম শক্তির পরিচায়ক নয়। তখনকার গীতিসাহিত্যে নিধুবাবু

সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র পথাবলম্বী। তাঁর গানগুলোর বেশির ভাগই প্রেম সংগীত। তাঁর প্রেম সংগীতে পাশ্চাত্ত্য 'প্লেটনিক' প্রেমের অনুভবই বেশি প্রবল। কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি, ভালোবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করেছেন এক নতুন ভঙ্গীতে। নিধুবাবুর পূর্বসূরীরা কাব্য রচনায় বহির্জগতের বিষয় বর্ণনায় ব্যস্ত থাকতেন। নিজের অনুভূতি বা অন্তর্জগতের কথা প্রায় বলেন নি কোথাও। আধুনিক সাহিত্য মোটমাট অন্তর্জগত নিয়ে। নিজের ভাব-অনুভূতির সাহায্যে অপরের অনুভূতির সহৃদয় বর্ণনা। প্রাচীন কবি গীতিকারদের মধ্যে নিধুবাবুকে এ বিষয়ে পথিকৃৎও বলা যায়।

গীতরত্নের সমস্ত গান অনবদ্য না-হলেও আধুনিককালে যেভাবে উপেক্ষিত ও অনাদৃত মনে হয়, সেরকম উপেক্ষা ও অনাদরের কারণ খুব যুক্তিসহ নয়। দুঃখের বিষয় নিধুবাবুর মতো একজন শক্তিশালী কবির সম্বন্ধে একালে কোনো সাহিত্য রসিকই উৎসাহী নন। দু-একজন সমালোচক অকুণ্ঠ সুখ্যাতি করলেও নিধুবাবুর গান ও নামের সঙ্গে একটা কালক্রমাগত অখ্যাতি জড়িয়ে গেছে। ফলে সকলেই—অনেকেই না পড়েই—নিধুবাবুর রচনা অতি নীচশ্রেণীর বলে পাশ কাটিয়ে যান। এই রকম ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কৈলাশচন্দ্র ঘোষ 'বাংলা সাহিত্যে' (১২৯৯) নামক বইতে লিখেছেন—'ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট। আরো নির্দয় সমালোচনা করেছিলেন 'উদভ্রান্ত প্রেম' প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখলেন—'এ সকল সংগীতে যে প্রেমের আদর্শ তাহা কুৎসিৎ অসংযত ইন্দ্রিয় লালসার নামান্তর মাত্র।' অবশ্য একথা বলা যায় না যে, নিধুবাবুর গানে অশ্লীলতা নেই; এখনকার রুচির নিরিখে বিচার করলে কতকগুলো গান রুচিবিরুদ্ধই মনে হবে। কিন্তু আজকের আর সেকালের রুচির যে পার্থক্য হবে তার মধ্যে তো আশ্চর্যের কিছু নেই। একালের কবিদের রচনার মধ্যে খুঁজলে অনেক অশ্লীল রচনাই বেরিয়ে পড়বে। কেবল প্রকাশভঙ্গীর হের ফের মার্জিত আর অমার্জিত বলে বিচার করা বই নয়। এসব তর্ক ছেড়ে দিলেও নিধুবাবুর গীত রচনায় অশ্লীলতা খুব বেশি নয়। দু-একটি টপ্পা, কয়েকটি হাফ আখড়াই ও খেউড় গান বাদ দিলে তাঁর গানের রুচি সর্বত্র সঙ্গত ও শুদ্ধই বলা যায়। তাঁর গানের মধ্যে ভোগ অপেক্ষা আত্মসমর্পণের কথাই মুখ্য। নিধুবাবুর গান এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, তাঁর নামের দোহাই দিয়ে অতি জঘন্য গানও 'নিধুবাবুর টপ্পা' বলে চলে গিয়েছিল। সেইজন্যেই বোধ হয় নিধুবাবুর গানের এত অশ্লীলতা অপবাদ। যেহেতু নিধুবাবু বাংলা টপ্পাগানের স্রষ্টা, সেইহেতু যার যত টপ্পা নামধারী অপসৃষ্টি সবই নিধুবাবুর পাপ। নিধুবাবুর এই অহেতুক পাপী দুর্নাম থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব আজকালকার সাহিত্য গবেষকদেরই গ্রহণ করতে হব।

নিধুবাবুর রচনায় বিশেষ সূক্ষ্ম কারুকার্য না থাকলেও ভাষার লালিত্য স্পষ্টতা, সুর লয়ের পারিপাট্য, ভাবের কোমলতা গভীরতাকে স্বীকার করতেই হবে। শব্দের ছটা, ছন্দোবৈচিত্র্য, অলঙ্কারাদির প্রাচুর্য নেই সত্যি, তবু অল্প কথায় স্বভাবকবির প্রাণের আবেগকে অতি সহজ কথায় গেঁথে সুরে বেঁধে প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন গীতিকারদের মতো শুধু সখীসংবাদ, মান বিচ্ছেদ, মিলনের কথা নয়, তাঁর মনের বীণায় কোমল স্পর্শে যে শত সহস্র ভাবের তরঙ্গ ওঠে, তারই

প্রতিধ্বনি নিধুবাবুর গানের মধ্যে শোনা যায়। প্রাচীন অনেক কবিই প্রেমের অনেক গান গেয়েছেন কিন্তু গানকে নিধুবাবুর মতো এমন সুর তালে ঝঙ্কৃত করে কেউ বোধ হয় শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন নি। গায়ক ও গীতিকারের সহমর্মীতাই নিধুবাবুর গানকে বিশিষ্টরূপ দিয়েছে। দু-একটা গান এখানে তুলে দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হতে পারে।—যেমন,

পীরিতি না জানে সখী সেজন সুখী বল কেমনে।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে॥

মানব হৃদয়ের প্রেমের ঔজ্জ্বল্য সামান্য দু-একটি কথায় কী সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রেম মুগ্ধ কবি প্রেমের কথা বলতে গিয়ে আত্মহারা :

পীরিতির গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয় শরীর শিহরে॥

যে প্রেম জানে না সে সুখীও নয় দুঃখীও নয়। জীবন তার কাছে স্বাদহীন। প্রেমের সুখ দুঃখই তো জীবনের সার অনুভূতি :

নহে সুখী নহে দুঃখী প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুঃখী সেই সখী এ রস যে জানে।

যুগধর্মানুযায়ী নিধুবাবুর কবিতায় প্রেম দেহবাদী হয়ে উঠলেও এর ব্যতিক্রমও অনেক পাওয়া যাবে। তাঁর প্রেম বাহ্যত দেহ আশ্রয় করে থাকলেও আবার দেহকে ছাড়িয়ে গেছে। কবির অনুভব অনুসারে প্রেমের জন্ম আগে সাকার দর্শনে, পরে সেই প্রেমই অনুভবে অন্তর্লীন হয়—অর্থাৎ নিরাকার চৈতন্যের আনন্দলোকে। আবার :

মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে নাহলে মন মিলন॥

প্রেমাস্পদের দর্শনে যে আকর্ষণের সৃষ্টি হয়, সেই আকর্ষণই চাক্ষুষ পরিচয়ের চেয়ে আরো এক নিবিড় পরিচয়ে নিয়ে যায়—সে পরিচয় হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের পরিচয়। সেক্সপিয়ার বলেছেন, প্রেমের প্রথম জন্ম চোখের নেশায়। সেই জন্যে রূপের দর্শন ও আঁখির মিলন হচ্ছে প্রেমের প্রস্তুতিকাল বা পর্ব। যথার্থ প্রেমিক যে, সে এই প্রথম পর্যায়কে অতিক্রম করে এমন এক স্তরে পৌঁছান, সেটা প্রেমের স্বর্গালোক। এই স্বর্গালোকের আনন্দস্বাদ উপভোগই কবির লক্ষ্য। তাই কবি বলছেন :

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
(সেইজন্যে)···দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

নিজের স্বার্থবোধকে প্রেমের কাছে উৎসর্গ করবার এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ বোধ হয় খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রেমের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ, অপবাদ লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেও যে প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে, নিধুবাবুর কাছে সেই প্রেমই হচ্ছে অকৃত্রিম—খাঁটি সোনা। প্রেমের এই অতীন্দ্রিয় প্রকাশের জন্যে নিধুবাবুর কবিমন উদ্বেল হয়ে থাকে। তারই চিহ্ন তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার

কোনো না কোনো পংক্তিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সেটা আমাদের চোখে সহজে পড়ে না। এর জন্যে আমাদের আধুনিক পরিবর্তিত শ্লীলতাবোধই দায়ী। আমরা নিধুবাবুর কবিতায় সখী, মজালে, লো, পিরীতি ইত্যাদি অপ্রচলিত শব্দ দেখেই নাক সিঁটকাই। কিন্তু একালে আমাদের 'আধুনিক কবিতার' মধ্যে এমন অনেক কুৎসিৎ কদর্য শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, যেগুলো নিধুবাবুর কালের খেউড় গান রচয়িতারাও ব্যবহার করতে লজ্জাবোধ করতেন। যাক সে তর্কের কথা! মোটকথা নিধুবাবুর সমসাময়িক অনেক সমালোচক যেমন তাঁর রচনার মর্মে প্রবেশ না করেই নিধুবাবুকে অশ্লীল গানের গুরু বলে নিন্দা করেছেন, আমরাও ঠিক তেমনি করছি। নিধুবাবুর গান ভদ্রজনের অশ্রাব্য ও গানগুলির কাব্যাংশ অপাঠ্য বলে রায় দিয়ে বসে আছি। নিঃসন্দেহে ভুল হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের খাতিরেই পুনর্বিচারের জন্যে সাহিত্য বিচারকদের তৎপর হওয়া উচিত বলে মনে করি।

বিদ্যুৎ মৈত্র

প্রমথ চৌধুরী (জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি | অশোক কুণ্ডু | ভারতী বুক ষ্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি : ৯ | মূল্য—১·৫০ |

খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হল তাঁদের সাহিত্য পাঠ ও সাহিত্যের আলোচনা। প্রমথ চৌধুরী তথা বীরবলের শতবার্ষিকী লগ্ন প্রায় সমাসন্ন (জন্ম ৭ই আগষ্ট ১৮৬৮)। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একটি সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশ শ্রীঅশোক কুণ্ডুই করেছেন। সে হিসাবে বাঙালী সাহিত্য-পাঠকদের তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বর্তমানে প্রমথ চৌধুরীর পাঠকের সংখ্যা সীমিত হলেও এককালে নিজ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে এবং রচনার চমৎকারিত্বে, বর্ণনারীতির নতুনত্বে তিনি বাংলা সাহিত্যে চমক সৃষ্টি করেছিলেন। সেই বিশিষ্টতার বড়ো সার্টিফিকেট দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর কাছে নিজ ঋণ স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু গতানুগতিকতার দায় এড়াবার জন্য যেমন নিন্দার দিকটি খুঁটিয়ে বের করা হয়, তেমনি সম্প্রতি প্রকাশিত 'কলকাতা' পত্রিকায় সুধীর রায়চৌধুরীর 'বীরবল ও বাবু বাঙলা' প্রবন্ধে বলেছেন—'বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রমথ চৌধুরীর কোন প্রভাব নেই—না গদ্য রীতিতে, না বিষয়বস্তুতে। এমন কি চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ রূপেও পার্থক্য আছে।' এত সহজে যদি কারো ঋণ অস্বীকার করা যেত তাহলে অনেক সমস্যারই সমাধান হত। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রমথ চৌধুরীর ঋণ স্বীকার করেছেন, তেমনি প্রমথ চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করেননি। অর্থাৎ বিশেষ একটা সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর যুক্ত প্রচেষ্টা বাঙলা সাহিত্যে ফলপ্রসূ হয়েছিল। 'সবুজপত্র' পত্রিকা বাঙলাভাষা ও সাহিত্যে একটা গতি আনতে সমর্থ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথচৌধুরীর লেখার দ্বারাই। এই দুটি বিষয়ের ইতিহাস সহৃদয়তার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে, বর্তমান গ্রন্থের 'প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র' প্রবন্ধে।

এছাড়াও 'প্রমথজীবনী', 'প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকৃতি', 'বাংলা চলিত গদ্যরীতির বিবর্তনে প্রমথ চৌধুরীর অবদান', 'প্রমথ চৌধুরী শতবর্ষের আলোকে', গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতির দ্বারা প্রমথ চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচিত হয়েছে। আলোচনার ভঙ্গি অত্যন্ত সরল। পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোন চেষ্টা নেই। তবে 'সাহিত্যকৃতি' অধ্যায়ে সনেটের যেমন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের আলোচনা সে অনুপাতে অনেক সংক্ষিপ্ত। প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ ও ছোটগল্পের বিস্তারিত আলোচনা করলে, বিষয়টি আরও আকর্ষণীয় হত।

অনিমেষ রায়চৌধুরী

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিমার্জনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 August '68 (0·50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

ষোড়শ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৭৫

সমকালীন

রূপে
রসে
গন্ধে
ভরা
সুন্দর মিষ্টি গন্ধ
আপনার মন ভরে
দেবে সহজ খুসীর
স্নিগ্ধ আনন্দে।
Basant Malati
বসন্ত মালতী
সি কে সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

ষোড়শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বাঙলার শিল্প

অসিতকুমার হালদার

এই বাঙলাদেশ ভারতবর্ষের বিবিধ প্রাদেশিকতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে নিজের শ্যামলতা, স্নিগ্ধচ্ছায়া ও বিচিত্র রসসৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে ভারতের একপ্রান্তে আপনার আসনখানিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমরা যখন এই বাঙলার বাইরের দিকে চেয়ে দেখি, তখন কেমন একটা নীরস কাঠখোট্টার ভাব···কোথাও উঁচু-উঁচু কালো-কর্কশ পাথরের জমাট পাহাড়ে, কোথাও বা তামাটে ঘাসে ধরণীর জীবন-রহস্যকে লোপ পাইয়ে দেবার চেষ্টা করেছে বলে মনে হয়। আমাদের বাঙলার শিল্পের মধ্যেও এমন একটি অন্তর্নিহিত রস ও স্নিগ্ধতা আছে, যার পরিচয় মোগল, কাঙড়া বা রাজপুত কোনো জাতীয় শিল্পের মধ্যেই পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়—দেশের এই আবহাওয়ার সঙ্গে শিল্পের বা কাব্যেরও একটি যোগ আছে। বঙ্গলক্ষ্মীর শ্যামল ক্রোড়ে যে সকল মানব-শিশু জন্মান, তাঁরা তাঁরই অনুরূপ কোমলতা এবং স্নিগ্ধতা-প্রাপ্ত হন। আমাদের দেশে কবি এবং শিল্পীদের মধ্যে সেই কারণেই বোধহয় এইরূপ ভাবপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের প্রাচীন কাঠের পাটায় আঁকা পোটোদের চিত্র দেখলে বোঝা যায় যে তাতে মোগল প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের শিল্পীদের মতো বর্ণযোজনা বা রেখার সহজ ও সরল গতির অভাব নেই। অজন্তা প্রভৃতি জগত বিখ্যাত প্রাচীন চিত্রশিল্পের রেখা ও বর্ণের মতোই বাঙলার চিত্রের রঙ ও রেখা সরল ও লাবণ্য পরিপূর্ণ। আধুনিক যুগেও আমাদের দেশে এইরূপ অঙ্কন-রীতির প্রচলন একেবারেই নেই বললে—ভুল বলা হয়। কেন না, বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষার গৌরবাভিমানীদের চক্ষুর অন্তরালে কলকাতা সহরের একপ্রান্তে কালীঘাটে এখনও সেইরূপ পদ্ধতিতে আঁকার প্রচলন আছে। তবে দুঃখের বিষয় সেই সকল শিল্পীদের পরিণাম বা পরিণতির

দিকে আমাদের শিক্ষিত-সমাজের কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। এমনকি, কালীঘাটের পটের উপর এরূপ অশ্রদ্ধা যে ভদ্র-সমাজে নাম উল্লেখ করাও রুচি-বহির্ভূত।

বহু বৎসর থেকে—মোগল-রাজ্যের তিরোধানের অব্যবহিত পরে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য-শিল্পের একটা প্রভাব চলে আসছিল, তার মধ্যেও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবে দুঃখীদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে বঙ্গ-শিল্প এখনও যে জীবনীশক্তির পরিচয় দিচ্ছে, তা' পরম আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই'।

আমরা পূর্বে অপরাপর প্রবন্ধে অনেকবার বলেছি এবং এখনও বলছি যে আমাদের শিল্পের অবনতির কারণ—বিদেশী শিক্ষা। আমাদের পটুয়ারা সৌভাগ্যক্রমে এই বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়নি বলেই এখনও পর্যন্ত একভাবেই দেশী ধরণটি বজায় রেখে পট এঁকে আসছে। অবশ্য এইসব শিল্পীদের উন্নতি বা অবনতির কোনোই তারতম্য লক্ষিত হয়নি। আমাদের এই শিল্পীদের ক্রমবিকাশের শক্তি জাগিয়ে তোলবার দিকে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। দেশীয় সাহিত্যই দেশীয় শিল্পের প্রধান সহায়। আমরা আশৈশব ইংরেজী শিশুপাঠ্য পুস্তকে, বিদেশী চিত্র-পুস্তকে, বিদেশী শিল্পের রূপ দেখতে দেখতে চোখ বিগড়ে ফেলি · বিদেশী শিল্পের গৌরবের কথা শুনতে শুনতে মনও দেশের দিক থেকে বেঁকে বসে। সুতরাং তারই ফলে, আমাদের মানস-লক্ষ্মী বিদেশী মানস-প্রতিমার হুবহু প্রতিরূপে প্রকাশিত না হলেও একটি বিকৃত-রূপে ধরা দেয়। আমরা যখন ছেলেবেলা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চোদ্দ বৎসর কাল যান্ত্রিক নিয়মে ইংরেজী শিক্ষা করে প্রথম সংস্কৃত-সাহিত্যের পথ দিয়ে দেশী-ভাবরাজ্যে প্রবেশলাভ করার অধিকার পাই, তখন আমাদের মানসপটে বিদেশী মানস-লক্ষ্মীর ছবি এরূপ প্রবল হয়ে জেঁকে বসে যে এমন কি, 'মেঘদূতের' কবি বর্ণিত বিরহিণীর—

'তন্বী শ্যামাশিখরিদশনাপক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।
মধ্যে ক্ষামাচকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ॥
শ্রোণীভারাদ্‌অলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাম্।
যা তত্রস্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টির্বাদ্যেব ধাতুঃ॥'

এই রূপটি ভিনাসের মূর্তির উপর হাল-ফ্যাশানের কাপড়-পরা একটি আধুনিক বিরহবিধুর রমণী-মূর্তি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আমাদের যদি অজন্তা প্রভৃতির প্রাচীন চিত্র, বরভূধরের মূর্তি প্রভৃতি দেশীয় শিল্পের সহিত বিদেশী ভিনাসের ন্যায় পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতির মারফতে শৈশবাবধি পরিচয় থাকতো, তবে আমরা ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা বিদেশীর চোখ নিয়ে স্বদেশের শিল্পের বিচার করতে যেতুম না।

এখন বাঙলার প্রাচীন চিত্র ও আধুনিক পোটোদের সম্বন্ধে কিছু বলবো।

বাঙলার প্রাচীন শিল্পীরা মহাত্মা চৈতন্যের পরবর্তী সময়ে তাঁর ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁদের ছবিতে তাঁর প্রচুর আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক কালীঘাটের পোটোদের 'তামসিক চিত্র' বেশি আঁকতে দেখা যায়। আমাদের দেশীয় সাধারণের, অর্থাৎ, এই সকল চিত্রের গ্রাহকদের এবং নিরক্ষর পটুয়াদের ধর্মশিক্ষা না থাকাই এবং নানাপ্রকার

কুপ্রথার অনুরক্ত হয়ে পড়াই, এই অবনতির প্রধান কারণ। প্রাচীন পটুয়াদের আঁকা 'গৌরাঙ্গলীলা' প্রভৃতি ছবি এখনও জীর্ণ পুঁথির পাটার উপর পাওয়া যায়, তা দেখলেই হৃদয় পবিত্র ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে পড়ে! পাটাগুলির বর্ণনাবিন্যাস এবং রেখা-সম্পাতের মধ্যেও শিল্পীদের অসাধারণ সংযম ও শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক পোটোদের অঙ্কন-দক্ষতা ও তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি থাকলেও, তার শৈথিল্যের ভাবও যথেষ্ট আছে। অজন্তা, মোগল-শিল্প প্রভৃতি জগতবিখ্যাত শিল্পের ন্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জায়গার তুলনায় বাঙলার প্রাচীন চিত্রেই বেশি দেখা যায়। সমগ্র এশিয়াখণ্ডের মধ্যে জাপানী ও চীনা শিল্পে প্রাচ্যের এই বিশেষত্বটি দেখা যায়। বাঙলার শিল্পের সঙ্গে চীনা ও জাপানী শিল্পের এক এক স্থানে একটা বেশ একতা দেখা যায়। বাঙলার শিল্পে অঙ্কন-পদ্ধতির বিশেষ কোনো গণ্ডীবদ্ধ নিয়ম নেই বললেও হয়···শিল্প অবলীলাক্রমে শিল্পীর হাতে খেলার মতো সহজে সংসাধিত হয়। এমনকি, সময় সময় তার প্রথাগত নিয়মকেও (Traditions) ছাড়িয়ে যেতে দেখা যায়। যাঁরা বাঙলার প্রাচীন চিত্র অধিক পরিমাণে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা এটা সহজেই বুঝতে পারবেন। দেশের মূল প্রকৃতিগত বিশেষত্বকে বজায় রেখে শিল্পী নিজের বিশেষত্বের ছাপ দিয়ে যা প্রকাশ করবেন, তাই যথার্থ শিল্প নামের যোগ্য। এ বিষয়ের অভাবই শিল্পের দৈন্যের লক্ষণ। জাপান আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় বেশি বিধিবদ্ধ নিয়মপালন করতে গিয়ে তার অমূল্য শিল্পরত্ন বিসর্জন দিতে বসেছিল। স্বর্গীয় মহাত্মা ওকাকুরা প্রভৃতি শিল্প-রসজ্ঞ ব্যক্তিরা মিলে এই দেশীয় শিল্পের শক্তি হ্রাস হবার পূর্বাহ্নেই সাবধান হওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমাদেরও এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। কেহ কেহ বলেন—আধুনিক বঙ্গদেশে এই ভারত-শিল্পের পুনরুত্থানের যুগে মোগল, কাঙড়া প্রভৃতির অনুকরণে ভারত-শিল্পের শ্রী-সাধন করা উচিত, কিন্তু কেউই বাঙলার নিজের কোনো সম্পদ ছিল কিম্বা আছে, সেদিকে দৃষ্টি দেন না। মোগল প্রভৃতি শিল্প বাঙলার শিল্পে তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও কলা-নৈপুণ্য দিতে পারে, কিন্তু বাঙলার স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা ও স্নিগ্ধরস দিতে পারে কিনা সন্দেহ। আমাদের উচিত প্রাচ্য শিল্প-সমূহের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা এবং সেই সঙ্গে নিজের দেশের স্বাভাবিকতাকে বজায় রাখা। আশ্চর্যের বিষয়, ছয়শত বৎসর মুসলমানের রাজত্বেও বাঙলার শিল্পকে মোগল-শিল্প অধিকার করে বসতে পারেনি। বৈষ্ণব-সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-শিল্প বাঙলায় নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করে চলেছিল। রাজপুত, কাঙড়া প্রভৃতি ভারতের অপর সকল স্থানে শিল্পের মধ্যে এই মোগল-শিল্পের প্রভাব যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ স্থানে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে মোগল-শিল্প এবং পারস্য-শিল্পের মধ্যে একটি বিশেষ জায়গায় পার্থক্য আছে। মোগল-শিল্প কেবল মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। হিন্দুরাই মোগল বাদশাহদের সভা-শিল্পী ছিল এবং তাঁদের দ্বারা প্রবর্তিত একটি নতুন ধরনের শিল্পের সৃষ্টি হয়। মুসলমান-রাজ্যের অভ্যুত্থানের যুগে পারস্য-শিল্প ভারতে যা এসেছিল, তা থেকে এখানকার প্রধান হিন্দুরাই কয়েকটি মুসলমান-শিল্পীর সঙ্গে মিলে তাঁদের প্রাচীন রীতিটিকে বজায় রেখে পারস্য-শিল্পের সূক্ষ্ম ভাবটি গ্রহণ করে এই অভিনব মোগল-শিল্পের শাখাটির প্রবর্তন করেছিলেন। এখন বাঙলায় সেই মোগল-শিল্পের হুবহু চলন অসম্ভব। সুতরাং মোগল-শিল্পের ভিতরকার কারুকার্যের

দক্ষতা এবং সূক্ষ্ম-ভাবটি গ্রহণ ও সেই সঙ্গে দেশীয় চিন্তা প্রবণতা রক্ষা করাই আমাদের দেশের শিল্পীদের প্রধান কর্তব্য। বাঙলার নিজের যে সকল বিশেষত্ব আছে, তার মধ্যে সরলতাই একটি প্রধান ভাব। খাঁটি বাঙলার মহিলাদের পরিচ্ছদের মধ্যেও এমন একটি সরলতা আছে, যার সঙ্গে অন্যান্য দেশের জটিল পরিচ্ছদ-পুঞ্জের কোনোই মিল দেখা যায় না। দুঃখের বিষয়, আজকাল আমাদের দেশের প্রাচীনকালের অঙ্গবস্ত্রের স্থলে সাধারাণতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য পরিত্যক্ত জ্যাকেট, সেমিজ এবং ফরাসডাঙা, ঢাকা, শান্তিপুরের স্থলে বোম্বাই দস্তুর বিদেশী সিল্কের শাড়ীর বহুল প্রচলন দেখা যায়। বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়—আমাদের দেশের পুরুষেরাও তো ধুতি চাদর ব্যবহার একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছেন। তাঁরা সভা সমিতিতে ধুতির উপর বুক খোলা কোট কিম্বা যাত্রা দলের জুড়ির মতো সাজে যেতে কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত হন না। বাঙলার প্রাচীন চিত্র দেখলে বোঝা যায় যে আমরা আজকাল যে বিদেশী অন্তবাস (Underwear) কামিজ ও ওয়েষ্ট কোট বাইরের সদরী পরিচ্ছদের মতো পরি, তখন তার চলন ছিল না। প্রাচীনকালে বাঙলায় কোর্তা পরার চলন ছিল। এই কোর্তা কতকটা আধুনিক পাঞ্জাবীর মতোই সুদৃশ্য ছিল। ধুতির সঙ্গে কামিজের মতো অত বড় ছন্দ পতন ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। আমার মনে আছে, দু'তিন বৎসর পূর্বে বিলাতের বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত রোদেনষ্টাইন যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তখন তিনি বাঙালীদের ধুতি ও চাদর পরা স্বাভাবিক ধারণটি দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ইউরোপ প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক মূর্তির সুকুঞ্চিত স্তর বিন্যস্ত পরিচ্ছদের চেয়েও বাঙালীর এই সরল ও সাধারণ পরিচ্ছদকে অধিকতর উচ্চে স্থান দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেননি। প্রাচীন উড়িষ্যার চিত্র দেখলে, বোঝা যায় যে বাঙলার ও প্রাচীন উড়িষ্যার পরিচ্ছদ প্রায় একই ধরনের ছিল। আমরাই অচিরে বিদেশী প্রভাবে পড়ে এই একতার খর্বসাধন করেছি। উড়িষ্যার তুলনায় বাঙলার পরিচ্ছদ রীতিই ভাল ছিল। বাঙলায় আধুনিক পোটোদের মতো উড়িষ্যায়ও একদল আধুনিক পটুয়া সেই প্রাচীন রীতিতে ছবি এঁকে আসছে। উড়িষ্যাবাসীদের এই বিদেশী শিক্ষার অভাবেই এ ধরনের প্রাচীন শিল্প এখনও টিঁকে আছে। এঁদের ছবি জগন্নাথ তীর্থযাত্রীদের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে। উড়িষ্যায় এখনও তরুণ বিদ্যাপটু শিল্পী পাওয়া যায়। তাঁরা অবশ্য স্ব-স্ব ব্যবসা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। এক সময় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশমতো প্রত্নতত্ব বিভাগের তরফ থেকে উড়িষ্যার একটি প্রাচীন মন্দিরে সংস্কারের জন্য কয়েকটি কারিগর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের দৈনিক মজুরী মাত্র কয়েক আনা দেওয়া হতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁরা এমন যত্নের সঙ্গে সুচারুরূপে কারুকার্যটি সম্পন্ন করেছিলেন যে গভর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হ্যাভেল ও ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন বাহাদুর প্রভৃতি তার শতমুখে প্রশংসা করেছিলেম। জয়পুর প্রভৃতি স্থানে ভারতের মধ্যেই ভাস্কর-শিল্পীদের অনুসন্ধান পাওয়া যায়…তবে উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে ক্রমেই এ শ্রেণীর কলা-কুশলী লোপ পেতে বসেছে। এসব দেখলে কি মনে হয় না যে আমাদের দেশের শিল্পের জীবনী শক্তি এখনও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুকানো আছে ?

আশ্চর্যের বিষয়, বাঙলার আধুনিক পটুয়াদের এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের শিল্পীদের

অঙ্কন রীতির নামগুলিরও মিল দেখা যায়। যেমন—কালি দিয়ে ছবির উপর যে শেষ-কাজ করার রীতি আছে, তাকে 'সীয়া কলম' করা অর্থাৎ, কালি তুলির কাজ বলে। ছবির জন্য বিশেষভাবে তৈরী কতকগুলি কাগজ একত্রে আঠা দিয়ে সেঁটে লাগিয়ে যা তৈরী হতো—তাকে 'ওয়াসলী' বলে। এক সময় সমস্ত ভারত-শিল্প যখন এক ছিল, তখন হয়তো আরো কত রীতি ও পদ্ধতির সাঙ্কেতিক নাম প্রচলিত ছিল যা আজ আমাদের কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত। যদি এখন কোনো সুধীজন এই সকল পরিভাষার প্রচলন করেন, তবে শিল্পীদের শিল্পবোধ সম্বন্ধে বক্তব্য সহজে প্রকাশ করতে সাহায্য পাবেন এবং তাতে সাধারণের মধ্যেও শিল্পজ্ঞান বিস্তারের সুপন্থা আবিষ্কার হবার সম্ভাবনা। ইংরেজীর অনেক শব্দ আধুনিক শিল্পীরা প্রায় প্রচলিত করে ফেলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সেস্থলে দেশী শব্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। সপ্ত বর্ণ এবং তাদের সংমিশ্রণের তারতম্যের অনুপাতে যতগুলি বর্ণের সৃষ্টি হয়, সেগুলির পরিভাষা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং 'Colour-wash'-এর জায়গায় 'রঙপোতা' বা 'ভরা', 'Sketch'-এর স্থলে 'তভাকাম' বা 'আদরা', 'Composition'-এর বদলে 'বাঁধুনী' প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিবিধ শব্দ যদি আমরা ক্রমাগত ব্যবহারের দ্বারা সড়গড় করে নিই, তবে আমাদের শিল্পেরও তাতে জোড় বাড়ে বই কমে না।

এ প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য, আমাদের আলঙ্কারিক-পরিকল্পনা শক্তিকে আমরা ক্রমশঃই জলাঞ্জলি দিতে বসেছি। এককালে যে বাঙলার বিশেষত্বের ছাপ দিয়ে আলঙ্কারিক পরিকল্পনা জাভার বরভূধরের ভিত্তি অলঙ্কৃত করেছিল, আজ সেই বাঙলায় শিল্পের পরিণতি যে কি দাঁড়িয়েছে, তা মনে করতেও কষ্ট হয়। আমাদের দেশে সামান্য ক্রিয়াকর্মে, উৎসবে, গৃহস্থালীর মধ্যে যে সকল শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় গৃহস্থের ঘরে ঘরে দেখা যেতো, আজকাল তারও লোপ হবার সূচনা দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের 'আলিপনা' ক্রমশঃ উপকথার পরী-কন্যার মতো হয়ে পড়ছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের যে ইউরোপীয় শিক্ষা দিই, তাতে দোষ নেই, সেই সঙ্গে দেশী আলঙ্কারিক নক্সার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার দিকে দেশের লোকের যদি নজর যায় তো শিল্পের এবং দেশের—উভয়েরই মঙ্গল। নতুবা মুখে স্বদেশহিতৈষিতা এবং কার্যে ছেলেমেয়েদের বিলাতী 'ক্রেসির' 'ভয়লিং', 'ট্যাটিং' প্রভৃতি প্রস্তুত করতে ও বিলাতী নক্সায় 'কার্পেট' বুনতে শিখিয়ে দেশীয় শিল্পবোধের মাথায় কুঠারাঘাত করতে শেখালে চলবে না। 'কার্পেট' যদি বুনতে হয়, তবে দেশী নক্সায় হওয়া চাই। আমাদের ভারতবর্ষের আলঙ্কারিক-শিল্প যে শতদলকে কেন্দ্রগত করে আপনার বিশেষত্বের বিজয় নিশান উড়িয়ে একদিন সমগ্র ভারত শিল্পের অন্তরে বিরাজ করতো, আমাদের আবার সেই শতদলের কোমল-পল্লবেই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এখন আর 'ক্রোটন' ও 'আঙুর' পাতার নক্সায় চলবে না। জীবন কমলদলের বিকাশের মতো ভারত শিল্পের সেই জীবনী শক্তির পরিচয় এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিজেদের বিশেষত্বের পরিচয় দিতে হবে।

ছবি দেখা সম্বন্ধে আমদের শেখবার অনেক আছে। আমরা অনেকেই কেবল ছবির বাইরের দিকটা ফস্ করে দেখে যার যা ইচ্ছা একটা কিছু মতামত প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু

ভারতীয় ছবি যে শিল্পীর কোথাকার জিনিস এবং কোথা থেকে সেটি উৎসারিত হয়ে আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হতে পেরেছে, সে কথা আমরা মোটেই ভাবি না। এটা সর্বাগ্রে মনে রাখা উচিত যে ভারতীয়-শিল্পীরা ইউরোপীয়-শিল্পীদের মতো যা হয় একটা চোখে দেখে হুবহু তার নকল এঁকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হন না। কবিরই মতো প্রকৃতির অন্তর থেকে তাঁদের চিত্রে প্রকাশযোগ্য রস-সৌন্দর্য আহরণ করতে হয়। আমরা যদি এ বিষয় আগে একটু ভেবে-চিন্তে ভারত শিল্প পর্যবেক্ষণ করি, তাহলেই খুব সহজে তার অন্তরের দ্বারে প্রবেশলাভ করতে পারি।

বাঙলায় চিত্র শিল্পের মতো প্রাচীন ভাস্কর্যেরও নিদর্শন যথেষ্ট আছে। প্রাচীন মন্দির প্রভৃতির বিগ্রহ এবং তার বাইরের ইটে খোদাই (Terracotta) যে সব প্রাচীন কাজের নমুনা আজও পাওয়া যায়, সেগুলি পূর্বকালের চারুশিল্পকলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে পৃথিবীর যে কোনো স্থলে গৃহীত হতে পারে। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সব মূর্তি এবং পুষ্করিণী খননের সময়ে যে সকল তাম্রোৎকীর্ণ মূর্তি এই বাঙলার মাটির মধ্যে থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি শুধু বাঙলার কেন, ভারত শিল্পের ক্ষেত্রেও অমূল্য বস্তু। গৌড়ের যে সব 'Low-relief' বা 'অতি নিম্নতা-রক্ষিত রীতিতে গঠিত' প্রাচীন খোদিত চিত্র পাওয়া যায়, সেগুলির ভঙ্গী ও গঠন সৌন্দর্য ভারতের যেকোনো মূর্তির চেয়ে হীন তো নয়ই, বরং অনেক বেশী সুন্দর। দুঃখের বিষয়, এই ভাস্কর্যের চর্চা বাঙলায় নেই। অবশ্য কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণীতে মাটির মূর্তি এবং প্রতিকৃতি গঠনের চেষ্টা কুমোর পরিবারের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে, কিন্তু তাঁরা সচরাচর বিলাতী অনুকরণে প্রকৃতির হুবহু নকল করারই প্রাণপণ চেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁরাও ঠিক আমাদের মতো দেশীয় শিল্পের খোঁজ খবর না রেখে Shade and Light, Anatomy, Perspective প্রভৃতি হরবোলার বুলি আবৃত্তি করেন। অবশ্য এজন্য আমরাই দায়ী। কেননা, শিক্ষাভিমানী আমরা—নিরক্ষর শিল্পীদের এই সমস্ত কথা শিখিয়েছি। দুঃখের বিষয়, আমরাই এঁদের শিল্পবোধের বিকাশ হতে দিইনি। এখন তাঁদের বিলাতী-হিসাবে মূর্তি-গড়ারও প্রশংসা করা যায় না, অথচ দেশীয় রীতিও সেখানে আজ অপ্রচলিত।

চালচিত্র-আঁকা প্রথাটির কোনো কোনো জায়গায় এখনও খুব প্রচলন আছে এবং তাতে শিল্পীদের কোনো কোনো জায়গায় খুবই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো শিক্ষিত লোকের মুখে দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে প্রতিমাগুলির সংস্কার সাধন করার প্রয়োজন আছে, এমন কথাও শুনেছি। তাঁরা সেগুলিকে গ্রীক-মূর্তির মতো অতিমানবীয় করে তুলতে চান। কিন্তু আমাদের মতে, এরূপ সংস্কার না হওয়াই মঙ্গল।

বলতে লজ্জা বোধ হয় যে আমাদের দেশের যাঁরা স্বদেশ সেবক, তাঁদের কাছে এই স্বদেশী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—ভারত-শিল্পের কোনই মূল্য নেই। শিশুরা যেমন ভাল মন্দ বিচার শক্তি না থাকায় নয়ন পথে কোনো একটি অভিনব ও রঙীন বস্তু দেখলেই সেটিকে ধরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে, আমরাও ঠিক তেমনি শিশুর মতো অজ্ঞানভাবে বিদেশী শিল্পের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে, সেটিকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পীদের গোড়া থেকেই ধ্যান ধারণা হয় র‍্যাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর মতো শিল্পী হয়ে ওঠবার···তাঁদের 'পোটো'

বললে ক্ষুণ্ণ হন—'আর্টিষ্ট' বলে তাঁদের অভিহিত করতে হয়। এটা যে ভারত শিল্পীদের কতদূর অগৌরব ও মানহানিকর বিষয় তা বোঝবার শক্তি আমরা হারিয়েছি। অবশ্য আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন কালটাকে আঁকড়ে ধরে চিরকাল কূপমণ্ডূকবৎ একভাবে বসে থাকতে বলছি না। আমাদের দেশের বিশেষ রীতিটিকে অবলম্বন করে অবাধে অগ্রসর হতে হবে। কেননা, আমরা যদি আমাদের রীতি পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাই, তবে আমাদের উভয়কূলই নষ্ট হবে। আমরা আগে আমাদের ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিয়ে, তবে অন্যত্র থেকে যদি অভিজ্ঞতা আহরণ করি, তাহলেই সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে গড়ে উঠতে পারবো—এই আমাদের বিশ্বাস। ক্ষুদ্র জাপান যেমন অশনে বসনে সব বিষয়ে নিজেদের দেশীয় শিল্প ভাবটির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিদেশী শিক্ষার অভিজ্ঞতার দ্বারা দেশকে বড় করে তুলতে পেরেছে, আমাদের ঠিক সেইরূপ করতে হবে। বাঙলার শিল্পীরা প্রথমে ভারত শিল্পের অন্যদিকে না চেয়ে নিজেদের বঙ্গ পল্লীর শুধু ভিতরকার সকল শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আবিষ্কার করে, পরে ভারতের এবং ক্রমে সমগ্র শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন, তবেই দেশের শিল্পের মঙ্গল। গুজরাট, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের শিল্পীরাও ঠিক এই প্রকার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে, অথচ মূলগত ঐক্য বজায় রেখে যেদিন স্ব-স্ব শিল্পের বিকাশের পথে অগ্রসর হবেন, সেইদিন ভারতের শিল্পলক্ষ্মী পূর্ণশ্রীতে আবির্ভূতা হবেন।*

* শিল্পাচার্য অসিতকুমার হালদারের অপ্রকাশিত রচনা।

রমেশচন্দ্র ও ভারতের আর্থিক ইতিহাস

ভারতীয় দেনা ও হোমচার্জ

রাজত্ব চালাবার জন্যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইংলণ্ডে খরচ করতে হত! অবশ্যই খরচটা কোম্পানীর অংশীদারদের দেয় টাকায় হোত না। লীডেন হল স্ট্রীট কোম্পানীর অপিস চালাবার খরচ, অফিসারদের পেনসন, ভারতের বাইরে স্থানে স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণে যুদ্ধ চালাবার খরচ, সবই যোগাতে হত ভারতে আদায়ীকৃত রাজস্ব থেকে। কিন্তু রাজস্বের থলি তো টানলে বাড়ে না—বা বাড়লেও ভরা ভরতি থাকে না। অতএব কোম্পানী রাজত্ব চালাবার কারণে দেদার দেনা করে গেছে। কোম্পানীর কর্মচারীরা একদিকে যেমন ব্যবসার নামে হিন্দুস্থানে লুটপাট আর যথেচ্ছ বাটপাড়ির পরিচয় দিয়েছে—কোম্পানীর অনুসৃত নীতির ফলেও এদেশের সম্পদ ব্যয়িত হয়েছে কোম্পানীর স্বদেশে।

১৭৯২ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত ৪৬ বছরে ভারতে আদায়ীকৃত রাজস্ব ও তার মোট খরচের এক দীর্ঘ তালিকা রমেশচন্দ্র দিয়েছেন। (১) তালিকার দিকে মোটামুটি চোখ বোলালে দেখা যাবে যে ৪৬ বছরের মধ্যে ৩২ বছর খরচ বাদ দিয়ে রাজস্বের অংশ উদ্বৃত্ত থেকেছে বাকি ১৪ বছর আদায়ীকৃত রাজস্বের বেশি খরচ হয়েছে। ৩২ বছরের মোট উদ্বৃত্ত ছিল প্রায় ৪৯০০০০০০ পাউণ্ড ১৪ বছরের ডেফিসিটের পরিমাণ প্রায় ১৭,০০০০০০ পাউণ্ড। ঐ দীর্ঘ ৪৬ বছরে হিন্দুস্থানে রাজস্ব বাবদ জমা উচিত ৩২০০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ তৎকালীন টাকার হিসেবে তিরিশ কোটি বিশ লাখ পাউণ্ড। এই হিসেব দেওয়ার পর রমেশচন্দ্র বলছেন :

The financial results of Indian administration was therefore a surplus of thirty two millions during forty six years. But this money was not saved in India, **nor devoted to irrigation or other works of improvement.** It went as a continuous tribute to England to pay the dividends to the Company's shareholders and as the flow of money from India was not sufficient to pay the dividends there was an increasing debt—called the public Debt of India adding to the burdens of the taxpayers who had to pay the interest. This is the saddest episode in the sad financial history of India.

অর্থাৎ, ছেচল্লিশ বছরের রাজস্ব আদায় ও খরচ থেকে উদ্বৃত্ত টাকা ভারতের কাজে ব্যয়িত হয়নি। জাতির কোনো উন্নয়নমূলক কাজে বা সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত হয়নি। উদ্বৃত্তের সমস্তটাই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারদের মুনাফার অংশ ভাগ হিসেবে বণ্টন করা হয়েছে। এ তো গেল উদ্বৃত্ত রাজস্বের তত্ত্ব। এ ছাড়াও সরকারীভাবে ব্যয়িত রাজস্বের অংশ ভাগও কোম্পানী স্বদেশে খরচ করেছে প্রতি বছর। বাৎসরিক রাজস্বের মোটা অংশ নির্দিষ্ট থাকতো কোম্পানীর স্বদেশে খরচের জন্য। ভারতের রাজস্ব থেকে সেই অংশ বিলেতে খরচ হোত 'হোমচার্জ'

নামে। কিন্তু রাজস্বের থলি থেকে প্রেরিত টাকা ইংলণ্ডের খরচের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না—এর জন্যেও কোম্পানীকে দেনা করতে হোত—অবশ্যই দেনা হোত ভারতের নামে। তারই নাম ইণ্ডিয়ান ডেট—ভারতীয় দেনা।

রমেশচন্দ্র সঙ্গতভাবে বলেছেন : Under an equable arrangement between the two nations India should have paid for her own administration and England should have remunerated the Company for building up an empire so beneficial to her trade and her power, and so advantageous to her some seeking a carrier in the East...But a different policy was pursued from the commencement of the British rule in India, and the result was a continuous Economic Drain from India, which has increased in volume with the lapse of years, and has impoverished an industrious peaceful, and once prosperous nation.

সরকারী হিসাব পত্র থেকে রমেশচন্দ্র যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে দেখি ভারতীয় রাজস্বের একটা মোটা অংশ ইংলণ্ডে ব্যয়িত হচ্ছে। ১৮৩৭-৩৮ সালে ভারতের রাজস্বের একদশমাংশ বিলেতে খরচ হোত। সিপাই বিদ্রোহের বছরে খরচ বেড়ে দাঁড়ালো একপঞ্চমাংশ। ইংলণ্ডে কোম্পানীর খরচের বহর ক্রমশই বাড়তে থাকে। রাজস্ব থেকে সংকুলান না হলে ভারতের নামে দেনা করে কোম্পানীর খরচ চালাতে দ্বিধা ছিল না, ফলে কোম্পানীর বিলেতের খরচ বাড়তে থাকে, কেননা দেনাটা আসলে কোনোদিন কোম্পানীকে শুধতে হবে না—শুধবে ভারতীয় জনসাধারণ। দেনার খরচের ধাক্কায় শতাব্দীর শুরুতে (১৮০০) যে দেনার পরিমাণ ছিল ১,৫৬,১২,৪২৬ পাউণ্ড ৩৭ বছরে তার পরিমাণ দাঁড়ালো ৩ কোটিরও ওপর (৩,৩৭,৭২,৭১৮ পা)। সিপাই বিদ্রোহের বছরে তার পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি পাউণ্ড (৬৯৪৭৩৩৮৪)। অর্থাৎ তৎকালীন টাকার হিসেবে ৭০ কোটি টাকা। বর্তমান হিসেবে ৭০০ কোটি। সেবছরে ইংলণ্ডে ভারতীয় রাজস্ব থেকে খরচের পরিমাণ ছিল ৬১ কোটি টাকার ওপর।

ভারতীয় দেনার পরিমাণ হিসেব করতে গিয়ে ইংলণ্ডে খরচের পরিমাণ দেখলে আমরা কম চমকাব না। ১৮৩৭-৩৮ সালে যে খরচ ছিল ভারতীয় রাজস্বের দশভাগের একভাগ ১৮৭৬-৭৭ সালে সেই খরচ গিয়ে দাঁড়ালো রাজস্বের চারভাগের এক ভাগে। এবং একটানা ১৯০১-০২ খৃঃ পর্যন্ত গত দশকের শেষ পঁচিশটা বছরে ভারতীয় রাজস্বের চারভাগের এক ভাগ খরচ হয়েছে বিলেতে। আর ঐ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাড়েবাইশ কোটি পাউণ্ডের উপর—যেটা সিপাই বিদ্রোহের বছরে ছিল ৭ কোটি পাউণ্ড। ৪০ বছরের ব্যবধানে আয়তন তার তিনগুণ বৃদ্ধি।

নীতিবাগিশরা বলবেন, এ আর কি—এ তো রাজত্ব চালনার খরচ। এবারে আমরা রাজত্ব চালনার খুঁটিনাটির দিকে তাকাই।

১৮৩৩ সালের পর থেকে হিন্দুস্থানে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের পাট চুকেছে। কোম্পানীর আয় তখন ভারত শাসন জনিত রাজস্ব থেকে। বাণিজ্য চুকলেও কিন্তু আয় কমেনি।

অতএব ভারতে শাসনাধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাইরেও সাম্রাজ্য বিস্তারের খরচ কে জোগায়? সিংহল, মালাক্কা, সিঙ্গাপুর, আইল অব ফ্রান্স, কেপ কলোনী এবং এমনকি মিশর অভিযানেও ইংরেজদের খরচ জুগিয়েছে ভারতীয় জনসাধারণ (১৭৯৮-১৮০৫ খৃ)। জাভা (১৮১০), নেপাল (১৮১৬), ব্রহ্মদেশ (১৮২৪-২৬, ১৮৫২-৫৩) ইংরেজদের হস্তগত হয়েছে ভারতের টাকায়—যখন রাজস্বের ঘাটতি পড়েছে, ভারতের ঘাড়ে দেনা (Indian Debt) চাপিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার হয়েছে।

একটা হিসেব পাওয়া যাচ্ছে (২) যে ১৮৫৮ পর্যন্ত ভারতের বাইরে যুদ্ধাভিযানের দরুণ ভারতের রাজস্ব থেকে খরচ করেও কোম্পানীকে দেনা করতে হয় সাড়ে ৫২ কোটি টাকা। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ দমনের জন্য দেনা করতে হয় ৬০ কোটি টাকার মত। ১৮৫৮-৯ ক্ষমতা হস্তান্তর হল—কোম্পানীর হাত থেকে পার্লামেন্টের হাতে এল ক্ষমতা। কিন্তু কোম্পানীর অনুসৃত নীতিই বৃটিশ সরকার বজায় রাখলো। ১৮৫৮ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ভারতের বাইরে যুদ্ধের খাতে বৃটিশ সরকার যা খরচ করেছে তার দরুণ আরো ৯০ কোটি টাকা দেনা হিসেবে ভারতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব যুদ্ধ ছিল, ভুটান যুদ্ধ (১৮৬৩), আবিসিনিয়ার যুদ্ধ (১৮৭৯) ইজিপ্ট অভিযান (১৮৮২), সীমান্ত যুদ্ধ সমূহ (১৮৮২-৯২) ও ব্রহ্মদেশের অভিযান (১৮৮৬)।

ভারতের বাইরের যুদ্ধের দরুণ ভারতের ঘাড়ে খরচ চাপানোর চেষ্টায় বৃটিশ পার্লামেন্টেও কখনো কখনো বিতর্কের সৃষ্টি হয়। রমেশচন্দ্র জন ব্রাইটের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আমরা তারই উদ্ধৃতি দিচ্ছি। পার্লামেন্টে ব্রাইট বলেছিলেন: Last year I refered to the enormous expense of Afgan war—about 15 million sterling—the whole of which ought to have been thrown on the taxation of the people of England, because it was a war commanded by the English cabinet, for objects supposed to be English. (৩)

ব্রাইটের বক্তব্য তুলে ধরে রমেশচন্দ্র অশেষ মুন্সিয়ানায় ইতিহাসের সঙ্গে আর্থিক যুক্তির সমন্বয় ঘটাতে পেরেছেন। যেখানে বৃটিশ রাজের সাম্রাজ্যবিস্তার হচ্ছে (কেননা এ যুদ্ধ পরিচালনা করছে বৃটিশ মন্ত্রীপরিষদ—**'it is a war commanded by the English Cabinate'**) ভারত তার খরচ জোগাবে কেন? সম্ভবত এই যুক্তি যে আফগানিস্তান বিজয়ে ভারত থেকেই সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রেট বৃটেন থেকে সেনাবাহিনী এসে যখন প্রথম ভারতীয় বিদ্রোহ দমন করে তার খরচ কে জুগিয়েছিল? তাও কিন্তু ভারত। বিদ্রোহ দমনে ইংলণ্ড থেকে সমুদ্র যাত্রার ছ'মাস আগে থেকেই সেনাবাহিনীর যা কিছু খরচ, তা সবই ভারত থেকে নেওয়া হয়েছে।

ব্রাইট বলছেন: The worst however, is not yet told, for it would appear that when extra regiment are despatched to India, as happened during the late disturbance there, the pay of such troops **for six months previous to sailing is charged** against the Indian Revenues and recorded as a debt due by the

government of India to the British army pay office.

ভারতীয় বিদ্রোহ দমনের জন্যে সরকারী তহবিল থেকে খরচ করেও কোম্পানীর দেনা করতে হয়। কেবলমাত্র বিদ্রোহ দমনের কারণে ৬০ কোটি টাকার মত দেনা ভারতের ঘাড়ে চাপানো হয়। আসলে ইংরেজদের ভারত জয়ের খরচ ভারতের জনসাধারণ জুগিয়েছে।

বিদ্রোহের পর যখন পার্লামেন্টের হাতে ভারত সাম্রাজ্যের হস্তান্তর হল তখন কোম্পানীর বাণিজ্যিক মূলধন ফিরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠলো। অবশ্য এর জন্যে বৃটিশ সরকারের তহবিলে হাত পড়েনি। ভারতের রাজস্ব থেকে সেই টাকা তুলে কোম্পানীর অংশীদারদের দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছিল—যতদিন না শোধ হবে তা দেনার আকারে থাকবে আর তার দরুণ প্রতিবছর কোম্পানীর অংশীদারদের সুদ দিতে হবে। প্রতিবছর হোমচার্জের অন্তর্ভূক্ত হবে এই সুদ বিলেতে খরচের জন্য। কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২০ লাখ পাউণ্ড।

কোম্পানী যখন ভারত ছেড়ে যায় তখন ভারতীয় দেনার পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ কোটি পাউণ্ড (৬৯৪৭৩৩৮৪ পা) সরকারী শাসনাধীনে সেই দেনা উনিশ বছরে (১৮৭৬খৃ) দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ১৪ কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি (১৩৮৯৩৫০২৫ পা)। অবশ্য রমেশচন্দ্রের দেওয়া হিসেবের মধ্যে কোম্পানীর মূলধন যুক্ত হয়নি। যদিও তার দরুণ বছর বছর ভারতীয় তহবিল থেকে সুদ গুণতে হয়।

এই প্রায় ১৩৯ মিলিয়ন পাউণ্ড ভারতীয় দেনার মধ্যে ২৪ মিলিয়ন সত্যিকারের দেনা বলে দেখানো যেতে পারে। কেননা এই ২৪ মিলিয়ন পাউণ্ড বা ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড রেলপথ নির্মাণ ও সেচ ব্যবস্থায় খরচ হয়েছে। এগুলি সত্যিকারের উন্নয়নমূলক কাজ। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র যে প্রশ্ন তুলেছেন তার যৌক্তিকতা কে অস্বীকার করবে? প্রতিবছর যদি হোমচার্জের দরুণ কোটি কোটি মুদ্রা ভারত থেকে আত্মসাৎ না হোত তা হলে রেলপথ ও সেচ ব্যবস্থার দরুন এই এক কোটি বিশ লক্ষ পাউণ্ড অনায়াসে ভারতীয় রাজস্ব থেকে ব্যয়িত হতে পারতো। ভারত-সাম্রাজ্য হস্তান্তরের পর থেকে উনিশ বছরে (১৮৭৬-৭৭ খৃ পর্যন্ত) হোমচার্জের দরুণ ভারতীয় তহবিলকে গুণগার দিতে হয় প্রায় ১৭ কোটি পাউণ্ড (১৬৮৯৬৭১৩. পা)।

বিংশ শতকের মুখোমুখি ১৮৯৮-৯৯ থেকে ১৯০১-০২ পর্যন্ত চার বছরে ভারতীয় বাজেটে সারপ্লাস দেখা গেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই উদ্বৃত্ত যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তা ভারতেয় কাজে লাগেনি। রমেশচন্দ্রের তুলে ধরা বাজেটের আয় ব্যয়ের দিকে চোখ দিলে উদ্বৃত্তের ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

	১৮৯৮-৯৯	১৮৯৯-১৯০০	১৯০০-১৯০১	১৯০১-১৯০২
রাজস্ব জাত আয়	৬৭৫৯৫৮১৫	৬৮৬৩৭১৬৪	৭৫২৭২২৯১	৭১৩৪৪৫২৫
মোট খরচ	৬৪৯১৯৪২	৬৫৮৬২৫৪১	৭৩৬০২০৪৭	৭১৩৯৪২৮২

কিন্তু ভারতের উদ্বৃত্তের উপরে ভারতের জনসাধারণের দখল নেই। ইম্পিরিয়েল এক্সচেকার বা বৃটিশ শিল্পপতিদের ইচ্ছে অনুযায়ী তার ভবিষ্যৎ। এমনকি ভারত সরকারও এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। অমন দোর্দণ্ড প্রতাপ লর্ড কার্জনের প্রতিবাদও টেঁকেনি, যখন ভারতীয় বাজেটের

উদ্বৃত্ত দেখে বৃটিশ সেনা রিক্রুটমেন্ট-এর খরচের জন্য ৭,৮৬,০০০ পাউণ্ড বিলেতে চলে গেল। আফ্রিকার বৃটিশ সৈন্য রাখার খরচের দরুণ আরো ৪,০০,০০০ পাউণ্ডের দাবী এসে পড়লো। শেষ পর্যন্ত বিলেতে ও ভারতে প্রতিবাদের চাপে তা প্রত্যাহার করা হোল বটে কিন্তু বাজেট উদ্বৃত্ত হচ্ছে বলে বিলেতের শিল্পপতিরা আন্দোলন শুরু করলো যে, ভারতে সূতীদ্রব্য আমদানীর ওপর টাকায় শতকরা সাড়ে তিন হারে শুল্ক নেওয়া চলবে না। অহেতুক ভারতের রাজস্ব বাড়িয়ে কী লাভ?

১। Ramesh Dutt—The Economic History of India Part I. 1902 London.

২। H. L. Saxena—India's Public Debt and our Sterling Balances.

রবীন্দ্র কাব্যের আদি পর্ব ও ভারতী পত্রিকা

গীতা পাল

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর খুবই শীর্ণ ছিল। তাই রসলোলুপ বালকের পক্ষে সেকালের পাঠ্য অপাঠ্য গুটিকয়েক বই শেষ করতে বেশি সময় লাগে নি। অবশেষে বালক রবীন্দ্রনাথ স্মরণ নিয়েছিলেন সাময়িক পত্রিকার। সেকালের যে তিনটি পত্রিকা বিশেষ করে বালকের মনোহরণ করেছিল তারা হচ্ছে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'অবোধবন্ধু' এবং 'বঙ্গদর্শন'। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত প্রথম পত্রিকাখানি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই দুটি পর্বে প্রকাশিত হয়ে তারপর বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকার বাঁধানো এক ভাগ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেজদার আলমারি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আর 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়ে কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যায়, এবং আবার প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের অবোধবন্ধু প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত বৎসর। এই সময়ে অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পৌল ভার্জিনী' পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথ চোখের জল ফেলেছিলেন, তাঁর শিশুচিত্ত ঘুরে বেড়িয়েছে সাগরতীরে নারকেল বনের ছায়ায়। বালকের স্বপ্নপ্রবণ মনের জাগরণ ঘটাতে অবোধবন্ধুর সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরওপর এই পত্রিকাতেই তিনি বিহারীলালের কবিতা প্রথম পড়েছিলেন। বিহারীলালের কবিতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি, 'তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।'

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন এগারো বারো বছর তখন 'বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯-৮২ সাল) বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল'। বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলি অপেক্ষা রোমান্টিক গল্পগুলি স্বাভাবিক ভাবেই বালক পাঠকের চিত্ত অধিকতর আকর্ষণ করেছিল।

এই পত্রিকাগুলি রবীন্দ্রনাথের কিশোর আকাঙ্ক্ষাকে লালন করেছিল। এইসব পত্রিকার দৌলতে একই সঙ্গে তাঁর রস পিপাসার নিবৃত্তি এবং সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে।

সেই রসিক মনের সাহিত্য প্রতিভার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করতে হলে প্রথমেই পিছনে ফিরে দেখতে হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' (১) পত্রিকার পাতাগুলি। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই (১২৮২ অগ্র) রবীন্দ্রনাথেয় 'প্রলাপ' নামের কবিতাগুচ্ছ ছাপা হয়। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এই গুলির উল্লেখ করেছেন 'পদ্য প্রলাপ' বলে। এগুলি রচনার ইতিহাস হচ্ছে যে, 'সাত আট বছর বয়সে পদ্য লেখার যে হাতে খড়ি। (২) সে লেখার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায় পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয় বেড়িয়ে আসবার পরে।

বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা না আমার, না আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুরই ভরসা না রাখিয়া

আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।' (সাহিত্যের সঙ্গী : জীবনস্মৃতি)

বলা বাহুল্য এই সব খাতা ভরা কবিতাই জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে 'প্রলাপ' নামে ছাপা হয়।

কবিতাগুলির লেখক মাত্র তেরো বছরের বালক, কিন্তু লেখাগুলিতে কবির যে কল্পনাশক্তি ও রচনাভঙ্গির নিদর্শন আছে তা সত্যিই একটি তেরো বছরের বালকের চিন্তারও নাগালের বাইরে বলেই বোধ হয়। অথচ এই বালক এই সময়ে লিখেছেন,

'ঢাল ঢাল চাঁদ। আরো আরো ঢাল
স্থনীল আকাশে রজত ধারা
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হয়েছে পাগল পারা।
গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরাণ আজিকে উঠেছে মাতি।'

বালক কবির অন্তরের জ্বালাও এই 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে।

'আয় লো প্রমদা। নিঠুর ললনে
বার বার বলি কি আর বলি
মরমের তলে লেগেছে আঘাত
হৃদয় পরাণ উঠেছে জ্বলি।'

অতি পরিণতবুদ্ধি-সম্পন্নতা ব্যতীত ঐ বালকের পক্ষে এমনতর লেখা সম্ভব নয়।

এই অসাধারণ বালকের অসামান্য ক্ষমতার চূড়ান্ত পাওয়া যায় পরের বছরে (১২৮৩ সাল) আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার পত্রিকাখানিতে। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখ সঙ্গিনী' নামের সমালোচনা প্রবন্ধে চোদ্দ পনেরো বছরের কিশোর কবি গীতিকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেন : 'মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয় তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়তো শত শত মনোভূমি উর্বর করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে। ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্বরা করিতে পারে।'

গীতিকাব্যের এই লক্ষণ নির্দেশনা সমসাময়িক সাহিত্যের আদর্শে অসাধারণ তো বটেই, উপরন্তু কিছুটা দুঃসাহসিকও এবং এই দুঃসাহসিক কাজ করলেন চৌদ্দ পনের বছরের কিশোর কবি।

এই কবির যেসব কাব্য লোকচক্ষুর গোচরে এসেছে তার মধ্যে প্রথম রচিত 'বনফুল' নামের দীর্ঘ আখ্যানকাব্যটিরও সবটুকু ধারাবাহিক ভাবে এক বছর ধরে এই জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বেই প্রথম ছাপা হইয়াছিল। মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল চক্রবর্তী

এবং সংস্কৃতি সাহিত্যের মহারথী কালিদাসের রচনার প্রভাবে এই আখ্যানকাব্যটি লেখা হলেও এইটি প্রকাশ করেই রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে প্রথম পরিচিত হন। সেইদিক থেকে 'বনফুল' স্মরণীয় রচনা। চতুর্ভুজ প্রেমের কাহিনী 'বনফুল' রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য। সমস্ত কাব্যটিই ভাবালুতায় পরিপুর্ণ।

'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সব কাব্য কবিতা কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নি। তেরো থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে লেখা প্রায় সকল কাব্য কবিতাই তিনি কাব্যগ্রন্থাবলী থেকে বাদ দিয়েছিলেন। কেবল রেখেছিলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এটি কবির ষোল বছর বয়সের লেখা। এটি ছাপা হয় 'ভারতী' পত্রিকায়।

এই ভানুসিংহের পদাবলীর কবিতাগুলি ভারতীর প্রথম বছর থেকে (১২৮৪) প্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়। ঐ বছরেরই (১২৮৩) পৌষ থেকে চৈত্র, এই চার সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় 'কবিকাহিনী' নামে দীর্ঘ কাব্য। এটি কবির প্রথম ছাপা বই। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' প্রকাশিত 'বনফুল' এর আগে লেখা হলেও বই আকারে প্রথম বার হয় 'কবি কাহিনী'।

'ভানুসিংহের পদাবলী' এবং 'কবিকাহিনী' এই দুয়েতেই তরুণ কবির ভাবালুতাপূর্ণ রোমান্টিক মনন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত।

পরবর্তী বছরের (১২৮৫) শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে আরম্ভ করে 'করুণা' উপন্যাস। অবশ্য এই বছরের আশ্বিন মাসে কবি বিলাত যাত্রা করবার পর এই উপন্যাস আর প্রকাশ হয় নি। ভাদ্রমাস পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে অসমাপ্ত অবস্থায়ই এই উপন্যাস রয়ে যায়। আলোচ্য উপন্যাসটির গল্পাংশ অতি তুচ্ছ, এখানি কবির এই সময়ের লেখা কাব্য কবিতার মতই উচ্ছ্বাসপূর্ণ, রোমান্সঘন রচনা।

এর সমসাময়িককালে মৌলিক কাব্য কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অনুবাদ কাজও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। মুর, বায়রন, বার্ণস, সেক্সপীয়র, ভিক্টর, হুগো প্রভৃতি বিদেশী কবিদের কবিতার বেশ কিছু অনুবাদ করেছিলেন। এই সঙ্গে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা' থেকেও তিনি এই সময়ে দুটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। এরপর বিলাতযাত্রার পথে আমেদাবাদে কিছুদিন থাকবার সময়ে তিনি দান্তে, পেত্রার্ক, গ্যেটের লেখা থেকেও কিছু অনুবাদ করেছিলেন। আর এই সময়েই তিনি ইংরেজদের আদি কবি কিড্‌মনের পদ্য-বাইবেলের কিছু কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'গাথা'গুলিরও রচনা আরম্ভ হয় সমসাময়িক সময়েই। গাথাগুলি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কবিতায় লেখা গল্প। এখগুলিতে ভাবের ঘোরে আনমনা কবি কল্পনা সখির সঙ্গে বিচরণ করেছেন। (৩)

বিলাতে থাকাকালে কবির সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্র প্রায় অফলা ছিল। এ বিষয়ে তিনি নিজে বলেছেন, 'একটা আশ্চর্য এই দেখিয়াছি, যতকাল বিলাতে ছিলাম আমার কবিতা লিখিবার

উৎসাহ যেন একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল।'

তবে সেখানে তিনি যে একটি বিশেষ কাজ করেছিলেন তা হচ্ছে মূরের 'আইরিশ মেলীজে'র গানগুলি শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। সেই সময়েই প্রথম তাঁর হাতে আসে হার্বাট স্পেনসরের একখানি বই। সেখানির আকর্ষণে পরে দেশে ফিরে তিনি স্পেনসরের আরো বই পড়েন। তারই মধ্যে একটি বিশেষ প্রবন্ধের বই পড়ে তিনি গীতিনাট্য রচনার প্রেরণা পান (৪) এবং তারই ফলে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সদ্য প্রকাশিত 'সারদা মঙ্গল' কাব্য (১২৮৬) থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৌলতে তাতে সুর বসিয়ে রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম খাঁটি গীতিনাট্য। (৫) বাল্মীকি প্রতিভা (১২৮৭)। ইতিপূর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' (১২৮৬) নাটকাকারে লেখা হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল একখানি গীতিকাব্য। সেই কারণে 'ভারতী'তে প্রকাশকালে (১২৮৬ কার্তিক) ভূমিকা অংশে কবি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন : 'কাব্যটিকে কাহারও যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়।...নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে সাত আট বছর বয়স থেকে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং সেইসব লেখার প্রকারগত বিচিত্রতাও কম নয়! সে সব লেখায় কবির আপন মনের গুঞ্জনও শোনা গিয়েছিল, তথাপি সেসব লেখাকে সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রয়াস মাত্র ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর রচনা প্রথম স্পষ্টরূপ নিয়ে প্রচলিত সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হয় তাঁর কুড়ি বছর বয়সের রচনা 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) কাব্যে। এই কাব্যের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি হচ্ছে :

'[সন্ধ্যাসঙ্গীতকে] আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না; করব কচি আমের গুটির সঙ্গে অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরেনি, তাই তার দাম কম। সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু আমারই বটে। (৬)

অতএব সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকেই রবীন্দ্রনাথের সার্থক যুগের আরম্ভ। ইতিপূর্বে তিনি অনুকরণ অনুসরণের মাধ্যমে নিজের কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সন্ধ্যাসঙ্গীতের আগে তিনি তাঁর নিজস্ব রোমান্টিক মনোভঙ্গীর উপযোগী পরিণততর গীতিকবিতার নতুন দিগন্ত সন্ধানে এগিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাননি।

এই সন্ধ্যাসঙ্গীতের কতকগুলি কবিতা 'ভারতী'তে প্রকাশ হয়েছিল। বলি, 'ভারতী' পত্রিকাই পরবর্তীকালের কাবগুরুকে শিক্ষানবিশির প্রাঙ্গন অতিক্রম করে পৌছে দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যের সিংহদরজায়।

১.। শ্রীকৃষ্ণ দাসের সম্পাদনায় 'জ্ঞানাঙ্কুর' (১২৭৯ আশ্বিন) পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা রাজসাহী, বোয়ালিয়ায় ছাপা হয়েছিল। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'প্রতিবিম্ব' পত্র এই জ্ঞানাঙ্কুরের সঙ্গে মিলে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই সম্মিলিত 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের বনফুল, প্রলাপ ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখ সঙ্গিনী ছাপা হয়েছিল। যদিচ রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে পত্রিকাটিকে শুধু 'জ্ঞানাঙ্কুর,

নামেই অভিহিত করেছেন।

২। কবিতা রচনারম্ভ : জীবনস্মৃতি।

৩। এ কি এ কি ওগো কল্পনা সখি। কোথায় আনিলে মোরে
স্বপন কি ঘুম ঘোরে।'

(দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের 'ফুলবাল গাথা' ; ভারতী ১২৮৫ কার্তিক পৃঃ ২৯৮-৩০৬)

৪। 'হার্বার্ট স্পেনসরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। এই কথাবার্তার আনুসঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সঙ্গীত পাইয়াছে। স্পেনসরের আগাগোড়া সুর করিয়া নানাভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন।' (বাল্মীকি প্রতিভা : জীবনস্মৃতি)

৫। ১২৮৬ সালে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানময়ী'কে বাংলা সাহিত্য গীতিনাট্য রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে, কারণ এতে গান ছাড়া গদ্যেও কথাবার্তা ছিল। কিন্তু বাল্মিকীপ্রতিভার সব কথাবার্তাই গানের মাধ্যমে বলা হয়েছে।

৬। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সন্ধ্যাসঙ্গীতের মুখবন্ধ অংশ।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

জীবনানন্দের কবিতা যে সেই সোনার রঙের দিগন্তরেখা। ধরা দিয়েই আছে অথচ ধরা যায় না। জীবনানন্দের ব্যক্তিচরিত্রের মতন তাঁর কবিতাও অতিমাত্রায় অপ্রতিভ। সমমর্মী সমধর্মী না হলে যেন ঠিক তাঁর রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন তাঁর গোপন কথার মতন। ভীড়ের হাটে তাকে পড়া যায় না। বারোয়ারি তলার সামগ্রী হতে তাঁর স্বভাবতই যেন একটা কুণ্ঠা আছে। দ্বিধা আছে। জীবনানন্দের ঝরাপালক থেকে শুরু করে সাতটি তারার তিমির পর্যন্ত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই একটি একটি করে গোপন সংরাগ যেন রচিত হয়েছে। এক একটি করে নির্জন পদাবলী। তাঁর ব্যক্তিস্বভাবে যেমন তিনি অত্যন্ত অন্তর্মুখীন ছিলেন কবিতার নির্মাণের ব্যাপারেও তাঁর সেই অন্তর্মুখীনতা লক্ষ্য করবার মতন। জীবনানন্দ জনতার কোলাহল থেকে দূরে একা একা বসে ভেবেছেন কোন দূর জাদুপুরে রহস্যের ইন্দ্রজাল মেখে মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানার মতন বাস্তবের রক্ততটে স্ফটিক আলোকে নীলাম্বর বিস্তার করে দিয়েছে নিষ্পলক নীলিমা। মায়াবী তার মায়াদণ্ড স্পর্শ করে ভেঙে দিয়েছে লক্ষ বিধি-বিধানের কারাতল। জীবনানন্দ দাশের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিতাতেও লক্ষ্য করবার মতন ;—তাঁর ব্যক্তিচরিত্র যেমন রহস্যাবৃত, কবিতাও তেমনি, 'কুহেলীকুহকে আচ্ছন্ন'। এই কুহেলীকুহকের মাঝখান থেকেই তাঁর কবিতাকে খুঁজে নিতে হয়। চিনে নিতে হয়। (১)

জীবনানন্দের মধ্যে কল্পনা ও কল্পনার মধ্যে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার এমনই এক সারবত্তা ছিল যাতে তিনি আধুনিক জগতের বহু নব নব কাব্য-বিকীরণের সাহায্য লাভ করেছেন। নানারকম চরাচরের সংস্পর্শে এসে কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পেয়েছেন। আর তাঁর মধ্যে সম্যক কল্পনা আভা হয়তো এসেছিল পরমেশ্বরের কাছ থেকে। আর তা স্বীকার করে নিতে পারলে একটি সুন্দর জটিল পাককে হীরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা সম্ভব। জীবনানন্দের কথায় বলতে গেলে, 'হয়তো সেই হীরের ছুরি পরীদেশের, কিংবা হয়তো সৃষ্টির রক্তচলাচলের মতোই সত্য জিনিস।'

জীবনানন্দ দাশের কবিতা তাই যেন বিশ্লেষণের বস্তু নয়, এ যেন পুরোপুরি আস্বাদনের সামগ্রী। কাকবৃত্ত হয়ে নয়, আস্বাদনপন্থী কোকিল কিংবা বৈষ্ণবের মতনই তাকে গ্রহণ করতে হবে। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মধ্যে তাই যদি কেউ পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কালকে প্রতিবিম্ব হতে দেখতে চান, তা হলে তাঁরা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবেন। কেননা তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে সংগ্রাম সংকুলনই সংসারের কথা, সংঘর্ষ-সচেতন বর্তমান কালের কথা কদাচিৎ স্বজ্ঞানে বলেছেন। (২)

জীবনানন্দ প্রথম থেকেই কাব্যনির্মাণের ব্যাপারে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হয়ে স্বকীয়তার প্রত্যাশী হতে চেয়েছেন—মাঝে মাঝে সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের সামান্য প্রভাব—মোহিতলালের ক্ষণস্পর্শ—প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যের মতো সর্ববন্ধনমুক্ত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ যদিও তাঁর ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত নয়,

আন্দোলিত করেছিল কিছুটা। জীবনানন্দ দাশের কবিতাতে পুরাতনের ঐতিহ্যানুসরণের তৃপ্তি নেই, আছে স্বকীয় ঐতিহ্য সৃষ্টির ব্যাপক প্রয়াস। এ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় নীচের এই ছত্র ক'টিতেই—

সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে জন্মে ফিরে ফিরে ফিরে
ঘাটে ঘাটে একা একা,—বুনো হাঁস—জোনাকির ভিড়ে।
দুশ্চর দেউলে কোন—কোন যক্ষ প্রাসাদের তটে,
দূরে উর—ব্যাবিলোন—মিশরের মরুভূসঙ্কটে, (অস্তচাঁদে)

কিংবা—

হয়তো শুনেছ তারে,—তার স্বর,—দুপুর আকাশে
ঝরাপাতা ভরামরা দরিয়ার পাশে
বেজেছে ঘুঘুর মুখে,—জলডাহুকীর বুকে পউষ নিশায়
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পূবালী হাওয়ায়। (কবি)

জীবনানন্দের মধ্যে সর্বত্র এক রূপকল্প সৃষ্টির চেতনা আশ্চর্যরকমভাবে বেঁচেছিল যেহেতু তাই দেখি ঝরাপাতা, জলডাহুকী, শিরশিরে হাওয়া, বুনোহাঁস, দারুচিনি দ্বীপ, উর ব্যাবিলন মিশরের সভ্যতা ইত্যাদি সহযোগে তিনি প্রায়সই সব অপূর্ব রূপনিকেতন সৃষ্টি করে চলেছেন। তাহলেও জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে যুগযন্ত্রণার ছায়াসঞ্চার ঘটেনি, এমন কথা উচ্চারণ করাও সঙ্গত হবে না নিশ্চয়। জীবনানন্দ আশ্চর্য রকমভাবেই আধুনিককালের যুগযন্ত্রণাকেও ভাষা দিয়েছেন। তাই তাঁকে যাঁরা জীবনপলাতক, শুধু রোমান্টিক কবি বলে আখ্যাত করতে চান, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি একমত নই এই কারণে যে জীবনানন্দ দাশই আমাদের শুনিয়েছে—

নাম তব মুছে যাবে মুসাফের, —অঙ্গারের পাণ্ডুলিপিখানি
নোনাধরা দেয়ালের বুক থেকে খসে যাবে কখন না জানি!
তোমার পানের পাত্রে নিঃশেষে শুকায়ে যাবে শেষের তলানি,
দণ্ড দুই মাছিগুলি করে যাবে মিছে কানাকানি
তারপরে উড়ে যাবে দূরে দূরে জীবনের সুরার তল্লাসে, (ওগো দরদিয়া)

শুনিয়েছেন—

পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে?—করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের সুখ?
দেখিবে সে শিশুদের সুখ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
…　　…　　…
নষ্ট শশা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয় ফলিয়াছে
—সেই সব।　　(বোধ ॥ ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এলিয়টের যেমন পোড়োজমি জীবনানন্দের তেমনি হেমন্তের মাঠ। হেমন্তের নিঃস্ব, রিক্ত রূপ তুলে ধরেছেন তিনি নীচের এই ছত্রগুলিতে কী আশ্চর্য বাণী বহন করে—

হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

('তুজন' ; 'বনলতা সেন')

জীবনানন্দ হেমন্তের মাঠে প্রাথমিক ফলনের পরই দেখেছেন আশ্চর্য ক্ষয়ের ব্যাপ্তি। হেমন্ত যেন এ যুগচেতনার প্রতীক এই কবির চোখে। (৩)

প্রেম সম্পর্কে জীবনানন্দ যেসব কবিতা লিখেছেন, তার ভাষা, আবেগ ও অনুভূতি যার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে—তার তুলনা আবহমানকালের বাংলা কাব্যসাহিত্যে ;—বৈষ্ণব কবিতায় কিংবা রবীন্দ্রনাথে অথবা তাঁর সমকালীনদের মধ্যে কোথাও বাস্তবিকভাবে আমার নজরে পড়ে নি। বিরহকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যখন একটানা অতীন্দ্রিয় অনুভবের কবিতা রচনার মরশুম চললো এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যার কোন বিপরীতধর্মের কবিতা রচনা করলেন না, তখন জীবনানন্দের কবিতাতে কী অসম্ভব (!) উল্টো সুর শোনা গেল—

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস,—
আকাশের ওপারে আকাশ। (আকাশলীলা', 'সাতটি তারার তিমির)

জীবনানন্দের কবিতায় কোথাও প্রেম উচ্ছ্বসিত আবেগে অভিব্যক্ত হয়েছে,—বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের মতন কিংবা রবীন্দ্রনাথ কী তাঁর অনুরাগীদের মতন বলে আমার মনে হয় না, বরং চণ্ডীদাসের সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর হয়তো কিছুটা। তাঁর প্রেমের কবিতাতে এক আশ্চর্য নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ লক্ষ্য করবার মতন। এই কারণেই নিঃসঙ্গকবিকণ্ঠ উচ্চারণ করেছে—

একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা।
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুকে অবহেলা।
একদিন—একরাত,—তারপর প্রেম গেছে চলে—

উচ্চারণ করেছে—

হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াওড়ি !
কবরের থেকে শুধু আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা !—
আমরাও ছায়া হয়ে—ভূত হয়ে করি ঘোরাঘুরি !
—মনের নদীর পার নেমে আসে তাই সন্ধ্যাবেলা।

(জীবন ৭ সংখ্যক, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

জীবনানন্দের প্রেম অত্যন্ত ঘরোয়া প্রেম—(শ্যামলীতে রবীন্দ্রনাথের কিছুটা ঝোঁক পড়েছে দেখা যায় এই ঘরোয়া প্রেমে) তাই নায়িকাদের নামকরণে দেখা যায় দেহীরূপকে মূর্ত করে তোলবার আকাঙ্ক্ষা। কবি বলেছেন—নাটোরের বনলতা সেন, সুরঞ্জনা, শেফালিকা বোস মৃণালিনী ঘোষাল, পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যাল ইত্যাদি নামের আটপৌরে নায়িকাদের কথা। এর ফলে তাঁর প্রেমের উপলব্ধি অনেক অবয়বত্ব লাভ করেছে বলেই আমার মনে হয়েছে।

জীবনানন্দ ছিলেন মূলতঃ দেহনির্ভর প্রেমে বিশ্বাসী। নীচের এই পংক্তি দুটিই তার যথেষ্ট প্রমাণ বহন করতে সমর্থ—

১। স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র……(শঙ্খমালা', বনলতা সেন)

২। বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে !
('হায় চিল', বনলতা সেন)

আরও একটি কথা।

জীবনানন্দের কাব্যে ইন্দ্রিয়মনোরমতা—কীটসের চেয়েও অধিকমাত্রায় সাফল্যমণ্ডিত কখনো কখনো, আমার প্রায়ই নজরে পড়েছে। তাঁর রচনাতে ইন্দ্রিয়ঘনতা ও চিত্র এক আশ্চর্য কোটিতে বিরাজমান।

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
হিজলের জানলায় আলো আর বুলবু'ল করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে ;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে'
পেয়েছে ঘুমের স্বাদ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;
('মৃত্যুর আগে', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

স্পর্শ-স্বাদ-গন্ধে ভরা একটি রূপের জগতে জীবনানন্দ প্রবেশ করেছিলেন। ফলে নিসর্গ প্রকৃতি তাঁর রচনাতে এক নিশ্চিত অবয়বত্ব লাভ করেছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের ক্ষমতার অধিকার দেখিয়েছেন—এ ধরনের প্রকৃতি মধ্যে শরীরী সত্য উপস্থাপনার অধিকার আমার যতদূর মনে হয় পরলোকগত কবি দেবেন সেন, গোবিন্দ দাস আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি পথের পাঁচালি ও আরণ্যকে। (৪)

এসব দিকগুলি লক্ষ্য করবার পরও কথা থেকে যায়। জীবনানন্দের কাব্যের মধ্যে যে ইতিহাস চেতনা দেখা যায় তাতে তিনিই একক, এমন কথা না বলেও (যেহেতু কবি মেস্‌ফিল্ডও কল্পনাকাব্যের রবীন্দ্রনাথ কিছুটা ইতিহাস চেতনার প্রমাণ দিয়েছেন এবং ইয়েটস বেশ অনেকটাই) উচ্চারণ করবো যে তাঁর মতন এমন বিশাল এবং বিস্তৃত ইতিহাস চেতনার প্রকাশ এখন পর্যন্তও অন্য কারো রচনাতে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। উদাহরণ দেওয়া যাক—

১। জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ! ('হাওয়ার রাত', 'বনলতা সেন')

২। চারিদিকে ছায়াঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র ;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির করে দিতে গিয়ে ইওরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খ্রীষ্টান। ('সবিতা', 'বনলতা সেন')

৩। অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ ক'রে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।
('উত্তর প্রবেশ', 'সাতটি তারার তিমির)

৪। তুমি কি গ্রীস পোল্যাণ্ড চেক প্যারিস মিউনিক
টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলান্টিক
লণ্ডন চীন দিল্লী মিশর করাচী প্যালেস্টাইন ? ('অনন্দা', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৫। দূরে উর—ব্যাবিলোন—মিশরের মরুভূ সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড তলে,—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে
* * *
আমি ছিনু 'ক্রবেদু'র কোন দূর 'প্রভেনস' প্রান্তরে!
('অস্তচাঁদে', 'ঝরাপালক')

ইতিহাস চেতনা সম্পর্কে কবির নিজের কৈফিয়ৎ আছে। কবি বলেছেন বেশ স্পষ্ট অঙ্গীকারেই—

'মহাবিশ্বলোকের ঈশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো ; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময় চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।' (কবিতা প্রসঙ্গে ॥ কবিতার কথা পৃঃ ৪০)

'মানুষ হিসেবে অনুদার আমি হতে পারি, কিন্তু সময়-ও-সীমা প্রসৃতির ভিতর সাহিত্যের পটভূমি বিমুক্ত দেখতে আমি ভালবাসি।......কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবির অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক ; কিন্তু সে সেই সমস্ত কুয়াশাগুলোকেই কেটে-কেটে চলেছে যা পরিস্থিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো।' ('উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য' 'কবিতার কথা' পৃঃ ৩২)

তাহলেও এই ইতিহাস চেতনা কবিকে তাঁর ব্যথা নিরাময়তার উপকূলে পৌঁছে দিতে পারে নি। কিন্তু বস্তুজগতের শূন্যতা অন্তরজগতের শূন্যতারই দ্যোতক বলে ইতিহাসের বিশাল

সরণীলোকে অরণ্যযাত্রা পরিত্যাগ করতে পারেন নি কবি। প্রাণদায়িনী উৎসের সন্ধানে যাত্রা করেছেন তাই বারবার। খুঁজেছেন তাকে বিভিন্ন 'ঐতিহ্যের মধ্যে—পেগান গ্রীস, কনফু'সয়াসের চীন, ধর্মাশোকের ভারতবর্ষে। এ খোঁজের সঙ্গে মিল আছে ইয়াটসের সেলিং টু বাইজেনটিয়ামের॥

ইতিহাস চেতনার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো বনলতা সেন। যেখানে কবি লিখেছেন—

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;

* * *

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; ('বনলতা সেন', বনলতা সেন)

এই কবিতার মধ্যকার সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিদর্ভনগর, বিদিশা শ্রাবস্তী ইত্যাদি যেন আমাদের কাছে এক স্বপ্নের আবহ তুলে ধরে। এছাড়াও ইতিহাস চেতনার দৃষ্টান্ত দেখানো যায়—

ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোন এক নগরী ছিল একদিন,
কোন এক প্রাসাদ ছিল ;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ ;
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিনতরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন। ('নগ্ন নির্জন হাত,' 'বনলতা সেন')

কিংবা—

গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছে ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা নগরীর গায়ে
কী চেয়েছ ? কী পেয়েছ ?—গিয়েছে হারায়ে।

('সুরঞ্জনা', 'বনলতা সেন')

ইতিহাস চেতনাই জীবনানন্দকে সমাজচেতনার তটে এনে পৌঁছে দিয়েছে। উদ্দীপ্ত করেছে তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা। কবি বুঝতে পেরেছেন মানুষ ও পৃথিবীর ব্যথার কেন্দ্রটিকে। বুঝতে পেরেছেন যে মানুষের অগ্রগতি কোনদিন কোথাও 'সরল রেখায়' হয় না। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক একটি স্মরণীয় যুগের পরই অন্ধকার ঘনিয়ে আসাই হলো স্বাভাবিক নিয়ম ও দুর্বার

নিয়ন্তি। বর্তমান কাল হলো মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সেই অপ্রাপনীয়, অসহ অচলায়তনের কাল। এ অচলায়তনের বাইরে আসার ইঙ্গিতও আছে ইতিহাস সচেতন কবি জীবনানন্দের কাছেই। কবি বিশ্বাস করেন মানব চেতনার পরিধি প্রসারিত হবে ক্রমশ—বিস্তৃততর হবে—মহত্তর হবে—বৃহত্তর চেতনায় উত্তরপ্রবেশ করে হবে তার মুক্তি। তাই কবি উচ্চারণ করেছেন—

ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ করে আরো বড চেতনার লোক;
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

('উত্তরপ্রবেশ', 'সাতটি তারার তিমির')

জীবনানন্দ ইতিহাস সচেতন কবি; ইতিহাসেরই প্রশস্ত পথে তাঁর কবি মন অনাদ্যন্ত যাত্রা করেছে। দেশ দেশান্তরের পথে। কাল থেকে কালান্তরের রথে চড়ে—অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে—যে ভবিষ্যৎ বহন করে নিয়ে আসবে এক শুভ্র মানবিকতার ভোর ॥

এই চেতনা এত দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও সুরোরিয়ালিস্টদের মতন কবি প্রায়ই ডুব দিয়েছেন দেখি মগ্নচৈতন্যের গভীরে—রচনা করেছেন সব আকর্ষণকারী ফ্যানটাসি। ভাবতে অবাক লাগে এইসব পংক্তিগুলি জীবনানন্দের রচনা—

পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।
হীরের প্রদীপ জেলে শেফালিকা চোখ যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,—

('হরিণেরা', 'বনলতা সেন')

অবাক লাগে শুনতে—

যে ঘোড়ায় চড়ে আমরা অতীত ঋষিদের সঙ্গে
আকাশ নক্ষত্রে উড়ে যাব
সেই সব শাদা শাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে কোথাও; ('আজকের একমুহূর্তে', 'মহাপৃথিবী')

জীবনানন্দ দাশও সুররিয়ালিস্টদের মতন আমাদের মনকে এক স্বপ্নলোকের কুহকের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেছেন।

এতক্ষণ আমরা জীবনানন্দের কবিতার বিষয় ও ভাবের কথাই বললাম। শিল্পপ্রকরণের দিক থেকেও জীবনানন্দ অসামান্য নবত্ব দেখিয়েছেন। গদ্য গন্ধী শব্দের ব্যবহারে, অতিচলিত,

গ্রাম্য, দেশজ ও ইংরেজী শব্দের ব্যবহারে তিনি তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধিশালিনী করে তুলেছেন। প্রধানতঃ তানপ্রধান ছন্দের ব্যবহারে তাঁর কবিতাকে করে তুলেছেন অসামান্য প্রত্যয়ী ও অব্যর্থ লক্ষ্য। পয়ার ছন্দকে অগ্রাহ্য করেন নি কোথাও, কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গদ্যকবিতা রচনাতেও, অল্পসংখ্যক (মাত্র দুটি—শকুন ও পথহাঁটা) সনেট রচনাতেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। মোটকথা জীবনানন্দ দাশের কবিতা—ভাবধর্মে ও শিল্পপ্রকরণে অসামান্য ভাবে উত্তীর্ণ যেহেতু তাই আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আমাদের গভীরতর মনের পথের দিকদিশারী হতে পারেন।

আগামী দিনের কাব্যরচয়িতাদের তিনি নানাদিক দিয়ে শিক্ষাগুরু হতে পারেন। ভাবধর্মে ও শিল্পপ্রকরণে তিনি বাংলা কবিতাকে যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়ে দিয়ে গেছেন, তাতে আমাদের অমূল্য অধিকার—উত্তরাধিকার। তবে তা উপযুক্ত দীক্ষিতেরই লভ্য। স্থিতধীর সুস্থ পাথেয়।

জীবনানন্দের উত্তরাধিকার যোগ্যতা প্রমাণে অসুবিধা অনেক। পরিশ্রমবিমুখ স্থূল বোধসম্পন্ন পাঠক-পাঠিকা; চঞ্চলচিত্ত সিনেমা-সাপ্তাহিক প্রেমিক প্রেমিকা; আবার তাঁর রচনা পদ্ধতির কুব্যবহারকারী লেখক-লেখিকা কখনোই তাঁকে জানতে পারবে না। বুঝতে পারবে না। তাই বলছিলাম, কেবল সম্মোহে কাজ অগ্রসর হবে না অধিকদূর। সম্মিলন চাই। বিষয় ও বিষয়ীর ভাব ও ভঙ্গীর, সাধ ও সাধ্যের সম্মিলন চাই।

জীবনানন্দের কবিতাতে যে স্বকীয়তা লক্ষ্য করেছি আমি তা রবীন্দ্রঐতিহ্যের বিপরীত পথে দিগন্ত পরিভ্রমণ করেও রচনা করেছে এক সিংহদরজার—এক উজ্জ্বল সূর্যতোরণের। আমরাও সেইপথের পথিক হব অবশ্য। হওয়াই হয়তো বিধিলিপি; সৌভাগ্যসম্পন্ন নিয়তি। কিন্তু কবে পারবো আমরাও পৃথিবীর ভীড়ের হাট থেকে ছুটি নিয়ে কোন নীল নির্জনে গিয়ে নিঃসঙ্গ নীরব হতে? কবির মতনই টেনে টেনে উচ্চারণ করতে পারবো কোনদিন—

> অর্থ নয়, কীর্তি নয়—সচ্ছলতা নয়—
> আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
> খেলা করে;
> আমাদের ক্লান্ত করে
> ক্লান্ত—ক্লান্ত করে; (আটবছর আগের একদিন', 'মহাপৃথিবী')

১। 'মানুষ ও কবি জীবনানন্দ কখনও অভেদ, কখনো পৃথক। তাঁকে খুঁজে চিনে নিতে হত—তাঁর কবিতাকেও।' নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ॥ বাণী রায়।

২। 'সংসারের সকল দুঃখ বেদনা, আনন্দ উল্লাস নিয়েই কল্লোলের যাত্রা আর জীবনানন্দ তুচ্ছ চপলতার উর্দ্ধে বা একটি গভীর ধ্যান সংযোগ। সে যেন এই সংগ্রাম সংকুল সংসারের জন্য নয়, সে সংসারে পলাতক।…যেখানে অনাহত ধ্বনি ও অলিখিত রং, জীবনানন্দের আড্ডা সেইখানে। 'কল্লোলযুগ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

৩। ধনে, শক্তিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এ-যুগের ঐশ্বর্যের অন্ত্য নেই। প্রথম হেমন্তের মতনই সে পর্যাপ্ত। কিন্তু তার মধ্যে ক্ষয়ের সূচনাও আধুনিক কবির চোখ এড়ায় নি। যেখানে ভিক্টোরীয় কবিরা তার ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যে মুগ্ধ ছিলেন, সেখানে আধুনিক কবির মোহমুক্ত সচেতন দৃষ্টিতে তার ভান ধরা পড়েছে। জীবনের উল্লাসকে পূর্বোক্ত কবিরা দেখেছিলেন বলে তাঁরা আশাবাদী আর জীবনের ক্ষয়িষ্ণু রূপকে আধুনিক কবিরা দেখলেন বলেই তাঁরা জরা ও মৃত্যুচেতনায় অবসন্ন, ক্লান্ত। এজন্য হেমন্তের ধূসর বর্ণে জীবনানন্দের চিত্রকল্প সার্থক রূপ লাভ করল। 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী। পৃঃ ১৫৮

৪। 'ধূসর গন্ধ', 'ধূমের ঘ্রাণ,'·· ···এর প্রত্যেকটিতেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্থান পরিবর্তন করে এক নিবিড় ইন্দ্রিয়ঘনতার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে মনে হল প্রকৃতিকে আমরা তার সমস্তগুলি আয়তনে (dimension) আরো শরীরীভাবে উপলব্ধি করলাম—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী পৃঃ ১৬৩

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

মেজর এড্‌ওয়ার্ডস (আনন্দ: ৪।৪) ॥
ঐতিহাসিক চরিত্র। ওয়ারেন হেষ্টিংসে প্রেরিত সন্ন্যাসীবিদ্রোহ দমনের দ্বিতীয় সেনাপতি। প্রথমদিকে এই চরিত্রটি মেজর ঠড্‌ নামে রূপলাভ করেছিল। পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিম তা সংশোধন করেন। এড্‌ওয়ার্ডস কৌলে মেলার দিন সন্ন্যাসীদের সর্বনাশসাধনের সঙ্কল্প নিয়েছিলেন।

মেনকা (রাজ: ২।৩) ॥
মোঘলদরবারের রমণীদের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেবার সময় স্বর্গের অপ্সরী মেনকার নাম করা হয়েছে। বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র এঁকে প্রেরণ করেন। তখন তাঁর গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। ইনি নবজাতিকাকে ফেলে স্বর্গে চলে যান।

মেরজা হবীব (চন্দ্র: ৬।২) ॥
একজন হাকিম। এঁর কাছ থেকেই করিমন দাসী দলনীর জন্য বিষ সংগ্রহ করেছিল।

মেহের-উন্নিসা (কপা: ৩।১) ॥
'আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ (আকতিমাদ-উদ্দৌলা খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকুলে প্রধানা সুন্দরী। একদিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেইদিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেইদিন সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শের আফগান নামক একজন মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট যাচমান হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল।' (৩।১)।

বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে ইতিহাসের চরিত্রটিকে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সামান্যক্ষণের জন্য আনার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য মেহের-উন্নিসার পিতার নাম—মির্জা খিয়াস। যাইহোক মতিবিবির কাহিনীকে পুষ্ট করার জন্য এই চরিত্রের ক্ষণিক উপস্থিতি ঘটেছে। অপ্রয়োজনবোধে বঙ্কিম মেহের-উন্নিসার 'নূরজাঁহা'-জীবনের পরিচয় দেননি। (দ্রঃ নূরজাঁহা বেগম)

মেহেরজান (রাজ: ৩।৮) ॥ এই ছদ্মনামে নর্ত্তকীবেশে রূপনগরের মোগলসেনাপতিকে মুগ্ধ করিয়া বিবি মোগলসৈন্য মধ্যে স্থানলাভ করেছিল।

যমুনা দিদি (ইন্দিরা ২১ পরিঃ) ॥ ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছিলেন।

যশোবন্ত সিংহ (দুর্গেঃ ১।৪) (রাজঃ ১।১) ॥
ইনি যোধপুরের রাজা। প্রথমে ইনি ঔরঙ্গজেবের সহায়তা করে অনুগ্রহভাজন হন এবং সেনাপতিত্ব লাভ করেন। অবশ্য পরে ইনি ঔরঙ্গজেবের বিরোধিতা করেন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে এঁর চিত্রের উল্লেখ আছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে যশোবন্ত সিংহের ভূমিকা এইটুকু মাত্র—রাজা মানসিংহ মাত্র দশসহস্র সৈন্য নিয়ে কোন বীর কত্‌লু খাঁর বিদ্রোহ দমন করতে পারবে জিজ্ঞাসা করলে সকলে নীরব রইল। 'পরিশেষে রাজার প্রিয়পাত্র যশোবন্ত সিংহ নামক রাজপুত যোদ্ধা রাজাদেশ পালন করিতে অনুমতি প্রার্থিত হইলেন।' এই রাজপুত যোদ্ধা যোধপুরাধিপতি নিশ্চয়ই নন।

যামিনী (কৃঃ উঃ ২।১১) ॥ ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ভগিনীর দুঃখের দিনে সে তার কাছে ছিল।

যোধপুরী বেগম (রাজঃ ২।৫) ॥
"ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম। যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না।"

যোধপুরী বেগমের চরিত্রটি অনৈতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন—আচার্য যদুনাথ সরকার। (বঙ্কিম গ্রন্থাবলীঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ-এর ভূমিকা)। যোধপুরের কোন রাজকন্যাকে ঔরঙ্গজেব বিয়ে করেন নি। ঔরঙ্গজেবের একমাত্র হিন্দুবেগমের নাম ছিল নবাব বাঈ। তাও তাঁকে নবাব বিয়ে করেছিলেন ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার পর। সরকার আরও বলেছেন—আকবরের পর কোন হিন্দু মহিষীই নবাবমহলে হিন্দুয়ানী বজায় রাখতে পারতেন না। সুতরাং ঔরঙ্গজেবের মহিষীর পক্ষেও হিন্দুয়ানী বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। তবে মানুচীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে ঔরঙ্গজেবের অসুস্থতার সময় নিজপুত্রের সিংহাসনলাভের জন্য নবাব-বাঈ দেব-দেবীর পূজা দেন। এ ঘটনাটিকে ব্যতিক্রম বলেই ধরা যেতে পারে।

যোধপুরী বাঈয়ের চরিত্রগঠনে ইতিহাসের উপাদানগত ত্রুটি যতই থাক না কেন, উপন্যাসের দিক থেকে চরিত্রটির আবেদন অপরিসীম। ঔরঙ্গজেবের পতন শুরু হয়েছিল ঘরে বাইরে। তাই যে হিন্দুনারী স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে (সে স্বামী যেমনই হোন না কেন) সেই হিন্দুনারী যোধপুরী বেগমও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু কামনা করেছেন। শুধু তাই নয়, ঔরঙ্গজেবের পতনেও তিনি কিছু সক্রিয়—সহযোগিতাও করেছেন। তিনি যদি নিজ দাসীকে পাঞ্জা দিয়ে চঞ্চলকুমারীর কাছে না পাঠাতেন, অথবা নির্মলকুমারীকে নবাব- হারেমে সাহায্য না করতেন, তাহলে হয়ত গল্পের গতিপথ পরিবর্তিত হত।

নবাব হারেমে উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার অত্যাচারে যোধপুরী বেগম বিব্রত। তাই তিনি মনেপ্রাণে কামনা করেন তাদের বিনাশ। এতে নারীসুলভ প্রতিহিংসাপরায়ণতা দেখা

গেলেও যোধপুরীর চরিত্রটি অনেকস্থানেই ধ্যানমগ্না যোগিনীর মত মনে হয়েছে। দুঃখের আগুনে যেন তিনি সর্বংসহা হয়ে উঠেছেন।

রঘুবীর মিশ্র (সীতাঃ ৩।২২) ॥ সীতারামের বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত সিপাহীদের মধ্যে একজন। শেষপর্যন্ত এরা যুদ্ধে প্রাণ দেবার সংকল্প গ্রহণ করে।

রঙ্গময়ী (ইন্দিরা ২১ পরি :) ॥ একজন রসিকা স্ত্রীলোক।

রঙ্গরাজ (দেঃ চৌঃ ১।১২) ॥

রঙ্গরাজের বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোঁপ্পা ও ছাঁচা গালপাট্টা আছে।" চেহারার এই বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় রঙ্গরাজ বিহারের লোক। ভবানীপাঠকের সে যোগ্য সহচর। রঙ্গরাজ সাহসী ও বিশ্বস্ত। সর্বোপরি, তার নির্বিচারে দলপতিকে মান্য করার ক্ষমতা আছে। এটি রঙ্গরাজের চরিত্রের ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় নয়, তার সদ্‌গুণ। রঙ্গরাজের উপর ভার পড়েছিল প্রফুল্লের রক্ষণাবেক্ষণের। আবার প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণীতে পরিণত হলেও রঙ্গরাজ হল তার বিশ্বস্ত অনুচর।

রঙ্গরাজ দেবী চৌধুরাণীকে যথার্থ দেবীর মতই ভক্তি করত। তাই ব্রজেশ্বর যখন দেবী সম্বন্ধে উক্তি করেছে—" তিনি নাকি যুবতী ?" তখন রঙ্গরাজ বলেছে—"তিনি আমাদের মা—সন্তানে মা'র বয়সের হিসাব রাখে না। ব্র। শুনিয়াছি বড় রূপবতী। রঙ্গ। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।" (২।৪)। দেবীকে রঙ্গরাজ যথার্থ মায়ের মতই ভালবাসত। তাই দেবী যখন একাকী বজরায় ধরা দেবার জন্য প্রস্তুত, তখন রঙ্গরাজ মাকে বাঁচাবার জন্য সিপাহী নিয়ে এসেছে। কিন্তু দেবীর আদেশে তাকে নিরস্ত হতে হয়েছে। রঙ্গরাজের বিশ্বস্ততা ও আদেশ মান্য করার ক্ষমতা, তার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ।

রজনী (রজনী ১।১) ॥

রজনীর চোখের সামনে রাত্রির অন্ধকার ছায়া মেলেছিল সত্য, কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে তার হৃদয়ে প্রেমের যে আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠেছে তাতে চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়েছে। লর্ড লিটনের" 'Last Day of Pompeii' উপন্যাসের কানা ফুলওয়ালী নিদিয়ার কাছে রজনীর ঋণের কথা বঙ্কিম স্বীকার করে সমালোচকের সাদৃশ্য—দর্শনের পাণ্ডিত্যের অহমিকাকে নিবৃত্ত করেছেন কিন্তু স্বীকার করতেই হবে—অন্ধত্ব এবং ফুলওয়ালীর বৃত্তি ছাড়া উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুবই কম। নিদিয়ার ভালবাসা ও রজনীর ভালবাসার মধ্যে পার্থক্য অনেক।

রজনী ফুলওয়ালী হলেও বঙ্কিম সর্বদাই তাকে মর্যাদা দান করেছেন। সাধারণ পসারিণীর মত সে পথে পথে ফুল বিক্রি করে না। পিতামাতাকে মালা গেঁথে সাহায্য করে মাত্র। তবে দু'একটি ভদ্রগৃহে ফুলযোগান দিতে তার যাতায়াত আছে। তা নাহলে তো শচীন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অসুবিধা।

রজনীর হৃদয়ে শচীন্দ্রের প্রতি অনুরাগের সঞ্চারণটি বড় অদ্ভুত। স্পর্শ এবং শব্দই রজনীর ভালবাসার উপকরণ। ফুলের স্পর্শ সে আজীবন অনুভব করেছে ভালবাসার কোমলতা। শচীন্দ্রের স্পর্শে সে খুঁজে পেল সেই ফুলের পেলবতা। তার হৃদয়ে জন্ম হল প্রেমের। কান দিয়ে শুনেছে সে এই আশ্চর্য পৃথিবীর পরিচয়, শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর তাকে আকর্ষণ করেছে। রজনীর প্রেমের তীব্রতা ও একাগ্রতা যথেষ্ট। শচীন্দ্রকে দুর্লভ জেনেও সে মনে মনে তাকেই স্বামী ব'লে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। হয়ত অন্ধ বলেই শচীন্দ্রের ঐশ্বর্য এবং তার দারিদ্র্য, ভালবাসার আঙিনায় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে দিতে পারেনি।

রজনীর সাহসও অসীম। শচীন্দ্রকে ভালবাসার মূল্য দিয়েছে সে গৃহত্যাগ করে। একে নারী, তায় অন্ধ—তার পক্ষে অপরিচিত লোকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করা যে কতবড় সাহসের পরিচয় তা সহজেই অনুমেয়। রজনী শক্তির পরীক্ষা দিয়েছে হীরালালের লাঠি ভেঙে এবং সেই ভগ্নাংশ দিয়ে তাকে আঘাত হেনে।

রজনীর কৃতজ্ঞতাবোধ প্রবল। অমরনাথ তার বিষয় উদ্ধার করে যতটা না হোক, তাকে দুষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করে রজনীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার আসন পেতে বসেছিল। সে কৃতজ্ঞতাবোধ এত প্রবল যে ভালবাসার পাত্রকেও দূরে সরিয়ে দিয়ে রজনী অমরনাথের কথামত তাকে বিবাহ করতে রাজী হয়। দরিদ্রাবস্থায় সাহায্যের জন্য লবঙ্গলতা ও শচীন্দ্রের প্রতিও রজনী কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে, বিষয়সম্পত্তি গ্রহণে শৈথিল্য দেখিয়ে। রজনী শেষ পর্যন্ত অমরনাথকে ভোলেনি। অমরনাথের ত্যাগ ও মহানুভবতাকে সে আজীবন বাঁচিয়ে রেখেছে, পুত্রের অমরপ্রসাদ নামকরণের মধ্যে।

অন্ধের কাছে ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য সমতুল্য। তবুও রজনী যেভাবে বিষয়ভোগে অনাসক্তি দেখিয়েছে তাতে তার নিরাসক্ত মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

রজনী চরিত্র সর্বাপেক্ষা সুপরিস্ফুট হয়েছে প্রথম খণ্ডে 'রজনীর কথা'র মধ্য দিয়ে। অন্ধের অনুভব, তার বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও চিন্তার সুস্পষ্ট পরিচয় এতে পাওয়া যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে যে রূপের মূল্য নিতান্তই নগণ্য রজনী তা প্রমাণ করেছে।

রজনীর জীবন আগাগোড়াই দ্বন্দ্বসংকুল। শচীন্দ্রকে ভালবেসে তার হৃদয়ে দ্বন্দ্বের শেষ নেই। এই দ্বন্দ্বেরই পরিণাম তার গৃহত্যাগ। কিন্তু শেষাংশে একদিকে শচীন্দ্রের প্রতি ভালবাসা, অন্যদিকে অমরেন্দ্রনাথের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতাবোধ রজনীচরিত্রকে দ্বন্দ্বমুখর করে তুলেছে। অমরেন্দ্রনাথের স্বার্থত্যাগ-এর সমাধান না করলে রজনীর জীবনে ট্র্যাজেডী দেখা দিত। রজনী সরলস্বভাবাও বটে। তাই অমরেন্দ্রনাথের কাছে নিঃসঙ্কোচে প্রণয়ের কথা স্বীকার করে অমরেন্দ্রের সংশয় দূর করেছে।

নিদিয়ার জীবন শেষ হয়েছিল ব্যর্থ প্রেমে। কিন্তু রজনীর অন্ধত্ববিমোচন যতই অবাস্তব হোক না কেন, তার অন্তর্লোকে যে আলোক সঞ্চারিত হয়েছে, চক্ষে আলোকের সঞ্চারকে তার রূপক বলে মেনে নিতে কোন বাধা নেই।

বটতলার নিধুবাবু

শ্রাবণ সংখ্যা সমকালীনে বটতলার নিধুবাবু প্রসঙ্গে শ্রীবিদ্যুত মৈত্রের সুদীর্ঘ আলোচনা দেখে আনন্দিত হলাম। তাঁর অভিযোগ বোধ করি এই যে, নিধুবাবু অধুনা অনালোচিত প্রায় বা আলোচনার আড়ালে তিনি অযথা প্রশংসার উচ্ছ্বাসে প্রবহমান অথবা (গঞ্জিকা সেবন ও চরিত্র-হীনতার) অন্যায় নিন্দাগ্লানির কণ্টক-মুকুট পরিহিত। মোটামুটি যে কেউ সমালোচিত হন এই প্রচলিত তিনটি শ্রেণীর একটিতে। কিন্তু নিধুবাবু একই সঙ্গে কি করে তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী পথেরই স্বাদ পেলেন তা বিস্ময়ের বিষয় নিঃসন্দেহে। যাই হোক, আমরা শ্রীমৈত্রের কয়েকটি মন্তব্য পুনরালোচনা সাপেক্ষ মনে করি। তিনি বলছেন নিধুবাবুর অবিসংবাদী আধিপত্যের কারণ 'তিনি একে সঙ্গীত রসিক তায় আবার অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন।' নিধুবাবুর জনপ্রিয়তার প্রথমতম ও প্রধানতম কারণ তিনিই প্রথম 'জনসভার গায়ক'। এর আগে রাজসভার পোষা গায়ক কেবল রাজাকেই গান শোনাতেন, কৃষ্ণনগর—মুর্শিদাবাদে। তারপর কান্তবাবু নকুধরেরা নিজেদের বারমহলের জলসাঘরে সাদাচামড়ার মন ভেজাতে যে যবনী নাচ গান পরিবেশনের আয়োজন করতেন সেখানেও আপামর জনসাধারণের অনুপ্রবেশের পাশপোর্ট ছিল না—আনাচে কানাচে উঁকিঝুঁকি মারলেই ভোজপুরী দারোয়ান হুঙ্কার দিত 'হঠ যাও'। নিধুবাবুই প্রথম পাবলিক আটচালার 'ভোরের পাখী' যিনি সদ্য সংকর জনতাকে গান শোনাতে বসলেন এই উন্মুক্তাঙ্গনের প্লাটফরমে। এই সহজ সূত্রটিই পপুলার গায়কের সিদ্ধির চাবিকাঠি। আর 'বন্ধুবৎসল' শব্দটি তাঁর গম্ভীর প্রকৃতির বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়। তিনি শ্রীমতীর স্তুতি বিনয় স্নেহ নির্মল প্রণয়ের বশ্য হলেও 'অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন, তাঁহার মুখের পানে মুখ করিয়া 'বাবু একটা গান কর' এমত কথা কহিতে কাহারো সাহস হইত না।'

নিধুবাবু বটতলা ও বাগবাজার, দু' আড্ডারই পক্ষীরাজ হয়েছিলেন কিন্তু একের পর এক—একই সঙ্গে নয়। আর জয়চন্দ্র মিত্র সভাপতি ছিলেন না—আটচালাটা ছিল তাঁর বাড়ীর পাশেই। সে সময় কলকাতায় 'গাঞ্জার গুঞ্জন' একটি পাবলিক কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীকালে গঞ্জিকা সেবন কলকাতাতে ধর্মের বিকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে এবং শ্মশান-সাধু-সাধনা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। বটতলার আটচালার গাঞ্জা সেবন সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছিল এখন একটি সাম্প্রতিক প্রমাণ আলোচনা করা যাক। আটচালার প্রতিষ্ঠাতা রামনারায়ণ মিশ্র নিমতলার মন্দির আনন্দময়ীতলার মালিক ছিলেন। এই মন্দিরের পাশেই বর্তমানে রয়েছে বাবা ভূতনাথের মন্দির। উত্তর কলকাতার 'ওপেন' গঞ্জিকা সেবনের এমন অ-শ্মশান অঞ্চল আর নেই। সম্ভবতঃ নিমতলা শ্মশানের সংক্রামক 'মাহাত্ম্য' এর কারণ না হতেও

পারে—পথের ধারে ধারে আজও একমুখী পাঁচমুখী বহু মাটির কলকের কুটির শিল্প লক্ষণীয় ভাবে দৃশ্যমান। ব্যক্তিগত ভাবে ধনী রামনারায়ণ মিশ্রের রুচি বৈচিত্র্যের সন্ধান এতদিন পরে পাওয়া একটু মুশকিল কিন্তু আনন্দময়ীতলার বর্তমান উত্তরাধিকারী রামনারায়ণ মিশ্রের (জ্যেষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুতে) দৌহিত্র মাধবকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেও জেনেছি শ্রীমিশ্রের প্রতিষ্ঠিত আটচালার আড্ডাটি প্রকৃতপক্ষে গাঁজারই আড্ডা ছিল। সমকালীন ব্যক্তিদের জীবনী আত্মজীবনী ছাড়াও বটতলার অধিবাসীদের লোকপরম্পরার জনশ্রুতি এই তথ্যকেই সমর্থন করে। অবশ্য শ্রীমৈত্রের মত, গাঁজার আড্ডার নেতা নিধুবাবুকেও 'প্রচণ্ড গঞ্জিকা সেবী' ধরে নিতে হয়—এর কোন বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। বরং শ্রীমৈত্রের ধারণানুযায়ী চিকিৎসাশাস্ত্রের সুস্বাস্থ্যানুসারে মদ ও গাঁজার নেশা সমান্তরাল ভাবে চালান শক্ত। আর নিধুবাবু যে প্রচণ্ড মদ্যপায়ী ছিলেন একথা লং সাহেবও শুনেছেন! নিধুবাবুর নিয়মিত স্নানাহার করার কথাটিতে জোর দেওয়া হয়েছে। পৈতৃক ভিটে ২০নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীটে (বটতলার কাছেই) হওয়া সত্ত্বেও নিধুবাবু প্রামাণিক ভাবেই দিনরাত আটচালাতে কাটাতেন। বলা বাহুল্য, এটা 'পক্ষী'দের অন্যতম কনভেনশন ছিল। সম্ভবতঃ নিধুবাবু পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট শান্তির সন্ধান পেতেন না, অন্ততঃ দাম্পত্য জীবনে তিনি যে পরিতৃপ্ত হন নি, তৃতীয় পত্নী বর্তমানেও শ্রীমতী প্রসঙ্গ তারই পরোক্ষ সাক্ষ্য। অতএব নিয়মিত স্নানাহারের তথ্যটি খুব বিশ্বস্ত নাও হতে পারে। মনে রাখতে হবে গুপ্তকবি নিধুবাবুর লুপ্তজীবনী সংগ্রহ করেছিলেন নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপালের কাছেই (অথচ জয়গোপালকেই তিনিও 'জয়চন্দ্র' বলে ভুল করেছেন।) গুপ্তকবি কর্তৃক প্রচারিত বহু তথ্যে শ্রীমৈত্র 'সংশয়' প্রকাশ করেছেন হঠাৎ অনুকূল ঠেকতেই নিয়মিত স্নানাহারের তত্ত্বে অচলা বিশ্বাস রাখছেন কেন বুঝলাম না!

আরেকটি বড় যুক্তি বলা হয়েছে নিধুবাবুর সুদীর্ঘ আয়ু। জীবনের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে নেশার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সব সময় নাও থাকতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর ধনীমহলে তো তাহলে সব 'বাবু'কেই 'শিশুমৃত্যু' না হোক কালীপ্রসন্ন সিংহের মত অকালমৃত্যু বরণ করতে হত। গীতরত্নের যে সংস্করণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই রয়েছে 'এই গীতরত্ন গ্রন্থ যাহা রামনিধি গুপ্ত কর্তৃক অশক্তাবস্থায় ও বিস্তর অশুদ্ধ সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।' অর্থাৎ শেষ বয়সে নিধুবাবু হয়তো বেশ শক্ত ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর আখড়াই থেকে হাফ আখড়াই-এ যে ঝুঁকে পড়ার কারণও গুপ্তকবি বলেছেন—নিধুবাবু প্রাচীন হলেন। কারণ নিধুবাবু তাঁর শিষ্য মোহনচাঁদ বসুর সৃষ্ট চটুল হাফ আখড়াই মনে প্রাণে প্রথমে মেনে নিতে পারেন নি। নিধুবাবু যে শেষ বয়সে অশীতিপর বৃদ্ধের মত 'এখন তখন' হয়ে পড়েছিলেন তাও জানা গেছে। বস্তুত একটি সংবাদপত্রে নিধুবাবুর মৃত্যু সংবাদে তাঁর মৃত্যুকালীন বয়স বলা হয়েছিল আশীবছর। সেকালের ঘনিষ্ঠ কলকাতায় প্রতিমুহূর্তেই নিধুবাবুর মৃত্যুসংবাদ রটত মুখে মুখে। অনেকে আবার গুজবের সত্যতা যাচাই করবার জন্য স্বয়ং এসে নিধুবাবুকেই নাকি জিজ্ঞেস করতেন 'মশাই আপনি এখনও বেঁচে আছেন কি?'। জনসমুদ্রের ভীড়ে বসে থাকা এই নির্জন মানুষটির এত প্রচারিত গাম্ভীর্য থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ যে তাঁরই কাছে অপপ্রচার যাচাই করতে যেতে সাহস পেত এতে যেমন

নিধুবাবুর জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হত তেমনি বৃদ্ধের শেষ বয়সে অসহায়তাও সুস্পষ্ট হত বই কি। তাই মনে হয় নিছক সুদীর্ঘ আয়ু আর সুস্থ স্বাস্থ্য বোধকরি সবক্ষেত্রে একই বস্তু নাও হতে পারে।

নিধুবাবুর সততা ও নির্লোভ তর্কাতীত নয়। ছাপড়ার ঘটনাগুলো সম্বন্ধে আমরা যা জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় নিধুবাবুও উনবিংশ শতাব্দীর 'জাতীয় খাদ্য' ঘুষের কবলেও পড়েছিলেন। অবশ্য প্রসঙ্গটি বিতর্কিত, যেমন রাজা রামমোহন অথবা মহারাজা নন্দকুমারের ঘুষ নেওয়াগুলোও। নিধুবাবু যে দশ হাজার টাকা ছাপড়ায় নিয়েছিলেন তা ঘুষ না তাঁর সঞ্চয় জানা শক্ত, তবে 'কালেক্টরের দেওয়ানীর পদের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে ঐ পদের দাবী ত্যাগ করে সামান্য কেরানীর পদ গ্রহণ' করার মধ্যে সততার কোন ইঙ্গিত না দেখতে পেয়ে আমরা দুঃখিত।

যে নিধুবাবু ব্রহ্মসঙ্গীতের রচয়িতা তিনি গাঁজাবাজ হবেন কি করে। কিন্তু ঐ একটিমাত্র ব্রহ্মসঙ্গীতও নিছক ফরমায়েসী রচনা। উচ্ছবানন্দ বিদ্যাবাগীশের 'আদেশে' রচিত এ গানটি নিধুবাবুর ব্রহ্মসাধনা ইঙ্গিত করে বলে মনে হয় না। তার চেয়ে বড় কথা তা হলে তিনি একই কলমে বাণী বন্দনা শ্যামাসঙ্গীতও রচনা করতে পারতেন না। কেরী সাহেবের মুন্সীও একদা আদেশে'র বশে 'কে আর তারিতে পারে লর্ড জিছছ ক্রাইষ্ট বিনা গো' রচনা করেছিলেন—কিন্তু তাতে রাম বসুকে কেউ খৃষ্টান বলে না অথবা রাম বসুর যুবতী বিধবা সংসর্গ ও গর্ভপাতের দুর্ণাম ঘোচে না। আর স্বয়ং রামমোহন বটতলায় যে গান শুনতে আসতেন (কথাটি খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শোনা, আমিই বোধহয় প্রথম প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম) তা অশ্লীল খেউড় কিনা প্রমাণ করা যায় না, তবে তা নিশ্চয়ই ব্রহ্মসঙ্গীত নয়। তা ছাড়া রামমোহনও সেকালের সেরা নিকি বাইজীর মুজরো বসাতেন তাঁর বাগানবাড়িতে কিন্তু এর জন্য নিকিকে কেউ 'পরমব্রহ্ম' বলেছেন শুনিনি। স্বয়ং রামমোহনের নামেও শুধু ঘুষ খাওয়াই নয় (কিশোরীচাঁদ মিত্র), যবনীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন-তথ্যও সরবরাহ করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অতএব মহাপুরুষ আসতেন বলেই বটতলার পাবলিক আটচালা ধুনো গঙ্গাজলে ভরে যেত তা মনে হয় না কারণ রামমোহন তখন ধনী 'রাজা' মাত্র—আর আজকের আঙ্গিকে যা মনে হচ্ছে সেকালের চোখে তা নিছক কালচার।

এবার নিধুবাবুর রচিত গানগুলো নিয়ে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। গুপ্তকবি বলেছেন নিধুবাবুর টপ্পা 'কবিতা' হিসেবে পড়তে ভাল নয়—গান হিসেবে গাইতে ভাল। তবু নিধুবাবুর গানে যে রবীন্দ্রনাথ ও রেঁনেসার উপলব্ধি ভবতোষ দত্ত করেছেন সেকথাও প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিনিধি হিসেবে নিধুবাবুকে মেনে নিতে সুশীল দে নারাজ ছিলেন। সদ্য সাঙ্করের অরাজক সাহিত্যে নিধুবাবুর এ গানগুলো একদা 'অশ্লীল' বলেই বিবেচিত হত। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি পরিবেশিত হয়ে এ ছাড়াও রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন 'আদিরস ঘটিত গীত রচনায় ইঁহার (নিধুবাবুর) অলৌকিক ক্ষমতা ছিল।...আদিরস ভিন্ন নিধুবাবুর রচিত অন্যরূপ গীত অল্পই আছে।' বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অন্যতম পুরোধার এ মন্তব্যটি উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। এর পর এযুগে 'উনবিংশ শতাব্দী' সম্বন্ধে নব চেতনাবোধ জাগ্রত হতেই নিধুবাবুর গানেরও পুনর্বিচার সুরু হল 'বদলে গেল মতটা'

দিয়ে।* যেসব জ্ঞানীগুণীরা এর পরেও জীবিত ছিলেন তাঁরা নিধুর গানের প্রশংসা সুরু করলেন উচ্ছ্বসিত ভাবে এমন কি অজ্ঞাস্তে পূর্বে কোন নিন্দা করে থাকলেও 'গৌরবসূচক পশ্চাদপসরণ' শুরু করলেন। যেমন বঙ্গদর্শন পুরাতন পর্য্যায় ৭ম-৮ম ভাগ (১২৮৭-৮৮ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন নিধুর টপ্পা 'অতি নীচ শ্রেণীর কবিতার করতোপ।' ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নারায়ণে অমরেন্দ্রনাথ রায় জানালেন 'এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পুরাতন মত অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি দুঃখিত।' এই হল নিধুবাবুর টপ্পা সম্পর্কে আমাদের ধারণার বিবর্তন। শ্রীমৈত্র লিখেছেন, নিধুবাবু 'যত গান রচনা করেছিলেন তার মধ্যে কালের প্রভাবানুযায়ী দু' একটা আদিরসাত্মক থাকলেই সবগুলিই যে ঐ জগতের তার প্রমাণ নেই'—সে চেষ্টাও আমরা করব না শুধু কালের প্রভাব কথাটাকে একটু ব্যাপক ও বিস্তৃত করতে চাই। শুধু কাল নয় স্থান কাল পাত্র এবং পাত্রীর প্রভাবও কম নয়। স্থানের প্রভাবটা যে কি মারাত্মক তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না সেকালের চিৎপুর। আর পাত্রীর কথা স্মরণ করলাম বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী পড়ে—'তবে টপ্পা খেয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদ গান করেন কেন? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন 'কোন কথাগুলি সুখকর—সামান্য গণিকাগণের চরিত্রের গুণগান সুখকর না দেবতার অসীম মহিমা গান সুখকর?' শ্রীমতী প্রসঙ্গে নিধুবাবুর গানগুলোও এ ব্যাপারে ভেবে দেখা দরকার। ১২৯৭ সালে গরাণহাটার সরকার এ্যাণ্ড কোম্পানী নিধুবাবুর সঙ্গীত রচনার উপলক্ষ্য সংক্রান্ত কাহিনীসহ 'প্রেমসঙ্গীত' প্রকাশ করে আরও ভাবিয়ে তুলেছেন। শ্রীমতী প্রসঙ্গটি আমরা পরে বলছি। শ্রীমৈত্র বলেছেন নিধুবাবুর গীতরত্নে যে বহিরাগত অশ্লীল গানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সে রচনার দুর্নামের দায়িত্ব নিধুবাবুর নয়। ঠিক একই কারণে অন্যের রচিত কোন ভাল গানও নিধুর গান বলে প্রচারিত হলে তার কৃতিত্বও নিধুবাবুর প্রাপ্য হতে পারে না। বাঙালীর গানের সম্পাদক কিন্তু বলছেন 'অনেকগুলি শ্রীধরের গান'—নিধুবাবুর নামে ইদানীং চলিয়াছে। ৺রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) টপ্পা সঙ্গীতের রাজা। কালবশে শ্রীধরের নাম বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের একরকম লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। নাম লুপ্তপ্রায় হউক—কিন্তু তাহার ভাল গানগুলি লুপ্ত হয় নাই। তাহা যে লুপ্ত হইবার নহে। সঙ্গীতাত্মা চিরদিন অবিনশ্বর। অবিনশ্বর বলিয়াই শ্রীধরের গানগুলি বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে সদাগীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ সকল গান কাহার চিরচিত (রচিত।) তাহা লোকে বুঝিতে না পারিয়া নিধুবাবুকেই এই গানের রচয়িতা বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। অনেকে ভাবিতেন এমন সুন্দর সুকবিত্বপূর্ণ সুমধুর টপ্পা এক নিধুবাবু ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না।' শ্রীমৈত্র উদ্ধৃত শেষ গানটি ('ভালবাসিবে বলে ভাল বাসিনে')—দুঃখের বিষয়, সেই বিতর্কিত রচনারই অন্যতম।

শ্রীমতী গৃহে মত্ত অবস্থায় শ্রেষ্ঠা টপ্পা রচনার মন্তব্য নিয়ে উত্তেজনার কোন কারণ নেই। কয়েকটি উদ্ধৃতির যোগাযোগে এই সিদ্ধান্ত। নিধুবাবুর শ্রেষ্ঠ গান টপ্পা—গণিকার গুণাগুণ বর্ণনা

* সুশীল দে লিখলেন 'নিধুর টপ্পা অর্থে আধুনিক পাঠক বুঝেন, বটতলা প্রকাশিত নিধুর নামে বিক্রীত জঘন্য টপ্পার সংগ্রহ। সেইজন্যই বোধ হয়, নিধুবাবুর গানের এত অশ্লীলতা অপবাদ।'

(বঙ্কিমচন্দ্র) রচিত হত শ্রীমতীর গৃহে (প্রেমসঙ্গীত দ্রষ্টব্য) প্রতিদিন সন্ধ্যায়। পর দিন আটচালায় তা গাওয়া হত (ঈশ্বর গুপ্ত)। নিধুবাবু তাঁর শ্রেষ্ঠ গান রচনা করেছেন মত অবস্থায় (লং সাহেব)। এখন এই কটি উদ্ধৃতির আলোকে কি প্রমাণিত হয় পাঠক বিচার করুন। শ্রীমৈত্রের এ কথা বিশ্বাস করতে 'প্রবৃত্তি' হয় না, কিন্তু কোন বিশেষ তথ্য বিশ্বাসের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার মাত্র—তথ্য তাতে অপ্রমাণিত থাকে কিনা সন্দেহ।

অতিসম্প্রতি আমার পরিচিত একজন শ্রদ্ধেয় সম্পাদক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে রক্ষিতা-মিসট্রেস পর্বটি প্রতিভার উন্মেষের পক্ষে সর্বদা ক্ষতিকর নাও হতে পারে। সেকালের বিচারে রক্ষিতা সামাজিক মর্য্যাদার ব্যরোমিটার ছিল একথা শিবনাথ শাস্ত্রী, কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, রাজনারায়ণ বসু বলেছেন। নিধুবাবু যদি সত্যিই কোন শ্রীমতীর প্রেমে পড়ে থাকতেন তাতে তাঁর প্রাপ্য মর্য্যাদার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার কথাও নয়। কিন্তু শ্রীমতী প্রসঙ্গে একটি নতুন তথ্যে নজর পড়া দরকার উনবিংশ শতাব্দীর মাসকমিউনিকেশনের অগ্রদূত নিধুবাবু সেকালের নেতা (Hero বলতে আজকাল যা বোঝায়)। সেকালের পরচর্চা প্রিয় বাঙালীর মধ্যে নতুন নায়ক সম্বন্ধে অহরহ চটুল প্রচার চালানো অস্বাভাবিক না হতেও পারে। কথাটা মনে হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রতিটি কবিয়ালের সঙ্গে একটি করে 'সঙ্গিনী'র সাদৃশ্য শোনার পর। প্রেমসঙ্গীতের রচয়িতার জীবনেও একটি প্রিয়া 'আবিষ্কার' করে অনেকেই হয়ত স্বস্তিবোধ করে থাকতে পারেন। এন্টনীফিরিঙ্গীর যেমন সৌদামিনী (মতান্তরে নিরুপমা)। যেহেতু এন্টনী সাহেব ছিলেন তাই তাঁর প্রিয়া সংগ্রহের সঙ্গে চারণকের প্রিয়া সংগ্রহ মিলে গেছে। আর মতান্তরের ক্ষেত্রে অবশ্য নৃত্য-গীতপটিয়সা প্রিয়া সংগ্রহটি প্রচলিত ধারণা থেকে গঠিত। কারণ অন্যান্য কবির ক্ষেত্রেও এই ঘটনাই ঘটান হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের শুরু থেকেই নিম্ন বা ভিন্ন জাতীয়া প্রণয়িনী সংগ্রহের ট্রাডিশন। সম্ভবতঃ সাহিত্য যে জীবনেরই দর্পণ এ তারই প্রমাণ। চর্যাপদ থেকেই আমরা নাড়িয়া বামুন ও নগর পারের ডোম্বিণীর পরকীয়া শুনে আসছি। ধামালী (ঢেমন-ঢেমনীর ব্যভিচার—ডঃ সেন) অর্থেও ডোম চাঁড়াল প্রণয়িনী উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চ মকারের সহজিয়া সাধনা ও পরকীয়া তত্ত্ব তো গভীর ব্যাপার! কিন্তু মন্দিরের সামনে অশ্লীল নাচগানের উৎসব ও অবৈধ যৌন অনাচার ব্যভিচার বাঙালী জীবন ও বাংলা সাহিত্যের আদিম মূল। গোয়ালিনী থেকে রজকিনীর বিবর্তন এই তো বাংলা সাহিত্যে গ্রাম্য ও নাগরিকতার মাইল ষ্টোন! চণ্ডীদাসের গোপনন্দিনী থেকে ভারতচন্দ্রের রজকনন্দিনী চিরদিনই গুপ্ত প্রণয়ের প্রশস্ত উপাদান বিবেচিত হয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্ন দাশরথি রায় সম্বন্ধে লিখছেন, কিতাবতী বাঙ্গলা ও 'যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজী শিক্ষা করিয়া মাতুলের সহায়তায় সাঁকাইয়ের নীলকুঠীতে সামান্য কেরানীগিরির কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময় পীলগ্রামে অক্ষয় কাটানী (অকাবাই) নাম্নী নৃত্যগীত ব্যবসায়িনী এক ইতরজাতীয়া কামিনী ছিল। দাশরথি বাল্যকাল হইতেই গীতবাদ্যে সবিশেষ অনুরাগ থাকায় যৌবনে উহার সহিত প্রণয় সঞ্চার হয়। কিছুদিন পরেই অকাবাই এক ওস্তাদি কবির দল করে—দাশরথি তাহাতে গীত বাঁধিয়া দিতেন।' আরেক কবিয়াল রামবসুর নামেও এই অপবাদ ছিল, নায়িকার নাম যজ্ঞেশ্বরী।

ডক্টর সুশীল দে লিখছেন 'tradition speaks of his (রাম বসুর) Partiality for one Jaines Wari, a Songstress of Nilu thakur's Party, who was herself a gifted kabiwala of some reputation in her time.' অনাথকৃষ্ণ দেব বলেছেন—'ইনি (যজ্ঞেশ্বরী) প্রথিত নামা কবি রামবসুর অনুগৃহীতা কোন রমণী বলিয়া প্রকাশ।' স্পষ্টতই এই প্রচলিত ধারণাতেই হয়ত ডঃ সেন শ্রীমতী-সংবাদের বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য অস্বীকার করেছিলেন এবং আমরাও তাঁরই তত্ত্ব নির্যাস ও তথ্য বিন্যাসে বিভ্রান্ত হয়ে অনুসরণ করেছি।

অর্থাৎ নিধুবাবু-শ্রীমতী সংবাদ ছাড়া অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো পুর্নবিবেচনার মত নতুন গবেষণার সংবাদ আমরা পাই নি। উচ্চমাত্রার ভাবালুতা আর নিরপেক্ষ গবেষণা বোধকরি একবস্তু নয়। 'স্বদেশী ভাষা' বা 'মোটা কাপড়' সবই মাথায় তুলে রাজনারায়ণ বসুর মত নাচা যেতে পারে কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভুলভ্রান্তি ভরা নায়ককেও মনুষ্যত্বের মাটি থেকে নির্বাসিত করে দেবত্বের অপ্রয়োজনীয় স্বর্গে জাগরিত করাতে কোন কৃতিত্ব রয়েছে। নিধুবাবু সংবাদপত্র চেতনার পরোক্ষ অগ্রদূত —মাস কমিউনেকশনের প্রথম সারথী কিন্তু তিনি নিখুঁত দেবতা নন। বটতলার টপ্পায় অশ্লীলতা (গ্রাম্য ও নাগরিক)-র 'ঐতিহাসিক' ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান আধুনিক গানের মত তা 'অ-পাঠ্য' না হতে পারে কিন্তু এযুগের রুচিতে সেদিনের টপ্পা শুনতে ভাল লাগলেও আসলে তা কতখানি 'শীল' তা বিতর্কের বিষয় হতে পারে।

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুরোহিত দর্পণ প্রসঙ্গে

'সমকালীন' শ্রাবণ সংখ্যায় জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বটতলানি' প্রবন্ধে লেখক বটতলার তলানি হাওড়াতে গিয়ে শুধু পাঁকের মধ্যে খাবি খেয়েছেন; যথেষ্ট ঐতিহাসিক আগ্রহ সত্ত্বেও নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার অভাবে সত্যের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেন নি।

প্রবন্ধের কিয়দংশে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে জড়িত বোধ না করলে, এ বিষয়ে কোন তর্কে নামবার প্রবৃত্তি আমার হত না। এবং প্রবন্ধের মূল দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা আমি করছি, তাও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যের ভূমিকামাত্র।

বটতলা সোনাগাছি অঞ্চলের কাছাকাছি বলেই বটতলার বইওয়ালারা আদিরসাত্মক পুস্তক নিয়ে ব্যবসা করেছে কথাটি অত্যন্ত অসঙ্গত। আর তার চেয়ে অসঙ্গত হল বটতলার বই সম্পর্কে নাক সিটকানো মনোভাব। আসলে বিগত শতকের গোড়ার দিকে বটতলার বিস্তৃত অঞ্চলই ছিল প্রধান বাজার—সব কিছুর। বএইর বাজারও স্বভাবতই সেখানেই গড়ে উঠেছে আর বাজারে মেয়েমানুষরা স্বভাবত তার ধারেকাছেই দোকান খুলেছে। কিছু পরে অবশ্য বাজারের অনেকখানি কিছুটা দক্ষিণে সরে গিয়ে নূতন বাজার নাম নিয়েছে, এই কারণেই যাত্রার দলগুলির আদিনিবাস

বটতলা অঞ্চলে। এমনকি কলকাতার প্রাচীনতম মিউনিসিপাল মার্কেটগুলির একটি আছে ওপাড়ায়।

বাঙলা সাহিত্য তখনও রূপ পায়নি। বাঙলার পল্লী সংস্কৃতির মুখ্যবাহন তখন যাত্রাগানে আর কলকাতার বাবু কালচার নিধুবাবুর টপ্পাও, কিছুটা রঙ্গিনীসঙ্গীতে। অথচ কলকাতা সহরে ছাপাখানা প্রবর্তনের পর থেকেই বাঙালীরা বইয়ের ব্যবসায়ে হাত দিয়েছে এবং তখনকার সুতোনুটির প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র চীৎপুর রোডের দুপাশে অনেক প্রকাশকসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কথাসাহিত্য, রম্যরচনা, কাব্য-কবিতা, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ কিছুই তখন রচিত হত না। কাজেই প্রকাশকদের বেসাতি ছিল বাস্তব জীবনের সবদিকের প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত বই। যাত্রাগান, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-চণ্ডী-স্তবকরচমালা, লক্ষ্মীর পাঁচালী, ব্রতকথা, চৈতন্যচরিতামৃত থেকে শুরু করে পূজাপ্রকরণ, নিত্যকর্ম, ফিটিং শিক্ষা, নাচগান শিক্ষা, লতাপতার গুণাগুণ, গো-চিকিৎসা, টোটকা চিকিৎসা, ম্যাজিক শিক্ষা, রঙ্গিনী সঙ্গীত—তখনকার প্রচলিত সমাজজীবনের ও টেকনোলজীর কোন বিষয়ই বাদ পড়েনি।

সে যুগে বইএর ছাপা ও কাগজে পারিপাট্য না থাকাই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে কলেজ স্ট্রীট প্রথম দিকে ছাপা ও কাগজের পারিপাট্যের জোরে 'বটতলার বই' সম্পর্কে অবজ্ঞা সৃষ্টি করেছে। আর করেছে বলেই ইতিহাস পাইওনীয়ারদের প্রতি অবজ্ঞা সমর্থন করবে না। এক কালের প্রধান মধ্যকলিকাতার বাজার চাঁদনী সম্পর্কেও সন্যগজিয়ে ওঠা ঝকমকে নিউ মার্কেটের দোকানদারেরা ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার মতলবে নাক সিটকে বলেছে—একি চাঁদনী পেয়েছেন মশাই।

'বটতলানি'-র লেখকের ভাবখানা এই যেন হীন উদ্দেশ্যে এবং প্রকাশকদের চারিত্রিক দোষের দ্বারা চালিত হয়েই বটতলা সমাজের কুরুচি ও কুসংস্কারগুলিকে তালিম দিয়েছে (আজ অবশ্য কলেজ স্ট্রীট তাই করছে)। এ দৃষ্টিভঙ্গী কট্টর সমাজসংস্কারকের, ইতিহাস গবেষকের নয়।

লেখক তাঁর গবেষণার উপাদান সংগ্রহে যেসব অসুবধার সম্মুখীন হয়েছেন, তাই নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু বটতলার প্রাথমিক যুগের প্রকাশকদের চরিত্রে কলঙ্ক ও উদ্দেশ্যে অসাধুতা আরোপ করে তারপর তাঁদের উত্তর পুরুষদের কাছে সহযোগিতা তিনি প্রত্যাশা করেন কোন সুবাদে! তাছাড়া বটতলার লেখকদের প্রতি তাঁর অমার্জনীয় তাচ্ছিল্য। তাঁর তথ্য সংগ্রহের ভ্রান্তি সম্পর্কে একটি বিশেষ উদাহরণই আমার মুখ্য বক্তব্য।

'পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম্য পুরোহিত' রচিত গ্রন্থ 'পুরোহিত দর্পণ' প্রসঙ্গে প্রকাশকদের কাছে খোঁজ নিয়ে তিনি নাকি জেনেছেন যে বইখানি 'টাকশাল বিশেষ'। আর 'রচয়িতার উত্তর পুরুষদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে' জেনেছেন যে 'পুরোহিতটির শেষ জীবনে আর্থিক অবস্থা হীন জেনেও বটতলার প্রকাশক তাকে কোন সাহায্য করেনি।'

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি জানাবেন 'পুরোহিত দর্পণ' নামে কোনও বই বটতলায় কোন প্রকাশক কবে প্রকাশ করেছেন?

আমি তাঁকে জানাচ্ছি যে ওই নামে কোন বই বটতলার কোনও প্রকাশক কোনোদিন প্রকাশ

করেননি। 'পুরোহিত দর্পণ' গ্রন্থের প্রকাশক বটতলার বইএর বাজার থেকে বেশ কিছু দূরে গুলু ওস্তাগর লেনাস্থিত প্রখ্যাত পত্রিকা প্রকাশক এবং বিভিন্ন বিষয়ের স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পি. এম. বাগচী অ্যাণ্ড সন্স্ (প্রাইভেট) লিমিটেড। ওই নামেরই আরেকখানি বই ছিল মস্‌জিদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীটস্থ সি. সি. বসাক অ্যাণ্ড সন্সের প্রকাশনায়। শেষোক্ত বইখানি বর্তমানে অপ্রচলিত, দীর্ঘদিন ছাপা নেই। 'টাকশাল বিশেষ' বই-এর এ অবস্থা হওয়ার কথা নয়। অতএব বসাক অ্যাণ্ড সন্সের 'পুরোহিত দর্পণ' লেখকের উদ্দিষ্ট গ্রন্থ নয়।

পুরোহিতেরা শুধু সুবচনী মঙ্গলচণ্ডী পূজাই করেন না। শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার আজও বাঙালী হিন্দুসমাজে শাস্ত্রনির্দিষ্ট মতে অবশ্য করণীয়। অন্যথা যাঁরা চরম নাস্তিক, তাঁদের ক্ষেত্রেও শ্রাদ্ধবিবাহাদিতে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত এবং এসব কাজে পুরোহিত অপরিহার্য।

কাজেই পুরোহিত দর্পণের বিষয়বস্তু এমন অবজ্ঞাত বিষয় নয় যে 'কোন গ্রাম্য পুরোহিত' তা রচনা করতে পারে। এই রচনা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন স্মৃতিতন্ত্র প্রমুখ শাস্ত্রে এবং ক্রিয়াকাণ্ড ও বৈদিক বিষয়ে সুপণ্ডিত ভিন্ন সম্ভব নয়।

বসাকদের প্রকাশিত 'পুরোহিত দর্পণে'র রচয়িতা সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেদান্তশাস্ত্রী না ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক, না ছিলেন পুরোহিত। তিনি ছিলেন নদীয়া জেলার অধিবাসী এবং প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগের প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক। বটতলার নয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স্ প্রভৃতি অ-বটতলার প্রকাশকেরা সেযুগে তাঁর রচিত উপন্যাসকে বেস্ট-সেলার বিবেচনা করতেন।

বাকচী কোম্পানীর 'পুরোহিত দর্পণ' টাকশাল বিশেষ নিঃসন্দেহ, যদিচ বর্তমানে তার দাম দশ টাকা নয়, একুশ টাকা। এ গ্রন্থের রচয়িতা মূলত পূর্ববঙ্গীয় হলেও তিনি গ্রাম্যও ছিলেন না পুরোহিতও নয়। সে যুগে কলকাতার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় এবং বৈষয়িক সমাজে পরম সম্মানিত ব্যক্তি। শেষ জীবনে কেন, জীবনের কোন সময়েই তার আর্থিক অবস্থা এমন হীন হয়নি যে কপিরাইট বিক্রি করা বই-এর প্রকাশকের কাছে অর্থের প্রত্যাশী হবেন।

গ্রন্থ রচয়িতার কোন উত্তরপুরুষের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কথা বলেছেন তা জানবার দাবি আমি করতে পারি। কারণ বাজারে প্রচলিত 'পুরোহিত দর্পণ' নামে একমাত্র গ্রন্থ, এবং যা টাকশাল বিশেষ যদিচ বটতলা থেকে প্রকাশিত নয়—সেই গ্রন্থের রচয়িতার উত্তরপুরুষ আমি ও আমার পরিবারস্থ আর সকলে। তার বাইরে আর কেউ নেই।

রাখাল ভট্টাচার্য

বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা ॥ ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। কলিকাতা-১২। মূল্য : ছয় টাকা।

বস্তুজগত ও অধ্যাত্মজগত এই উভয় জগতকে জয় করে যিনি দুর্লভ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময় বাঙ্গালী হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তথাকথিত ভাববাদী সন্ন্যাসীর মত সমাজ-সংসার থেকে দূরে বহুদূরে নির্জন পর্বতগুহায় ধ্যানাসীন জীবন স্বামী বিবেকানন্দ গ্রহণ করেন নি। দৈনন্দিন নানা সমস্যায় বিজড়িত সাধারণ মানুষের জীবন মঞ্চেই তাঁর সাধনার বেদী নির্মাণ করেছিলেন। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রতিটি স্থানে তিনি পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন। অভিজাত ধনী রাজা-মহারাজা থেকে আরম্ভ করে দরিদ্র অস্পৃশ্য সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে স্বামীজী মিশেছেন নিবিড়ভাবে। সর্বশ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনায় তিনি অংশ নিয়েছেন। স্বামীজী ভারতবাসীর নাড়ীর স্পন্দন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের যথার্থ অভাব কোথায়? ধর্মপ্রাণ ভারতের ধর্মপ্রবণতাকে উজ্জীবিত করতে হলে যেমন ধর্মের সংস্কার প্রয়োজন, তেমনি ধর্মকে বিজ্ঞান ভিত্তিক হতে হবে। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে তিনি এক সূত্রে বেঁধেছেন এবং স্বামীজীই সর্বপ্রথম ধর্মকে বলেছেন ধর্মবিজ্ঞান।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী। তিনি বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ আছে বলে মনে করেন নি। বরং উভয়ের লক্ষ্য মূলতঃ একাভিমুখী সেকথাই তিনি প্রমাণ করে গেছেন তাঁর বিবিধ রচনায় ও ভাষণে। মানুষের মন হবে উদার ও সমুন্নত, অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ ব্যবস্থা রচনা করে প্রতিটি মানুষ হবে পরিপূর্ণ—স্বামীজী এইভাবেই ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক দানেই তা সম্ভব হতে পারে। তাই স্বামীজী ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই কণ্ঠে মালা বদল করিয়েছেন। পুরুষ ও নারী যেমন পরস্পরের পরিপূরক, তেমনি পরস্পরের পরিপূক ধর্ম ও বিজ্ঞান। ধর্ম এবং বিজ্ঞান কখনই স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ যদিও প্রথাগত বিজ্ঞানী ছিলেন না, তথাপি তিনি যে সহজাত বিচারশীল বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী ছিলেন, এ কথা আজ স্বীকার না করে উপায় নেই। শৈশবে তিনি কোন বৈজ্ঞানিক আবেষ্টনীতে মানুষ হননি এবং এমনকি, তিনি কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্রও ছিলেন না। অথচ তাঁর ঝোক ছিল বালক বয়স থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি। জাতিভেদ প্রথার সারবত্তা, ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে কৈশোরেই স্বামীজী বিতর্কে নেমেছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি চেয়েছেন। সারাজীবন তিনি সর্ববিষয়েই বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করে গেছেন। তথাকথিত সাধারণ সন্ন্যাসীর মত বিবেকানন্দ কোনদিনই বিজ্ঞানের বিরোধী হন নি। তিনিই অধ্যাত্মজগতের

কুহেলীঘেরা নানা তত্ত্ব বিজ্ঞানের রঞ্জনরশ্মিতে আলোকিত করেছেন ; তিনিই প্রথম কুসংস্কারের জটাজালে বদ্ধ ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বিমুক্ত করেন। জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব এবং উচ্চ গণিতে স্বামীজীর ছিল অসামান্য অধিকার। বিজ্ঞানচেতনা ছাড়া ধর্মকে অন্ধ প্রাণহীন, একথা স্বামীজী ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন সন্ন্যাসী এমন সোচ্চারে বলেছেন কিনা আমাদের জানা নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের এই বিজ্ঞান চেতনাকে অবলম্বন করে ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার 'বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা' নামে বাংলা ভাষায় এক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এই অভিনব বিষয়ের জন্য বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজ মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। স্বামীজী বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় সমৃদ্ধ সমগ্র ইউরোপকে জয় করেছিলেন যে ধর্মাস্ত্র দিয়ে, তা ছিল বিজ্ঞান নির্দেশিত বিচার বিশ্লেষণে তীক্ষ্ণ। তাঁর সকল বিবৃতি ও রচনা বিজ্ঞাননির্ভর সত্য দর্শনের নিরঙ্কুশ ইঙ্গিতে সমুজ্জ্বল। স্বামীজীর বেদান্ত বাণীও ছিল বিজ্ঞাননিষ্ঠ। ডক্টর অমিয়কুমার তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন পর্বে স্বামীজীর রচনা ও ভাষণের ভিত্তিতে বিবেকানন্দের নিরাসক্ত মনকে আবিষ্কার করেছেন। এ আবিষ্কার অভিনব ও অভিনন্দনের যোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থ 'বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা' পূর্বলেখ সহ একাদশ পর্বে বিভক্ত। পূর্বলেখ : প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, প্রথম পর্ব : বৈজ্ঞানিক মেজাজ, দ্বিতীয় পর্ব : স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান, তৃতীয় পর্ব : কারিগরি বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ, চতুর্থ পর্ব : বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম ও বিবেকানন্দ, পঞ্চম পর্ব : বিবেকানন্দ ও ক্রমবিকাশবাদ, ষষ্ঠ পর্ব : অধ্যাত্মবস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সপ্তম পর্ব : বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান, অষ্টম পর্ব : বিবেকানন্দের নৃতাত্ত্বিক মতবাদ, নবম পর্ব : বিবেকানন্দ ও বিদেশী বিজ্ঞানী, দশম পর্ব : বিবেকানন্দ জগদীশচন্দ্র নিবেদিতা এবং একাদশ পর্ব : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী। গ্রন্থের বিভিন্ন পর্বগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্ব। ক্রমবিকাশবাদ, মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় স্বামীজীর যে কৃতিত্ব তা লেখক অতি স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। 'বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান'—এই পর্বটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। আলোচনাটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হল এবং এটা আরো বিস্তৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। গ্রন্থের প্রতিটি পর্বই স্বয়ং সম্পূর্ণ। মনে হয়, লেখক বিভিন্ন সময়ে লেখা বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলিকে একত্র করেছেন। সেজন্য কোনো কোনো পর্বে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে।

উপসংহারে, বর্তমান বিজ্ঞান চঞ্চল যুগে অত্যন্ত কালোপযোগী গ্রন্থ রচনার জন্য ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদারকে ধন্যবাদ জানাই। সাম্প্রতিক প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থরাজির ক্ষেত্রে এটি একটি বিশিষ্ট সংযোজন। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়।

অধীর দে

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ষোড়শ বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৭৫

আনন্দে
উৎসবে
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

দোলনার ছুটি

খোকার বয়স তিন বছর ; ওর দোলনাটি অবশ্য ওর চাইতে একদিনের ছোট। ওদের জীবন প্রায় অচ্ছেদ্য ভাবেই স্থরু হয়েছিলো। খোকা যখন আস্তে আস্তে বড় হতে স্থরু করলো তখন দোলনায় শুয়ে ঘুমোনোটা ওর আর পছন্দ হচ্ছিলো না। ও নিজেকে অনেক বড় বলে মনে করতে লাগলো, কাজেই দোলনায় শোয়া ছেড়ে দিলো। দোলনাও ছুটি পেলো। তবে খোকা তার এই পুরানো সঙ্গীকে অন্য রকমভাবে ব্যবহার করার উপায় বের ক'রে ফেললো। দোলনাটা ওর ছবির বই, ব্যাট, পুতুল ইত্যাদি রাখার জায়গা হয়ে গেলো। মা বললেন "দেখো খোকার কত জিনিস; ও কত খুসী।" বাবা বেশ গর্ব্বের সঙ্গে হেসে বললেন "দোলনাটাকে অনেক দিনের ছুটি দিয়ে আমরা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিনি কি ?" হ্যাঁ; ওরা সত্যিই বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান বাবা মা পরিকল্পনা করেই পরিবার গঠন করেন। পরিবার পরিকল্পনার অর্থ শুধু কম ছেলে মেয়ে হওয়াই নয়,
বাবা মা যখন সত্যিই আর একটি সন্তানের জন্য তৈরী হন তখনই শুধু সন্তান লাভ করাটাও পরিবার পরিকল্পনের অন্তর্ভূক্ত। সন্তান জন্ম এখন আর দৈবের ওপর নির্ভরশীল নয়। পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিতে আপনি ইচ্ছানুযায়ী সন্তান লাভ করতে পারেন। বিনামূল্যে পরামর্শাদির জন্য আপনার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যুগান্তর শিবনাথ শাস্ত্রী

৭৩ বৎসর পূর্বের উপন্যাস বর্তমানের সমাজপটভূমিতে বিষয়বস্তু ও রূপের দিক দিয়ে প্রয়োজনহীন বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা বিগত ৭৩ বছরে বাংলা উপন্যাস নানাবিধ পরিবর্তন লাভ করেছে, পাঠকের মানসিকতা ও রুচি পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এমন অনেক উপন্যাস আছে যেগুলি পাঠকের কাছে কোনদিন পুরোনো হয় না বরং সেগুলি পাঠ করলে পাঠকের কৌতূহল বেড়ে যায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" সেই জাতের উপন্যাস। নবজাগরণের কালে বাঙালীসমাজ যে পরিবর্তন লাভ করেছে তারই রসসমুজ্জ্বল কাহিনীরূপ এ উপন্যাসে লভ্য। বস্তুতঃ তৎকালীন লেখক গোষ্ঠী এ ধরণের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে উপন্যাস লেখেন নি বললেই চলে। শিবনাথ নিজে ছিলেন তাঁর সময়ের বাংলাদেশের চিন্তানায়ক এবং কর্মযোগী। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে 'যুগান্তরে' আত্মপ্রকাশ করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং একদিকে উপন্যাসখানির মধ্যে ১৯ শতকের পরিবর্তমান সমাজমানসের সার্থক চিত্র, অন্যদিকে শিবনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ বিবৃত হয়েছে।

যুগান্তর উপন্যাসে শিবনাথের একটি বিস্তীর্ণ পরিকল্পনা সংকেতিত হয়েছে এবং এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে, বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পরিবারকে কেন্দ্র করে। এই সূত্রে যে চরিত্রগুলি এবং যে ঘটনাবলী উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে পাঠকের কাছে আজও সে সমুদয় সমাদরের অপেক্ষা রাখে।

এই উপন্যাসের বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন সমকালের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিশিষ্টে সাধনা পত্রিকায় (১৩০১, চৈত্র) রবীন্দ্রনাথ কৃত আলোচনা সংযোজিত হয়েছে মূল্য : আট টাকা

বাংলার পুরনারী দীনেশচন্দ্র সেন

দীনেশচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের ভগীরথ। তার ঐকান্তিক সাধনায় বাংলার পল্লী-গীতিগুলি বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিলুপ্ত হয় নি। মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা বাংলার প্রাণের সম্পদ। দীনেশচন্দ্রের গবেষণাবৃত্তের সোনার ফসল এই সব গীতিকা। শিল্পী দীনেশচন্দ্র এই গীতিকাগুলিকে অবলম্বন করে "বাংলার পুরনারী" লিখেছেন। বিষয়বস্তু পুরোনো, কিন্তু শিল্পীর প্রাণের ছোঁয়া পেয়ে তা যেন নতুন রূপ ধারণ করেছে।

বাংলাদেশকে এবং বাংলা সাহিত্যকে জানতে হলে এ গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

মূল্য : আট টাকা

দীনেশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক :

কানুপরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা, মুক্তা চুরি, রাখালের রাজগি, রাগরঙ্গ, সুবল সখার কাণ্ড

মূল্য প্রতিখণ্ড ২'৫০

পুরাণ প্রসঙ্গ :

বেহুলা ১'৬০
ফুল্লরা ১'৪০
জড়ভরত ১'৫০
সতী ১'৩০
ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ ১'২০

সমগ্র একত্রে
পৌরাণিকী ৬'০০
রামায়ণী কথা ৪'০০

জিজ্ঞাসা

কলকাতা : ৯
কলকাতা : ২৯

ষোড়শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আশ্বিন
তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন

ষোড়শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতের স্থাপত্য

অসিতকুমার হালদার

যে ভারতবর্ষের অন্তঃস্থল-বিকশিত অম্লান-কমলটির মত তাজমহল বিরাজ করছে, তাকে স্থাপত্য শিল্পের পীঠস্থান বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু বলতে কষ্টবোধ হয় যে এখনকার সভ্যতার ভদ্রাসন প্রসিদ্ধ কলিকাতা নগরীর দিকে যখন আমরা তাকাই, তখন প্রাচীন কীর্তিগুলির বিষয় স্মরণ করে যেমন উল্লাসে-গৌরবে বুক ভরে ওঠে, তেমনি এই আধুনিক শহরের কুশ্রী ঘর-বাড়িগুলো দেখে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাপত্যের জন্য কোনো আশা-ই মনে স্থান পায় না। প্রাচীন ভারতের সংখ্যাতীত রমণীয় স্থাপত্য-রচনা আর এখনকার এই শহরের ইট-কাঠের কতকগুলি পায়রার খোপ—যেন কতকগুলি প্যাকিং-বাক্স বা দেশলাইয়ের বাক্স উপরাউপরি সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা কলিকাতা সহরে ইষ্টক-হর্ম্যের মধ্যে বৈদ্যুতিক-পাখার তলায় বরফ-জল খেতে খেতে ভাবি 'পি, ডবলু, ডি'র তৈরি সরকারী 'বিল্ডিংগুলি' বা বেসরকারী রেলওয়ে-ষ্টেশন ভবনগুলিই বুঝি স্থাপত্য-কলার একমাত্র চরম ও পরম পরিচয়! আমরা গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে বসে থাকি। কলিকাতার দেশী কয়েক শত ধনীব্যক্তি বিলাতী-স্থাপত্যের বস্তা-পচা ওঁচা-নমুনার বাড়ি-ঘর তৈরি করাতে ঝুড়ি-ঝুড়ি অর্থ সামর্থ্যের অপব্যবহার করছেন, আর দেশের সকল প্রাচীন আদর্শ স্থাপত্যগুলি ক্রমশঃই অযত্নে অবহেলায় অজ্ঞাতে ধরাশায়ী হবার উপক্রম হচ্ছে—এমনি আমাদের অবস্থা! আমাদের স্বদেশ-সেবক হতে হলে, এটা জানতেই হবে যে সকল শিল্পের মধ্যে স্থাপত্যই জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে প্রধান। সকল দেশে সকল কালে প্রত্যেক জাতি এই স্থাপত্যের পাথরের ভিতের উপরই তাঁদের সভ্যতা সংস্কৃতির বিজয় নিশান উড়িয়ে গেছেন। তাই আজ আমরা ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যগুলির মত ইউরোপীয় প্রাচীন

ধ্বংসাবশেষ নষ্ট শহরগুলি থেকে, রোম ও গ্রীসের এবং মিশরের পিরামিড প্রভৃতি থেকে প্রাচীন অধিবাসীদের হৃদয়ের কত না নিগূঢ় পরিচয় পাচ্ছি।

সুন্দর ও সুগঠিত স্থাপত্য যেমন মনকে প্রসারিত করে দেয়, তেমনি আবার কদর্য্য স্থাপত্যে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও দীনতাই আনে। যে সৌভাগ্যবান সুন্দর গৃহে বাস করেন, তিনিই যে শুধু সুখী হন, তাই নয়—তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্য-কলা যাঁরা যাঁরা দেখবার সুযোগ পান, তাঁরাও ধন্য হন। সম্রাট সাহাজানের ভাগ্যে তাজমহল নির্মাণের দ্বারা যে আনন্দ, তাঁর সেই অমরকীর্তি যুগে যুগে তার চেয়ে কত বেশী আনন্দ কত দেশের নর-নারীকে দিয়ে আসছে—তার ইয়ত্তা আছে!

আজকাল আমাদের দেশে যেমন দেশী চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের সৌভাগ্যক্রমে কিছু কিছু আদর হচ্ছে, এমনি যদি কিছুমাত্র সুনজর স্থাপত্যের প্রতি না দিতে পারি, তাহলে আমরা কিছুতেই সম্পূর্ণ হয়ে উঠবো না—এবং ফলে, সবই বৃথা হবে। চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য—এদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ আছে। দেশের চারু-শিল্পের সমগ্রতা আনতে হলে, এই তিনেরই সমাবেশ চাই। শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্তা থাকে, তেমনি স্থাপত্যই চিত্র ও ভাস্কর্য্যের আধার। আবার চিত্র ও ভাস্কর্য্যই স্থাপত্যের বসন-ভূষণ···এগুলি না থাকলে, আভরণ ও অলঙ্কার-হীনা সুন্দরীর ন্যায় স্থাপত্য নিতান্তই নগ্ন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। সে স্থাপত্যের কোনো মানে থাকে না। আমাদের ইলোরা, অজন্তা, বাঘগুহা প্রভৃতি প্রাচীন মঠ ও মন্দিরগুলিতে তাই স্থাপত্য-কলার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্র ও ভাস্কর্য্যের সমাবেশ দেখা যায়। ইউরোপেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দেখা যায়—যে কোনো ধরণের চিত্র বা ভাস্কর্য্য যে কোনো স্থাপত্যের সঙ্গে জোড়া লাগাতে গেলে কখনোই মিশ খায় না···জোড়ের মুখে দাগটি বিকট আকারে প্রকাশ পায় মাত্র। তাই আমরা দেখি যে দেশী চিত্র বা ভাস্কর্য্য যদি তদুপযুক্ত দেশী-রীতিতে তৈরী গৃহে স্থান না পায়, তাহলে ধুতি-চাদরের সঙ্গে হ্যাট-কোটের মত চোখ ও মনকে শুধু পীড়াই দেয়।

স্থাপত্য-কলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেশের গৃহের আসবাবপত্রেরও ঘোরতর পরিবর্তন ঘটেছে। আজকাল আর সে সাধাসিধা সুরুচির পরিচায়ক তাকিয়া-খাস্‌গেলাস-সজ্জিত গৃহ আমাদের তেমন করে সহজভাবে আহ্বান করে না···নাচঘর, ঠাকুর-দালান, নাট-মন্দির প্রভৃতিতে নানা রকম খিলান ও নক্সার কাজ ইত্যাদি করা হতো, পুরোনো সে সব রীতি একেবারেই লোপ পেয়ে গেল!

এই প্রসঙ্গে আজ বলতে বড়ই আনন্দ হচ্ছে যে আমাদের দেশের মহাত্মা-বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁর স্বোপার্জিত সমস্ত অর্থ দিয়ে যে 'বিজ্ঞান-গবেষণা মন্দির তৈরী করাচ্ছেন, সেটি যথাসম্ভব দেশী-ধরণের ও স্বদেশী কারিগর দ্বারা করানো হচ্ছে। আশা করা যায়, তাঁর এই শুভ-অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে আরো অনেক দেশী-স্থাপত্যের সৃষ্টি হবে।

সম্প্রতি কোনো বাঙলা সাপ্তাহিকপত্রে রাধানগরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের যে স্মৃতি-মন্দিরটি হবে, তার একটি নক্সা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা সেটি কোনোমতেই অনুমোদন করতে পারি না—বিশেষতঃ, আমরা যখন কোনো স্বদেশী মহাত্মার

স্মৃতি-রক্ষা করতে চায়, তখন এরূপ খাপছাড়া একটা তৃতীয়-শ্রেণীর বিলাতী-হলের মত মন্দির প্রতিষ্ঠা কখনোই আমাদের কল্পনায়ও উদয় হওয়া উচিত নয়। দেশী মহাত্মার কীর্তি আমাদের দেশের সকলের মনের মধ্যে যে মন্দিরটি স্বতঃই প্রতিষ্ঠা করছে, আমরা তারই ছাপ স্থাপত্যের ভিতর দেখতে চাই। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষ তরুণ ইউরোপীয় সভ্যতার মাদকতায় যখন মত্ত, সেই সময় সুদূর ইংলণ্ডে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় নিজ-ব্যয়ে ব্রিষ্টলে মহাত্মা রামমোহনের সমাধিটি স্বদেশী-স্থপতির চারুশিল্পে শোভিত করে রেখে গেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ এই ভারত-শিল্পের নব-জাগরণের যুগে রামমোহনের জন্মভূমির সুশান্ত-ছেলেরা এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তাও করছেন না!

স্থাপত্যের মধ্যে প্রত্যেক যুগের বৈচিত্র্যের ছাপ থাকবে বটে, কিন্তু তার মধ্যে রস-সৌন্দর্যটির মাধুর্য অনন্তকাল ধরে সকল নর-নারীকেই সমানভাবে মুগ্ধ করবে—যে সময় তার কালাকাল-পাত্রাপাত্রের বিচার থাকবে না। স্থাপত্যের ভিতর যদি এতটুকু কৃত্রিমতার চিহ্ন থাকে, তাহলে তা জগতে কখনোই স্থায়ী হতে পারে না। এখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে শুধু প্রত্নতত্ত্ব-হিসাবে স্থাপত্যের বিচার করলে চলবে না···কেন না, স্থাপত্য শুধু একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণারই জিনিষ নয়, ওটি জাতীয়-সম্পদ এবং ওর বিচারও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ধরণের। শুধু বসবাসের সুখ-সুবিধার

অনুযায়ী গৃহ-নির্মাণ করা নয়, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে গঠন-সৌকর্য ও শিল্প-সুষমার, ব্যঞ্জনারও প্রয়োজন আছে। দেখা যায়—এদেশে প্রাচীনকালে স্থাপত্যকেও অন্যান্য চারু-শিল্পের ন্যায় ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছিল। বেদ-পুরাণাদিতে এবং স্থাপত্য-সম্বন্ধীয় 'বিশ্বকর্মা-প্রকাশ', 'শিল্প-শাস্ত্র', 'জ্ঞানরত্নকোষ' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে স্থপতিদের জ্ঞাতব্য মাপ-প্রমাণাদি নানান তথ্য দেওয়া আছে। এমন কি, কিরূপ জমির উপর কোন সময়ে কোন দিনে গৃহ-নির্মাণ আরম্ভ করা হবে, এ সকলেরও উল্লেখ আছে। কথিত আছে—বাড়ীর জমি পূর্বদিকে ঢালু হলে গৃহস্থের সৌভাগ্য, কিন্তু পশ্চিমে ঢালু হলে গৃহস্থেরই হানি। এখনকার দিনে এ সকল খুঁটিনাটি যুক্তি-তর্কে যদি না টেঁকে তো না মানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু পশ্চিমের দিকে গড়িয়ে পড়া সম্বন্ধে শাস্ত্রের নিষেধ মেনে চলাই আমাদের কর্তব্য বোধহয়। ধর্মের বর্ম পরিধান করে আমাদের শিল্প-কলা মোগল প্রভৃতির আমল থেকে বহুকাল আত্মরক্ষা করে এসেছিল। দেশের অন্তরের পরিচয় যেমন ধর্মে, তেমনি শুধু ধর্মের দ্বারায় নয়—শিল্প-কলারও সহায়তার দরকার। আমরা জাত বাঁচাতে ব্যস্ত, কিন্তু জাতীয়তাকে রক্ষা করতে পারি না। ভয় হয়—কোন দিন আমরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মনুমেণ্ট তৈরী করে না বসি!

ভারতের পশ্চিম-প্রদেশে রাজপুত রাজাদের আধুনিক দেশী-ধরণের সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, উড়িষ্যা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের আধুনিক দেশী-স্থাপত্যগুলি দেখলে যেমন আশার উদয় হয়, তেমনি বাঙলায়ও যদি দেশী স্থাপত্য-শিল্পের আদর কিছুমাত্র দেখতে পাই, তাহলে বোঝা যাবে আমরা স্বদেশ-প্রেম যে কি বস্তু, তা কিছু হৃদয়ঙ্গম করেছি।

সকলেই জানেন যে ভারত-শিল্পের প্রবর্তক মিঃ ই, ভি, হ্যাভেল ও বিলাতের নূন্যাধিক দেড়শত গণ্যমান্য-পদস্থ ব্যক্তি ও শিল্পী মিলে যাতে দিল্লীর নতুন সহরটি ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতে দেশী কারিগরের দ্বারা তৈরী করানো হয়, সেজন্য ইংরাজ-সম্রাটের ভারত বিভাগীয় প্রধান-সচিবের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু সে আবেদন দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রাহ্য হয়নি। মিঃ হ্যাভেল প্রভৃতি মহোদয়গণের আশা ছিল যে মোগলদেরবার থেকে ভারতের স্থপতিরা যে সহায়তা লাভ করে এককালে তাজমহল প্রভৃতি রমণীয় প্রাসাদ সকল তৈরী করেছিলেন, তেমনি ভারত সম্রাটেরও উৎসাহে আবার বুঝি নতুন দিল্লীতে এই স্থপতিদের বংশধরেরা কিছু কিছু কাজ দেখাতে পারবে। কিন্তু ভারত-ভাগ্যবিধাতারা ভারতীয়দের চেয়ে নিজেদের জ্ঞাতি-বন্ধুদের যে বেশী আত্মীয়, সেটা তারা ভুলে গিয়েছিলেন। যদিও দেশী স্থাপত্য-কলা রাজকীয়-সহায়তায় সহজেই ও শীঘ্রই পুনরুদ্ধার হতে পারতো, কিন্তু তা যখন হলো না, তখন আমরা নিজেরাই ধৈর্য্য ও সংযমের দ্বারা আমাদের দেশী-শিল্পকে জাগিয়ে তুলবো—তাতে যত সময় এবং যত চেষ্টাই লাগুক। মিঃ হ্যাভেল তাঁর ভারতীয় স্থাপত্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থে এক স্থলে লিখেছেন যে উড়িষ্যার জাজপুরের কোনো একজন সাধু-সন্ন্যাসী তাঁর সারা জীবনের ভিক্ষালব্ধ ধনের দ্বারা একটি ফিরোজা-পাথরের মন্দির মেরামত করিয়ে দিয়েছিলেন। পশ্চিমে 'সন্‌তরাস্‌কা-মসজিদ' ও 'পিষহরীকা-মন্দির' প্রসিদ্ধ। ফতেপুর সিক্রিতে মিস্ত্রীরা প্রাসাদ নির্মাণের সময় প্রত্যহ একঘণ্টা বেশী কাজ করে সেই প্রথম সুন্দর মন্দিরটি গড়ে তুলেছিল। দেহাতী-অঞ্চলের আরেকজন সামান্য স্ত্রীলোক জাঁতা পিষে অর্থ সঞ্চয় করে

অপরূপ সুন্দর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরূপ শুভ-সঙ্কল্প যদি ভারতের মজ্জাগত থাকে, তাহলে এদেশের শিল্পকলা কখনোই লোপ পাবে না···বরং উত্তরোত্তর অজ্ঞাতে বাড়তে থাকবে। আমরা আশা করি, এই সকল সাধু-দৃষ্টান্ত আমাদের মনে সর্বদা অনুপ্রেরণা জাগিয়ে রাখবে এবং আমরা সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ভুলে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই শুভ মিলন-মন্দিরটিকে দেশী স্থাপত্য রীতিতে পুনরায় গড়ে তুলবো। অবশ্য এ কাজে অনেক যুগ, অনেক অর্থ ও অনেকের মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন...একদিনেই কিছু রোমনগরী তৈরী হয়নি। এখন প্রাচীন কীর্তিসমূহ নিয়ে বড়াই করে বেড়িয়ে কোনোই ফল নেই। এখন আমাদের কার্য্যের দ্বারা সেই সকল পূর্ব গৌরব রক্ষা করবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে।*

* শিল্পাচার্য অসিতকুমার হালদারের অপ্রকাশিত রচনা ও একটি চিত্র

বাংলা সাহিত্যে ভূগোল ঃ চর্যাপদ

মীরা ঘোষ

প্রাচীন সাহিত্য শুধুমাত্র রসাস্বাদের জন্য সৃষ্টি হয়নি। ধর্ম বা সাধনা অনুগামী হয়ে রসিকের দরবারে সাহিত্যের আবির্ভাব। সাধনার দুরূহ তত্ত্বকে মানুষ চিরকালই সহজ করে বলতে চেয়েছে। তাকে মনোরম, সুচারু করে তুলতে চেয়েছে। নিরসকে রমণীয় করে তোলার আবেগ থেকেই সাহিত্যের জন্ম।

বক্তব্যে চারুত্ব দানের জন্য মানুষ তার সৃষ্টিতে প্রচলিত জীবনের অনেক স্মৃতি তুলে ধরে! তার আহার, বিহার, বাসস্থান, তার আনন্দ বেদনা। তার স্বভাবের খুঁটিনাটি পরিচয়। আর এই সূত্রেই কোন এক বিশেষ অঞ্চলের নৈসর্গিক বৈচিত্র্য, মানুষের জীবনকথা তথাকার সৃষ্ট সাহিত্যে উপস্থিত হয়। সুতরাং অলংকরণের ছদ্মবেশে কোন দেশের ভূগোল, সেখানকার সাহিত্যে হাজির হতে পারে। তাই পৃথক ভাবে দেখলে সাহিত্য ও ভূগোল দুই বিপরীত মেরুর বিষয় হলেও, সাহিত্যে ভূগোলের উপস্থিতি অসম্ভব নয়।

ভূগোল বলতে শুধু ভূ-পরিচয় বোঝায় না। মানুষ নিয়েও তার কারবার। মানুষের প্রচলিত জীবনধারা বা কর্মপ্রচেষ্টার মূলীভূত যুক্তি ভূগোলের মধ্যেই নিহিত। আর এই আলোকে বিচার করে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে, বাংলাদেশের ভূগোল কেমন ফুটে উঠেছে অর্থাৎ বাংলার জনপদ ও জনপদবাসীর কথা কেমন ব্যক্ত হয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাই-ই খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হল।

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন রয়েছে চর্যাপদে। এর আগে যা লেখা হয়েছে তা প্রাকৃতে অথবা অপভ্রংশে। বাংলায় লেখা না হলেও প্রাকৃত অপভ্রংশের এইসব শ্লোক বা ছোট কবিতা থেকে বাংলা দেশকে চিনে নিতে দেরী হয় না। সুখ্যাত সংকলক গ্রন্থ 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' মেঘমেদুর, পুষ্পসমাকীর্ণ বাংলা দেশ কেমন অক্ষয় হয়ে আছে। এ কবিতাগুলির নিসর্গ চিত্রই শুধু বাংলার তা নয়, এর বিশেষ মানসিকতাও বঙ্গদেশজ। প্রায় হাজার হাজর বছর আগে মেঘেছাওয়া আকাশ দেখে সেদিন নরনারী আজকের মতই বিচলিত হত।

'সো মোহ্ কন্তা পাউষ আএ
দূর দিগন্তা ঢেউ চলাএ'

সেই মোর কান্তা দূর দিগন্তে। প্রাবৃষ আসে, চিত্ত চঞ্চলিত হয়।

'গজ্জই মেহ কি অম্বর সামর একলজীঅ পরাহিণ অম্নহ
ফুল্লই নীব কি বুল্লই ভামর। কীলউ পাউস, কীলউ বম্নহ।'

মেঘ গর্জন করছে। শ্যামল অম্বর। নীপ ফুটেছে। ভ্রমর গুণ গুণ করছে। আমার একলা পরাধীন জীবন। প্রাবৃষ (মেঘ) খেলা করুক, মন্মথও খেলা করুক।

এরপর চর্যাপদ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের উদ্বোধন। চর্যাগীতির সর্বপরিচিত সত্য এই যে

এগুলি সাধারণ গীত বা সাধারণ কবিতা নয়। সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের গূঢ়কথাগুলি চর্যাগানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। শূন্যতা (প্রজ্ঞা) ও করুণা (উপায়) নিয়ে সাধকের যে বোধিচিত্তে পর্যবসান কিংবা শিবশক্তির মিলিতাবস্থায় যে অদ্বয় অনুভূতি তাহার কথাই চর্যাপদে বলা হয়েছে। কিন্তু এই অতি দুরূহ তত্ত্বগুলি বাংলাদেশ ও বাঙালীর পরিচিত জ্ঞানও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলার সমুদ্র, নদী, পাহাড়, খালবিল, বন উপবন, মেঘদল, সূর্যচন্দ্র কেমন অম্লান মহিমায় দীপ্তি পাচ্ছে চর্যাপদগুলিতে।

বাংলা দেশের সমগ্র দক্ষিণ উপকুল জুড়ে সাগর। দেশকথায় পরিপূর্ণ চর্যাপদে খুব স্বাভাবিক ভাবে সাগরের স্মৃতি ফুটে উঠেছে। অনন্ত অক্ষয় সাগর শত তরঙ্গ ভঙ্গেও শেষ হয় না, যেমন মৃত্যু শেষ করতে পারে না শাশ্বত অস্তিত্বকে।

'মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোসই সাঅর॥'

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। বাঙালীর চেতনার গভীরে নিহিত এই নদী। তার ভাগ্য বাঁধা রয়েছে নদীর জলধারায়। সেইজন্য নদীর কথা বলতে বাঙালী কবিরা চিরকাল উচ্ছ্বসিত। চর্যাপদেও বারে বারে বলা হয়েছে নদীর কথা। গঙ্গা, পদ্মা নামও অনুল্লেখ্য নয়।

'গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ
তঁহি বুড়িলি মাতঙ্গী যোইআ লীলে পার করেই।'

গঙ্গা যমুনার মাঝখানে নৌকা বাওয়া হয়। তাতে ডুবন্ত মাতঙ্গী যোগীকে অবলীলায় পার করে দেয়।

পদ্মা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ	আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥	নিঅ ঘরণী চণ্ডালী লেলী॥'

বজ্রনৌকা পারের উদ্দেশ্যে পদ্মাখালে বাহিত হল। অদ্বয় বঙ্গে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ক্লেশ লুণ্ঠিত। চণ্ডালীকে নিজ ঘরণী করে আজ ভূসুকু বাঙ্গালী হল।

বাংলা দেশের নদীরূপ গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অববাহিকায়। সমুদ্র সান্নিধ্যে অগ্রসংমান বাংলাদেশের নদীগুলি মন্দগতি। তাই তাদের দুই তীরে কাদা। আর নিম্নভূমি জলাভূমির দেশ বাংলা স্বতঃই খাল, বিলে পরিপূর্ণ।

'ভব নই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥'

ভব নদী গভীর, গম্ভীর বেগে বহে চলে। দুই তীরে কাদা, মাঝে ঠাঁই নেই।

'বাম দাহিন জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজবাট ভইলা॥'

পথে বাম দক্ষিণে অনেক খাল বিখাল ; সরহ বলেন সোজা পথ ধরে চল। কিংবা—

'বাম দাহিণ দো বাটা ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আঁখি বুঝিঅ বাট জাইউ।'

বাম দক্ষিণ ছেড়ে সোজা পথে (মাঝ পথে) চলতে হবে। এই সোজা পথে ঝোপ বাধা বিঘ্ন কিছু নেই। চোখ বুজে এই পথে চলা যায়।

শুধু নদী নয়, বন উপবন পর্বত বাংলা দেশের ভূবৈচিত্র্যের প্রতীক। এগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত নয়, তবে ছোটখাট উল্লেখ চর্যাপদে পাওয়া যায়।

'উচা উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ শবরী গীবত গুঞ্জরী মালী'
'ণণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী শবরী এবণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী।'

উচু উচু পর্বত, সেখানে শবরী বালিকা বাস করে। শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত। গলায় গুঞ্জাফুলের মালা। নানা ফুলে তরুবর মুকুলিত। তার শাখা গগন স্পর্শ করছে। কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী শবরী একলা এই বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্ত।'

হরিণী হরিণকে বলছে—হরিণ তুই শোন তো। এই বন ছেড়ে তুই ভ্রান্ত হ। (দূরে চলে যা।)

'করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ। বিসঅ বিশুদ্ধি মই বুজঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চাঁন্দে ॥'

করুণা মেঘ নিরন্তর স্ফুরিত। আকাশে চাঁদ উঠলে নিবিড় অন্ধকার যেমন কোথায় মিলিয়ে যায়, তেমনি ভুসুকুপাদের মনে জ্ঞানোদয়ের উজ্জ্বল আলোকে অন্ধকার বিদূরিত।

চর্যাপদের এইসব অস্পষ্ট ভৌগোলিক অনুভূতিগুলিই কি একদা বহু পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সজ্ঞান ভৌগোলিক চেতনায় ধরা পড়ে নি? যখন ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের জন্মভূমির বর্ণনায় কবি বলেন—

'এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, 'চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা,
কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়।' কোথায় এমন উজল ধারা।'
কিংবা—'পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী।' —ইত্যাদি।

আঞ্চলিক ভূগোল বর্ণনার ক্রমানুসারে ভূপ্রকৃতি, নদনদীর পর বাংলার কৃষি কথা, খনিজ সম্পদ, অধিবাসীর কর্মপ্রচেষ্টার স্বরূপ চর্যা সাহিত্য থেকে তুলে ধরা যায়। এ দেশের অন্যতম কৃষিজ পণ্য কার্পাসের বেশ বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায় এই পদগুলিতে। বাংলাদেশ সুপ্রাচীন কাল থেকেই বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এ বস্ত্র রেশমী বা মুগাজাতীয়। এ বস্ত্র কার্পাস জাত। বাংলায় একদা প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হত। চর্যাপদ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

'হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকর এবেয়ে কপাসু ফুটিলা
তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্নাবাড়ী তা এলা।
ফিটেলি অন্ধারিরে আকাশ ফুলিয়া ॥'

'বাড়ীর বাগানে কার্পাস ফুল ফুটেছে দেখেই আনন্দ। যেন ঘরের চারপাশ উজ্জ্বল হল। আকাশের অন্ধকার টুটে গেল।' শান্তি পাদের আর একটি পদ আছে—

'তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু। তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু শূণ লইআঁ অপণা চটারিউ॥'

তুলা ধুনে ধুনে আঁশ করা হচ্ছে। আঁশ ধুনে ধুনে আর কিছু বাকী নেই। তুলা ধুনে ধুনে শূন্যে উড়িয়ে দিচ্ছি। আবার তা নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি।

নদী, বন, কানন, সমাবৃত বাংলাদেশের কয়েকটি পরিচিত জীবজন্তুর কথা চর্যাপদে রয়েছে। এগুলি হাতি, হরিণ, গোরু, কুমীর, সাপ, ইঁদুর, শৃগাল। বনময় জলময় দক্ষিণ বাংলায় সাপ, কুমীরের অবাধ রাজত্ব। উত্তর বঙ্গে, গারো পাহাড়ের কাছে হাতী পাওয়া যেত। সুশিক্ষিত হস্তীবাহিনী একদা বাংলার রাজশক্তির বলবৃদ্ধি করেছিল। মত্ত হস্তীর নানা আচরণ ব্যক্ত হয়েছে চর্যাপদে।—

'মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই
নিরন্তর গঅণন্ত তুসে ঘোলই।'

মত্ত চিত্ত গজেন্দ্র ধাবিত হয়। নিরন্তর গগনপ্রান্ত তৃষ্ণায় ঘুলিয়ে তোলে।

মূষিকের কথায়—'নিসি অন্ধারী মুসা অচারা মারবে জোইআ মুসা পবণা।
অমিঅ ভখঅ মুসা কব্অ অহারা। জেণ তুটঅ অবণা গবণা॥'

রাত্রির অন্ধকারে মূষিক বিচরণশীল। চঞ্চল মূষিক দেহভাণ্ডে অবস্থিত অমৃত ভক্ষণ করে। পবনের মতো চঞ্চল মূষিককে হে যোগী মার, যেন তার আনাগোনা টুটে যায়।

সর্পপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'আই অণুঅনা এ জগরে ভাংতি এঁ সো পড়ি হাই
রাজসাপ দেখি জো চমকই কিং বোড়ো খাই।'

আদিতে অনুৎপন্ন এই জগৎ ভ্রান্তির দ্বারাই সত্য বলে মনে হয়। রজ্জুসর্প বা দড়ির মিথ্যা সাপ দেখে যে চমকায় সত্যিই কি বোড়ো সাপ তাকে খায়?

বাংলা দেশে যে একদা সোনা রূপা প্রভৃতি আকর-জ পদার্থ পাওয়া যেত, এখানে তার প্রমাণ আছে। 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥'

সোনা ভরতি করুণা নৌকায় রূপা রাখবার যায়গা নেই! পশ্চিম বাংলার সুবর্ণরেখা নদী, ঢাকা জেলার সোনারং, সোনার গাঁ প্রভৃতি নাম নিকটবর্তী অঞ্চলে স্বর্ণপ্রাপ্তির স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে।

আধ্যাত্মিক সাধন সঙ্গীত হলেও চর্যাপদগুলি আশ্চর্য সুন্দর বাস্তবমুখীন রচনা। তাই এখানে বাংলা দেশের অধিবাসী ও তাদের উপজীবিকার বিস্তৃত পরিচয় পাচ্ছি। তবে যেহেতু এই পদগুলি স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্য-সমাজ বহির্ভূত জনমানসের সৃষ্টি, তাই এখানে ব্রাহ্মণ বা উচ্চকোটীর জীবন পরিচয় কিছুই নেই। আছে শবর, ডোম, নিষাদ তন্তুবায়, সূত্রধর, মৎসজীবি সম্প্রদায়ের কথা। সমাজের উচ্চকোটীর মানুষদের স্পর্শ বাঁচিয়ে এদের বাস করতে হত।

'নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ'

কিংবা— 'বরগিরিসিহর উত্তুঙ্গ মুণি সবেরেঁ জহি কিঅ বাস।'

বড় বড় পাহাড়ের সুউচ্চ শিখর চূড়ায় শবরদের বাস।

এরা হরিণ শিকার করে, জাল ফেলে মাছ ধরে, নৌকা বেয়ে, তাঁত বিক্রি করে, ধুনুরীর বৃত্তি নিয়ে কিংবা কাঠের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। বাংলা দেশের বৃত্তির বহুমুখিতা এরাই অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু আজও যেমন, সেদিন, কায়িক-শ্রম নির্ভর এই নিম্নবিত্ত সমাজে দুঃখ কষ্ট বা অভাব লেগেই ছিল। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই উপবাস। অথচ ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে।

'টালত ঘর মোর নাহি পড় বেষী। বেঙ্গ সংসার বড়হিগ জাঅ।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥ দুহিল দুধু কি বেণ্টে সমায়॥'

আমাদের আলোচনায়, বারে বারে চর্যাপদের লৌকিক জীবন বা লোকায়ত ভাবনার কথা এসে পড়েছে। কারণ এটি চর্যাগীতির একটি বিশেষ স্মরণীয় দিক। চর্যাপদের আর একটি স্মর্তব্য দিক আছে, তা হচ্ছে এই ধর্মাদর্শের মনোময়তা। যদিও বিষয়টি আমাদের আলোচ্য নয়, তথাপি পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে বলে, এর একটি গুরুত্ব আছে।

বৌদ্ধধর্ম তার বিবর্তন পথে অনেকগুলি শাখায় বিকশিত হয়ে ওঠে। হীনযান, মহাযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান অবশেষে সহজযানে হীনযাত্রীরা বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে পুণ্য অর্জনে যখন তৎপর, মহাযানপন্থীরা জগতকে শূন্য স্বভাব জেনেও করুণায় বা পরোপকারে আগ্রহী। সহজযানীরা শূন্যতা ও করুণাকে প্রকৃতি ও পুরুষ বলে অনুভব করলেন। এঁরা বাইরের মন্ত্রতন্ত্র, কৃচ্ছসাধন কিছুই মানলেন না। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে সহজানন্দের পথে এঁরা ধর্মকে উপলব্ধি করতে চাইলেন।

বাহিরে কোথাও নয়, আপন চিত্তের গহনে ডুব দিয়ে সত্য খুঁজে ফেরা বৌদ্ধ সহজিয়া-পন্থীদের এই মরমী আদর্শ—যা একদিকে উপনিষদীয় ভাবনার সঙ্গে যোগ রেখেছে, তা অন্যদিকে বৈষ্ণবপদাবলী, মঙ্গলকাব্য ও শাক্তগীতিতে মানবিক আবেগ বর্ষণ করছে।

সাহেব নবাব ও বাবু বেনিয়ান

মুরারি ঘোষ

ভারতের ইতিহাসের সেই যুগে আমরা কেবল ইংরেজদের লড়াই আর বাণিজ্যের কথা পড়ি। উৎকোচ উপঢৌকনের ইতিহাস, গোপন পথে আয়ের ইতিহাস অপ্রকাশ্য রয়ে গেছে। ইংরেজদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ গুপ্ত সুড়ঙ্গ বেয়ে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেল। এখন তার হিসেব পাওয়া যাবে না। কিছু কিছু খোঁজ অবশ্য পাওয়া যায়, তবে তা সমস্ত হৃত সম্পদের ভগ্নাংশ মাত্র। বিভিন্ন সময়ে বাংলার নবাবদের মসনদ বদল এর কালে কোম্পানীর এদেশী কর্তাব্যক্তিরা যথেষ্ট কামিয়েছেন। ইংরেজ বাণিজ্যের সেই ছলনাময় দিকটার কথা ছেড়ে দিলেও—যার মধ্যে বাণিজ্যের প্রথম অক্ষরটিই ছিল না—ছিল লুটতরাজ আর অত্যাচার,—তা বাদেও আমাদের জাতীয় সম্পদ আমাদের বেহাত হয়ে যাওয়ার কাহিনী অনেকের ব্যক্তিগত জীবন কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। রবার্ট ক্লাইভ, বারওয়েল রামবোল্ড ইত্যাকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে হেষ্টিংসের নামও অনায়াসে জড়িয়ে রয়েছে।

ভারত থেকে সম্পদ এনে বিলেতে যারা নবাবী করেছেন হেষ্টিংস তাদেরও একজন। ইতিহাসে আমরা পড়ি মহামতি হেষ্টিংস। এই মহামতির প্রকৃত মতির খবর যথাযথ রাখতেন পাঁচ ব্যক্তি। হেষ্টিংসের জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে এঁরাও ইতিহাস খ্যাত পুরুষ হয়ে আছেন—হেষ্টিংসের পাঁচ সহচর। নবকৃষ্ণ, কান্তবাবু, দেবী সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান কাশীনাথ। হেষ্টিংসের পাওনার ছিটে ফোঁটাও এঁরা পেয়েছেন। শুধু হেষ্টিংস নন, হেষ্টিংসের মত তথাকথিত সাহেব-নবাবদের অনুগ্রহ ধন্য—অনুচরেরাও নানা দুষ্কর্মের সহযোগী হয়ে এ দেশেও ছোটখাট নবাবী গড়ে তুলেছিলেন। সাহেবনবাবদের বেনিয়ানেরা শহুরে বাবুয়ানীর নায়ক পুরুষ এবং আদি পুরুষও বটে।

তবু হেষ্টিংসকে কাঠগড়ায় উঠতে হয়েছিল। পার্লামেণ্টে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বাইশ দফা অভিযোগ। বাইশ দফার মধ্যে সপ্তম দফায় ছিল কয়েকটি উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ। এই অভিযোগের সঙ্গে হেষ্টিংসের কৃপাধন্য—পঞ্চরত্নের যোগাযোগের উল্লেখ আছে। সেই অভিযোগের কলঙ্কময় ইতিহাস খুলে দেখলে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের সেই অধ্যায় আমাদের কাছে ধরা পড়বে যা কোনোদিনও ইংরেজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবে না।

হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির একটায় ছিল কয়েক লক্ষ টাকার উৎকোচ নেওয়ার কথা। বাংলার নবাবের দেওয়ান ছিলেন রেজা খাঁ। রেজা খাঁকে পদচ্যুত করে দেওয়ানের ক্ষমতা কিছু কমিয়ে সে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা হল মণিবেগমকে। মৃত নবাব মীরজাফরের বেগম সাহেবা তিনি। অত্যাচারী রেজাখাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমা হচ্ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত বিলেতের কর্তৃপক্ষ রেজাখাঁকে পদচ্যুত করার জন্য হেষ্টিংসের কাছে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আরো বলা হল নন্দকুমারের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে। নন্দকুমার ছিলেন রেজাখাঁর আগে বংলার নবাবের প্রধান দেওয়ান—নবাব নাজিম।

হেষ্টিংস মণি বেগমকে বেছে নেওয়ার পরামর্শদাতা নন্দকুমারও পুত্র গুরুদাসকে মণিবেগমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ফিকির পেয়ে গেলেন। বিলেতে কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো মহিলার হাতে ক্ষমতা দেওয়া সম্পর্কে যে আপত্তি উঠতে পারে গুরুদাস থাকায় তা চাপা পড়ে যায়। কাগজে কলমে ক্ষমতা থাকবে মণিবেগমের হাতে, আর মনিবেগমের দেওয়ান হবে গুরুদাস।

এরকম একটা বিরাট দায়িত্বশীল পদে কোনো মহিলাকে বসানোর ব্যাপারে হেষ্টিংসের কী চাতুরী ছিল, তা পরে সহজেই ফাঁস হয়। কান্তবাবু মারফৎ মণিবেগম একলাখ টাকা হেষ্টিংসের কাছে পাঠিয়ে দেন। মণিবেগমের পরামর্শ দাতা হিসেবে গুরুদাসের জন্য নন্দকুমারকে দিতে হয় দেড়লাখ টাকার উপর। বিলেতে অভিযোগ ছিল, দুটো উপঢৌকন মিলে হেষ্টিংস নিয়েছেন নাকি আরো সাড়ে তিন লাখ টাকার উপর।

কলকাতায় কাউন্সিল সভায় যখন এই উৎকোচ নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে হেষ্টিংস সভা ভেঙে দিয়ে চলে যান—নন্দকুমার মণিবেগমের চিঠি সেই সভায় উপস্থাপন করেন। কান্তবাবুকে সাক্ষী মানা হয়। সাক্ষ্য দেওয়ার সমন এলো কান্তবাবুর কাছে—কিন্তু সব চাপা পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

এতেও কিন্তু শেষ না। পরেও মণিবেগমের কাছ থেকে হেষ্টিংস আড়ো দেড়লাখ টাকা আদায় করেছিলেন। হাউস অব লর্ডসে ইম্পিচমেন্টের সময়ে হেষ্টিংসও এই টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন। হেষ্টিংস বলেছিলেন এটা ঘুষ নয়, নজরানা—গভর্ণর জেনারেলকে মণিবেগমের দেওয়া সম্মানী টাকা—গভর্ণর হিসেবে এটা ওঁর প্রাপ্য কেননা তাঁর আগের গভর্ণরেরা এই ধরণের নজরানা নিয়েছেন।

কান্তবাবু, হেষ্টিংস আর মণিবেগম সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে কবি রসসাগরের মজার ছড়া আছে। কান্তবাবুর মারফৎ উৎকোচ নেওয়ার ব্যাপারটা নন্দকুমার স্পষ্ট করেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন—মনিবেগমের লেখা চিঠি যাতে হেষ্টিসকে লাখ টাকা দেওয়ার কথা আছে—সেটা যে কোন কারণেই হোক নন্দকুমারের হস্তগত হয়েছিল—চিঠির সত্যাসত্য নির্ণয়ের কারণেই কাউন্সিল সভায় কান্তবাবুর ডাক পড়েছিল। কবি রসসাগর বলছেন :

কান্তবাবু যান মণি বেগমের ঘরে
হেষ্টিংস লাটের পেট ভরাবার তরে
শ্রীনন্দকুমার সাক্ষী কাউন্সিল ঘরে
কাউন্সিল হতে এক সমন আসিল
হেষ্টিংসের হাতে তাহা কান্তবাবু দিল
হেষ্টিংসের নিষেধে সাহসী হইয়া
কান্তবাবু সে সময় দিল উড়াইয়া
হেষ্টিংসের মহামিত্র সেই কান্তবাবু
কৃতান্তেরও সাধ্য নাই তারে করে কাবু।

সমন পেয়েও কান্তবাবু অনুপস্থিত রইলেন—এতে কাউন্সিল অপমানিত বোধ করলেও কিছুই করতে পারেনি—হেষ্টিংস নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে কান্তবাবুকে রক্ষা করলেন।

রাজসাহীর জমিদারীর কর্ত্রী ছিলেন রাণী ভবানী। ৭৬-এর মন্বন্তরে দুঃস্থ প্রজাদের কাছ থেকে রাণী কর আদায় করতে পারেননি। ফলে তাঁর কাছ থেকে কোম্পানীর প্রাপ্য দু বছরের টাকা বাকী পড়লো। কোম্পানীর দাবী—যেমন করে হোক প্রাপ্য টাকা জোগাড় করে দিতে হবে।

এই সময়ে দুলাল রায় বলে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হলো। ইনি নাকি রাণী ভবানীর স্বামীর

দূর সম্পর্কের আত্মীয় হন। রাণী ছিলেন অপুত্রক—তাঁর বাসনা দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণ জমিদারীর কর্তা হবেন। কিন্তু কলকাতার কাউন্সিল সভায় ঠিক হয়েছিল রাণীর জমিদারী কেড়ে নেওয়া হবে, কারণ রাণী সময় মত খাজনা জমা দিতে পারছেন না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত পরিবর্তন করে ঠিক হয় রাণী ভবানী যতদিন বাঁচিবেন ততদিন তিনিই হবেন জমিদারীর মালিক তবে রাণীর হয়ে রাজস্ব আদায় করবেন দুলাল রায়। রাণীর মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণকে দখল নিতে দেওয়া হবে না।

ব্যাপারটা কলকাতার কাউন্সিলে সহজে মেটেনি—সদস্যদের মধ্যে মতান্তর ঘটেছিল। খবর পেয়ে রামকৃষ্ণ কাউন্সিলের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠালেন। তাতে জানালেন, দুলাল রায় কোম্পানীর কর্মচারীদের সহযোগে প্রচণ্ড অত্যাচার করে রাজস্ব আদায় করছে—প্রজাদের দুরবস্থার সীমা নেই—আর, জমিদারীর ১৫ লাখ টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না—এই টাকার দায়িত্ব কোম্পানীর বেনিয়ানদের—এর মধ্যে তিন লাখ ৮১ হাজার ১ শত ৪১ টাকা নিয়েছেন মহামহিম কান্তবাবু।

এই অভিযোগের দু মাস বাদে কাউন্সিলের সভায় সাক্ষাৎ প্রমাণাদি দেখে কিছু টাকার হদিস পাওয়া গেল—যা কান্তবাবু বেমালুম আত্মসাৎ করেছেন। প্রমাণ পাওয়া গেল, কান্তবাবু সব টাকাটাই স্বয়ং হাতে করে নিয়েছেন—এর মধ্যে কতটাকা সাহেব নবাবের হাতে পড়েছে কে তার হিসেব রাখে। হেষ্টিংসের ইম্পিচমেণ্টের সময়ে এই প্রশ্ন উঠে।

১৭৭৫ সালের ২৯শে মার্চ সুপ্রীম কাউন্সিলের কাছে একটা দরখাস্ত এলো। দরখাস্তে বলা হয়েছে, টাকাকড়ি হাত ফেরতা হ'য়ে হুগলীর ফৌজদারী পদটি খান জাহান খান পেয়েছেন—এতে মহামহিম হেষ্টিংসের লাভ হয়েছে ৩৬ হাজার টাকা আর কান্তবাবু পেয়েছেন ৪০০০ টাকা। এখানেও কান্তবাবু! হেষ্টিংসের অর্থাগমের মাধ্যম খুব সুচারুভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই চিঠির ব্যাপারে জয়নাল আবেদিন খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে জেরা করা হয়। তিনি এই সম্পর্কে দুটো চিঠি প্রমাণস্বরূপ দেখিয়েছিলেন—পরে খান জাহান খাঁকে তলব করা হল—খাঁ সাহেব কোন রকম শপথ নিয়ে কিছু বলতে অস্বীকার করলেন—কাউন্সিল তখন খাঁ সাহেবকে পদচ্যুত করে নতুন ফৌজদার নিয়োগ করলেন। কিন্তু গভর্ণর জেনারেলের গায়ে আঁচটি লাগলো না।

কলকাতার কাউন্সিল তখন সর্বোচ্চ শাসন পরিষদ, এই পরিষদের সদস্য পাঁচজন। গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস, রিচার্ড বারওয়েল, ফিলিপ ফ্রান্সিস, জেনারেল ক্লেভারিং, কর্নেল মনসন। কাউন্সিলে বারওয়েল ছিলেন হেষ্টিংসের সব ব্যাপারের সমর্থক। হেষ্টিংসের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করতেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। জেনারেল ক্লেভারিং আর মনসন অধিকাংশ সময়েই সমর্থন করতেন। সময়ে সময়ে এই তিনজনের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্বেও হেষ্টিংস কাজ করে গেছেন। ক্লেভারিং মনসন, ফ্রান্সিস এরা কান্তবাবুর গায়ে আঁচড়ও কাটতে পারেন নি।

প্রথম জীবনে নবকৃষ্ণ হেষ্টিংসের পারসী শিক্ষক ছিলেন। হেষ্টিংস তখন কলকাতায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একজন করণিক। সেই সূত্রে নবকৃষ্ণের কলকাতায় কোম্পানীর বড় সাহেবদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে যায়। নবাব সিরাজ যখন কলকাতা আক্রমণ করেন ইংরেজরা কোম্পানীর সরকারী মুন্সী তাজউদ্দিনকে মুসলমান বলে বরখাস্ত করে নবকৃষ্ণকে নিয়োগ করেন।

নবকৃষ্ণ পারসী জানতেন ভালো। সরকারী চিঠিপত্র দেশীয় ভাষায় মুসাবিদা করার জন্যই এই পদের সৃষ্টি। অতি বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করে নবকৃষ্ণ ইংরেজদের বিশেষ বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয় বিশেষ প্রীতিভাজন ব্যক্তি বলে নানান সূত্রে দেশীয় রাজা-রাজড়া জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ যে সব উৎকোচ উপহার পেতেন তার ভাগেরও কিছু কিছু নবকৃষ্ণের খপ্পরে এসে পড়তো।

ইংরেজ কোম্পানী যখন দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পাবার জন্যে চেষ্টা সুরু করে সেই সময়ে নবকৃষ্ণই ছিল আসল ব্যক্তি। তাঁরই পরামর্শে লর্ড ক্লাইভ এ কাজে এগিয়ে আসেন, নবকৃষ্ণই চিঠি পত্র তৈরী করে দেন, দিল্লী যাতায়াত করেন—নবকৃষ্ণের পরিশ্রমে, বুদ্ধিতে তিন প্রদেশের দেওয়ানী পেয়ে কোম্পানী এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হবার সুযোগ পেলেন।

নবকৃষ্ণের উপকার ক্লাইভ ভুলে গেলেন না। দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে তাঁকে ছয় হাজারী মনসবদারীর সঙ্গে—কোম্পানীর পয়সায় দশবিধ খেলাত (ঘোড়া, জোড়া, চামর, শিরপেঁচ, ছাতা, পাখা, হাতী, ঝলিরদার পাল্কী, ঘড়ী, তলোয়ার, কুণ্ডল, মুক্তামালা প্রভৃতি রত্নালঙ্কার) দিয়ে মহারাজ বাহাদুর উপাধি পাইয়ে দিলেন। মুন্সী নবকৃষ্ণ হলেন মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

ক্লাইভের পর ভেরেলষ্ট। ভেরেলষ্টের পর কার্টিয়ার কলকাতার গভর্ণর হলেন। এঁদের সময় ক্রমে ক্রমে নবকৃষ্ণের যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়তে থাকে—তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠাও। হেষ্টিংস যখন গভর্ণর জেনারেল হলেন নবকৃষ্ণ তখন ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষদেশে অবস্থান করছেন। নবকৃষ্ণের পরামর্শ, সাহায্য ছাড়া কোম্পানীর বড় বড় কাজের সমাধান হত না। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে বে-আইনীভাবে নবকৃষ্ণেরও যথেষ্ট অর্থাগম হত—যেমন নদীয়ার কর আদায় মারফৎ ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা,—এ টাকার হিসাবপত্র কোম্পানীর কাছে নবকৃষ্ণ দাখিল করেন নি। গভর্ণর কার্টিয়ার নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করতে পারেন নি। এদেশে হেষ্টিংসের প্রথম বন্ধু নবকৃষ্ণ। অতএব হেষ্টিংসের আমলে সমাজে রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নবকৃষ্ণ হেষ্টিংসের প্রধান সহায় হয়ে উঠলেন।

কলকাতার কাউনসিলকে হেষ্টিংস কখনই কায়দায় আনতে পারেন নি। ফিলিপ ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং আর মনসনের বিরোধিতা প্রায় সব সময়েই ছিল। এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যাবেন। দেশ থেকে তাঁর অ্যাটর্নি হিসেব পাঠালেন যে বিলেতে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১২,৬৫৭ পাউণ্ড—তার থেকে বার্ষিক আয় ৩,৫০০ পাউণ্ড। অথচ হিন্দুস্থানে কোম্পানীর কাছ থেকে হেষ্টিংস তখন মাইনে পেতেন বছরে ৩০,০০০ পাউণ্ডের কাছাকাছি। এই বিশাল আয়ের কাছে বিলেতের সম্পত্তি থেকে আয় কিছুই নয় বলতে গেলে। হিন্দুস্থান থেকে ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়ে সব সাহেবই দেশে গিয়ে নবাব হয়েছেন—হেষ্টিংস এমন আর কি করতে পেরেছেন এক বছরে—পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাবার স্বপ্ন তাঁর ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে যদি সম্পত্তির পরিমাণ আরো না বাড়ে। বিশেষ, তাঁর পূর্ব পুরুষের বিশাল সম্পত্তি ছিল ডেল্‌স্ ফোর্ডে (Dayles ford)—অবস্থার বিপাকে তা বিক্রি হয়ে যায়—সেই সম্পত্তি উদ্ধারের স্বপ্ন হেষ্টিংস দেখেন।

মেজর জন স্কট নামে এক ভদ্রলোক হিন্দুস্থানে ইংরেজ সেনাবিভাগে বিশিষ্ট অফিসার ছিলেন। ১৭৮০ সালে হেষ্টিংস তাঁকে নিজের এজেণ্ট হিসেবে বিলেতে পাঠালেন। বিলেতে হেষ্টিংসের সম্পত্তির হিসেব দেখে স্কট লিখলেন বছরে ৫ হাজার পাউণ্ড আয় না থাকলে বিলেতে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে ('a cause of melancholy to you whenever you think of it'—P. J. Marshall : P. 147.)।

হেষ্টিংসের বিচারের সময় ভদ্রলোকের এই ধরণের চিঠিপত্র হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মারাত্মক মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিচারের সময়ে হেষ্টিংসের সাহায্যকারী হিসেবেও তাঁর কাজ কর্ম উল্টে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যায়—ভদ্রলোকের বুদ্ধি একটু মোটা রকমের ছিল। স্ত্রীর কাছে দুঃখ করে এ বিষয়ে হেষ্টিংস চিঠিও লিখেছিলেন।

মেজর স্কটের চিঠি পাবার কয়েকমাস বাদেই হেষ্টিংসের দুর্ভাবনা ঘুচে যাবার একটা সুযোগ এসেছিল। সেই সময়ে চুণারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই ঘটনায় অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজাউদ্দৌলা হেষ্টিংসকে দশ লক্ষ টাকা দিতে চাইলেন উপঢৌকন স্বরূপ।

সুজাউদ্দৌলা ছিলেন একাধারে অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর প্রধান উজীর। এই মহামহিম ব্যক্তিটি বাদশার পড়তি অবস্থা দেখে ইংরেজদের সংগে সদ্ভাব রেখে চললেন। বাদশার ক্ষতিসাধন করেও কোম্পানীর মংগলের জন্যে কাজ করে যেতে দ্বিধা করলেন না, অবশ্য নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁর এসব করা।

নবাব-উজীরের দেয় টাকার কথা গোপন ছিল না। অথচ তখন কোনরকম উপহার উপঢৌকন নেওয়া নিষিদ্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু হেষ্টিংস এ সুযোগ হারাতে চাননি। তিনি বিলেতে ডিরেক্টরদের কাছে চিঠি লিখলেন :

I am now in the fiftienth year of my life, I have passed thirty one years in the service of the company and the greatest part of that time in employments of the highest trust. My conscience allows me boldly to claim the merit of zeal and integredly, nor has fortune been unpropitius to their exertions. To these qualities I bound my pretention. I shall not repine, if you shall deem otherwise of my services, nor aught your decisions, however if may disappoint my hope of a retreat adequate to the consequence and elevation of the office which I know possess to lessen my gratitude for having been so long permitted to hold it, since it has at least, enabled me to lay up a provision with which I can be contented in a more humble station.

অনেক ইনিয়ে বিনিয়ে বলবার চেষ্টা করে হেষ্টিংস নিজের বক্তব্য পেশ করলেন কিন্তু কোম্পানী কোন অনুমতি দিল না।

পরের বছর ১৭৮২ সালের ফেব্রুয়ারীতে উজীর আবার দশলক্ষ টাকা নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে। প্রথমে 'রিফিউজ' করে দুমাস বাদে হেষ্টিংস মন স্থির করে ফেললেন টাকাটা তিনি

কোম্পানীর নামেই নেবেন। কিন্তু কোম্পানীর নামেও এইভাবে টাকা নেওয়া বেআইনী এবং অসঙ্গত বিবেচনায় হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ১৫ নম্বরের অভিযোগ ছিল।

এদিকে আর কয়েক বছর বাদেই হেষ্টিংসের চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে—নিজের টাকার কিছু সুরাহা হল না—কোম্পানীও সরাসরি কোন উপহার উপঢৌকন নিতে দেবে না। অগত্যা অন্য পথ নিলেন। সোজাসুজি টাকা পাওয়ার উপায় নেই দেখে একটা খরচের হিসেব দাখিল করলেন—কোম্পানীর হয়ে তিনি খরচ করেছেন ৩ লাখ টাকা—এই টাকাটা তাঁর চাই। খরচের মধ্যে ছিল তাঁর অফিসের যাবতীয় খরচ, তার দেহরক্ষীদের বাড়ি ভাড়া, হিন্দু ও মুসলিম আইনের সঙ্কলকদের মাইনে একটা মাদ্রাসা স্থাপনের খরচ, আরো টুকিটাকি। কাউনসিলের বিরোধিতা এড়াবার জন্যে হেষ্টিংস নিজের দায়িত্বে টাকাটা কোন এক জায়গায় থেকে নিয়ে রাখলেন। ১৭৮৪ সালে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের জানালেন যে, খরচের টাকাটা তিনি তুলে নিয়েছেন কিন্তু কীভাবে কোথা থেকে নিয়েছেন তা জানালেন না। পার্লামেণ্টে ইম্পিচমেণ্টের সময়ে জানাতে বাধ্য হলেন যে মহারাজা নবকৃষ্ণের কাছ থেকে টাকাটা এসেছে।

নবকৃষ্ণ কিন্তু অন্য কথা জানালেন, ১৭৯২ সালে তিনি কোম্পানীর কাছে এক বিল দিয়ে ৩ লাখ টাকা চেয়ে বসলেন। বললেন, টাকাটা হেষ্টিংস তাঁর কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন—নেবার সময়ে একটা বণ্ড লিখে দেবেন বলে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—শেষ পর্যন্ত বণ্ডও দেন নি—টাকাও দেন নি। শতকরা ১২ টাকা সুদে সমস্ত টাকাই নবকৃষ্ণ চেয়ে বসলেন। বিলেতের পাবলিক রেকর্ডস অফিসে হেষ্টিংসের বিচার সংক্রান্ত যেসব কাগজপত্র আছে তাতে দেখা যায় একদা সত্যি সত্যি হেষ্টিংস একটা বণ্ড দিয়েছিলেন, কিন্তু নবকৃষ্ণ তা গ্রহণ করেন নি। লাটসাহেবকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেই বণ্ড—পরিবর্তে নবকৃষ্ণ বর্ধমানের কর আদায় করার দায়িত্ব ভার চেয়ে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক মার্শাল বলছেন: At first sight, it seems difficult to avoid the conclusion that Nabkissen had bribed Hastings to send him to Burdwan.

সে সময়ে বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন নাবালক তেজচন্দ্র। নাবালক রাজার বহু টাকার রাজস্ব বাকী পড়ে। হেষ্টিংসের পরামর্শে নবকৃষ্ণ মহারাজার হ'য়ে নিজেই কোম্পানীর কোষাগারে সমস্ত টাকা জমা দেন, ঠিক হয় জমিদারীর তত্ত্বাবধান করে মহারাজাকে ধার দেওয়া ঐ টাকা তিনি তুলে নেবেন। নাবালক রাজকুমার তিনবছর শোভাবাজারে নবকৃষ্ণের ভবনে ছিলেন। উপরন্তু ঐ কাজের জন্যে বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা বেতন বরাদ্দ ছিল।

নবকৃষ্ণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঐ টাকার কতগুণ যে নবকৃষ্ণকে হেষ্টিংস পাইয়ে দিয়েছিলেন তার হিসেব কে রাখে?

কোম্পানীর অধীনে গঙ্গাগোবিন্দের সমকক্ষ দক্ষ করিতকর্মা ও সুযোগ সন্ধানী কর্মচারী কেউ ছিলেন না। সাধারণ কানুনগোর পদে চাকরী নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গাগোবিন্দ যেরকম ক্ষমতা ও পদের অধিকারী হয়েছিলেন তার তুলনা নেই। কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্পর্কে এক আলোচনা নিবন্ধে, ঐতিহাসিক মার্শাল বলতে বাধ্য হয়েছেন: For a few years he was the wonder

Calcutta। কেননা পাঁচ বছর কোম্পানীর চাকরী করার পর তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২০ লক্ষ টাকা।

অবশ্যই প্রচুর অর্থাগমের স্থযোগ এসেছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে—কুখ্যাত রেজা খাঁর অধীনে গঙ্গাগোবিন্দ তখন কর্মচারী। হেষ্টিংসের পীরিতের লোক বলে কাউনসিল গঙ্গাগোবিন্দকে পছন্দ করতো না। ১৭৭৫ সালে কাউন্সিল কায়দায় পেয়ে গঙ্গাগোবিন্দকে পদচ্যুত করে—কিন্তু হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে ছাড়বার পাত্র নন। পদচ্যুতির কয়েকমাস বাদেই কাউনসিলে হেষ্টিংসের বিরোধীপক্ষের কর্ণেল মনসন হঠাৎ মারা গেলে হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে নতুন করে চাকরী দিলেন—গঙ্গাগোবিন্দ হলেন নতুন রেভেনিউ সভার দেওয়ান। এই সময়ে গঙ্গাগোবিন্দের প্রতাপ দেখবার মত। বিশ্বকোষকার মন্তব্য করছেন—"এই উচ্চ ক্ষমতা হাতে পাইয়া তিনি যেরূপ অত্যাচার, স্বদেশীয় ও স্বজাতির যেরূপ অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না (বিশ্বকোষ, ৫০ ভাগ : গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ)।

পাঁচ বছরের মেয়াদী বন্দোবস্তে কোন কারণে রাজস্ব বাকী থাকলে গঙ্গাগোবিন্দ নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী তালুক মুলুক জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারতেন। উৎকোচ নিয়ে অন্য ব্যক্তির হাতে জমিদারীর ভার দিতেন। কোম্পানীর রাজস্ব সমিতি (Committee of Revenue) গঙ্গাগোবিন্দের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। ব্যাপার স্যাপার দেখে পার্লামেণ্টে পিটার মুর নামে এক সদস্য প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, (He) Could fabricate what accounts he pleased and......regulate the state of every zemindar's or rentier's payments or arrears by his good or bad disposition.........there is hardly a native family of rank or credit in these provinces, whom he has not at some time or other distressed or afflicted ; scarce a zamidary that he has not disembared or plundered :

কেবলমাত্র একজনই গঙ্গগোবিন্দকে স্থনজরে দেখতেন—তিনি গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস। কোম্পানীর ছোট বড় আর কোন কর্মচারী, কোম্পানীর কাউনসিলের কোন সদস্য গঙ্গাগোবিন্দকে একচুলও পছন্দ করতো না। গঙ্গাগোবিন্দ, দেবী সিংহ, রেজা খাঁ এদের কুকর্মে অত্যাচারের খবরে কোম্পানীর কাউনসিল উত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। হেষ্টিংসের বিদায়ের পর গঙ্গাগোবিন্দের চাকরী তো গেলই—এবং এ ছাড়া ঠিক হ'ল এ ধরণের কোন উচ্চপদে আর কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হবে না। যেখানে কোম্পানীর কোন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী গঙ্গাগোবিন্দকে পছন্দ করছে না—একমাত্র হেষ্টিংস নিজের ক্ষমতায় তাকে বারবার রক্ষা করে আসছিলেন। জন ম্যাকফরসন গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হ'য়ে এলে শাসন পরিষদের বিভিন্ন সভার আলোচনায় গঙ্গাগোবিন্দ নিজের ভবিষ্যৎ আঁচ করে নিতে পেরেছিলেন। পদত্যাগ না করে তখন আর নিজের সম্মান বজায় রাখার কোন পথ ছিল না তাঁর।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী। গিরিশচন্দ্রের মনোতুষ্টির জন্যে ভাদুড়ী মশাই অনেক ছড়া বেঁধেছিলেন—তার

কয়েটার উল্লেখ এই নিবন্ধেই আগে করতে হয়েছে। গিরিশচন্দ্র একটা করে পংক্তি বলতেন—সেই পংক্তিকে কাব্যের অন্তর্গত করে কৃষ্ণকান্ত ছড়া বাঁধতেন।

একদিন রাজসভায় যুবরাজ শ্রীশ চন্দ্র একটা পংক্তি উল্লেখ করলেন :

কত দেবী পড়ে দেবীসিংহের কবলে।

রস সাগরের ছড়া বাঁধতে দেরী হল না। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে মুখে মুখে ছড়া বেঁধে দিলেন :

হেষ্টিংস করেন সভা মুরশিবাদে
দেবীসিংহ সে সভায় এক ফাঁদ ফাঁদে।
নবীন সাহেব যত কর্তা এ সভার—
দেবী সিংহ হইলেন তাদের সর্দ্দার।
নর্তকী গণিকা যারা, তাদের তখন
দিতে হত সবাকারে কর বিলক্ষণ।
আদায় করিতে দেবী সিংহ এই কর,
কুতূহলে চলিলেন বাঁধিয়া কোমর।
দিলজান, দেলখোস, মতিবিবি আর—
কত বা করিব নাম হাজার হাজার।
দেবীসিংহ এক এক বাছিয়া লইয়া
এক এক প্রভু পদে দিতেন সঁপিয়া।
এই রূপে তাঁহাদের যোগাইয়া মন,
ইষ্ট সিদ্ধি করিতেন নিজে বিলক্ষণ।
এ রস সাগর তাহে কহে কুতূহলে—
কত দেবী পড়ে দেবীসিংহের কবলে।

এই ব্যাপারটাই বিশ্বকোষকার দেবী সিংহের জীবনী প্রসংগে নিম্নোক্ত ভাবে আলোচনা করেছেন :

'অর্থাগম সম্বন্ধীয় পরামর্শার্থ ও উৎকোচ গ্রহণের সুবিধার্থ হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে সংগে রাখিয়াছিলেন। দেবী সিংহকে গঙ্গাগোবিন্দ পূর্ব হইতেই জানিতেন। হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দের পরামর্শানুসারে কার্য করিয়া থাকেন দেখিয়া দেবী সিংহ গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন। উভয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই গঙ্গাগোবিন্দের সুপারিশে দেবীসিংহ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক সমিতির দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন।

'দেওয়ান হইয়া দেবী সিংহ দেখিলেন প্রাদেশিক সমিতির সভ্যগণ তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন এবং তাহা হইলে তাঁহার অর্থোপায়ের পথ রুদ্ধ হইতে পারে। তিনি কূটনীতি অবলম্বনপূর্বক তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া স্বকার্য সাধনে তৎপর হইলেন। প্রাদেশিক সমিতির সভ্যগণ সকলেই অল্প বয়স্ক কার্যানভিজ্ঞ ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। দেবী সিংহ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদনার্থ উত্তমোত্তম বিলাতী সুরা ও সুন্দরী স্ত্রীলোক সরবরাহ করিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি সর্বদা তাঁহার সঙ্গে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন।'

কিন্তু বেশীদিন দেবী সিংহের নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ চললো না। উৎকোচের অংশ ভাগ নিয়ে কাউনসিলের সাহেবদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। পালের গোদা দেবী সিংহ। তার মারফৎ-ই উৎকোচ। সাহেবদের রাগ গিয়ে পড়লো দেবী সিংহের ওপর। দেবী সিংহের চাকরী যায় যায় অবস্থা। কিন্তু দেবী সিংহের দুশ্চিন্তা কী? হেষ্টিংস তাঁর নিজের স্বার্থে দেবী সিংহকে রক্ষা করবেন। এর আগে পূর্ণিয়ায় অকথ্য অত্যাচারে—উৎকোচ নেওয়ায়—হিসাবপত্রে গোলমাল রাখায় দেবী সিংহের চাকরী প্রায় খতম হতে বসেছিল, কিন্তু রক্ষাকর্তা ছিলেন হেষ্টিংস।

পূর্ণিয়ায় সে সময় বার্ষিক রাজস্ব নির্দিষ্ট ছিল ৯ লাখ টাকা। দেবী সিংহ পূর্ণিয়ার সমস্ত পরগণার ইজারা নিয়ে রাজস্ব আদায় করলেন ১৬ লাখ টাকা। তখন ৭৬-এর মন্বন্তরের কাল। রেজাখাঁর সহকারী হ'য়ে দেবী সিংহ অকথ্য অত্যাচারে রাজস্ব আদায় করতে লাগলেন। কলকাতার কাউনসিল রেজাখাঁকে পদচ্যুত করলেন—দেবী সিংহেরও চাকরী গেল সেই সুবাদে—কিন্তু গুণমুগ্ধ হেষ্টিংস সুযোগ বুঝে দেবীকে মুর্শিদাবাদে এনে ফেললেন। মুর্শিদাবাদের রাজস্ব আদায়ের ভার পেলেন দেবী সিংহ। এবারে দেবী সিংহ হাওয়া বুঝে নিয়েছেন। দেখলেন, কাউনসিলের সদস্যদের আর কোন কোন বড় সাহেবের মন ভেজাতে পারলে তাঁর চাকরী কে মারে? অতঃপর নারী আর সুরা। চাট হিসেবে উৎকোচও ছিল। সাহেবদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি আর ভর্ত্তি পকেট এ দুই ছিল দেবী সিংহের বল। শেষ পর্যন্ত পকেটের অংশ ভাগ নিয়েই লাঠালাঠি বাধলো—সাহেবে সাহেবে ঝগড়া। সকলেরই রাগ গিয়ে পড়লো দেবী সিংহের ওপরে। উপায়ান্তর নেই, দেবী সিংহের এবার নিশ্চিত পতন—মুর্শিদাবাদ থেকে আসর গোটাতে হবে—কিন্তু রক্ষাকর্তা হেষ্টিংস এলেন এগিয়ে। দেবী সিংহকে সরিয়ে নিয়ে এলেন দিনাজপুরে।

দিনাজপুরে অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজার সরকারী অভিভাবক ছিলেন গুডল্যাড সাহেব। গুডল্যাড সাহেব আসলে গুড-ফর-নাথিং। কিছুই করতেন না, খেয়ে দেয়ে ঘুমনো ছাড়া। দেবী সিংহের খেলা সুরু হ'ল। রংপুর, দিনাজপুর বেনামীতে ইজারা নিয়ে, খাজনা বাড়িয়ে—খাজনা আদায়ের নামে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে দেবী সিংহ নারকীয় বিভীষিকার সৃষ্টি করলেন। সাধারণ প্রজার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে বিদ্রোহের ঢেউ উঠলো—অনেক কষ্টে বিদ্রোহ দমন হল। কলকাতার কাউনসিল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেবী সিংহের খপ্পরে গিয়ে পড়লো। কাউনসিল থেকে মনোনীত একজন অফিসার অনুসন্ধান করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল—দেবী সিংহের ভয়ে কেউ হাজির হলোনা কোন বিবৃতি দিতে। নতুন করে আবার কমিশন বসলো। কিন্তু কমিশন কাজ সুরু করতে না করতেই হেষ্টিংসের কার্যকাল খতম হ'য়ে গেল। কিন্তু কর্ণওয়ালিস বড়লাট হ'য়ে এসে দেবী সিংহকে আর চাকরীতে বহাল রাখলেন না—যদিও নতুন কমিশনের কাছে প্রজারা ভয়ে, আশংকায় দেবী সিংহের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করতে পারেনি।

হেষ্টিংসের কৃপাধন্য পঞ্চরত্নের কাহিনী এখানে শেষ হল কিন্তু আমাদের সমাজ-জীবনে আর একটি শ্রেণীর উদ্ভব হোল। এই নায়েব বেনিয়ানদের শ্রেণী। সাহেব-নবাবদের হাতে গড়া এই সমাজ। কেউ কেউ সাহেব নবাবদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও কৃপা পেয়েছেন, কেউ কেউ উচ্ছিষ্ট পেয়ে শহুরে বড়মানুষীর পত্তনী করেছেন। বাংলা দেশে উনিশ শতকের বাবুয়ানীর এঁরাই হলেন মাথা। 'হুতোম পেঁচার নক্সার' কিংবা 'আলালের ঘরের দুলালের' এঁরাই হলেন নায়ক-পুরুষ।

কোম্পানীর নথিপত্রে আদিকলকাতার দিশি চাকুরে

নারায়ণ দত্ত

অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় কলকাতাকে যদি মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়, দেখা যাবে সে মৌচাকের শ্রমিক মৌমাছিদের ভিড়ে সাহেবদের পাশাপাশি ছিল বাঙালীরা। তারাই সেই চাক বানিয়েছিল। এবং বলা নিষ্প্রয়োজন সংখ্যায় তারা কম তো ছিলই না, বেশিই ছিল। আজকের যে সোনার শহর কলকাতা, সেটা তৈরী হয়েছে জনকোম্পানীর আলাদিনের যাদুপ্রদীপের স্পর্শে নয়, বাঙলার মেহনতী মানুষের স্বেদে, শ্রমে; জনকোম্পানীর তাঁবে কাজ করে, তারা এই সত্যভূমিষ্ট শহরের ধাত্রীর কাজ করেছে, তাকে লালনপালন করেছে। এই শহরের রক্ষায় তারা, এই শহরের শুচিতা রক্ষায় তারা, এর রাজকার্যে তারা, পাবলিক রিলেসন্সের কাজে তারা। কিসে নয়। তারা কোম্পানীর খাজনা আদায় করেছে, ফরেন রিলেসন্স দেখেছে, ঢিগ ঢিগ করে ঢ্যাড়া পিটেছে, আবার শহর সাফ-সুতরা করা—তাও তারা।

এদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ অবশ্যই যদি করতেই হয়—আগেই নাম করতে হয় উকিলদের—যাঁরা ইংরেজদের হয়ে বিভিন্ন নবাবী দরবারে কাজকর্ম করত। ইংরেজদের ব্যবসাপত্র যাতে ঢিলে না পড়ে, অসুবিধা না হয়, তার তদারক করতেন। এঁরা বেশ ভালো মাইনে পেতেন। কোম্পানীর কর্মচারী-কুলপঞ্জীতে এঁরা কুলীন। একেবারে নৈকষ্য। এরা শুধু মাইনে পেতেন না, শিরোপা পেতেন। সঙ্গে, সামনে পেছনে, ঘোড়সওয়ার রাখবার 'এ্যালাওউন্স। আবার চলে ঘুরে বেড়াবার জন্যে ঘোড়া পেতেন। তার উদবৃত্ত খরচ, সবই কোম্পানী বইত। ঢাকার উকিল ছিলেন, কলকাতার মল্লিকবাড়ির আদিপুরুষ সন্তোষ মল্লিক। সেকালের নিরিখে ইনি 'ফ্যাট স্যালারির' লোক। তনখা পঞ্চান্ন। এঁরই নামে সেকালের কলকাতায় একটা মস্ত বাজার ছিল সুতানটীতে সন্তোষ বাজার, এই দলে ছিলেন লক্ষ্মণ উকিল,—উকিল হিসেবে এর নামেরই সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছে কোম্পানীর নথিপত্রে। রামচন্দ্র, এর পোস্টিং ছিল হুগলী, পাটনার উকিল রূপচাঁদ এবং সবচেয়ে বিখ্যাত—রাজারাম মল্লিক। এঁদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে, অবকাশও আছে। এবং কলকাতার আদ্যিকালের ইতিহাস রচনায় এইসব ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড অপরিহার্য।

এছাড়াও আছেন সেকালের কালা জমিদাররা। কালো কলকাতার দণ্ডমুণ্ডের মালিক ছিলেন এঁরাই। এই দলে আছেন নন্দরাম সেন, জগতদাস, রামভদ্র চৌধুরী, গোবিন্দরাম মিত্র। সেকালের কলকাত্তিয়া বাঙালীদের এইসব দিকপালরা শুধু জমিদারের মত খাজনা আদায়ই করেননি, সেরেস্তার কাজকর্মই দেখেননি—কলকাতার নতুন গড়ে ওঠা বাঙালী সমাজের পত্তন করেছেন, ঘাট বানিয়েছেন, জলাশয় স্থাপন করেছেন, মায়ের ব্রতানুষ্ঠানে উৎসব করেছেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন; দোল দুর্গোৎসব করেছেন কলকাতার বুকে বলতে কি বাঙালী সংস্কৃতির আসর বসিয়েছেন।

এ ছাড়াও আছেন বেনিয়ানরা। দালালরা। এঁদের মধ্যে আছেন দীপচাঁদ তাল্লা, বোধকরি কোম্পানীর প্রথম দালাল, জনার্দন শেঠ, বেনারসী শেঠ, বৈষ্ণবচরণ শেঠ। কিন্তু এরা সবই জন কোম্পানীর কুলীন কর্মচারী। ছোটখাট কর্মচারীদের হিসেবে এঁদের ধরবার কথা নয়। এবং অসংখ্য সেইসব ছোটখাট চাকুরেদের ভিড়ে শহর কলকাতার বনিয়াদ যখন রচনা হল, তখন যাদের মনে রাখবার কোন উপায়ই রইল না, এই নিবন্ধে তাদের ও তাদের বৃত্তির কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোম্পানীর নথিপত্রে সতেরশ তিন সালের অক্টোবরের একটা হিসেব রয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে এই মাসে ২৯৮৮৷৶৯ পাই খরচেরমধ্যে জন কোম্পানীর ৪২০৸৶ ব্যয় করেছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের মাইনের খাতে। অর্থাৎ কোম্পানীর মোট খরচের শতকরা চৌদ্দভাগ ব্যয় হত কর্মচারীদের মাইনের জন্যে। ঐ বছর ঐ মাসের কলকাতার বাজার—ডিহি কলকাতা, কলকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের জমা খরচের একটা হিসেব পাওয়া যায়। এগুলির কর্মচারীদের জন্যে কি হারে খরচ হত তা বোঝাবার জন্যে ঐ খরচপত্রের একটা 'এ্যাবস্ট্রাক্ট' নিচে তুলে দেওয়া হল :

ডিহি কলকাতা—	জমা	৩৯২৷৷১৫	চাকুরেদের জন্য খরচ—		৭৭৸০
কলকাতা—	ঐ	২৮৫৸৵৫	ঐ	—	২০৴০
সুতানুটী—	ঐ	২৭৯৷৵১০	ঐ	—	১৫৲
গোবিন্দপুর—	ঐ	২৪২৷৶৫	ঐ	—	২৭৷৫
একুনে		১২০০৷১৫			১৪০৴৫

বাজারের খরচের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী তখন তার চাকুরেদের জন্য 'পে বিল' দিত আয়ের প্রায় বার ভাগ। অর্থাৎ জমিদারীর তুলনায় কম। অবশ্য এরও মধ্যে কথা আছে কলকাতা ও গোবিন্দপুরের খরচের হিসেবে কিছু আকস্মিক বা 'ইনসিডেণ্টাল' খরচ রয়েছে। কলকাতার দু'জন মণ্ডলকে কোম্পানী শিরোপা দেয় যার জন্যে খরচ হয় দুই টাকা এক আনা। আর গোবিন্দপুরের বাজার খরচ থেকে একটাকা সওয়া চার আনা দেওয়া হয় একজন সরকারী পিওনকে। এ থেকে কোম্পানীর বেনেতী বুদ্ধির আর একটা নিদর্শন মেলে। দেখা যায়, যদি কলকাতার জমিদারী আর কলকাতার বাজার মূলতঃ একই কাউন্সিলের অধীনে, তবু হিসেবের খাতায় তাদের পার্থক্য সবসময় বজায় রাখা হ'ত।

সতেরশ এগার সালের মার্চ মাসের অর্থাৎ প্রায় আট বছর পরের একটা হিসেব পাওয়া যায়। সেই সময় দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর আয় ২,২৪০৵৮ পাই। খরচ ৮৬৷৶৬ পাই। এর মধ্যে কর্মচারীদের মাইনে বাবদ খরচ ১৩৴০। দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর জমিদারীর আয় প্রায় সমান থাকলেও কোম্পানী ব্যয়কৃচ্ছ্রতা করে মাইনে খাতে খরচ আয়ের শতকরা চৌদ্দভাগ থেকে চারভাগে কমিয়ে ফেলেছে। এই বক্তব্যটা আরও সুস্পষ্ট হবে, কোম্পানীর ঐ মাসের বাজারের হিসেবটা বিচার করলে। সেটা এই রকম।

ডিহি কলকাতা—	জমা— ৮৭৮৬/২ পাই—	চাকুরেদের জন্যে খরচ— ৮০।০
কলকাতা—	" — ৩৭২।/৬ " —	ঐ ঐ — ২০৲
সুতানুটী—	" — ৬৩৩/৯ " —	ঐ ঐ — ২৫৸০
গোবিন্দপুর—	" — ১৪৮৴৪ " —	ঐ ঐ — ১২॥০
	২০৩২।৵৯ পাই	১৩৮॥০

এ ছাড়াও এই সময়ে আরও দুটা বাজার বসেছিল তাদের হিসেবও এইরকম—

নতুন বাজার—	জমা— ২৮০৸৵০	কর্মচারীদের জন্যে খরচ— ৩॥০
সন্তোষ বাজার—	জমা— ১২৩২।/৩	ঐ ৬৸০
মোট	৩৫৪৫॥৵০	১৪৫৸০

এই হিসেব থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট কোম্পানীর লভ্যাংশ যখন তিনগুণ বাড়তির দিকে কোম্পানীর দিশি কর্মচারীদের তনখা খাতে খরচ কমে কমে মাত্র সওয়া তিন ভাগ প্রায়। কোম্পানীর আমলের সেই গোড়ার দিকের কলকাতায় অন্ততঃ পারকিনসন ল' চলেনি—এই হিসেবই তার প্রমাণ। এবং কলকাতার কালাধলা কর্মচারীদের মধ্যে সেই আদ্যিকালেই যে দুর্নীতির মারাত্মক মারাত্মক যেসব অভিযোগ পাওয়া যায়—কোম্পানীর কর্তাদের এই ব্যয়কুণ্ঠ নীতি যে তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল, সন্দেহ নেই।

কিন্তু দিশি যে সব কর্মচারী কোম্পানীর তাঁবে চাকরি করত, কি কি কাজ তাদের করতে হত? মাইনেই বা পেত কত তারা। অথচ এ কথা ভুললে চলবে না, সেই আমলের কলকাতায় তখনও কড়ির প্রচলন রয়েছে। তখন ষোলপণ কড়িতে এক কাহন হত আর দুই কাহন কড়িতে হত একটা টাকা। কাজেই আজকের নিরিখে এদের মাইনে অনেক কম বলে মনে হলেও সেটা ঠিক নয়। সেকালের কোম্পানীর হিসেবের খাতায় ছোটখাট চাকুরের কথা রয়েছে এবং তাদের মাইনেও পাশাপাশি জমাখরচ রয়েছে—কোতোয়াল—৪৲ চারজন রাইটার—১৮॥০ পনেরজন পিঅন—৩১৲ দশজন পাইক—১৫॥০ চারজন খাজনা আদায়কারী তহশিলদার—৬।০ একজন ঢুলি ও শিঙাবাদক (Drummer and Piper)—১৸০ এবং হালালখোর—৸০ এদের মধ্যে কোতোয়াল বা পুলিস সুপারিনটেনডেনট এবং রাইটার—এঁরা কিন্তু কোম্পানীর দিশি কর্মচারী নন, ফোর্ট উইলিঅমে থাকা খাস বিলিতী কর্মচারী। এই কোতোয়াল চারিটি গ্রামের শান্তিরক্ষাও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। আর এই রাইটাররা কলকাতা জমিদারদের কাজ করত। দিশি কর্মচারীদের মধ্যে ছিল পনেরজন পিঅন। প্রত্যেকের মাইনে ছিল দু'টাকার মত করে। দশজন পাইক। এদের সঙ্গে সড়কি বল্লম থাকত। কোম্পানীর জমিদারীর এদের সশস্ত্র রক্ষী বলা যায়। কোম্পানীর টাকা খেয়ে জয়রাম কলু যখন বরানগরে রামভদ্রের জমিদারীতে আশ্রয় নেয় তখন এদেরই পাঠানো হয়েছিল তাকে বেঁধে আনবার জন্যে। চারজন তহশিলদার। মাইনে পেত প্রত্যেকে ১॥/০ করে। একজন ঢুলি আর একজন শিঙাবাদক মাইনে ৸৵০ আনা করে। এরা কোম্পানীর জমিদারীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাজনা আদায় করে আনত। হালালখোররাই সবচেয়ে মাইনে কম পেত মাস প্রতি পৌণে এক

টাকা। কিন্তু এরা কি কাজ করত? কলকাতার বিভিন্ন ঐতিহাসিক এদের পরিচয় দিতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। কলকাতা—সেকালের একালের গ্রন্থে বা হরিহর শেঠের প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়ে বলা হয়েছে যে এঁরা কি যে কাজ করতেন, বলা শক্ত। উইলসন সাহেব তাঁর আর্লি অ্যানালস অফ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল গ্রন্থেও এঁদের পরিচয় ঠিক করে দেন নি। কেবল নির্ঘণ্ট বা ইনডেক্সিং-এর সময় পাশে 'সুইপার' শব্দটি লিখে দেন। গ্লাসগো জন ম্যাথিসন সাহেব England to Delhi' বলে একটা বই লেখেন। সেখানে হালালখোর সম্বন্ধে যা লেখেন তাতে দেখা যাচ্ছে, এঁরা হচ্ছেন আদি কলকাতার ডোম। সাহেব লিখছেন—

It would appear that the meanest of all occupations is that of the city dustmen (in Bombay called Halalcores ; and in Calcutta Dhomes), a degraded order of Hindoos, whose very shadow is shunned by the Brahaminical class, and with whom all ordinary mortals in the community disdain to eat or associate. (Chaptar XLIII Page 483) আগের পৃষ্ঠায় এই হালালখোরদের একটা ছবিও আছে।

সেকালের কোম্পানীর হিসেবপত্রে আরও কতকগুলি পদে দিশি কর্মচারীদের বহাল করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে পদাধিকারবলে প্রথম হচ্ছেন শিকদার—বা রাজস্ব অধিকারিক। কলকাতা, সুতানুটী বা তিনটি গ্রামে তিনজন শিকদার থাকত। কলকাতার চাকুরেদের তালিকায় রয়েছে—শিকদার তিনজন মণ্ডল, একজন পাটোয়ারী আর পাঁচজন পিওন। সুতানুটীর জন্যে একজন শিকদার একজন পাটোয়ারী আর পাঁচজন পিঅন আর গোবিন্দপুরে একজন শিকদার, একজন পাটোয়ারী, একজন উকিল, দু'জন রাইটার আর আটজন কাহার বা গোয়ালা। মজার জিনিস হচ্ছে, গ্রাম ভেদে সেকালের কোম্পানীর রাজত্বে মাইনের তফাৎ হত। কলকাতা বা গোবিন্দপুরের রাজস্ব অধিকারিকের মাইনে যখন চার টাকা সুতানুটীতে তিন টাকা। কলকাতা গোরা প্রধান অঞ্চল বলে যদি তার শিকদারদের মাইনে বেশি হয়, গোবিন্দপুরের সে কৌলিন্য কোথা? যদি বলা হয় আমানতের বেশি কমের ওপরে শিকদারদের মাইনে বেশি কম হত তাহলেও হিসেব মেলে না, কেননা কলকাতার আর গোবিন্দপুরের আদায়ের পরিমাণ যখন যথাক্রমে ২৮৫৫৵৩ পাই এবং ২৪২।‍৶৩ পাই, সুতানুটীর আমানত তখন ২৭৯'৵৬ পাই। তবে একটা ব্যাপার আছে। কলকাতা গ্রামের জমি বাড়ির খাজনা শতকরা দশ ভাগ বাট্টা সহ যখন ২২৪।৴৬ পাই, গোবিন্দপুর ১৭৬৲ সুতানুটীর মাত্র ১৪৭॥৴৯ পাই। মোট খাজনাই কি শিকদারের মাইনে ঠিক করার মাপকাঠি ছিল, বলা শক্ত। তবে এ আলোচনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, যদি সন্দেহ করা যায় এই শিকদাররা বাঙালী ছিল না, সাহেব ছিল। সাহেব ছিল মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, কেননা অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, কোম্পানীর কলকাতার একবারে উষালগ্নে বাঙালী পট্টির দণ্ডমুণ্ডের মালিক ছিল কালা জমিদার—নন্দরাম সেন। জানা যায় এঁর মাইনে ছিল দু'টাকা। কাজেই তিন-চার টাকা মাইনের চাকরী বাঙালীর কপালে জোটে কি করে? অবশ্য বাঙালী উকিলরা বেশি মাইনে যে পেত না তা নয়। তবে কথা কি, শিকদাররা বাঙালী হলে তাদের কর্মকাণ্ড কোম্পানীর নথিপত্রে কোথাও না কোথাও কি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হত না? যেসব কাগজপত্র উইলসন

সাহেবের চেষ্টায় আমাদের গোচরীভূত হয়েছে, তার মধ্যে কিন্তু কোন শিকদারের নাম খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এর চেয়ে পাটোয়ারীরা অনেক কীর্তিমান। এদের বেলায়ও গ্রামভেদে মাইনের কম বেশি হত। সুতানটী আর কলকাতার পাটোয়ারী যখন দু'টাকা করে পেত—গোবিন্দপুরের পেত দেড়টাকা। এঁরা খাজনা আদায় করতেন। এবং হিসেবও রাখতেন। বলা বাহুল্য পাটোয়ারীরা হত স্থানীয় ব্যক্তি। এবং খুবসম্ভব কলকাতার প্রজাদের দেয় পাট্টা এরাই তৈরী করত।

সতেরশ' সাত সালের জুন মাসে এইসব পাটোয়ারীদের হঠাৎ মাইনে বেড়ে যায়। দু'টাকার জায়গায় চারটাকা। এবং এদের কাজও বেড়ে যায়। এর কারণ, এই সময়ে কোম্পানীর প্রথম মাপ জরিপ শেষ হয়। এবং এর ফলে সবিস্ময়ে কোম্পানী লক্ষ্য করে যে the Company was being chanted, many personal not paying for half the ground they possessed. (১) The council also discovered that the black rent collectors had been making false returns and farming out lands for their own advantage.(২) এই আবিষ্কারের ফলে কোম্পানী পুরনো পাটোয়ারীদের সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় নতুন লোক নেয় এবং দুর্নীতি দূরীকরণের জন্যে মাইনে বাড়িয়ে দেয়। এবং কিস্তিতে কিস্তিতে নয়, সালিয়ানা খাজনা এক থোকে আদায় করতে পারলে 'কমিশন' দেবার রেওয়াজ করে।

কোম্পানী যে শহর পত্তনের সময়ে গ্রাম্য মুখিয়া বা মণ্ডলদের মাইনে দিয়ে রাখত, এবং কিছু কম টাকা করে মাইনে দিত, তার কারণ বোধ হয় এরা স্থানীয় মনোভাব রীতকরণ বুঝতে কোম্পানীর কর্তাদের সাহায্য করত। এবং কোম্পানী যে তাদের খুবই সম্মান করত তার প্রমাণ তাদের নিয়োগের সময়ে তাদের শিরোপা কিনে দিতে হত। একমাত্র দালাল রাখবার সময় কোম্পানী এই সম্মান দেখাত।

কোম্পানীর দিশি কর্মচারীদের মধ্যে জমিদাররা ছাড়া আরও যারা খুবই খাতির পেত তাঁরা উকিল (Vakil) সে কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। এঁরা কোম্পানীর এ্যামবাসাডর বা দূত হিসেবে কাজ করত নবাব বা সুবেদারদের দরবারে। এঁদের মাইনে হত মোটা। গোবিন্দপুরের যে উকিলের কথা পাওয়া যাচ্ছে তার মাইনে কিন্তু মাত্র পাঁচ টাকা। অস্বাভাবিক রকম কম। কেননা, সতের শ' চার সালের ২৩শে মার্চের নথিপত্রে রয়েছে, ঐ দিন হুগলীর রামচন্দ্র বলে একজনকে মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে ইংরেজদের উকিল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাঁর মাস মাহিনে কুড়ি টাকা। ঘোড়ার জন্য তিনি অতিরিক্ত পেতেন পাঁচ টাকা। আর সামনে পেছনে যাবার জন্য সড়কি বল্লমধারী দুজন পেয়াদা যাদের মাহিনে কোম্পানীর খাজাঞ্চীখানা থেকে যেত।

দিশি কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে নীচু পংক্তিতে বসত কাহাররা। এরা সাধারণতঃ সমাজের নীচু স্তর থেকে আসতো এবং কাছারীতে চাকরের কাজ করত।

কিন্তু কলকাতার মৌচাক আস্তে আস্তে যেমন বড় হতে লাগল, জমে উঠতে লাগল মধুভাণ্ড,

দেখা গেল, কোম্পানী দিন দিন বেশ সজাগ হয়ে উঠ্‌ছে। তার কাজের পরিধি বাড়ছে, কিন্তু কমছে কর্মীরা। বিশেষ করে যারা সাধারণ ছোটখাট চাকুরে। আমরা আগেই দেখেছি কোম্পানীর আয় যখন বেড়ে তিনগুণ হয়েছে, পার্কিনসন ল'কে কলা দেখিয়ে কোম্পানী তার কর্মী সংখ্যা কমিয়ে ফেলেছে। এই খাতে তার ব্যয় মোটেই বাড়েনি। এটা কি করে সম্ভব? আজকের দিনে যাকে বলে 'র‍্যাশান্যালাইজেসন' বা যুক্তিযুক্ত বুদ্ধিপ্রয়োগ, মনে হয়, কলকাতার আদ্যিকালে কোম্পানী তার আশ্রয় নিয়েছিল। বেঞ্জামিন বাউচার ছিল কোম্পানীর কাছারীর গোরা জমিদার। এবং বক্‌সী। তবিলদার। তখন কাজকর্ম কম। কোম্পানী তাকে বললে, বাপুহে, এই সময় হাতে ত কাজ কম, কলকাতাটা এই অবকাশে মাপজরিপ করে ফেলত। মনে হয়, অলস শ্রমিকের কাজে নিয়োগ করে' কোম্পানী খরচ অনেক কমাতে পেরেছিল।

যে করেই হোক, সতেরশ' এগার সালের হিসেবে দেখা গেল, কোম্পানী তার জমিদারীর কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলেছে। নীচের হিসেব থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

ডিহি কলকাতা

অক্টোবর, ১৭০৩			মার্চ, ১৭১১		
কোতোয়াল	—	১ জন	কোতোয়াল	—	১ জন
রাইটার	—	৪ জন	রাইটার	—	৪ জন
পিঅন	—	১৫ জন	পিঅন	—	২ জন
পাইক	—	১০ জন	পাইক	—	৮ জন
তশিলদার	—	৪ জন	তশিলদার	—	৪ জন
ঢুলি	—	১ জন	ঢুলি	—	১ জন
শিঙে বাদক	—	১ জন	বাজনদার	—	১ জন
হালালখোর	—	১ জন	হালালখোর	—	১ জন
মোট	—	৩৭ জন	মোট	—	২২ জন

কলকাতা

অক্টোবর, ১৭০৩			মার্চ, ১৭১১		
শিকদার	—	১ জন	শিকদার	—	১ জন
মণ্ডল	—	৩ জন	মণ্ডল	—	২ জন
পাটোয়ারী	—	১ জন	পাইক	—	৬ জন
পিঅন	—	৫ জন	পাটোয়ারী	—	২ জন *
মোট	—	১০ জন	মোট	—	১১ জন

সুতানুটী

শিকদার	—	১ জন	শিকদার	—	১ জন
পাটোয়ারী	—	১ জন	পাটোয়ারী	—	৩ জন *
পিঅন	—	৫ জন	মণ্ডল	—	২ জন
মোট	—	৭ জন	পাইক	—	৬ জন
			পিঅন	—	১ জন
			ঢুলি	—	১ জন
			মোট	—	১৪ জন

গোবিন্দপুর

শিকদার	—	১ জন	শিকদার	—	১ জন
পাটোয়ারী	—	১ জন	পাটোয়ারী	—	১ জন
** উকিল	—	১ জন	পাইক	—	৪ জন
** রাইটার	—	২ জন	মোট	—	৬ জন
** কাহার	—	৮ জন			
মোট	—	১৩ জন			
মোট	—	৬৭ জন	মোট	—	৫৩ জন

এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী নিখুঁত ভাবেই না তাঁদের কর্মচারীদের সংখ্যা প্রয়োজন ভিত্তিতে বাড়িয়েছে বা কমিয়েছে। এবং এই খাতাপত্র থেকে কলকাতার টৌন বা বাজারের উত্থান-পতনের ছবিটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখা যাচ্ছে, এই আট বছরের মধ্যে ডিহি কলকাতার কাজকর্মে ঝামেলা অনেক কমেছে। ইংরেজ শাসন, তার ব্যবসার মতই যে ধীরে ধীরে শিকড় গেড়ে বসছে, পিয়নের সংখ্যা পনের থেকে দুই এবং পাইকের সংখ্যা দশ থেকে আট করার মধ্যে সেই সত্যটা প্রতীয়মান হয়ে উঠছে। অপর পক্ষে টৌন কলকাতার পাটোয়ারী একটার জায়গা হচ্ছে দুটো, অথচ গ্রাম্য মণ্ডলের পোষ্ট তখন তিনজনের জায়গায় একজন। অর্থাৎ, স্থানীয় রহিস ব্যক্তিদের প্রয়োজন, গ্রাম্যজীবনে তাদের প্রভাব কমের দিকে, জন কোম্পানী নিজের শক্তিতেই নিজের প্রতিষ্ঠা খুঁজছে এবং কিছুটা লাভও করছে। এইখানেও পিঅন-পাইকের দলে ভাঙন ধরেছে।

সুতানুটীর কাপড়ের ব্যবসা যে ফালাও হচ্ছে, এই কর্মচারীর সংখ্যা ডবল হওয়াই তার পরোক্ষ প্রমাণ। যেখানে পাটোয়ারী একজন ছিল, সেখানে হল তিনজন। ভাবী বড়বাজার জমতে আরম্ভ করেছে। তার বাজারে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মধুপগুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। লোক সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ী বাড়ছে। আর তাই বাড়ছে পাট্টা দেবার লোক। খাজনা নেবার লোক। বাজারে ঘন ঘন ঢোল সহরৎ দরকার হচ্ছে। তাই ঢুলি আসছে তার ঢোল নিয়ে।

টিগ টিগ্ করে তার ঢোলের কাঠি পড়েই চলেছে, পড়েই চলেছে। এই সুতানুটীতে তখন একটা-আধটা নয়, ন'টা বাজার। চালের বাজার, নূনের বাজার জমজমাট। চাল চালানের শুল্কই শুধু আদায় হচ্ছে—১৯৮০ এদিকে গোবিন্দপুর কেমন যেন নিবু নিবু। আগে তার পাইক লাগত না, এখন লাগছে। পাটোয়ারী সেই একজন।

এই আট বছরের বিবর্তনে কিন্তু শুধু প্রয়োজনভিত্তিক নিয়োগ-ছাঁটাই করেনি কোম্পানী, কর্মচারীদের মাইনে-পত্র কম-বেশি করেছিল। শিকদারের মাইনে বেড়ে চার টাকার জায়গায় হয়েছিল পাঁচ। মণ্ডলদের তিনজনের মাইনে হ'ত দুটাকা। এখন টাকা-টাকা। পাইকদের মাইনে কমে দু'টাকা থেকে দেড়টাকা হয়েছে। ঢুলিদের হয়েছে বার আনা। পিঅনদের মাইনে কিন্তু যেকে সেই।

কিন্তু ছোটখাটই হোক আর বড়সড়ই হোক, কর্মচারীদের কথা বলতে গেলে, ছাঁটাই, 'রিট্রেঞ্চমেণ্টের' কথা এসেই পড়ে। শহর কলকাতায় কোম্পানী কলির সঙ্গে নামতে না নামতেই ছাঁটাই সুরু হয়েছিল। প্রথম ছাঁটাই হয় রাজনৈতিক ডামাডোলে। সতের শ' চার সাল নাগাদ যখন নতুন আর পুরনো ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী—আমে দুধে মিশে গেল, দেখা গেল দিশি কর্মচারীদের আঁতি খোলা সব বাদ। একেবারে ঝাড়েমূলে উচ্ছেদ। সেই হুকুমৎটা ছিল—'Ordered that all the black servants that look after the Company's factories and dead stock in the country be dismissed and Paid off till the 1st of February'. বলাবাহুল্য এদের মধ্যে কলকাতা জমিদারীর কর্মীরা পড়েননি। যাদের ওপর ছাঁটাই-এর কোপ পড়েছিল, তারা কোম্পানীর বৃহৎ যজ্ঞের ঋত্বিক-পুরোহিত। তারা কোম্পানীর ফ্যাক্টরিতে থাকত, গুদামে কাজ করত। অবশ্য ঈশ্বর রক্ষা, জয়েণ্ট কোম্পানী থিতু হয়ে বসলে পরের এক হুকুমে তাদের পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেওয়া হয়, এটাই বাঁচোয়া, নয়তো বেশ কিছু সংখ্যক গরীব বাঙালী ভাতে মারা গিয়েছিল আর কি!

কলকাতায় সত্যি করে বড়সড় ছাঁটাই-এর কথা জন কোম্পানী চিন্তা করে সতের শ এগার সালের এপ্রিল মাসে। এই সময়ে এক সঙ্গে বহু লোকের চাকরী গিয়েছিল। এবং তার ফলে কোম্পানীর বেঁচেছিল বার শ' টাকা। সেই আদেশটা হুবহু এই রকম: 'Agreed that we turn away several Peons Gwallors. Bannians and Gardiners Dandys and Cooleys which being last up also saves 1,200 rupees per month now therefore ordered the Buxie discharge the same according to List now delivered him.'

অবশ্য শাস্ত্র বলেছেন মধুরেন সমাপয়েৎ। কাজেই ছাঁটাই-এর কথা বলে জন কোম্পানীর কলকাতার গোড়ার যুগে ছোটখাট দিশি চাকুরের কথা শেষ করা ঠিক হবে না। সেকালের কলকাতায় মাঝে মাঝে প্রয়োজন বোধে হঠাৎ বেশি সংখ্যায় টেম্পরারি—সাময়িক লোকজন নেবার গল্পও রয়েছে। সতের ছ' সালের ডিসেম্বর। সেই কনকনে শীতে কলকাতার দিশি ডাকাতরা চড়াও হয়ে অনেক কয়জন গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি করে ফেললে। বেশ কয়েকজন মারা গেল। সামান্য কয়জন কালা পাইক বাধা দিতে গিয়ে চোট খেল। কোম্পানীর টনক নড়ল। কোম্পানী

একত্রিশজন দিশি পাইক নিয়োগ করলে। কোম্পানীর কনসালটেশন বইয়ে লেখা হল—'Thought necessary to keep greater guard on the towns for the Company's tenants' safety, wherefore the Jeminder is orderee to entertain 31 piks. or black peons, for the time presnt, to prevent like mischief in the future.'

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, এই প্রবন্ধের আলোচ্য পরিসর খুবই ছোট। সংক্ষিপ্ত। মোটামুটি ভাগে সতের শ' তিন-চার থেকে সতের শ' দশ-এগারর কলকাতা নিয়েই এখানে বলা হ'ল। এবং কেবলমাত্র কোম্পানীর কলকাতার জমিদারীর ছোটখাট দিশি কর্মচারীদের নিয়েই এই আলোচনা করা হ'ল। এ'ছাড়াও অনেক বঙ্গতনয় তখন কোম্পানীর নানা কারবারে চাকরীতে ঢুকেছে। কোম্পানীর পে অফিসে তখন গণেশ রামেরা দু'হাতে উপরি কামাচ্ছে। কাপড়ের গুদামে কাপড় মাপতে মাপতে বাঙালী সন্তান আখের গোছাচ্ছে। তখন কিন্তু কলকাতা সবেমাত্র কুঁড়ি। কি তারও আগে। সবুজ পাতার বুকে সদ্য জন্ম নিয়েছে। ফুল হয়ে ফুটতে তার অনেক দেরী। তার মৌচাক সদ্য বসতে সুরু করেছে। আরও বাড়বে। আরও বাড়বে। কত না মৌমাছির ভিড় বাড়বে। আরও অনেক মানুষ আসছে। আসবে। নতুন নতুন কাজ নিয়ে। বৃত্তি নিয়ে। তার কত বৈচিত্র্য। কত বাহার। জানি, কলকাতার ইতিহাস রচনায় তাদের কথা বলা দরকার। খুব দরকার, তবে, এই প্রবন্ধে তাদের কথা বাকি রয়ে গেল!

১। Early Annals — C. R. Wilson. Vol. I

২। 1 bid. 1 bid. „

৩। এঁরা পাটোয়ারী শুধু নন। এঁরা পাট্টা লেখকও বটেন।

৪। এঁরা শুধু গোবিন্দপুরের জন্যেই নিযুক্ত ছিলেন না। তিনটি টাউনের জন্যেই এদের রাখা হয়েছিল।

প্রস্তরযুগ ও জনতত্ত্ব

অলককুমার দত্ত

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে পৃথিবীতে এখন আমরা স্থানাভাবে কষ্ট পাচ্ছি, সেই পৃথিবীই কয়েক কোটি বছর আগেও মানুষের অস্তিত্বের অভাবে কি ভীষণ নির্জন না ছিল। আজ যে পৃথিবীকে স্থানাভাবে এত ছোট মনে হচ্ছে যার জন্য গ্রহান্তরে যাওয়ার প্রচেষ্টায় মানুষ এত ব্যগ্র সেই পৃথিবীই তখন মানুষের অভাবে কত বিশালই না ছিল। সবার মনে তাই এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, মানুষ প্রথম কোথায় এবং কবে দেখা দিলো। তবে প্রশ্নটা যত সহজ, উত্তর কিন্তু তত সহজ নয়। নানা মুনির নানা মত। অবশ্য এ কথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যেতে পারে, যে মানুষের মত জীব পৃথিবীর বুকে এক কোটি বছর আগেও ছিল। মানুষের মত জীব—ঠিক মানুষ নয়।

প্রকৃতির বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করলে অনেক জিনিষের রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। তাই এটা ঠিক আজকের মানুষ আর সেই এক কোটি বছর আগের মানুষে পার্থক্য অনিবার্য। তার চলনে বলনে, সবেতেই সে এখনকার থেকে অনেক আলাদা, তবুও সে মানুষ।

সেই প্রাগৈতিহাসিক দিনগুলো তুষার ঝঞ্ঝাপাতে কি ভয়ঙ্কর ছিল! পৃথিবীর প্রায় সবটাই বেশিরভাগ সময় বরফে ঢাকা থাকতো, আর সেই নির্মম অবস্থার মোকাবিলা, মানুষ, জীবজন্তু এবং গাছপালাকে করতে হত। মানুষ তখন হাতিয়ার শূন্য। তারপর এল প্রস্তর যুগ। পাথরের তৈরী হাতিয়ারের ব্যবহার সে ধীরে ধীরে শিখল। পাথরের হাতিয়ারই ছিল তার একমাত্র অস্ত্র আর ফল মূল সংগ্রহ এবং জীবজন্তু শিকার করাই ছিল তার প্রধান জীবিকা।

প্রস্তরযুগের প্রথম ও মধ্যভাগে মানুষের বসতি ছিল সেইসব জায়গায় যেখানে পৃথিবীর আদিম বরফাচ্ছন্ন আবহাওয়া থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারতো।

পৃথিবীর সম্পূর্ণ স্থলভাগের কতটুকুইবা সেদিন মানুষের ছিল। আজকে ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এখনকার জনসংখ্যার প্রাচুর্যে আমাদের গ্রহান্তরে যাবার কল্পনা করতে হয়। কেননা বিশ বা একশো বছর বাদে বিশ্বের জনসংখ্যা, কত হতে পারে বা জনতত্বের (demography) বৈশিষ্ট্য কী রূপ নেবে তাও মেপে বলা যায়। পেছন ফিরে তাকালেও, অন্তত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে সমকালীন বিশ্বের মানুষের নানা পরিসংখ্যান আমরা পেতে পারি। জনতত্ব সংক্রান্ত নানা পদ্ধতি ও বিচিত্র উপাদানে আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ। তবু যদি প্রশ্ন করা যায় মানব প্রজাতির জন্মের উষাকালে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ছিল এবং কীই বা ছিল সেদিনের মানবের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা প্রজাতিতত্ব। তার উত্তর কি?

পৃথিবীর প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষের আবির্ভাব। ফ্লেচার উইলেমেয়ার আর ফ্রাঙ্ক লরিমার দুই তাত্বিক মানব জন্মের উষাকালের খবর আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। মোটামুটি একটা অনুমান সিদ্ধ আঙ্কিক তথ্যে আমরা আসতে পেরেছি।

খৃষ্ট জন্মের আগের ছ'লক্ষ থেকে ছ'হাজার বছর সময়কাল আমরা প্রাচীন প্রস্তর যুগ ধরে

থাকি। খৃষ্টজন্মের ছ'লক্ষ বছর আগের সময়কে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সুরু বলে ধরা হয়। অন্তত সেই যুগে মানুষ না হোক মানুষ সদৃশ (man like type) জীবের দেখা মিলবে। অবশ্য সংখ্যায় তাদের স্বল্পতা মেনে নিতে হয়। কেউ কেউ অবশ্য এর আগে কোন কোন প্রজাতির উল্লেখ করেছেন—সন তারিখ নিয়ে প্রশ্ন ছাড়াও মানুষের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য কিন্তু উল্লেখযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে আরেকজন পণ্ডিত শ্রীমতী ডেস্‌মণ্ড অ্যানাবেলের ভাষ্য উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী ডেস্‌মণ্ড বলেছেন 'মানুষের আবির্ভাবকাল নিয়ে নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ—হিসেবে প্রায় লাখো বছরের ফারাক। সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কার থেকে বিভিন্ন অনুমানে মানবজন্মের উষাকাল বিশলাখ বছর পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। অবশ্য অনেক পণ্ডিতেই এই সময় সীমা মেনে নেন নি। তাঁর মতে, তবু এই নির্দিষ্ট সন (খৃষ্টপূর্ব ৬,০০,০০০) নৃতত্ত্বের বিভিন্ন প্রান্ত সীমার মাঝামাঝি এসে দাঁড়ায়।'

এই কাল সীমাকেই আমরা মোটামুটি আমাদের আলোচনার বনেদরূপে ব্যবহার করতে পারি। উইলেমেয়ার ও লরিমার তাই করেছেন। ওঁদের মতে 'নব্য প্রস্তর যুগের শুরুতে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লাখ আর জন্মহার হাজারে পঞ্চাশ। ফলে জনবৃদ্ধির হার ছিল সুষম।'

উপরিউক্ত অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে বিভিন্ন যুগের (প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর ও লৌহ যুগে) বার্ষিক জনবৃদ্ধির হার বার করা সম্ভব। সুদীর্ঘ প্রাচীন প্রস্তর যুগে বার্ষিক জনবৃদ্ধি ছিল হাজারে '০২। অতএব এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে (খৃষ্টপূর্ব ৬,০০,০০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৬,০০০ বছর) মোট মানব জন্মের সংখ্যা ১২ বিলিয়ন বলেই অনুমিত। শ্রীমতী ডেসমণ্ডের মতে 'যদি মানব আবির্ভাবকালকে খৃষ্ট জন্মের দশ লাখ বছর পর্যন্ত (এক মিলিয়ন) পেছিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ বর্ধিত কালসীমায় ৩২ বিলিয়ন মানবশিশু পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়েছিল। আরও কিঞ্চিৎ সঠিক হয়ে বলা চলে অন্তত ১২ বিলিয়ন থেকে ৩২ বিলিয়ন-এর মধ্যে মোট জন্মের সংখ্যা ধরা যেতে পারে।'

মোটামুটি দশ লাখ বছর ধরে মানুষ এই পৃথিবীর বুকে রয়েছে। কিন্তু গ্রাম শহর বন্দর জনপদ অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লবের আগে মানুষ সামান্য কয়েকটা দলে বিভিন্ন হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিল। সেই বিরল মানব অধ্যুষিত যুগেও ঐ অস্তিত্ব লক্ষণীয় নয়। এ সম্পর্কে শ্রীমতী অ্যানা বেলের তথ্য প্রণিধানযোগ্য—'শিকার আর সংগ্রহ থেকে মানুষের জীবিকার্জনের যুগে জনসংখ্যার সঠিক পরিমাণ জানা যাবে না। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের পরিমাণ ৫০০ লক্ষ বর্গমাইল। সম্ভবত সে যুগে ২০০ লক্ষ বর্গমাইলের অধিক স্থলভাগ মানুষের অধিকারে আসেনি। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন সাধারণতঃ উর্বর ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শিকার আর সংগ্রহ কাজের জন্য প্রতিটি মানুষের ২ বর্গমাইল ভূমিভাগের প্রয়োজন হয়। সে যুগে জনসংখ্যার স্বল্পতা যেমন ছিল, তেমনি ব্যক্তি মানুষের জীবন কাল ও একপুরুষের অস্তিত্ব কালের গড়, এখনকার চেয়ে স্বল্পস্থায়ী ছিল। বাঁচার তাগিদে মানুষ যাযাবরের জীবন যাপনে বাধ্য ছিল। আবহাওয়ার খেয়াল খুশীর উপরেই ছিল একান্ত নির্ভরতা। শিকারযোগ্য জন্তু জানোয়ারের ভৌগোলিক সংস্থান আর সহনযোগ্য আবহাওয়ার সন্ধানে মানুষের বসতির স্থায়িত্ব ছিল না। খাদ্যাভাব লেগেই ছিল—মহামরীও তথৈবচ, জনবসতি খুব ঘন না থাকায়—মহামারী ব্যাপক আকার নিতে পারতো না।

ঘটনার গতি এমন ছিল যাতে জন্ম ও মৃত্যু হারের মোটামুটি সমতা থেকেই যেত—অবশ্য জন্মহারের পাল্লা যৎকিঞ্চিৎ ভারী ছিল।'

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে প্রত্ন প্রস্তর যুগে মানব সমাজে বৃদ্ধ ও শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। মানব সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যা মানবসমাজে বাড়তে থাকে। প্রসংগত 'ইলসে স্বাইডেটজকীর' তথ্য উল্লেখযোগ্য। এই তত্ত্বানুযায়ী এবং প্রাচীন মানব সমাজের যতটুকু খবর জানা গেছে তাতে বলা চলে যে সমগ্র প্রত্ন প্রস্তর যুগে কোথাও মানুষ সম্ভবত, ৬০ বছরের বেশি বাঁচেনি। এই বক্তব্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে হলে জনতত্ত্বের আরো বিভিন্ন উপাদানের খবর, যথা বয়স, স্ত্রী পুরুষ—পরিসংখ্যান, মানবরোগ ও শিলীভূত অস্থি সমীক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানা দরকার।

মানবঅস্থি সমীক্ষার সতর্ক বিচারে জনতত্ত্বের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস পাওয়া যায়। পূর্ণবয়স্ক মানবের অস্থি বিচারে নির্ভুল ভাবে লিঙ্গ নির্ণয় করা যায়। প্রাচীন অস্থি সংস্থান বিদ্যায় শতকরা ১৫ ভাগ প্রমাদের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু আধুনিক শাস্ত্রে বিচ্ছিন্ন অস্থির সমীক্ষায় গুণাগুণ বিশ্লেষণে যথাযথ খবরই পাওয়া যাচ্ছে। অস্থি বিচারে বয়স নির্ধারণ সম্ভব—১২ বছর পর্যন্ত এক বছরের এদিক ওদিক হতে পারে। ৪০ বছরের দুই কি তিন—ষাট বছরে পাঁচ বছরের তফাৎ হতে পারে।

অস্থি সমীক্ষায় বয়সের যে বিচার তা প্রায়শই আদিম মানব গোষ্ঠির জীবন্ত মানবের বয়স বিচারের মত যথাযথ হতে পারে। চাউকুতিয়েনের গুহা থেকে প্রাপ্ত ৪৮টি 'পিকিং-মানবের' অস্থি নিয়ে সমীক্ষা করেছিলেন 'ভাইডেন রাইখ' (১৯৩৯)। ঐ সমীক্ষা থেকে পাওয়া যায় যে ৩৮ জনের ১৫ জন কিশোর ও শিশু, চৌদ্দ বছর পর্যন্ত যাদের বয়স। বাকি ২৩ জনের ৭ জনের মৃত্যুর সময়কার যথাযথ বয়সও বলা গেছে। এদের মধ্যে ৩ জন তিরিশ পৌঁছবার আগে মারা গেছে, অপর ৩ জন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে—শেষ ব্যক্তির পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়স। চাউকুতিয়েনের আর একস্থান থেকে আরও সাতটি শিলীভূত মানব অস্থি পাওয়া গেছে। যারা সম্ভবত পরবর্তী যুগের মানুষ। এদের তিনজন পরিণত বয়সে মৃত্যু কবলিত—একজন গর্ভস্থ কিংবা নবজাত শিশু। একজনের বয়স ছিল পাঁচ বছর অন্য জনা ১৫ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে। পরিণত বয়স্কদের দুজন মহিলা—বয়স কুড়ির ওপরে, আর একজন মাঝ বয়সী পুরুষ—শেষটিও পুরুষ, বয়স ষাট। এই সব বিচ্ছিন্ন সূত্র থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে 'সিনানথ্রোপাশ বা উত্তর চীনের আপার প্লীষ্টোসীন' মানুষেরা খুব বেশি বয়সের উর্ধ্বে উঠতে পারে নি।

প্রাচীন প্রস্তরযুগের যেসব মানব অস্থি থেকে বয়স বিচার করা গেছে তার থেকে জানা যায়, 'নিয়াসডারথাল' মানবগোষ্ঠির শতকরা ৫৫ জন ও প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানবগোষ্ঠির শত করা ৩৪ জন অকালে মৃত্যুর কবলে পড়েছে, অর্থাৎ কুড়ি পৌঁছোবার আগেই। নৃতত্ত্ববিদ 'ভ্যালোয়া' এই সূত্রে বলেছেন, মানুষের যে দীর্ঘ জীবনকাল বর্তমানে আমরা দেখতে পাই তা আধুনিক সভ্যতার পরিবেশের প্রভাব। এর কারণেই মানুষের সাম্প্রতিক দীর্ঘজীবন লাভ। জীবনী শক্তির স্বল্পতা নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ বাঁচতে পারতো না।' ফলত নিয়ত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রত্ন প্রস্তর

যুগের মানুষেরা বেশি বয়স পর্যন্ত পৌঁছোতই না—কেননা তখন মানুষকে বাঁচার জন্য তীব্র সংগ্রাম করতেই প্রাচীন প্রস্তর যুগ বলা চলে প্রধানতঃ যৌবন শক্তির যুগ।

প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষের বাঁচাটাই প্রায় অভাবিত ঘটনা। চকিত মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে মানুষকে জন্মাতে হত। ফলে জনগোষ্ঠি কখনই বিশাল আকার নিতে পারতো না। ছোট ছোট গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে থাকতে হতো। তখনকার জনগোষ্ঠির মধ্যে বৃদ্ধ ও শিশুর অভাব লক্ষণীয় ছিল। শতকরা ৫০ জন শিশু কৈশোরত্ব প্রাপ্তির আগেই মৃত্যুর গর্ভে চলে যেতো। যারা বাঁচতো তাদের কেউই বয়সের প্রাচীন সীমায় পৌঁছতো না। আগুন আবিষ্কারের পর মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল—ফলে পরবর্তীকালে জনতত্ত্বের তত্ত্ব ও নিয়মাদির পরিবর্তন ঘটলো। এই সূত্রে নৃতত্ত্ববিদ লিপার্টের তথ্য উল্লেখযোগ্য।

'আগুনের ব্যবহার এই প্রথম স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক কর্মবিভাগ এনে দিল—পুরুষেরা শিকারে যেত—মেয়েরা আগুন পাহারা দিত। আগুনে পুড়িয়ে খাদ্যবস্তু রন্ধনের প্রথায় শিশুমৃত্যুর হার কমে আসতে শুরু করলো। এমন কি সমাজের বয়স্ক মানুষদের অবস্থারও পরিবর্তন হল, আগুন ব্যবহারের পর।'

যদিও মানব সমাজে সামান্য কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে লাগলো—তবে এটা ঠিক মানুষের কৃষিজীবন সুরু না হওয়া পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য জনবৃদ্ধি ঘটেনি। কৃষিজীবনের শুরু হলে মানুষের খাদ্য সরবরাহের স্থায়িত্ব আসায় পরে স্থায়ী বাসস্থান ও জনপদ গড়ে উঠে—ফলে লক্ষণীয় হারে মানুষের জনবৃদ্ধি শুরু হয়।

সৎ সাংবাদিকতার শতবার্ষিকী

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

'বিগত ২৬শে বৈশাখ ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেশনে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার অত্যন্ত ভয়ানক বিবরণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।' সরকারী সংবাদপত্র এডুকেশন গেজেটের প্রথম বাঙালী সম্পাদক লিখছেন এই তথ্য। ঠিক একশ বছর আগে ১৮৬৮ সালের মে মাসে শ্যামনগর ষ্টেশনের কাছে এই রেল দুর্ঘটনা, বলা বাহুল্য এডুকেশন গেজেটে নিছক প্রেসনোটের বেশী মর্যাদা পায় নি। কিন্তু দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত হয়। 'যাঁহারা তৎকালে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যরূপেই বলিতেছেন যে, প্রায় তিনশত লোক মারা পড়িয়াছে।' এডুকেশন গেজেট নিছক রেলওয়ের রিপোর্ট নির্ভর করে প্রেসনোট প্রকাশ করলেও সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার ব্যক্তিগত আগ্রহে অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের দ্বারা পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করলেন। ১২৭৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ এডুকেশন গেজেটে তাঁর দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হয়। এর আগে অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে জোর আলোড়ন উঠেছিল যে সরকার দুর্ঘটনার প্রকৃত রূপ চেপে দিচ্ছেন।

শিক্ষা বিভাগীয় (দক্ষিণ) ইনস্পেক্টর হজসন্ প্র্যাটের নেতৃত্বে ১৮৫৬ সালে ৪ঠা জুলাই এডুকেশন গেজেট ১ম প্রকাশিত হয় প্রতি শুক্রবার ইটালী পদ্মপুকুর থেকে ১৪ নম্বর ভবনে মুদ্রিত হয় সত্যার্ণব যন্ত্রে। রেভারেণ্ড ও'ব্রায়েন স্মিথ এর প্রথম সম্পাদক। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬০ সালের আগে স্মিথের সঙ্গে যোগ দেন। ১৮৬২ সাল নাগাদ জানা যায় সরকার এডুকেশন গেজেটকে সরকারী মুখপত্র করবার জন্য বাৎসরিক ২৭০ টাকা অর্থসাহায্য দিতে শুরু করেছেন। ১৮৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সরকারীভাবে স্বীকৃত যে 'এডুকেশন গেজেটও সাপ্তাহিক বার্তাই' সরকারী মুখপত্র। ১৮৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে স্মিথ অসুস্থ হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুদিন পর তেশরা মার্চ প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। মাইনে মাসিক তিনশটাকা। 'প্রবন্ধাদি নির্বাচন ও পত্রিকার সকল প্রকার দায়িত্ব সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হয়—গবর্ণমেণ্ট ইহার সহিত সাক্ষাৎ সংসর্গ রাখেন নাই।'

এরই ফলশ্রুতি প্যারীচরণ সরকারের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের দীর্ঘ উদ্ধৃতি সম্ভব নয়, তবে দুর্ঘটনার কারণ, ব্যাপ্তি ও চিকিৎসা-যত্নে রেলওয়ে কর্মচারীর নিদারুণ অবহেলার উল্লেখ প্রতি ছত্রে ছত্রে। 'অনেকেই এরূপ অনুভব করিতেছেন যে রেলওয়ে কর্মচারীরা যখন তাড়াতাড়ি ভগ্ন গাড়ী হইতে হত আহত ব্যক্তিগণকে বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন।' 'দয়া ধর্ম শূন্য সসব্যস্ত কর্মচারী'রা হতাহত ব্যক্তিদের স্থানান্তরী করবার সময় মাটির উপর এমন টানাটানি করেছিলেন যে' যাহারা মৃতপ্রায় ছিল, তাহাকে জীবিত থাকিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না।' প্যারীচরণ এই সব দোষী কর্মচারীদের গুরুতর দণ্ডবিধান প্রার্থনা করেছিলেন। 'ইহাও অনেকের মুখে শোনা যাইতেছে যে প্রকাশ্য রিপোর্টে

যিনি যেরূপ লিখিয়া দেউন না কেন, বস্তুত সকল আহত ব্যক্তির প্রতি যথোচিত-রূপ যত্ন ও শুশ্রূষা করা হয় নাই। অকুস্থলে উপস্থিত কলিকাতার পুলিশকমিশনার ষ্টুয়ার্ট হগসাহেব ও আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় সুপ্রীম কৌন্সিলের মেম্বর স্যর রিচার্ড টেম্পল সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে প্যারীচরণ বলেছেন ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান কর্মচারীরা প্রেষ্টেজ হগ সাহেবকে বলেছিলেন 'তোমার এবিষয় কথা কহিবার অধিকার নাই।' 'তাড়াতাড়ি হতব্যক্তি সমূহকে রাত্রিকালে গোপনে নূতন ট্রেন আনাইয়া স্থানান্তরিত করা, এবং কোথায় নিক্ষেপ করা হইল না জানান, অত্যন্ত সন্দেহের কারণ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে কয়েকখানি গাড়ী ভাঙ্গিয়া যায় রাত্রিমধ্যে তৎসমুদায় অগ্নি দিয়া ভস্মীভূত করিবারই বা তাৎপর্য কি? গোপন করিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র হইবার কি প্রয়োজন ছিল।' এরপর প্যারীচরণ বলেছেন কুষ্টিয়ার নীচে পদ্মাতে ও অন্যত্র মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে—আত্মীয়দের সৎকার করতেও দেওয়া হয় নি। ব্যারাকপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডেকে অনুমতি নিয়ে মৃতদেহ পদ্মায় ও আহতদের হাসপাতালে পাঠান যেত। 'শ্যামনগরের নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের মুখেও ঐ কথা শুনা যায় এবং তাঁহারা বলেন হত আহতদের সংখ্যা তিনশতের ন্যূন নহে।' 'শুনা গেল জনৈক আহত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রেলওয়ে কর্মচারীর দুই একজন তাঁহার পকেটে হাত দেওয়াতে তিনি যেমন সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখেন তৎক্ষণাৎ দস্যুবৎ কর্মচারীরা অন্যদিকে যায়। এই সময় এই সকল কর্মচারী লুট করিতে গিয়াছিল সাহায্য দিতে যায় নাই।'

এর পর প্যারীচরণ ব্যাপক তদন্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান দাবী করেছেন 'কমিশন' নিয়োগ করে। কর্মচারীদের অপরাধের অভিযোগ কাটাতেও 'অতএব একটি কমিশন নিযুক্ত হওয়া সর্বতোভাবে উচিত।'

এ তথ্যাদি প্যারীচরণ বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবরণ ও নিজস্ব সংগৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে সংকলন করেছিলেন। বলা বাহুল্য কর্তৃপক্ষের কাছে এ রিপোর্ট রুচিকর ঠেকেনি। ১৮৬৮ সালের ২রা জুন তৎকালীন ছোট লাট স্যার উইলিয়ম গ্রে সরকারের তরফ থেকে সম্পাদককে জানালেন 'The article is calculated, from the false account which it gives of the occurence to mislead and to alarm the Native Public, and the admission of such an article without first taking some steps to inquire into the truth of the statements it contained, seems to the Lientenant Governor to be entirely opposed to the spirit of the condition on which the Education Gaeztte is supported by Govt, the chief of those condition it may be said being that the paper shall be a vehicle for furnishing the people with the means of forming a sound opinion on passing events by supplying them with accurate information.

১৬ই জুন বাংলা গভর্ণমেণ্টের জুনিয়ার সেক্রেটারী মান্যবর এচ, এল, হ্যারিসনকে প্যারীচরণ অভিযোগের উত্তর দিলেন যে ছোটলাটের কাছে তার প্রবন্ধ অপ্রীতিকর হয়েছে জেনে তিনি দুঃখিত। 'যদিও কোনো কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় নাই, তথাপি আমার নিজের প্রতি কর্তব্যানুরোধে'

তিনি লিখলেন হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ন্তাসনাল পেপার, ইণ্ডিয়ান মিরর, সোমপ্রকাশ, প্রভাকর ও চন্দ্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ পড়ে বিশ্বাসযোগ্য সূত্র অনুসন্ধান করে এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

অর্থাৎ সংবাদটি আগেই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের পরিচালিত সংবাদপত্রে দেশীয় জনসাধারণ পড়ে দেখেছেন অতএব ভয় বা ভ্রমের স্কোপ ছিল না। 'যে নিয়মে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এডুকেশন গেজেট প্রতিপালিত হইয়া থাকে আমি সেই নিয়মাবলি পাঠ করিয়া এমন কিছুই দেখিতে পাই নাই, যাহা সাময়িক ঘটনাসমূহের উপর আমার নিজের ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার প্রতিবন্ধক স্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। এবং যে নিয়মটিকে সেই নিয়মাবলীর প্রধান বলিয়া আপনার পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই নিয়মটিও মদীয় প্রবন্ধে ভঙ্গ করা হয় নাই কারণ উহা বিনা অনুসন্ধানে পত্রস্থ করি নাই।' সব শেষে প্যারীচরণ লিখলেন 'গভর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশ্যে এডুকেশন গেজেট পত্রকে সাহায্য করেন তাহার প্রতিকুলগামী হইতে পারে, এরূপ কোন প্রবন্ধ আমি ঐ পত্রে স্থান দিব এরূপ অভিপ্রায় কখনই আমার ছিল না, এবং আমি ওরূপ প্রবন্ধ কখনও পত্রস্থ করি নাই। কিন্তু সেই বিষয়েই বর্তমান স্থলে আমার কার্য দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, জ্ঞাত হইয়া আমি সন্তপ্ত হইয়াছি। আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, কোন প্রকাশ্য পত্র পরিচালন কার্যে অনিচ্ছা সত্বেও এইরূপ কোন না কোন অসন্তোষকর কারণ উপস্থিত হইতে পারে এবং সকল সময়েই উহা অতিক্রম করা আমার পক্ষে দুরূহ হইবে। সেইজন্য আমি বিহিত সম্মান পুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি যে মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এডুকেশন গেজেট পরিচালনা কার্য হইতে অব্যাহতি দান করেন।'

৩১শে জুলাই প্যারীচরণ পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এ্যাটকিনসন প্যারীচরণকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের বিশেষ অনুরোধ করেও ব্যর্থ হন। ৮ই আগষ্ট সরকার প্যারীচরণের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। এরপর ৪ঠা ডিসেম্বর এডুকেশন গেজেটের নতুন সম্পাদক হন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। 'গভর্ণমেণ্ট ভূদেববাবুকে পত্রিকাখানির সর্বস্বত্ব দান করিয়াছিলেন।' এরপর দীর্ঘকাল-জীবিত-এডুকেশনগেজেটে হেমচন্দ্রের বিখ্যাত 'ভারতসঙ্গীত' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

পুরোহিত দর্পণ প্রসঙ্গে

গত ভাদ্রসংখ্যা সমকালীনে শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য 'বট-তলানি' প্রবন্ধের পুরোহিত দর্পণ প্রসঙ্গে, সুতীক্ষ্ণ আলোচনা করে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। এখানে আমরা শুধু 'পুরোহিত দর্পণ প্রসঙ্গে' তাঁর মন্তব্য নিয়ে কয়েকটি কথা পাড়ব কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বটতলা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে তাঁর অ-সংলগ্ন বক্তব্য নিয়ে কোন রকম আলোচনাই করব না। কারণ, সম্ভবত শ্রীভট্টাচার্য হয়ত খেয়াল রাখেন নি বট-তলানির আগেও বটতলা সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ সমকালীনের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। সেগুলো পড়লে শ্রীভট্টাচার্য বোধহয় তার মূল অভিযোগ সঞ্জাত প্রাথমিক উত্তেজনা হ্রাস করার মত কিছু কিছু বিষয়বস্তুর সন্ধান পেতেও পারতেন সেখানে।

এবার শ্রী ভট্টাচার্যের পুরোহিত দর্পণ সংক্রান্ত বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সর্বাগ্রেই বলে রাখা দরকার বটতলার বর্তমান বই-বাজার নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি আর্থিকভাবে ক্ষতিকর-সম্ভাব্য-মতভেদ এবং সবচেয়ে বড় কথা পূর্ব পুরুষ প্রসঙ্গে মনোবেদনাকর কোন তথ্য পেলেও পারতপক্ষে সম্পূর্ণভবেই এড়িয়ে গিয়েছি স্পষ্ট কারণে। বটতলার অন্যান্য বহু প্রবণতার মধ্যে 'নকল' করার স্বাভাবিক ধর্ম জড়িয়ে রয়েছে মুদ্রণ শুরু হওয়ার থেকেই। কিন্তু ইতিহাসগত প্রয়োজনে হুতোমপেঁচার নকশার নকল আমরা কিছু আলোচনা করলেও আজকের বটতলার কোন 'চালু' নকল থাকলেও সযত্ন সতর্কতায় তা এড়িয়ে গিয়েছি। বস্তুত বটতলার কয়েকটি প্রকাশক এ ব্যাপারে এই অ-লিখিত প্রতিশ্রুতির বিনিময়েই মুখ খুলেছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁদের কাছে আমাদের মৌখিক প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য অগ্রিম ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে আমরা পুরোহিত দর্পণ নিয়ে আলোচনায় বসছি। আমরা পুরোহিত দর্পণ বলতে বটতলার আসল—বিজ্ঞাপনের ভাষায় আদি ও অকৃত্রিম পুরোহিত দর্পণকেই বোঝাচ্ছি। বটতলা নিয়ে রচিত একাধিক প্রবন্ধের অন্যতম বট-তলানির অন্তর্ভুক্ত পুরোহিত দর্পণ সংক্রান্ত তিন লাইন আলোচনায় আমরা এই আসল পুরোহিত দর্পণ নিয়েই আলোচনা করেছি। কবে কে তা অর্থলোভে তার ব্যর্থ নকল করেছিলেন তা আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মূল পুরোহিত দর্পণের দাম দশটাকা (এখনও বলছি, যদিও কাপড় বাঁধাই সংস্করণের দাম দুটাকা বেশী তবু কোনটাই একুশ টাকা নয়, দুখণ্ডেও নয়—অখণ্ড)। এই পুরোহিত দর্পণ পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সঙ্কলিত, লিখিত নয় (এই সকল নানা কারণে আমি একখানি পুস্তক সঙ্কলন করিব বলিয়া স্থির করি···)। উপরন্তু পুরোহিত দর্পণটি এর পর শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ব্যকরণতীর্থ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংশোধিত। বটতলায় আজও একটি বহু প্রচলিত প্রথা : অপরের রচনায় খ্যাতনামা লেখকের নাম ভাড়া দেওয়া [এ মন্তব্যের মানে এই নয় যে (১) বটতলায় এটা একচেটে, কলেজ স্ট্রীটেও কেউ কেউ এই অন্ধকার

পথেই চলেছেন 'বাধ্য' হয়ে। (২) পুরোহিত দর্পণের ক্ষেত্রেও এ ধরণের দুর্ঘটনার কোনরকম সুস্পষ্ট প্রামাণিক ইঙ্গিত রয়েছে। নিছক জনশ্রুতি যা সেদিনের পরচর্চাপ্রিয় বটতলারমূলধন ছিল তা সবসময় বিশ্বস্তও নয় কোনমতেই।]

শ্রী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি জানাবেন 'পুরোহিত দর্পণ' নামে কোনও বই বটতলায় কোন প্রকাশক কবে প্রকাশ করেছেন?" এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের পুরোহিত দর্পণের একটি পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি '৩।১ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট। সাহিত্য-প্রচার কার্যালয় হইতে শ্রীনবকুমার দত্ত কতক প্রকাশিত। এবং Printed by P. N. Mitra At/THE ABSARA PRESS/No 91 Durgacharan Mitter's street, Calcutta' এখন এই দুটি রাস্তা খাস বটতলার কেন্দ্রস্থলে। শ্রীভট্টাচার্য নিজেই বলেছেন আরেকখানি বই ছিল মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটস্থ সি, সি, বসাক এণ্ড সন্সের প্রকাশনায়। বসাকদের প্রকাশিত পুরোহিত দর্পণের রচয়িতা সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেদান্ত শাস্ত্রী…জানি না, বসাক এণ্ড সন্স বলতে শ্রী ভট্টাচার্য কোন প্রকাশক বোঝাতে চেয়েছেন কিন্তু সোনাগাছির মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট যে বটতলারই আত্মার আত্মীয় তা কিছু সংখ্যা আগে সমকালীনে প্রকাশিত 'বটতলার ভোরবেলা' পড়লেও জানতে পারতেন।

১৩১৩ সালের পুরোহিত দর্পণের প্রথম সংস্করণে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বলেছিলেন, '১২১৮ বঙ্গাব্দে পুরোহিত দর্পণের প্রথম প্রচার। ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় সংখ্যায় তখন ইহা প্রকাশ হইয়াছিল। এক্ষণে সাহিত্য প্রচার কার্যালয়ের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নবকুমার দত্ত মহাশয়ের যত্নে ও অজস্র অর্থব্যয়ে পুরোহিত দর্পণের সম্পূর্ণাংশ নূতন সংস্করণরূপে প্রকাশিত হইল।'

এর পর তিলকচন্দ্র দাস পুরোহিতদর্পণের কপিরাইট কিনে নেন। তিলকচন্দ্র দাস এষ্টেটের পক্ষে দুলালচন্দ্র দাস বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন 'পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শ্রীনবকুমার দত্ত প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থকার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর গ্রন্থ স্বত্বাদি আমার পিতা স্বর্গত তিলকচন্দ্র দাস উপযুক্ত দলিলে মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন।' 'পুস্তকাবলীর পরিচয়ে' (তালিকায়) প্রথমেই রয়েছে পুরোহিত দর্পণ। অর্থাৎ কোথাও আমরা সি, সি, বসাক এণ্ড সন্সের উল্লেখ পেলাম না।

বর্তমানে পুরোহিত দর্পণ 'সত্যনারায়ণ লাইব্রেরী। ৩২ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা-৬।' থেকে প্রকাশিত। শ্রী ভট্টাচার্য বোধহয় জানেন বটতলা যেখানে অবস্থিত ছিল বলে আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি সেই বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটের শেষ থেকে দশ গজের মধ্যেই গোপীকৃষ্ণ পাল লেন। আশা করি এরও পর শ্রী ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই পুরোহিত দর্পণকে বটতলার ফসল বলতে ইতস্তত করবেন না।

'আমি তাঁকে জানাচ্ছি যে ওই নামে কোন বই বটতলার কোন প্রকাশক কোনদিন প্রকাশ করেন নি।' শ্রী ভট্টাচার্যের, এই সরল ঘোষণাটি আমরা গলাধঃকরণ করতে পারলাম না বলে আন্তরিক দুঃখিত।

"বাজারে নকল হইয়াছে!

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত 'পুরোহিত দর্পণ' বঙ্গের গৃহে গৃহে পঠিত

হইতেছে। এত প্রতিপত্তি এত বিক্রয় এত আদর গৌরব দেখিয়া নকলকারিগণের রসনা-রস ঝরিতে লাগিল। তাহারা নানা নামে নানা ঢঙে ইহার জঘন্য নকল আরম্ভ করিল।' পুরোহিতদর্পণ প্রথম প্রকাশিত হয় ১১ শ্রাবণ ১৩১১ সালে। আর ১৩১৬ ২১শে ভাদ্রতেই অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয় (বোধ করি এর পরেও প্রমাণের প্রয়োজন নেই পুরোহিত দর্পণ কতটা 'সু প্রচলিত' ছিল কারণ আজকের মত টাইটেল পেজ পাল্টে 'সংস্করণ' বাড়ান সে যুগে চালু ছিল না)। অষ্টম সংস্করণেই সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন 'পুরোহিত দর্পণকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া লোভী ব্যক্তিগণ পুরোহিত দর্পণের জঘন্য নকল করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় হইতে ছিল।'

এর পর বেশ কিছু নকল পুরোহিত দর্পণ প্রকাশিত হয়। ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কায় নকলকারী সংস্থাটির নমোল্লেখ করলাম না। কিন্তু 'নকল' দানার ব্যাপারটি যে শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে। বাদী আসল পুরোহিত দর্পণ—প্রতিবাদী নকল পুরোহিত-দর্পণ উৎপাদক দুজন। হাইকোর্টের আদিম বিভাগের দেওয়া ডিক্রীর অনুবাদ হল—

অত্র আদালতের অন্যতম জজ মাননীয় ই, ই, ফ্রেচার সাহেবের এজলাসে বাদীর কৌঁসুলী এবং প্রতিবাদীদিগের কৌঁসুলীর সাক্ষাতে এবং প্রতিবাদীদ্বয় বাদীকে ৫৫০৲ টাকা দেওয়ায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইল এবং এই সাব্যস্ত হইল যে বাদী 'পুরোহিত দর্পণ' নামক পুস্তকের তাহার কপিরাইটের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী এবং এই হুকুম ও ডিক্রী হইল যে, প্রতিবাদীদ্বয়ের বিরুদ্ধে এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা Perpetual Injunction দেওয়া হইল যে, তাহারা বাদীর উক্ত পুরোহিত দর্পণ নামক পুস্তককে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া আর্জীতে উল্লিখিত যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা অদ্যকার তারিখ হইতে কেহ আর প্রকাশ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না, কেবল উক্ত আর্জীতে উল্লিখিত ৩০০০ কপির মধ্যে যতগুলি অবশিষ্ট আছে সেইগুলিই বিক্রয় করিতে পারিবে।'

শুনেছি, নকল 'পুরোহিত দর্পন'—ওয়ালারা এর পর থেকে তাঁদের বইয়ে বিশুদ্ধ আর্য্যাচার পদ্ধতি মতে মার্কা কোন একটা বিশেষণ জুড়ে নকল বই চালাতে থাকেন আইন বাঁচিয়ে। আমরা এই নকল পুরোহিত দর্পণের কপি দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করি নি, তাই জানি না কি ভাবে তাঁরা আইন ফাঁকি নিয়ে ব্যবসা চুটিয়ে চালিয়েছেন। কিন্তু তাদের বই অখণ্ড নয়, দাম বেশী ইত্যাদি বহু কারণেই সুরেন্দ্রমোহনের আসল পুরোহিত দর্পণের মত বাজারে চালু হয় নি। একথা আমরা দোকানদারদের কাছে শুনেছি। দোকানের খাতাপত্র দেখে প্রমাণ করার মত ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করায় সে প্রয়োজন ও হয়নি।

গুলু ওস্তাগর লেন স্থিত পুরোহিত দর্পণ টি প্রথম নয়। তাই সে বিষয়ে আমাদের কৌতূহলও ছিলনা, আমরা দেখিনি এর কপি। আলোচনাও করিনি এর কথা। কারণ বটতলার আসল পুরোহিত দর্পণ (Registored under X X of 1897) আমাদের প্রয়োজনীয় ছিল। বইখানি 'বর্তমানে অপ্রচলিত' নয় বরং বিপরীতই, সবচেয়ে বেশী চালু, এজাতের বইয়ের মধ্যে কেবল দামকম, অখণ্ড, সুরেন্দ্রমোহনের সুনাম, (সর্বোপরি দুলালবাবু বলেন 'ভাগ্য।') তবে দীর্ঘ দিন ছাপা নেই কথাটা অবশ্য আংশিক সত্য হতে পারে কারণ ১৩৭২ বঙ্গাব্দে এর পঞ্চত্রিংশ সংস্করণ প্রকাশিত

হবার পর সম্প্রতি কিছুদিন আগে এর নতুন মুদ্রণ হয়েছে। দুলালবাবু বল্লেন বইটির দাম কম রাখার জন্য একসঙ্গে বেশী ছাপাতে হয় (costings পোষাতে হয়)। একসঙ্গে বেশী ছাপাবার জন্য দেরী করে নতুন মুদ্রণ দিতে হয়। গত রাধাষ্টমীর দিন দুশো কপি বাঁধাই করে বাজারে ছাড়া হয়েছে নতুন বই। আমরা যখন দুলালবাবুর সঙ্গে দেখা করি তখন ভাঁজা ফর্মায় ঘর ভর্তি ছিল।

বটতলার এই পুরোহিত দর্পনকেই আমরা টাকশাল বলতে শুনেছিলাম। স্বভাব সৌজন্য বশত বটতলার পুরোহিত দর্পণের অসম্ভব বিক্রয়ের পরে রচিত 'পুরোহিত দর্পণ' সম্বন্ধে আমরা নীরব ছিলাম। বাগচী কোম্পানীর পুরোহিত দর্পণের ভালমন্দ, দাম, লেখক, ইত্যাদি কোন প্রসঙ্গেই আমরা বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য করিনি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই, কারণ বটতলার পুরোহিত দর্পণ যা আসল আদি ও অকৃত্রিম ও মূল (মূল্যও যার দশটাকা আজও) তাই আমাদের আলোচ্য ছিল।

এবার বটতলার লেখক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য নিয়ে আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করা যাক। সুরেন্দ্রমোহন 'বটতলার নয়' শ্রীভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের উত্তরে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য উদ্ধার করছি—'বটতলার ভদ্র প্রকাশক মণ্ডলীর একজন প্রধান উপন্যাস লেখক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য অনেক ডিটেকটিভ ও রোমাঞ্চক কাহিনী লিখিয়াছিলেন।' শ্রীভট্টাচার্য রাগ করলে কি হবে, স্বয়ং সুরেন্দ্রমোহনও বটতলার অন্যতম প্রকাশক নবকুমার দত্ত সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রসংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। একটু আগেই উদ্ধৃতি দিয়েছি যে তিলকচন্দ্র দাস (বটতলারই প্রকাশক) সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের বহু রচনার কপি রাইট নিয়েছিলেন।

একমাত্র সুপণ্ডিত না হলেই যে পুরোহিত দর্পণ রচনা করা যায় না শ্রীভট্টাচার্যের এ বক্তব্যও পুরোপুরি মেনে নেওয়া শক্ত। কারণ তিনি সুরেন্দ্রমোহনকে বেদান্তশাস্ত্রী বল্লেও সুরেন্দ্রমোহন নিজের নামের শেষে পুরোহিত দর্পণে বেদান্ত শাস্ত্রী ব্যবহার করেন নি। উপরন্তু সুরেন্দ্রমোহন পুরোহিত দর্পণ লেখেন নি সঙ্কলন করেছেন। তারও ওপর সেই সংকলন 'সংশোধন' করেছেন জনৈক ব্যকরণতীর্থ। এই সব প্রামাণিক তথ্য ছাড়াও বলা যেতে পারে পুরোহিত দর্পণ রচনা করতে গেলেই স্মৃতিতীর্থ হতেই হবে কিনা তা বিতর্কের বিষয়বস্তু। সুরেন্দ্রমোহন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা করে লিখেছিলেন 'রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব।'

গ্রন্থ রচয়িতার উত্তরপুরুষের সঙ্গে আমাদের কথা বলার ব্যাপারে যেন আরও বেশী অ-যথা উত্তেজিত হয়েছেন শ্রীভট্টাচার্য। হয়ত তিনি স্বাভাবিক ভাবে অনুমান করেছিলেন উত্তরাধিকার ও উত্তরপুরুষ এক বস্তু যেমন আসল নকল ব্যাপারটা ভুয়ো। আবার বলি আদি ও মূল পুরোহিত দর্পণ আমাদের আলোচ্য। বটতলার বইয়ের সংখ্যা ও বৈচিত্র এত গভীরও ব্যাপক যে নকল নিয়ে আলোচনা করার সময় সুযোগ জোটেনা—জুটলেও সম্পাদকও হয়ত তাঁর পত্রিকার স্থান সংকুলান জনিত অভাবের প্রশ্ন তুলতেন। তবুও হয়ত এ প্রসঙ্গে আমরা সুরেন্দ্রমোহন ছাড়া অন্যের রচনা পুরোহিত দর্পণ নিয়েও দু একটি তথ্যমুলক মন্তব্য করতাম যদি যেগুলো বাজারে চালু না থাকত অর্থাৎ তাদের ব্যবসায়িক ক্ষতির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকত। এটা আমাদের নয়, বহুজন অনুসৃত প্রতিজ্ঞা অনুসরণ মাত্র।

প্রতিবাদের উত্তরে শ্রীভট্টাচার্যের সকল প্রশ্নেরই জবাব দেবার চেষ্টা করা গেল, কেবল পুরোহিত দর্পণের লেখককে কেন পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য পুরোহিত বলেছি এই প্রশ্নটি ছাড়া। এই সহজ সরল মন্তব্যে বিভ্রাট ঘটত না বোধহয় যদি কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থও পূর্ববঙ্গের না হতেন। এরই ফলে শ্রীভট্টাচার্যের মন্তব্যটির বাঁক তাঁর পূর্বপুরুষের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে আমরা কোন মন্তব্যই করতে চাই নি। কারণ তিনি ও তাঁর রচনা আমাদের আলোচনার—বৃত্তের বাইরে। আমরা পুরোহিত দর্পণ সম্বন্ধে যা কিছুই বলেছি তা বটতলার আসল পুরোহিত দর্পণ, তার লেখক প্রকাশক ইত্যাদি সম্পর্কে। এই পুরোহিত দর্পণের লেখককেই আমরা তিনটি বিশেষণে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলাম। তিনটি মন্তব্যই আমরা স্পষ্টতর করতে চেষ্টা করতাম কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থ-স্বভাব সৌজন্য—অলিখিত প্রতিশ্রুতিও লিখিত প্রমাণাভাব এই কটি কারণে আমদের কণ্ঠরুদ্ধ। শুধু বলি, গ্রাম্য বলতে আমরা গ্রামীণ বুঝিয়েছি। অধুনা গ্রাম্য শব্দটির যে সংকুচিত অর্থ চলতি তা আমাদের লক্ষ্য ছিল না। কারণ বটতলার লেখক প্রকাশকদের ব্যথা বেদনা ও ব্যবসায়িক ব্যাপারে অসহায় দারিদ্র্য আমরা অনুভব করতে পারি বলেই বিশ্বাস। বটতলাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধেই আমাদের অক্ষম অভিযান অথচ শ্রীভট্টাচার্য্যের পত্রে সে অভিযোগটাই ব্যুমেরাং হয়ে পত্র পাঠ ফিরে এসেছে আমাদের কাছে। কোন প্রবন্ধের অংশবিশেষের একটিমাত্র মন্তব্যকে জোর দিয়ে বিশ্লেষণ করলে কখনই সহমর্মিতা আশাকরা যায় না।

বটতলার প্রকাশকদের উত্তরপুরুষদের বোবা অভিমান ভাঙ্গার সম্পর্কে আমাদের অসহায় উদ্যোগ সম্বন্ধে শ্রীভট্টাচার্য্যের অসতর্ক মন্তব্য আশাহীন ভাবে নিষ্ঠুর। কোথাও আমরা এত উত্তেজনা লক্ষ্য করি নি কারণ যে ব্যবসায়িক স্বার্থ সৌজন্যের মুখোস খসিয়ে দেয় যে স্বার্থের আক্রমণ দেখছি বটতলার বাইরেই বেশি। বরং বটতলার অনেক দরিদ্র অন্দরমহলে বাতাসা গলান চায়ের সঙ্গেও এর চেয়ে অনেক ঘন মরমী আন্তরিকতার আস্বাদ পেয়েছি। পাঁক হয়ত অনেক ঘেঁটেছি এবং শ্রীভট্টাচার্যের ভাষায় যথেষ্ট ঐতিহাসিক আগ্রহ নিয়েই। এর পরও যদি সত্যের ধারে কাছেও না পৌঁছতে পেরে থাকি সে আমাদের দুর্ভাগ্য নয়—বিশ্লেষণে ব্যর্থতা—তারজন্য কোন উত্তরপুরুষের ব্যবসায়িক স্বার্থপরতাকেই আমরা দায়ী করব না। এমন কি যাঁরা তাঁদের লাইব্রেরীর ক্যাটালগ দিয়ে পুরো ছাপিয়ে দিতে বলেছিলেন বিনাপয়সার বিজ্ঞাপন হিসেবে অথবা যাঁরা তাঁদের ছাপা নকল বইকে নির্লজ্জ ভাবে সমর্থন করতে বলেছিলেন তাঁদেরও আমরা প্রকাশ করেন তাঁদেরও সমর্থন করতে পারি না আমরা।

গ্রন্থরচয়িতার কোন উত্তরপুরুষের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা তা জানবার দায়ী শ্রীভট্টাচার্যের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক কারণ 'সোর্স অফ ইনকরমেশন' জানান নিয়ম নয়। আর যে পুরোহিত দর্পণ রচয়িতার তিনি উত্তরপুরুষ সে ব্যাপারটি আমাদের আলোচ্য নয়। বটতলার 'পুরোহিত দর্পণ' আমাদের লক্ষ্য ছিল।

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সমালোচনা

রাগাঙ্কুর ॥ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ডু। জিজ্ঞাসা। ৩৩ কলেজ রো কলিকাতা-৯। মূল্য দশ টাকা।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য অনুসন্ধানীরা প্রচলিত কিম্বদন্তী এবং ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে রাগসঙ্গীতের ধারা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। সঙ্গীত প্রধানত: প্রয়োগশিল্প। সুতরাং প্রয়োগকর্মের মাধ্যমেই শিক্ষাদান প্রশস্ত। তবু ভারতীয় সঙ্গীতের পটভূমিকায় রয়েছে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র—উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস সন্ধানে যার দান অপরিহার্য। ভারতীয় সঙ্গীতের এই দুইটি আপাতবিবাদমান তথ্য সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন। সুতরাং সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন অন্যথায় গ্রন্থবিশেষের প্রকাশনার সার্থকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ থেকে যাবে।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র নাট্য ও সঙ্গীত বিষয়ক এবং গুরুশিষ্য সংবাদ মাত্র। সঙ্গীতগুরু ব্রহ্মার সঙ্গীত-বিষয়ক উপদেশাবলী ভরতমুনির মুখনিসৃত। বস্তুত: এই উপদেশাবলীই নাট্যশাস্ত্রের উপজীব্য সুতরাং ভারতীয় সঙ্গীত যে গুরুশিষ্য পরাম্পরায় সুরক্ষিত এবিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না।

সহজলভ্য ছাপাখানার যুগে মুখে মুখে সঙ্গীতকে প্রচার না করে সঙ্গীতবিজ্ঞানকে লিপিবদ্ধ রাখবার যতই প্রচেষ্টা হোক না কেন প্রয়োগকর্মের মধ্যে দিয়েই সঙ্গীত শিক্ষার পূর্ণতা একথা ভুললে চলবে না। তবু সঙ্গীতগ্রন্থ—বিশেষ করে আলোচ্য গ্রন্থের ধরনের—প্রকাশনার প্রয়োজন আছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীর প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত গুরুর অপ্রাচুর্য দ্বিতীয়ত: উপযুক্ত গুরুর যথোপযুক্ত গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ স্বল্পবিত্ত ছাত্রের পক্ষে প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। সুতরাং উপযুক্ত সম্পাদনায় প্রকাশিত স্বল্পায়তন, সুলভ, প্রামাণ্য ও সহজবোধ্য সঙ্গীতগ্রন্থ সঙ্গীত শিক্ষার্থীর একমাত্র সহায়। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসের 'রাগাঙ্কুর' এই সমস্ত প্রয়োজন মেটাতেই আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থখানি বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে রাগসঙ্গীত শিক্ষার এক প্রকৃষ্ট প্রকল্প।

রাগসঙ্গীতের গঠন ও বিকাশ বর্ণনা করতে গেলে প্রথমেই বিভিন্ন 'ঘরাণা' গুলির বিবাদমান মতদ্বৈধতার মধ্যে আপোষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সর্বক্ষেত্রে একটা মধ্যপন্থারনীতি অনুসরণ করেছেন। রাগসঙ্গীতের 'এনসাইক্লোপীডিয়া' হিসাবে তাই—'ক্রমিক পুস্তকমালিকা' সর্বজনগ্রাহ্য কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে হিন্দিভাষায় ও দেবনাগরী হরফে লেখা গ্রন্থের অনুসরণ করে মতবাদের গোলকধাঁধায় পথ বিস্মৃতির আশঙ্কা আছে। অন্য পক্ষে রাগাঙ্কুর অবশ্যই এক সরল পথের নির্দেশ দিয়েছে।

রাগাঙ্কুর প্রয়োগ নির্দেশনার প্রাথমিক সোপান হিসাবে কণ্ঠসাধনাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সাধন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি ভালভাবেই দেখানো হয়েছে। কণ্ঠসাধন পদ্ধতির মধ্যে

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের নির্দেশক্রম অনুসৃত হয়েছে।

রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। আলোচ্য পুস্তকে প্রফুল্লবাবু এই বিস্তৃত ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে মোট আটটি পাঠক্রমের নির্দেশ দিয়েছেন। মোট আটটি পাঠক্রমের মধ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ পাঠক্রমে ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ এবং পঞ্চম থেকে অষ্টম পাঠক্রমে ক্রিয়াসিদ্ধ অংশের সঙ্গে তত্ত্বসিদ্ধ অংশও সমাবেশিত হয়েছে। সঙ্গীত শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অন্ত্য—এই তিন মানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তত্ত্বসিদ্ধ অংশ যোজনায় নিষ্ঠা। ক্রিয়াসিদ্ধ অংশে যেখানে রাগের বিবরণ ও তার আলাপ ও বিস্তার স্বরলিপির সাহায্যে দেখানো হয়েছে তত্ত্বসিদ্ধ অংশেও বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞের উক্তিগুলি প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত করা হয়েছে। অবশ্য ফলে বিপত্তিও দেখা গেছে স্থলবিশেষে। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রবিদগণ অনেকক্ষেত্রেই সঙ্গীত তত্ত্ব ও অলৌকিকতাবাদের মধ্যে সীমারেখা টেনে চলেন নি ফলে সঙ্গীতক্রিয়ার বহু অংশ ঐহিক দ্যোতনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পক্ষে ধোঁয়াটে তত্ত্বকথা কণ্ঠস্থ করা অবশ্যই অনুচিত। মুস্কিল এই যে দৈবভাষায় লেখা এই সকল তত্ত্বকে যুক্তি দিয়ে সহজে কেহই খণ্ডিত করতে চান না ফলে এই সকল মতবাদ বিজ্ঞান-ভিত্তিক যুক্তির পাশাপাশি চলে আসছে।

স্বর ও শ্রুতিতত্ত্ব প্রসঙ্গে বহুকাল থেকেই তর্কের অবতারণা। এরই জের টানতে গিয়ে গ্রন্থকার ভাষা কথন ও সঙ্গীত পরিবেশন এই দুই প্রকার 'কণ্ঠস্বরের ব্যবহারের' মধ্যে যে অভিন্নতার নির্দেশ দেখিয়েছেন তা পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের 'প্রণব ভারতী' থেকে গৃহীত ও অনূদিত এই কথাও স্বীকার করেছেন। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একটি তালিকায় ব্রহ্ম, নির্গুণ, শক্তি ইত্যাদি প্রচুর ঐহিক তত্ত্বের নির্দেশ রয়েছে এই তালিকায় সুতরাং আমরা সভয়ে ও ভক্তিভরে এই মতকে মেনে নেব একথা বলাই বাহুল্য। তবু অতি সন্তর্পণে পদার্থ বৈজ্ঞানিকদের যুক্তি অনুসরণ করে তাঁদের বক্তব্য প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি।

কণ্ঠ ও বাকযন্ত্র একই বস্তু নয়। কণ্ঠ হল মূলে স্বরযন্ত্র বা স্বরযন্ত্র। বাকযন্ত্র হল আস্য বা মুখবিবর যার আদি আর উপান্ত থেকে ককার আদি মকার পর্যন্ত বর্ণ শব্দগুলি উদ্ভূত হয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণকারী সম্প্রদায়ের মন্ত্রোচ্চারণ ছিল মুখ নিসৃত ও স্বর সংযোজিত। সেখানে মুখনিসৃত বাক্যেরই ছিল প্রাধান্য বেশী।

অধুনা উত্তরভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞান পুস্তকগুলির সম্পাদনকালে শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী সমাবেশীত হচ্ছে। অথচ বিকল্প তত্ত্বগুলি বর্জন করা হচ্ছে না। সঙ্গীততত্ত্বের এই 'জগাখিচুড়ী' ভক্ষণ করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীর যাতে উদরাময় না হয় সেই জন্যই কথাগুলি বলতে হল।

রাগাঙ্কুর যদিও উপরিউক্ত সম্পাদনপন্থার বিরল ব্যতিক্রম নয় তবুও তথ্য সন্নিবেশের পারম্পর্যে বৈজ্ঞানিক মননের স্বাক্ষর বহন করছে ।

মুদ্রণ ও বাঁধাই ভাল। প্রচ্ছদপট আচার্য নন্দলালের রেখাঙ্কিত বীণাবাদিনী সরস্বতীর চিত্র সম্বলিত।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

পরিবার পরিকল্পনার তাৎপর্য

গোবিন্দ নারায়ণ

এ পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা নানা বিশেষণে ভূষিত হয়েছে। কেউ বলেছেন, সব সমস্যার গোঁড়ার সমস্যা, কেউ বলেছেন মূল সমস্যা আবার কেউ বলেছেন এ সমস্যা ভীষণ বিপদ ডেকে আনবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানেই হল নতুন নতুন সমস্যা ও সামান্য প্রগতি। সোজা কথা হল, আমরা যদি এ সমস্যার সমাধান করতে পারি তাহলে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল হবে এবং আমরা আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারব।

জনসংখ্যা আজ আমাদের দেশে জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে। কিন্তু সেই হারে আমাদের জাতীয় সম্পদ যেহেতু বাড়ছে না আমরা এ সম্পদকে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যেতে দেখছি।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীটির বিচার শুধু জাতীয় সম্পদের দিক থেকে করলে চলবে না। তাকে দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও যোগাযোগগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করতে হবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোন থেকে এই কর্মসূচীর বিচার করলে দেখা যাবে যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানুষের মনোভাব ও ব্যবহারের পরিবর্তন সাধনের; এবং ব্যাপারটা যেহেতু অত্যন্ত ব্যক্তিগত অভ্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত, তাই প্রচেষ্টায় কিছু বাধাও আসতে পারে। এই বাধা বা প্রতিরোধ খুবই স্বাভাবিক। তবে প্রতিরোধটা খুব জোরালো হবে না। কেন না এই পরিবর্তনের দ্বারা ব্যক্তির নিজের স্বার্থই সাধিত হবে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক তাৎপর্য হল এই যে তা এমন একটি সামাজিক আদর্শ স্থির করে দেবে যাতে ছোট পরিবারই সবাই পছন্দ করবে। সেটাই হয়ে উঠবে সমাজের ফ্যাশান। তাছাড়া ইতিহাসে এই প্রথম মানুষের অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সমাজে খোলাখুলি আলোচনা ও বিতর্ক হচ্ছে। ফলে মানুষ তার অতি ব্যক্তিগত কাজের সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করছে।

এই কর্মসূচীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল এই যে এই কর্মসূচী গ্রহণের ফলে আমরা বুঝেছি যে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণের জন্যে ব্যাপক কর্মসূচীর রূপায়ন যে শুধু কাম্য তা নয়—তা সম্ভবও নিঃসন্দেহে।

এর গুরুত্ব আমরা তখনই উপলব্ধি করব যখন জানব যে এতদিন রোগীই চিকিৎসক বা চিকিৎসা ব্যবস্থার সন্ধানে ছুটোছুটি করতেন কিন্তু এখন ব্যাপক এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ইউনিটের প্রচলনের ফলে চিকিৎসকই রোগীর ঘরে গিয়ে সেবা করে আসছেন এবং সেটা সম্ভব হচ্ছে এই সুযোগ সুবিধার প্রবর্তন আমরা সামাজিক দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেছি বলেই। কাজেই চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিতে সুরু করেছে।

এ কর্মসূচীর সার্থক রূপায়নের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক খুব বেশি। তাই কর্মসূচী রূপায়নে মানুষের মতিগতির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হয়। কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংগ হবে শিক্ষা দেওয়া ও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা। মানুষের ব্যবহার বা অভ্যাস সংক্রান্ত কর্মসূচীর রূপায়নে নানা ধরনের কর্মীর প্রয়োজন হবে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কর্মী তো চাই—ই। তাছাড়া চাই সমাজ বিজ্ঞানী। এ কাজে চিকিৎসক ও সমাজ বিজ্ঞানীকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

গণ সংযোগের নতুন মাধ্যম

এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে আমাদের গণসংযোগ মাধ্যমগুলি দেশের বড় জোর ২০ শতাংশ জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ করতে পারে এবং একথাও সবার জানা যে সড়ক ও রেল ব্যবস্থা এখনও দেশের প্রতিটি প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌছতে পারেনি। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী এমন যোগাযোগ বা গণসংযোগ মাধ্যম উদ্ভাবনের প্রয়াসী যা দেশের যে কোন অংশের প্রতিটি মানুষের কাছে কর্মসূচীর বক্তব্য পৌছে দিতে পারে। কাজেই পরিবার পরিকল্পনার বাণীটি সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে পৌছে দেবার উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচীকে লোকসংগীত প্রভৃতি যাবতীয় লোক সংস্কৃতির বাহনগুলির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। ফলে নতুন নতুন গাইয়ে, বাজিয়ে বা নাটুকে দলের উদ্ভব হচ্ছে। পুতুল নাচের আশ্রয়ও নেওয়া হয়েছে। যে সব মাধ্যমগুলির সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের পরিচয় অতি ঘনিষ্ট তারই সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও অবশ্য অন্যান্য ব্যবস্থাও পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে।

দুঃখের কথা দেশের স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ কর্মসূচীগুলি যে অর্থনৈতিক সুবিধার সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে তারা আজও প্রশাসক ও পরিকল্পকদের ওয়াকিবহাল করতে পারেনি। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী একাধারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্য পূরণে এবং অর্থনৈতিক সুবিধা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছে এবং তা যদি তারা সার্থকভাবে করতে পারে তাহলে একটা মহৎ কিছু করা হবে।

সতর্কবাণী

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী হল আমাদের সবচেয়ে উচ্চকাংখী কর্মসূচী কেননা এর সাহায্যে জীবন ধারণের মান উন্নয়নের বিরাট এক আশা রয়েছে। কর্মসূচীর লক্ষ্য হল, শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের গতিকে বাড়িয়ে দেওয়া, লক্ষ্য হল যাবতীয় উৎপাদিত সামগ্রীর ন্যায়সংগত সুসম বণ্টন সম্ভব করা। তবু আমি বেশি আশাবাদী হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিতে চাই ; কেননা অবিলম্বে এসব লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। মানুষ, মানুষের মন ও ব্যবহার তথা অভ্যাস সম্পর্কিত কোন কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ন খুব সহজ হয় না। এ ধরনের কর্মসূচীর সুফল অনুভব খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরা যদি সকল শক্তি ও সম্পদ দিয়ে এ কর্মসূচী রূপায়নে ব্রতী হই—অর্থাৎ বর্তমান জন্মহার যদি অর্ধেক করতে চাই তাহলে কমপক্ষে সময় লাগবে দীর্ঘ দশটি বছর। তবে হ্যাঁ, দশ বছরের মধ্যেও যে কিছু কিছু উন্নতি হবে না তা নয়।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী হল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এর সাফল্য যে সুফল তা হল সমৃদ্ধিশালী প্রগতিশীল জাতি। এর ব্যর্থতা হবে বর্তমান সংকটাবস্থার চিরন্তনতা। আমি কর্মসূচী রূপায়নকারী কর্মীদের উপর আস্থা রাখি, আস্থা রাখি দেশবাসীর সুবুদ্ধিতে। তাই আশা করি, সফল আমরা হবই। কেননা আমরা দেশবাসীর হিতার্থেই এ কর্মসূচী গ্রহণ করেছি।*

---

* লেখক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচী ঃ সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য

দীপক ভাটিয়া

পরিবার পরিকল্পনা ভারতে সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর একটা সম্পূর্ণ নতুন দিককে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্য এই কার্যসূচী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নতুন এক দিগন্তের সূচনা করেছে পরিবার পরিকল্পনা।

প্রজননশীল বয়সের প্রায় দশকোটি দম্পতি অর্থাৎ ২০ কোটি নারী পুরুষের পরিবার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনের সঙ্গে আমাদের পরিবার পরিকল্পনার সমগ্র কর্মসূচী জড়িত। উল্লিখিত সংখ্যাটি আমেরিকার মোট জনসংখ্যার সমান। এ থেকেই সমস্যা এবং কর্মসূচীর বিরাটত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

ভারতে শহরের সংখ্যা ৩ হাজার। গ্রামের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬০ হাজার এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকই গণসংযোগের মাধ্যমগুলোর সঙ্গে পরিচিত নন। বিরাট এই দেশে রয়েছে আচার-ব্যবহার, ভাষা ঐতিহ্যগত বৈচিত্র ও পার্থক্য। তাছাড়া শিক্ষিতের হারও ভারতে কম। দ্রুত ও আধুনিক ধরণের পরিবহন ব্যবস্থারও এখানে অভাব। কিন্তু এইসব সীমাবদ্ধতির মধ্যেই সমগ্র দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়নের জন্যে একটি সংস্থা সংস্থাপন করতে হয়েছে।

এ ধরণের একটি বিরাট প্রকল্পের কথা চিন্তা করা এবং এবং রূপদান করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। সংস্থাটিকে অত্যন্ত ব্যাপক ভিত্তিতে গঠন করা হয়েছে। জনগণকে সেবা করবার জন্যে এই সংস্থাটিকে জনগণ তাদের প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও একাজে জড়িত করতে হয়েছে। জনগণের মধ্যে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মনোভাব সৃষ্টি করা এভাবেই সম্ভব।

পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ন—উভয় ক্ষেত্রেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে জড়িত করা দরকার। একথা আজ বলতে কোন বাধা নেই, প্রশাসন যন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রচনাও রূপায়ণ করে নি, করেছে এমন একটি সংস্থা যে সংস্থা জনগণের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর আর একটা বড় সাফল্য এই যে, জনগণকে আগ্রহী করে তুলবার জন্যে এর আগে কখনো এত বড় এবং সমবেত প্রয়াস চালানো হয়নি। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বড় বড় অভিযান চালান হয়েছে বটে, কিন্তু তা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে। পক্ষান্তরে আমাদের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের পরিবর্তন ঘটানো। আমাদের এই প্রয়াসের ফলে ভারতীয়সমাজে যে এর মধ্যেই অনেক বিবর্তন দেখাদিয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। লোকে আজকাল যেভাবে খোলাখুলি পরিবার পরিকল্পনা ও যৌন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন, এর আগে কখনো তা করতে পারতেন না। সুতরাং এমন আর বেশী দূর নেই যেদিন ছেলে মেয়ের সংখ্যা কত হওয়া উচিত তাও প্রকাশ্যে তারা আলোচনা করতে পারবেন।

সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এরকম একটি বিরাট কর্মসূচীতে কোন ঝুঁকি নেয়া যায় না।

তাই পরিবার পরিকল্পনায় যেসব পদ্ধতি সুদীর্ঘ ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে সন্দেহাতীতভাবে ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে সে সব পদ্ধতিগুলোই কেবল চালু করা যায়।

এভাবে পরিবার নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে আগ্রহী করে তুললেও সরকার কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি জনগণের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন না; বরং জনগণ তাদের প্রয়োজনানুযায়ী যে কোনো একটি পদ্ধতি বেছে নিচ্ছেন।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীর ক্ষেত্রে আমাদের একটু তড়িঘড়ি করতে হচ্ছে। কারণ ১৯৭৬—৭৭ নাগাদ জন্মহার হ্রাসের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা আমাদের অর্জন করতে হবে। সময়-সীমার ব্যাপারটা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। কারণ এর সঙ্গে আমাদের অর্থনীতি এবং অগ্রগতির কর্মসূচীর ক্ষতির প্রশ্নটি জড়িত।

সাফল্যের কথা বাদ দিলে এই কর্মসূচীর সীমারতি রয়েছে প্রধানত প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং মূল্যায়নের দিক থেকে। আমাদের এই কার্যসূচীর জন্যে দরকার হচ্ছে ২৫ হাজার শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী। কিন্তু যতদিন না এত অধিক সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী না পাওয়া যায় ততদিন পর্যন্ত তো অপেক্ষা করে থাকা যায় না। কর্মসূচী রূপায়ন এবং প্রশিক্ষণ দুটোই একসঙ্গেপাশাপাশি চলবে কর্মীদের শিক্ষণদানের জন্যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন ও এই সব প্রতিষ্ঠান চলাবার জন্যে প্রশিক্ষণ তৈরীর জন্যে সময়ের প্রয়োজন। এজন্যেই প্রধানত এক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি মন্থর।

অনুরূপভাবে গবেষণার ক্ষেত্রেও একুশটি গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণালব্ধ তথ্য এখন পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের কর্মক্ষমতা বাড়াবার জন্যে এবং গবেষণার জন্যে নতুন নতুন সমস্যার উপলব্ধির পক্ষে এই গবেষণালব্ধ তথ্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। প্রতিষ্ঠান কলাকৌশল, পদ্ধতি এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্পর্কে মূল্যায়নের কাজও খুব একটা এগোতে পারেনি। সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়নের যে কাজ হচ্ছে সে সম্পর্কে তথ্যাজ্ঞাপন এবং রেকর্ডরক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়নের ফলে ২০ লক্ষ শিশুর জন্ম রোধ করা হয়েছে। বর্তমান হারে যদি জন্মহার হ্রাসের প্রয়াস চালানো হয় তবে ১৯৭৬—৭৭ সাল নাগাদ আমরা বছরে ১২৫ লক্ষ শিশুর জন্ম রোধ করতে সক্ষম হবো। তখনি আসবে এমন একটা সময়ান্তর যখন আমরা দাবী করতে পারবো যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছি। আর তখনি আমরা সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির একটা নতুন যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম হবো।

এই কর্মসূচী রূপায়নে আমরা সর্বতোভাবে প্রয়াস চালাচ্ছি। কিন্তু যা করছি তাই যথেষ্ট নয়। বর্তমান প্রয়াসকে আমাদের বহুগুণিত করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তা পূরণ করতে হবে। অর্থ, লোকবল এবং জিনিষপত্রের কোনো অভাব আমাদের নেই। কাজেই এক্ষেত্রে ব্যর্থতার কোনো ক্ষমা নেই।

আমাদের কর্মসূচীর দক্ষতা এবং এতে জনগণের অংশ গ্রহণের পরিমাণেই প্রমাণিত হবে কর্মসূচীর সাফল্য।আমার বিশ্বাস, প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকলে ইতিমধ্যে যে অগ্রগতি ঘটেছে তা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা মিলিয়ে দেশের জনসংখ্যা সমস্যা আমরা নিশ্চিত সমাধান করতে পারবো।*

* লেখক পরিবার পরিকল্পনা কমিশনার।

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 October '68 (0'50) Central Regd. No. B.N.2605/57 SAMAKALIN

এই সোনা রং দিনে দার্জিলিং

হাসি-খুশির মেলা
বসেছে এখানে। মেঘ
ও রোদের লুকোচুরি
খেলায় আপনারও
হারিয়ে যেতে মানা নেই।
আলো-অন্ধকারে যখন
ভোর হবে তখন টাইগার
হিল, ফালুট, সন্দকফুতে
সূর্যের প্রতীক্ষা করুন
—দেখবেন কী উজ্জ্বল
বিস্ময় আপনার জন্য
অপেক্ষা করে আছে।

তারপর সোনা-গলা
দিনে খুশির উজ্জ্বলতায়
পথ চলতে চলতে
হিমালয়ের তুষারশুভ্র
মহিমার সামনে
আপনি থমকে দাঁড়াবেন;
উপলব্ধি করতে পারবেন
আপনার অবসর দিনের
প্রতিটি মুহূর্ত কী এক
আনন্দঘন অপার্থিবতায়
পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজ'
(ফোন : ৬৫৬) অথবা
'শৈলাবাসে'
(ফোন : ৬৮৪)
ওঠাই সুবিধে।

বুকিং এর জন্যে লজের
ম্যানেজারদের সঙ্গে অথবা
পাশের যে কোন ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন।

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
দার্জিলিং
টেলিগ্রাম : DARTOUR
৩/২, ডালহৌসী
স্কোয়ার (ইস্ট)
কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭১
টেলিগ্রাম : TRAVELTIPS

কলিকাতা ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে
নির্দিষ্ট তারিখের ১৫ দিন
আগে বুকিং বন্ধ হয়।

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ষোড়শ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৭৫

আনন্দে
উৎসবে
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিশীলনরমনীয়
কেশতেল
কেশরঞ্জন

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞানও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

বিদগ্ধ দায়িত্ব…

একটি ভাল উপন্যাস বা গল্প
আপনাকে সহজেই
আগ্রহান্বিত করে, একটি
ভাল কবিতা মুহূর্তেই
আপনাকে অনুপ্রাণিত করে,
কিন্তু একটি প্রবন্ধ ?
তার দায়িত্ব অনেক বেশী।
আপনার বিদগ্ধ মনকে
সে ধীরে ধীরে
প্রাভন্বিত করে, তাকে
বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে উত্তরণ করে'
বিদগ্ধতর করে তোলে।
সাময়িকতায় সে বিশ্বাসী নয়,
চিরন্তনতাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

গল্প কবিতা বা উপন্যাস নয়,
বিদগ্ধ ও মননশীল প্রবন্ধাবলী
যদি আপনাকে
আকর্ষণ করে তাহলে
প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা
স ম কা লী ন
আপনার অবশ্য পাঠ্য।

প্রিয় জুকু

বাবা জিজ্ঞেস করলেন,
জন্মদিনে আমি কী চাই।
আমি মর্টনের বড় এক বাক্স
মিষ্টি চাইলাম। বাবা বললেন
আমি একটি আস্ত পেটুক।
কেন না — আমি কখনো অন্য
কিছু চাই না।
পেটুক কাকে বলে ভাই ?
নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু।
কিন্তু মর্টনের মিষ্টি ছাড়া
চাইবার মতন কী এমন ভাল
জিনিস আছে ? অবিশ্যি, আমি
যা চাই, বাবা তা দেবেন
বলেছেন। তুমিও এসো না, দুজনে
বেশ মজা করে খাওয়া যাবে।
এসো কিন্তু। ভালবাসা নাও,

তোমারই
বিল্টো
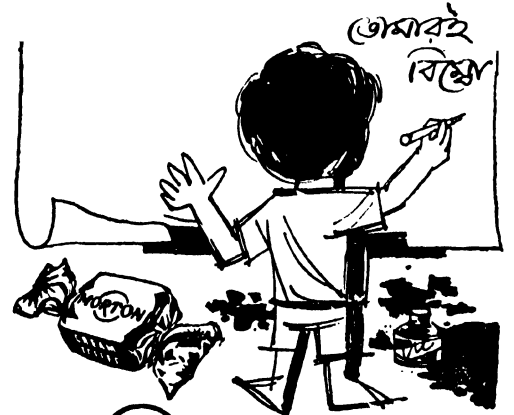
MORTON
সি এণ্ড ই মর্টন (ইণ্ডিয়া) লিঃ
উচ্চ শ্রেণীর মিষ্টি, কনডেনসড্ মিল্ক ও মাখন প্রস্তুতকারক

ASP:M. 6/68

ষোড়শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

পৌরাণিক যুগে সাংবাদিকতা

তারাপদ পাল

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদি, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ইতিহাস, ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: 'সাংবাদিকতা' বলতে আজ যে কাজকে বোঝায়, প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতবাসীগণ তার সমজাতীয় কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিল। কিন্তু সেই কাজকে সে-সময়ে 'সাংবাদিকতা' বলে চিহ্নিত করা হয়নি ঠিকই। তথাকথিত আধুনিক 'সাংবাদিকতা' শব্দের আমদানি ও অভিধা ষোড়শ শতকে। ভারতবর্ষে এর সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে। অগষ্টাস হিকি-র 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকার প্রকাশ দিয়ে। তা বলে এমন কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে, তার আগে ভারতবর্ষে 'সাংবাদিকতা' বা তার সম-জাতীয় কোন কাজের অস্তিত্ব ছিল না।

রামায়ণের নারদ বাল্মীকি সুগ্রীব হনুমান, মহাভারতের সঞ্জয় বিদুর—এঁরা সবাই সাংবাদিক। শুধু এরাই নয়, এদের সঙ্গে আরও অনেকেই আছে। ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পটভূমিতে, বহু ঘটনা ও চরিত্রের মিছিলে এরা মিলে মিশে হারিয়ে গেছে। তাই খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু চিনতে অসুবিধা হয় না। তাদের কাজই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে চিনিয়ে দেয়। বিভিন্ন কাজের মধ্যে তাদেরকে বারবার দেখা যায়, পরিচয় পাওয়া যায়, চেনা যায় সাংবাদিক বলে।

আরও লক্ষণীয় রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয়ের আরম্ভেই সাংবাদিকতার লক্ষণ স্পষ্ট। প্রথমটি শুরু হচ্ছে একটি পরিকল্পনার সংবাদ দিয়ে, দ্বিতীয়টি সাংবাদিক সম্মেলন বা 'প্রেস কনফারেন্স্' দিয়ে।

ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম প্রধানতঃ পরিচালিত হয় নয়া দিল্লী থেকে।

'যোজনা ভবনে' তৈরী হয় বিভিন্ন পরিকল্পনা। পরিকল্পনা তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হবার পর, পরিকল্পনা ও সমগ্র কর্মসূচী সাংবাদিকরা সংগ্রহ করে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সংবাদপত্র ও বেতারের মাধ্যমে প্রচার করেন। আধুনিক কালের এই কাজটি সাংবাদিকতা।

পুরনো বিশ্বাস অনুসারে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনার কর্মকেন্দ্র স্বর্গরাজ্য। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তার সবই সেখান থেকে ঘটানো হয়। পৃথিবীর লোকেরা কেবল নির্দেশ পালন করে। এই কর্মকেন্দ্রের কর্তাব্যক্তিরা হলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র অগ্নি বরুণ দেবতারা। নারদ এই স্বর্গরাজ্য ও ত্রিভুবনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী সাংবাদিক। 'লবি করেস্‌পন্‌ডেন্ট'। সর্বত্র তার গতায়াত। সর্বস্থানের সংবাদ সংগ্রহ করা ও যথাযথ স্থানে তা সরবরাহ করার কার্যভার তার ওপর ন্যস্ত। তিনি একদিন বিষ্ণুলোকে গিয়ে জানতে পারলেন যে, সেখানে একটি পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে মর্ত্যে কতকগুলি ঘটনা ঘটবে। রাম-কেন্দ্রিক এই পরিকল্পনাটির নাম: 'রামায়ণ পরিকল্পনা'। বিস্তারিত ভাবে সংবাদটি সংগ্রহ করে তিনি চলে এলেন মর্ত্যে। বার্তা-সম্পাদক বাল্মীকিকে তিনি যথারীতি সংবাদটি জানালেন। উপযুক্ত সম্পাদনার পর 'রামায়ণ' শিরোনামায় উক্ত পরিকল্পনা-সংবাদের 'নিউজ-ষ্টোরী' তৈরী হলো। এবং এই ষ্টোরীটি প্রচারের দায়িত্ব নিলেন লব ও কুশ। সে-সময় খবরের কাগজ ছিলো না, লেখার প্রচলনও ছিল না। তাই এই সব সংবাদাদি মুখে মুখেই প্রচারিত হত। পূর্বোল্লিখিত কাজের সঙ্গে এই কাজের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

এখনকার দিনে ভ্রাম্যমান সাংবাদিকরা বিভিন্ন স্থানে সফরকালে সেখান থেকে নিয়মিতভাবে সেই স্থানের খবরাখবর ও সংবাদ-ভাষ্য লিখে পাঠান—সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে। সংবাদ বা বেতারের মাধ্যমে আমরা তা পাঠ করি বা শুনি এবং সেই সব স্থানের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ অবহিত হই। মহাভারতের যুগে আজকের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা ছিল না। অতএব সেই যুগের লোকেরা আজকের মতো নিয়মিত 'নিউজ ডেসপ্যাচ' পেত না। সেই সাংবাদিকের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হতো। আজকাল যেমন (অনেক ক্ষেত্রে) বিদেশে ভ্রমণরত সাংবাদিকরা ফিরে এসে সংবাদভাষ্য, বা ভ্রমণ-বিবরণ বা রিপোর্টার্জ লেখেন, সেইভাবে মহাভারতের যুগের সাংবাদিকরা ফিরে এসে দেশের লোকের কাছে তার 'রিপোর্ট' পেশ করতো। 'মহাভারতে'র শুরু হচ্ছে এমনি একটি ঘটনা দিয়ে।

ভারতের নানা স্থানে দীর্ঘদিন ধরে ভ্রমণ করে নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ করে নৈমিষারণ্যে এসে উপস্থিত হলেন উগ্রশ্রবা। উগ্রশ্রবা জাতিতে সূত। (১) উপাধি সৌতি। সৌতির অনুপস্থিতিতে নৈমিষারণ্যের মুনিগণও দীর্ঘদিন কোন খবরাখবর পাননি। সংবাদের জন্য তারা উদগ্রীব হয়েছিলেন (আজকাল যেমন প্রতিদিন সকালে খবর জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকি)। উগ্রশ্রবাকে পেয়ে তাঁরা তার কাছ থেকে সব খবর জানতে চাইলেন। উগ্রশ্রবা যেখানে যা দেখেছেন শুনেছেন—সব বলে গেলেন একে একে। উগ্রশ্রবার এই রিপোর্টই 'মহাভারত'।

ভিয়েতনামে এখন যে যুদ্ধ চলছে, নিয়মিত তার খবর পাওয়া যাচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রে কর্মরত সাংবাদিক বা 'ওয়ার করেস্‌পন্‌ডেনটের' দৌলতে। মহাভারতের কালে সজ্ঘটিত সর্ববৃহৎ যুদ্ধ

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সংবাদ জানা গিয়েছিল তৎকালীন 'ওয়ার করেস্‌পন্‌ডেন্ট' সঞ্জয়ের কাছ থেকে। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও হস্তিনাপুরবাসীদের কাছে প্রতিদিনের যুদ্ধের বিবরণ তিনি দিয়েছেন। তার সেই বিবরণের মধ্যে দিয়েই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমগ্র চিত্রটি মহাভারতে বর্ণিত। ঐ যুগের প্রথম ও সার্থক 'ওয়ার করেস্‌পন্‌ডেন্ট' সঞ্জয়।

বিদুরও সাংবাদিক হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। জতুগৃহে মাতা কুন্তি সহ পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার গোপন ও ষড়যন্ত্র-মূলক পরিকল্পনাটি তৈরী হয়েছিল এক গোপন বৈঠকে। দুর্যোধন শকুনি কর্ণ প্রমুখের মধ্যে অনুষ্ঠিত সেই 'ক্লোজডোর কনফারেনসের সিদ্ধান্তটির সংবাদ চতুরতার সঙ্গে বিদুরই সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিদুর কর্তৃক এইরকম একটা 'স্কুপ-নিউজ' সংগ্রহ করার সাফল্যেই পঞ্চপাণ্ডবাদি জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই জাতীয় সংবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশ ও জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক এই রকম কোন ষড়যন্ত্র-মূলক পরিকল্পনা—তা সে শত্রুপক্ষেরই হোক আর সরকারেরই হোক তা সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে পারা সাংবাদিকের সততা, কর্মদক্ষতা ও গৌরবের বিষয়। সেদিক দিয়ে বিদুর সার্থক।

'সাংবাদিকতা' শব্দটি ইংরাজী 'জার্ণালিজম' শব্দের প্রতিশব্দ। ইংরাজী ভাষায় এর আমদানি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে। এর সঙ্গে 'জার্ণাল শব্দের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। জার্ণাল থেকেই জার্ণালিজম শব্দ এসেছে। জার্ণালের মৌল ও যথার্থ অর্থ হলো রোজনামচা বা কড়চা। ইংরাজী ভাষায় শব্দটির জন্ম ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে। অর্থ বিস্তারের ফলে আজকাল আমরা জার্ণাল বলতে রোজনামচা ও কড়চার সঙ্গে পত্রপত্রিকাও বুঝি। Shorter Oxford Dictionary-তে জার্ণাল শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'a day's work—a record of travel—……—a record of public events or transactions noted down as they occur, without historical discussion—a daily newspaper or other publication; hence, by extension, any periodical publication containing news in any particular sphere.' আর জার্ণালিজম সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'The occupation or profession of a journalist—journalistic writing—the practice of keeping a journal.' ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় 'জার্ণালিষ্ট' (Journalist) শব্দটি আসে। এরই বাংলা 'সাংবাদিক'। 'জার্ণালিষ্ট' কারা? Shorter Oxford Dictionary-তে লিখেছে: 'One who earns his living by editing or writing for a public journal—one who keeps a journal.'

এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দৈনন্দিন ঘটনাবলী, কাজকর্ম ইত্যাদির বিবরণ, হিসাব ও খতিয়ান রাখা ও জানানো সাংবাদিকতা। এবং এই কাজ যারা করে তারাই সাংবাদিক। জার্ণাল, জার্ণালিষ্ট ও জার্ণালিজম—এই শব্দত্রয়ের মধ্যে প্রাচীন ও মূল শব্দ জার্ণাল-এর আবির্ভাব ঘটে এখন থেকে ৪১৯ বছর আগে। তাহলে এর থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, ঐ সময় থেকেই মানুষ 'জার্ণাল' লেখা ও রাখা শুরু করেছিল? তার আগে মানুষ উক্ত কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল না?—এমন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সঙ্গত নয়, বিশ্বাস্যও নয়। মানুষ ও সমাজের কতকগুলি

মৌলিক লক্ষণ—যা আজ আছে, তা আদিতেও ছিল। জানা ও জানানোর কৌতূহল মানুষের মৌলিক ও প্রধানতম লক্ষণ। ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কৌতূহলও তাই। তাই একথা ধরে নেওয়া যায় যে, নামাকরণটি ৪১৯ বছর আগে হলেও, কাজটি আরও অনেক আগে থেকেই ছিল এবং প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। ভারতবর্ষে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে থেকেই এই কাজের অস্তিত্ব বর্তমান।

সাম্প্রতিককালে 'সাংবাদিকতা' শব্দের ব্যাপকতর অভিধায় সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে, সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রে এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যে সুস্পষ্ট সীমা-রেখা টানা সম্ভব হয় না। এটা নিঃসন্দেহে সাংবাদিকতার উন্নতি ও বিস্তৃতির ফলশ্রুতি।

এ প্রসঙ্গে লণ্ডনের 'The Sunday Times' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক জেমস গোমার বেরী কেমসলীর উক্তি উল্লেখ্য: 'Journalist cannot overstate his indebtedness to literature. He cannot deal with the problems of today and tomorrow unless he is informed about the past out of which they grow. The political writer who knows nothing of history and economics is in blinkers. Every journalist should be familiar with at any rate the greatest works in imaginative literature, and possess sound elementary knowledge.'—এর মধ্যে সাংবাদিকের গুণগত যোগ্যতার বিষয়টিও লক্ষণীয়।

সংবাদপত্র বর্তমানকালে কেবলমাত্র সংবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটায় সেখানে নানাবিধ নতুন বিষয় সংযোজিত হবার সুযোগ ঘটেছে। সেই দিক থেকে সাংবাদিকের কাজের ক্ষেত্রেও পরিধির বিস্তার লাভ করেছে। সেই সঙ্গে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের পার্থক্যও অনেক ক্ষেত্রে কমে এসেছে। সাংবাদিক রচনা অনেক সময় সাহিত্যের মর্যাদা পায়। সাংবাদিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন, আবার সাহিত্যিকও সাংবাদিকের কলম তুলে নেয়। কেম্‌স্‌লী লিখেছেন: 'There are points, indeed, at which the two worlds have seemed to merge; there has never been a complete demarcation. **Robbinson Crusoe** is literature, and Defoe was the most accomplished 'all-round' journalist of his time. Benjamin Franklin was a great figure in the early literary annals of the United States as well as a pioneer of the American newspaper press...The best of the The Times fourth leaders could take their place in any collection of essays, and there are many practising journalists who have a high reputation as men of letters.'—এই অবস্থার আর এক ফলশ্রুতি: সাংবাদিকতার মধ্যে সাহিত্য গুণের সমাবেশ। বিশেষ বিশেষ সাংবাদিক-রচনা সাহিত্য-রস সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাতে সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তা (বিশেষ করে আমাদের দেশে) ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনারও সুযোগ ঘটেছে।

আমাদের দেশে আজকের সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের জন্ম জেম্‌স্‌ অগষ্টাস্‌ হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভাইর্টাইজার' পত্রিকা দিয়ে। সময়: ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে।

তারিখ : ২৯ জানুয়ারী। অবশ্য প্রচেষ্টার সূত্রপাত এর আগেই হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রচেষ্টা চালান উইলিয়ম বোল্টস। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবার আগেই তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাকে ভারতবর্ষ থেকে বিতারিত করেন। এ-বিষয়ে প্রথম সাফল্য লাভ করেন হিকি সাহেব। তারপর থেকে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আজকের পরিণতি লাভ করেছে আধুনিক সাংবাদিকতা।

আজকের সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকের কাজের অঙ্গীভূত বিষয়গুলি এইরকম :

সংবাদ সংগ্রহ করা ও লেখা। সংবাদ সম্পাদন। সংবাদ ও ঘটনাবলীর ভিত্তিতে সম্পাদকীয় মন্তব্য রচনা এবং বিভিন্ন সম্পৃক্ত তথ্য ও ঘটনাবলীর পর্যালোচনাপূর্বক ভাষ্য-রচনা করা। বিজ্ঞাপন। জনসংযোগ। কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র আঁকা। প্রকাশিত পুস্তক ও পত্র পত্রিকার আলোচনা ও সমালোচনা। জীবনের বিভিন্ন দিক ও সমাজের বিভিন্ন অবস্থার ওপর আলোকপাত করে ও তা বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লেখা। ভ্রমণ কাহিনী, রোজনামচা, দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও জীবনযাত্রার ওপর ব্যঙ্গ রচনা। বিভিন্ন শিল্পকলা বিষয়ের আলোচনা ও সমালোচনা।—কাজগুলি ক্ষেত্রবিশেষে গবেষণা-মূলকও হতে পারে। সংবাদপত্র সহ নানাবিধ পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা। ঘটনাবলীর আলোকচিত্র ও দলিল চিত্র (documentary film) গ্রহণ। ডিসপ্লে ও লে-আউট এবং প্রচার। বিষয়গুলি প্রকাশের মাধ্যম কেবল সংবাদপত্র নয়। রেডিও, টেলিভিশন, নিউজরীল, বা ডকুমেণ্টারী ফিল্ম ; বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান, জনসংযোগ বিভাগ, পাবলিক ইন্‌ফরমেশন বুরো, গোপন সংবাদের জন্য ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ইত্যাদি।

ঘটনা, দুর্ঘটনা, সভা সমিতি অনুষ্ঠানের বিবরণ, পরিকল্পনা, সামাজিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, অবস্থা ও পরিস্থিতি, আবিষ্কার, গবেষণা, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ—ইত্যাদি নানা বিষয় ও সরকারী ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি ও বিবৃতি—প্রভৃতি নিয়ে সংবাদ তৈরী হয়। মন্তব্য লেখা হয় অতীত ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত দিয়ে। ভাষ্য রচনার সময় বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়, ঐতিহাসিক সূত্র, নেপথ্যের রহস্য উদ্ঘাটন, অতীতের নজীর ইত্যাদির সাহায্যও নেওয়া হয়। কোন একটি সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র অতীত ঘটনা ও কাহিনী নিয়েও সাংবাদিক রচনা লেখা হয়।

সাংবাদিকতার কেন্দ্র-বস্তু 'সংবাদ'। আবার যোগাযোগ-এর (communication) অন্যতম অংশ সাংবাদিকতা। দুই পক্ষের মধ্যে তৃতীয় কোন পক্ষের সংবাদের আদান-প্রদান সাংবাদিকতা। এবং ঐ তৃতীয় পক্ষ হলো সাংবাদিক। অনেকের ধারণা ও বিশ্বাস মাধ্যম (medium) না থাকলে সাংবাদিকতা হয় না। তৃতীয় পক্ষ বা সাংবাদিক তার সংবাদ যদি কোন মাধ্যমের সাহায্যে প্রকাশ না করে সরাসরি বা সামনা সামনি করেন তা হলে তা সাংবাদিকতা হয় না। অর্থাৎ মাধ্যমই হলো প্রধান। আসলে তা নয়। সংবাদের আদান-প্রদানটাই সাংবাদিকতার মূল বিষয়। কেবলমাত্র সংবাদ সংগ্রহ করা সাংবাদিকতা নয়, যতক্ষণ না তা সরবরাহ করা হচ্ছে। তা যে কোন ভাবেই সরবরাহ করা যেতে পারে। কেবল মাধ্যমকে রেখে যদি সংবাদকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে কি তা সাংবাদিকতা হবে ? তা নিশ্চয়ই নয়। সংবাদ যদি থাকে তা হলে

যেভাবেই হোক সরবরাহ করা যাবে। কিন্তু সংবাদই যদি না থাকে তা হলে মাধ্যম কি করবে। সরবরাহ করার মধ্যে দিয়েই সাংবাদিকতার প্রকাশ। মাধ্যম দিয়ে নয়। এখনকার দিনে কোন সরকারী বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্র, রেডিও, বুলেটিন, প্রেস নোট—ইত্যাদির মাধ্যমে জানান হয়। এটা সাংবাদিকতার অঙ্গ। আগেকার দিনে যখন এসব ছিল না, তখন ঘোষকরা ঢোল পিটিয়ে সেই বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করতো। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল ঐ কাজটা সহজ হয়ে গেছে। ছাপাখানার সাহায্যে তা প্রকাশ করা হচ্ছে। আবার রেডিও-র মাধ্যমে যেখানে প্রচারিত হচ্ছে, সেখানে ঘোষক বা সংবাদপাঠক মাইকের সামনে বলছে এবং যান্ত্রিক উপায়ে তা সমস্ত বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে ভাষা পাচ্ছে এবং সকল শ্রোতা তা শুনছে। এতে ঘোষক বা সংবাদ পাঠকের কাজটি সহজ হয়েছে মাত্র। এই সুবিধা না থাকলে জনস্থানসমূহে, সশরীরে উপস্থিত থেকে তা ঘোষণা করতে হতো। এখানে, উভয় ক্ষেত্রেই প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের মধ্যে সংবাদটি পৌঁছে দেওয়া। আজকে মাধ্যম রেডিও আছে, অতএব তা সাংবাদিকতা। এবং যেহেতু যখন রেডিও ছিল না তখন তা সাংবাদিকতা হবে না, তা কি করে হয়? প্রকৃতিটাই আসল, আঙ্গিক নয়। আঙ্গিক যাই হোক না কেন, প্রকৃতিতে যদি মিল থাকে তা হলে দুটি বিষয়কে একই আখ্যা দেওয়া যাবে না কেন? মানুষকে মানুষ বলে চেনা যায় তা প্রকৃতিগত মিল দিয়ে। সভ্য যুগের মানুষ পোষাক পরে। আদিম কালের মানুষের পোষাক ছিল না, কিংবা বল্কল ছিল পোষাক। আজকের যুগের মানুষ বল্কল পরে না, অন্য জিনিসের তৈরী পোষাক পরে। তা হলে কি সে যুগের মানুষ নয় আর আজকের যুগের মানুষই মানুষ। তা আমরা বলি না। মনুষ্য প্রকৃতি দিয়ে আমরা মানুষ বলি। বানরকে পোষাক পরালে সে মানুষ হবে না, আবার মানুষকে পোষাকহীন করলে সে বানর হবে না। ঠিক তেমনি, কাজের প্রকৃতিতে ও বস্তুগত মিল থেকেই সাংবাদিকতাকে চিহ্নিত করা যাবে, মাধ্যম থেকে নয়। (২)

প্রাচীন রোমে ঘটনা দুর্ঘটনা যুদ্ধ অগ্নিকাণ্ড নির্বাচন ইত্যাদি দৈনন্দিন, আনুষ্ঠানিক ও সাময়িক ঘটনাবলী সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা হতো। একে বলা হতো **Acta Diurna** বা দৈনিক ঘটনাবলী। ষোড়শ শতকে ভেনেসীয় সাধারণতন্ত্রে ঐ জাতীয় সংবাদাদি প্রচার করা হতো **Notizie Scritte** নামক হাতে লেখা 'বুলেটিনে'র মাধ্যমে। ছাপাখানা আবিষ্কারের পরেও দীর্ঘদিন এই রীতি অনুসৃত হয়েছিল। তারপর ছাপাখানার সাহায্যে গ্রহণ করা হয়। এই তিন ধাপেই উদ্দেশ্য এক ছিল, কাজও ছিল একই। এদের মধ্যে বস্তুগত কোন পার্থক্য ছিল না। সংবাদপত্র তৈরী তথা সাংবাদিকতার সর্বপ্রকার উন্নতি ঘটেছে উনিশ ও বিশ শতকে। কিন্তু এই পরিবর্তিত বিভিন্ন অবস্থায় এদের মূলগত ও বস্তুগত বিষয়ের কোন তফাৎ ঘটেনি।

আজকের সমাজে সংবাদপত্রের প্রভাব অত্যন্ত তীব্র। এর মূল কারণ সংবাদপত্র নয়, 'সংবাদ'। আজকের দিনে সংবাদ জানার প্রধানতম উপায় হলো সংবাদপত্র, সেখানে ইপ্সিত খবর থাকে। সেই খবর পড়া ও জানার জন্যেই মানুষ খবরের কাগজ পড়ে—'কাগজের' জন্য নয়।

আমেরিকার জনৈক সংবাদপত্র প্রকাশক Harry Chandler একজায়গায় বলেছেন যে,

'daily assurance of the exact fact—so far as we are able to know and publish them'-ই হলো সংবাদপত্রের ভিতরের বস্তু। আমাদের যা কিছু আকর্ষণ ও লক্ষ্য হলো ঐ ভিতরের বস্তু। উনিশ শতকের আগে ভাবপ্রকাশের বাহন ছিল কাব্য, উনিশ শতকের পর গদ্য এলো। তা বলে গদ্যটাই সাহিত্য হলো আর কাব্যটা সাহিত্য নয়, তা তো নয়। আসলে বিষয়-বস্তুই হলো প্রধান। সেদিক থেকে প্রাচীন কালেও সাংবাদিকতা ও সাংবাদিক ছিল। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ইতিহাসে ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তার প্রমাণ আছে।

হিকি-র পত্রিকা বা বোল্টস-এর প্রচেষ্টা থেকে ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার শুরু—এমন কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কেবল সমাজ জীবনের বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতা রূপ বদলিয়েছে মাত্র। এবং ভারতবর্ষে সাংবাদিকতা আজ যে পরিণতি লাভ করেছে তার জন্যে সে নিঃসন্দেহে পশ্চিমের কাছে ঋণী। কিন্তু 'সাংবাদিকতা'র জন্য বিদেশের কাছে তার কোন ঋণ নেই।

পৌরাণিক সমাজ জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র চতুর্বেদের অন্যতম ঋগ্‌বেদ-এ পাওয়া যায়। এই ঋগ্‌বেদে 'সূত' ও 'পালাগল' এই দুই শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ আছে। 'সূত' হলো—পুরাণ কথক, রাজ-সাংবাদিক (আবার সারথিও বটে)। এবং 'পালাগল' হলো সংবাদ বাহক (বা courier) আজকের সংবাদপত্র বা রেডিওর কাজ এরাই করে দিতো।

রামায়ণ মহাভারত কেবল ধর্মগ্রন্থ বা প্রাচীন মহাকাব্যই নয়—তৎকালীন সমাজের আলেখ্য বলেও পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত। সেই রামায়ণ মহাভারতের মধ্যেও আমরা বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের সন্ধান পাই (প্রবন্ধের শুরুতেই তা বলা হয়েছে)। ঐতিহাসিক যুগেও দেখা যাচ্ছে যে, সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হতো তাদেরকে কোথাও অবশ্য 'সাংবাদিক' বলে সরাসরি চিহ্নিত করা হয়নি। কিন্তু সাংবাদিকের কাজের সঙ্গে এদের কাজের কোন পার্থক্য ছিল না।

'A History of the Press in India' গ্রন্থে এম নটরাজন লিখেছেন: 'The international character of the modern newspaper begins in Europe in middle of the 16th century. We first see the handwritten 'newsletters' of trading houses appearing as 'news-books'. This carried political and economic intelligence and were published by enterprising printers as of general interest....Considerable ingenuity has been shown in tracing similarities between the modern newspaper and older manifestation of the written word. The proclamation of governments, the reports of the spies on which rulers depended, the writers maintained by Mughal rulers, even the exchange of gossip at one market place or round the villages well—all these have been mentioned as serving the role of the Press.' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা থেকে

'ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ' (গোপন তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ) ও 'ডাক ও তার' বিভাগের জন্ম।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, 'সাংবাদিকতা' শব্দের আমদানী ও অভিধা যোড়শ শতকের হলেও এর অস্তিত্ব প্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও যন্ত্রযুগের অনুবর্তী হয়ে সাংবাদিকতার উন্নতি ও সম্যক বিকাশ ঘটেছে। ভারতবর্ষে সেই ঢেউ এসেছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কিংবা অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে। কিন্তু সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত মূল কাজ পৌরাণিক যুগ থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। আজকের মতো সেদিন এর কোন নাম ছিল না। তাই নাম দিয়ে কাজকে খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় কাজের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে।

১। 'সূত'-এর উল্লেখ ঋগ্‌বেদে আছে। এদের পেশা পুরাণ কথন, রাজ-সংবাদ আদান-প্রদান ও সারথ্য। ইংরাজীতে এর প্রতিশব্দ royal herald.

২। আজকের দিনে কোন দেশে বহির্শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে বা আক্রমণ ঘটলে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। এটি সাংবাদিকতার দৌলতে হয়। যখন সংবাদপত্রাদি ছিল না, তখনও এরকম অবস্থা কেবল শাসক বা শাসনযন্ত্রই নয়, দেশের জনগণও সে খবর পেতো। সাংবাদিকতা ছাড়া তা সম্ভব হতো কি ভাবে? সংবাদপত্র, বেতার বা দূরেক্ষণই—কেবল মাত্র সাংবাদিকতা নয়।

বাংলা কবিতার প্রাচীন অলঙ্কার

নবেন্দু সেন

মতবাদের বাইরে কাব্যে তথা সাহিত্যে অলঙ্কার প্রথম কবে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্পষ্ট কোন আলোচনা এ পর্যন্ত হয়নি। চর্যাপদকে যদি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যায় তাহলে সেদিক থেকে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে' ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলিই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম অলঙ্কার ব্যবহারের নিদর্শন। ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য বিচারে এগুলির রচনাকাল আনুমানিক দশম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে। বাংলা অলঙ্কার ব্যবহারের ইতিহাসও এদিক থেকে বেশ প্রাচীনই। ধর্ম, দর্শন ও তত্ত্ব নির্ভর সাহিত্য-রস-বিশুষ্ক কঠিন, দুরূচ্চার্য চর্য্যার পদগুলির কিন্তু অন্যতর একটি সহজ দিকও এই অলঙ্করণের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কঠিন, বৌদ্ধ ধর্মের দর্শনাদিপূর্ণ বাংলা সাহিত্যের এই প্রাচীন নিদর্শনগুলির রূপরাগ চর্যাপদগুলিকে সাধারণের কাছে নিয়ে আসতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে; তার বহিরঙ্গের সমাজ জীবনের চলচ্চিত্র এবং প্রাকৃতিক বর্ণনা'র আভরণ তার ধর্মের আবরণগত দুরগম্যতাকে সাহিত্যরসের প্রবল বাধা হতে দেয়নি; ধর্মের বাইরে, তত্ত্বচিন্তার উর্দ্ধে কবিতার রূপ ও অঙ্গরাগের যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে তার আবেদনই অধার্মিক, তত্ত্বজ্ঞানহীন কাব্যরূপ-পিপাসু সাধারণের নিকট বড় হয়ে উঠেছে। লাভের সর্বজনীনতায় এই প্রাপ্তি কম কোথায়?—কাজেই চর্যাপদের সেই অঙ্গরাগের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম অলঙ্কার ব্যবহারের একটি সাধারণ পরিচয় নেওয়ার আবশ্যকতা অবশ্যই আছে।

চর্য্যার অলঙ্কারগুলির আলোচনায় প্রাচ্য রীতির প্রভাব স্পষ্ট; পদকারগণ মূলতঃ সংস্কৃত রীতিতেই অভ্যস্ত ছিলেন বলে মনে হয়। সেই প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য "Rhetoric' ও 'Figure of speech'র সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়াদের তথা ধর্মপ্রাণ সাধকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল। কাজেই বক্ষ্যমান আলোচনারও আমাদের দেশীয় অলঙ্কার রীতির পরিপ্রেক্ষিতেই চর্যাপদের অলঙ্কারগুলির পরিচয় নেওয়া হবে। বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণে' অলঙ্কারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

'শোভাবর্ধক, রসভাবাদির উপকারক ও যাহা শব্দ ও অর্থের অস্থায়ী ধর্ম এইরূপ অঙ্গদাদি ভূষণস্বরূপ পদার্থই হইল অলঙ্কার।' (১)

এই অলঙ্কারের স্বভাব এবং রচনায় এদের কোন কর্ম করণীয় সে সম্পর্কেও স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে—

'স্বর্ণাদি অলঙ্কারগুলি যেমন মানুষের শোভা বর্ধন করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে, সেইরূপ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি অলংকারগুলি কাব্যদেহ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থে বর্তমান থাকিয়া শব্দার্থের অত্যন্ত শোভা সম্পাদন করিয়া কাব্যের আত্মাস্বরূপ রস বা ভাবাদির উপকার করিয়া থাকে।' (২)

অলঙ্কার ব্যবহারের উদ্দেশ্য তাহলে দুটি;—'শব্দার্থের শোভা সম্পাদন' এবং 'কাব্যের

আত্মা স্বরূপ রস বা ভাবাদির উপকার' করা। 'শব্দার্থ' অর্থে 'word meaning' নয় কিন্তু; বাক্যের বা উচ্চারণাংশের যে দুটি দিক থাকে, 'শব্দ' এবং 'অর্থ' সেই দুটি দিকের কথা বোঝাচ্ছে। অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে কাব্যের রূপগত সৌন্দর্যও ('শোভা') যেমন সৃষ্টি করবে তেমনি কাব্যের ভাবগত ঐশ্বর্যও ('আত্মা স্বরূপ রস বা ভাবাদি) সৃষ্টি করবে।

'রূপ ফোটানো এবং রস গছানো এই দুই কাজ হল শিল্পীর। এর মধ্যে রূপ ফোটানোর ক্রিয়াটি নানা প্রথা—প্রকরণে শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারায় সুনিষ্পন্ন করেন শিল্পী।…রসোদ্রেকের ব্যাপার দরদের সঙ্গে জড়ানো। দরদ দিয়ে যে বাজালে নাচালে বা গাইলে, সেই দেখা যায় অনেক সময়ে রসও জাগালে।' (৹)

এই রূপ ও রসের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কবিতার প্রাচীন অলঙ্কারগুলির মূল্য বিচার করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য চর্যার যে আলঙ্কারিক রসের উল্লেখ এখানে করা হবে বা হচ্ছে তা চর্যাপদের অধ্যাত্মচিন্তাশ্রিত ধর্মীয় রসের প্রসঙ্গ নয়। নিছক কাব্য সৌন্দর্য বিচারের প্রসঙ্গে আলোচ্য রূপ ও রসের বিচার, বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাচ্য অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী শব্দ এবং অর্থ অলঙ্কার, উভয়ই এখানে ব্যবহৃত। চর্য্যার ৪৬½টি পদের প্রতিটিতেই শব্দালঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে। এবং শব্দালঙ্কারের মধ্যে আবার অনুপ্রাসের ব্যবহারই বহুল। এর মধ্যে যে যে সংখ্যক পদগুলি অনুপ্রাসের ব্যবহারে উজ্জ্বল বেশি সেগুলি হল: ১, ৪, ৫, ৭, ৮, ১১, ১২ ১৫, ১৬, ১৯, ২৩, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৮, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৯ এবং ৫০ ॥

একটি মাত্র পদের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করলেই এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। যথা:

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসব সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীছে পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমতো সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহারা তোহেরি।
নিঅ ধরিণী নামে সহজ সুন্দরী ॥

স্পষ্টতই এই পদাংশের ধ্বনি সৌন্দর্য অনুপ্রাসের সঙ্গতিতে অনেকখানি রস সঞ্চারী হয়ে হয়ে উঠেছে। এবং অন্তত তিন প্রকারে এই অনুপ্রাসের ব্যবহার হয়েছে। যথা:

(১) স্বরের অনুপ্রাসে (vowel alliteration) = স্বঃ অ/
(২) ব্যঞ্জনের অনুপ্রাসে (consonant alliteration) এবং = ব্যঃ অ/
(৩) যুক্ত ব্যঞ্জনের অনুপ্রাসে (double consonant alliteration) = যুঃ অ/

উদ্ধৃত চারটি পংক্তির অনুপ্রাস ব্যবহারের হিসাব নিয়মত;

অনুপ্রাস	১নং চরণ	২নং চরণ	৩নং চরণ	৪নং চরণ
স্বঃ | অনুঃ	৮	৮	১৩	৮
ব্যঃ | অনুঃ	১৪	১০	১৫	৬
যুঃ | অনুঃ		৩		১

(যে সকল আলঙ্কারিক স্বরবর্ণের অনুপ্রাস হয় না বলে মনে করেন তাঁদের যুক্তি কখনো স্পষ্ট হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অনুপ্রাসের সংজ্ঞাও খুব স্পষ্ট নয় তাঁদের কাছে)। বর্ণের পশ্চাৎ সেই

সেই বর্ণের প্রয়োগকে তাঁরা অনুপ্রাস বলে অভিহিত করে এসেছেন; কিন্তু একই বর্ণের প্রয়োগ অনুপ্রাসের সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে না; পারে একই স্থানচ্যুত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। উচ্চারণের সময় আমাদের জিহ্বা যে সকল স্থান স্পর্শ করে আসে এবং ঐ স্পর্শজনিত যে যে ধ্বনি শ্রুত হয় সেই সেই স্থান ও ধ্বনি নিয়ে অনুপ্রাসের ব্যাখ্যা দরকার। আসলে 'উঁচা উঁচা পাবত' উচ্চারণে যে দুটি 'উ', 'ঁ ঁ', 'চা'র (চ+আ) ব্যবহারেই অনুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে তা নয়; ঐ বর্ণগুলির উচ্চারণ একস্থানগত বলে ধ্বনিগত ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে; শ্রুতিতে সুর সঙ্গতি এনে একপ্রকার Hermony'র সৃষ্টি করেছে। উ, চ, আ, ঁ, এরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক উচ্চারণ স্থান স্পর্শ করেছে কিন্তু প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট discipline মেনে দুবার করে উচ্চারিত হয়েছে। উ উ—ঁ ঁ | চ+আ চ+আ | প+আ | চ—ত এই ক্রমে ধ্বনি সৃষ্টি করেছে। ফলে ধ্বনির একটা নির্দিষ্ট ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে। ধরা যাক, 'উ=১, ঁ=২, চ+আ=৩/৪, প+আ=৪/৩, ব—৩=•—•। তাহলে ঐ অংশটির ধ্বনিগত সঙ্গতিচিত্র=১, ১ | ২, ২ | ৩/৪, ৩/৪ | ৪/৩, ৪/৩ | •—• ॥ কারণ ১, ২, ৩/৪ এবং ৪/৩ যথাক্রমে উ, ঁ, চ+আ এবং প+আ ও ৩—ব'র উচ্চারণ স্থান। দেখা যাচ্ছে এখানে স্বরবর্ণের ধ্বনিও সুর সঙ্গতি সৃষ্টিতে সমান কার্যকারী তাছাড়া চর্যার অনুপ্রাস রচনায় স্বরের অবদান আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ পদগুলি বিভিন্ন রাগে গীত হত। গানে, বিশেষত ধর্ম সঙ্গীতে হলন্ত উচ্চারণ খুবই কম হয়; রাগের বিস্তারে স্বরান্ত উচ্চারণ বোধ হয় বেশি অভিপ্রেত। অবশ্য এ কেবল অনুমান; সিদ্ধান্ত নয়।

শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস ছাড়া দুটি মাত্র কাকু বক্রোক্তি অলঙ্কার পাওয়া যায়। Intonation'র কলাকর্মের উপর এই অলঙ্কার নির্ধারিত হয়; অর্থাৎ প্রশ্নের ভঙ্গীতে নিশ্চয়াত্মক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। আপাতভাবে যেটি প্রশ্ন, আসলে সেটির অস্বীকারে বা নিষেধে ঠিক তার বিপরীত নিশ্চয়াত্মক বিষয়কে ইঙ্গিত করে। যেমন চর্যায় ব্যবহৃত অলঙ্কার দুটি :

১) রাজ সাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে
কিতা বোড়ো খাই ?—(পদ সংখ্যা ৪১)।

২) ভাগ তরঙ্গ **কি মোষই সাঅর ?**—(পদসংখ্যা ৪২)।

রজ্জু সর্প দেখে বোড়ো সর্প ভ্রম করে চমকে উঠলেও রজ্জু কখনো কামড়ায় ? আসল বক্তব্য না কামড়ায় না। ঠিক তেমনি ভঙ্গ তরঙ্গ সাগর শুষে নেয় না। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চারণ ভঙ্গী জনিত এই অলঙ্করণ সৃষ্ট। (সেদিক থেকে 'কাকু বক্রোক্তি'কে শব্দালঙ্কার বলার যাথার্থ্য নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়ে যায়। একে ধ্বনিগত অলঙ্কার বলার যুক্তিই বেশি। অবশ্য সব অলঙ্কারই ধ্বনিময়। সেদিক থেকে অর্থ এবং শব্দগত দুটি পৃথক বিভাগের প্রয়োজনীয়তাও আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার)।

তুলনামূলকভাবে চর্যাপদের আলঙ্কারিক বৈচিত্র্য অর্থালঙ্কারে অনেক বেশি। প্রচলিত অর্থালঙ্কারের যে সকল বিভাগ করা হয় তারি পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ৪৩টি অর্থালঙ্কার পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৩৯টি সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারের, ৪টি মাত্র বিরোধমূল। সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারের মধ্যে আবার ২১টিই রূপক অলঙ্কার।

অবশ্য চর্যাপদই নিজে একটি রূপক অলঙ্কার। কারণ কবিতা বা চর্যাগানের রূপকে বৌদ্ধধর্মের অধ্যাত্মচিন্তা ও আচারানুষ্ঠানের কথাই 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়'-এ প্রকাশিত। সেখানে মনকে তরুর সঙ্গে, জীবনকে নদীর সঙ্গে, চিত্তকে চাঁদের সঙ্গে, প্রায়ই তুলনা করা হয়েছে। চর্যার মূল বক্তব্য বস্তুই রূপকে ব্যক্ত। সেদিক থেকে একে রূপক কাব্য বলায় অত্যুক্তি হয় না। হতে পারে এই রূপকের রহস্য সহজে উদ্‌ঘাটিত নয়। কিন্তু সেদিক থেকেও চর্যার বিরুদ্ধে যে অস্পষ্টতার অভিযোগ চলে আসছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে,—'...সবচেয়ে আগে কবির নিজেরই কাছে তা ধরা পড়বে। শিল্পী মানসের এই কঠিন আত্মোপকার প্রতিষ্ঠা রয়েছে; তিনি অতীত বা আধুনিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা নৈর্ব্যক্তিক যাই হোন না কেন।' (৩)

তাই চর্যার রূপক অলঙ্কারও মূল্যবান। একটি রূপক অলঙ্কার সমৃদ্ধ পদ এখানে তোলা হল।

মণ তরু পঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আসা-বহুল পাত ফল বাহা।
বর গুরুবমণ—কুঠারেঁ ছিজঅ
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ॥
বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী॥
জো তরু ছেব ভেবই ন জানই।
সারি আড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মানই॥
সুন তরুবর গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল॥—(৪৫ সংখ্যক পদ)।

এখানে মূল উপমেয় 'মণ' এবং মূল উপমান তরু। অন্যান্য রূপক কল্পনাগুলি এই মূলের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে মালারূপক সৃষ্টি হয়েছে। 'পঞ্চ ইন্দ্রিয়' = শাখা, 'আশা = ফল-পাতা, বজ্রগুরুর বচন = কুঠার কল্পিত হয়েছে।

বাকী আঠারোটি সাদৃশ্যমূল অলঙ্কার সহ এই রূপক অলঙ্কার ব্যবহারের বিস্তৃত বিশ্লেষণ চিত্রটি এবার দেখা যেতে পারে।

অলঙ্কার	সংখ্যা	পদসংখ্যা
রূপক	২১	১, ৪, ৫, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৯, ২৩, ২৮, ৩১, ৩৮, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫০।
উপমা	১১	৪, ৯, ২৩, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৬।
দৃষ্টান্ত	৩	৪১, ৪২।
অতিশয়োক্তি	১	৩৯।
বাচ্যোৎপ্রেক্ষা	১	৩০।
ব্যতিরেক	১	৩৭।
সমাসোক্তি	১	২৭।

চর্যার সাদৃশ্য মূল অলঙ্কার ব্যবহারের এই হিসাবচিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রূপকের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বেশি হয়েছে এবং তারপরই হয়েছে উপমা অলঙ্কারের ব্যবহার। অন্যান্য অর্থালঙ্কারের ব্যবহার খুবই কম। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই সংখ্যাগত পার্থক্যের একটি বড় কারণ চর্যাপদের মূল ধর্ম স্বভাব। সেদিক থেকে সুপ্রাচীনকালের এই চর্যাগীতগুলিতেই অর্থালঙ্কারের ব্যবহার বৈচিত্র্য, সংখ্যায় যতই স্বল্প হোক না কেন, এক ঐতিহাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত; তার মূল্য বিচারে সাহিত্যের ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যের কারণই সৃষ্টি করে। বিরল ব্যবহৃত দু' একটি মূল্যবান অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করলেই এ বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঙ্কর।
ভাগ তরঙ্গ কি মোষই সাঅর ॥—(পদ সংখ্যা ৪২)

দৃষ্ট বস্তু, নষ্ট রূপের সঙ্গে ভঙ্গ তরঙ্গের তুলনা। দৃষ্ট বস্তু, নষ্টরূপ ('দিঠ নাঠ') = উপমেয়
ভঙ্গ তরঙ্গ = উপমান
কার্যক্ষমতা = সাধারণ ধর্ম

এবং সাধারণ ধর্ম পৃথক বাক্যে। তাছাড়া প্রকৃতকে অপ্রকৃত থেকে (উপমেয়কে উপমান থেকে) সরিয়ে নিলেও মূল বক্তব্য ঠিক থাকে। সুতরাং দৃষ্টান্ত অলঙ্কার এটি। এই ভাবে উপমান = 'দুষ্ট বলদ', 'শূন্য গোহাল', উপমেয় = বিষয়াসক্তি এবং বিষয়াসক্তিশূন্য চিত্তকে গ্রাস করে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সৃষ্টি করেছে ৩৯ সংখ্যক পদে। যথা :

সহর ভণন্তি বর সুর্ণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্দেঁ।
একেলে জগ নাশিআ রে বিহরহু মুচ্ছন্দে ॥

আবার উপমেয় = বিষয় বিশুদ্ধির আনন্দ; গগনের চাঁদ = উপমান। কিন্তু চাঁদের কিরণ, বোঝার আনন্দ ঢেকে ত্রিলোকের অন্ধকার পর্যন্ত দূর করেছে; অর্থাৎ উপমান পক্ষ প্রবল হয়েছে কোথাও। ফলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার রচিত হয়েছে। ৩০ সংখ্যক পদে, 'জিম', 'জোই' (যেন) তুলনাবাচক অব্যয় যোগে এই অলঙ্কারের ব্যবহার লক্ষিত হয়।

বিসঅ বিশুদ্ধেঁ মই বুজ্ঝিঅ আনন্দে
গঅণহ জিঅ উজোনি চান্দে ॥
এ তৈলোত্র এত বিসারা।
জোই ভুসুকু ফেড়ই অন্ধকারা ॥

এই অলঙ্কারগুলি যে কেবল অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী ব্যাকরণ সম্মত তাই নয়, এগুলির ব্যবহারে কাব্য সৌন্দর্যও সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও সমাজ জীবনের পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে সেই চিত্রের মাধ্যমে।

ভবণই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী ॥

পদটিতে যে জীবন ও জগৎকে নদী ও নৌকার সরসুতামের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাতে বাংলা কবিতার চিত্রকল্পের ইতিহাসই আভাসিত। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু কবির কবিতাতেই এই

Image কল্পনার পরিচয় পাওয়া গেছে পরে। 'কায়া তরুবর' (পদ নং ১), বা 'মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি'র (পদ ৪৫) Image পরিকল্পনায় বৈষ্ণব সাহিত্যেও ('নীরজ নয়নে') উর্বর হয়েছে। তেমনি 'মাআজাল পসারি রে বধেলি মাআহরিণি' (২৩ সংখ্যক পদ) রূপক অলঙ্কার 'আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি'র কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অলঙ্করণ ভঙ্গিকে স্মরণ করায়। চর্যার এই অলঙ্কার বৈচিত্র্য তার বিরোধমুখ অলঙ্কার ব্যবহারের মধ্যেও লক্ষিত হয়। কার্য ও কারণের বিরোধে রচিত অসঙ্গতি অলঙ্কারের উদাহরণ হিসাবে ৩৩ সংখ্যক পদের নিম্নলিখিত চরণ দুটিই এই মন্তব্যের সমর্থন করতে পারে। যথা :

দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে॥

তেমনি অমৃত থাকতে বিষ ভক্ষণের বিরোধাভাসে রচিত একটি অলঙ্কার পাওয়া যাচ্ছে ৩৯ সংখ্যক পদে। যেমন :

'অমিআ অচ্ছন্তে বিষ গিলসি রে চিঅ পরবস অপা।'

কয়েকটি উপমায় ও রূপকে এই সৌন্দর্য যে কত নিবিড় হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় ৩১, ২৯ বা ২৭ প্রভৃতি পদে। কামোদ রাগে রচিত ২৭ সংখ্যক পদটিতে যে রতিচিত্রের রূপকে বোধিচিত্তের জাগরণ সম্পর্কে চিত্রকল্প রচিত হয়েছে তার সর্বজনীন রসাবেদনটি কত গভীর একবার দেখা যেতে পারে।

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইনী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ॥
... ...
চালিঅ ষষহর গউ নিবাণে।
কমলিনি কমল বহই পাণালে॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ॥

পূর্ণ অর্ধরাতে কমল বিকশিত হল। বত্রিশ যোগিনী আনন্দে, উষ্ণ উত্তাপে, তাদের অঙ্গ থেকে আনন্দস্রাব করতে লাগল। শশধর বজ্রশিখরে তখন, সহজ আনন্দের কথায় মগ্ন। কমলিনী কমল প্রবাহে নিমগ্ন হল। এ আনন্দ নিঃসন্দেহে পবিত্র। যে এই সত্য বোঝে সেই বুদ্ধিমান।—এ বিষয়ে ভাষ্য বা টীকা নিষ্প্রয়োজন।—২৯ সংখ্যক পদে বর্ণ, গন্ধ ও স্পর্শাতীত বোধির অস্তিত্ব ব্যাখ্যায় তাঁর অসীমতা জ্ঞাপক একটি উপমায় কবিতার সৌন্দর্য লক্ষ্য করার।

কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদকচান্দ জিম সাবল মিছা॥—

বোধি কেমন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর মিলবে, 'জলের চাঁদ যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়।' এই জলচন্দ্রছবির উপমায় চোখের উপর যেন জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের চেহারার রূপ গোচরীভূত হয়ে ওঠে, তৎক্ষণাৎ। জলের মধ্যে তো সত্যি চাঁদেরই প্রতিবিম্ব পড়েছে, কিন্তু সে তো সত্যি

চাঁদ নয় তা প্রতিবিম্বন। জল-চল-নৃত্যে তা অস্থির, চঞ্চল হয়েও পড়তে পারে। এই আভাসিত সৌন্দর্যই পদটির শিল্পশ্রীর সহায়ক।

অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ।
আজ দেব নিরাসে রাজই॥
চান্দরে চান্দকান্তি জিস পতিভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তাহঁ উনি পইসই॥—(পদসংখ্যা ৩১)।

রাগ পটমঞ্জরীতে গীত এই পদটিতে 'করুণারূপ ডমরু বাজার চিত্রটি তাৎপর্যময়; এবং 'চান্দরে চান্দকান্তি জিস পতি ভাসঅ' চিত্রকল্পটি কবিকল্পনার সৌন্দর্য প্রীতির লক্ষণ। ডমরুধ্বনি সাধারণত বীরত্ব ব্যঞ্জক। কিন্তু যে কারুণ্য অসীম, পরিব্যপ্ত তার প্রকাশ রূপও বহু বিস্তৃত, বৃহৎ হবে। আর্যদেব আসঙ্গ-রহিত যে কারণে সে কারণের গুরুত্ব করুণায়, কারুণ্যে প্রকাশিত; অপরিহার্যভাবে তাই New Collocation সৃষ্টি হয়েছে 'করুণাডমরুলি'তে। তেমনি সুন্দর চাঁদের আলো। চাঁদ চলে গেলে পূর্ণিমার লাবণ্যবিলাসও লক্ষিত হয় না। চিত্তের স্থিতি এলে (বিকরণত্ব এলে) তার বিকল্পজালও তখন লক্ষিত হয় না; এই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে চাঁদ ও চাঁদের আলোর উপমায় ব্যক্ত করা হয়েছে। সামান্য এই চাঁদ ও চাঁদের আলোর ছোট্ট উপমাটি সমস্ত পদটির কাব্যশ্রীই যেন বদলে দিয়েছে; এক অসামান্য মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে; শতবার চন্দ্রমুখী বা মুখচন্দ্র উচ্চারণেও এই পূর্ণচাঁদের মায়ায় মুগ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু চর্যার সর্বত্রই এই অলঙ্করণ স্পষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বিবৃতির রূপে প্রকাশিত মাত্র। কিন্তু মনে রাখা দরকার চর্যাপদগুলি বস্তুত বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক আচার, আচরণের কথায় পূর্ণ; এবং সেই সমস্ত কথাবার্তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি; রূপকে বলা হয়েছে। যাঁরা এই প্রাথমিক সত্যটি না জানেন বা মানতে রাজী নন, তাঁরা চর্যার সমস্ত অলঙ্করণ-পরিচিতি লাভে বঞ্চিত হতে বাধ্য। যার জন্য সমগ্র চর্যাপদগুচ্ছই রূপক অলঙ্কারে রচিত বলা হয়েছে তা বুঝতে তাঁরা অক্ষম হবেন। কিন্তু তবু এ কথাও স্বীকার্য চর্যার ধর্মীয় তত্ত্ব, দর্শন এবং সেই কঠিন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক অর্থের প্রকাশ-মাধ্যমে 'সান্ধ্য ভাষা'র আলো ছায়াময় অস্পষ্টতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের নিকট চর্যার যে আবেদন তা তার এই অঙ্গরাগ জনিত অলঙ্করণের মাধ্যমে তা তার ছন্দ-বিন্যাসে, এবং সঙ্গীত সঙ্গতির মধ্যে। অলঙ্কারের সৌন্দর্য ব্যবহারের রীতির উপরও অনেক নির্ভর করে। অলঙ্কারে নির্মিত চিত্রগুলি বা উপমাগুলি মূল বক্তব্য প্রকাশের সহায়ক হলেই এই সৌন্দর্য আসে; নতুবা নয়। চর্যার অলঙ্কারগুলি সেদিক থেকে ভাবানুসারী, স্বাভাবিক। 'শব্দার্থের শোভা' এবং আত্মার রস সৌন্দর্য্য দুই-ই সৃষ্টি করেছে।

১। 'সাহিত্য দর্পণ' (অনুদিত, বিদ্যানিধি ও ভট্টাচার্য) ১৯৬৪, (৪ সংস্করণ), ২৬৯।
২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিল্পায়ণ', ১৯৫৯ (২য় সংস্করণ), ৬৪-৬৫।
৩। জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা', ১৯৬৩ (সিগনেট সংস্করণ), ২৭।

চারুশিল্প ও যন্ত্রযুগশিল্প

ইন্দ্রজিত রায়

আজকের যন্ত্রযুগের ভেতরে চারুশিল্পের দাম কতটা সে বিষয় নিয়েই এ প্রবন্ধের সূত্রপাত।

পৃথিবীর ইতিহাসে চারুশিল্প একটা বিরাট উজ্জ্বল অধ্যায়, কারণ দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ইতিহাস তার অনেকখানি সম্পদ পেয়েছে শিল্পকলার ভেতরে। স্থাপত্য এবং অঙ্কনশিল্প অনেক জায়গাতে ধরে দিয়েছে ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারাকে।

এখন মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা যাক চারুশিল্পের সংজ্ঞার বিষয় তারপর যন্ত্রযুগের সঙ্গে তার আঙ্গিক পার্থক্যকে আলোচনা করা যাবে।

চারুশিল্পের প্রধানত দুটো দিক একটি স্থাপত্য, অপরটি চিত্রাঙ্কন।

স্থাপত্য শিল্প চিত্রাঙ্কনের আগে বোলে অনেক পণ্ডিত মত প্রকাশ কোরেছেন। তাঁদের মতামতের মৌলিকতার উদ্দেশ্য বিষয় আলোচনা কোরতে গেলে এক্ষেত্রে মূল বক্তব্য তার উদ্দেশ্য হারাবে সুতরাং সে মতটাকেই স্বীকার কোরে পথ চলা সুরু করা ভালো।

পৃথিবীর বুকে বিরাট বিরাট প্রাচীন প্রাসাদ অতীতের জীবন্ত প্রমাণ বোলে আজও সাক্ষী দেয়, সেই সঙ্গে আমরা পাই পাথরের মূর্তিগুলো। অতীত পৃথিবীর বিরাট শিল্প সম্ভার হিসেবে পৃথিবীর বুকে আজও সেগুলোর অনেক কয়টি পাওয়া যায়।

এই শিল্পকলার ক্রমবিকাশের ধারা মূলত দুটো প্রাণধর্মকে বহন কোরেছে একটি ধর্মতান্ত্রিক সমাজ, দ্বিতীয়টি রাজতান্ত্রিক।

ধর্মতান্ত্রিকের সমাজের যে সমস্ত মঠ মন্দির চৈত্য গির্জা প্রভৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়, সেগুলোর প্রায় সবগুলোই রাজতান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী, কারণ গঠনশিল্পের জন্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হতো ততো অর্থ ব্যয় করা ধর্মযাজকদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না আর বহু দেশেই ধর্মের কায়েমী আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো রাজতন্ত্রের আনুকুল্যে।

ধর্মস্থানীয় শিল্পের সঙ্গে রাজতন্ত্র শিল্পের যে আঙ্গিক তফাৎটা চোখে পড়ে, সেটা হলো দেবস্থানের শিল্পকলাগুলো। প্রধানত দেবতার জন্যে গঠিত বলে, দেবমাহাত্ম্যই শিল্পকে প্রকাশ করেছে, সেখানে বিরাট মন্দির ও গির্জার গায়ে ও ভেতরে তাই স্বর্গীয় মাহাত্ম্যের প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে।

রাজকেন্দ্রিক সমাজে রাজপ্রাসাদের শোভা বর্ধন করেছে যে শিল্প সেখানে শিল্প সম্ভার তার আত্মবিকাশের ভেতরে প্রধানত বিরাটত্বের প্রমাণই দিয়েছে। আবার ধর্মজীবনের প্রতিচ্ছবির প্রমাণও সেখানে অপ্রচুর নয়।

সব দেশেরই স্থাপত্য শিল্পের এই দুটো দিক গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে।

স্থাপত্য শিল্পের পথ চলা আরম্ভ হয়েছে বেশ কয় হাজার বছর আগে থেকে। এই পথ চলার ছন্দে সে যুগে যুগে নতুন রূপ নিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ রাজতন্ত্রের সমাজে রাজার পতন

ও অভ্যুদয়ের ওপর নির্ভর করেই স্থাপত্য শিল্প তার রূপ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে।

আজও স্থাপত্য শিল্পের প্রচলন মুছে যায় নি, কারণ আজকের যুগের বিরাট বিরাট বাড়িগুলোর গঠন পদ্ধতি প্রমাণ করে স্থাপত্য শিল্পের প্রয়োজনীয়তা।

তবে আগের যুগের স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে আজকের যুগের স্থাপত্য শিল্পের প্রভেদ এইটুকু যে আগের যুগে শিল্পকে প্রকাশ করার জন্যে স্থাপত্যের একটা বিশেষ চাহিদা ছিলো, সেখানে শিল্প করতো ব্যবহারিক জীবনকে প্রভাবিত। কিন্তু আজ, ব্যবহারিক জীবনই শিল্পকে প্রভাবিত করছে। আজকে তাই শিল্পের চাহিদা নির্ভর করেছে ব্যবহারিক বস্তুর ওপরে।

এবার চারুশিল্পের বিষয় আলোচনা করা যাক।

কৃষিকেন্দ্রীক সমাজে এককালে বিজ্ঞান ছিলো স্বপ্নেরও বাইরে তাই জীবন ও তার পারিপার্শ্বিক আবাহাওয়া চলতো একটা বিশেষ ছন্দে। সেদিন তাই যে চিত্রাঙ্কনের ভেতরে চারুকলার বৈশিষ্ট প্রকাশ পায় তার আঙ্গিক রূপের পেছনে যে আদর্শটি সেদিন জীবন্ত ছিলো, আজকের দুনিয়ার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির আদর্শের সঙ্গে তার মিল নেই। আজ তাই গত যুগের চারুকলার দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা গিয়েছে বদলে।

দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার পেছনে যে সমাজ ব্যবস্থা থাকে সেটার গঠনের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক পরিবর্তন। তাই সেই মূল পরিবর্তনেই দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

সেকালের চারুকলার পেছনে ছিলো কৃষি কেন্দ্রীক জীবনের প্রভাব, তাই সেখানে ভাব প্রকাশ ক্ষেত্রও ছিলো বেশি। এবং ভাবের গভীরতার যেখানে অভাব ছিলো সেখানে অঙ্কিত চিত্রের দীর্ঘতায় আর রং এর উজ্জ্বলতায় সে অভাব দূর করার চেষ্টা হতো।

এই সঙ্গে বলে রাখি যে, ভাবের গভীরতার অভাবটি সেদিনকার অনেক শিল্পী বুঝতে পেরেই যে চিত্রের দীর্ঘতায় ও বর্ণবাহুল্যে সে ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা করতেন। সেখানে কোনও ক্রমবিকাশকে সমষ্টি করে চিন্তাধারাও দেখা যেতো না আর দৃষ্টিভঙ্গীও অনেক জায়গাতে নেহাত চিরাচরিত পথে চলে আসতো। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের গতিও ছিলো মন্থর, কারণ সেদিনকার সামাজিক গতিই চলতো ধীরে।

সে যুগের চিত্রাঙ্কনে তাই সমাজের প্রতিচ্ছবি তেমন পাই না, সেখানকার চিত্রাবলী অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে তার পূর্বসূরীদের। যেখানে যেখানে পূর্বসূরীদের আদর্শকে ঠিক যথাযথ অনুসরণ না করে শিল্পীদের সক্রিয় মন বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ দিয়েছেন, সে বৈশিষ্ট্য, তার দাম পেয়েছে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু যুগ প্রভাবকে অতিক্রম করে উঠতে পারেনি।

সেযুগের চিত্রাঙ্কনে আমরা পেয়েছি ব্যক্তিত্বের রঙিন চিত্র এবং সে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার জন্যে চারপাশের অনেক উপচার দিয়ে তাকে রেখান্বিত করতে হয়েছে। সমষ্টিকতার মূল্যবোধ সেযুগের চিত্রাঙ্কনের ব্যাকরণ জানতো না।

অবশ্য সমষ্টির মূল্য দিলেই সার্থক চিত্রাঙ্কন হবে আর ব্যক্তিত্বকে বড় করে দেখলে তা অসার্থক হবে এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু ব্যক্তিত্বকে ফোটাতে গিয়ে তার চারপাশের বস্তুগুলোকে

ছোট করেই দেখাতে হবে, অথবা সেই ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় অন্য সব বস্তুগুলোকে তার উপচার হিসাবে কাজে লাগাতে হবে, এইটেই ছিলো সেদিনকার চিত্রাঙ্কনের দৃষ্টিভঙ্গী। ফুলের সার্থকতা দেখাতে গিয়ে শিল্পী ফুলদানীর সৌন্দর্যকে স্বীকার করেন নি ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তার পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলোর বৈশিষ্ট্যের মূল্য দেওয়া হয় নি, বরং সেই সব বস্তুগুলোকে কাজে লাগানো হয়েছে সেই ব্যক্তিত্বকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে।

সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সেটা দোষের নয় কারণ সেদিন দশের চেয়ে একের দাম ছিলো বেশি। আজকের নতুন যুগে সেসব চিত্রাঙ্কন দেখতে পাওয়া যায় অনেক জায়গায় আর শিল্পের ইতিহাসে সেগুলোকে নতুন নতুন সমালোচনায় সাজতে হয়।

একথাও স্বীকার্য যে চিত্রাঙ্কনের ভেতর সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করতে গেলে চিত্রাঙ্কনের মূল বক্তব্যটি অস্পষ্টই থেকে যাবে, কারণ দেখা যায় যে চিত্রাঙ্কনে একটি মূল ব্যক্তিকে কেন্দ্র করতে গিয়ে কতকগুলো পারিপার্শ্বিক বস্তুর সহযোগিতা না নিলে চিত্রাঙ্কন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, কাজেই এ জায়গাতে পারিপার্শ্বিক সহযোগিতার নিতান্ত দরকার। এবং সেই অনুসারে যে অঙ্কিত চিত্রকে আমরা পাই সেগুলোর ভেতরেই শিল্পীর বক্তব্যকে পেতে কষ্ট হয় না।

উপমা দেওয়া যেতে পারে যে কোনও ব্যক্তির চেহারা আঁকবার সময় তার সাজ পোষাক ঘর আসবাব, দরকার অনুসারে আঁকা হয়ে থাকে, কিন্তু সে চিত্রে মূল ব্যক্তিটিই প্রধান, সেখানে যদি ব্যক্তির সম্বন্ধে তার আসবাব পত্রগুলোকে সমান মর্যাদায় ওই বিশেষ চিত্রে আঁকা যায় তো, তার পরিণামে ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিক কেউ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে না।

চিত্রাঙ্কনের এ আদর্শ বহুদিন থেকে চলে আসছে। এবার এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা বলে সে যুগের সঙ্গে এযুগের চিত্রাঙ্কন শিল্পের ক্রম বিকাশের ধারাটা দেখাতে চেষ্টা করব।

বহু প্রাচীন যুগে শিল্প নিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ব্যক্তিত্বের পূজো করা, এই ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে গুণ সম্পন্ন করতে গিয়ে আমরা শিল্পজগতে দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সেখানে দেবতাই শিল্পজগতের পরম পুরুষ। স্থাপত্য শিল্পে অনেক দেশেই যে সমস্ত শিল্পাবলী দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সেগুলোর ভেতরে অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়েছে দেবতার জন্ম থেকে নরজীবন লীলার ধারাবাহিকতাকে। পরবর্তী যুগে দেবলীলার ধারাবাহিকতা পাওয়া গেলো রং আর তুলির ভেতর দিয়ে। এবং তারপরে দেখা গেলো যে ঘটনার চেয়ে ব্যক্তিত্বই প্রধান হলো ঘটনা থাকলো উহ্য হয়ে, ব্যক্তিত্বস্বরূপ দেবতাকে পাওয়া গেলো স্বতন্ত্ররূপে। সেই ব্যক্তিত্বের আমলে পরবর্তী যুগে এলো মানবত্বের প্রভাব।

মানুষের ব্যক্তিত্বকে আঁকবার পেছনে এই ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাচীন ইচ্ছা রয়েছে।

কয়শো বছর আগে পশ্চিম পৃথিবীতে ব্যক্তিত্বহীন চিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টাকে চারুশিল্প ও যন্ত্রযুগ শিল্পের মধ্যবর্তী যুগ বলে ধরলে অন্যায় হবে না। সেখানে অনেক জায়গায় মানুষ নেই রয়েছে তার ব্যবহার করা বই, নিভে যাওয়া মোমবাতী প্রভৃতি।

মূলকেন্দ্রকে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় সে মূল কেন্দ্রকে যে সমস্ত শিল্প মনোরম করেছিলো, সেগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

এই যুগের পথ প্রদর্শক যদিও পশ্চিম পৃথিবী। সেকালের পরের নতুন কাল। কিন্তু এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিলো পৃথিবীর প্রায় সব দেশে।

কারুশিল্প আর যন্ত্রযুগ শিল্পের মাঝখানে এই বিশেষ কালকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এই সঙ্গে বলে রাখা দরকার যে যন্ত্রযুগ বলে আমরা যে যুগকে ধরেছি সেযুগকে ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে আমরা পেয়েছি বিদ্যুতের আলো। এই বিদ্যুত রেখাই যন্ত্রযুগের প্রথম দিক দর্শক।

চারুশিল্প আর যন্ত্রযুগের শিল্পের মধ্যবর্তী যুগটি হলো দুইটি যুগের সন্ধিযুগ।

এসময় পশ্চিম পৃথিবীর বাণিজ্য লক্ষ্মী ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়ে লক্ষ্মীর সুপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এবং এই ধনলক্ষ্মীর প্রভাবে ব্যক্তিত্বের সম্মান হচ্ছে এবং বৈশিষ্টগুলো পাচ্ছে তার উচিত দাম। কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যক্তিকে অনেক সময় উচিত মূল্য দিয়েছেন এবং সেইটেই তার একমাত্র অবদান।

ধনলক্ষ্মীর আবির্ভাবে চারুশিল্প যুগের চিরাচরিত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী যাচ্ছে পাল্টে। ব্যক্তিত্বের যেমন দাম আছে, তেমনি দাম আছে সেই ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলোর। এবং সেই সঙ্গে দাম আছে সেইসব শিল্পীর যুগসৃষ্টির এই নতুন দিনে যাঁরা তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্টকে প্রকাশ করে যুগসম্ভারকে গৌরবোজ্জ্বল করেছেন। সেযুগ স্মরণীয় হয়ে থাকার একটা বিরাট বৈশিষ্ট হলো যে সে ভবিষ্যত যন্ত্রযুগের আসার পথটিকে পরিষ্কার করে দিয়েছে।

আলোচনাটা তুলনামূলক হলে সেখানে ইতিহাস রক্ষা করার দরকার এ সত্যটি অনেক জায়গাতেই দেখা দেয়। এই তুলনামূলক বিচারের জন্যে শিল্পের ইতিহাসের দরকার হয়েছে। এখানে ইতিহাস যদিও ইতিহাস হিসাবেই রয়েছে তবে প্রকাশভঙ্গীটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে মাত্র।

এবার আমরা আসছি যন্ত্রযুগ শিল্পে। প্রথমে জানা দরকার যে যন্ত্রযুগের আদিকালে আমরা যন্ত্রযুগের কোনও শিল্পকে পাইনি, কারণ বিজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করেছে একেবারে অঙ্কের অক্ষরে। এ যুগের প্রথমে তাই জাহাজ রেলগাড়ি আর কলকারখানাকেই পাওয়া গিয়েছে। যন্ত্রদেবতা প্রথমে ঘোষণা করলেন যে যন্ত্রযুগে কলালক্ষ্মীর প্রাধান্যটা প্রধান নয়। ভাব জগতের আকাশের দাম নেই, নেই অলস জীবনের মন্থর গতি। অলসতা এ যুগে মানসিক ও শারীরিক পঙ্গুতার পরিচায়ক। অথবা অলসতা এযুগের বিলাস মাত্র।

যান্ত্রিক যুগের প্রথম দিকে আমরা শিল্পকে পাইনি। সে যুগের যে সমস্ত শিল্পসম্ভার প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে পেয়েছি চারুশিল্প এবং তার পরবর্তী যুগের প্রভাব।

যন্ত্রযুগের শিল্প এলো তখনই যখন যন্ত্রযুগ পৃথিবীর বুকে অনেকটা শিকড় বিস্তার করতে পেরেছে।

যন্ত্রযুগের শিল্প কথাটা, অনেকটা শোনায় সোনার পাথরের বাটীর মত। কারণ যে যুগ তার আত্মপ্রকাশের প্রথম পদক্ষেপেই ঘোষণা করেছে যে যন্ত্রযুগের কলা লক্ষ্মী প্রাধান্যটা প্রধান নয়, সেখানে শিল্পকে প্রত্যাশা করা অন্যায়, কারণ কলা লক্ষ্মীর আসনটা মূলত কল্পনার জগতের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত, বাস্তবতা সেখানে কল্পনার বাহন মাত্র, কিন্তু যন্ত্রযুগে দেখা গেলো যে, সে যুগের বাহনটাই তার নিজস্ব স্বত্বা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, আর কলালক্ষ্মী সেখানে চিত্তবৃত্তিকে পরিপুষ্ট করার

পরিবর্তে জন্ম দিচ্ছে ভবিষ্যৎ কঠিন বাস্তবকে যে বাস্তব মানব কল্যাণের জন্যে জন্ম নেবে।

গতযুগের শিল্পের চিত্রাঙ্কনের ঘর পরিণত হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে, যেখানে শিল্পের পরিবর্তে রয়েছে বৈজ্ঞানিকরা।

প্রশ্ন হতে পারে যে বৈজ্ঞানিক যুগের বাস্তবমুখী মন চারুকলার প্রভাবকে প্রাধান্য না দিতেও পারে কিন্তু তাকে অস্বীকার করবার অধিকার তার নেই। যে চিত্তবৃত্তি এতদিন চারুশিল্পের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে এসেছে, তার প্রভাব হঠাৎ যেতে পারে না। কারণ দৃষ্টিভঙ্গী হঠাৎ তার গুণ পাল্টাতে পারে না। এতদিন তার যে চিন্তাধারা অক্ষত দেহে চলে এসেছে আজকে তার হঠাৎ মৃত্যুকে মানুষের মন সহজে নিতে চাইবে না।

কিন্তু এ চিন্তাই আমাদের ভুল কারণ কোনো চিন্তাধারা হঠাৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, যে জিনিস বা চিন্তার খোরাক আমরা একদিন পাই সেটা হঠাৎ পাওয়া নয় তার আসার পেছনে রয়েছে বিশেষ কতকগুলো অর্থনৈতিক কারণ।

তখন যন্ত্রযুগ একটা সিদ্ধান্তে এলো যে যন্ত্রের সাহায্যে সে চিত্রবৃত্তির খিদেটা মেটানো যাক অতএব চিত্র আঁকার পরিবর্তে ছবি তোলা হোক।

এই ছবি তোলার ভেতরে গত যুগকে অর্থাৎ সন্ধিযুগকে স্বীকার করা এবং বাস্তবকে বস্তুর মতো করে দেখানোটাই ছিলো ছবি তোলার কাজ।

যন্ত্রযুগে যে শিল্পকে ছবির ভেতরে পাওয়া গেলো সেগুলোর ভেতরে প্রধান লক্ষণীয় হলো রংকে বর্জন। কলালক্ষ্মীর বিচিত্র বর্ণ এখানে নেই, নেই কল্পনার প্রবল প্রাধান্য, বাস্তবতার ভেতরে বস্তুটি ফুটে উঠেছে। যদি মানুষের এতদিনকার চিত্তবৃত্তি সন্তুষ্ট হয় ভালো না হলে, কি আর করা যাবে।

যন্ত্রযুগের তোলা ছবির ভেতরে পাওয়া গেলো শিল্পের মাধ্যমে, বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা। কল্পনার আকাশের অসীমতা পরিণত হলো ছোট্ট আকাশে।

বেশ কিছুদিন আগে বিজ্ঞান স্বীকার করেছে যে এখনও পর্যন্ত শিল্পবৃত্তির দরকার রয়েছে কারণ বিজ্ঞান তার মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মানুষের মনকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে যতদিন মানুষ চরমভাবে বিজ্ঞানের বরপুত্র না হতে পারে, ততদিন চিত্ররাজের এই শিল্পবৃত্তির দরকার থাকবে।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে মানুষকে আবার তার আগের অবস্থার যুগে তার চিত্তবৃত্তিকে পেছনে নিয়ে যাবে, কারণ মন জগতকে স্বীকার করা মানে এ নয় যে মানুষ আবার তার পুরোনো দিনে ফিরে যাক। কারণ বিজ্ঞান প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে, পুনরাবৃত্তিকে নয়।

এযুগের ছবিতোলার সরঞ্জামে বৈজ্ঞানিক রং এলো অর্থাৎ বিজ্ঞান স্বীকার করলো যে চিত্তবৃত্তি রং ভালোবাসে।

সেই সঙ্গে চিত্রাঙ্কন শিল্প এলো যুগোপযোগী হিসেবে। এই চিত্রাঙ্কনটি যন্ত্রযুগের শিল্পের ভেতরে অন্যতম প্রধান উপাদান, এবং এরই সঙ্গে গত দুই যুগের শিল্পের তুলনাগত প্রভেদ দেখিয়ে

এ প্রবন্ধ তার বক্তব্য শেষ করবে।

চারুশিল্প এবং তারপরবর্তী যুগের শিল্পের আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে আমরা বিজ্ঞান যুগের শিল্প পর্যন্ত এসে পড়েছি যথাযথ নিয়মে, এবার আলোচনা করা হবে বিজ্ঞান যুগের চিত্র শিল্পের অবদানবলতে যা বুঝি তার বৈশিষ্ট্য কি ?

আমরা জানতে পেরেছি যে চারু শিল্প যে বিজ্ঞান যুগের শিল্পবৃত্তিকে অলস মনের অন্ধ ক্রিয়া বলেই ধরে নিয়েছে। চারুশিল্পীরা সাধনার ভেতর দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। বিজ্ঞান তার চেয়ে ঢের বেশি দিতে পারে বলে মনে করে এবং সেই বৃত্তিকে আংশিক ভাবেও বিজ্ঞান যদি স্বীকার করে তাহলে সে সব শিল্পী আধুনিক যুগে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিল্প চর্চা করার সুযোগ পেতে পারেন।

ওই দ্বিতীয় কথাটি বিজ্ঞান বলেছে তার পরবর্তী যুগে যখন সে শিল্পকে মনবৃত্তির অন্যতম এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করেছে।

যাই হোক। আজও চারু শিল্পের আদর আছে কিন্তু কদর নেই।

বিজ্ঞান যুগে বাস করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যারা চিত্রাঙ্কন সাধনা করে চলেছেন তাঁদের শিল্পের দীর্ঘস্থায়িত্বের দাম নেই, আছে ক্ষণ স্থায়িত্বের।

আজকের দিন বদলাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে বারমাস আর ছয় ঋতুর কাঠামোকে অতিক্রম করে আজকের সময় এক একটি মুহূর্তকেও দাম দেয়। এক এক দিন এযুগে তাই এক এক মাস এযুগের গতিতে তাই পুনরাবৃত্তির স্থান নেই, সেই স্থায়িত্বের মূল্য। তাই এযুগের শিল্পীরা চিত্রাঙ্কনে পাকা রং ব্যবহার করেন না, যে পাকা রং স্থায়িত্বের পরিচায়ক হিসেবে চারুশিল্পে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে।

এযুগের শিল্প চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গী তাই চলমান জগতকে স্বীকার করে। চিত্রাঙ্কনে তাই রেখা চিত্রের প্রাধান্য বেশি, এই রেখা চিত্রগুলির প্রকাশ ছাপার ভেতরে চিন্তার কোঠায় তার ক্ষণস্থায়ী দাম। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়িত্বের ভেতরে আছে এমন গভীরতা যেটা বুঝতে আজকের লোকের কষ্ট হয় না। প্রতিদিনকার প্রতিচ্ছবি আমরা তাই পাই এই চিত্ররেখার ভেতরে এর সঙ্গে রসিক ও ঝাঁকালো মন্তব্য সমেত হলে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই সার্থক হয়।

এই সঙ্গে আছে বিজ্ঞাপন শিল্প। যান্ত্রিক যুগে বিজ্ঞাপন হলো যন্ত্রের উপাদানের প্রচার পত্র।

বিজ্ঞাপনের রেখাঙ্কনের বস্তুকে প্রচার করার মনোরম অভিপ্রায় ফুটে উঠেছে রেখা আর রং-এ।

আজকের যন্ত্রযুগ বিজ্ঞাপনের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেছে যে আজকের দুনিয়া বাস্তব উপাদানকে প্রচার করার কাজ হলো শিল্পের অন্যতম প্রধান কাজ। যে বিজ্ঞান যন্ত্রযুগকে জন্ম দিয়েছে সে বিজ্ঞান পরিবর্তিত করেছে গত যুগের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে। এবং সে বিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বীকারও করেছে যে আজও মানুষের মনবৃত্তিতে শিল্পবৃত্তি আছে অতএব জোর করে তাকে অস্বীকার করায় বাহাদুরী নেই, কারণ বিজ্ঞান ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয় না সে সত্যকে মূল্য দিতে চেষ্টা করে, সত্য হিসেবেই। কিন্তু শিল্প বৃত্তিকে স্বীকার করা আর চারুশিল্পের পুনরাবৃত্তিকে

সমর্থন করা এক জিনিস নয়। তাই শিল্পবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে বিজ্ঞান তাকে এ যুগের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিপুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। কাজও তেমনি ভাবে বেশির ভাগ হয়েছে।

আজও যেখানে চারুশিল্পের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা চলছে, সেখানে যন্ত্রযুগ জোর করে তার প্রতিবাদ করতে চাইছে না, কারণ সে জানে যে বিজ্ঞানের মাধ্যমে যন্ত্রের প্রসারতা যত বাড়বে, ততো মানুষ পুনরাবৃত্তিকে ভুলতে পারবে।

যন্ত্রযুগ এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞানের পথ বিস্তারকে অবলম্বন করে। তার সে যাত্রার পথে সে করে চলেছে নতুনকে আবিস্কার ও সৃষ্টি করছে নতুনকে। তবে সিদ্ধান্তে এইটুকুই বলা যেতে পারে যে চারুশিল্পের যুগে জীবনটা ছিল শিল্পাশ্রয়ী আর যন্ত্রযুগে শিল্পটাই হল জীবনাশ্রয়ী।

রমেশচন্দ্র ও ভারতের শুল্কনীতি বিচার

মুরারি ঘোষ

বৈদেশিক বাণিজ্য শুল্কের বাধা তুলে বা সরিয়ে দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করা যায়। শুল্কের প্রয়োগ সাফল্যের ওপর বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নির্ভরশীল। সুকৌশলী শুল্কনীতির ফলে জাতীয় অর্থনীতি লাভবান হতে পারে আশাতীতভাবে। ফলে আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থায় সরকার অনুসৃত আর্থিক নীতির অন্যতম সেরা হাতিয়ার শুল্কের যথাযথ প্রয়োগে ও তজ্জনিত কারণে আমদানী রপ্তানীর নিয়ন্ত্রণে। আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রাযুক্তিক অর্থনীতির স্বার্থে বৃটিশ রাজনীতি ও শুল্ক ব্যবস্থার দিকেও কড়া নজর রেখে চলতো। এ নজর যেমন ইংলণ্ডের আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে সজাগ ছিল তেমনি ছিল তার কলোনীগুলোয়। বৃটিশ অর্থনীতির সামগ্রিক চাহিদায় কেমনভাবে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে স্বদেশে ও ভারতবর্ষে শুল্কনীতির প্রয়োগ চাতুরীতে স্বদেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভারতের সমূহ সর্বনাশ কীভাবে ডেকে আনা হয়েছে রমেশচন্দ্র বিভিন্ন অধ্যায়ে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের দুর্দশার ইতিহাস শুল্কনীতির প্রয়োগ চাতুরী থেকে সুরু—বিলেতে ভারতীয় পণ্যের ওপর ধার্য শুল্ক আর হিন্দুস্থানে বিলিতি পণ্যের দেয় শুল্ক-এ দুয়ের মধ্যে এক আসমান জমিন অসাম্য স্থির ও নিশ্চিতভাবে আমাদের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়েছে। প্রচলিত শিল্পোদ্যোগের নষ্ট কাঠামো আমরা কোনোদিনও উদ্ধার করতে পারিনি। ফলে স্বাভাবিক শিল্পোন্নতির রাস্তা বেয়ে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা লক্ষে পৌছোতে পারে নি। জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে এ হল সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। শুধু মাত্র সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের স্বার্থে নতুন করে শিল্পোদ্যোগের সূচনা হয়েছিল স্বভাবতই তাতে জাতির আর্থিক বিকাশের পথ ছিল রুদ্ধ।

ইংরেজ বণিকের স্বার্থদুষ্ট শুল্কনীতির যথাযথ চেহারা রমেশচন্দ্র তুলে ধরতে পেরেছিলেন। শুল্কনীতির প্রয়োগ চাতুরীর ইতিহাস রমেশচন্দ্রের রচনায় পরিষ্কার। হাউস অব কমনসের এক অনুসন্ধান কমিটির আলোচনা বিচার করে ইংরেজ শাসকের সততার মুখোস উন্মোচন করেছেন। ঐ কমিটিতে ভারতে বাণিজ্য সম্পর্কিত অনুসন্ধানে অনেকের সঙ্গেই সাক্ষ্যদানকারী জন র‍্যাঙ্কি-এর অভিযোগ তুলে ধরেছেন। পার্লামেন্টের অনুসন্ধান কমিটির প্রশ্নে (১৮১৩) র‍্যাঙ্কিং জানাচ্ছেন: ইংলণ্ডে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ভারত থেকে প্রেরিত ক্যালিকো কাপড়ের প্রতি ১০০ পাউণ্ড দামের ওপর ৬৮ পা ৬ শি ৮ পে কর ধার্য হোত। মসলিনের ওপর প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ২৭ পা ৬ শি ৮ পে। এই অসম্ভব হারে কর ধার্যের উদ্দেশ্য যে কোন বুদ্ধিমান লোকের কাছে দুর্বোধ্য নয়। জন র‍্যাঙ্কিং বলেছেন: There was no thought of concealing the real object of these prohibitive duties. I look upon it as a protective duties to encourage our own manufactures. (১)

সংরক্ষণমূলক কর ধার্যের পেছনে জাতীয় সদুদ্দেশ্য অস্বীকার করা যায় না। দেশের

শিল্পোন্নতির কারণে আমদানীর সম্মুখে শুল্কের প্রাচীর তুলে ধরার যৌক্তিকতায় কেউই ভিন্নমত পোষণ করেন না। এই পর্যন্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে সৎ প্রচেষ্টা বলে স্বীকৃত হবে। দশবছর বাদে জন র‍্যাঙ্কিং বলছেন : The silk manufactures and its piece goods made of silk and cotton intermixed have long since been excluded altogether from our markets, and of late partly in consequence of the operation of a duty of 67 pc...(৪) সংরক্ষণমূলক শুল্কের কল্যাণে ভারতীয় সিল্ক এবং তুলোজাতীয় কাপড়ের ইংলণ্ডের বাজার হাতছাড়া হয়ে গেল রমেশচন্দ্র প্রদত্ত পরিসংখ্যান (৫) থেকে জানা যায় যে ভারত থেকে তুলোজাতীয় কাপড়ের রপ্তানী ক্রমশ নিম্নমুখী—১৮১৩ সনে যেখানে ১৪৮১৭ গাঁট কাপড়ের রপ্তানী ছিল ১৮২৫ সালে তার পরিমাণ নেমে গিয়ে দাঁড়ালো ১৮৭৮ গাঁট কাপড়ে। ঐ তুলনায় বৃটেন থেকে ভারতে আমদানীকৃত কাপড়ের পরিমাণ ক্রমহারে বাড়তে থাকে ১৮১৩ থেকে ১৮২৫ সালের পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যাবে ভারতে বৃটিশ কাপড়ের রপ্তানীর পরিমাণ চারগুণ হয়ে গেছে। (৬) এখানে লক্ষণীয় ভারতে ও গ্রেট বৃটেনে বৈদেশিক বাণিজ্যের শুল্কনীতির ব্যবস্থা। সমস্ত ব্যবস্থাই বৃটেনের পণ্যোৎপাদনের স্বার্থে—বৃটিশ শিল্পমালিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা। ভারতের প্রয়োজনের নামগন্ধ নেই। যে সময়ে ভারতীয় শিল্পপণ্যকে গ্রেটবৃটেনে শতকরা ৬০।৭০ হিসেবে শুল্ক দিতে হয় সেখানে গ্রেটবৃটেনের পণ্যের ভারতবর্ষে দেয় কর শতকরা আড়াই। এ ছাড়াও ভারতবর্ষে ভারতীয় পণ্যকেও সাধারণ ভাবে শতকরা সাড়ে সাত টাকা দেশজ শুল্ক দিতে হত বৃটিশ পণ্যকে তাও দিতে হত না। (৭) প্রায় বিনা শুল্কে ভারতের বাজার দখল করে ভারতীয় পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করার উদ্যোগ শুরু হল। ভারতীয় বাজারের এই সুবিধা বৃটিশ শিল্পমালিক ও বণিকেরা নিতে কসুর করেনি।

একটা খুবই চালু ও বাজার চলতি প্রশ্ন আছে যে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের কৃপায় বর্ধিত উৎপাদনের সুবাদে ভারতে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা মার খেয়েছে—এটা শিল্প বিপ্লবের মার—এর ধাক্কার অভিজ্ঞতা ভারতীয় পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতেই হবে সেটা যত মারাত্মকই হোক না কেন? প্রশ্নটা কতখানি যুক্তি সহ? তৎকালীন অর্থনীতিবিদ ফ্রেডারিক লিষ্টের এক পাল্টা প্রশ্নে এর ভিৎ তাসের ঘরের মত ভেঙে যায়: 'Had they sanctioned free importation into England of Indian cloth and silk goods, the English cotton and silk manufactories must, of necessity, soon come to a stand. India had not only the advantage of cheap labour and raw material, but also the experience, the skill and practice of centuries. The effect of these advantages could not fail to till under a system of free compettion.

ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সাফল্য স্বত্ত্বেও ভারতীয় বস্ত্রের বাজার তথাকথিত বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় নষ্ট হবার মত ছিল না। ভারতে জাতীয় প্রয়োজনে যদি বৈদেশিক বাণিজ্যের শুল্ক ব্যবস্থা গড়ে উঠতো তাহলে ভারতে সংরক্ষণমূলক কর ধার্যের আওতায় ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রসাদ পুষ্ট উৎপাদিত পণ্যের কতখানি ক্ষমতা থাকতে পারে যে ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও

আর্থিক কাঠামো তাতে বানচাল হয়ে যাবে। কিংবা ইংলণ্ডে শুল্কের প্রাচীর তুলে ভারতীয় বস্ত্র আমদানী রুদ্ধ করার সুফল কে পায়? শিল্প বিপ্লব স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বয়ংক্রিয় কোনো পন্থা নয় রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থিক বিভিন্ন অবস্থার সমষ্টিগত প্রয়োগ ফলে তার উদ্ভব। ভারতীয় পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার ওপর নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপে তার স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা লুপ্ত করে অধুনা শিল্পবিপ্লবের জয় ঘোষণা করা হয়। এমনিতেই বৈদেশিক বাণিজ্যের বিভিন্ন দুয়ার হিন্দুস্থানে বৃটিশ কোম্পানীর স্বার্থে সদা উন্মুক্ত ছিল—সহায় ছিল ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা ও কর ব্যবস্থা, যার পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়েছে বৃটিশ বণিক স্বার্থ—তার সুফল গিয়ে পৌঁচেছে ইংলণ্ডের শিল্পোদ্যোগে ম্যাঞ্চেষ্টারে, ল্যাংকাশায়ারে। কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক তা স্বীকার করেছেন। তাদের অন্যতম হোরেস হেরম্যান উইলসন।

It is also a melancholy instance of the wrong done to India by the country on which she has become dependent. It was stated in evidence (in 1813) that the cotton and silk goods of India up to the period could be sold for a profit in the British market at price from 50 to 60 pc lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of 70 and 80 pc on their value, or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory duties aud decrees existed, the mills of poislly and Manchester would have been stopped in their outset...they were created by the sacifice of the Indian manufacturer. Had India been independent she would have retaliated, would have imposed prohibitive duties upon British goods, and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of self defence was not permitted her, she was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty, and the foreign manufaturer employed the aim of political injustice to keedown and ultimately strangle competitor with whom he could not have contended on equal term."

মূলত ধনবিজ্ঞানী না হয়েও ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশের প্রাথমিক কারণটি উইলসনের দৃষ্টিতে এড়ায় নি। ইংলণ্ডে সংরক্ষণমূলক কর ধার্য করে তার শিল্প ব্যবস্থা ক্রমোন্নতির পথ পরিষ্কার রাখা হয়েছে, ভারতের শিল্পোন্নতির পথ রুদ্ধ রাখা হয়েছে সেই একই হাতিয়ারে। বারংবার ল্যাংকাশায়ার ও ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্প বণিকদের দাবীর সামনে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নতি স্বীকার করতে হয়। মূলত ঐতিহাসিক উইলসনের সংগত প্রশ্নই ছিল, ভারত যদি স্বাধীন রাজ্য হত এ ধরণের বাধ্যতামূলক বৈদেশিকদের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ কি ছেড়েই দিত। এখানে শিল্প বিপ্লবের ধার ও ভারের প্রশ্ন নিছক হাস্যকর বলেই স্বীকৃত হবে। বেপরোয়া ও বেআইনী বাণিজ্য মারফৎ ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবে মূলধনের যোগান ঘটেছে—ভারতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প রাজনীতির কৌশলী হাতিয়ারে মুমূর্ষু সেখানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপুঁজির বিনাশ ও নতুন পুঁজির আবির্ভাবের পথ

রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভারত-ইংলণ্ড অর্থনীতিক সম্পর্কের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে শিল্পবিপ্লবের জয় ঘোষণা নিরর্থক। নেহাৎ বাতুলতা।

আমদানীর প্রতিবন্ধে (Import restriction) ত্রিবিধ লাভে ইংলণ্ড শক্তিশালী হয়েছে।

(১) শিল্পের পুঁজির চাহিদা।

(২) বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আহৃত বর্ধিত পুঁজির বিনিয়োগ।

(৩) পণ্য বস্তুর বর্ধিত চাহিদায় মূলধনী শিল্পের বিকাশ (increased capital formation).

ভারতে ঘটেছে এর বিপরীত ক্রিয়া :

(১) রপ্তানীর প্রতিবন্ধে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের বাজার হাতছাড়া।

(২) চাহিদার অভাবে উৎপাদন সঙ্কোচ।

(৩) ফলে বাণিজ্যজাত আয়ের সঙ্কোচে পুঁজির বিকাশ ব্যাহত ও পরিশেষে মূলধনী শিল্পের সম্ভাবনা নষ্ট।

উনিশ শতকের শুরুতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই দুর্দশা বজায় ছিল। ফলে তার পরম আঘাত আসে ভারতের শিল্পোদ্যোগে পক্ষান্তরে আর্থিক পরিস্থিতির ওপর। সমস্ত উনিশ শতকে শুল্কের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু মূল শুল্কনীতি সাম্রাজ্যিক স্বার্থ থেকে মোটেই বিচ্যুত হয়নি। এমন কি ঐ শতকের চতুর্থ ভাগে যখন হিন্দুস্থানে বস্ত্রশিল্পের আধুনিক কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই ম্যাঞ্চেষ্টার ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পমালিকদের উদ্বেগের কাহিনী এবং তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টার কথাও রমেশচন্দ্র বিস্তৃত ভাবে দেখিয়েছেন। এর ফলে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তাতে দেখা গেল আমদানী শুল্কের পরিবর্তিত নিম্নহারের দরুণ (Tariff Act of 1875) এক বছরেই ৩,০৮,০০০ পাউণ্ড রাজস্ব থেকে ভারত বঞ্চিত হয়েছে। শুল্কনীতির প্রয়োগচাতুরী শতাব্দীব্যাপী বঞ্চনার করুণ ইতিহাসে ভারতকে ডুবিয়ে রেখেছে। ভারতের শিল্পবিকাশ ও সম্ভাবনাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। রমেশচন্দ্র কয়েকটি অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বিবরণ ব্যক্ত করেছেন। সাম্প্রতিক ধনবিজ্ঞানের বিচারে রমেশ চন্দ্রের বিশ্লেষণ অনুন্নত দেশের আর্থিক উন্নতি যোগের এক মৌল তত্ত্বের সন্ধান দেয়।

(১) Dutt—Vol II, P 26. (২) ibdd P. 262. (৩) প্রথমখণ্ড পা ২৯৮।

(৪) ঐ পা ২৯৮।

(৫) Most of the imports form Great Britain were admitted free and others paid a nominal duty of 2½ pc, while the generality of Indian produce and manufactures were suffering under the inland duty of 7½ p. c. and the oppressive system of collection. The heavly taxed produce and manufacturies of India were, in consequnce, placed in an unfavourable and unfair position in compittion with lightly laxed or free machine made goods from Great Britain (p 55 ; N. J. Shah —History of Indian Tariffs.

একটি অন্ত্যজ লোকসাহিত্যঃ গালাগালি

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

'লোকসাহিত্য যে সমাজের সৃষ্টি তাহা আদিম সমাজ নহে, তাহা হইতে আরও অগ্রসর সমাজ।' বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণে সমৃদ্ধ সভ্য সমাজ লোকসাহিত্যের স্রষ্টা। অর্থাৎ আদিম সমাজে লোকসাহিত্যের ভূমিকা নেই একদা ভাষাহীন আদি নরনারী ভাব প্রকাশের জন্য অঙ্গ চালনা করত রাগ ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রভৃতি আদি অনুভূতি প্রকাশে ভাষা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু লোকসাহিত্যের সৃষ্টি ভাষা আবিষ্কারের পর 'সভ্য' সমাজে।

'The whole nature of the performance, the voice and the mimicry, the stimulas and the response of the andience mean as much as the text' এই উদ্ধৃতিতে জানা যায় লোকসাহিত্যের মূল অংশের সঙ্গে কথকের হাবভাবভঙ্গী এবং শ্রোতার দেহে মনে তার ফলশ্রুতি লক্ষ্যণীয়। সন্দেহ হয়, ভাব ভঙ্গী ও ফলশ্রুতি (দৈহিক) সভ্য সমাজে সৃষ্টির আগে ভাষা আবিস্কারেরও পূর্বে আদিম নরনারীর ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য। নিছক ছড়া হেঁয়ালী বা প্রবাদগুলো শুনে টুকে নিলেই সব কাজ সারা হয় না। B. Malinoski তাই বলেছেন, 'when a Scholar jots them down without being able to evove the atomsphere in which they florish he has•given us but a mutilated bit of reality.'

আজকাল আমরা সভ্য হইয়াছি, সেইজন্য সহজ কথা সহজ করিয়া বলিতে পারি না। কৃত্রিম সভ্যতার একটি অঙ্গ হইতেছে ইহার বাহিরে ফিটফাট থাকিলেই হইল।' ভাষাগত রুচিতে আমরা শিহরিয়া উঠি, কিন্তু ভাবগত কুরুচি পরোক্ষভাবে আকারে ও ইঙ্গিতে, গোপন বিষসর্পের মত ওতপ্রোত থাকিলে আমাদের রুচিধ্বনিতার ব্যাঘাত হয় না। প্রবাদের প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন ড্রয়িংরুমে চুরুট চিবিয়ে যাঁরা চাকরকে শূয়ারকা বাচ্ছা বলেন তাঁরা ভাবের দিক থেকে কি ইঙ্গিত করেন। আমরা এই গালাগালির উত্তরে গোপালভাঁড়ের সরস রসিকতা 'হুজুর মা বাপ'টাই লোক সাহিত্যে স্থান দিয়েছি কিন্তু 'শূয়ারকা বাচ্ছা'কে নয়। বাংলা সাহিত্যে বা ভাষায় নয় বাঙালীর মুখে মুখে এমনি অজস্র গালাগালি ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলো সঙ্কলনের কোন প্রয়াস ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সম্ভবতঃ 'ড্রেন ইনসপেক্টারের লোকসাহিত্য আখ্যা পাবে বলেই গালাগালিকে প্রথমেই লোকসাহিত্য হিসাবে নামাঙ্কিত করতে আমিও নারাজ।

লোকসাহিত্য সর্বপ্রথমে একজনেরই সৃষ্টি—All products of folklore, probably originally the products of individuals, are taken by the folk and put through a process of re-creation, which through constant variation and repetation become a group product' অর্থাৎ লোকসাহিত্য একজনেরই মুখ থেকে ছড়িয়ে যায় ভিন্নমুখে whatever the sources, however, it is oral circulation that is the best general criterian of

what is folk song.

কিন্তু মুদ্রিত রূপে যে লোকসাহিত্য আমরা পড়তে (শুনতে নয়) পাই তা সাধারণত লিখিত রূপ। সাধারণত গবেষক দুভাগে এগুলো সংগ্রহ করেন (১) প্রচলিত ও লুপ্ত পুঁথি উদ্ধার করে (২) বিভিন্ন কণ্ঠ থেকে শুনে। লোকসাহিত্যের লিখিত রূপ যে কতটা 'চালানী' হতে পারে তা আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন 'সমগ্র বাংলা ও আসামে মনসামঙ্গল কাহিনীর কোন ব্যতিক্রম নাই দুই এক স্থানে সামান্য যে এক আধটু ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহাও মূল কাহিনীর ব্যতিক্রম, ইহার বহিরঙ্গগত ব্যতিক্রম মাত্র; কিন্তু তাহাও নিতান্ত উপেক্ষণীয়।' লোকসাহিত্যের লিখিত এ ধরণের মেসিনীকরণ ঘটে থাকে। বাকি থাকে মৌখিক লোকসাহিত্য। M. J. Herskorits-এর মতে লোকসাহিত্য unwritten literature of any group whether having writing or being without it হতে পারে। এ প্রসঙ্গের অবতারণা এই জন্য যে গালাগালির মৌখিক রূপকে ধরে রাখলে লোকসাহিত্য হতে পারে ডিক্সনারী অফ স্ল্যাংসের মত নিঃসন্দেহ—লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের লিখিত রূপে লোকবৈশিষ্ট্য (folk character) অক্ষুন্ন থাকে না বলেই অনেকে লিখিত লোকসাহিত্যকে স্বীকার করতে চান না। কিন্তু trained investigator যদি সরাসরি লোকের মুখ থেকেই তাকে উদ্ধার করতে পারেন তার এ বিপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ চুরির জন্য চৌর পঞ্চাশিকা পুঁথি লেখা হলেও এদেশে গালাগালির কোন পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নি। এখনও গালাগালি লোকের মুখে মুখে নির্ভেজাল খাঁটি রূপে টিকে রয়েছে তাই। অশ্লীলতার প্রতি প্রচলিত অনীহার বসে গালাগালিকে লোকসাহিত্যের পংক্তিতে যাঁরা স্থান দিতে নারাজ হবেন তারা বাংলা লোকসাহিত্যের এই একমাত্র 'টাটকা' শ্রেণী থেকে বঞ্চিত হবেন। বলাবাহুল্য এ গবেষণার বিস্তৃত ক্ষেত্রটি অসামাজিক পরিবেশে সঙ্কীর্ণ তাও নাগরিক কুশ্রীতার মধ্যে তাই সামাজিক লোকাচার ও অসামাজিক স্ত্রী আচার থেকে বহু বাধা আসার সম্ভাবনা রয়েছে গবেষকের কাজে।

বাংলা গালাগালিতে প্রচুর অবাংলা শব্দ ইডিয়ম ইত্যাদি উচ্চারণ, পরিচিতির সুবিধার্থে ঢুকে রয়েছে, সেগুলোও ঐতিহাসিক ভাবে বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। গালাগালি অ-সামাজিক অন্ধকারে জন্মলাভ করলেও তার মূল সন্ধান করতে হবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বাংলার নবজন্মদাতা। বলাবাহুল্য বাংলা গালাগালির ও স্ত্রী সংখ্যাবৃদ্ধি এ সময় সবচেয়ে বেশি ঘটেছে। কূপমণ্ডুক ব্রাহ্মণ জাতির মনোপলিতে বিশ্বাসের সংঘাত ছিল না। বিশুদ্ধ পরচর্চা ছাড়া চরিত্রের ইঙ্গিত করাও সম্ভব ছিল না কারণ রক্ষিতা তখন 'চক্রে'র অন্তর্গত পরকীয়াই বলুন পথমেকারই বলুন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিটি সিড়িতে মানুষের বিশ্বাসকে পিছনে বেড়াতে হয়েছে টিকিও টাকের সংরক্ষণশীলতা, বাবুদের উচ্ছৃঙ্খলতা, নব্যবঙ্গের উদ্দামতা, ক্রীশ্চানদের পাদ্রীগিরি ব্রাহ্মদের 'দুর্বোধ্য' ধর্মবোধের অহরহ ঘাতপ্রতিঘাত মানুষের মনে মনে নিত্য নতুন গালাগালি সৃষ্টি হয়েছে। অব্রাহ্ম শ্রেণীতে, 'বেরম' বা অমুসলমান শ্রেণীতে 'নেড়ে' তখন গাল। এই contrast-ই গালাগালির মূল। trnsition period-এ এরই চূড়ান্তরূপে আমরা পেয়েছি। সামাজিক থেকে সাংস্কৃতিক নিত্য নতুন বিবর্তনে বিশ্বাসের খ্যাপাকুকুর যত বাধা পেয়েছে ততই জন্ম নিয়েছে নতুন গালাগালি।

কে মেরেছে ধরেছে কে দিয়েছে গাল। তাইতে খুকু রাগ করেছে ভাত খায় নি কাল।
গালাগালির স্বীকৃতি লোকসাহিত্যে এইটুকুই নয়। কেরীর কথোপকথন থেকে চলিত ভাষার উল্লেখ প্রসঙ্গে মুদ্রিত সাহিত্য মাত্রেই গালাগালির উদাহরণ বহন করছে।

মোটামুটি বাংলা গালাগালিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। (১) উগ্র গালাগালি (২) মেয়েলী গালাগাল (৩) মৃদু 'গাল' (১) বলাবাহুল্য উগ্র গালাগালিতেও মেয়েরাও অংশ নিতে পারেন তবে সাধারণত তারা এখানে অনুপস্থিত। অন্তত গালাগালি দেবার সময় তারা মেয়ে চরিত্রের কোন অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য মেনে চলেন না। যে কোন পুরুষের সমান ভাবেই তারা গালাগালি দেন। প্রসঙ্গটি আমরা (৩) নং আলোচনা কালে বিস্তৃত করবো।

মানুষ রাগ হিংসা দ্বেষ ঈর্ষ্যা ইত্যাদি আদিম অনুভূতি প্রকাশের জন্য গালাগালির আশ্রয় নেয়। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় প্রমাণ করে দাতা নিজের ইনফিরিয়টি কমপ্লেক্স থেকে মুক্তি পায়। সাধারণত এই মুক্তির তৃপ্তি উগ্র গালাগালির ক্ষেত্রে তীব্রবোধের ব্যাপার। পারস্পরিক অপমান বোধটাও এর কারণ। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চরম হয়ে যেতে পারে তার অক্ষমতার ইঙ্গিত করে। যথা 'জন্ম প্রসঙ্গে—উদ্দিষ্ট ব্যক্তির (একে আমি 'ক' বলব) নিজের জন্মের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এখন এই জন্মের কোন কুৎসিৎ ইঙ্গিত করাতেই সার্থকতা শুধু তার নয় তার বংশের কোন ঔরসগত জন্ম বিভ্রাট সমান কাজ করে। পূর্বপুরুষ ছাড়া বর্তমান প্রসঙ্গতে এটা চলে। মনে রাখতে হবে জন্মপ্রসঙ্গে গালাগালির মূল যৌন বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতার ইঙ্গিত করা। বস্তুত দাতার perversion বৃত্তিও এ গালাগালির জন্মদাতা হতে পারে। তাই 'ক'এর বিধবা বোনের গৃহত্যাগ ইত্যাদি এ সবই এ প্রসঙ্গে অন্তর্গত হতে পারে।

কর্ম প্রসঙ্গে—সাধারণত এগুলো 'ক'র চারিত্রিক দুর্বলতা নির্ভর। মদ্যপ, লম্পট এসবই এর অন্তর্ভূক্ত। যৌন চরিত্রের ইঙ্গিত পুরুষ অপেক্ষা নারীর ক্ষেত্রেই মারাত্মক। তাই প্রসঙ্গটি আমরা (৩) আলোচনা কালে বিস্তৃত করবো। দাতার perversion-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 'ক'-এর যৌন-কর্মাদির কুৎসিত ইঙ্গিতও (এখানে উচ্চারণ পদ্ধতিও গুরুত্বপূর্ণ) ভারী হতে থাকে। আগেই বলেছি দাতা যখন 'ক' অপেক্ষা নিজেকে হেয় মনে করে তখনই যে 'ক' কে অপমান করে প্রতিশোধ নেবার জন্য গালাগালি দেয়। নৃতত্ত্ব বাদ দিয়েও বলা যায় 'ক'এর আত্মীয়া (স্ত্রী, কন্যা, এমনকি মাতৃস্থানীয়া) কাউকে নিজের অনাচারের সঙ্গিনী বর্ণনা করে গালাগালির উগ্রতাকে তীব্রতার শেষ সীমায় পৌছে দেওয়া হয়।

কর্মপ্রসঙ্গে গালাগালির একটি অ-গভীর পর্য্যায় বৃত্তিজাত গালাগাল। মনে রাখতে হবে 'ক'-এর প্রকৃত বৃত্তির সঙ্গে গালাগালিতে উল্লেখ্য বৃত্তির সম্পর্ক একটি অপমানকর যোগাযোগ রাখবে কিংবা রাখবে না। স্বাস্থ্যমান 'ক'কে গুণ্ডা, সুন্দরী ক-কে 'বেশ্যা' বলার কারণ এইটেই। মনে রাখতে হবে যার যা বৃত্তি নয় বা বিতর্কিত তাকে তাই বলা হয় গালাগালিতে। রাস্তায় দুটাকা কুড়িয়ে নিতে দেখে 'ক'-কে চোর বলার অর্থ যে চোর প্রমাণ করে অপমানের চেষ্টা করা।

বৃত্তি অর্থে জীবিকা। তাই পুরোহিতকে পুরুত বলা গাল নয়। কিন্তু হেড অফিসের সুট বুটে হ্যাট কোটের মিঃ ভট্টাচারিয়াকে 'পুরুত' বলাটাই গালাগালি। হেমচন্দ্র বাজীমাৎ এ বলেছেন

'বেশ্যার বেহদ্দ পেশা কথা বেচে খাওয়া' উকীলের পক্ষে এ গালাগালি। গিরিশ ঘোষ প্রফুল্ল নাটকে বলেছেন মা আমার রত্নগর্ভা কারণ তার দুটি সন্তান উকীল ও মাতাল। মারাত্মক গালাগালি উকীলের পক্ষে নিঃসন্দেহে।

মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গকে তুলনামূলক বিচার করে মর্যাদা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। পায়ের চেয়ে মাথার মর্যাদা বেশি 'ক' আপনি দেহের কোন অঙ্গবিশেষে রাখতে চান তা গালাগালিতেই বুঝা যাবে। পশুবাচক গালাগালি ঠিক এই পদবাচ্য। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী আমরা কয়েকটি জন্তুকে গালাগালির তুল্য মনে করি কিন্তু কাউকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করলে রেগে যাই না। কিন্তু হাতী (মোটা ইঙ্গিত করে), শেয়াল (ধূর্ততায়), নেকড়ে (ক্রূরতায়), কুকুর (নির্লজ্জতায়), নিঃসন্দেহে গালাগালি পদবাচ্য।

আমি 'ক' কর্তৃক আচার উক্তিতে যত অপমান বোধ করব আমার গালাগালিও তত তীব্র হবে। অর্থাৎ অপমান বোধ ও গালাগালির উগ্রতা একই অনুপাতে গম্ভীর হবে। গালাগালি যত তীব্র হবে জৈববিজ্ঞানের ধর্ম অনুযায়ী ততই বেশি স্নায়ু পীড়িত হবে উভয়ের। ভাষা আমাকে তৃপ্ত করতে ব্যর্থ হলে আমার অঙ্গভঙ্গীও ভূমিকা নেবে। উগ্র গালাগালি শিক্ষা সংস্কৃতির অভাবে অঙ্গভঙ্গীর প্রভাব বাড়বে। কবিসংগীতের তরজালড়াই কিন্তু রসজাত গালাগালি ও পূর্ববর্ণিত অঙ্গভঙ্গীরই কিম্ভূত সংমিশ্রণ হয়। এখানে গালাগালি তীব্র হলেও মোড়ক দিতে চেষ্টা করা হয়ে থাকে উপরন্তু অঙ্গভঙ্গীর কুৎসিতত্বকে নৃত্যছন্দের দোলানিতে চাপা দেওয়া হয়।

এখন আমরা জানি গালাগালির সঙ্গে অঙ্গভঙ্গীর একটি সম্পর্ক রয়েছে। যখন ভাষা আমার গালাগালির তীব্রতাকে চাহিদা মত গভীর করতে পারেনা তখনই আমার অপমান বোধ প্রতিহিংসা তৃপ্ত হয় না কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীতে এর কিছুটা মিটতে পারে। এমন অর্থহীন শব্দ উচ্চারণেও এর পরিপূরক হতে পারে। এমন অনেক গালাগালি ছিল যা একদা অর্থহীন শব্দ মাত্র যেমন 'ফুঃ'—পরে তুচ্ছ অবহেলার প্রতীক হয়ে দাড়িয়েছে। এখন এই অঙ্গভঙ্গী ও অর্থহীন শব্দ গালাগালিও হলেও লোকসাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে কিনা? ভারী জিনিস তোলার সময় মজুর যে সাবাস জোয়ান হেঁইও মার্কা অর্থহীন শব্দ করে C. E. Grover-এর মতে তা শ্রমসঙ্গীত। আশুতোষ ভট্টাচার্য এ শ্রমসঙ্গীতে তাল মুখ্য কিন্তু ভাব গৌণ মনে করেন। এই অঙ্গসঞ্চালন ও অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ তাঁর মতে অসংযত হৃদয়োল্লাসের অর্থহীন অভিব্যক্তি মাত্র তাই লোকসাহিত্য পদবাচ্য নয়। কিন্তু তাল ও অঙ্গসঞ্চালন মুখ্য ঘুমপাড়ানিয়া cradle song-কে তো তিনি লোকসাহিত্য বলে স্বীকার করেছেন। শিশুর অর্থহীন ছড়া মায়ের গুনগুনালির অর্থ পাওয়া মুসকিল তবু ডঃ ভট্টাচার্যের মতে এখানে রস জমাট বাঁধে এবং সুনিবিড় ভাব থাকে। সেক্ষেত্রে কবিসঙ্গীতেও ঘন রস এবং ভাব-এর অভাব নেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি সত্ত্বেও এই urban কবির লড়াইকে তো ডঃ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য বলতে চান নি।

তাহলে গালাগালির মুখ্য অংশ অঙ্গভঙ্গী ও অর্থহীন উচ্চারণ সম্বন্ধে লোকসাহিত্যের শেষ বিচার এখনও অসমাপ্ত বলা চলে।

তবে লোকসাহিত্যের গালাগালিও শুধু স্থান ও পাত্র বিচার করে না কালও বিচার করে

স্থান কাল পাত্রভেদে উচ্চারণ অঙ্গভঙ্গী অনুযায়ী গালাগালির নিত্য নতুন অর্থ সন্ধান চলছে। 'It is liue a forest tree with its roots deeply buried in the past but which continually pup forth new branches, new leaves, new fruits.' লোকসাহিত্যের অন্যতম অংশ গালাগালির ক্ষেত্রেও একথা সমান ভাবেই প্রযোজ্য।

এতক্ষণ আমরা গালাগালির যে পর্বগুলো প্রকাশ করতে চাইলাম তা উগ্র। বলা বাহুল্য সাহিত্যে উগ্রতার স্থান নেই। প্রচারে উগ্রতার স্থানে হতে পারে, প্রকাশে নয়। উগ্রতাকে লাবণ্যের খাতিরেও যখন মৃদু করা হয় তখনই সেটা সাহিত্য হয়। হুতোম তার নক্সায় বহু পরিচিতের কুৎসাকীর্তন করেছেন কিন্তু মৃদু প্রলেপে, তাই সেটা সাহিত্য।

অর্থাৎ মৃদুতার মাত্রাভেদেই গালাগালির সঙ্গে সাহিত্যের আত্মীয়তা। গালাগালি যখন মৃদু হয় তখন তা অনুগ্র না হতে পারে। চরিত্রহীনে দুই মাতাল বৃদ্ধা পতিতার ঝগড়া দেখান হয়েছে এক পতিতাকে বাবু আঁচলে নোট বেঁধে দেওয়ায় সে মদের গ্লাস হাতে ধরেছে উত্তরে প্রতিবাদিনী বলছে দুটো নোটেই মদ ধরেছিস আর দুটো নোট দিলে ত....' শরৎচন্দ্রের মুন্সীয়ানায় এখানে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে কুৎসিত তথ্যটির গোপন ইঙ্গিতে। অর্থাৎ শুধু মৃদুতা নয় গোপনতা। যেমন ধরুন আপনার অধ্যাপক বন্ধুকে আপনি যখন প্রশংসা করে বলছেন, তিনি খুব শান্ত তখন অধ্যাপকের স্ত্রী-ই হয়ত অধ্যাপকের দিকে সকটাক্ষে আঁচল দাঁতে চিবিয়ে যদি আপনাকে বলেন যে আপনার বন্ধু যে কত শান্ত তা তাঁর জানা আছে। সেখানেই মৌখিক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। আপনি বললেন যে যতই বলুন আপনার বন্ধু অভদ্র নয় অধ্যাপকের স্ত্রী হয়ত বললেন দুষ্টুও কম নয়, পুরো ডাকাত।' এখন ডাকাত শব্দটা বলাবাহুল্য উগ্রবৃত্তিজাত গালাগালি কিন্তু এখানে দাম্পত্য জীবনের কোন প্রকৃতির সরস ইঙ্গিত সঞ্জাত এ মন্তব্যটি মোটেই গালাগাল নয়।

আমার রচনার দ্বিতীয় পর্ব মৃদু গালাগালি তাই আমি গালাগাল বলব। এ প্রসঙ্গে গালাগালগুলো তীব্র তো নয়ই প্রায়ই বিপরীত অর্থ ব্যঞ্জক। উগ্র গালাগালিগুলোও যেমন আলোচনার পক্ষে আড়ষ্টতার সৃষ্টি করে তেমনি মৃদু গালাগালও আলোচনায় অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এর অধিকাংশই দাম্পত্য কলহ সঞ্জাত। 'দুষ্টু "চোর' 'ডাকাত' 'অসভ্য' এমনকি 'ছোটলোক' শব্দগুলোও এই পদবাচ্য। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে গালাগালির উচ্চারণ ভঙ্গী ও পরিবেশ বিশেষ বিচার্য। 'ক'-কে গালাগালি কখন দিচ্ছেন কোথায় দিচ্ছেন মৃদু গলাগালি কিনা বিচার করার সময় এসব বিষয়ে তীব্র লক্ষ্য রাখতে হবে। একটু চোখ টিপে বলা যায় দাম্পত্য জীবনে এমনি 'মিষ্টি' গালাগালি যা শুনবার জন্য স্বামীরা সদাই সচেষ্ট মনে হয় তাকে মৃদু 'গাল' বলেও বিন্যাস করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে আমরা জানি বিশেষ বয়স পর্যন্ত শিশুমাত্রেই চিহ্নেন। তারা ছেলে মেয়ে পৃথক নয়। শিশুদের এ বয়সের গালাগালিগুলো ক্ষেত্র বিশেষে উপভোগ্য। তাই তো মার ধর বা গালি দিলে 'মুকুব' অনেক সময় রাগ করে লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বহুব্যবহার সামাজিক বিন্যাসের বিশেষ সংসার অনেক সমর কুৎসিত গালাগালির উগ্রতা হ্রাস করিয়ে বিবর্তনের পথে মৃদু করে দিতে পারে। যেমন—শালা। 'ক'-এর বোনের সঙ্গে

সম্পর্কের ইঙ্গিত-এ গালটি। কবিগান এ-আমরা কবিয়াল এণ্টনীকে বলতে শুনেছি হরে ঠাকুর সিংহের বাপের জামাই (অর্থাৎ ঠাকুর সিংহশালা) বাংলার লোকসাহিত্যে যে, 'তার বোনকে বিয়ে করি ওড় ফুল দিয়ে' বলি সেও শালা সম্পর্কেরই ইঙ্গিত।

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বেশী ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদী গালাগালি মেয়েলী গালাগালি। মেয়েলী গালাগালি বলতে স্নানের ঘাটের মেয়েদের কোন্দলকে শুধু বোঝাচ্ছি না আমি মেয়েদের মুখের যাবতীয় গালাগালিই বলছি। উগ্র পর্যায়ে আমারা পুরুষ নারীর কোন ভেদাভেদ দেখি নি। কিন্তু শান্তিপুরী মেয়েলী রসিকতা এসে আমাদের ইতিহাসকে বিভ্রান্ত করেছে। বাংলায় অশ্লীল গালাগালিকে সাধারণত বলা হয় খিস্তি খেউড়। খেউরকে অনেকে খিস্তির ধন্যাত্মক শব্দদ্বৈত মনে করেন যা হয়ত পুরো ঠিক নয়। বাংলা সাহিত্যের কথায় জানা যায় খেউড় একধরনের গান। যার জন্ম মেয়েলির আদিরসিকতায়। শান্তিপুরের মেয়ে হয়ত শুনে রাগ করবেন যে তাঁরই বৃদ্ধা প্রপিতামহীরাই এর জন্মদাতা সাধারণত বিবাহবাসরে। জামাইঠকান ধাঁধাঁর নামে এ ধরনের রসিকতার বিস্তার ঘটে। গুপ্তকবি বলেছেন শান্তিপুরের ভদ্র যুবকেরাও পরে এই খেউড়কে গ্রহণ করে জনপ্রিয় করেন। ভাবতচন্দ্রের বিদ্যা বলেছেন যে নদে শান্তিপুর থেকে খেড়ু এনে শোনাবে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন মেয়েলী বাসরঘরের অশ্লীল আদিরসিকতার বিস্তার ঘটেছিল কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। দুর্গাপূজার নবমীর দিনে কৃষ্ণচন্দ্র সপরিবারে এই অশ্লীল খেউড়ে রত হতেন কাদামাখামাখিসহ। নবমী খেউড় ও কাদা লড়াইর একসঙ্গে উল্লেখ হুতোমও করেছেন। শান্তিপুরের খেউড় চুঁচুড়ার পথ ধরে কলকাতা এসে নিধুবাবুর তানবহুল আখড়াই টপ্পায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু অশিক্ষিত ও পুরপুরুষের সঙ্গবিহীন পুরাঙ্গনারা আদিরসের এই অশ্লীল খেউড়কে অন্দরমহলেও বরণ করে নিল। বাবু সভ্যতার বীভৎস ব্যভিচারে বিধবা সতীদের বিরহে তখন ঘৃতাহুতি দিল এই খেউড়। সতীদের সম্মিলিত পতিনিন্দায় ভারতচন্দ্রীয় ট্রাডিশনে এই মেয়েলী গালাগালির ছন্দরূপ দেখা যায়। বাংলার মেয়েদের (কুমারী থেকে বিধবা) সম্বল ছিল কেবল বঞ্চনার জ্বালা, এরই মাঝে দৃঢ় ভাবে খেউড় প্রতিষ্ঠিত হল নাগরিক বিকৃতি নিয়ে।

অপরদিকে ডিরোজিও নবব্যঙ্গের কল্যাণে বাবুশিক্ষা মদ্য-মাংস-মেয়েতে নেমে বস্তীর বারাঙ্গনাকে উচ্চাসনে বসাল। বারাঙ্গনা তার সংস্কৃতি নিয়ে ধনী বাবুর বাগানে এসে এক কিম্ভূতমিশ্রিত সংস্কৃতির সৃষ্টি করল। মোটামুটি এই হল বাংলার মেয়েলী গালাগালির পটভূমিকা। মেয়েলী খেউড় আদিরসিকতা গালাগালি বাসর ঘরের ধাঁধা ইত্যাদিতে এমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে যে এ প্রবন্ধে সে সুদীর্ঘ জট খোলা স্থানাভাবে অসম্ভব। যেমন ধরুন, কোন স্ত্রী (বালিকা বধূ) ফুলশয্যার রাতেই স্বামীকে যদি ধাঁধা বলেন কি এমন জিনিস যা পথে ঘাটে সবাইকেই দেওয়া কিন্তু স্বামীকে দেওয়া যায় না। এখন স্বামী যদি মনে মনে ধাঁধার উত্তর চুম্বন ভাবেন তবেই বিপত্তি কিন্তু ঘোমটা ভাবলে কিছুই আপত্তি নেই। বলা বাহুল্য, আদিরসের কল্যাণে ধাঁধার উজ্জ্বল দিকে ভোঁতা বিকৃতিও ঘটেছে স্ত্রীর কোন অঙ্গ স্বামীও দেখতে পায় না এ ধাঁধাটার মূলেই ইচ্ছাকৃত ভুল। কারণ অঙ্গ নয় ওটা হবে অবস্থা—স্ত্রীর বৈধব্য স্বামী দেখতে পান না কিন্তু

আদিরসের ভিয়েনে ধাঁধাটাই বিকৃত হয়ে গেল। এই রসেরই মাত্রা বিশেষের চাপান উতোরে মেয়েলী গালাগালির দুরন্ত ভূমিকা রয়েছে।

মেয়েরা সাধারণতঃ যে ধরণের গালাগালের আশ্রয় নেয় তাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। (১) চরিত্রবাচক (২) রূপ, স্বাস্থবাচক (৩) ভাগ্যবাচক (৪) গুণবাচক (সংকর্মে অকর্মণ্যতায় বলাবাহুল্য) (৫) চরিত্রবাচক গালাগলিগুলো প্রায়ই উগ্রতা স্পর্শ করে, কিন্তু অতিক্রম করে না। স্বভাবজাত ভদ্রতার ফলে মেয়েরা পতিতাপাড়াতেও এ ধরণের গালাগালিতে কিছুটা মুখোস পরিয়ে নেয়। মেয়েরা এক্ষেত্রে মেয়েদের গাল দিতে গিয়ে যতটা উগ্র হয়, পুরুষদের ক্ষেত্রে তা পারে না। এমন কি পুরুষদের এ ধরণের গালাগালি দিতে গেলে নারীচরিত্র জড়াতে হয় বলেই বোধহয় এ আড়ষ্টতা। কিংবা রক্তে-মেশা সংস্কারজনিত কারণে আজও মেয়েদের মনে একই অপরাধ সম্পর্কে নারী অপেক্ষা পুরুষের বিচার নিরপেক্ষতা অনেকটা শিথিল হয়ে যায়। মেয়েরা মেয়েদের চরিত্রবাচক গাল বলতে চরিত্রের ব্যভিচার ইঙ্গিতই করে। নিষিদ্ধ সম্পর্কে অনাচার, পরপুরুষ আসক্তি (এটাই সর্বাধিক ব্যবহৃত), বিধবার বিকৃতি এ ধরণের অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তবে চরিত্রবাচক গালাগালিই মেয়েদের পক্ষে সর্বাধিক উগ্র। নারীর চরিত্রের আরেকটি কুৎসিত দিক কুটনী। একান্নবর্তী সংসারে কোন বধূ 'লাগানি-ভাঙ্গানি' হলেও এ গাল শুনবে আর কুটিলা, বড়ায়ি, প্রভৃতি দূতীবিলাসের নায়িকারাও কুৎসিতের অর্থে এই গালাগালি শুনতে পাবে। জন্ম সম্বন্ধে ইঙ্গিত সহ চরিত্রবাচক গালাগালিগুলো প্রাচীন মনে হয় না। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে এধরণের গালাগালি অর্থহীন ছিল বলে সন্দেহ হয়।

মেয়েলী স্বভাবের সৃষ্টি এই রূপবাচক বা স্বাস্থ্যবাচক গালাগালি। বিভিন্ন ধরণের অভাব (অসত্যও হতে পারে) এখানে ইঙ্গিত করা হয়। যথা, চুলের অভাবে নেড়ী, রূপ (রং) এর অভাবে—মা কালী, মুখশ্রীর অভাবে—বাঁদরী, Comonsense-এর অভাবে—নেকী, স্বাস্থ্যের অভাবে—চিমড়ী। স্বাস্থ্যের দেহগত বিভিন্ন অঙ্গ ইন্দ্রিয় ইত্যাদির অভাবে নাকে খুঁত-খোনা, চোখে খুঁত—ট্যারা, কানা, পায়ে—ল্যংড়া খোড়া, হাতে—নেউলে নুবা, কপালে—উঁচ কপালে, নেই কপালে, ইত্যাদি। খুঁত, অভাবের মত আধিক্যও এ পর্য্যায়ে গড়ে ক-এর উচ্চতায় আধিক্য হলে নিশ্চয়ই সে আমদিগ্‌গী মেয়ে—স্বাস্থ্যগত কতকগুলো অভাবকেই ভাগ্যবাচকও বিবেচনা করেন মেয়েরা যেমন 'ক'-এর সন্তান ধারণে অক্ষমতা বাঁজী (বন্ধ্যা), কাকবন্ধ্যা (একটি সন্তান হলে) ছেলে বা মেয়ে আঁটকুড়ী ইত্যাদি। ভাগ্যবাচক গালাগালির অনেক ক্ষেত্রেই অভিশাপ জড়িয়ে থাকে ভবিষ্যতের জন্য। এটা মেয়েলী গালাগালির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমি যদি সতী হই মার্কা অজস্র গালগাল তার উদাহরণ। আর্থিক, দৈহিক ইত্যাদি ক্ষমতার অভাবজনিত হীনমন্যতা থেকে বেদনার ফসল এই অভিশাপ জাত গালাগালি। বস্তুত এই শ্রেণীর গালাগালিটা কেবল মেয়ে মহলের জন্য সংরক্ষিত। পুরুষদের মধ্যে এর কোন প্রচলন নেই যেমন খুব উগ্র, যৌন ইঙ্গিতময় গালাগালি পতিতাপাড়া ভিন্ন মেয়েমহলে প্রচলিত নয়।

চতুর্থ বা গুণবাচক গালাগালি বলতে আমি মেয়েদের সাংসারিক কাজকর্মে অনৈপুণ্য-জাত (সত্যমিথ্যা যাই হোক) গালগালি বোঝাচ্ছি। সাধারণতঃ এ গালাগালি পারিবারিক। আর

বিশেষতঃ শাশুড়ী পুত্রবধুর ব্যাপার। পুত্রবধুর অজস্র ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি দোষ অপরাধ পাপ শাশুড়ীর চক্ষুশূল। বলাবাহুল্য চর্য্যাপদ থেকে আধুনিকতম সাহিত্যের সর্বত্র এর সাহিত্য সম্পাত উদাহরণ পড়ে রয়েছে। এ গালাগালিতে সাধারণতঃ শাশুড়ীরাই মুখ্য (মৌখিক) ভূমিকা নিয়ে থাকেন— দোষী অথবা নির্দোষী পুত্রবধূ শরৎচন্দ্রের গল্পের মত নীরবতাকে স্বর্ণময় বিবেচনা করেন। এর আরেকটি কারণ অক্ষমতা বা অভাব গালাগালির জন্মদাতা। সৃষ্টিশীল যৌবন আত্মগর্ব্বী—গালাগালি দেওয়ার চেয়ে প্রতিবাদ-কর্ম যে বেশী বিশ্বাসী। দেশ-বিদেশের লোকসাহিত্যে শাশুড়ী পুত্রবধুর এই ঠাণ্ডালড়াই প্রবাদ-মুখর। যুবতী পুত্রবধূ তার আদরের সন্তানকে কোল থেকে কেড়ে একটি আঁচলের গিঁটে বেঁধেছে এই হীনমন্যতা প্রতিযুগের শাশুড়ীর অন্তরে ব্যর্থ-বেদনার সৃষ্টি করে। কিন্তু যৌবনের কাছে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তাই গৃহবধূরা এখানে নীরব সক্রিয়তায় যতই সফল হন— উত্তেজিত শাশুড়ী ততই বেশী গালাগালি দিতে থাকেন। বস্তুত বাঙালী জীবনে একান্নবর্তী সংসারে ভাঙ্গন ধরিয়ে পাশ্চাত্য ফ্লাটধর্মী সংসার বিবর্তনে এ ধরণের গালাগালির এক গভীর ভূমিকা রয়েছে বলে মনে হয়। মেয়েলী গালাগালিকে অন্যদিক দিতে তাই ভাগ করা হলে প্রথম শ্রেণীতেই পড়ে।১) অন্দরমহলের গালাগালি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে বারমহল অর্থাৎ পুকুরঘাটের পরচর্চা।

গালাগালিকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করতে গিয়ে তার শিথিলতা অস্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক। উদাহরণ সহযোগে প্রসঙ্গটি আলোচনা করা যাক। প্রবাদ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। জীবনরসে জারিত এরকম অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণতম ভাষায় প্রকাশ নিঃসন্দেহে এক সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। লোকসাহিত্যবিদরা স্বীকার করেছেন যে সাধারণের মধ্যেও gifted প্রতিভা দেখা যেতে পারে—gifted individuals do arise in peasant communities. খনা ডাক তারই প্রমাণ। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সাধারণ মানুষই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন পথের নিশানা দিতে পারেন।

সার্থক লোকসাহিত্যের এই অঙ্গে গালাগালি দুর্বল কিছুটা। গালাগালি কোন প্রতিভাজাত নয়। প্রতিভাধরেরও বাঁ হাতের সৃষ্টি গালাগাল। জ্ঞানী গুণী সাহিত্যিকও মদখেয়ে যে গালাগালি দিলেন তা তার প্রতিভাজাত নয়—সেখানে তিনি অতি তুচ্ছ সাধারণ মানুষ মাত্র। রাতের তরল অন্ধকারে অ-জ্ঞান মগুপ গালাগালির জন্মদাতা—প্রতিভার স্পর্শ বিহীন সে। মেয়েলী গালাগালির ক্ষেত্রেও কুৎসিত ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রতিহিংসা নারীর সহজাত জীবনবোধকে ম্লান মোড়কে আচ্ছাদিত করে রাখে। দাম্পত্য মিষ্টিগাল এ দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত সাহিত্য পদবাচ্য— কিন্তু তার দৌড়ও কিছুটা, এইটু পরেই দিগভ্রান্ত কুয়াশায় হারিয়ে যায়।

একটি গুরুতর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রবন্ধটি শেষ করছি। বিশেষত উগ্র গালাগালির ক্ষেত্রেও উদাহরণচ্ছলে আমি কোন অসাহিত্যিক অর্থাৎ পূর্বে অমুদ্রিত কোন উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি নি। তথাকথিত শালীনতা যে সাহিত্যের সর্বত্র মোড়ক মেরে থাকবে এটা সর্বথা আকাঙ্ক্ষিত নয়। স্ত্রীরোগের আলোচনা কোন গাইনোকলজীর ডাক্তার যদি 'শ্লীল' ভাবে আলোচনা করতে চান তবে আর যাই হোক তা সত্য হবে না। অন্ত্যজ লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নিস্পৃহ উদারতাই

কাম্য। লোকসাহিত্যের শেষ কথায় জানা যায় মুদ্রিত এমন কি লোকসাহিত্যের লিখিত পুঁথিগুলিও নির্ভেজাল নয়। লিপিকরের চেতনার বশে যেখানে অনেক আকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু উগ্র গালাগালির উদাহরণেও আমি শরৎচন্দ্রের ট্রাডিশন অতিক্রম করতে পারি নি। কখনও সেই দুঃসাহসী অপচেষ্টা প্রশংসিত হবে না। কিন্তু লোকসাহিত্য সর্বাগ্রে সাহিত্য নয়। অথচ শরৎচন্দ্রের প্রতিটি লেখা-শব্দ সর্বাগ্রেই সাহিত্য। যাহা ঘটে তাহা সত্য নহে সাহিত্যে বরং সেই সত্য যা রচিবে তুমি এ তবে তাঁরা সাহিত্যের সকালে বাস্তবতার অনেক গ্লানিকে হোয়াইট ওয়াশ করে তবে পাঠকের পাতে পরিবেশন করেন। বলা বাহুল্য এতে সাহিত্য হতে পারে কিন্তু শরৎ সাহিত্যকে কেউ কোন দিনই লোকসাহিত্যের দর্পণ বলে ভুল করবেন না। আমি অন্যান্য বহুজনের মত লোকসাহিত্যের উৎসাহী পাঠক। অভিষ্টতার ফলে অনালোচিত দিকটি আমি ইঙ্গিত করতে পারি মাত্র trained invcstigator-এর স্বভাবধর্ম অনুযায়ী কাঁচা (raw) লোকসাহিত্যের সন্ধান করা আমার কর্ম নয়। উপরন্তু এহেন সেনসিটিভ বিষয়বস্তুতে সুদক্ষ হাতে নাড়াচাড়া না হলে গালাগালির বিশ্লেষণ 'অশ্লীল' হয়ে পড়তে পারে। আগামী কোন অনুসন্ধানী গবেষক প্রসঙ্গটি সুদীর্ঘ আলোচনা করলে আগ্রহী পাঠক নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হবেন।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

রত্নদাস বণিক (মৃণা : ৪।১১) ॥

মৃণালিনীর সংগে "সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।"

রত্নময়ী (মৃণা : ৩।১) ॥

রত্নময়ী এক পাটনীর কন্যা। নবদ্বীপে এঁদের গৃহেই গিরিজায়া এবং মৃণালিনী আশ্রয়গ্রহণ করে। তখন বিশেষভাবে গিরিজায়ার সংগেই রত্নময়ীর সখীত্ব জন্মে। রত্নময়ীর কথাবার্তায় বেশ রসের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রের নতুন রাজ্যেও রত্নময়ী স্থান পেয়েছিল। এক সম্পন্ন পাটনীকে বিয়ে করে সেখানেও গিরিজায়ার সংগে সখীভাবে দিন কাটাতে লাগাল।

রমণবাবু (ইন্দিরা ৭ম পরি :) ॥

সুভাষিনীর স্বামী রমণবাবু উকীল। উকীলের মতই তিনি কৌশলের সংগে মিলিত করেছেন ইন্দিরা ও উপেন্দ্রকে। উকীলের মতই তিনি সহিকরা কাগজে ইন্দিরার সবকথা লিখে দিয়েছিলেন যথাসময়ে খোলবার জন্যে, কারণ তাতে সকলের বিশ্বাস জন্মাবে। রমণবাবু স্ত্রীকে পরামর্শ দেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। স্ত্রীর মত স্বামীও কম রসিক নন।

রমা (সীতা : ১।৮) ॥

সীতারামের কনিষ্ঠা স্ত্রী রমা দুর্বলচিত্ত এবং বাতিকগ্রস্ত হলেও তার চরিত্রমাধুর্যও নিতান্ত কম নয়। রমাও সুন্দরী। তার রূপের মধ্যেও যেমন একটা কোমলতা আছে, তেমনি "জলে ধোয়া যুঁইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি।" তার বয়সও নিতান্ত অল্প। এই সংসার—অনভিজ্ঞতা ও বালিকাসুলভ মনোবৃত্তির জন্যই রমার সর্বনাশ হয়েছে।

রমার সঙ্গে 'দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের সাগর বৌয়ের তুলনা করা চলে। কিন্তু সাগরবৌ বালিকা ও চপলা হলেও স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা বর্তমান রেখে সে নিজের খেয়ালেই চলে। রমা কিন্তু স্বামীর উপর আস্থা রাখতে না পেরে স্বামীর অনুপস্থিতিতে গঙ্গারামকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করেছে।

রমার সীতারামের প্রতি ভয়ের কারণ তার শক্তিমত্তা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ সে মা। তার পুত্রের মঙ্গলকামনাই তাতে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

গঙ্গারামের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তায় যে কোন অপরাধ আছে, একথা রমার মনে উদয়ই হয়নি। কিন্তু মুরালার কথায় যখন সে নিজের অপরাধ বুঝতে পেরেছে, তখন সে আঘাতে ম্রিয়মাণ হয়েছে।

এই আঘাতের ফলেই রমার মধ্যে জেগে উঠেছে পৌরুষের ভাব! সে রাজসভায় মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের কথা বলতে ভয় পায়নি। রমার যে গঙ্গারামের প্রতি কোন আসক্তিই ছিল না, এমনকি গঙ্গারামকে সে ভ্রাতা সম্বোধনই করেছে, এ সত্য বঙ্কিমে স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই যখন এই নিরপরাধিনী নারীকে রাজসভায় দাঁড়াতে দেখি, তখন সীতার অপমানের মতই আমাদের হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

রমা জনসাধারণের হাত থেকে নিস্কৃতি পেলেও, স্বামীর কাছে অপরাধ স্বীকার করবার কোন সুযোগই পায়নি। সীতারাম তখন শ্রীর জন্য উন্মাদ। এখানে স্বামীর প্রতি রমার সূক্ষ্ম অভিমানও প্রকাশ পেয়েছে। তাই ঔষধপত্র ফেলে দিয়ে রমা আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করেছে।

রমার চরিত্রে মাতৃত্ব এবং স্বামীভক্তি দুটিই শেষপর্যন্ত প্রধানলাভ করেছে। তাই মৃত্যুকালে সে যেমন স্বামীকে অনুরোধ করেছে—"মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা।" তেমনি সীতারামকে বলেছে—" এ জন্মের মত বিদায় হইলাম। আশীর্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।"

রহমত মোল্লা (বিষঃ ১ম পরিঃ) ॥

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রথমে নগেন্দ্রের নৌকাপথে কলিকাতা যাত্রার কালে রহমত মোল্লা ছিল মাঝি। এই অনভিজ্ঞ মাঝির বাগাড়ম্বর চরিত্রটিকে অল্প অবকাশেই জীবন্ত করে তুলেছে।

রহিম সেখ (দুর্গেঃ ১।১৮) ॥

কতলুখাঁর সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক। ওসমান রাত্রির অন্ধকারে যখন গড়মান্দারণ দুর্গ অধিকার করার জন্য বিমলার হাত থেকে দুর্গের চাবি গ্রহণ করলেন, তখন ছাদে বন্দিনী বিমলাকে লক্ষ্য রাখার জন্য এই রহিম সেখকে ভার দিয়ে যান। কিন্তু রহিম সেখ বিমলার কটাক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে অবশেষে তাকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে। এই উপন্যাসে রহিম সেখের সাহসিকতা অপেক্ষা বোকামীই বেশি প্রকাশিত হয়েছে।

রাজচন্দ্র দাস (রজনী ২।২) ॥

রাজচন্দ্র দাস রজনীর মেসো। তিনি রজনীকে বাল্যকাল থেকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন। রাজচন্দ্রের রজনীর প্রতি যথার্থ পিতৃস্নেহ ছিল। তবে শেষের দিকে তাকে কিঞ্চিৎ অর্থলোভাতুররূপে অঙ্কন করা হয়েছে।

রাজসিংহ (রাজঃ ১।২) ॥

রাজসিংহ ঐতিহাসিক চরিত্র। তাঁর নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ। কিন্তু তিনি যে নায়ক বলেই তাঁর নামে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে তা নয়, বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য বিষয় যে হিন্দুর বাহুবলের

প্রতিষ্ঠা তা রাজসিংহকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত বলে আদর্শ হিসাবে তাঁর নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহকে এককভাবে নায়ক বলতে রাজী হন নি। তাঁর মতে—"ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরঙ্গজেব রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ।" একথা সত্য যে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে কাহিনীর ঘনঘটায় কখন কখন রাজসিংহকে গৌণ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম সমস্ত ঘটার কেন্দ্রে রাজসিংহের প্রভাব অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

রাজসিংহ রাজপুত বীর তাঁর চরিত্রে বীরত্ব, মহত্ব এবং রণকৌশলের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এগুলি তাঁর ইতিহাস-সম্মত গুণাবলী। তিনি দেশপ্রেমিক। পরাধীনতার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ঘৃণা। কিন্তু এ সবের চেয়ে বঙ্কিম যেখানে স্বীয় কল্পনা দ্বারা রাজসিংহের চরিত্রে নূতন ঘটনার সংযোগসাধন করেছেন, সেখানেই চরিত্রটি সজীব হয়ে উঠেছে।

চঞ্চলকুমারীর বিপদে রাজসিংহের রূপনগর যাত্রার পিছনে তাঁর বীরত্বের অভিমান, শরণাগতের প্রতি কর্তব্যপালন প্রভৃতি মনোভাব রয়েছে। বয়সে তিনি প্রৌঢ়। তাই নূতন নারীর প্রতি আকর্ষণ তার পক্ষে অনিবার্য নয়। কিন্তু মবারকের সামনে দাঁড়িয়ে যখন তিনি চঞ্চলকুমারীর অলৌকিক রূপদর্শন করলেন, তখন সৌন্দর্যের কাছে তাঁকে মাথা নত করতে হল।

তারপর রাজসিংহের হৃদয়ে ধীরে ধীরে চঞ্চলকুমারীর স্মৃতি জাগরূক হলেও রাজোচিত মহিমায় এবং বয়সোচিত গাম্ভীর্যে তিনি তা দমন করেছেন। চঞ্চলকুমারীর মন পরীক্ষা তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় দেয়। চঞ্চলকুমারীর পিতার অমতে বিবাহ করতে সম্মত না হওয়ায় অনেকে হয়ত রাজসিংহকে কাপুরুষ বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে রাজসিংহ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যক্তিগত ভাবে ও রাজনৈতিক দিক থেকে সঙ্গত। তখনি চঞ্চলকে বিবাহ করলে তার পক্ষে পিতা-মাতার অভিশাপ যেমন সুখকর হত না, তেমনি বিক্রমসেলঙ্কির বিরুদ্ধতার দ্বারা ঘরে বাইরে শত্রু সৃষ্টি করাও সমীচীন হত না।

চঞ্চলকুমারী ও রাজসিংহের মিলনে যে রোমান্সের গন্ধ ছিল বঙ্কিম তা সমূলে বিনাশ করে ভালই করেছেন। প্রৌঢ় রাজসিংহের প্রেমে চাপাল্য দেখালে তাঁর চরিত্রমহিমা ক্ষুণ্ন হত। চঞ্চল কুমারী সংক্রান্ত ঘটনা ছাড়া রাজসিংহের সাংসারিক জীবনের আর কোন উল্লেখ না থাকায়, চরিত্রটি আংশিক প্রকাশিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা করতে গেলে ঘটনার ঐতিহাসিক তৎপরতা বিনষ্ট হয়ে যেত।

রাজসিংহের অন্যান্য গুণের মধ্যে দয়ার্দ্রচিত্ততা ও কৃতজ্ঞতাবোধ অন্যতম। ডাকাত মাণিকলালকে তিনি যেন দয়াপরবশ হয়ে রক্ষা করেছেন, তেমনি তাঁর কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে জেব উন্নিসাদান তাঁর সম্মতিক্রমেই সম্ভব হয়েছিল।

যুদ্ধে ছলে বলে শত্রুকে পরাস্ত করা নীতি হলেও ক্ষুধার্ত ঔরঙ্গজেব ও তাঁর সৈন্যদের মুক্তিদিতে তিনি দ্বিধা করেননি।

ঔরঙ্গজেবের পাশে রাজসিংহ চরিত্রবলে হিমালয়ের মতই মহান ও গগনস্পর্শী।

সমালোচনা

বহুরূপী গান্ধী ॥ অনু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী ॥

গান্ধী শতবার্ষিকীর অব্যবহিত পূর্বে "বহুরূপী গান্ধী" প্রকাশ করে রূপা কোম্পানী একটি মূল্যবান প্রয়োজন মেটাবর প্রয়াস করেছেন। মাত্র এক দশক আগেও গান্ধীজী সম্পর্কিত পুস্তকের অভাব ছিল না বাজারে। গান্ধী-জীবনী সম্পর্কিত ছবির এ্যালবামও প্রচুর বিক্রী হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছুদিন পর্যন্ত স্কুল পাঠ্য পুস্তক হিসাবেও গান্ধী-চরিত পড়ানো হত। তারপর ধীরে ধীরে মহাত্মা পরিণত হলেন দেবতায়। কালী, যিশু, রামকৃষ্ণের পাশাপাশি তাঁর ছবিও ধূলিমলিন গৃহকোণে স্থানলাভ করল। অর্থাৎ হারিয়ে গেলেন তিনি। এখন আর তিনি জাগ্রত স্মৃতি নন, চলমান শক্তিও নন। সৌখিন আদর্শ মাত্র। শুধু যে সশস্ত্র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলা দেশে এমনটি ঘটেছে তা নয়। গুজরাটে সবরমতি আশ্রম ও পোরবন্দরে গান্ধী মিউজিয়মেও স্বচক্ষে গতবছর দেখে এসেছি, গান্ধী-স্মৃতি এখন মিউজিয়মের বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কোথাও প্রাণের কোন অস্তিত্ব আর নেই। এহেন পরিস্থিতিতে গান্ধীজীকে দেবত্ব থেকে টেনে নামিয়ে একান্ত কাছের মানুষ হিসাবে দেখাবার এই চেষ্টার প্রয়োজন ছিল।

লেখিকা নিজে গঠনকর্মী। ভূমিকায়, বলেছেন, 'বছর তিনেক গ্রামে কাজ করার সময় আমি লক্ষ্য করেছিলুম যে, আমার সঙ্গিনী শিক্ষার্থিনী ও গ্রামবাসীরা গান্ধীজীর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না। অথচ তারা গান্ধী-জয়ন্তী পালন করত, প্রতিদিন চরকা কাটত, প্রার্থনা করত। তাদের মধ্যে কেউবা স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাগ নিয়ে কয়েদ ভোগ করে এসেছিল, তবু জাতীয় জীবনে গান্ধীজীর প্রকৃত দান কি তা তারা জানত না।"

শুধু শিক্ষার্থিনী ও গ্রামবাসীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। গান্ধীজীকে না বুঝলেও তাঁর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার অভাব তাদের মধ্যে ছিল না। কোন ভণ্ডামীকে তাঁরা প্রশ্রয় দেননি। বয়োজ্যেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কেরা কি গান্ধীতত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত? গান্ধী-শতবার্ষিকীর ঠিক পূর্বে কোন কোন রাজ্যে খাদি বোর্ডের বিলুপ্তি কিসের লক্ষণ? মদ্যপান নিরোধ আইন কেন আজ সারা ভারত থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে?

এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে রেখে রচিত। রাজনৈতিক দর্শন প্রচার বা গান্ধী শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্গত কোন মন্ত্রীকে খুসী করার কোন চেষ্টা নেই। গান্ধীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা বলা হয়েছে অথচ কোথাও কোন নেতার নামোল্লেখ নেই। নেহরুজী ভূমিকা লিখেছেন। কিন্তু গ্রন্থের ভিতরে তিনি অনুপ্রস্থিত। খান আবদুল গফুর খান ও বল্লভভাই প্যাটেলের যে দুটি স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও তাঁরা অকিঞ্চিৎকর। এই যে সংযম, গান্ধী-জীবনী রচনার অজুহাতে সমকালীন রাজনৈতিক নেতাদের স্তুতিগানে এই যে অনীহা, এটি আদর্শ স্থানীয়।

একদিকে স্বচ্ছবিজ্ঞান-দৃষ্টি, অন্যদিকে মানবতাবোধ,—গান্ধীজীর জীবনে বারবার এ দুইয়ের সংঘাত ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে মানবতাবোধ। সেবাগ্রামে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিলে তিনি প্রাকৃতিক চিকিৎসার উপর নির্ভর করে বসে থাকেন নি। এ্যালোপ্যাথিক ইনজেকসন নিতে আশ্রমবাসীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তাঁর খাদি-প্রচার, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, অহিংসা বা রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কিত আলোচনা আরও অনেকে করেছেন। অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত বিষয় হল 'সৌখিন সাপুড়ে'। গান্ধীর নানা বাতিকের মধ্যে একটা বাতিক ছিল সাপ মারা হবেনা। তিনি যে পরম বৈষ্ণব বংশের সন্তান, অহিংসায় বিশ্বাসী। প্লেগ রোগের মড়কের সময় রোগবাহী ইঁদুর আর বীজাণু ধ্বংস করার পরামর্শও দিয়েছিলন। কিন্তু সাপমারার সমর্থক ছিলেন না। সমস্যা হল, কোন্‌টি বিষধর ও কোন্‌টি নির্বিষ তা জানা যাবে কি করে? জার্মান বন্ধু কলেনবাক তখন আশ্রমবাসী। তিনি উঠে পড়ে লাগলেন তাঁকে সর্পতত্ত্ব শেখাতে। গুরুগম্ভীর সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকাকালেও তাঁর মনে সর্পতত্ত্ব জানার সখ চির জাগরূক ছিল। তিনি অহিংসা ও নির্ভিকতার এমন স্তরে উঠতে চাইতেন যাতে তাঁর স্পর্শ থেকে সাপ বুঝতে পারবে যে তিনি তাকে আঘাত করতে চান না। মুখে রামনাম উচ্চারণ করতে করতে সাপের মুখে হাত দিতে পারা তিনি খুব বাহাদুরী বলে মনে করতেন অবশ্য। সে সাহস তাঁর কোনদিনই হয় নি বলে গান্ধীজী লজ্জা পেতেন।

এবার সামান্য কিছু ত্রুটীর কথা উল্লেখ করি। বইটির ইংরাজী সংস্করণ প্রথম বোম্বাইয়ের পপুলার প্রকাশন প্রকাশ করেন। বাংলা সংস্করণটি তারই অনুবাদ। কিন্তু গ্রন্থপাঠ কালে প্রায়ই মনে হয়েছে, হিন্দী থেকে অনূদিত। লেখিকা বাঙ্গালী, অনুবাদ দেখে তিনি খাঁটী বঙ্গদেশবাসী কিনা সন্দেহ জাগে। কিছু কিছু হিন্দী শব্দ অকারণে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। "প্রতি রবিবারে ছুটির দিনে তাঁর বাড়ীতে **খাই খেলাই** হত" "আইনজীবীর পেশা যে মিথ্যেবাদীর **ধান্ধা** নয় তা প্রমাণ করার জন্য……"

"দক্ষিণ আফ্রিকার যে আদালতে তিনি **দশ সাল** সসম্মানে ব্যারিষ্টারী করছিলেন…"

"আইনত পসার করায় **হক** বাতিল হয়ে গিছল।" কিন্তু আমাদের সর্বাধিক আপত্তি বইটির নাম করণে। বহুরূপী শব্দটির আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন, সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। রাজনীতিবিদদের বহুরূপী বলে গালাগালি করার উদাহরণও বড় কম গান্ধীজীকে বহুরূপী বললে তাঁর ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ ঘনীভূত হবে। আর একটি কথা, নয়। মূল ইংরেজী বইয়ের একস্থানে তাঁর ডান ও বাঁ হাতের হস্তলিপির নমুনা ছাপা আছে। বাংলা বইয়েও সেটি ছাপা চলত।

চণ্ডী লাহিড়ী

Regd No.C-315 Phone : 23-5155 November'68 (0·50) Central Regd.No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ষোড়শ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার

সত্ত প্রকাশিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে সে জেলার যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ষোলটি বিস্তৃত অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়:

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য; ইতিহাস; জনসমাজ; কৃষি ও সেচ; শিল্প; ব্যাঙ্কিং; ব্যবসায় ও বাণিজ্য; যোগাযোগ ব্যবস্থা; অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি; প্রশাসন; রাজস্ববিধি; আইন-শৃঙ্খলা ও বিচার; স্বায়ত্তশাসন; শিক্ষা ও সংস্কৃতি; চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য; জনজীবন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং দর্শনীয় স্থানসমূহ।

কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মূল্যবান রচনা, আঠারটি আর্টপ্লেট ও এগারটি ম্যাপ এ বইয়ের গৌরব। বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট সম্বলিত এই প্রামাণিক পুস্তক যে-কোন বিদ্যোৎসাহীর পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২৪; মূল্য ২৫ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস

৩৮, গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা-২৭

॥ পুস্তক ব্যবসায়ীরা ১৫% কমিশন পাবেন ॥

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ২২৪২০/৬৮

ইউকো ব্যাঙ্ক
সেভিংস
ব্যাঙ্ক
এ্যাকাউণ্ট খুলুন
আপনার
প্রিয়জনের
জন্যে।
এটি এমন একটি উপহার
যা বেড়েই চলে
দি
ইউনাইটেড
কমার্সিয়াল
ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস—কলিক

বিদগ্ধ দায়িত্ব ...

একটি ভাল উপন্যাস বা গল্প
আপনাকে সহজেই
আগ্রহান্বিত করে, একটি
ভাল কবিতা মুহূর্তেই
আপনাকে অনুপ্রাণিত করে,
কিন্তু একটি প্রবন্ধ ?
তার দায়িত্ব অনেক বেশী।
আপনার বিদগ্ধ মনকে
সে ধীরে ধীরে
প্রভাবান্বিত করে, তাকে
বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে উত্তরণ করে'
বিদগ্ধতর করে তোলে।
সাময়িকতায় সে বিশ্বাসী নয়,
চিরন্তনতাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

গল্প কবিতা বা উপন্যাস নয়,
বিদগ্ধ ও মননশীল প্রবন্ধাবলী
যদি আপনাকে
আকর্ষণ করে তাহলে
প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা
স ম কা লী ন
আপনার অবশ্য পাঠ্য।

ষোড়শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা   অগ্রহায়ণ তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

অগ্রহায়ণ
তেরশ' পঁচাত্তর

ষোড়শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি : ভারতের রাজস্ব ব্যয়

মুরারি ঘোষ

"বিশ্বের অন্য অংশে সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংরেজ কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করেছে, কিন্তু ভারতে যে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে, প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে তার জন্য ইংরেজদের একটি শিলিংও ব্যয় হয়নি। যে বাণিজ্য সংস্থা ভারতের রাজস্বভাণ্ডার অপহরণ করে কয়েক যুগ ধরে নিজেদের লাভ এবং লভ্যাংশ মিটিয়েছে, ১৮৩৪ সন থেকে তার বাণিজ্য অধিকার না থাকলেও ভারতের মানুষের দেয় কর থেকে সেই সংস্থার অংশীদারদের লভ্যাংশ যোগানো হয়েছে।"

ভারতের আর্থিক ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে রমেশচন্দ্র এই বক্তব্য রেখেছেন। রমেশচন্দ্রের এই বক্তব্য থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতের কর ব্যবস্থা, রাজস্বভাণ্ডার ও সরকারী ব্যয়নীতির যথাযথ সমালোচনা প্রকাশ পাচ্ছে। কোম্পানীর শাসনকাল কেটে গেলেও (১৮৫৮) ইংরেজ পার্লামেণ্টের শাসনে সরকারী ব্যয়নীতির অরাজকতা ও যথেচ্ছাচারিতা কেটে যায়নি। কেননা "আঠারো শো আঠান্নোর কোম্পানীর অস্তিত্ব যখন বিলুপ্ত হয় কোম্পানীর অংশীদারদের সংভার অর্থ (share money) ঋণ তুলে মিটিয়ে 'ভারতীয় ঋণের' তহবিল ভারী করা হয়। কোম্পানীর হাত থেকে সাম্রাজ্য হস্তান্তরিত হল মহারাণীর হাতে, কিন্তু ক্রয় মূল্য বহন করতে বাধ্য হল ভারতের মানুষ। যেহেতু ঐ ঋণ এখনো শোধ হয় নি—ঐ ঋণের সুদ হিসেবেই ভারতের মানুষ এক মৃত সংস্থার বাণিজ্যিক লভ্যাংশ দিয়ে চলেছে" (ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস—২য় খণ্ড - পৃ ৩৯৯)।

সিপাই যুদ্ধের আগে ও পরে ভারতীয় রাজস্বের ব্যয়নীতির (Public Expenditure) দুটো উল্লেখযোগ্য যুগের চিত্র রমেশচন্দ্র তুলে ধরেছেন। রমেচন্দ্রের এই বিশ্লেষণ থেকে ভারতীয়

রাজস্ব ভাণ্ডার ও সরকারী ব্যয় নীতির স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

ভারতীয় রাজস্ব ভাণ্ডার ও যুদ্ধ ব্যয়

সিপাই যুদ্ধের আগে পর্যন্ত কোম্পানীর শাসনে ভারতের রাজস্ব ভাণ্ডারে বাড়তি কিছু থাকে নি। ১৭৯২-৯৩ থেকে ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত বছরগুলির মধ্যে ২৯টি ঘাটতি, ৩৮টি বাড়তি আয়ের বছর। সরকারী বাজেট অনুসারে ঐকালে এভাবে বছরের হিসেবও প্রায় নিরর্থক। কেননা ৩৮টি বাড়তি আয়ের বছরেও দেশের সাধারণ সম্পদ বাড়েনি—রাজস্ব থেকে বাড়তি আয় দেশের আর্থিক উদ্যোগে নিয়োজিত হয়নি। প্রতি বছর গড়ে তিন কোটি টাকার অর্থসম্পদ রাজস্ব তহবিল শূন্য করে ইংলণ্ডে (হোম চার্জ বাবদ) চালান হয়েছে। কোম্পানীর রাজত্বের শেষ বছরে ভারতের ঘাড়ে চাপানো অনুৎপাদক ঋণের বোঝা ৭০ কোটি টাকার মত (৬৯৪৭৩৪৮৪ পাউণ্ড)। এর মধ্যে রয়েছে ভারতের বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের দরুণ যুদ্ধ ব্যয় জনিত ঋণ—ঐ ঋণের পরিমাণ ৫২.৫ কোটি টাকার মত। সিংহল, মলাক্কা, সিংগাপুর, আইল অব ফ্রান্স, কেপ কলোনী, মিশর, জাভা, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, আফগানিস্তান, পারস্য ও চীন দেশে ক্রমান্বয়ে সৈন্য প্রেরণ ও যুদ্ধ ব্যয়ের দায় ভারতের করদাতাদের ওপর চাপানো হয়েছে। এ ছাড়াও কোম্পানীর আমলে পলাশীর পর ভারতের মাটিতে ১৫টি বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এতে রক্ত ঝরেছে ভারতের মানুষের, সম্পদ নষ্ট হয়েছে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও করদাতার, ভারতের পক্ষে অনর্থক, ক্ষতিকর ও বিধ্বংসী যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় বহন করেছে ভারতের রাজস্বভাণ্ডার। ভাণ্ডারে টান পড়লে ভারতীয় ঋণের বোঝা বাড়িয়ে সমগ্র হিন্দুস্থানকে ক্রম-নিঃস্বতার পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

কোম্পানীর হাত থেকে পার্লামেণ্টের শাসনে এল ভারতবর্ষ। সিপাই বিদ্রোহের অজস্র রক্তক্ষয়ের সমস্ত ব্যয় চাপলো দুর্বল ভারতের কাঁধে। '৫৬-'৫৭ সালে যে ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি টাকার (৫৯৪৬১৯৬৯ পাউণ্ড) মত ছিল, '৫৯-'৬০ সালে তার পরিমাণ ৯৮ কোটি টাকা। ভারতীয় বিদ্রোহ দমনের ব্যয়, ভারত সাম্রাজ্য হস্তান্তর দরুণ কোম্পানীকে দেয় ৫৫.৮ কোটি টাকা—এ সবের কারণে ভারতের রাজস্ব-ভাণ্ডার লুটতরাজ করেও ভারতীয় ঋণের বোঝা বাড়ানো হল। 'পরের যুগেও ভারতের বাইরে সেনা প্রেরণের' ব্যয় হিন্দুস্থানের করদাতাদের বহন করতে হয়েছে। ভুটান যুদ্ধ (১৮৬০), আবিসিনিয়া অভিযান (১৮৬৭), পেরাক অভিযান (১৮৭৫), আফগান যুদ্ধ (১৮৭৯-৮১) মিশর অভিযান (১৮৮২) ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮৮৬)—এ সব যুদ্ধাভিযানের দরুণ অনর্থক ৯০ কোটি টাকার ব্যয় ভারতের ওপর চেপেছে। ঋণের বোঝা ভারী হয়েছে অসম্ভব হারে। ৫৬-৫৭ সালে ঋণের যে পরিমাণ ছিল তা চারগুণ হয়ে চাপলো ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে—পরিমাণ প্রায় ২২৭ কোটি টাকার (২২৬, ২৩২, ১০৫ পাউণ্ড) ওপর। অবশ্য এই সংখ্যার মধ্যে রেলপথ ও সেচ কার্যের দরুণ উন্নয়নমূলক কাজের অজুহাতেও ঋণ চাপানো আছে।

ইংরেজ করতত্ত্ব ও সরকারী ব্যয়নীতি

ইংরেজ অর্থনীতি শাস্ত্রের গুরু অ্যাডাম স্মিথ লিখেছিলেন: "সরকারী প্রশাসন পরিচালনার

দরুণ প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রজা সম্প্রদায়কে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। অন্তত সেই পরিমাণে সামর্থ অনুযায়ী ত্যাগ স্বীকার বাঞ্ছনীয় যে পরিমাণ রাজস্বের অংশ ভাগ রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁরা উপভোগ করার সুযোগ পান" (ওয়েলথ্ অব নেশনস্ ॥ ২য় ভাগ ॥ পা-৩১০)।

স্মিথ দক্ষতার সংগে তাঁর করতত্ত্বে (Theory of taxation) কর সম্বন্ধীয় প্রধান প্রত্যয় দুটির হিতসাধন (Benefit theory) ও সামর্থ্য (Ability to pay) তত্ত্বের একত্র যোগাযোগ ঘটাতে পেরেছেন। স্মিথের পরেও ধনবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ সামর্থ্য তত্ত্বের, কেউ কেউ হিতসাধন তত্ত্বের সমর্থক। কিন্তু স্মিথের বক্তব্যের বাইরে কিংবা বিরোধি কোনো বক্তব্য এ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়নি। প্রশাসনের দায়িত্ব এবং প্রজার দায়িত্ব দুপক্ষের করণীয়ই স্মিথের বক্তব্যে সমীকৃত।

অ্যাডাম স্মিথ কিংবা ষ্টুয়ার্ট মিলকে সজ্ঞানে অনুসরণ নয় ইংলণ্ডের করবিন্যাস এবং সরকারী ব্যয়নীতি (Public Expenditure) উনিশশতক থেকেই স্বদেশীয় আর্থিক উন্নয়নের অনুকূলে। সরকারী ব্যয়নীতির এমন কয়েকটা দিক ছিল যেটা আপাত দৃষ্টিতে শুধুই হিতকর নয় দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যাপকতর আর্থিক ক্রিয়াকলাপের অনুসঙ্গী। সরকারী ব্যয় বিন্যাসে ও স্থানীয় পৌরশাসন সংক্রান্ত ব্যয়ে পথ নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য, গণ আর্থিক সাহায্য (Poor relief) অপর্যাপ্ত ছিল না। ফলে, করনীতি ও সরকারী ব্যয় নীতির মৌল দায়িত্ব দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করে যার ফলে অতিরিক্ত বিনিয়োগ যোগ্য সম্পদ বা মূলধনের সৃষ্টি হতে পারে যাতে লক্ষ্যণীয় ভাবে নানাবিধ আর্থিক উদ্যোগের প্রসার, ব্যবসা বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও কর্ম সংস্থার বৃদ্ধি ঘটে। পথ নির্মাণ ও জন স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় সামাজিক সম্পদ (Social Overhead Capital) সৃষ্টির প্রাথমিক ধাপ—উন্নত ও ব্যাপকতর আর্থিক ক্রিয়াকলাপের অনুকূল।

এ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র তার স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পেরেছেন। ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে সরকারী ব্যবস্থার তুলনা এনে ব্রিটিশযুগের অযৌক্তিক ও ধ্বংসাত্মক নীতির ছবি তুলে ধরেছেন :

'প্রতি জাতির লোক আশা করে যে দেশে সংগৃহীত কর দেশের কাজেই ব্যবহৃত হবে। পূর্বে, ভারতে সবচেয়ে ক্ষতিকর রাষ্ট্রীয় শাসনেও এই নীতি প্রচলিত ছিল। পাঠান ও মোগল সম্রাটদের সুবিপুল ব্যয়ে লালিত সেনাবাহিনী যেমন রাজকীয় আড়ম্বর রক্ষা করতো তেমনি তাদের প্রাপ্ত বেতনে হাজার হাজার সৈনিক পুরুষ ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হোত। রাজপ্রাসাদ ও স্মৃতি সৌধ নির্মাণে, বিলাস-ব্যসন জনিত ব্যয় বাহুল্যে ভারতের কারিগর, বাস্তুকার ও কারুবিদদের ভরণপোষণ সম্ভব হোত। রাজ-অমাত্য, সেনাধ্যক্ষ, দেওয়ান, সুবেদার, কাজী প্রমুখ রাজ-প্রতিনিধিরা এবং প্রদেশ ও জেলার প্রতিটি ছোট বড় রাজকর্মচারী অনুরূপ আচরণে অভ্যস্ত ছিল এবং মন্দির, মসজিদ, পথঘাট ও খাল বিল, পুষ্করিণী নির্মাণে তাদের ঔদার্য ও রাজকীয় আড়ম্বড়প্রিয়তা সুফল দিত। শাসক মূর্খ কি বিচক্ষণ যাই হোন না কেন রাজস্ব ব্যয়ের অংশ প্রজার তহবিলে গিয়েই পৌছোত—দেশের শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হোত (মুখ বন্ধ : ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস—১ম খণ্ড)

হিন্দুস্থানের রাজস্ব ও কোম্পানীর মূলধন

ব্রিটিশ যুগে হিন্দুস্থানের রাজস্বভাণ্ডারের দুর্গতির স্বরূপ প্রতি বছরের হিসেবে রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন, কেমন ভাবে সরকারী কর ব্যবস্থা ও রাজস্ব ব্যয় নীতি ভারতকে ক্রমদুর্দশার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর (১৭৬৫) থেকে প্রথম ছয় বছরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগল বাদশার প্রাপ্য মিটিয়ে রাজস্বভাণ্ডারের তথাকথিত এক তৃতীয়াংশ রপ্তানীযোগ্য পণ্যক্রয়ের মূলধন হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। রাজস্বের কোন অংশই দেশের প্রয়োজনে হিন্দুস্থানের সম্পদ বৃদ্ধির অনুকূলে ব্যবহৃত হয়নি।

রাজস্ব মোটামুটি সেসময়ে তিন ভাগে ব্যয়িত হয়েছে—(১) মোগল বাদশাকে দেয় কর, (২) প্রশাসনিক ও সামরিক খাতে ব্যয় ও (৩) বাণিজ্যের মূলধন। পরে অবশ্য এ কাঠামোর কিছু পরিবর্তন হয়েছিল—মূলধনের বদলে 'হোমচার্জ' জনিত ব্যয় স্থান পেয়েছে। রাজস্ব থেকে শাসক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যের মূলধন সংগ্রহ পৃথিবীর রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসে এক অভাবিত ঘটনা। এই ধরণের ব্যাপারে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক ভেরেল্‌ষ্টের বিবেকও ধরাশায়ী হয়েছিল। পরের যুগে "বার্ক" রচিত বিখ্যাত "নবম-প্রতিবেদন" (১৭৮৩ খৃঃ) থেকেও উদ্ধৃতি দিয়ে রমেশচন্দ্র ইংরেজ কোম্পানীর হঠকারিতার মুখোস খুলে দিতে পেরেছিলেন। দেওয়ানী লাভের প্রথম ছ'বছরে রাজস্ববাবদ কোম্পানীর প্রাপ্য ছিল ১৩,০৬,৬৭,৬১০ টাকা। প্রশাসনিক খরচ বাদ দিয়ে এর থেকে কোম্পানীর ভাণ্ডারে বাণিজ্যিক মূলধন এল ৪,০৩,৭১,৫২০ টাকা। এমন কি 'বার্কের' 'প্রতি বেদনের' তিন দশক পরেও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট থেকে কোম্পানীর আর্থিক নীতির সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। পার্লামেণ্টে আনীত এক প্রস্তাবে বলা হচ্ছে : "...the whole or part of any surplus that may remain of the rents, revenues and profits, after providing for the several appropriations, and defraying the several changes before mentioned, shall be applied to the provision of the company's investments in India, in, remittance to china for the provision of investments there, or towards the liquidation of the debts in India. or such other purposes as the court of directors, with approbation of the board of commissioners, shall from time to time direct."

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কে, টি, শাহ এক হিসেব দিয়ে প্রকাশ করেছেন ('সিক্সটি ইয়ারস অব ইণ্ডিয়ান ফিনান্স'), ১৮১৩ পর্যন্ত কোম্পানীর গড়ে বার্ষিক মূলধন সংগ্রহ ছিল ১,২৫.০০,০০০ টাকা। ১৮১৩ খৃঃ পর্যন্ত মূলধনের নামে হিন্দুস্থানের রাজস্বভাণ্ডারে কোম্পানীর থাবা এসে পড়েছে। আঠারো'শ তের-র নতুন সনদে কোম্পানীকে ভারতে ব্যবসার পাট গুটোতে হয়—কিন্তু মূলধন সংগ্রহ ফলত বন্ধ হয়নি। উপরি উক্ত আইনের বিধিমতই কোম্পানীর চীন-বাণিজ্যে ভারতের রাজস্ব থেকে মূলধন যোগানো হত। উপরন্তু কোম্পানীর অংশীদারদের নিয়োজিত স্থায়ী মূলধনের ওপর শতকরা ১০'৫ হারে লভ্যাংশ হিন্দুস্থানের রাজস্ব থেকে সংগ্রহ করার বিধান তৈরী হল। এই ব্যয় "হোমচার্জ" বাবদ ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত।

এই সময় থেকেই সরকারী ব্যয়ের বিরাট অংশ সামরিক খাতে প্রবাহিত। রাজস্ব থেকে মূলধন সংগ্রহের মতই এই ব্যয়ের শতকরা কত ভগ্নাংশ যে অনুৎপাদক নয় আজ তা বলা যাচ্ছে না। কেননা সামরিক খাতের ব্যয়ের অধিকতর অংশের দখলদার ছিল ইংরেজ সেনানীরা—যাদের বেতন ও পেনসন বাবদ ব্যয়ে স্বদেশে পরিবার-পরিজনই পুষ্ট হয়েছে—পুষ্ট হয়েছে স্বদেশের অর্থনীতি। যৎকিঞ্চিৎ অংশভাগ এদেশের সিপাইরাও পেয়েছেন, তবু তাবৎ বৃটিশ যুগে সামরিক খাতের ব্যয়ের বড় অংশই হিন্দুস্থানের বাইরে চলে গেছে। সমভাবে গেছে প্রশাসনিক খাতের ব্যয়।

মূলধন বাবদ ব্যয়, সামরিক ব্যয় ও প্রশাসনিক ব্যয়—রাজস্ব-ভাণ্ডারের এই সব ব্যয় তালিকার প্রায় সবটাই কেবলমাত্র অনুৎপাদক (unproductive) নয় দেশীয় আর্থিক ব্যবস্থায় এক সমস্থণ অনভিপ্রেত নির্গম পথের (Leakage) জন্ম দাতা—উন্নয়নধর্মী আর্থিক প্রক্রিয়ায় যা ঋণাত্মক ক্রিয়ালাপের জনক।

সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যয়

মূলধন বাবদ ব্যয় বা 'হোমচার্জ'—সবটাই ভারতের অপহৃত সম্পদ। সামরিক খাতের ব্যয় সম্পর্কে আমরা আরো একটু আলোচনা করতে পারি।

জাতীয় প্রতিরক্ষার জরুরী কারণে সামরিক খাতে ব্যয় সরকারী ব্যয়ের এক প্রধান উপাদান. তবু ভারতে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে সামরিক খাতের ব্যয় অধিকাংশ ছিল দেশ জয়। এই একশো বছরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৫টি বড় বড় যুদ্ধে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত দখল করে নিজেদের শাসন বিস্তৃত করেছে। সিপাই যুদ্ধের শুরু পর্যন্ত তাবৎ যুদ্ধের ব্যয় ভারতের রাজস্ব ভাণ্ডার জুগিয়েছে। এমন কি পার্লামেণ্ট শাসিত ভারতেও (১৮৫৮-১৯০০) সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যুদ্ধ ব্যয়ের দায় বহন করেছে ভারতের মানুষ। ইংরেজ শাসন বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু ইংলণ্ডের রাজস্ব ভাণ্ডারে হাত পড়েনি। সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে সেনা বাহিনী পোষার খরচ সরকারী ব্যয় ভাণ্ডারের প্রধানতম অংশ। প্রথম দিকে রাজস্ব থেকে এক তৃতীয়াংশ খরচ হোত সামরিক ব্যয়ে, পরের যুগে এক চতুর্থাংশ। যুদ্ধের বছরে ব্যয়ের পরিমাণ আরো বেড়ে যেত। বেড়ে যেত ঋণের পরিমাণও। ব্যয়ের ধারাবাহিক তালিকা আমাদের রক্ত ক্ষয় ও অর্থ ব্যয় দুই-ই সূচিত করে। সামরিক খাতের ব্যয়ের একটা মোটা অংশ চলে যেত গ্রেট বৃটেনে। সেখানে ভারতের জন্য নির্ধারিত সেনাবাহিনীর রিক্রুটমেণ্ট ও সেনা শিক্ষাখাতে অবসর প্রাপ্ত সেনানীদের পেনসন খাতে সামরিক ব্যয়ের মোটা অংশ ব্যয়িত হোত।

প্রশাসনিক খাতে ব্যয়ের সিংহ ভাগ ছিল বড় লাট সাহেব, এক্সিকিউটিভ কাউনসিল ও তদ্বিভাগীয় কর্মচারীবৃন্দের বেতন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বাবদ ব্যয়ে। এ ব্যয়ের প্রায় সবটাই প্রাপ্য ছিল ইংরেজনন্দনদের। এদেশে বসবাসের কারণে ঐ ব্যয়ের যৎকিঞ্চিৎ এ দেশের ভোগে লাগতো। খাদ্য, বাসস্থান ও ভৃত্য জনিত ব্যয় ছাড়া আয়ের বাকী অংশের সুফল পেত সাগর

পারের মাতৃভূমি। সামরিক খাতে ও প্রশাসনিক খাতে এদেশে কৃত ব্যয়ের অংশ ভাগ সুমসৃণ নিরন্ধ্র পথে হাতছাড়া হয়ে এদেশে বিনিয়োগ সম্ভবনা হারাত।

সরকারী ব্যয় নীতি ও আর্থিক উন্নয়ন তত্ত্ব

রাজস্ব থেকে সরাসরি যা বিলেতে চালান হয়েছে তার নাম হোমচার্জ। কিছুকাল মূলধন বাবদ ব্যয় হোমচার্জের অন্তর্ভূক্ত ছিল। হোমচার্জের অন্যান্য উপাদান ছিল যথা; (১) ভারতীয় ঋণের সুদ (২) কোম্পানীর অংশীদারদের স্থায়ী মূলধনের সুদ (৩) বিলেতে প্রেরিত সেনা বাহিনীর জন্য খরচ (৪) ইণ্ডিয়া অফিস সংক্রান্ত প্রশাসনিক খরচ (৫) পরবর্তী কালে [১৮৪৫ এর থেকে] রেলপথ প্রতিষ্ঠার মূলধনী ব্যয়ের লভ্যাংশ এবং আরো নানাবিধ খরচে হোমচার্জ ভূষিত।

নানা হিসেব থেকে জানা যায় (রমেশচন্দ্র দত্ত, মণ্ট গোমারি মার্টিন, কে, টি, শাহ) অন্তত বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব ভাণ্ডারের এক চতুর্থাংশেরও বেশি প্রতি বৎসর মসৃণ নিরন্ধ্র পথে হিন্দুস্থান থেকে অবলুপ্ত হয়েছে।

সব দেশেই সরকারী ব্যয় নীতির অভিপ্রেত ফল: দেশের আর্থিক পরিমণ্ডলে ক্রমান্বয়ে মূলধন সংগঠনে সহায়তা, ব্যাপকতর আর্থিক ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধির পথ মসৃণ রাখা, শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ সম্ভাবনা বাড়ানো। কর্মসংস্থানের Employment-situation উন্নতি। কোম্পানীর আমলে ও পরবর্তী কালে এর বিপরীত প্রক্রিয়াই আমাদের আর্থিক পরিমণ্ডলে ঘটে গেছে। সরকারী ব্যয় ব্যবস্থায় শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য পথ নির্মাণ ইত্যাকার জনকল্যাণমূলক কাজ কখনোই প্রাধান্য পায় নি। তথা কথিত সামাজিক সম্পদ (সোস্যাল ওভারহেড ক্যাপিটাল) বহুগুণিত হবার সম্ভাবনা পায়নি। জাতীয় মূলধন সংগঠিত হয়নি। উল্টো চাপে নিরন্ধ্র পথে জাতীয় আয় ক্রমান্বয়ে অপহৃত হয়েছে। উদ্বৃত্ত মূলধনের যথেষ্ট অবশেষ পড়ে থাকেনি যার দ্বারা উত্তরোত্তর শিল্পবাণিজ্যে অভিপ্রেত বিনিয়োগ বেড়ে যেতে পারতো। ফলে কর্ম সংস্থানের উন্নতি ঘটেনি। জাতীয় আয় কমে গিয়ে কিংবা স্থাণু থেকে দেশের আর্থিক পরিমণ্ডল দুরবস্থার অপচক্রে vicious-circle গিয়ে পড়েছে।

অন্তত উনিশ শতকে বিশ্বের উন্নয়নকামী সমস্ত দেশের আর্থিক পরিমণ্ডলে সরকারী ব্যয় ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা উদ্যোগ নানা কারণে ক্রমোন্নয়নমূলক আর্থিক ক্রিয়াকলাপে অপারগ দেখা গেছে রাজস্ব ব্যয় ব্যবস্থা ধন বিজ্ঞানের পরিভাষায় আর্থিক গুণক-এর (Economic multiplier) কাজ করেছে। অর্থাৎ, সরকারী ব্যয় বহুগুণিত হয়ে সামাজিক সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে এবং জাতীয় আয় (National Income) অপচক্রের (vicious circle) বাধা কাটিয়ে ক্রমপ্রসারমাণ হতে পেরেছে।

আমাদের দেশে উদ্বৃত্ত আয় সরকারী ব্যয় ব্যবস্থায় নিরন্ধ্র পথে অপহৃত হয়েছে।

চৈতন্য লাইব্রেরীর গৌরহরি সেন

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত গ্রন্থাগার চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি সেন। তিনি বটতলারই সন্নিকটে আহিরীটোলায় একশবছর আগে ৪ঠা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্য লাইব্রেরী বহু মহাপুরুষের স্মৃতিধন্য কয়েকশ গজের মধ্যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। স্বাভাবিকভাবেই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহুজনের সান্নিধ্য লাইব্রেরী অর্জন করেছে। বর্তমানে লাইব্রেরীর বাড়ীটি যেখানে অবস্থিত সেই জমিতেই (চড়কডাঙ্গায়) একদা বটতলার টপ্পা-সম্রাট নিধুবাবুর প্রণয়িনী শ্রীমতী থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ী। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পুত্র রাজা গুরুদাসের মাধ্যমে মহানন্দ রায়ের অধীনে হয়। শ্রীমতী মহানন্দেরই রক্ষিতা ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জ্যৈষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথও চৈতন্য লাইব্রেরীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁরা দুজনেই চৈতন্য লাইব্রেরীর বিভিন্ন সভায় বহু বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছেন যা পরবর্তীকালে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে আয়োজিত শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ এখানেই তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্র' পাঠ করেন। 'রবীন্দ্রনাথ—বঙ্কিমচন্দ্র' সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রচারিত বহু অস্থায়ী গুজবকে এই প্রবন্ধ হত্যা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সশ্রদ্ধ আসন পাতা ছিল তারই খতিয়ানে প্রবন্ধটির মূল্য অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের স্নেহের ভাইঝি প্রতিভা দেবীর স্বামী আশুতোষ চৌধুরীও চৈতন্য লাইব্রেরীর সূচনার দিকে সংযুক্ত ছিলেন।

গৌরহরি স্থানীয় বিদ্যালয় আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর বয়সে ভর্তি হন। এগার বছর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় রৌপ্যপদক পেয়ে হিন্দুস্কুলে ভর্তি হন। আঠারবছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে ডাফ কলেজে এফ, এ, পড়তে ভর্তি হন। এখানেই অধ্যাপক টমরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। গৌরহরি ধনী বংশের সন্তান। 'কুড়ি বছর বয়সে কলেজের লেখাপড়া ইস্তফা দিয়ে…বাজে বই পড়া আরম্ভ করিলাম'। গৌরহরির লেখাপড়া ছাড়ার কারণ অনুমান করা শক্ত, তবে এক বছর আগেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। কাকার সঙ্গে বৈষয়িক মনোমালিন্যে তাঁর এফ, এ, পরীক্ষার প্রস্তুতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে শোনা যায়।

'তখন কম্বুলিটোলা লাইব্রেরীর খুব নামডাক ছিল।' কেশব একাডেমীর ছাত্র গুরুচরণ চৌধুরী ও তাঁর দাদা তীর্থনাথ কম্বুলিটোলা লাইব্রেরীর 'পাণ্ডা' ছিলেন। গৌরহরি ছিলেন গুরুচরণের বন্ধু। ১৮৮৭ সালে তিনি কম্বুলিটোলা লাইব্রেরীর সভ্য হন এবং পরের বছর কুঞ্জবিহারী দত্তকেও সভ্য করান সেখানে। 'কুঞ্জর তখন গাড়ি ঘোড়া ছিল না। বর্ষাকালে কম্বুলিটোলা যাইতে কষ্ট হওয়াতে তাহার বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলে একটা লাইব্রেরী করিতে সাধ হয়।' কুঞ্জর দ্বিতীয় ভাই নিতাই চাঁদ, নিতাই এর গৃহশিক্ষক ও গৌরহরি প্রতিবেশী রঙ্গলাল বসাকও এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। 'কিন্তু টাকা কোথা? ঘর কই? হরলালবাবু মাষ্টার, রঙ্গ সামান্য মাহিনার কেরানী,

নিতাই হেয়ার স্কুলে পড়ে, কুঞ্জ এফ, এ, ক্লাশের ছাত্র, আমি এফ, এ, পরীক্ষায় ফেল হইয়া টো টো কোম্পানীর কার্য্য করি।' কুঞ্জ ও নিতাইএর পিতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্তের প্রয়োজনীয় ইংরেজী চিঠিপত্র লিখে গৌরহরি ইতিমধ্যে তাঁর স্নেহভাজন হয়েছিলেন। তাঁর কাছে একদিন কথা পাড়া হল। গঙ্গানারায়ণ বল্লেন 'তোমাদের কিছু টাকা দিব আর এই ঘরটা দিব'। ঘরটা ৮৩নং বিডন ষ্ট্রীটের বাঁ দিকের বৈঠকখানা ঘর। গঙ্গানারায়ণ সেখানে হিসাব করতেন, হরিনাম করতেন, ঘুমোতেন। যাই হোক এভাবেই ১৮৮৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পুজোর দিন উদ্বোধন হল লাইব্রেরী। শুভলগ্নের জন্য লাইব্রেরী উদ্বোধন হতে দেরী হয়। গৌরহরি সরস্বতী পুজোর দিন লাইব্রেরীর উদ্বোধন করালেন। এর আগে তাঁরা কয়েকজন রাত জেগে শহরে পোষ্টারও মেরেছিলেন। অতি সম্প্রতি লাইব্রেরীর কর্মীরা ও সভ্যবৃন্দ লাইব্রেরীর রিডিং রুমে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন কারণ লাইব্রেরীর সংবিধানে লাইব্রেরীর ভেতরে কোন ধর্মানুষ্ঠান (পৌত্তলিক ?) আয়োজনের অনুমতি নেই। তা করতে হলে সর্বাগ্রে শুনেছি সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন। শুনেছি যে সংশোধনেরও ব্যবস্থা হচ্ছে সন্দেহ নেই এতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরির তৃপ্তি হতে পারবে।

যাই হোক, নিতাই এর দাদার, মাষ্টারের, রঙ্গ ও গৌরহরির বই নিয়ে পৌনেএক আলমারি ভর্তি হল। গঙ্গানারায়ণের দেওয়া টাকায় কিছু বাংলা বই কেনা হল। কুঞ্জর শ্বশুর দৈনিক ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকাটি কিনে পড়ে লাইব্রেরীতে দান করতেন। এছাড়া বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনী কেনা হত।

ডাফ কলেজের পাদরী টমরী প্রথম সভাপতি ও স্থায়ী সভাপতি হলেন। ১৮৮৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হল। সহঃ সম্পাদক গৌরহরি সেন। সাধারণ সভ্যের চাঁদা মাসিক দু আনা। আজীবন সভ্যের দেয় এককালীন দশটাকা অথবা ঐ দামেরই বই। গঙ্গানারায়ণ প্রথম বছরে তিনশ টাকা ও ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কুড়ি টাকা দান করলেন।

মনে রাখতে হবে চৈতন্য লাইব্রেরীর সঙ্গেই ছিল বিডন স্কোয়ার লিটারারী ক্লাব। টমরী সাহেবের নেতৃত্বে সাহিত্য সভা খোলা হয় ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসেই।

পরের বছর (১৮৯০) চৈতন্য লাইব্রেরীর সহ সভাপতি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আশুতোষ চৌধুরী। ১৮৯১ সালে শোভাবাজারের বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুরের নির্দেশে ১৮৬০ সালের ২১ নং আইন অনুসারে লাইব্রেরী রেজিষ্ট্রী করা হল। ৩য় বার্ষিক অধিবেশনের রিপোর্টে দেখা যায় ইহাই প্রথম রেজিষ্ট্রীভুক্ত লাইব্রেরী। চতুর্থ বছরের সবচেয়ে বড় ঘটনা লাইব্রেরীর জন্য বর্তমান বড় বাড়ী তৈরী করা। ৪।১ বিডনষ্ট্রীটে এই বাড়ী তৈরীতে টমরি, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরীর সাহায্যের কথা গৌরহরি উল্লেখ করেছেন। 'কুঞ্জর আন্তরিক যত্নে ও রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের ব্যয়ে, ১৮৯৪ সালের শেষ ভাগে......দ্বিতল বাটী তৈয়ারী হয়। ভাড়া সস্তা, বৎসরে দুইশত টাকা।'

এই বছর থেকেই গৌরহরি লাইব্রেরীর প্রথম সম্পাদক হন। ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও নিরলস পরিশ্রম করে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এ লাইব্রেরীটিকে দাঁড় করান। 'চৈতন্য নাম শুনিয়া কেহ কেহ টিকি লাইব্রেরী বলিয়া ঠাট্টা করিত।

ছেলেদের কাণ্ড বলিয়া পাড়ার বয়স্ক লোকেরা প্রথম প্রথম আমল দিতেন না।'

গৌরহরি সুবর্ণবণিক। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন মনে হয়। ১৩১৬-১৭ সালে মানসীর ২য় ও ৩য় বর্ষের এগারটি সংখ্যায় গৌরহরি রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী বর্ণনা করেন। 'ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা।' বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্কলন করে তিনি মানসী পত্রিকায় ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা থেকে নিদর্শন প্রকাশ করেন। প্রবাসী, ভারতী, নব্যভারত, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, অর্ঘ্য, আর্য্যাবর্ত, কৌহিনূর, ঢাকা রিভিউ পত্রিকা তিনি নিয়মিত পড়ে এই সংকলন গ্রন্থনা করতেন। বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দের সংকলন তিনি প্রকাশ করেন মানসী ও মর্মবাণী ১১ বর্ষ বৈশাখ সংখ্যায়। মানসী চতুর্থ বর্ষে তিনি অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্য আলোচনা করেন—'কাব্য প্রসঙ্গে'। ইংরেজী পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলন করে 'বৈদেশিকী' প্রকাশ করেন মানসী ও মর্মবাণী ৮ম বর্ষে। ১১ বর্ষে শ্রাবণ সংখ্যায় গৌরহরি মানসী ও মর্মবাণীতে 'রুশিয়ার ভাগ্য বিপর্য্যয়' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সুবর্ণবণিক সমাচারের ৮ম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'কবিযুগল' প্রবন্ধে গৌরহরি অক্ষয়কুমার সেন ও রসময় লাহার কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন। মানসীর চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে গৌরহরি আলোচনা করেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে। অবশ্য এ ছাড়াও আরো কয়েকটি কারণে এ রচনাটি আজও পুনর্মুদ্রণ যোগ্য।

গৌরহরি সেকালের সুবর্ণবণিকদের মত কট্টর সংরক্ষণশীল ছিলেন। মানসী ও মর্মবাণীর ১৫শ বর্ষ ভাদ্র সংখ্যায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের শান্তি উপন্যাস আলোচনাকালে তাঁর গোঁড়া মত ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথের চারুলতা, শরৎচন্দ্রের অচলা ও সাবিত্রীকে তিনি তীব্র নিন্দা করেন। গৌরহরির রচনা সম্বন্ধে চারুচন্দ্র মিত্র লিখেছেন 'বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যরস পিপাসু গৌরহরি সেন মহাশয়ের দান অকিঞ্চিৎকর নয়। লেখাগুলি সংখ্যায় অধিক না হইলেও উৎকর্ষে চিরদিন বাঙালীকে প্রকৃত আনন্দ ও শিক্ষাদান করিবে। তাঁহার রচনায় ভাষার গাম্ভীর্য, ভাবের উদারতা, চরিত্র বিশ্লেষণের অসাধারণ শক্তি ও দুরদর্শী সমালোচকের তীক্ষ্ণধীর বিপুল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।'

গৌরহরি সেনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ লাহা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অজাতশত্রু গৌরহরির সত্য নিষ্ঠা, অধ্যয়ন স্পৃহা, নিয়মানুবর্তিতা ও সংযমের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। ১৩৩৩ সালের ১৫ই কার্তিক গৌরহরি সেন পঞ্চান্নবছর বয়সে পরলোকগমন করেন। এসময়ে তাঁর বিধবা জননী বর্তমান ছিলেন। মানসী ও মর্মবাণী ১৮শ বর্ষ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় চারুচন্দ্র মিত্র গৌরহরি সেন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

'জীবনে কখনও তাঁহাকে (গৌরহরিকে) কোন বিষয়ে অসত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখি নাই।...তিনি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার চরিত্র মাধুর্যে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ়তা আবার বালসুলভ কোমলতা তাঁহার দীন দুঃখীর দুঃখমোচন প্রবণতা ও সহানুভূতি আদর্শস্বরূপ থাকিবে।...তিনি নিবাত নিষ্কম্প অচঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার হাস্যানন দেখিলে শোক দুঃখ আপনি দূর হইয়া যাইত। তাঁহার মুখ হইতে সহানুভূতি সূচক বচন বাহির হইলে দুঃখীজন দুঃখজ্বালা ভুলিয়া যাইত, হৃদয়ে বল পাইত।'

* এই প্রবন্ধ রচনার আগেই চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক ও কর্মীদের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি।

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

নবরত্ন মন্দির

রত্ন মন্দিরের ভাবকল্পনা পঞ্চরত্ন হইতে বিস্তার লাভ করিল নবরত্ন আকৃতিতে। নবরত্ন অর্থাৎ নয়টি রত্নের সংস্থান সুতরাং মন্দিরদেহের বিস্তার হইয়াছে স্বাভাবিক ভাবেই। নবরত্ন মন্দির-দেহ সাধারণতঃ দ্বিতল। আচ্ছাদনসহ প্রথমতলটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ইহার উপরে ঠিক চারিটি কোণে—ঈশান, বায়ু, নৈঋত ও অগ্নি—চারিটি রত্ন। আর মধ্যস্থলে যেখানে পঞ্চরত্নের কেন্দ্রীয় রত্নটির অবস্থান, সেখানে থাকে একটি সম্পূর্ণ পঞ্চরত্ন কক্ষ। ইহাদের সমবায়ে নবরত্ন মন্দিরদেহের সৃষ্টি। পঞ্চরত্ন মন্দিরের আলোচনায় বলিয়াছিলাম মূলগত সমস্যার প্রশ্নে একরত্ন ও পঞ্চরত্ন মন্দিরের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। স্বয়ং সম্পূর্ণ একাধিক অঙ্গকে একত্রবদ্ধ করিয়া সংহত রূপরেখা সৃষ্টি করাই হইল সমস্যার মূল কথা। একরত্ন হইতে পঞ্চরত্নে এই সমস্যা একটু বেশী জটিল, নবরত্ন মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে তাহা স্বভাবতই হইয়া উঠিয়াছে জটিলতর। বস্তুতঃ বিস্তৃত নিম্নাংশ, উপরে তিনটি স্তরে বিভক্ত নয়টি বিভিন্ন আকারের রত্ন, এই সবকয়টির সমাহারে একত্র সংহত রূপরেখা রচনা করা সঙ্গীতে molody সৃষ্টির সমস্যার মতই। molody সৃষ্টির সমস্যা পঞ্চরত্ন ভাবকল্পনাতেও বিদ্যমান কিন্তু নবরত্ন মন্দিরের বিস্তৃত দেহে তাহা একেবারে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

ঊর্দ্ধাংশের বিস্তারের ফলে নবরত্ন মন্দিরে নিম্নাংশ ও ঊর্দ্ধাংশের পারস্পরিক সম্পর্ক একরত্ন ও পঞ্চরত্ন মন্দির হইতে পৃথক। একরত্ন ও পঞ্চরত্ন মন্দিরের মর্য্যাদার দিক দিয়া নিম্নাংশ ও ঊর্দ্ধাংশ উভয়েরই স্থান ছিল সমান। কিন্তু নবরত্ন মন্দিরের দিকে একবার চাহিলেই উপলব্ধি হইবে যে মন্দিরদেহে ঊর্দ্ধাংশের স্থানই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তাহার বিস্তার স্থপতি ও দর্শক উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া নেয়। নবরত্ন মন্দিরের অঙ্গবিন্যাসে তাই ঊর্দ্ধাংশ নিম্নাংশ অপেক্ষা উচ্চতর। তবে, এ আধিক্য খুব বেশী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, দ্বিতলে যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই উচ্চতা অর্জিত হইবে সেই পঞ্চরত্ন কক্ষটির আসন-বিস্তার প্রথমস্তরের পার্শ্বরত্ন-গুলির অবস্থানের জন্য সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতেই হইবে। আর, ঐ পঞ্চরত্নটি যে কতদূর উচ্চ হইতে পারিবে তাহার সীমারেখা তো আসনেই নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। এই কারণে নিম্নাংশ ও ঊর্দ্ধাংশের মধ্যে উচ্চতার বৈষম্য নবরত্ন মন্দিরে শিখর মন্দিরের বার ও গণ্ডীর মত অতটা বেশী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই।

এই সীমা ও সম্ভাবনা লইয়া নবরত্ন ভাবকল্পনা কিভাবে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হইল তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিবার মত তথ্য আমাদের নাই। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রচুর নবরত্ন মন্দির নির্মিত হইয়াছে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নির্ম্মিত নবরত্ন মন্দিরের সংখ্যা সামান্য আর তাহাদের নির্মাণকালের মধ্যে ব্যবধানও প্রচুর। ভাবকল্পনার ক্রমবিকাশের ধারা ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

অসুবিধা আরও আছে। প্রাচীনতম নবরত্ন মন্দিরের সবগুলিই পড়িয়াছে পূর্ব্ব পাকিস্থানে। তাহার একটিও আবার অক্ষত অবস্থায় নাই। ডামরেলীর সমাজ মন্দিরটির অবস্থা ধ্বংসস্তূপ বলিলেই হয়, নিম্নাংশের দেওয়ালের কিছুটা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় মাত্র। অপর দুইটি মন্দির কান্তনগরের (দিনাজপুর জেলা, পূর্ব্ব পাকিস্থান) কান্তজী মন্দির ও পাবনা জেলার হাটি কুমরুল গ্রামের দোলমঞ্চ—উভয়েরই রত্নগুলি সব পড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য এ সবই বলিতেছি
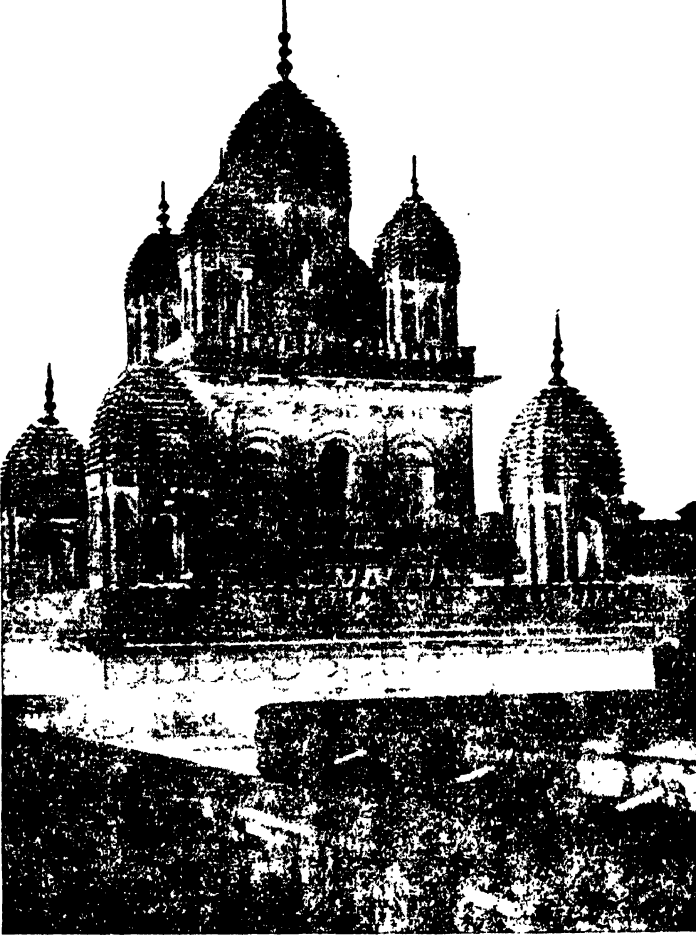
নবরত্ন রীতির বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির ॥ ঘাটাল, মেদিনীপুর

আলোকচিত্র দেখিয়া। তাহার সবগুলি আবার অধুনা গৃহীত নহে। সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিত যশোহর খুলনার ইতিহাস নামক গ্রন্থে প্রকাশিত ডামরেলী মন্দিরের যে আলোক-চিত্রটি আমাদের অবলম্বন তাহা গৃহীত হইয়াছিল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে। কান্তজী মন্দির সম্পর্কে একটু সুবিধা আছে। রত্নগুলি পড়িয়া যাইবার আগে কাঠ খোদাই করিয়া মন্দিরটির একটি প্রতিকৃতি গঠন করা হইয়াছিল। প্রতিকৃতিটি বর্ত্তমানে কলিকাতার ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত। ইহার

একটি চিত্র J. Fergusson কৃত History of Indian and Eastern Architecture গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ব পাকিস্থানে অবস্থিত যে তিনটি নবরত্ন মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইল ডামরেলীর সমাজ মন্দির। যশোহর খুলনার ইতিহাসে মন্দিরটির নির্ম্মাণকাল বলা হইয়াছে ১৫০৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ। মন্দিরটি নাকি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে মন্দিরটির এমনই ভগ্নদশা যে আলোকচিত্র দেখিয়া তাহার অঙ্গবিন্যাস সম্পর্কে কোন ধারণা সৃষ্টি করা অসম্ভব বলিলেই হয়।

কালানুক্রমিক সজ্জায় ডামরেলী সমাজ মন্দিরের পরেই যে মন্দিরটির উল্লেখ করিতে হয় তাহা হইল কান্তনগরের কান্তজী মন্দির। মন্দিরটির নির্ম্মাণকাল ১৭২৩ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ ডামরেলী সমাজ মন্দিরের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে নবরত্ন রূপ লইয়া কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকিলে তাহার গতি-প্রকৃতিই বা কি সে সমস্তই অজ্ঞাত। সুতরাং দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া নবরত্ন মন্দিরের আলোচনা প্রকৃতপক্ষে শুরু হইবে কান্তনগরের কান্তজী মন্দিরকে লইয়া।

সাধারণতঃ, নবরত্ন মন্দিরেরর অঙ্গবিন্যাস বলিতে যাহা বুঝায় কান্তজী মন্দিরের দেহ সংগঠন তাহা হইতে কিছুটা পৃথক। মন্দিরটি ত্রিতল। প্রথমতলের আচ্ছাদনের চারি কোণে চারিটি রত্ন এবং মধ্যস্থলে একটি কক্ষ। এই কক্ষটি স্বাভাবিক পঞ্চরত্নের মত নহে। ইহার আচ্ছাদনের চারিকোণে চারিটি রত্ন, কিন্তু কেন্দ্রস্থলে উঠিয়াছে আর একটি কক্ষ। কেন্দ্রীয় রত্নটির অবস্থান তাহার উপরে। পরবর্ত্তীকালে যতগুলি নবরত্ন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র একটি—হাটি কুমরুল গ্রামের মন্দিরটি—ভিন্ন আর সবগুলিই দ্বিতল। স্বাভাবিক পঞ্চরত্ন দেহ গঠন করিয়া উর্দ্ধাংশটিকে সমাপ্ত করা হইয়াছে। হাটি কুমরুল গ্রামের মন্দিরটির অঙ্গবিন্যাস ঠিক কান্তনগর মন্দিরের মতই। একটু পরেই ইহার প্রসঙ্গে আসিতেছি।

কান্তজীর ত্রিতলে বিভক্ত মন্দিরদেহটি একটু খর্ব্বাকৃতি। আকৃতির এই খর্ব্বতার সূচনা হইয়াছে আসন ও দেওয়ালের আনুপাতিক সম্পর্ক হইতে। নিম্নাংশের দেওয়াল উচ্চতায় আসন বিস্তারের প্রায় ঠিক অর্দ্ধেক। মন্দিরদেহের উচ্চতার সীমা তো এইখানেই নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। নবরত্ন ভাবকল্পনায় উর্দ্ধাংশের গুরুত্ব অধিক হওয়া সত্ত্বেও প্রথমস্তরের পার্শ্বরত্নগুলির সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য কেন্দ্রস্থ পঞ্চরত্নটির প্রসার ও উচ্চতা যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয় একথা একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি। এই সীমাবদ্ধতায় পঞ্চরত্নটির আসনের প্রসার মূল মন্দিরের আসনের প্রায় অর্দ্ধেক। পার্শ্বরত্নগুলির সংস্থান দেখিয়া মনে হয় যতটা স্থান পড়িয়া রহিয়াছে তাহার উপর পঞ্চরত্নটিকে আরও বিস্তৃত করিয়া দেওয়া চলিত। কিন্তু সেই বিস্তৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য উর্দ্ধাংশটিকে যতটা উচ্চ করিয়া গড়িতে হইত তাহাতে নিম্নাংশের তুলনায় উর্দ্ধাংশ হইত গুরুভার এবং পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন। পঞ্চরত্নটির দেওয়াল তাহার আসনের অর্দ্ধেক। পঞ্চরত্ন মন্দিরের সংগঠন পদ্ধতি অনুযায়ী দেওয়াল আরও উচ্চ করিয়া গড়া সম্ভব ছিল, কিন্তু নিম্নাংশের দেওয়ালের খর্ব্বতার পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চরত্নের দেওয়ালের অধিকতর উচ্চতা যে প্রভাব

সৃষ্টি করিত তাহাতে মন্দির দেহের ভারসাম্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অথচ প্রয়োজনীয় উচ্চতা তো অর্জ্জন করিতে হইবে। এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই বোধকরি মন্দিরটি ত্রিতল করিয়া গড়া। পঞ্চরত্নটির কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রীয় রত্নের পরিবর্ত্তে রহিয়াছে আর একটি তল। ইহারই উপরে কেন্দ্রীয় রত্নটির অবস্থান। দ্বিতলে বিভক্ত পঞ্চরত্নটি উচ্চতায় নিম্নাংশের বারের দেড়গুণ। বারটি আসনের অর্দ্ধেক। ফলতঃ মন্দিরটির মোট উচ্চতা তাহার আসন দৈর্ঘ্যের মাত্র এক চতুর্থাংশ মাত্র বেশী। আসন ও উচ্চতার পরিমাণ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে মন্দিরটিকে যতটা উচ্চ করিয়া গড়া চলিত তাহা করা হয় নাই, অর্থাৎ মন্দিরদেহ আকৃতি খর্ব্বই।

মন্দিরটির রূপরেখার খর্ব্বতার প্রভাব যতটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারিত প্রকৃতপক্ষে ততটা কিন্তু হয় নাই। উর্দ্ধাংশের অভিনব গঠন পরিকল্পনা বিন্যাসে রহিয়াছে দীর্ঘায়ত দেহের অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে দ্বিবিধ উপায়ে। প্রথমতঃ মন্দির দেহের ত্রিতল গঠন আর দ্বিতীয় উপায়টি রূপ-লাভ করিয়াছে শিখর-রত্নের আকারের মধ্যে। দ্বিধাবিভক্ত উর্দ্ধাংশে টানা দেওয়ালের পরিবর্ত্তে রহিয়াছে ক্রমহ্রস্বায়মান স্তরভেদ। ইহার সহিত আসিয়া যুক্ত হইয়াছে রত্নগুলির রূপরেখা ও তাহাদের বিন্যাসের বৈচিত্র। রত্নগুলির গঠন ঠিক রেখ দেউলের অঙ্গবিন্যাসের প্রধান সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া। সাধারণতঃ রত্নমন্দিরে শিখর-রত্ন নির্ম্মাণে বাড় ও গণ্ডীর অনুপাত নির্ণয় শিখর মন্দির সংগঠনের নীতি অবলম্বন করিয়া করা হয় না। বাড় ও গণ্ডী প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই সমান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। অনেক ক্ষেত্রে তো গণ্ডী বাড় অপেক্ষা হ্রস্বও হইয়া থাকে। কান্তজী মন্দিরের রত্নদেহে গণ্ডীর প্রাধান্যই অধিকতর। গণ্ডীর বহিরেখাও খাঁটি রেখ দেউলের মত ভিতরের দিকে ইষৎ ঝুঁকিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে।

রত্নগুলির দেহ গঠন মন্দির দেহের মতন খর্ব্ব করিয়া নহে। নিম্নাংশের আচ্ছাদনের উপরে যেটুকু স্থান তাহাদের মিলিয়াছে তাহার উপর বিস্তৃত আসনের মধ্যে উচ্চতা অর্জ্জনের যতটুকু সম্ভাবনা ছিল ইহাদের উচ্চতার মধ্যে তাহার সবটুকুই প্রতিফলিত। উচ্চায়ত দেহ লইয়া প্রথম স্তরের রত্নগুলি গিয়া স্পর্শ করিয়াছে দ্বিতীয় স্তরের রত্নদেহের গণ্ডীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় স্তরের রত্নগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় রত্নের সম্পর্কও ওই একই প্রকারে। স্তরে বিভক্ত উর্দ্ধাংশের উপর রত্নগুলির লালিত্যময় দীর্ঘায়ত দেহভঙ্গিমার প্রভাবেই সমগ্র মন্দির দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রলম্ব দেহের অভিব্যক্তি।

খর্ব্বদেহের সীমরেখার মধ্যে দীর্ঘায়ত রত্নদেহ আরও একটি দিক দিয়া স্থপতির পরিমাণ ও রূপবোধের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। রত্নগুলির দেহ গঠন ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ সমষ্টি লইয়া সংহত রূপরেখা সৃষ্টি করিবার সফল প্রয়াস দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার নয়। রত্নগুলির পারস্পরিক নৈকট্য হইতেএই সংহতির জন্ম। ঘন সংবদ্ধ রত্ন সমাবেশের ফলে উর্দ্ধাংশে রত্নাবলীর প্রভাবটাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। পঞ্চরত্নের বাড় অংশ পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ায় না। পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত নবরত্নগুলির উর্দ্ধাংশ সংগঠনে পঞ্চরত্ন কক্ষটির বাড় অংশের ভূমিকা সর্ব্বদাই প্রধান। প্রথম স্তরের রত্নগুলি পঞ্চরত্নটির আচ্ছাদনের ঢালু কোণের নীচে শেষ হইয়া যায় আর ওই কোণের উপরেই উঠে দ্বিতীয় স্তরের রত্নগুলি। ফলে পঞ্চরত্ন কক্ষটির বাড় অংশ তাহার বিস্তৃতি ও উচ্চতা লইয়া রত্নগুলির অস্তিত্ব অনেকটাই ম্লান করিয়া দেয়। উচ্চায়ত দেহ

গঠনের প্রয়োজনে পঞ্চরত্নের বাড় অংশের এই প্রাধান্য যে বিশেষ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্তরে বদ্ধ রত্নগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ও পঞ্চরত্নের বাড় অংশের প্রাধান্য যে উর্দ্ধাংশের সংগঠন শিথিল করিয়া তুলে ইহাও অনস্বীকার্য্য। কান্তজী মন্দিরের উর্দ্ধাংশ সংগঠনে উচ্চায়ত দেহ নির্ম্মাণের কোন প্রশ্ন ছিল না। তাই পঞ্চরত্নের বাড় অংশকে প্রাধান্য না দিয়া, রত্নগুলিকে প্রধান করিয়া, তাহাদের সাহায্যে মন সংবদ্ধ উর্দ্ধাংশ গঠন করা সম্ভব হইয়াছে।

সূক্ষ্ম পরিমাণবোধ ও স্থাপত্য নৈপুণ্য এই দুইয়ের মিলনে সৃষ্ট যে সংহত রূপরেখা রচনার প্রয়াসের কথা বলিতেছিলাম তাহাই পূর্ণতা লাভ করিল অলঙ্করণের সামগ্রিক বন্ধনে। মন্দিরটির সর্ব্বাঙ্গ ব্যপ্ত করিয়া পোড়ামাটির বিচিত্র অলঙ্করণ। নিম্নে ভিত্তিমূল হইতে শুরু করিয়া প্রতিটি তলের দেওয়ালে কার্ণিসে, তাহাদের আচ্ছাদনের প্রান্তবাহিয়া যে অনুচ্চ আবরণ রহিয়াছে তাহার গাত্রে, রত্নগুলির পাদমূল হইতে শুরু করিয়া গণ্ডীর উদ্‌গত বন্ধনীমালার প্রারম্ভ পর্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখিতেছি অলঙ্করণের বিপুল, বিচিত্র সমাবেশ। সর্ব্বাঙ্গব্যাপী এই বিচিত্র অলঙ্করণ সমাবেশ রত্নমন্দিরের যে অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা—নিম্নাংশ ও উর্দ্ধাংশের মধ্যে স্বতসিদ্ধ যোগের অভাব—তাহার উপর রূপময়তার আবরণ সৃষ্টি করিয়া, মন্দিরটির রূপরেখাকে পরিপূর্ণভাবে একত্র সংহত করিয়া তুলিয়াছে। পরিমাণবোধ ও রত্নবিন্যাস কৌশল উর্দ্ধাংশের যে সমস্যা তাহা অনেকটা সমাধান করিয়াছিল এবং নিম্নাংশ ও উর্দ্ধাংশের মধ্যে সুসমঞ্জস ভারসাম্যও কিছুটা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু সমগ্র মন্দিরদেহের মধ্যে যে সাবলীল একাত্মতা বিদ্যমান তাহার উৎস এই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী অলঙ্করণের পরিণাম প্রভাব। উর্দ্ধাংশেও স্থাপত্য কৌশল যে অভাব সম্পূর্ণ পূরণ করিতে পারে নাই—প্রতিটি স্তরে রত্নগুলির পারস্পরিক ও পঞ্চরত্নদেহের সহিত তাহাদের যে দেহগত বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে অভাব বলিতে সেইটাই বুঝাইতেছি—অলঙ্করণের পরিণাম প্রভাব তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু মন্দিরটির দিকে চাহিলে ইহার অলঙ্করণের ঐশ্বর্য যে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইবে, এমন নয়। স্থাপত্যের বৈশিষ্টই তাহার প্রধান আকর্ষণ। তাহার সহিত মিলিত হইয়া অলঙ্করণের বিপুল ঐশ্বর্য্য স্থাপত্যের মহিমাকেই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ঠিক এই ঘটনাই দেখিয়াছিলাম বিষ্ণুপুরে, কৃষ্ণরায়ের বিখ্যাত জোড় বাংলা মন্দিরটিতে। কৃত্রিমভাবে সংযোজিত জোড় বাংলা দেহটিকে অখণ্ড রূপরেখায় বাঁধিবার জন্য স্থাপত্য কৌশলের সহিত যোগ করা হইয়াছিল সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন অলঙ্করণের বিপুল সমারোহ।

কান্তজী মন্দিরের মত ত্রিতলে বিভক্ত আর একটি নবরত্ন হইল পাবনা জেলার হাটি কুমরুল গ্রামের দোলমঞ্চ বলিয়া খ্যাত দেবালয়টি। কান্তনগরের মন্দিরটির মত ইহারও সবগুলি রত্নই পড়িয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, অক্ষত অবস্থায় মন্দিরটির কি রূপ ছিল তাহার কোন চিত্র বা প্রতিকৃতি কেহ রাখিয়া যায় নাই। তরুলতা আচ্ছাদিত একটি ভগ্ন মন্দিরের আলোক চিত্র দেখিয়া বেশী কথা বলা সম্ভব নহে।

কথিত আছে ইহার নির্ম্মাতা রামনাথ ভাদুড়ী নির্ম্মিয়মান কান্তজী মন্দির দেখিয়া তাহার অনুকরণে, একই স্থপতিবৃন্দের দ্বারা মন্দিরটি নির্ম্মাণ করান। তরুলতার আচ্ছাদনের বাহিরে ভগ্ন দেহের যতটুকু দেখা যাইতেছে তাহাতে কিন্তু জনশ্রুতি একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না।

ত্রিতলে বিন্যস্ত মন্দিরটির আসন ও নিম্নাংশের বাড়ের সম্পর্ক ও নিম্নাংশের বাড়ের সম্পর্ক ও নিম্নাংশের সহিত উর্দ্ধাংশের তলদ্বয়ের সম্পর্ক কান্তজী মন্দিরের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। রত্নসমূহের বিন্যাস ও তাহাদের আকৃতির কথা তো জানিবার উপায় নাই—তবে কান্তজী মন্দিরের মত সর্ব্বাঙ্গব্যাপী অলঙ্করণের ঐশ্বর্য্য যে ইহার ছিল না তাহা আলোকচিত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কান্তজী মন্দিরে অলঙ্করণের ভূমিকা সম্পর্কে তো একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি। এই ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া হাটি কুমরুলের দোলমঞ্চ যে কান্তনগর মন্দিরের পর্য্যায়ে উঠিতে পারে নাই ইহা সহজেই অনুমেয়।

নবরত্ন মন্দির দেহ গঠনে কান্তনগরের কান্তজী মন্দিরের অঙ্গবিন্যাস একটি বিশিষ্ট ধারা রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। হাটি কুমরুলের মন্দিরটির প্রসঙ্গ বাদ দিলে ইহার পুনরাবৃত্তি বলিয়া চিহ্নিত করা যায়—তাও অবশ্য আংশিক ভাবে—এমন একটিমাত্র মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেটুকু সাদৃশ্য আছে তাহাও বোধ করি কান্তনগর মন্দিরের অনুসারে না হওয়াই সম্ভব। এই মন্দিরটি হইল মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সহরের বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির। নির্মাণ করা হইয়াছিল ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে। উচ্চতার দিক দিয়া ইহার রত্নগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাহাদের রূপরেখা কান্তজী মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। খর্ব্বাকৃতি উর্দ্ধাংশের সীমিত উচ্চতার মধ্যে দীর্ঘায়ত রত্নগুলির সাবলীল দেহভঙ্গিমা ও তাহাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা উর্দ্ধাংশের রূপরেখাকে সংহত করিয়া তুলিয়াছে। রত্নগুলির দেহ গঠনে কান্তনগরের সূক্ষ্ম পরিমাণ-বোধ অবশ্য এখানে নাই।

কান্তনগর মন্দিরর সহিত উর্দ্ধাংশের সাদৃশ্য রহিয়াছে বটে কিন্তু কান্তনগরের অঙ্গবিন্যাস যে সামগ্রিকভাবে বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের স্থপতির লক্ষ্য ছিল না নিম্নাংশে বারের উচ্চতাতে ও মন্দিরটির দ্বিতল সংগঠনেই তাহা অনুধাবন করা যায়। স্থপতি সম্ভবতঃ উচ্চায়ত মন্দিরদেহ গড়িতে চাহিয়াছিলেন। এই মূলগত পার্থক্য এবং কান্তনগর ও ঘাটালের দূরত্ব বিবেচনা করিলে এ কথা বোধ করি বলা অসঙ্গত হইবে না যে ঘাটালের বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির নির্ম্মাণে কান্তনগরের কান্তজী মন্দিরের অনুকরণ করিবার কোন সচেতন প্রয়াস ছিল না।

নাট্যকার আলেকজেণ্ডার ডুমাস

ফণিভূষণ বিশ্বাস

ডুমাসের জীবন যেন একটা জীবন্ত নাটক। বহু বিচিত্র নাটকীয় ঘটনা সংঘাতে মুখর। যখন তাঁর বয়স মাত্র চার বৎসর, তখন তাঁর পিতা মারা যান। সেই শোকাভিভূত মৃত্যুর দিনে তাঁর জীবন নাট্যের প্রথম দৃশ্যের সূত্রপাত।

ডুমাসের মা যখন মৃত স্বামীর ঘর থেকে বার হয়ে আসছেন, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, সিঁড়ি বেয়ে তাঁর শিশু-পুত্র একটা বন্দুক হিঁচড়ে টেনে নিয়ে উপরে উঠে আসছে।

—খোকন, কোথায় যাচ্ছ? তাঁর মা ঘাড় ফিরিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন।

—কেন স্বর্গে যাচ্ছি। শিশু ডুমাস উত্তর করলেন।

—বালাই ষাট, কিন্তু কি জন্যে?

—ভগবানের সঙ্গে এক হাত লড়তে যাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি কেন তিনি আমার বাবাকে মেরে ফেলেছেন?

এ এক আশ্চর্য প্রশ্ন, অদ্ভুত জিজ্ঞাসা!

ঠিক তাঁর থ্রি ম্যাস্‌কেটিয়াসে নাটকের মতই। সেখানে এহেন জিজ্ঞাসার সঙীন খাড়া হয়ে আছে।

ডুমাস শৈশব থেকেই অক্লান্ত, দুর্জয় সৈনিকের মত সমস্ত অনতিক্রম্য বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। কোথাও তিনি নতজানু হন নি।

বংশগতির প্রভাবে তাঁর রক্তে ছিল অভিযান আর যুদ্ধের নেশা। তাঁর পিতামহ রক্তের আবেদনে নরমান্‌ডি থেকে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন স্যান ডোমিন্‌গোর উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস পরিবৃত হয়ে সেখানে তিনি সম্রাটের মত দিনপাত করেছিলেন। তিনি এক ক্রীতদাস কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এই মুলাট্টো রমণীর গর্ভে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মায়। তার নাম রাখা হয় টমাস আলেকজেণ্ডার।

টমাস তাঁর বাবার স্বভাবের সেই তর্জন তম্বিকে পেয়েছিলেন নিজ-প্রকৃতিতে। সৈনিক হবার স্পৃহাও ছিল তাঁর অন্তরে।

—আমি সেনাদলে নাম লেখাতে চাই। পুত্র পিতার অনুমতি চাইলো।

—বহুৎ আচ্ছা। পিতা জবাব দিলেন। বল্লেন: তবে তোমার মা'র নামেই নাম লেখাবে, বুঝলে। আমার এই অভিজাত বংশের নামে এক মুলাট্টো সৈনিকের নাম লেখাবে, এ আমি চাইনে।

তারপর ১৭৯৩ সনে আলেকজেণ্ডার ডুমাস নামে ফরাসী সেনা বিভাগে যোগদান করেন। এবং মাত্র সাত বছরের মধ্যে সাধারণ সেনা থেকে তিনি সেনাপতি পদে উন্নীত হন।

তিনি ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। একাধারে সাহসী এবং কোমল স্বভাবের। যেমন চিন্তাশীল, তেমনি প্রেমিক যোদ্ধা—যেন অভিজাত মলাট্টো বংশের আদর্শ। তাঁর বর্ণ ছিলো কালো,

মাথার চুল ছিলো বাদামী রঙের। তিনি প্রাইবেন্স দুর্গ দখল করে হাজারখানেক সৈনিকদের বন্দী করেন।

তিনি একা এক হাতে একদল অষ্ট্রেলিয়ান সেনাবাহিনীকে পরাভূত করে একটি সেতু রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সর্বদা পুরোভাগে থাকতেন। একবার একটি যুদ্ধে তিনি মৃতদের চিত্তেও আতঙ্কের সঞ্চার করেছিলেন।

সেনাপতি তুমি কি আহত হয়েছ? একজন সেনাধ্যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

—না, আমি এত, এত সৈনিকদের নিহত করেছি। তিনি সানন্দে জবাব দিয়েছিলেন।

ভয়াবহ রিপাবলিক সংগ্রামে তিনি নেপলিয়ানের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। নেপোলিয়ান যখন এক নায়কত্বে ব্রত হলেন, তখনও তিনি ছিলেন রিপাবলিক দলে। তিনি তখন সেনা বিভাগ থেকে বরখাস্ত হলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর বিবাহ হয়েছে। তিনি তখন একটি পুত্রের পিতা। পুত্রের ওজন ন' পাউণ্ড লম্বায় আঠারো ইঞ্চি।

—ভগবানকে ধন্যবাদ! ছেলেকে দেখে তাঁর মা মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন: আমার পুত্র শ্বেতাঙ্গ হয়েছে। তার চামড়াও কটা, পাতলা চুল আর নীল চক্ষু। কেবল মুলাট্টোদের মত ঠোঁট হয়েছে পুরু।

বাপ মা ছেলের নাম রাখলেন আলেকজেণ্ডার। অতি শৈশবেই ছেলেটি ছিল দেহে মনে বলিষ্ঠ। আর সে পেয়েছিল বিদ্রোহীর মেজাজ।

—দুষ্টু নেপোলিয়ান আমার বাবাকে অসম্মান করেছেন, এ আমার কাছে অসহ্য। আমি আজীবন দুষ্ট লোকেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো।

তাঁর মা চেয়েছিলেন পুত্রকে সুপণ্ডিত করে তুলতে। পুত্র কিন্তু তথা কথিত শিক্ষা দীক্ষাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। মা তখন চাইলেন পুত্রকে একজন দক্ষ বীণাবাদক করে তুলতে। কিন্তু সঙ্গীতে তাঁর ছিল বীতরাগ। পরিশেষে তিনি পুত্রকে পাদ্রী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ডুমাস তখন অনন্যোপায় হয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান। এবং অনেকদিন একটা বনে আত্মগোপন করেছিলেন।

তাঁর মা তখন হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলেন। তাঁর লেখাপড়ারও পাট উঠল। তবে ভালোর মধ্যে তাঁর হস্তাক্ষর সুন্দর। কিন্তু অমন সুন্দর করে লিখতে যে কোন নির্বোধও পারে।

তা' বলে আলেকজেণ্ডার ডুমাস জড়ধী ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, মন ছিল খোলা, এবং এই বিশ্ব জগৎকে আলিঙ্গন করতে পারে এমন ছিল তাঁর উদার অন্তর। যদিও পাঠ্য কেতাব অধ্যয়নে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তিনি ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসতেন। তখনকার ঘটনাসঙ্কুল দিনে—দু'কদম হাঁটলেই—অনেক কিছুই চোখে পড়ত। ১৮১৫ সনে আলেকজেণ্ডার দেখলেন ভির্লাস কটোরেটর্সের রাস্তা দিয়ে তীব্রবেগে একটা ঘোড়ার গাড়ী ছুটে চলছে। পর্দার অন্তরাল থেকে দেখলেন গাড়ীর ভিতরে একজন মানুষ বসে রয়েছে। কি বলিষ্ঠ দৃঢ় আর ঋজু তাঁর চেহারা।

সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি আর কেউ নন, স্বয়ং নেপোলিয়ান। তিনি চলেছেন ওয়াটারলুর

যুদ্ধক্ষেত্রে। দিন কয়েক পরেই তিনি দেখলেন সেই গাড়ীটাই রাস্তার বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে। গাড়ীর ভিতরে সেই লোকটিই বসে ; অথচ কি বিষণ্ণ ভাবনায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে আছে। তিনি ওয়াটারলুর রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছেন।

নেপোলিয়ানের মৃত্যুর পর ডুমাসের মাতা তাঁর ভাগ্য আর তাঁর পদমর্যাদাকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। তিনি একদিন পুত্রকে ডেকে বললেন : হয় তুমি তোমার পিতার অভিজাত পদবী অথবা শুধু ডুমাস—এই দুটির যেকোন একটিকে বেছে নিতে পারো।

—আমি আলেকজেণ্ডার ডুমাস-ই থাকতে চাই। তরুণ বিদ্রোহী পুত্রের মুখ থেকে এই জবাব এলো।

তথাপি তাঁর মনে এই আত্ম-জিজ্ঞাসা জাগল। কে এই আলেকজেণ্ডার ডুমাস? সেই কৃষ্ণকায় পিতামহের প্রপৌত্র? জীবিকার জন্য সে কি করবে? তাঁর পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা এই সমস্যা সমাধানের পথ বাতলে দিল। তিনি অবশেষে সামান্য নকল নবিশ কেরানীর চাকুরী গ্রহণ করলেন।

এই অফিসে এসে কলমপেশার চেয়ে অনেক বেশী বই পড়তে শুরু করলেন। এমন কি কর্মকর্তাদের বিরক্তি উৎপাদন করেও। তিনি ভলটেয়ার প্রভৃতি যারা বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন, তাঁদের লেখা পড়তে শুরু করলেন।

কিন্তু ক্রমে তিনি বুকের মধ্যে অন্য এক ধরনের প্রদাহের স্বাদ পেলেন। সে হলো কামনার স্ফুলিঙ্গ, আসক্তির আগুন। তিনি যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর দীঘল সুদর্শন অবয়ব, আর শুভ্রোজ্জ্বল হাসি অন্যদের আকর্ষণ করে। বিশেষ করে মেয়েদের কাছে তার একটা সম্মোহিনী শক্তি আছে। এই শক্তির হাতিয়ারকে তিনি কাজে লাগালেন। এডেলি ভ্যালভিন নামে একটি তরুণীকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করতে উদ্যোগী হলেন।

ব্যাপারটা সহজ বলেই প্রতিপন্ন হলো। ভ্যালভিনকে তিনি আয়ত্তে আনলেন। তিনি এই প্রেমঘটিত বিদ্যা চর্চায় লাগলেন অতন্দ্রভাবে। অল্প দিনেই তিনি ভিলরস কোটেরেটস নগরীর ডন জোয়ান হয়ে উঠলেন।

তারপর তাঁর মনে জাগলো আর একটা নতুন আকাঙ্ক্ষা। জগতে একদিন যিনি বরেণ্য হবেন, একটা ছোট্ট শহরে আবদ্ধ হয়ে কি তাঁর সেই প্রতিশ্রুত প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটবে? কোথাও যদি যেতেই হয়, তবে প্যারী নগরীই তো প্রশস্ত স্থান।

কিন্তু কি ভাবে সেখানে যাওয়া যায়? তাঁর মা তো খুবই গরীব; আর তার আয়ও যৎসামান্য। কোন ভরসায় তিনি প্রমোদ ভ্রমণে প্যারীতে যাবেন? খরচ যোগাবে কে?

কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রবল, সেখানেই পথ আছে। একটা না একটা সুযোগ বাধার অর্গল খুলবেই খুলবে।

সেই সুযোগ এলো।

ইতিমধ্যে তিনি একজন দক্ষ খেলোয়াড় রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ফেলেছেন! একদিন এক সরাইখানার বিলিয়ার্ডের টেবিলে উপস্থিত প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে বসলেন। সেই

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে যে অর্থ সংগ্রহ করলেন, সেই পাথেয় নিয়েই তিনি প্যারী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

প্যারীতে পৌঁছেই তিনি ফ্রানকিয়াস রঙ্গালয়ে গিয়ে উঠলেন। খ্যাতনামা ট্র্যাজিক অভিনেতা টালমার সাজঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তখন তাঁর বুকের মধ্যে আশার বিদ্যুৎ খেলছে—যে তড়িৎ শিখার শেষ নেই।

তাঁর উৎসাহ দেখে প্রবীণ অভিনেতা খুশী হলেন।

—তুমি কি করো হে? প্রবীণ অভিনেতা শুধালেন।

—আমি নটারস-এর কেরানী। কিন্তু আমার ইচ্ছা লেখক হবো।

—কেন হবে না। প্রবীণ অভিনেতা উৎসাহ দিয়ে বললেন: কারলাইলকে চেনো? সেও একদিন…তোমারই মতন…থাক সে কথা…আপাতঃ করনিকের কাজই করো।

—মহাশয়, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ডুমাস বললেন: যাতে আমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, সেজন্য আমাকে আশীর্বাদ করুন।

—নিশ্চয় করবো। ডুমাসের কপালে হাত রেখে তিনি বললেন: আমি শেক্সপীয়ার কারলাইল শীলার প্রভৃত্তির নামে কবি হও বলে তোমাকে আশীর্বাদ করছি।

সেই প্রধান অভিনেতা যতটা পরিহাসের সঙ্গে এই আশীর্বাদ করে ছিলেন, তার মধ্যে সেই আনুপাতিক আন্তরিকতা ছিল না। কথাটা যাই হোক না কেন, ডুমাসের একাগ্রতার কাছে কথাটা কিন্তু আদৌ পরিহাস যোগ্য ছিল না। নতুবা কাজের মাধ্যমে সব পরিহাস বাক্যকে সত্য করে তুলবেন কি করে? তাই তিনি সচেষ্ট হলেন, এই ভবিষ্যৎ বাণীকে সফল করে তুলতে। তিনি যেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, কেবল 'টালমা' নয় সমস্ত জগতের কাছে এর সত্যতা প্রমাণ করবো। এবং নিশ্চয় তা করবো।

এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তিনি স্বগৃহে ফিরে গেলেন। এবং স্কটের 'আইভ্যানহো'র নাট্য রূপ দিতে বসলেন।

নাটক অবশ্য লেখা হলো।

কিন্তু আইভ্যান হোর নাটকের কোন প্রযোজক পাওয়া গেল না। এমন কি তাঁর পরের দু'খানা বই-এরও কোন সদগতি হলো না। তবুও তিনি আশা ছাড়লেন না, আশাবাদের দার্শনিকতায় নিমগ্ন হলেন। আর গল্প নাটক লেখা শুরু করলেন। বার বার এই বিমুখ জগৎ, আর সম্পাদকদের দরজায় ধর্না দিলেন।

যখন কোন প্রযোজক বা সম্পাদক তাকে প্রত্যাখ্যান করতো, তিনি তাঁদের সচিবদের সামনেই হেসে জবাব দিতেন: ধন্যবাদ মঁসিয়ে, আমি কিন্তু সহজে হাল ছাড়ছি না। কিছু মনে করবেন না, আমি আবার আসবো।

শেষ পর্যন্ত অগ্নি পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর 'কুইন খৃষ্টানা অফ্ দি সুইডেন' ফ্রানকাইস রঙ্গালয়ের প্রযোজক মনোনীত করলেন। সুনির্বাচিত অভিনেতাদের নিয়ে মহলা শুরু হলো। একজন তরুণ নাট্যকার এবিষয়ে অগ্রণী হলেন কাজেই সাফল্য পথে অনেকটা

এগিয়েছে ; তখন তিনি সেই চরম দিনের সুযোগ স্বেচ্ছায় হারালেন। অনেকটা মহত্ত্বের আবেগে তিনি তা করে বসলেন।

আর একজন বৃদ্ধ নাট্যকার তাঁকে ধরে বসলো। আজীবন চেষ্টা করে ভদ্রলোক তাঁর কোন নাটকই মঞ্চস্থ করতে পারেন নি। তিনি ঐ একই বিষয় নিয়ে একটি নাটক লিখেছিলেন ; তার একান্ত ইচ্ছা যে, তাঁর নাটকটাই যেন পাদ প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়।

—এই প্রবীণ নাট্যকারকেই এ সুযোগ দেওয়া হোক। ডুমাস মঞ্চাধ্যক্ষকে গিয়ে জানালেন। বললেন : জগৎ রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে, এ সুযোগ তাঁকেই দেওয়া হোক।

এর নাটকীয় ভাবেই তিনি তাঁর নাটকটি প্রত্যাহার করে নিলেন। ঠিক এরই পরে তিনি হেনরি তৃতীয় নামে আর একটি নতুন নাটক লিখলেন। এবার একজন প্রযোজকও জুটলো। তিনি অধীর আগ্রহে সেই প্রথম অভিনয় রজনীর প্রতীক্ষায় রইলেন।

সেই বহু প্রতীক্ষিত স্মরণীয় রজনী এলো ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৮ সনে। ডুমাসও এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণের জন্য তৈরী হলেন। তিনি আগে থেকেই তাঁর পোষাক জমা দিয়েছিলেন।

সেই অভিনয় রজনীর দিন তাঁর সে কি ব্যস্ততা।

—তাড়াতাড়ি কর নইলে দেরী হয়ে যাবে। ড্রেসারকে তিনি তাগিদ দিলেন।

কিন্তু মেকআপ দেওয়ার পর এক সমস্যার উদ্ভব হলো। প্যাণ্ট জুতো সার্ট পরার পর তিনি দেখলেন যে, গলাবন্ধটা আনা হয় নি। তখুনি অবশ্য কার্ডবোর্ড কেটে একটা টাই বানিয়ে নিলেন।

তার পর তিনি অন্তরাল থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন প্রেক্ষাগৃহের দিকে। দেখলেন যে, প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারনের স্থান নেই।

তিনি তখন উর্ধ্বশির,—উদ্দীপনায় দীপ্ত—যেন আকাশের তারা থেকে সেই অদম্য শক্তির শিখাকে আহ্বান করছেন! দীর্ঘ দেহী এই মুলাট্টো যুবক তখন যেন রঙ্গমঞ্চের নতুন অধিপতি।

অভিনয় হলো, চরম সাফল্যের স্বয়ং লেখক যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন হাততালি আর প্রশংসা, চীৎকারে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে।

ডুমাস যেন তাঁর নিজস্ব রাজ্যে প্রবেশ করেছেন—যেন মঞ্চে নীল লোহিত আলোয় তার নব জন্ম হয়েছে! মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি সহাস্যে গ্রহণ করলেন দর্শকদের অভিনন্দন। আকণ্ঠ পান করলেন গৌরবের বিশুদ্ধ বায়ু। সেই দৃশ্য দেখে মনে হলো যেন এক তরুণ যুবক অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় আছে।

এর পর যেন তাঁর উৎসের মুখ খুলে গেলো। নাটকের পর নাটক লেখা চললো। সে কী উন্মাদনা। নতুন নাটক, অনেক জয়োদ্দীপ্ত সাফল্য আর কামিনী কাঞ্চনের মুখ দেখলেন ডুমাস।

তাঁর জীবননাট্যে এলো আবার নতুন অভিযান। মসী ছেড়ে তিনি অসি ধরলেন। সে এক রাষ্ট্র বিপ্লব উপলক্ষে। দশম চার্লস প্রেসের স্বাধীনতা হরণ করে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন। তার বিরুদ্ধে প্যারীর বুদ্ধি জীবী সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

ডুমাস সেই আন্দোলনে যোগদান করলেন।

এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে ডুমাস বন্দুক চালনার চেয়ে ঢের বেশী গলাবাজি করলেন।

মাছি যেমন ঘোড়ার গাড়ীর চাকার চারপাশে ভনভন করে উড়ে, যুদ্ধের নামে তিনি তেমনি ভাবে ছুটোছুটি করলেন। তাঁর চোখে মুখে উত্তেজনা আর এমন বারুদের গুঁড়ো লাগলো যে, যে দেখলো সেই তাঁকে বাহবা জানালো।

—মিঃ ডুমাস! তাঁকে আলিঙ্গন করে লোকটি আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন। বললেন: সত্যিই এইমাত্র তুমি তোমার প্রথম নাটককে পেয়ে গেছ।

ডুমাস তাঁর এই প্রশংসায় উৎফুল্ল হলেন। তাঁকে ফরাসী শ্রমিক আন্দোলনের কাজের দায়িত্ব দিলেন। লোকটি সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন। অদ্ভুত ধরনের সাজ পোষাকে সজ্জিত হয়ে চললেন কৃষক আন্দোলনের সংগঠনে। সেই সংগঠনে তিনি কিন্তু তেমন সাফল্য লাভ করতে পারলেন না।

সে বিদ্রোহ ছিল অকৃতকার্যতার। বিদ্রোহীরা মন্দ রাজার পরিবর্তে আরও খারাপ রাজাকে সিংহাসনে বসাতে পেরেছিলো। এই রাজনৈতিক অকৃতকার্যতা থেকে তিনি ফিরে এলেন সাহিত্যিক সফলতার ক্ষেত্রে।

তিনি "য়্যানোটমি" নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। চিরন্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে সে এক অভিনব নাটক। সে নাটক দেখতে সমস্ত প্যারী নগরী যেন ভেঙে পড়লো,—অশোভন, উত্তেজিত বিদ্রোহে!

অভিনয়ের প্রথম রজনীতে সে কি উত্তেজনা! উত্তেজনার আবেগে মেয়েরা তাঁর কোট টেনে ছিঁড়ে ফেললো। সকলে একবাক্যে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে বললে: হে দুঃসাহসিক তরুণ নাট্যকার বিদায়! তুমি কী আনন্দউজ্জ্বল তরুণ!

সেই জমকালো ওয়েষ্টকোট পরিহিত দুঃসাহসী প্রাণোদ্দীপ্ত মুলাট্টো তরুণ ক্রমেই ঘূর্ণায়মান ভাগ্যচক্রের শীর্ষে উঠতে শুরু করলেন। নাটকীয় দৃশ্যের মত তাঁর জীবনে ঘটলো পুত্র লাভ, বিবাহ বিচ্ছেদ, কলেরার কবলে পড়া, আর একটি সার্থক নাটকের রূপায়ণ; আবার একটি বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ, ধরা পড়ার ভয়ে সুইজারল্যাণ্ডে পলায়ন—তারপর ধর্মযাজকের পদ গ্রহণের অভিপ্রায়।

আর কি নয়? নতুন নাটকের স্রষ্টা আমি, এক নতুন বিধিব্যবস্থার পত্তন করে যাবো। তাঁর মনে এহেন খেয়ালের উচ্চাকাঙ্ক্ষা উঁকি দিলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্যক অবহিত হয়ে তিনি সে মতলব ত্যাগ করলেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যে যে আগ্নেয়গিরি ছিল, তা কোন দিনই তাঁকে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে দেয় নি। জাগতিক আনন্দের স্বাদ এতই উপভোগ্য, এত সুস্বাদু যে, স্বর্গ লাভের প্রতিশ্রুতি তার স্থান পূরণ করতে অক্ষম। তাই তিনি বলেছিলেন যে, আমি সারা জীবন পৌত্তলিক থাকবো, তার জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তা দিতে অনিচ্ছুক নই।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পৌত্তলিকই ছিলেন। তিনি নানা শ্রেণীর পুরুষদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করেছেন, তাদের মন হরণ করেছেন; নাটকের পর নাটক লিখেছেন। তিনি সাফল্য আর অসাফল্যকে সহজ স্বভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছেন।

প্রশংসা শুনে ভ্রু কুঞ্চিত করেছেন, অবমাননাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন।

তথাপি যখন অপমানটা মারাত্মক হয়ে উঠেছিল, তখন অট্টহাস্যের তীব্রতা দিয়ে তাকে প্রতিবাদ করেছেন। একদিন একজন যুবক ঠাট্টা করে তাঁর বংশ পরিচিতি জানতে চেয়েছিল।

—আমার পিতা। ডুমাস তৎক্ষণাৎ উত্তর করেছিলেন। বলেছিলেন: আমার পিতা হলেন ক্রীয়োল, আর পিতামহ ছিলেন নিগ্রো, এবং আমার প্রপিতামহ ছিলেন একটি হনুমান। মনে হয় আমার বংশের সেখানেই সূত্রপাত, যে জন্ম ভিটে তুমি ছেড়ে এসেছ।

একদা ব্যালজাকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যালজাকই ছিলেন তাঁর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি এই তরুণ নাট্যকারকে খোটা দিয়ে তাঁর অসাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, যখন আমার প্রতিভা পড়ে আসবে, তখন আমি নাটক লিখবো।

—তা হলে তো এখুনই আরম্ভ করতে হয়। সোচ্চারে ডুমাস মন্তব্য করেছিলেন।

১৮৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জীবন-নাট্যের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। মণ্টপারসের একজন প্রতিভাশালিনী মহিলা এলেন তাঁর সর্বাধুনিক নাটকের একটি ভূমিকায় অভিনয় করতে। মহিলাটির নাম ইডা ফেরিয়ার। টেরেসা (Teresa) নাটকের শেষ যবনিকার পর, সেই অভিনেত্রী জয়োল্লাসে ডুমাসকে জড়িয়ে ধরে বললেন: মিঃ ডুমাস, তোমার জন্যই আমার এই সুখ্যাতি। কেমন করে আমি তোমার এ ঋণ শোধ করবো।

—খুব সহজেই। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সেই অপ্রতিহত হাসির ঢেউ তুলে ডুমাস জবাব দিলেন।

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। এবং পাকাপাকি। অনেক বছর সেই মহিলাটি ডুমাসের সঙ্গে বসবাস করলেন। হয়তো সেই ঋণ পরিশোধের অভিপ্রায়। শেষপর্যন্ত সকলকে অবাক করে দিয়ে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ডুমাস যেন হঠাৎ ঘরকন্নায় মন দিলেন। এতদিনের সেই অশান্ত বিদ্যুৎ কি শৃঙ্খলাবদ্ধ হলো?

কিন্তু তাঁর সেই অদম্য প্রবল শক্তির কাছে আলগা শিকলের বাঁধন কতক্ষণ টেকে? বার বার তিনি সেই তাগিদে গিয়েছেন দূর দূরান্তরের অভিযানে।

তিনি নিত্য নতুনের অনুসন্ধান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সদা সর্বদাই চেয়েছেন নতুন উত্তেজনা, নতুন কামনা আর নতুন স্তুতিবাদ। তখন ডুমাসের পোয়াবারো। রঙ্গমঞ্চে জয় জয়কার অহরহ বর্ষিত হচ্ছে তাঁর উপর। জগতের সর্বত্রই তখন বিদ্রোহের আগুন নিভে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর তড়িৎ-শক্তি অন্য নতুন পথ খুঁজছে। কিন্তু কোথায়, কেমনভাবে তা পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ আর একটি পথ খোলা আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখায় হাত দিলেন তিনি। ভাবলেন মৃত অতীতকে ফিরিয়ে আনতে হবে আনন্দমুখর জীবনে। রোমান্সের রাজা ওয়ালটার স্কট তখন প্রায় মৃত। সেই মৃতের জগতে দীর্ঘজীবী হোন রাজা—আলেকজেণ্ডার ডুমাস;

ঐতিহাসিক রোমান্টিক উপন্যাস 'থ্রি মাসকেকটিয়াস' লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন ডুমাস। ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি সাহায্য নিলেন পণ্ডিত আগষ্ট ম্যাকুইটের। ইতিহাসে মৃত ঘটনাবলীর চেয়ে জীবন্ত সত্যের দিকেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, তখনই ইতিহাসের পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব, যখন আমরা ভাবতে পারি যে,

ইতিহাসের গর্ভে আমার একটি সন্তান জন্মেছে।

এবার শুরু হলো উপন্যাস লেখার পালা। অক্লান্ত ভাবে চললো লেখালেখির কাজ। সকাল সাতটা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত লেখার কাজ চললো এক নাগারে। দুপুরের আহার্য তাঁর পাশেই ঢাকা পড়ে থাকতো। লেখার সময় কোন দর্শক বা অতিথি এলে তাদের সঙ্গে তিনি বাঁ হাতে করমর্দন করতেন। আর ডান হাতে চালিয়ে যেতেন লেখার কাজ।

আবেগ নিরুদ্ধ হৃদয়ে রাত্রেই তিনি বেশী লিখতেন। তাঁর এই হৃদয়াবেগই ছিল নাট্যকারের আবেদন। তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মধ্যে বাস করতেন, তাদের সঙ্গে কথা কইতেন। এমন কি দিব্যি হাস্য পরিহাসও করতেন। তখন বাইরে থেকে কিছু বোঝবার জোই ছিল না যে, ঘরের মধ্যে কার সঙ্গে তিনি কথা কইছেন।

তার একটা স্মরণীয় দৃষ্টান্তও আছে। শোনা যায় যে, একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

ডুমাসের ঘরের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে একটা উচ্চ হাসির রোল ভেসে আস্‌ছিল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভদ্রলোক ডুমাসের চাকরকে শুধালেন, "আচ্ছা বলতে পারো, কখন তোমার মনিবকে একলা ঘরে পাওয়া যাবে?

—কেন বলুন তো?

প্রয়োজন আছে,—ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।

—ওঃ, এই কথা। চাকরটি জবাব দিয়ে বল্লে: যান্‌না ভিতরে, আমার মনিব একাই আছেন। তবে দিনে তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে বাস করেন। রাত্রে দেখা দেন যেন তাদের সুহৃদ রূপে।

—এত পরিশ্রম করেও কেমন করে তুমি দেহ মনে এত প্রফুল্ল, এত সতেজ থাকো? আগন্তুক শুধালে।

—তার কারণ ডুমাস বল্লেন: আমি যা' লিখি তার মধ্যে এতটুকু ক্লান্তি আসে না...... কেননা, আমি হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে আমি যাকে তৈরী করি, সেগুলি কেবল জড় অপদার্থ নয়, তারা আমার আনন্দের আশীর্বাদ।

—'তা' হলে? আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলো।

—আমি গল্প তৈরী করি না। গল্পগুলো আপনিই আমার মনে এসে জন্ম নেয়।

—কি ভাবে তা সম্ভব? আগন্তুক শুধালো।

—আমি তা' জানি না। একটা পাম গাছকে জিজ্ঞাসা করো, সে কি ভাবে ফল দেয়, তার জবাব পাওয়া যাবে না। সেই নিরুত্তরই আমার উত্তর।

এহেন রহস্যময় বিরল সৃজনী-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করার আরও অদ্ভুত ধরণের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো তাঁর। সব সময় তাঁর হৃদয় আর আবাসের দুয়ার থাকতো সর্বদা উন্মুক্ত।

ডুমাসের মধ্যাহ্ন ভোজের সময় নির্ধারিত ছিল সাড়ে এগারটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত।

তাঁর গৃহে অতিথি-অভ্যাগতের আনাগোনার বিরাম ছিল না। নিত্যই নতুন অতিথি আসছে, আর তাঁর চাকরকে ছুটতে হচ্ছে কসাইখানায় মাংস আনতে। অথবা রেস্তরায় কাটলেটের জন্যে।

ডুমাস মিশুকও ছিলেন খুব। যখন তাঁর হাতে কোন কাজ থাকতো না, তখন তিনি অবাধে অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে মিশতেন। অতিথিদের অধিকাংশ রবাহূত হলেও, অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হোতো না কোন দিন।

—দয়া করে কি আমাকে ঐ ভদ্র লোকটির সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন? একজন অতিথি ডুমাসকে অনুরোধ করলেন।

—দুঃখিত, আমার দ্বারা একাজ হবে না। ডুমাস জবাব দিলেন। বল্লেন: আমি নিজেকেই আজ পর্যন্ত অন্যের কাছে পরিচিত করাই নি।

তাঁর ঔদার্য এমনই ছিলো যে, সেই মহত্বের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে তাঁর অর্জিত অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফলে তিনি প্রায় আকণ্ঠ ঋণ জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেরিফের এক কর্মচারী ডুমাসের ঘরে নিয়মিত যাওয়া আসা করতেন।

একদিন এক বন্ধু এসেছিল তাঁর কাছে। একজন মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার জন্য সাহায্য চাইতে। লোকটি গরীব হলেও, বড় দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেল।

—কে সেই হতভাগা যে মারা গেছে? কোন শেরিফের কর্মচারী?

—না, একজন পেয়াদা।

—সেই জন্যই তুমি তাকে কবরস্থ করছো? বেশ ডুমাস সোচ্চারে বল্লেন: তা' হ'লে আরও পনের ফ্রাসিস্ নাও, দু'জনকে কবর দেওয়ার জন্য।

ডুমাসের পকেট যখন শূন্য, তখন তার তুঙ্গে বৃহস্পতি। খ্যাতি আর ক্রমোন্নতির উর্ধ্বগতি। ইতিহাসকে তিনি উপন্যাসে, আর উপন্যাসকে ইতিহাসে রূপান্তরিত করে চললেন। তাঁর "মণ্টে ক্রিস্টো"—যদিও ম্যাকেটের সহযোগিতায় বিরচিত—একটি খাঁটি রোমান্সের উদাহরণ। তাঁর চরিত্রগুলি এতই জীবন্ত যে, সেগুলি আজকের যুগেও আদর্শ মডেল হয়ে আছে। নারসেলিস্ ভিজিটার হাউসে-মারসিডিস্ আর মরেল-এর দিকে ইংগিত আছে। গল্পের কাঠামোটি দান্তের এব্বেকি ফ্যারিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। মেঘ আর ধোঁয়া থেকে ডুমাস যেন সৃষ্টি করেছেন নিটোল আলোয় আর একটি সজীব মানুষ।

এটাই কিন্তু ডুমাসের আসল উদ্দেশ্য নয়। তিনি চেয়ে ছিলেন হয় সৃষ্টি করতে, না হয় আনন্দ দিতে অথবা উপভোগ করতে।' লেখকের কাজ হলো, তিনি মন্তব্য করেছেন যে, খুসী মনে লেখা, যাতে পাঠক তা পড়ে আনন্দে বাস করতে পারে।

যে আর্টের সে শক্তি নেই, তা' মানুষকে খুশী করতে পারে না। আদত কথা তিনি প্রাণ ঢেলে লিখেছেন। তখনও পণ্ডিত বা কবি হওয়ার ভাণ করেন নি। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল সুদক্ষ গল্প বলিয়ে হওয়ার।

তিনি হামেসাই বলতেন যে, যে বিষয়ে তোমার কোন অধ্যয়ন নেই, তুমি সেই ঘটনার

কথা লেখো। কথাটা খাঁটি। ডুমাসের উপন্যাস সম্পর্কে একজন রূঢ় সমালোচক এই মন্তব্য করেছিলেন।

তার উত্তরে ডুমাস কড়া জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, যদি ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েই সব সময় ব্যয় করতাম, তা' হ'লে লেখার সময় পেতাম কোথায় ?

তাঁর বিরুদ্ধ পন্থীরা অভিযোগ করতেন যে, ডুমাস উপন্যাস লেখার কারখানা খুলেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা এই যে, ম্যাকরেট বা অন্যান্য সহকারীরা তাঁকে কেবল ঐতিহাসিক উপাদানগুলিরই যোগান দিয়েছিলেন, আর ডুমাস কল্পনার ফুঁ-দিয়ে সেগুলির মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। আরবীয় গাল্পিকদের মতই তিনি তাঁর কর্মশালায় জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত বাস করেছিলেন মরুভূমির তারকাখচিত আকাশের দিকে চেয়ে। এত সতর্কতার শেষেও তাঁর সাফল্যের পিয়ালা ঈর্ষার বিষে কটু হয়ে উঠেছিল। সেই তিক্ততার মধ্যে অহমিকার মিশেলও ছিল। 'লেডি অফ্ দি ফ্যামেলি' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। সেটি নাট্যরূপে মঞ্চস্থ করার সময় নামকরণ হয়েছিল 'ফ্যামেলি'—যার জনপ্রিয়তা ডুমাসের অন্যান্য গল্পের খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছিল। সেখানে পিতা পুত্রের এক দ্বন্দ্বের ছবি আঁকা হয়েছে। বাপ চায় ছেলেকে, ছেলে চায় বাপকে হটিয়ে দিতে। পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষা করে, অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, তারা দু'জনেই দু'জনকে ভালোবাসে। পরস্পরের প্রশংসা করে।

এই নাটক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এই : আমি একটি ছেলেকে রসিক রূপে গড়ে তুলেছি, যে আদতে সাপের মতই খল। আর আমি পিতার ভূমিকায় যাকে বসিয়েছি, সে একটি শিশু মাত্র।

তাঁর চরিত্র ছিল এই বাপের মত। স্বভাবে বিনি অবিধ্বংসী, হাস্য পরিহাস প্রিয় অভিযানেচ্ছু। অথচ অন্তরে তিনি ছিলেন শিশুরই মতন।

যদিও বয়স কালে সাফল্যের আনন্দে তিনি একটু দুর্বল কুঁজো হয়ে পড়েছিলেন, তথাপি মনের দিক থেকে তিনি যেমন তরুণ, তেমনি দুর্দান্ত ছিলেন। যখনই কোথাও কোন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সেখানেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

১৮৩৮ সালে তিনি একটি জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে পরিচালিত করে প্যারী অভিমুখে যাত্রা করার জন্য তৈরী হয়েছিলেন। কিন্তু সেই বাহিনী তাঁর নেতৃত্ব মানতে রাজী হন নি।

১৮৫৯ সাল তিনি গ্যারিবলদির দলে যোগদান করেছিলেন ; এবং তাঁর গচ্ছিত ৫০,০০০ ফ্যাঙ্কস দান করে দিয়েছিলেন।

তার চার বছর পরে তিনি এক গ্রীক বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে তুরস্কে অভিযানে গিয়েছিলেন।

তাঁর অদম্য শক্তি চেয়েছে কাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে। সেই অদম্য ইচ্ছার তাগিদে তিনি কখনই স্থির হয়ে থাকতে পারেন নি।

একদা তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইতালী থেকে প্যারীতে ফিরে এলেন—এক বিদ্রোহী পরিদর্শকের পদে। তাঁর পুত্র ষ্টেশনে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তখন রাত্রি দশটা।

—তুমি নিশ্চয় পরিশ্রান্ত হয়েছ, বাবা আমি তোমাকে বাসায় নিয়ে যেতে এসেছি।

—না বাবা, তা হয় না। ডুমাস উত্তর করলেন। আমি শয্যা গ্রহণ করবার আগে

গাউটিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেখানে চললেন।

তাঁরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুলেন তখন গাউটিয়ার দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুমাচ্ছেন।

তিনি চিৎকার করে তাঁর ঘুম ভাঙালেন।

—কে ওখানে? গাউটিয়ার চেঁচিয়ে উঠলেন।

—পিতা পুত্রে আমরা দু'জনেই। ডুমাস জবাব দিলেন।

—কখন তোমরা শুতে যাবে?

—সেই শেষ রাত্রে। হে কুঁড়ের সর্দার বাইরে এসো। সকলেই উঠে পরো।

রাত্রি চারটের সময় পিতা-পুত্রে ঘরে ফিরলেন। ফিরেই তিনি পুত্রকে বললেন: এখুনি একটা আলো জ্বেলে আনো।

—এখন আলো দিয়ে কি হবে?

—আমাকে একটু কাজ করতে হবে।

ছেলে তখন তাঁর বাপকে টেবিলের সামনে বসিয়ে দিয়ে শুতে গেলেন। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন পুত্র দেখলেন যে, পত্রিকার জন্য দু তিনটি প্রবন্ধ লেখা পড়ে রয়েছে টেবিলের উপর।

ডুমাস তখন একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে কামাতে গান গাইছেন।

—কেমন আছ বাবা?

—ডেজি ফুলের মতই তাজা আছি, পুত্র! তারপর চোখ কুঁচকে বললেন, তোমরা যুবক চেয়ে দেখো, বুড়ো হলেও, তোমাদের মত অত সহজে ক্লান্ত হইনে।

অবশেষে আটষট্টি বছর বয়সে তিনি লেখালেখি থেকে অবসর নিলেন। বার্ধক্যের অভিযানে তিনি ক্লান্ত হয়েছিলেন বলেই কি অবসর গ্রহণ করলেন?

না। তিনি তাঁর জীবনের শেষ রোমান্সের জন্যই তৈরী হচ্ছিলেন।

সে হলো একটি প্রণয় কাহিনী।

জনৈকা আমেরিকান অভিনেত্রী। নাম তার এ মেন্‌কিন।

সে প্রণয় কাহিনীটি যেমনি আবেগঘন, তেমনি দ্রুত এবং অতি সংক্ষিপ্ত। তার শেষটা বিয়োগান্ত এবং বেদনাদায়ক। ভদ্রমহিলা তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান।

তার পরের ঘটনাটুকু আরও নাটকীয়।

পুত্র, আমি তোমার এখানে মরতে এসেছি। অবিচল কণ্ঠে তিনি এসে বললেন।

তারপর মেঝের উপর তিনি গড়িয়ে পড়ে নিশ্চুপ, নিথর হয়ে গেলেন। তাঁর বন্ধু বান্ধবরা যখন মাথা নেড়ে দুঃখ করে বললেন: এতদিনে ডুমাসের পতন ঘটলো।

কখনই না। ডুমাসের পুত্র প্রতিবাদ করলেন। বললেন, আমার পিতার মন যে দৃঢ় তার কখনই পতন হতে পারে না। যদিও তিনি আজকের এই জাগতিক ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা কইতে নারাজ হয়েছেন, তার কারণ তিনি এখন সেই অনন্তকালের ভাষা অনুধাবন করবার শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

রাজা মদনদেব (যুগ: ৬ষ্ঠ পরি:) ॥
'রাজা পরম ধার্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে না।' মদনদেব যেভাবে হিরণ্ময়ী পুরন্দরের মিলনে সাহায্য করেছেন তাতে তাঁকে স্নেহশীল বলে মনে হয়।

রাধারাণী (রাধা: ১ম পরি:) ॥
'রাধারাণী' কাহিনীর নায়িকা। মধুর গল্পটিতে মধুর রসের যোগান দিয়েছে এই কোমল-মধুর চরিত্রটি। বালিকা রাধারাণীর সারল্য ও কথোপকথনের ভঙ্গী আমাদের মুগ্ধ করে। রাধারাণী শিক্ষিতা ও সুন্দরী। তথাপি তার বাল্য কৃতজ্ঞতার থেকে জন্ম যে প্রেমের, সেই অবুঝ প্রণয়প্রতীক্ষার বৈরাগ্য আমাদের মনে তার রূপটিকে শুচিশুভ্র করে তোলে। রুক্মিণীকুমারের সঙ্গে মিলনে রাধারাণীর আবেগোচ্ছল কথোপকথন তার মার্জিত রুচি ও অনুরাগের গভীরতার পরিচয় বহন করে।

রাজা অমরসিংহ (রাজ: ১।২) ॥
মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র। চঞ্চলকুমারী কর্তৃক তাঁর চিত্রদর্শনের ইঙ্গিত আছে।

রাণা কর্ণ (রাজ: ১।২) ॥
এই রাজপুত রাণার চিত্রের উল্লেখ আছে।

রাণা প্রতাপ (রাজ: ১।২) ॥
মেবারের বিখ্যাত রাণা। তিনি আকবরের কাছ থেকে তাঁর রাজধানী চিতোর উদ্ধারের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করেন। আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম এবং মানসিংহের সঙ্গে ১৫৭৬ খ্রী: হলদিঘাটের যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ১৫৯৭ খ্রী: তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রামকান্ত রায় (কৃ: উ: ১।১) ॥
গোবিন্দলালের পিতা। উপন্যাসে নামোল্লেখ মাত্র আছে।

রামকৃষ্ণ রায় (বিষ: ৩৫ পরি:) ॥
ইনি বৈদ্য? সূর্যমুখীর রোগ ইনিই সারান। ইনি অর্থপিশাচ ছিলেন না। নগেন্দ্রকে ইনি সংবাদ

দেন যে সূর্যমুখী বদ্ধগৃহে পুড়ে মরেছে।

রামগোবিন্দ ঘোষাল (কপা: ১।৮) ॥

পদ্মাবতীর পিতার নাম রামগোবিন্দ ঘোষাল। পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়ে তিনি পাঠানগণ কর্তৃক বন্দী হন এবং পরে ধর্মান্তরিত হন। ধর্মান্তরের পর স্ব-সমাজে চ্যুত হওয়ায় তিনি ঢাকায় গিয়ে রাজকার্যে নিযুক্ত হন। তারপর বাদশার অনুগ্রহলাভের আশায় আগ্রায় যান। সেখানে নিজগুণে বাদশাহের প্রধান ওমরাহদের মধ্যে স্থানলাভ করেন। ধর্মান্তর গ্রহণের পরও কিন্তু আচার-আচরণের দিক থেকে তিনি শুদ্ধ ছিলেন বলে মনে হয়। তাই কন্যার চরিত্রদোষ দেখা দিলে তিনি কন্যাকে পরিত্যাগ করেন। তাছাড়া—'রামগোবিন্দ কিছু উগ্র স্বভাব।'

রামগোবিন্দ ঘোষালের চরিত্রটি বর্ণনার মাধ্যমে ঘটনাসূত্র নির্দ্ধারণের জন্যই আনা হয়েছে।

রামচরণ (চন্দ্র: ২।৫) ॥

রামচরণ প্রতাপের ভৃত্য। এই চরিত্রটিকে অবলম্বন করে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে। সে ব্রহ্মচারী—চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দু'জন নারীকে দেখে চিন্তান্বিত হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে ঠিক, করেছে, চন্দ্রশেখর তাদের সহমরণে প্রবৃত্তি দেবার জন্যেই নিয়ে এসেছেন। এই চিন্তা হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে। প্রতাপের শৈবলিনী উদ্ধারকার্যে রামচরণ বন্দুকের সাহায্যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। বহুস্থানে রামচরণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিপদের দিনেও প্রতাপের সঙ্গে থেকে রামচরণ যথার্থ প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়েছে নিতান্ত সাধারণ চরিত্র হলেও রামচরণ পাঠকের হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ (সীতা: ৩।৯) ॥

মহম্মদপুরের দু'জন সাধারণ নাগরিক। তাদের কথাবার্তায় উপন্যাসের অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

রামরাম দত্ত (ইন্দিরা ৬ষ্ঠ পরি:) ॥

সুভাষিনীর শ্বশুর। ভদ্রলোকের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁকে বেশ রসিক বলেই মনে হয়।

রামসদয় মিত্র (রজনী: ১।২) ॥

উপন্যাস মধ্যে বৃদ্ধ রামসদয় মিত্র তাঁর তরুণী ভার্যা লবঙ্গলতার কৌতুকপ্রবণতায় বিপর্যস্ত। কিন্তু তিনি যেভাবে পিতার সঙ্গে ঝগড়া করে নিজচেষ্টায় কলকাতায় বিষয়সম্পত্তি করেছিলেন, তাতে তাঁকে কর্মযোগী পুরুষ বলেই মনে হয়। রজনীকে সম্পত্তি দিতে তার অনিচ্ছা। তাই তিনি পুত্রের সঙ্গে রজনীর বিয়ে দিতে উৎসুক।

রামানন্দ স্বামী (চন্দ্র ২।৩) ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে যে সমস্ত সন্ন্যাসী বা সিদ্ধপুরুষ আছেন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের রামানন্দ স্বামী তাদের মধ্যে অন্যতম। 'রামানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞান সকলই তিনি জানিতেন।' চন্দ্রশেখরের গুরু হিসাবে তিনি চন্দ্রশেখরকে অনেক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন। এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? হয় তো শৈবলিনী ছাড়া চন্দ্রশেখরকে সান্ত্বনাদান বা পথপ্রদর্শনের জন্য বঙ্কিম রামানন্দ স্বামীর এই দীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করেছেন।

দলনী ও শৈবলিনীর সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে রামানন্দ স্বামীর হস্তক্ষেপ আছে। তবে শৈবলিনীর চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনেই রামানন্দকে বিশেষভাবে আনা হয়েছে বলে মনে হয়। রামানন্দ শৈবলিনীকে চিত্তশুদ্ধির জন্য দ্বাদশ বৎসর ব্রতপালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ পর্যন্ত যুক্তিশীল মন গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারপর রামানন্দ যখন চন্দ্রশেখরের কাছে শৈবলিনীর মনের কথা বিকাশের জন্য 'যোগবল' দান করেছেন, তখন চরিত্রটি অলৌকিকতার স্তর স্পর্শ করেছে। অবশ্য অনেকে এই যোগবল-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের দিক থেকে এ সবের খুব বেশি প্রয়োজন ছিল না, যতটা ছিল নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের। তবে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর একত্র বসবাসের নির্দেশ দান করে রামানন্দ সহজ মানুষের মতই ব্যবহার করেছেন।

রামানন্দ যে সর্বজ্ঞ নন, তাঁরও যে মানবজীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আছে তা বঙ্কিম প্রকাশ করেছেন—'রামানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন, 'আমি এতকাল সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সর্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না! এসমুদ্রের কি তল নাই? (৬।১)॥ এর দ্বারা এই চরিত্রটি কিছুটা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে।

সবশেষে প্রতাপের নিঃস্বার্থ মহৎ আত্মত্যাগের জন্য এই মহাপুরুষের শ্রদ্ধাবনত চিত্তের বাণী রামানন্দস্বামীর চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

রাসবিহারী দে (কৃঃ উঃ ২।৬)॥

নিশাকর দাস প্রসাদপুরে গিয়ে গোবিন্দলালের নিকট এই ছদ্মনাম প্রকাশ করেন।

রুক্মিণীকুমার রায় (রাধা ১ম পরিঃ)॥

রাধারাণীর কাছ থেকে রথের মেলায় ফুল কিনে ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করেছিলেন রুক্মিণীকুমার রায়। এঁর প্রকৃত নাম রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইনি দয়ালু সন্দেহ নাই, কিন্তু রাধারাণীর প্রতি দয়া কেবলমাত্র দুঃখীর প্রতি কৃপা নয়, অনুরাগের রাগেও রঞ্জিত। অন্ধকারের কণ্ঠস্বর ও স্পর্শ কত সুন্দর হয় জানি না, কিন্তু রুক্মিণীকুমারের কাছে সেই স্মৃতি যে অনির্বাণ ছিল, তাতে তাঁর একাগ্রতার পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই। যুবতী রাধারাণীর সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর সুরুচি, ভদ্রতাবোধ ও মার্জিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রাধারাণীর যোগ্য স্বামী।

রূপসী (চন্দ্র : ২।৪) ॥
সুন্দরীর ভগিনী এবং প্রতাপের স্ত্রী রূপসী 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের উপেক্ষিতা চরিত্র। এই চরিত্রটি আরও বিস্তারিত হতে পারত, কিন্তু কাহিনীর জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাবার আকাঙ্ক্ষায় বঙ্কিম তাকে তত গুরুত্ব দেননি। সুন্দরীর সঙ্গে শৈবলিনীহরণ সম্বন্ধে কথোপকথনের সামান্য পরিস্থিতিতে তার উপস্থিতি।' সে দিদিকে বলেছে—'দিদি, তুই বড় কুঁদুলী।' ফলে এর বিপরীত চরিত্র হিসাবে—সহজ সরল, গ্রাম্য, পতিপরায়ণ স্ত্রীরূপেই রূপসীর ছবি আমাদের কল্পনা করে নিতে হয়।

রূপো (কৃ: উ: ২।৬) ॥
প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের ভৃত্য। অর্থলোভী।

রেজা খাঁ (আনন্দ: ১।১) ॥
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কালে রাজস্ব আদায়ের কর্তা। তিনি দুর্ভিক্ষের বৎসরেও শত করা দশ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। হান্টারের গ্রন্থে তাঁর রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নিম্নরূপ উল্লেখ দেখা যায়—

"It was common at that period to make temporary remissions and advances wherever a harvest proved deficient; but during 1769-70, although such indulgences were constantly proposed, they were not, except in a very few isolated instances, granted....In April a scanty spring harvest was gathered in; and the council, acting upon the advice of its **Mussulman Minister of Finance,** added ten percent to the land-tax for the ensuing year."

Hunter : The Annals Rural Bengal,
Vol. I, Chap. II, P. 23.

এই মুসলমান রাজস্ব আদায়কারী মন্ত্রীই হলেন রেজা খাঁ।

আ লো চ না

চিরায়ত সাহিত্য প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

মায়াবাদের গোড়ার কথা—যা ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে পেয়েছি, অনিত্য জগতে সবই শেষ পর্যন্ত ধূসর ধূ ধূ শূন্যতা, এবং আমাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার পূর্ণাবয়বে কোন কোন মনীষীগণের মধ্যে দৃষ্ট—সমাজ-সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে কতটুকু সত্য এবং প্রযোজ্য সে বিচার না করে; অন্ততঃ একটি কথা সহজ করে বলা যায় যে, সাহিত্যে চিরন্তন সত্যের দাবী থাকলে মায়াবাদপ্রশ্ন কিছুটা অনিবার্য। কিন্তু প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, বস্তুবাদ বা অস্তি-দর্শনও উপেক্ষণীয় নয়। সুতরাং শিল্প-সাহিত্যে পরিবেশ, বিষয়বস্তু, এমন কি বিশ্বপরিস্থিতিতে মায়াবাদ কতটুকু গ্রাহ্য তা চিন্তনীয়—তবু কেন মানুষ শিল্প-সাহিত্য, রাজ-অর্থনীতি ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চিন্তিত ও সচেষ্ট তা কুহেলিকাময়, প্রচ্ছন্ন। অতীত, বর্তমান এবং নিকট ভবিষ্যৎকাল মানুষের চিন্তা জগতে বিশেষ স্থানাধিকারী এই কারণেই যে, অস্তিত্বের চিরন্তনতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ মানুষের চেতনা বর্তমানের আলোয় কিছুটা আলোকিত এবং সুদূর ভবিষ্যৎ অন্ধকারের গর্ভে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন। তাই ক্রমশ গভীর চিন্তায় সমগ্র জগতের অস্তিত্ব, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দার্শনিক চিন্তায় অনেকটা নিষ্পত্তি ঘটায়। এটাই সব নয়। শিল্প-সাহিত্যের জন্ম ইতিহাসে বা সার্ভেতে বিশ্ব সত্য কি মিথ্যা প্রশ্ন ওঠার মূল কারণ, শিল্প-সাহিত্যে চিরন্তনত্ব বলতে কি বোঝায়? 'চিরন্তন' শব্দের অর্থ—অনাগত কালেও নতুন এবং প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত নয়; কারণ ব্রহ্মময় জগতে তার বিদেহী অস্তিত্ব এবং চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা পৃথিবী প্রভৃতির নিয়মিত একে অন্যকে প্রদক্ষিণ করার রীতি চিরন্তন, এদের কক্ষচ্যুতিতে মহাপ্রলয় এমন কি ধ্বংস অনিবার্য। শিল্প-সাহিত্যে এমন চিরন্তনত্ব দুরাশা মাত্র। কোন গ্রন্থের সাহিত্য-রসাস্বাদনে হয়ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না—কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের চিরন্তনত্ব, আঁদ্রেজিদের সূত্রানুযায়ী প্রায় অসম্ভব।

সমাজের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্ক নিবিড় তা বলাই বাহুল্য। অতীত থেকে বর্তমানে পথে পথে শিল্প-সাহিত্যের বাস্তবতায় একটি জিনিস পরিলক্ষিত যে, সামাজিক পরিবেশ—যা কোন কোন সমসাময়িক যুগ-সাহিত্যে দৃষ্ট—সর্বত্রই নিপুণভাবে পরিবেশিত নয়। গ্রীক ভাস্কর্যে বা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তৎকালীন যুগের প্রচ্ছায়া, সাধারণত, অদৃশ্য। প্রশ্ন ওঠে কোনটি চিরন্তন সাহিত্য?—যাতে সমাজ-চিত্র প্রস্ফুটিত সে-টি—না বায়বীয় চিন্তার ওপর ভর করে লিখিত যে-টি? চিরন্তনত্বের দাবী কার আছে সে প্রশ্ন তর্কাতীত নয়। আজকের পরিবেশে রচিত সাহিত্য আগামী দিনেও যে সমাদৃত হবে তা জোর করে বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের রসাস্বাদনে এখনও কোন কোন পাঠক যদিও আনন্দ পেয়ে থাকেন তথাপি আধুনিক পাঠকের বৃহৎ অংশটি এখন ক্রমশই ওদিক থেকে সরে এসে আধুনিকতায় নিজেকে কেন্দ্রীভূত করেছেন।

আধুনিকতার ব্যাখ্যা ব্যাপক।

হোমার ভার্জিল কিম্বা বাল্মীকি কালিদাসের সাহিত্য চিরায়ত সাহিত্য কেন সে প্রশ্ন আমাদের নাড়া দেয়। বক্তব্যের প্রকাশে, না ব্যঞ্জনাময় ধ্বনি-চিত্রকল্পের নিপুণ চিত্রকল্পের নিপুণ চিত্রায়নে শব্দ চিরায়ত। রঙ, চিত্র, ধ্বনি, সুর সবই শব্দে। শব্দেই ব্রহ্ম। প্রকাশের আশ্রয় শব্দ। শব্দ চিরায়ত। কিন্তু তবু সব শিল্পসাহিত্যই চিরায়ত নয় কেন? অ্যারিষ্টোফেনিসের নাটকে তৎকালীন যুগের সামাজিক প্রচ্ছায়া পড়েছে—সাহিত্য হিসেবে উৎকৃষ্ট তবু তাতে চিরন্তনত্বের দাবী কোথায়! কামুর অস্তিবাদ-চিন্তা ও সার্ত্রর অস্তি-দর্শন সামাজিক পটভূমিকে বাদ দিয়ে নয়, তাই কি এঁদের রচনা একটা বিশেষ যুগের মধ্যে সীমায়িত থাকবে? পরিচিত পরিবেশ থেকে এথেন্স অনেক দূরে তাই হয়ত অ্যারিষ্টোফেনীসীয় প্রজ্ঞা আমাদের কাছে ততটা আবেদন জানায় না যতটা স্বদেশীয় সাহিত্যে বা দর্শনে নাই। স্বদেশের সঙ্গে যদি আত্মিক যোগ না থাকে তবে সে দেশের শিল্প-সাহিত্য-রস কি করে আস্বাদিত হতে পারে। আর দেশের বর্তমান অবস্থা আমাদের কাছে যতটা স্বচ্ছ, প্রাচীন অবস্থা ততটা স্পষ্ট নয়—অর্থাৎ পুরণো যুগের অবস্থা, যা ইতিহাস বা সমাজ-তাত্ত্বিক আলোচনায় পেয়েছি, জানা সহজ-সাধ্য নয়—তাই বর্তমান যুগোপযোগী সাহিত্যেই পাঠক সাধারণ বেশী আগ্রহশীল। তবু কিছু কালজয়ী শিল্প-সাহিত্যের নাম করা যায় যা সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে ঝড় তুলেছে।

'তস্যেত্থং ব্রুবতাশ্চিন্তা বভুব হৃদি বীক্ষতঃ। শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যবহৃতং ময়া ॥' মহাকবির আত্মআবিষ্কার! এই আত্মআবিষ্কারেই মহাকাব্যের জন্ম। চিরন্তন সাহিত্যের উন্মোচিত দুয়ারে কবি একাকী, আত্মনিষ্ঠ! মিথুনের মৃত্যুতে বিচ্ছেদ, এবং শোকার্ত হৃদয়ের উদ্বেলতা-বিমর্ষতায় চিরন্তনত্ব আছে—যেমন রাত্রির কোলে গভীর অন্ধকার বা জ্যোৎস্নায় বৈধব্যের প্রতীকময়তায়, কিংবা সূর্যালোকে আলোকিত অদৃশ্য সত্তায়—যন্ত্রণায়, আনন্দোল্লাসেও আছে চিরন্তনত্ব। জীবন উপভোগ সম্পর্কে শ্রেগালের উক্তি, হৃদয় আন্দোলনেই সত্যিকারের আনন্দ, কতটুকু চিরন্তন তা বিচার সাপেক্ষ—কেননা, যুগ এবং সমাজ পরিবর্তনে হয়ত মানুষ এ সমস্ত ভুলে যাবে।—এরপর যদি 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি'-কেই চিরন্তন আনন্দময় পথ বলে মনে করেন তবে বলব, তাও ঠিক নয়। কারণ, এ নীতিও সবযুগে চলে না। কাউর বক্তব্যই চিরায়ত নয়। সোফোক্লিস ইউরিপিডিসের বক্তব্যই বা কতটুকু চিরায়ত। শুধু একটি প্রশ্নই আমাদের বার বার নাড়া দেয়—চিরায়ত সাহিত্য কাকে বলব?—যে-কথা বলছিলাম, কয়েকটি অনুভূতি, যা বাল্মীকিতে দৃষ্ট, চিরন্তন সত্য এবং সাহিত্যে-শিল্পে এটাই দেয় আনন্দ। অনুভূতির উপলব্ধিতেই শাশ্বত আনন্দ?

কিন্তু সাহিত্য শুধু আনন্দের জন্য নয়। সাহিত্যিকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে নৈরাজ্যবাদ—অবক্ষয়িত চিন্তা, বুদ্ধি এবং সামাজিক অবস্থা—ক্রমশই শিল্পায়তা থেকে বিচ্যুতির কারণ। রসজ্ঞের সৌন্দর্য দর্শনে বিচিত্র অনুভূতি, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি শিল্প-সাহিত্য রচনা' আমাদের উচ্চ ভাব দেয়। এ ভাব সৃষ্টির কাব্যে বা চিত্রে আরোপিত সমস্ত সত্তায়—যা প্রাচীনকালে ব্রহ্মায় অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার হাতে দৃষ্ট। সৃষ্টি-নাশ পাশাপাশি অবস্থিত—দর্শনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রূপান্তর হচ্ছে মাত্র। আবার শঙ্কর বলেন যে, বস্তুজগতে আমরা অনেককিছু দেখি ভিন্ন ভিন্ন রূপে, কিন্তু আসলে সবই এক এক ব্রহ্ম,—ব্রহ্মময় বিশ্বে ভিন্নতা মায়ামাত্র। শূন্য শূন্যে মিলায়, তাই বুঝি সবই মায়া!

—রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা, শিল্প-সাহিত্যে অন্তরের সঞ্চিত রস-সিঞ্চন, বিমূর্ত ফর্ম নিলেও অত্যাধুনিকতার অবক্ষয়িত রচনায় অদৃশ্য। আসলে রসজ্ঞেরা ক্রমশঃ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা হারাতে বসেছেন। বর্তমান শিল্প-সাহিত্যে নতুন আবিষ্কার তথা ট্যালেণ্টের মর্যাদা কোথায়! রোসাবোনোয়ারের শিল্প-কীর্তিকে সম্রাজ্ঞী ইউজিন প্রদত্ত পুরস্কার এবং ম্যালকম ভ্যাণ্ডহানের রসিকজনোচিত মন্তব্যে শিল্প-সৌন্দর্য চেতনার আভাস পরিলক্ষিত। কিন্তু সাধারণ রসিকের কাছে এর আবেদন কতটুকু? আসলে চিরায়ত সৃষ্টি কোনটিকে কেন বলব সে-প্রশ্নের সমাধান কোথায়? সৃষ্টির সৌন্দর্যই, সম্ভবতঃ, চিরায়ত। সৌন্দর্যই সৃষ্টিতে চিরন্তনত্বের দাবীদার! রামধনু, প্রজাপতি এবং ফুলের বর্ণবৈচিত্রের উৎস সূর্য, সকলকিছুর আধার, চিরন্তন সত্য, আলোয় আলোয় বর্ণময়।

সাহিত্যে মায়াবাদ কতটুকু প্রযোজ্য তার সমাধান উপরিউক্ত বক্তব্যে হয় কিনা এ প্রশ্ন উঠতে পারে। অস্তিত্ববাদের সঙ্গে মায়াবাদের বিরোধ, তার ফলে প্রাচ্য-দর্শনের মূল সুর—অনিত্যজগত—ভারতীয় সাহিত্যে অনেকটা ফলপ্রসূ, এবং চিরায়ত নামক বায়বীয় চিন্তাধারার সঙ্গে সাম্প্রতিক সমাজ-আর্থনীতিক অবস্থা নিয়ে রচিত সাহিত্যের তুলনায় তথাকথিত অর্থে 'চিরায়ত'-র কোন মূল্য নেই।—এ সমস্ত ব্যাপারে মার্কসীয় গুরুত্ব অনেকখানি। মার্কসের বস্তুবাদ-বিতর্ক এই জটিল প্রশ্ন সমাধানের পথ প্রদর্শক। বাস্তবজীবনে বস্তুর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। আর শিল্প-সাহিত্যে বাস্তবতা প্রকাশিত হওয়া উচিৎ। সুন্দরভাবে শিল্পে সাহিত্যে পরিস্ফুট বাস্তবতাই চিরায়ত।

যে কথা প্রথমেই বলেছিলাম, সাহিত্যে মায়াবাদ প্রসঙ্গ, তার গুরুত্ব কতখানি, আমাদের চিন্তিত করে তুললেও এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, বাস্তব-জগতে শঙ্কর কথিত দার্শনিক আলোচনা মায়াবাদ আমাদের কাছে অন্ধকারময়, নিস্প্রয়োজনীয়, অবাস্তব। এবং কিছুটা পরিহাসের মত শোনায়। বস্তুজগতে সাহিত্যের দাবী এবং প্রয়োজন গভীর। সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজ আর্থনীতিক প্রচ্ছায়া পড়বেই। মায়াবাদের ভণ্ডামী এখানে চলেনা। কবির অন্তর্মুখীনতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে অনেক—এই অন্তর্মুখীনতা আমাদের আনন্দও দেয়। তবু কবির কিছু সামাজিক দায়িত্বতো রয়েই গেছে।

রবীন্দ্রনাথ, আধুনিকতার রথী, শিল্প-সাহিত্যে যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন সেখানে সমাজ-চিন্তা প্রখর। আসলে সমাজ আর্থনীতিক চেতনার আলোতেই সাহিত্যের মূল্যায়ন হবে। প্রগতিশীল সাহিত্য-সেবীদের তো তা'ই মত। লক্ষ্যণীয়, রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সচেতনতা সাহিত্যে রূপায়িত। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা পরিস্ফুট হলেই কি সাহিত্য চিরায়ত নয়? এমন রস, যা অনন্তকালের জন্য সৃষ্ট হয়, তাই চিরায়ত। কিন্তু কোন রসই কি চিরায়ত হতে পারে? প্রশ্ন জটিল। উত্তর জটিলতর, বিস্তীর্ণ। বস্তুবাদী চিন্তা সাহিত্যে প্রতিফলিত হলে তা কোন ক্যাটেগোরিতে পড়ে চিন্তনীয়। এতে যে সমাজ-চিন্তা প্রতিফলিত হয় তাও বিচার্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের পার্থক্য অনেক। পরিবেশ এবং বস্তুবাদী চিন্তার ভিন্নতাও স্পষ্ট।—পরিবর্তনশীল জগতে চিরন্তন কিছুই নয়। মায়াও নয়। অস্তিত্বের প্রকাশই বড় কথা। বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

জনশিক্ষা ও সংস্কৃত ॥ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। প্রকাশিকা : শ্রীমতী উষাদেবী চক্রবর্তী 'ঋষিধাম'। পো: দত্তপুকুর, জিলা ২৪ পরগণা মূল্য ৫'৫০

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী 'জনশিক্ষা ও সংস্কৃত' শীর্ষক পুস্তিকাটিতে ভারতীয় জীবনের মর্মলোকে সংস্কৃত ভাষার যে কলধ্বনি প্রাচীনকাল থেকে বেজে চলেছে, তা নিষ্ঠাভরে শুনিয়েছেন। আমরা এমনই বধির সেই কলধ্বনি শুনতে পাই না। এই না-শোনার সবটা বধিরতার জন্য নয়, কিছুটা ইচ্ছাকৃতও। দুঃখের বিষয়, আত্মভাস সংস্কৃতের দীপ্তিচ্ছটা বিশ্লেষণ ক'রে দেখাতে হয় এই আত্মভ্রষ্ট জাতিকে। আর তাতেও এই অন্ধজাতির দৃষ্টি আলোর স্পর্শ পায় কিনা, এ বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ।

সংস্কৃত মন্ত্রে আপাতদৃষ্টিতে বহুধা বিভক্ত ভারতের ঐক্যবোধ উদ্বোধনের নিষ্ঠাবান আয়োজন রয়েছে। লেখক এ প্রসঙ্গে জলশুদ্ধির মন্ত্রের কথা বলেছেন—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

এই মন্ত্রের একটি শব্দ ব্যবহার করে বলতে পারি, সমগ্র ভারতবর্ষের সন্নিধির অনুভব জাগাতে পারে একমাত্র এই সংস্কৃত ভাষা। এভ.বে জাতীয় ঐক্যানুভূতিসঞ্চারের চেষ্টা ছিল সংস্কৃত মন্ত্রে। উত্তর ভারতের আর্যগোষ্ঠীর ভাষাগুলি সংস্কৃত থেকে জন্মেছে, আর দক্ষিণ ভারতের ভাষা এভাবে না জন্মালেও সংস্কৃত শব্দ দু'হাতে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাই ডক্টর পট্টভিসীতারামাইয়ার পক্ষে বলা সম্ভব হয় যে দক্ষিণ ভারতে তাঁরা সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কেননা তাঁরা হিন্দী বা সংস্কৃতজাত অন্যান্য ভাষার চেয়ে সংস্কৃত ভালো বুঝতে পারেন (আলোচ্য পুস্তিকার ৫ম পৃষ্ঠা) সংস্কৃত ভাষার শব্দ ভাণ্ডারেও আর্যেতর ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ সাদরে গৃহীত হয়েছে। এই গ্রহিষ্ণুতাতেই সংস্কৃতভাষার ঐশ্বর্য। ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা থেকেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে বুদ্ধিজীবীর ভাষা হিসেবে সংস্কৃত সর্বভারতীয় চরিত্রলাভ করেছিল। লেখক ইতিহাসের বহুদূর বিস্তৃত পটভূমিটির আলোচনা করেছেন। কেরলের শঙ্করাচার্য থেকে আরম্ভ করে বাঙালাদেশের শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকলে তাঁদের নিজ নিজ চিন্তা প্রচার করেছেন এই সংস্কৃত ভাষায়, আধুনিক যুগের পণ্ডিতরা যেমন করেছেন ইংরেজিতে। এই ভাষার সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণের যে আত্মিক যোগ ছিল না, তা নয়। বরং এ যুগেই ইংরেজি বিদেশী ভাষা বলে এ ভাষার সঙ্গে জনসাধারণের আত্মিক যোগ নেই। লেখক এই পুস্তিকার পরিশিষ্টে সংস্কৃতের স্বপক্ষে লোকসভায় প্রদত্ত সভ্যদের ভাষণগুলি স্থান দিয়েছেন। এই ভাষণগুলির একটিতে বক্তা শ্রীযুক্ত প্রকাশবীর শাস্ত্রী সেযুগের সাধারণ মানুষও যে সংস্কৃতে কেমন অভ্যস্থ ছিলেন, তা বোঝানোর

জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত কুমারিল ভট্ট মদনমিশ্রের বাড়ি কোন পথে যেতে হবে জিজ্ঞেস করেছিলেন গ্রামবাসীদের কাছে। অত্যন্ত সাধারণ একজন গ্রাম্য মানুষ তাঁকে তখন পথের নির্দেশ এভাবে দিয়েছিলেন,

স্বতঃ প্রমাণং পরতঃ প্রমাণং কীরাঙ্গনা যত্র গিরো গিরন্তি।
দ্বারস্থ নীড়ান্তর সন্নিরুদ্ধা অবেহি তন্মণ্ডন মিশ্র বাসঃ ॥

যেখানেই দেখবেন, দ্বারপ্রান্তে খাঁচায় খাঁচায় বন্দী সারী আলোচনা করছে বেদ স্বতঃ প্রমাণ, না বাহ্য প্রমাণ সাপেক্ষ ; তাহলেই বুঝবেন সেখানে মণ্ডনমিশ্রের বাসস্থান। এই ঘটনাটি সংস্কৃতের সঙ্গে ভারতের আত্মিক যোগই প্রমাণ করে। সংস্কৃতকে ঘিরে ভারতবাসীর মনে জন্মেছে 'গৌরব বোধ' ও 'সংস্কার'। এই দুটি শব্দই বিবেকানন্দের রচনা থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের ভবিষ্যৎ বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, তাঁর পরমশ্রদ্ধার পাত্র বুদ্ধদেব সংস্কৃতের পরিবর্তে পালিকে উচ্চাসনে বসিয়ে এই 'গৌরব বোধ' ও 'সংস্কার' এর সুযোগ স্বেচ্ছায় হারালেন। সংস্কৃতের গৌরব ব্যাখ্যার দিকথেকে বিবেকানন্দের এই বক্তৃতার মূল্য অপরীসীম।

লেখক এই সংস্কৃত ভাষার শুধু সর্বভারতীয় চরিত্রই ব্যাখ্যা করেননি। এ ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভের ইতিহাসও তিনি আলোচনা করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই এশিয়া ও য়ুরোপে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস আলোচনায় নিবেদিতপ্রাণ মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন ও ডক্টর রঘুবীরের গবেষণার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। রঘুবীর বলেছেন, মঙ্গোলিয়ার সুদূর অভ্যন্তরে এমনকি একজন সাধারণ পশুপালককেও দন্ডীর কাব্যাদর্শ ও পাণিনির ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় উৎসাহী দেখে বিস্মিত হতে হয়। কাম্বোডিয়া, জাভা ও বোর্নিয়োতে সংস্কৃতে লেখা বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে। স্পেনের ঐতিহাসিক Lopez তাঁর Le Races Ariyans de Pern গ্রন্থে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি বিশেষ করে পেরু সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যোগ নির্দেশ করেছেন। দেওয়ান চমনলাল 'Hindu America' গ্রন্থে এই একই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। লেখকের অনুসরণে এসব তথ্য আমরা আমাদের জাতীয় অহমিকা তৃপ্তির জন্য উল্লেখ করছি না। উল্লেখ করছি শুধু সত্যকে জানার আগ্রহ থেকে। প্রাচীন চীনে 'বোধিরুচি' মঠে সাত শো সংস্কৃতজ্ঞ ভিক্ষু বাস করতেন। হিউয়েনসাং নিজের চৈনিক নামের পরিবর্তে 'মোক্ষাচার্য' ও 'মহাযানদেব' এই দুটি সংস্কৃত নাম ব্যবহার করতেন। ভারতজিজ্ঞাসু বিদেশী পর্যটক মেগাস্থিনিস্, ফা-হিয়েন, ইৎসিং, আলবেরুনী সকলেই সংস্কৃতভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কেননা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, সংস্কৃতই ভারতের চাবিকাঠি। আর আমরা এযুগে ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনের গবেষণায় ইংরেজিতে লেখা বিদেশীদের বই প'ড়ে বাহবা নেবার তালে আছি।

'জনশিক্ষা ও সংস্কৃত' পুস্তিকাটির পরিশিষ্টে মুদ্রিত লোকসভার সভ্যদের বক্তৃতাগুলিতে সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত চিন্তার আধুনিকতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চৌধুরীর বক্তৃতায় জানতে পারি এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর কাছে একটি বইয়ের Copy right সম্পর্কে আইন সম্পর্কিত পরামর্শ নিতে এসে, সংস্কৃত বাক্যে এই ইংরেজি শব্দটির সাবলীল অনুবাদ করেছিলেন

'অনুভারসত্ব'। শ্রীযুক্ত প্রকাশবীর শাস্ত্রী বলেছেন, ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বেদের পবিত্র ধ্বনি বা বিদ্যা কোনো শ্রেণীবিশেষের নয় বলা হয়েছে। শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য লোকসভায় এ আলোচনার উপসংহারে ভাগবতের একটি শ্লোকের কথা উল্লেখ করেছেন,

যাবৎ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহনাম্।
অধিকং যোঽভিসৎন্যত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি। ৭।১৪।৮

অর্থাৎ সমাজে একজন ব্যক্তির ততোটুকুতেই অধিকার, যতটুকু তার দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। সে তার অতিরিক্ত চায়, সে দণ্ডার্হ। তিনি মনুসংহিতার সেই বিখ্যাত শ্লোকের কথা বলেছেন যেখানে বলা হচ্ছে, যে চাষ করে, তারই জমি অর্থাৎ আরো আধুনিক ভাষায় লাঙ্গল যার, জমি তার—স্থানুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম—৯।৪৪ সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডারে স্তরে স্তরে সঞ্চিত চিন্তার শ্রেষ্ঠ সম্পদে রক্ষণশীলতার চিহ্নমাত্র নেই। ভাগবত ও মনুসংহিতার এই দু'টি শ্লোকে যা বলা হয়েছে, তা আশ্চর্যভাবে আধুনিক।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন, 'পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দুসভ্যতার মূর্তিটা সেই রকম। সে কেবল স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতের সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের মনে প্রাচীন ভারতকে ঘিরে এমন জীর্ণ ছবিটি স্থান পাওয়ার মূলে আছে রক্তমাংসে সজীব পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের মানসিক বিচ্ছেদ। আধুনিক ভারতে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চর্চাই শুধু এই বিচ্ছেদ ঘোচাতে পারে। 'জনশিক্ষা এ সংস্কৃত' পুস্তিকাটি রচনার মূলে কাজ করছে লেখকের একটি মাত্র ইচ্ছা। সে ইচ্ছা এই বিচ্ছেদ ঘোচানোর জন্য পাঠককে সচেষ্ট করার আন্তরিক ইচ্ছা। প্রাচীন ভারত সম্পর্কে আমাদের আরেকটি ভিত্তিহীন ধারণা প্রশ্রয় পেয়েছে যে সেখানকার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ঐহিক চেতনার যোগ ছিল না। অথচ প্রাচীন ভারত পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা, মানববিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা ও আত্মবিদ্যাকে একসূত্রে গেঁথে আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতির শিখর স্পর্শ করেছিল। লেখক সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য ব্যাখ্যায় শুধু কাব্য ও নাটকের উল্লেখ করেন নি। তিনি লিখেছেন আবার তুলনামূলক ব্যাকরণ, ভাষাবিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, অলংকার, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পশুবিজ্ঞান, পূর্তশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে।' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' নামক ইংরেজি গ্রন্থে প্রাচীনভারতবাসীর বিজ্ঞান চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা বাৎসায়নের 'কামসূত্র' যে দেশে রচিত হয়েছে, সে দেশের চতুর্বর্গ ধারণায় মোক্ষের সংগে একাসনে স্থান পেয়েছে ধর্ম, অর্থ, কাম। এই হচ্ছে এ দেশের প্রাচীন যুগের জীবনধারণার সারাৎসার। এ জীবন-ধারণার মূল ভিত্তি সামগ্রিকতার বোধ। সামগ্রিকতার বোধ এই সভ্যতার মূল ভিত্তি, এ সংবাদ আমাদের জানা নেই। এতোবড় সংবাদটি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও সবসময় আমাদের জানানোর প্রয়োজন বোধ করেন না। কেননা তাঁদের মনেও প্রাচীনভারতকে ঘিরে কুয়াশা যে নেই, তা নয়। তাই তাঁরা মাঝে মাঝে এমন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় কথা বলেন, যা আমাদের আধুনিক মনকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা বলেন, সংস্কৃত দেবভাষা।

ভারতবর্ষ দেবভূমি। অথচ তাঁরা বলতে পারেন না এ ভাষা মানুষের ভাষা। ভারতবর্ষ আবহমানকাল ধরে মানুষের বাসস্থান। অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক সংস্কৃতে ভাষান্তরিত রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' পড়ে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ডক্টর ফ্রেডারিক্ হাইল্যাণ্ড তাঁকে লেখা একটি চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে যে কথা লিখেছেন, তা আমাদের মতো কুয়াশাচ্ছন্ন মনের 'দেবভাষা' বা 'দেবভূমি' জাতীয় কথা নয়। তাঁর কথাগুলির মূল ইংরেজিতেই এই পুস্তিকা থেকে তুলে দিচ্ছি' ..I love Sanskrit as the most perfect language of the world, the earthly expression of the eternal rtam'. তিনি কিন্তু আমাদের মতো সংস্কৃতকে Divine expression বা দেবভাষা বলে কুয়াশাচ্ছন্ন মনের পরিচয় দেন নি।

আলোচ্য বইটিতে লেখক আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতের স্থান কোথায় হওয়া উচিত, আর এখনই বা কোথায় আছে, তার এক তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। দুঃখের সঙ্গে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন পরাধীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের যে স্থান ছিল, স্বাধীন ভারতে বিশেষতঃ বাংলাদেশে আজ তাও নেই। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত সংস্কৃত কমিশনের রিপোর্টেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। সংস্কৃত জননী স্থানীয়া ভাষা বলে পুস্তুভাষী আফগানিস্থানের কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তর পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য করা হয়েছে। আর আমরা অষ্টম শ্রেণীতে সব ছাত্র-ছাত্রীদের একবারই শুধু সংস্কৃত শেখার সুযোগ দিয়েছি। তারপর একমাত্র মানবিদ্যার ছাত্র-ছাত্রীরা বাদে আর সবাই সংস্কৃতকে নমো নমঃ করে বিদায় জানাচ্ছে। মনোবিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের জন্যও উচ্চতর মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত সংস্কৃতকে অনেক বাদানুবাদের পর সম্প্রতি অবশ্য পাঠ্য করা হয়েছে। লেখকের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মত হচ্ছে, পঞ্চম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান বাণিজ্য মানববিদ্যা নির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য করা হোক। মহাবিদ্যালয়ে মানববিদ্যায় স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত অন্ততঃ ১০০ নম্বরের একটি পত্র সংস্কৃতের জন্য নির্দিষ্ট রাখা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে দর্শন, ইতিহাস ও সব সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের ১০০ নম্বর সংস্কৃত পড়ানো উচিত। এ বিষয়ে লেখকের সঙ্গে অনেকে একমত হতে না পারেন। কিন্তু বিভিন্ন স্তরে লেখক কর্তৃক সংস্কৃতের এই স্থান নির্দেশের মূলে রয়েছে তাঁর নিজের যুক্তি। লেখকের সঙ্গে যাঁরা একমত হতে পারবেন না, তাঁরাও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ভারতীয় দর্শন ও ইতিহাস এবং যে কোন আধুনিক ভাষায় সাহিত্যের বোধ সুস্পষ্ট করার জন্য সংস্কৃত পড়া অপরিহার্য। যেকোন ভারতীয় ছাত্র যখন ইংরেজি বা এধরনের বিদেশী সাহিত্য পড়বেন, তাঁরও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ছাত্রজীবনে প্রাথমিক পরিচয়ের সুযোগ করে দিলে পরবর্তীকালে তুলনামূলক আলোচনার পথ প্রশস্ততর হবে। সংস্কৃতকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চস্থান দেওয়ার স্বপক্ষে লেখকের অন্য একটি যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সে যুক্তি হচ্ছে, সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মানসিক শৃঙ্খলার জন্য সংস্কৃত ছাত্রছাত্রীদের পড়া উচিত। পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে কিনা, এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেই যে সব সময় পাঠ্য বিষয় স্থির করা উচিত, তা নয়। যা আমাদের চিন্তা করতে শেখায়, বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করে, তাকে নিশ্চয়ই পাঠ্যক্রমে স্থান

দেওয়া উচিত। এভাবে চিন্তা করলে সংস্কৃতের স্থান অস্বীকার করার উপায় নেই। 'এফ, আর, সি, এস'-এর মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমুচ্চ পাঠ্যক্রমে একটি প্রাচীন ভাষা এজন্যই অবশ্য পাঠ্য হয়েছে।

কথা উঠতে পারে, এখনকার ছাত্রছাত্রীদের বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো সকলকে সংস্কৃত পড়তে বাধ্য করলে অবস্থাটি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। অষ্টম শ্রেণীর পরেই বিদেশী করণের খাঁচায় পুরে মারার যে ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে একদিকে পাঠ্যবস্তুর বোঝা ভারি হয়েছে ও অন্যদিকে সব বিষয়ের কিছু কিছু না জানিয়েই কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে পণ্ডিত বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা চলছে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রবর্তনের পর থেকে। এই সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের এই বেদনার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন। তাতেও কি আমাদের চৈতন্যোদয় হবে? তারপরও কি আমরা পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাবো? দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিজ্ঞানকে যোগ্য আসনে বসিয়ে আমরা যদি পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাই তাহলে বিদ্যালয়ের বোঝাটিও হাল্কা হবে এবং সংস্কৃতের প্রতিও সুবিচার করা সম্ভব হবে। তাই বলি, সমস্যাটি বিশেষীকরণের। তাই আজ মানববিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি গণিত শিখিয়ে পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা নেই; বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের দেশের মাটির পরিচয় আছে যে ভূগোলে ও স্মৃতির পরিচয় আছে সে ইতিহাসে, সেগুলি না জেনেও বৈতরণী পার হওয়ায় আপত্তি নেই। যদিও দশমশ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পরীক্ষণীয় মূল বা 'কোর' বিষয় হিসেবে সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান, গণিত সকলের জন্য আবশ্যিক করা হয়েছে। তবু মূল উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হচ্ছে না। কেননা এসব বিষয়ের বিদ্যা যাচাই করার ব্যবস্থা নেই উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি-লিট্' উপাধি দানের সময় লাতিন ভাষায় রচিত মানপত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষণ এবং সোভিয়েট সরকার কর্তৃক ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে প্রদত্ত সংস্কৃত মানপত্র—এই দু'টি মূল্যবান রচনা পুস্তিকার পরিশিষ্টে প্রকাশের জন্য লেখককে ধন্যবাদ।

দেবদাস জোয়ারদার

আনন্দে উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিনিন্দনীয় কেশতৈল
কেশরঞ্জন

Regd No.C-315 Phone : 23-5155 December'68 (0'50) Central Regd.No. R.N.2602/57 SAMAKA

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ষোড়শ বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৭৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ

পত্রিকা পড়ুন

এই সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় জেলার কোথায় কি সব উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তার বিবরণ যেমন থাকে তেমনি থাকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার খবরাখবর, নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ, সংবাদচিত্র ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা

ষাণ্মাসিক : দেড় টাকা   বার্ষিক : তিন টাকা

(ভি. পি.-তে কোনো পত্রিকা পাঠানো হয় না)

অগ্রিম চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হবার জন্য
নিচের ঠিকানায় লিখুন

তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা ১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি, ২৪৭৪০/৬৮

সবেমাত্র বেরিয়েছে
ক্রীমটি সত্যিই ভাল!
SADHANA
Beauty
CREAM
ANTISEPTIC
Indispensable for Women
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

কত বছরের ব্যবধানে আমার দ্বিতীয় সন্তান ?

ডাক্তাররা বলেন যে শিশুর শরীর ও মন গঠনের পক্ষে প্রথম ৪-৫ বছরই হ'ল খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। মায়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলেও অন্ততঃপক্ষে ৩-৪ বছরের ব্যবধানে সন্তান হওয়া উচিত।

আজকাল অনেক রকমের সহজ, নিরাপদ ও কার্য্যকরী পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম প্রতিরোধ করা যায়। বর্ত্তমানে আপনি ইচ্ছানুযায়ী সন্তানলাভ করতে পারেন, দৈবের ওপর নির্ভর করতে হয় না।

বিনামূল্যে পরামর্শাদির জন্য আজই আপনি বাড়ীর কাছাকাছি পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আর এ কথাটা মনে রাখবেন যে...

দুটি সন্তানই যথেষ্ট

davp 68/289

বিদগ্ধ দায়িত্ব …

একটি ভাল উপন্যাস বা গল্প
আপনাকে সহজেই
আগ্রহান্বিত করে, একটি
ভাল কবিতা মুহূর্তেই
আপনাকে অনুপ্রাণিত করে,
কিন্তু একটি প্রবন্ধ ?
তার দায়িত্ব অনেক বেশী।
আপনার বিদগ্ধ মনকে
সে ধীরে ধীরে
প্রভাবান্বিত করে, তাকে
বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে উত্তরণ করে'
বিদগ্ধতর করে তোলে।
সাময়িকতায় সে বিশ্বাসী নয়,
চিরন্তনতাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

গল্প কবিতা বা উপন্যাস নয়,
বিদগ্ধ ও মননশীল প্রবন্ধাবলী
যদি আপনাকে
আকর্ষণ করে তাহলে
প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা
স ম কা লী ন
আপনার অবশ্য পাঠ্য।

দোলনার ছুটি

খোকার বয়স তিন বছর; ওর দোলনাটি অবশ্য ওর চাইতে একদিনের ছোট। ওদের জীবন প্রায় অচ্ছেদ্য ভাবেই সুরু হয়েছিলো। খোকা যখন আস্তে আস্তে বড় হতে সুরু করলো তখন দোলনায় শুয়ে ঘুমোনোটা ওর আর পছন্দ হচ্ছিলো না। ও নিজেকে অনেক বড় বলে মনে করতে লাগলো, কাজেই দোলনায় শোয়া ছেড়ে দিলো। দোলনাও ছুটি পোলো। তবে খোকা তার এই পুরানো সঙ্গীকে অন্য রকমভাবে ব্যবহার করার উপায় বের ক'রে ফেললো। দোলনাটা ওর ছবির বই, ব্যাট, পুতুল ইত্যাদি রাখার জায়গা হয়ে গেলো। মা বললেন "দেখো খোকার কত জিনিস; ও কত খুসী।" বাবা বেশ গর্ব্বের সঙ্গে হেসে বললেন "দোলনাটাকে অনেক দিনের ছুটি দিয়ে আমরা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিনি কি?" হ্যাঁ; ওরা সত্যিই বুদ্ধিমান।

বুদ্ধিমান বাবা মা পরিকল্পনা করেই পরিবার গঠন করেন। পরিবার পরিকল্পনার অর্থ শুধু কম ছেলে মেয়ে হওয়াই নয়, বাবা মা যখন সত্যিই আর একটি সন্তানের জন্য তৈরী হন তখনই শুধু সন্তান লাভ করাটাও পরিবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সন্তান জন্ম এখন আর দৈবের ওপর নির্ভরশীল নয়। পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিতে আপনি ইচ্ছানুযায়ী সন্তান লাভ করতে পারেন। বিনামূল্যে পরামর্শাদির জন্য আপনার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

dovp 68/441

আনন্দে
উৎসবে
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিশীলনরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

ষোড়শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

পৌষ
তেরশ' পঁচাত্তর

ষোড়শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতা

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

ভিক্টোরীয় যুগের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিদগ্ধ কবি হলেন ম্যাথু আর্নল্ড। তাঁর কল্পনা সকল সময়ই মহৎ কবিতার চিন্তাতে উদ্বুদ্ধ ছিল। মহৎ কবিতা বলতে তিনি যা বুঝতেন তা ছিল সহজ সরল স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত। তাঁর এই বোধ ও বোধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল গ্রীক ঐতিহ্য ও পুরাণের অধ্যয়নে।

তাঁর কবিতাতে তাই আমরা প্রবল ভাবাবেগের চেয়ে কোমলতাই লক্ষ্য করে থাকি অধিকমাত্রায়। বায়রণের মতন তীব্রতা কী ঘৃণা ইত্যাদি কোন চরম অবস্থা সৃষ্টিতে তিনি পারঙ্গম নন। উচ্ছল যৌবনের কিংবা উৎক্রান্তিক মনোবিলাসীর তিনি আত্মীয় নন; তাঁর সমালোচনার মধ্যেও সৌজন্য বোধ এবং সৌজন্যবোধ আবৃত শ্লেষ আমরা যত্র তত্র লক্ষ্য করে থাকি।

আর্নল্ডের কোমল স্বভাবের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় নীচের লাইনগুলিতেই :

> One lesson, Nature ! let me learn of thee,
> One lesson that in every wind is blown,
> One lesson of two duties served in one,
> Though the loud world proclaimed their enmity—
> Of toil unserved from tranquility !

আর্নল্ডের কোমল স্বভাবেরই মূর্চ্ছনা বেজেছে দেখি 'স্কলার জিপসি' ও 'থার্সিস' নামক কবিতা দুটিতে। তাঁর উল্লেখ্য সৃষ্টির মধ্যেই এই দুটি পড়ে। অক্সফোর্ড ও টেমসের স্মৃতিই এই দুটি রচনার অনুপ্রেরণা। কবির কাব্যজীবনের বিশবছরের ফসল সঞ্চিত হয়েছে এই দুটিতে।

বন্ধুত্ব যে সব ইংরেজ কবিদের শিল্প সত্তাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছিল তাঁদের মধ্যে শেলী ও টেনিসন নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। আর্নল্ডও কবিতা রচনার উৎসাহ পেয়েছেন এই বন্ধুত্বের আত্যন্তিকতা থেকেই। অক্সফোর্ডের বান্ধব-পরিবেশ, টেমসের সান্নিধ্য কবি আর্নল্ডের কবিমনকে জাগ্রত করেছে, উদ্দীপ্ত করেছে বার বার।

কিন্তু এই বান্ধব-পরিবেশ, অনুকূল সান্নিধ্য আর্নল্ডের কবিমনকে কখনোই বিষাদের অস্তে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। তাঁর অধিকাংশ রচনারই অন্তরালে বাজছে এক করুণ রাগিনী; ১৮৪৯র ষ্ট্রেড রিভেলার থেকে শুরু করে ১৮৭৭ সালের কলেকটেড পোয়েমস পর্যন্ত প্রায় সকল রচনা এক শান্ত কারুণ্যে বিন্যস্ত।

তাঁর প্রখ্যাত কবিতা স্কলার জিপসির মর্মমূলে রয়েছে এক রমণীয় বিষাদ। বর্তমান যুগে হতাশা, মনোবিকলন; আলো ও মধুর জন্য এষণা; আধ্যাত্মিক শান্তির জন্য প্রার্থনা এবং পল্লীর স্নিগ্ধ পরিবেশের প্রতি আকর্ষণ এই কবিতাটিকে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দান করেছে।

আর্নল্ডের অনেক কবিতাতেই গ্রাম্য সৌন্দর্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত। থার্সিসের এই ছত্রগুলি কী মধুর ব্যঞ্জনায় রঞ্জিত!

'So, some tempestuous morn in early June,
When the year's primal burst of bloom is o'er,
Before the roses and the longest day—
When garden-walks, and all the grassy floor,
With blossoms, red and white, of fallen May,
And chestnut flowers are strewn—
So have I heard the cuckoo's parting cry,
From the wet field, through the vext garden trees.
Come with the Volleying rain and tossing breeze.
The bloom is gone, and with the bloom go I!
Too quick despairer, wherefare wilt thou go?
Soon will the high Midsummer pomps come on,
Soon will the mask carnations break and swell,
Soon shall we have gold-dusted snap drogon,
Sweet William with its homely cottage-small,
And stocks in fragrant below:
Roses that down the alleys shine afar,
And open, jasmine-muffled datties,
And groups under the dreaming garden-tree
And the full moon, and the while evening star!

স্নিগ্ধ আহ্বানে তিনি স্কলার জিপসীকে এই সংঘর্ষসচেতন বর্তমানকালে জটিলতার কূল থেকে উত্তরণ দিতে চেয়েছেন,

O born in days when wits were fresh and clear,
And life ran gaily as the sparkling Thames ;
Before this strange disease of moden life,
With its sick hurry, its divided aims,
Its heads o'er tax'd, its palsied hearts, was rife—
Fly hence our contact fear !
Still fly, plunge deeper in the boweing wood !
Averse, as Dido did with gesture stern
From her false friend's approach in Hades turn,
Wave us away, and keep thy solitude !

কবির এই মনোভঙ্গিমার সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিদৃষ্টির বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যায় যদিও একথা সত্য যে, স্বাতন্ত্র্যে তিনি ছিলেন সতত ভাস্বর।

মেজাজের দিক দিয়ে আর্নল্ড ছিলেন বিশ্লেষণপন্থী, পশ্চাৎ প্রেক্ষণে ইচ্ছুক, আবেগ পরিচালিত অনীহাসম্পন্ন। সমকালীন বুদ্ধিজীবীর সংকট সম্পর্কে তাঁর অনুভব ছিল তীব্র। কিন্তু এই সংকটাবর্ত অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে কখনোই সম্ভবপর ছিল না। এপিডোক্লিস এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন আগ্নেয়গিরির মুখে আত্মাহুতি দিয়ে। কিন্তু আত্মসংযমী পুরুষ আর্নল্ড মুক্তি খুঁজেছিলেন সনেট ও লোকগাথা সৃষ্টির নিসিধ্যাসনে। তাইতেই তিনি কিছুটা হয়তো মানসিক স্বস্তি লাভ করেছিলেন।

প্রেমসম্পর্কে ব্যক্তিগত আবেগও আর্নল্ডকে উৎসাহিত করেছিল কখনো কখনো। মার্গুরাইটকে উদ্দেশ্য করা লেখা কবিতাগুলিতে (সংখ্যায় পাঁচটি) আর্নল্ডের সতৃষ্ণ হৃদয়ের বাসনা অভিব্যক্ত হয়েছে কী মধুর ও তীব্রভাবে—

"Yes ! in the sea of life enisled,
With echoing straits between its thrown,
Dotting the shoreless watery wild,
We mortal millons live alone.
The islands feel the enclapsing flow,
And then their endless bounds they know.

মার্গুরাইট যে কে ছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। সে কী কবির মনোলালিতা, ছায়াবৃতা না কায়াসম্পন্না এই পৃথিবীরই ধূলার ধন—তা ঠিক জানা যায় না। তবে সে যে কবির মানসী প্রতিমা তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। মার্গুরাইটের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতাগুলিতে কবির প্রেমতৃষ্ণা এবং উদ্দীপনার অকপটতা ও রোমান্টিক প্রেরণার অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 'অসীম

আবেগ এবং সীমিত হৃদয়ের বাসনাজনিত ব্যথাবোধ'—এইতো এই কবিতার মর্মবাণী। ব্রাউনিং-এর 'টু ইন দি ক্যাম্পানা' কবিতাতেও অনুরূপ সুর অনুরণিত হয়ে উঠেছে। অন্তত: এই একটি দিকে দুই কবির মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কিন্তু এখানেও আর্নল্ডের বিষাদ অবসিত হয় নি। বিষাদের ছায়াতলে বেদনার্ত কবির শান্ত কণ্ঠস্বর আমরা এই কবিতার অন্তে শুনতে পেয়েছি—

'And bade betwixt their shores to be
The unplumb'd, salt, enstranging sea.

এই ব্যাথা বিষণ্ণতা—দুঃখবোধ—হতাশাই আর্নল্ডের অধিকাংশ কবিতার মর্মবাণী। ফোরসেকেন মার্ম্যান একটি বিষাদের ছায়াতপে রঞ্জিত কবিতা। মাইসারিনসে, স্কলার জিপসী এবং রেসিগনেশান কবিতারও নেপথ্যরাগিনী হলো বিষাদ। ডোভারের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি আর্নল্ড শুনতে পান—

'Retreating, to the breath
Of the night-wind, down the vast edges dear
And naked shingles of the world.'

আর্নল্ডের বিশেষ ধর্মমত নেই, কিন্তু মানুষের জন্য রয়েছে তাঁর এক সীমাহীন সহানুভূতি। বর্তমানের ধ্বংসস্তূপের উপরে জেগে উঠছে ভবিষ্যতের সূর্যতোরণ—নোতুন কাল ও নোতুন পৃথিবীর জন্ম হচ্ছে, হবে—এমনটাই আশা করেছিলেন আর্নল্ড। কিন্তু দুঃখজনক নিয়তি হলো এই যে তাঁকে থাকতে হলো—

'Standing between two worlds, one dead,
The other powerless to be born.'

পৃথিবীর সব জীর্ণজরা ঝরিয়ে দিয়ে, প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দিয়ে নোতুন সৃষ্টির জন্য কোন প্রতিশ্রুত নায়কের আবশ্যক। এই নবনায়ক হয়তো আসবেও একদিন কুহেলিকা যবনিকা সরিয়ে ফেলে তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের মতন। কিন্তু এখনো সে আসে নি। আসতে তার দেরি হচ্ছে। আর্নল্ড দেখেছেন তাই পৃথিবীকে নোতুন করে ঢেলে সাজাবে, এমন কোন শক্তি নেই। কবির কাছে তাই মনে হয় এই কালটা যতটা ধ্বংস সাপেক্ষ ততটা সৃষ্টিশীল নয়। বরং প্রমাণিত হয়ে গেছে—

'Europe's dying hour
Of fitful dream and feverishpower.'

যে বিশ্বাস একদা গঠন করেছিল ইউরোপকে, নিয়ন্ত্রিত করেছিল, সে বিশ্বাস আজ অন্তহিত; সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। ওবারম্যানের স্রষ্টা সেনানকুর আর্নল্ডকে এহেন ধারণারই সম্মুখবর্তী করে দিয়েছিলেন। সেনানকুরও মনে করতেন যে একটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এবং তাইতেই মানুষের হতাশার রাগিনী অমন গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন মানুষই বিষাদবিরহিত হতে পারেন না। আর্নল্ডও পারেন নি।

পারেন নি তথাকথিত আশাজ্জ্বল কবি ও সাহিত্যিক শিল্পীদের সঙ্গে একাত্ম হতে। তাঁর কণ্ঠ থেকে ব্রাউনিং-এর মতন উচ্চারিত হয় নি—

"God's in his heaven ; all is right with world.

বরং আর্নল্ড যেন আমাদের বলতে চেয়েছেন—আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল, নিল ভুলায়ে…?

আর্নল্ডও মনীষী কার্লাইলের মতন বিশ্বাস করতেন যে যা কিছু সংক্রামকের মতন এই বিশ্বকে আচ্ছন্ন করেছে তার হাত থেকে পরিত্রাণের পথ হলো বস্তুতান্ত্রিক সত্যে লীন হয়ে যাওয়া নয়, পরন্তু আধ্যাত্মিক পথের নিষ্ক্রামণ। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় কোন আস্থা ছিল না কবি আর্নল্ডের; তিনি মনে করতেন যে ঐ যুগটা ছিল অবিবেচক, যুক্তিহীন, কল্পনাবিলাসী। তিনি জানতেন যে মানুষের প্রগতিকে রুদ্ধ করবার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

আর্নল্ড মনে করতেন যে সময় সততই দাবী করে, এমন এক বেলাভূমি, যা কখনোই কোন কুহেলীকুহকে আচ্ছন্ন নয়; যেখানে গিয়ে চলা শেষ করা যায়। আমরা সকল সময়ই একজন পথনির্দেশক সমুদ্রসন্ধানী অভিযাত্রিক কলম্বাসের খোঁজ করি যিনি আমাদের উত্তরণ দেবেন নোতুন কালের দিগন্তে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, আমরা কখোনই সেই নাবিকের সন্ধান পাই না। সাক্ষাৎ পাই না সেই চালকের।

নানা সমস্যার কথা বলেছেন আর্নল্ড বারবার তাঁর কবিতার মধ্যে। কিন্তু কোন সমাধানই দেন নি। তাঁর কাছে সবচেয়ে অসুবিধা ছিল এই যে তিনি মধ্যযুগীয় সভ্যতার সঙ্গে আপোষসাধন করতে পারেন নি, আবার আধুনিক কালকেও আহ্বান করতে পারেন নি।

কবিতা বলতে আর্নল্ড বুঝতেন "জীবনেরই সমালোচনা।" তাঁর নিজের কবিতা সম্পর্কেই তা সর্বৈব সত্য। তাঁর কবিতা তাই হয়েছে যত না গঠনমূলক—সৃষ্টিশীল, তার চেয়ে বহুলাংশে সূক্ষ্মদর্শী। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও তাঁকে সূক্ষ্মদর্শী বলতে হয়। গ্যেটে, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও সেনানকুরকে কবি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই সূক্ষ্মদর্শী মনের মেজাজ বুঝতে পারা গেছে। থার্সিস, স্কলার জিপসী, রেজিগনেশন, ওবারম্যান এবং সাদার্ন নাইট কবিতাতে। আপন যুগ, আপন দেশ ও ব্যক্তিমানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আর্নল্ড বারবার মন্তব্য করেছেন।

কবিতার আঙ্গিক ও রীতির ব্যাপারেও আর্নল্ড যতটা ক্ল্যাসিক্যাল ততটা রোমান্টিক নন বলেই আমার মনে হয়েছে। চরম রোমান্টিসিজিমের সৌন্দর্য কিংবা দুর্বলতা অথবা ইম্প্রেশনিষ্টদের ইঙ্গিতময়তা আমি কখনোই আর্নল্ডের কোন কবিতাতেই লক্ষ্য করি নি। বরং প্রতিটি কবিতার অনবদ্য স্বচ্ছন্দগামীতা এবং প্রকাশময়তা স্বভাবতই তাঁর কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। জীবনের নানা দিক ও জটিলতার প্রসঙ্গে কবিতা রচনা করলেও আর্নল্ড তাঁর লেখায় প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেন নি। তাঁর নিসর্গ বিষয়ক কবিতাও কম নেই। "প্রকৃতি তোমার আশ্চর্য হোক" —ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতন আর্নল্ডও এ কথা উচ্চারণ করেছেন নির্দ্বিধায়। তথাপিও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে আর্নল্ডের। ওয়ার্ডওয়ার্থের কাছে প্রকৃতি হলো ক্ষণকালের আশ্রয়স্থল। দিনযাপন আর

প্রাণধারণের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফলে "জীবন যখন শুকায়ে যায়" তখন আর্নল্ডের কাছে প্রকৃতির কাছে আসার অর্থ "করুণাধারায় আসা।" আর্নল্ডের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতন প্রশান্তি আছে সত্য। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের আনন্দদীপ্তি কিংবা নিরাসক্তি—দুটোই তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে অনুপস্থিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিসর্গের সান্নিধ্যে, নদীজপমালা ধৃত প্রান্তরে চিরকাল কাটিয়ে দিতে পারেন কিন্তু আর্নল্ড তা পারেন না।

আর্নল্ডের চিত্তের প্রশান্তির অর্থ তাঁর বুদ্ধিজীবী মননের ক্ষণিকের বিশ্রাম আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে তা নিতান্তই মজ্জাগত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্বভাবপ্রকৃতির সবচেয়ে সঠিক অভীধা হলো ট্র্যানকুয়িলিটি। আর আর্নল্ডের প্রশান্তির অর্থ হলো এক উদাসীন শান্ত বৈরাগ্য।

আর্নল্ডের অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই শোকসূচক উপাদান নিহিত। বলাই বাহুল্য এ উপাদান সৃষ্টিতে তিনিই একক পথ প্রদর্শক নন। এ ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে নিকটতর সহচর ছিলেন উইলিয়াম ওয়াটসন। মিলটন, গ্রে, শেলী ও টেনিসন ইত্যাদি কবিরা সকলেই এক একটি শোকগাথা রচনা করেছেন কিন্তু আর্নল্ডের মতন এমন সর্বব্যাপী শোকগাথা কেউই রচনা করেন নি। এই শোকগাথা রচনার অর্থ হলো আর্নল্ডের মধ্যে যে "ভার্জিলের-ক্রন্দন" অব্যক্ত মন্দাকিনীর মতন বয়ে চলছিল তাকেই ভাষা দান করা।

কোন দুঃখ বিলাস নয়, ভাববিহ্বল ব্যথাবোধ নয়, আনন্দ উচ্ছ্বাসও নয় আর্নল্ডের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এমনই এক প্রশান্তি যা বারবার ব্যহত হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বীরের মতনই রক্ষা করেছে তার আপনসত্তা। আর্নল্ড শান্তি প্রয়াসী—কিন্তু শান্ত নন; প্রশান্ত—কিন্তু সমাহিত নন। তিনি একবারে শান্তিতে খুশী হতে পারেন না।

"Calm is not life's crown tho calm is well."

যদিও দৃষ্টিভঙ্গীতে দুঃখবিলাসী ছিলেন কবি তথাপিও তিনি একেবারে আশাহীন ছিলেন না। তাঁর সামার নাইট কবিতাতে আমরা আশা ও করুণার প্রলেপ দেখতে পাই। এখানে দুঃখ আছে কিন্তু কঠিন বৈরাগ্যের আস্তরণে সে দুঃখ কোথাও উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত নয় যতই সময় এগিয়ে গেছে আমরা কবির মধ্যে সাহস ও আশা সমন্বিতও হতে দেখতে পেয়েছি। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের আনন্দ ও প্রশান্তি এবং গ্যেটের বিশাল প্রজ্ঞাদৃষ্টি আর্নল্ডের কবিকণ্ঠেও বহন করে এনেছে—"All pains the immortal spirit must endure."

সূক্ষ্ম ও মনোরম কবি শিল্পী ছিলেন আর্নল্ড; তাঁর কাব্যসঙ্গীত টেনিসনের চেয়ে অনেক বেশী ছিল সীমিত; ব্রাউনিং-এর মতন জীবন দৃষ্টি কিংবা পৌরুষও তাঁর ছিল না; তা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে মুহূর্তের বিদ্যুৎগর্ভ কল্পনা ও অনুভূতির শিহরে আনন্দে তাঁর কবিতাকে তিনি নির্মাণ করেছেন অপূর্ব করে। হয়তো অত্যুক্তি হবে না একথা বললে যে, "আর্নল্ডও সফোক্লিসের মতন জীবনকে দেখেছেন স্থিরভাবে, সামগ্রিক ভাবে।"

ভিক্টোরীয় যুগের কাব্যাকাশে আর্নল্ড যেন এক নক্ষত্রের রাত, কুয়াশার স্পর্শে ম্লান—সুন্দর ও শীতল।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে আর্নল্ডের মতন কবি কে? মধুসূদন? মোহিতলাল? যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত? না জীবনানন্দ? কার সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যাবে আর্নল্ডের স্বাধর্ম?

সঙ্গীত রসিক সঙ্গীতশিল্পী অতুলপ্রসাদ

কল্যাণকুমার বসু

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সরলা দেবীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের যখন আলাপ পরিচয় হয় তখন অতুলপ্রসাদ সদ্য প্রত্যাগত নব্য বারিষ্টার।

প্রথম আলাপে রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদকে বললেন একটা গান করুন তো অতুলবাবু। আপনি নিজে কবিতা যখন লেখেন নিজেরই গানই করুন। অতুলপ্রসাদের তখন লজ্জায় সঙ্কোচে পৃথিবী দ্বিধা হও ভাব।

কবি অতুলপ্রসাদের প্রসঙ্গে বলতে প্রথমে যে কথাটি মনে আসে তা'হল তাঁর কবিতা ও গান সম্বন্ধে স্বাভাবিক এক নম্র লাজুকতার কথা। তাঁর গান রচনা করতে এবং গান গাওয়াতে ছিল কুণ্ঠা অথচ আগ্রহের অভাব ছিল না।

অতুলপ্রসাদ প্রায়ই বলতেন আমার গান নিয়ে তোমরা যে কেন এত মাতামাতি কর আমি বুঝতে পারি না, আমার গানে রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের মত ভাষার ঝঙ্কার বা পদলালিত্য নেই।

সঙ্গীতজ্ঞ মেঘেন্দ্রলাল রায় তাতে বলেছেন কিন্তু আপনার গানে যা আছে তাতে প্রমাণ হয় আপনার সুরের ঐশ্বর্য ঝঙ্কার ও পদলালিত্যকে ম্লান করে এমন সহজ আবেদন শ্রোতার মনে এনে দেয় যা ভাষার ঝঙ্কার যা পদলালিত্য অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ অতুলপ্রসাদকে একবার বলছিলেন আপনার গানের সুর রবীন্দ্রনাথের গানে সুর অপেক্ষা বিশুদ্ধজাত এবং উৎকৃষ্টতর। অতুলপ্রসাদ তাঁর কথায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলেছিলেন, 'কবিগুরুর সাথে আমার তুলনা করবেন না তাঁর সাথে আমার তুলনা হয় না'। লণ্ডন থেকে প্রথমবার ফিরে এসে অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের খামখেয়ালী আসরে যোগ দিলেন। তিনি ছিলেন সে আসরের সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য। গান গল্প সাহিত্যালোচনা কাব্য পাঠ সবই'ত ছিল সে আসরের অন্তর্গত। বৈশিষ্ট্য ছিল খাওয়া দাওয়া। প্রত্যেক সভ্যর বাড়ি বাড়ি ঘুরে পালাক্রমে আসর বসত। সে সভ্যই সকল সভ্যর সেদিনের ভার বইত।

ব্যারিষ্টারী করা তা কেবল জীবিকা অর্জনের তাগিদে। মন পড়ে থাকত অতুলপ্রসাদের রবীন্দ্রনাথের কাছে—খামখেয়ালী আসরে। কলকাতায় যখন ব্যারেষ্টারী জমল না, গেলেন লর্ড সত্যপ্রসন্ন সিংহ এবং অন্যান্য ক'য়েকজনের পরামর্শে রংপুর ব্যারিষ্টারী করার জন্য। তারপর আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যিক কবিগোষ্টি। কলকাতায় আছে প্রাণ: অতুলপ্রসাদ পায়ে পায়ে পা বাড়ালেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি—তখন বর্ষাকাল ছোট একখানি ঘরে ওঁরা তিনজন। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ কবিগুরুর সখা লোকেন্দ্র পালিত। জানালাপথে মেঘ বর্ষার রূপ দেখতে দেখতে বর্ষার কবিতা আবৃত্তি ও গান চলত। তখন শুধু গান আর গান।

১৯০১ সালে কলকাতায় বিডন স্কোয়ারে যে জাতীয় সম্মেলন হল তাতে নিতান্তই অপরিচিত

কণ্ঠে এক অদ্ভুত রক্ত পাগল করা গান দেশের মানুষ শুনলো। সেদিন থেকে অতুলপ্রসাদের পরিচয় 'উঠগো ভারতলক্ষ্মীর কবি অতুলপ্রসাদ সেন'। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতুলপ্রসাদের সঙ্গে জলধর সেনের যখন পরিচয় করিয়ে দেন তখন বলেন চিনতে পারছেন 'ইনি আমাদের সেই 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মীর কবি অতুলপ্রসাদ সেন।' ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজায়গায় লিখেছেন 'আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অন্যধরণের। আমাদের পরিচয় হয় সঙ্গীতের আসরে। আমার প্রিয়গানের রচয়িতা হিসেবে যুবা বয়স থেকে তাঁর নাম শুনে এসেছি। সবুজপত্রের এক বৈঠকে তাঁর মুখে তাঁর গান শুনি। কৈসারবাগে তখন তিনি থাকতেন। অনেক রাত পর্যন্ত গানবাজনা হয়। তারপর কত আসরে তাঁর পাশে বসে গানবাজনা শুনেছি তার সংখ্যা নেই। ভালো গান বাজানা শুনলে তিনি বালকের মত অধীর হয়ে উঠতেন, অস্ফুট চীৎকার করতেন মুখদিয়ে উর্দু জবান বেরুত, একস্থানে বসে থাকতে পারতেন না, আবার তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হতেন। কতবার বলেছেন দেখ একটু ব্যাকুল ও বেসামাল হয়ে পড়লে আমার জামা ধরে টেন। তোমাকেই বা কে সামলায় তার ঠিকানা নেই। শারীরিক উত্তেজনা অল্পক্ষণের জন্যেই তাঁকে অভিভূত করত। তারপর ধীরে ধীরে নামত তাঁর মুখে সর্বাঙ্গে এক সস্মিত কমনীয়তা, যার স্থিতি আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

১৯০৩ সালে অতুলপ্রসাদ লখনউতে উপস্থিত হলেন সপরিবারে। লখনউতে শুরু হল তার ব্যারিষ্টারী জীবন। পারিবারিক নানা দুঃখ বেদনার জন্যেই তাঁকে বাংলাদেশ তথা সাহিত্যের বঙ্গভূমি কলকাতা ছেড়ে দূর বিদেশে প্রবাসী জীবন কাটাতে হল। তবুও একপক্ষে ভালোই হয়েছিল। কারণ অতুলপ্রসাদের গানের যে প্রধান ঠুংরীর সুর তার অন্যতম জন্মভূমি এই লখনউ শহর। লখনউ ঠুংরীর জনক বিন্দাদিন মহারাজ। অতুলপ্রসাদকে লখনউ প্রবাসী করে বাংলাসঙ্গীত জগৎ লাভ করেছে বাংলা গানে ঠুংরীর মধুর তান ও কোমলতা। শ্রীদিলীপকুমার রায় বলেছেন অতুলপ্রসাদের গানের একাধিক দিক থাকলেও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান: প্রথম বাংলা গানে ঠুংরির মধুরতম কোমলতম বিচিত্রতম ঝঙ্কারের আমদানি—লীলায়িত ভঙ্গীতে। লীলায়িত বলতে আমি বুঝেছি—গানকে সুরের অবকাশ দেওয়া কথার চাপে অষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ করে বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার চেষ্টা না করা।'

অতুলপ্রসাদ নিজেকে কোনো গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখেন নি, প্রবাসে বাস করেও নিজেকে প্রবাসী বলে কোনদিন মনে করেন নি—সেদেশের মানুষকে আপনার করে নিয়েছিলেন সেদেশের সঙ্গীত সংস্কৃতি সবকিছুতেই তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল। সঙ্গীতের আকর্ষণে তাঁর যাত্রা ছিল তার উৎস সন্ধানে। লখনউর প্রখ্যাত উর্দু কবিদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল এবং তাদের কবিগানের আসর মুসেরাতে তাঁর যাতায়াত ছিল। ঠুংরীর আকর্ষণে যাত্রা ছিল তার বাঈজি পাড়ায়। গান ছিল তাঁর প্রাণ, গানের জন্যে তাঁর মন সব সময়ে উন্মুখ থাকতো যদিও তাঁর অবসর ছিল না নানান কাজের মাঝে—কত অসংখ্য তাঁর কাজ। তিনি ছিলেন লখনউর মুকুটহীন বাদশা। তিনি লখনউ কংগ্রেসের একজন মডারেট নেতা সমাজসেবী শিক্ষাব্রতী মানব দরদী কিন্তু সবথেকে প্রথমে তিনি ছিলেন একজন শিল্পী। তিনি নিজে খুব যে একটা ভাল গাইতে পারতেন তা নয় গলা ভাল ছিল

না তবে তাঁর গলায় সে কি অপূর্ব দরদ, অপূর্ব মিড় আশ সূক্ষ্ম গমকই বেরুত তাঁর কণ্ঠে। তিনি মনে প্রাণে সাড়া দিতেন সুরের সূক্ষ্মতায়। তিনি গান রচনা করতেন সুরের পথ ধরে। তাঁর মনে সুর আসত প্রথমে তারপর আসত ভাষা। 'গোমতী নদীর তীরে রিভার ব্যাঙ্ক রোডে প্রাতঃভ্রমণে পায়চারী করছেন মনে মনে চলেছে গুনগুন সুর তখনই বুঝলাম নতুন গান হবে রচনা। হলোও তাই নতুন গান।' বলেছেন উত্তরা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী। বাথরুমে স্নান করছেন মাথার উপর ঝরণা খুলে দিয়ে ভাব এল, গুন গুন রব তুলল হৃদয়ে—গুনগুন করে গাইলেন জন্ম হল 'জল কহে চল' এমনি আরো কত গান।

পারিবারিক দুঃখ তাঁর অন্তঃকরণে ছিল জমা। স্ত্রী তাঁকে আঘাত করেছেন সামান্য সামান্য কারণে। তাঁকে ছেড়ে দূরে একাকী বাস করেছেন, দুজনের মাঝে অভিমান। আত্মীয় স্বজনদের বিচ্ছেদ ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে—তিন বোনেদের স্বামীরা অকালে বোনেদের বিধবা রেখে বিদায় নিয়েছেন। মায়ের মৃত্যু, বোনপো একের পর এক মৃত্যুর আঘাত তবু মুখের হাসি মিলিয়ে যায় নি। 'যে ঈশ্বর আমাদের আঘাত দিয়েছেন সেই ঈশ্বরের হাত ধরিয়া থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই' তিনি বলেছেন একথা। ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তাই তিনি গাইতে পেরেছেন—

'আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, বুঝতে নারি কিছুই যে গো।

কিম্বা　　কি আর চাহিব বলো, হে মোর প্রিয়,
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।'

...　　...　　...　　...　　...

'যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে ;
আমার ভাবনা প্রিয় তুমি ভাবিয়ো।'

এবং আরো কত আত্ম সমর্পণের গান।

এত দুঃখ মনে তবু হাসি তাঁর সব সময়ে মুখে। তাঁর লখনউর বাড়ি যেন আনন্দনিকেতন। সব সময়ে অতিথির আগমন। প্রতি রবিবার গানের আসর কবিতার আসর—যেখানেই অতুলপ্রসাদ কি কলকাতায় কি লণ্ডনে কি শান্তিনিকেতনে যেখানেই হোক সেখানেই সাহিত্যবাসর জ্ঞানীগুণীদের আগমন। সঙ্গীত খাওয়া-দাওয়া এ যেন গৌরীসেনের টাকা।

লখনউ-এর অধিবাসী অতুলপ্রসাদের স্নেহধন্য ৺সত্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "প্রায় রবিবারই তাঁর বাড়িতে সাহিত্যসেবীদের বৈঠক হতো এবং ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ, অধ্যাপক বিনয় দাশগুপ্ত, ডাঃ বিজনবিহারী, অধ্যাপক শম্ভুশরণ রসরাজ দুর্গাদাদা প্রভৃতির সঙ্গে নির্মল দে (ক্ষেপা) এবং আমারও স্থান ছিল। মধ্যে স্বল্পবাক অধ্যক্ষ শ্রীশ সেনও দেখা দিতেন। সকলেই স্বলিখিত কবিতা বা গল্প পাঠ করতেন। এইভাবে মজলিসটি বেশ আনন্দের উৎস ছিল এবং বিদায়ের পূর্বে চা জলখাবার ও সাময়িক মিষ্ট ফলের দ্বারা অতুলদাদা আগতদের তুষ্ট করিতে সর্বদাই যত্নবান ছিলেন।'

কৈসারবাগে থাকতে অতুলপ্রসাদের ঘুম ভাঙতো আলিম হোসেনের সানাইয়ের ভৈঁরো আর

টোড়ী শুনতে শুনতে। তালিমহোসেন লখনউর শেষবিখ্যাত সানাইয়া। 'ইয়ামুফের সেতারে মিঠে হাত রাখলে হয় না। সেতার শোনা যাবে।' তাকেই রাখলেন। 'বরকতে ছড়ির টান ভালো—নিয়ে এসো তাকে।' 'অতুলপ্রসাদের মত রসিক দুর্লভ রসই তাঁকে সংহিত করেছিল। রসের মর্যাদা তিনি দিতে জানতেন' ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন 'পর্ণকুটীরে ভৈরবীর ঠুংরী শুনতে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে। বৃদ্ধ ওস্তাদ কেঁপে অস্থির—সেন সাহেবকে কোথায় বসাবে? সেই ছেঁড়া ভাঙা খাটিয়ার ওপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনলেন—বেলা বারোটা হল—ওস্তাদের ছেলের হাতে দুখানা নোট গুঁজে দিলেন—আর কিসী রোজ তস্‌রীফ 'নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। লখনউর একজন পাগলী আছে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, এককালে বিখ্যাত গায়িকা ছিল। এখন অদ্ভুত টোড়ী আর ভৈরবী গায়। অতুলদা শুনেই সংবাদ দাতাকে পাঁচটাকা দিলেন 'তাকে নিয়ে এসো, নিয়ে এসো।' সেদিন তাকে পাওয়া গেল না। টাকা ফেরত দেয়ার সময়ে তিনি বললেন, 'ও তো তোমার কাছেই থাক, যখন খুঁজে পাবে ধরে এনো'। বুঝলাম এটা হয় সুখবরের পুরস্কার। রাজকুমারের গজমতীর মালাদান, না হয় সংবাদ দাতাকে সাহায্য। যে খবর দিয়েছিল সে ছিল বিদেশী সঙ্গীত শিক্ষার্থী। ছোট মুয়ে ওয়াজিদ আলি শা'এর দরবারে শেষ গায়ক এসে জুটেছিল অতুলসেনের বৈঠকখানায়।'

'কদরদান' বলে লখনউতে একটা কথা আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন 'কদরদান বলতে লখনউর লোকে ঠিক কি বোঝে জানি না—তবে আমি অতুলপ্রসাদকে বুঝতাম। বাংলা দেশ ওয়াজিদ আলি শার মারফৎ লখনউর কাছে চিরঋণী কিন্তু অতুলপ্রসাদকে লখনউএ প্রবাসী করে লখনউ সে ঋণের প্রতিশোধ করেছে। অমন দরদী না হলে কেউ অমন কদর দিতে পারে?'

গান গাওয়া গান শোনা। এর যেন শেষ নেই। লখনউ-এর বিরাট সঙ্গীত সম্মেলন। সারা ভারতের সেরা গায়ক গায়িকা উপস্থিত অতুলপ্রসাদ সেখানেও কর্ণধার। সঙ্গীত সম্মেলন শেষ হয়ে গেল কিন্তু সঙ্গীতের কী শেষ হয়। দিলীপকুমার রায় ও সাহানাদেবীর ওপর স্নেহের আমেজ হল শীঘ্র ফিরলে চলবে না। অতএব গান গাওয়া শুরু হলো ওঁদের দুজনের। লখনউর চেনা পরিচিত ঘরোয়া ভাবে বাড়িতে বাড়িতে। সঙ্গীতসাগরে ডুব দিয়েছেন অতুলপ্রসাদ অত সহজে নিস্তার নেই মণ্টু এবং ঝুনুর।

ঝুনুও (সাহানা দেবী) ওস্তাদ। যেখানেই সুযোগ পায় দারজিলিং লখনউ গিরিডি সেখানেই ভাইদাদার কাছ থেকে গান তুলে নেয়। তার গানের এমন দরদ তার কাছে বসে না শিখলে কোথায় পাবে।

অতুলপ্রসাদ সব সময়েই ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ লখনউ আসবেন তাঁকে জবরদস্ত সম্মান জানাতে হবে বেঙ্গলীক্লাবের সভ্যরা গান গাইবে···নতুন গান চাই পাহাড়ীকে গাইতে হবে। পাহাড়ী নতুন গান লিখছি আমার কাছে এসো কেমন! 'আওয়ার ডে ফণ্ড' টাকা তুলে দিতে হবে এসো আমরা সকলকে গান শোনাই।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার কে, জি, গুপ্ত, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ যে কেউ আসবেন তাঁদের অভ্যর্থনা করা হবে বেঙ্গলী ক্লাবের পক্ষ থেকে চলবে গান।

'গান রচনা করতে কুণ্ঠা গাইতে কুণ্ঠা অথচ আগ্রহ' 'গাইতে কি তিনি সহজে চাইতেন' দিলীপকুমার রায় বলছেন 'গান রচনা করেছেন গাইছেন সেও যেন একটা অপরাধ কত সঙ্কোচ প্রচার করতে আপনাকে।' 'অথচ কেউ যদি তাকে গান গাওয়ার অনুরোধ করতেন অসুস্থ শরীরেও ঠেলতে পারতেন না কখনো' বলেছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'গান গান আর গান। প্রসারী বাঙালীদের সাহিত্যসভায় যোগ দেওয়া ছিল তার নেশা।

'তাঁর উপস্থিতিতে রসের ফোয়ারা বয়ে যেত' ধূর্জটিপ্রসাদ আর এক জায়গায় বলেছেন কানপুরে রাত দুটো পর্যন্ত গাইলেন দিল্লীতে' জয়ন্তী উৎসবে রাত বারোটা পর্যন্ত। শেষকালে জোর করে বাড়ি পাঠালাম। গোরখপুর, নাগপুর, কাশী সর্বত্রই তিনি গিয়েছেন—সকলকে মুগ্ধ করেছেন কেবল সৌজন্যে নয় সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রীতির সক্রামণে। এমন রসিক সুজন দুর্লভ।

ভারতীয় সাহিত্যে পুরূরবা উর্বশী কথা

দেবনাথ দাঁ

পুরূরবা উর্বশী প্রণয়কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যের এমন একটি বিষয় যা প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে এসেছে। গল্পকাহিনীর প্রবহমানতা ভারতীয় সাহিত্যে নতুন নয়। বৈদিক সাহিত্যের আরো অনেক গল্প যেমন হরিশচন্দ্র রোহিত শুনঃশেপের কাহিনী কালানুযায়ী পরিবর্তনের পথ বেয়ে পরবর্তী পৌরাণিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবাহিত। রামায়ণ মহাভারতের কতো গল্প কতো কবির কল্পনার রসে সঞ্জীবিত হয়ে সংস্কৃত কাব্য-নাটকে নবীনতা লাভ করেছে। পুরূরবা উর্বশীর মতো আর কোনো কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যের প্রত্যুষকালে জন্মলাভ করে ব্রাহ্মণ-মহাভারত-ভাগবতের ভিতর দিয়ে কালিদাস এবং তারপরে একেবারে রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকে এসে উপনীত হয় নি। নতুন কালে সে কাহিনী নতুন বাঁক নিয়েছে সত্য, স্বতন্ত্র কবির বিশিষ্ট ভাবকল্পনা তাকে রূপান্তরিত করেছে, কিন্তু প্রাচীন গল্প ধারায় নিরবচ্ছিন্নতা তাতে হারায় নি। একমাত্র লক্ষ্যগোচর ধারাবাহী সূত্র বলে পুরূরবা উর্বশীর গল্প ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান। কোথায় কী ভাবে রূপান্তরিত হয়ে এই প্রাচীন গল্পকথা আধুনিক কবির চিন্তালোক অধিকার করে রয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য সেই দিকে।

ঋগ্বেদে পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনী নাটকীয় সংলাপের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত। পলায়নপরা প্রিয়তমার উদ্দেশে পুরূরবার খেদোক্তি দিয়ে এই গাথাটির সূত্রপাত :

হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে
বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈনু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এ তে
ময়স্করন্ পরতরে চ নাহন্ ॥ ১০।৯৫।১

[হে পত্নি, তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অতি শীঘ্র চলিয়া যাইও না। আমাদের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হইতেছে। এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করিয়া না বলা হয়, ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হইবে না—ঋগ্বেদ-সংহিতা, রমেশচন্দ্র দত্ত।]

উর্বশী বললেন,

কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং
প্রাক্রমিষমুষ সামগ্রিয়েব।
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি
দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি ॥ ১০।৯৫।২

[তোমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমার কি হইবে? আমি প্রথম উষার ন্যায় চলিয়া আসিয়াছি। হে পুরূরবা, আপন গৃহে ফিরিয়া যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও

তেমনি আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না—ঐ]

উর্বশী-পুরূরবার এই সংলাপ থেকে জানতে পারা যায় উর্বশী স্বৈরিনী। পুরূরবার গৃহে তিনি পত্নীরূপে চার বৎসর অবস্থান করেছিলেন। পুরূরবার বংশবীজ আপন গর্ভে ধারণ করলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এখন তিনি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করবেন। বিরহী হয়ে রাজা ব্যাকুল হয়ে পত্নীকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর সন্তান জন্মলাভ করে যখন পিতার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করবে, তখন উর্বশী কি উত্তর দেবেন তাকে? উর্বশী বললেন, যথাসময়ে পুত্রকে তিনি পুরূরবার নিকট দিয়ে যাবেন। পুরূরবা যেন দুঃখ না করে স্বগৃহে ফিরে যান। রাজা উত্তর দিলেন, তিনি ফিরেই যাবেন, তবে গৃহে নয়, আজানিত দূরদেশে, নয়তো মৃত্যুবরণ করবেন। তাঁর দেহ বৃকের ভক্ষ্য হবে। রাজার এই অসহায় কাতরোক্তি শুনে উর্বশীর মন করুণায় বিগলিত হল, তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

পুরূরবো মা মৃথা মা প্র পপ্তো
মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উ ক্ষন্।
ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা ॥ ১০।৯৫।১৫

[হে পুরূরবা, এরূপে মৃত্যু কল্পনা করিও না; উচ্ছন্নে যাইও না, দুর্দান্ত বৃকেরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই একপ্রকার—ঐ]

কিন্তু বিরহী হৃদয়ের অতলস্পর্শ বেদনা এতে কী কোনো সান্ত্বনা মানে? তিনি ব্যাকুল হয়ে শেষবারের জন্য অনুনয় করলেন:

অন্তরিক্ষ প্রাং রজসো বিমানীমুপ
শিক্ষাম্যুর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য
তিষ্ঠান্নিবর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে ॥ ১০।৯৫।১৭

[আমি বসিষ্ঠ, অন্তরীক্ষপূর্ণকারিনী আকাশপ্রিয়া উর্বশীকে আমি আলিঙ্গন করিতেছি। তোমার সুকৃতির সুফল যেন তোমার নিকট বর্তমান থাকে। হে উর্বশী, ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।—ঐ]

পুরূরবা-উর্বশী আখ্যানের আরম্ভ যেমন, উপসংহারও তেমনি অত্যন্ত নাটকীয়। প্রেমিক হৃদয়ের বিরহ তাপে সঞ্জীবিত এমন বাস্তব রসসিক্ত কবিতা বৈদিক সাহিত্যেও অল্পই আছে। ঋগ্বেদীয় কবিতার এই আবেদন পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যে দুর্লভ, এমনকি কালিদাসেও যেন এর পূর্ণ সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হয় নি! পলাতকা প্রেমসৌন্দর্যের মূর্তিমতী প্রতিমা উর্বশীকে লাভ করবার জন্য প্রেমিক হৃদয়ের চিরন্তন ব্যাকুলতা ঋগ্বেদ ব্যতীত যদি আর কোথাও এমন করে বাণী লাভ করে থাকে, তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়।

ঋগ্বেদের পুরূরবা-উর্বশীর গল্প বেশ প্রাচীন। কাহিনীর রচয়িতারূপে কোনো ঋষির নাম

সেখানে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের পর এই কাহিনী পাওয়া গেল শতপথ ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণ-সাহিত্য বেদ বহির্ভূত নয়, বেদেরই দ্বিতীয় অংশ। শতপথ ব্রাহ্মণের পুরূরবা-উর্বশীর গল্প ঋগ্বেদের মূল ধারাটি অনুসরণ করলেও এর আগে ও পরে কিছু অতিরিক্ত আছে। ঋগ্বেদের কাহিনীতে উর্বশী স্বয়ং পুরূরবাকে পরিত্যাগ করেছেন, যখন তিনি জানলেন, পুরূরবার বংশবীজ তাঁর গর্ভে। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে মর্ত্যলোক থেকে উর্বশীকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনবার জন্য গন্ধর্বেরা পরামর্শ করেছে। ব্রাহ্মণে আছে, উর্বশীর শয্যাপার্শ্বে দুটি শাবককে নিয়ে এক মেষী বাঁধা থাকত। গন্ধর্বেরা একটি শাবককে প্রহার করলে উর্বশী সেই স্থানকে পুরুষশূন্য বলে মনে করেন। গভীর রজনীতে পুরূরবা তখন উর্বশীর যৌবনসৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। প্রিয়তমার পরুষ ভর্ৎসনাবাক্য সহ্য করতে না পেরে অন্ধকারেই তিনি ছুটে গেলেন অসহায় মেষশিশুটিকে রক্ষা করতে। বস্ত্র পরলেন না, পাছে বিলম্ব হয়। এমন সময় গন্ধর্বেরা আকাশে অকস্মাৎ বিদ্যুতের আলোক জ্বেলে পুরূরবার নগ্নরূপ দেখিয়ে দিল উর্বশীকে। উর্বশী তার অনিন্দ্য-সুন্দর যৌবনকান্তি নিয়ে পুরূরবার কাছে ধরা দেবার আগে তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে, তিনি অসময়ে পতিকে বিবস্ত্র দেখবেন না। গন্ধর্বদের উদ্দেশ্য সফল হল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উর্বশী স্বামীর কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু পুরূরবার যৌবনতৃষ্ণায় তখনো কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি। তিনি পলায়ন পরা কান্তার অনুসরণ করে উপনীত হলেন এক কমল সরোবরে, যেখানে উর্বশীর সখীরা রাজহংসী হয়ে বিচরণ করেছিলেন। অতঃপর কাহিনী বেদের অনুসারী। কিন্তু উর্বশী প্রিয়তমের অনুরোধ রাখতে পারলেন না। তবে কথা দিলেন, বৎসর পূর্ণ হলে এক রাত্রিতে তাঁর শয্যায় রাজার নিমন্ত্রণ রইল এবং সেই মিলনরাত্রিতেই তিনি তাঁর গর্ভজাত পুত্রকে তুলে দেবেন পিতার কোলে। বলা বাহুল্য এ কাহিনী ঋগ্বেদে অনুপস্থিত। বৎসরান্তে রাজা যখন উর্বশীর সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন উর্বশী রাজাকে জানালেন, রাজা যদি পুনরায় উর্বশীকে কামনা করেন, তাহলে তিনি যেন সকালে গন্ধর্বদের নিকট তাঁদের মতো তনু প্রার্থনা করেন। পরদিন প্রভাতে গন্ধর্বেরা রাজাকে বর প্রার্থনার আদেশ করলে পুরূরবা উর্বশীর কথামতো গন্ধর্বদের জীবন কামনা করলেন। কিন্তু তাঁরা জানালেন, মানুষের মধ্যে অগ্নির সেই যজ্ঞোপযুক্ত তনু নেই যার দ্বারা যাগ করে তাঁদের একজন সে হতে পারে। পুরূরবার ইচ্ছাপূরণের জন্য গন্ধর্বেরা পাত্রে অগ্নি রেখে তাঁকে দান করলেন। পুরূরবা সেই অগ্নি সযত্নে রক্ষা করে আগে সন্তানকে রেখে গেলেন গৃহে। তারপর অগ্নি আনতে গিয়ে দেখেন, অগ্নি সেখান থেকে অন্তর্হিত। এর পরের কাহিনী যজ্ঞ-মহিমা বর্ণনায় ধূমান্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। ঋগ্বেদীয় কবিতার বিষাদান্ত পরিণতির করুণ মাধুর্য শতপথ ব্রাহ্মণে এইভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

ঋগ্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণের এই কাহিনী মহাভারতে অন্যান্য বহুবিধ কাহিনীর সঙ্গে মিলিত মিশ্রিত হয়ে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। ঋগ্বেদ এবং ব্রাহ্মণে উর্বশীর স্বস্থান হিসেবে কোনো বিশিষ্ট স্থানের বর্ণনা নেই, কিন্তু মহাভারতে উর্বশীকে দেখা গেল দেবরাজ ইন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন সভানর্তকীরূপে। তিনি পুরু বংশের জন্মদাতৃ। পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ করেন। পুরু তাঁরই প্রপৌত্র। পুরুবংশের কোনো রাজেন্দ্র পুণ্যবলে স্বর্গে আগমন করলে ললিত

যৌবনের লীলালাবণ্য তার পরিচর্যা করা উর্বশীর কাজ। এই প্রেমময়ী গন্ধর্বকন্যা কেবল একজনকে তাঁর যৌবনভরা বাহুপাশে বাঁধতে পারেন নি—তিনি জিতেন্দ্রিয় অর্জুন। সে যাক, মহাভারতের খিল পর্বে অর্থাৎ মহাভারতের বহুবিচিত্র গল্পকাহিনী যাতে অর্গলিত হয়েছে, সেই হরিবংশের চব্বিশ অধ্যায়ে পুরূরবা-উর্বশীর গল্প আবার শতপথ ব্রাহ্মণে যেমন, তেমনি ভাবে পাওয়া গেল। হরিবংশের কাহিনীর রচয়িতা ঋগ্বেদের সূত্রটি যে পাঠ করেছিলেন, ভাষা দেখে তা বুঝতে পারা কঠিন নয়।

জায়েহ মনসা ঘোরে বচসি তিষ্ঠ হ।
এবমাদীনি সূক্তানি পরস্পরম ভাষতে॥

বৈদিক কাহিনীর সঙ্গে হরিবংশের পার্থক্য যেটুকু, তা হল পুরূরবা সত্যবাদী এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন বলেই উর্বশী তাঁকে ভালোবেসেছিলেন।

ভাগবতে পুরূরবা-উর্বশী কথায় গোড়ার দিকে সামান্য নতুনত্ব আছে। ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখা যায়, উর্বশী দেবরাজের সভায় পুরূরবার রূপ গুণ বীরত্বের খ্যাতি শুনে মনে মনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তারপর মিত্রাবরুণের অভিশাপে নরলোকে উপনীত হলে তিনি উপযাচিকা হয়ে পুরূরবাকে প্রণয় নিবেদন করেন। রাজা উর্বশীর প্রণয় লাভ করে ধন্য হলেন। পরবর্তী কাহিনী শতপথ ব্রাহ্মণের অনুরূপ। তবে শতপথ ব্রাহ্মণে ছিল উর্বশীকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনবার জন্য গন্ধর্বদের চক্রান্ত। এখানে সে চক্রান্ত করেছেন স্বয়ং ইন্দ্র। উর্বশীহীন নিরানন্দ সভায় অধিকদিন কালযাপন করতে না পেরে গন্ধর্বদের দিয়ে তিনি ঘন অন্ধকার যামিনীতে মেষদুটিকে চুরি করালেন। তারপর শতপথ ব্রাহ্মণের মতোই উর্বশীর ভৎর্সনা, তাড়াতাড়ি বিবস্ত্র অবস্থাতেই মেষের ডাকের কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাজার প্রস্থান, আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ, সেই আলোকে উর্বশীর নগ্ন স্বামীরূপ দর্শন এবং অন্তর্ধান। ব্রাহ্মণের মতো এখানেও উর্বশী বিচ্ছেদকাতর রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন :

সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বরঃ।
বৎস্যত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ॥

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পুরূরবার যে প্রসঙ্গ উল্লিখিত, তাতে বেদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কান্তা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে পুরূরবা কিছুদিন বিরহে পাগল হয়ে রইলেন। নগ্ন রাজা পলাতকা পত্নীর অনুসরণ করে কেবলই তাঁকে আহ্বান করতে থাকেন। হারাণো অতীতের সুখস্মৃতি স্মরণ করে তিনি ভুলে যান কখন দিন যায়, ঘনাইয়া আসে রাত্রির অন্ধকার। বিরহী রাজার পাগল প্রাণের এই অতলস্পর্শ হাহাকার এরপর শোনা যাবে কালিদাসের নাটকে। ভাগবতের কাহিনী এখানেই শেষ হয় নি। আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় সে কাহিনীর উপসংহার। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে পুরূরবা ভোগসুখের ঘৃণ্যতা ও নশ্বরতা বুঝতে পারলেন। মর্ত্যের ক্ষণচঞ্চল যৌবনসৌন্দর্যে বীতরাগ হয়ে আপন আত্মার মধ্যে পরমাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ উপলব্ধি করলেন—জ্ঞানের বিমল আলোকে নৃপশ্রেষ্ঠের মোহান্ধকার বিদূরিত হল।

বেদে ব্রাহ্মণে মহাভারতে ভাগবতে যা ছিল একটি সংক্ষিপ্ত গল্প, তাকে আশ্রয় করে কালিদাস

রচনা করলেন একখানি পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক। সুতরাং পুরাতন কাহিনীর কাঠামোতে নতুন অনেক উপকরণ যোগ করতে হয়েছিল কালিদাসকে। তাঁর বিক্রমোর্বশীয় নাটকের গল্পাংশ সম্পূর্ণ প্রয়োজন নাই। কেবল পরিবর্তনটুকুই আমাদের আলোচ্য। ভাগবতে দেখেছি, পুরূরবাকে না দেখেই উর্বশী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কালিদাসের নাটকে উর্বশী পুরূরবার রূপ গুণ বীরত্বের পরিচয় পেয়েছেন সাক্ষাৎ দর্শনে। কৈলাসে শিবপূজা করে প্রত্যাবর্তনের পথে উর্বশী দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হলে, নারীর করুণ ক্রন্দন শুনে পুরূরবা সেদিকে ছুটে যান এবং তাঁকে উদ্ধার করেন। উর্বশী দস্যু-কবল থেকে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু পুরূরবার শৌর্যবীর্য তাঁর চিত্তকে চঞ্চল করলো। স্বর্গে ইন্দ্রের রাজসভায় ফিরে গিয়েও তিনি রাজাকে ভুলতে পারলেন না। লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নাটক অভিনয় করার সময় বিষ্ণুর নামান্তর পুরুষোত্তম উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি বলে ফেললেন পুরূরবা। আচার্যের অভিশাপে উর্বশীকে স্বর্গ ছাড়তে হল। ভাগবতেও অভিশাপের প্রসঙ্গ ছিল। কিন্তু ভাগবতের কবি উর্বশীর স্বর্গচ্যুতির এমন মনোরম ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। সে যাক, দেবরাজ ইন্দ্র আচার্যের অভিশাপ লঘু করে বললেন, তুমি যার প্রতি অনুরক্ত, সেই রাজা রণে আমাকে সাহায্য করেন, তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য যতদিন তিনি সন্তানের মুখ না দেখেন, ততোদিন তুমি যথেচ্ছ তাঁর পরিচর্যা কর। এরপর পুরূরবা উর্বশীর মিলন ও পরিণয়। পুরূরবার পাটরাণী কাশীরাজকন্যা সে কাহিনীকে জটিল ও বৈচিত্র্যময় করেছে। চতুর্থ অঙ্কে অভিমানিনী উর্বশী ভুল করে কুমার-বনে প্রবেশ করলে সহসা লতায় পরিণত হলেন। উর্বশীকে হারিয়ে রাজা পাগল হয়ে গেলেন। এখানে উদভ্রান্ত রাজার কণ্ঠে অপভ্রংশ ভাষায় যে প্রলাপোক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে বেদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অরণ্যের চেতন অচেতন পশুপাখি বৃক্ষ লতা সকলের কাছে কান্তার সন্ধান জিজ্ঞেস করছেন রাজা :

সুরসুন্দরী জহনভরালঅ পীনুত্তুঙ্গঘণত্থণী,
থিরজোব্বণ তনুসরীরি হংসগই।
গঅণুজ্জলকাণণে মিঅলোঅনি ভমন্তে,
দিট্ঠু পঞি? তহবিরহসমুদ্দন্তরে উত্তরহিমহু।

[ভাই মৃগ! একবার আমার দিকে তাকাও, তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে তাঁহার সংবাদ দিয়া আমাকে অগাধ বিরহ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর, তাহাকে তুমি চিনতে পারিবে. সে সাধারণ রমণীর মতো নয়, সে স্বর্গের অপ্সরা, জঘনভারে মন্থরগমনা, পীনোন্নত পয়োধরা, এখন তাহার যৌবন গলিত হয় নাই. শরীর ক্ষীণ, হংসের মতো অলসগতি, তোমার প্রিয়ার মতোই তাহার চক্ষু, এই গগণশ্যামল কাননে বিচরণ করিতেছিল, হঠাৎ আর দেখিতে পাইলাম না। কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।]

কালিদাস বহুখ্যাত উর্বশী বিদায় দিয়ে নাটকের যবনিকাপাত করেন নি। পুত্রমুখ দর্শন করে উর্বশী যখন প্রস্থান করবেন, প্রেয়সীর শোকে রাজা যখন সংসার পরিত্যাগ করে বনগমনে উদ্যত, তখন বৈজয়ন্তী থেকে সহসা রাজাদেশ নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন দেবর্ষি নারদ, বললেন, "ত্রিকালদর্শিভিরাদিষ্টঃ সুরাসুরবিমর্দ্দো ভাবী, ভবাংশ্চ সংযুগীনঃ সহায়ঃ। তেন ন ত্বয়া শাস্ত্রন্যাসঃ

কর্তব্যঃ। ইয়ঞ্চ উর্ব্বশী যাবদায়ুস্তে ধর্ম্মচারিণী ভবত্বিতি।"

[ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন, দেবাসুরে একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সেইসব যুদ্ধে আপনিই প্রধান সহায় এবং সকলের অগ্রগামী হইয়া থাকেন। অতএব এখন আপনার অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক বনগমন কর্তব্য নয়। এই উর্বশী যাবজ্জীবন আপনার সহধর্মচারিণীরূপে থাকিবে।"—ঐ]

কালিদাস তাঁর সৃষ্টিকল্পনার ঐশ্বর্যে পুরোনো কাহিনীতে অভাবনীয় বৈচিত্র্য ও জটিলতা এনেছেন সত্য, কিন্তু বৈদিক কবিতার বিষাদান্ত পরিণতির করুণ মাধুর্য্য তাঁর নাটকে মিলনান্ত উপসংহারে কিছুটা দীপ্তি হারিয়েছে। বৈদিক উপসংহারে যে আবেদন কালিদাসে নিষ্প্রভ, তা আশ্চর্যরূপে পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতায় :

ফিরিবে না, ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি—
ঝরে অশ্রুরাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে।

পুরূরবা-উর্বশীর প্রচলিত কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ এখানে গ্রহণ করেন নি। তাঁর কাব্যে উর্বশী সর্বসম্পর্কশূন্য বাস্তববিরহিত চিরসুন্দরের প্রতীকরূপে কল্পিত এবং পুরূরবার স্থান নিয়েছে নিখিল মানবচিত্ত। সুন্দরের জন্য মানবহৃদয়ের চিরন্তন কান্নাই উপরের পংক্তিগুলিতে ঝরে পড়েছে। এই দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর উপসংহার বৈদিক কবিতার চেয়ে অধিকতর ব্যঞ্জনাময়। দেবরাজের স্নেহভাজন এই কুসুমযৌবনা গন্ধর্বকন্যাকে মানুষের চিরন্তন কামনার বস্তুরূপে রূপায়িত করতে গিয়ে কবি আপন কল্পনারও চরমোৎকর্ষ দেখিয়েছেন। কিন্তু এই পলায়নপরা সৌন্দর্যপ্রতিমার রূপায়ণে তাঁকে ভারতীয় কবিকুলের কল্পনাঐশ্বর্যেরই মাধুকরী করতে হয়েছে। উর্বশীর উদ্দেশে গোড়াতেই কবি বলেছেন :

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

আলোচ্য পংক্তিটির প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন মোহিতলাল। কিন্তু মহাভারতে অর্জুন উর্বশীকে পুরুজননী বলে সম্বোধন করলে উর্বশী স্বয়ং বলেছেন, "অপ্সরারা নিয়মাধীন নয়। পুরুবংশের পুত্র বা পৌত্র যে কেউ স্বর্গে এলে আমাদের সঙ্গে সহবাস করেন" (রাজশেখর বসু)। ইনি চির অপ্রাপনীয়া। পুরূরবা তাঁকে বলেছেন নিষ্ঠুরা। উর্বশীও স্বয়ং জানিয়েছেন, "ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি। সালাবৃকাণাং হৃদয়ানি এতা" (ঋগ্বেদ)। রবীন্দ্রনাথ বললেন,

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী।

পদ্মপুরাণের বর্ণনানুযায়ী, বিষ্ণুর সুকঠোর তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য উর্বশীর সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও এই ভাবনা উপস্থিত,

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।

উর্বশীকে রবীন্দ্রনাথ অনিন্দিতা, অপূর্বশোভনা, ভুবনমোহিনী, উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করেছেন। উর্বশীর অলৌকিক রূপমাধুরী সম্বন্ধে এমন বিশেষণ সর্বত্রই আছে, তবে কালিদাসে বেশী। চিত্রা কাব্যের এই কবিতার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টি। কিন্তু উর্বশীর স্বভাব ও সৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যেরই উত্তরসাধক॥

প্রবন্ধ আর বিশ শতক

ইন্দ্রজিত রায়

আজকের বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হোচ্ছে সেগুলোর ভেতরে ভাব জগতের নতুনত্বের অভাব বোধ করা যায়।

আমরা আজকের যুগের যে সমস্ত শারদীয় পত্রিকা পাই, সেগুলোর বেশীর ভাগ কাগজ জয় করে আছে চলচ্চিত্রের ছবি আর গল্প নিয়ে আর যে সমস্ত পুরোনো পত্রিকা তার শারদীয় রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আসে সেগুলোর ভেতর যে সমস্ত প্রবন্ধ আমরা পাই তাতে সেগুলোর বিষয়াবলীর নতুনত্ব, বিশেষ নজরে পড়ে না। সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আজকের পাঠকের কাছে, আজকের প্রাবন্ধিকেরা আজকের কোনও বিষয় নিয়ে আজকের রচনাশৈলীতে তা লেখেন না।

বার শতকের লক্ষ্মণ সেন কোন থালায় ভাত খেতেন আর তাঁর প্রাসাদের বিস্তৃতি তা জ্ঞাপন করা, অথবা সেই বার শতকের লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি যে মল্লার রাগে গীতগোবিন্দ গাইতেন সে মল্লার রাগের রূপ কী রকম, সেদিন ছিল সে বিষয়টা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আধুনিক যুগে সেই রকম বিষয়কে প্রাধান্য দিলে পাণ্ডিত্য দেখানো চলে কিন্তু পাঠক মেলে না।

একটা জিনিস গভীর ভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে আজকের যুগে যে সমস্ত পুরোনো পণ্ডিত প্রাবন্ধিক আছেন যাঁদের চাহিদা রয়েছে কিন্তু তাঁরা পাঠক পান না এর একটা প্রধান কারণ হল যে তাঁদের ভাবার সঙ্গে এ যুগের পাঠকের মনের মিল খুব ক্ষীণ এবং যদিবা ভাষাকে বুঝল পাঠক, তো প্রাবন্ধিক এমন বিষয় প্রবন্ধ লিখবেন যে বিষয় বুঝতে গেলে পাঠকের দরকার তার আগে বেশ কিছু পুরোনো বই পড়ে নেওয়া এবং সে সমস্ত বই বাজারে নেই এমন কি হাজারেও একটি আছে কিনা সন্দেহ।

তাতেও কোন ক্ষতি ছিলো না, যদি প্রাবন্ধিকেরা একটু ভাষাসচেতন হতেন। নামের পেছনে বড় উপাধিটুকু পড়ে যে সমস্ত পাঠক তাঁদের বই পড়বেন সে সব পাঠকের সংখ্যা কমছে এবং কমবে কারণ আমরা আত্মচেতনা সম্পন্ন প্রাবন্ধিক মাত্র পাঠক চেতন প্রাবন্ধিক নই।

আজকের যুগে যে সমস্ত গতযুগের প্রাবন্ধিকেরা লেখেন তাঁদের দরজায় এককালে সম্পাদকদের দৌড়াতে হোতো কয়লাইন লিখে দেবার জন্যে। পরের যুগে সম্পাদকের বদলে যেতে লাগলো সম্পাদকের অনুরোধপূর্ণ চিঠি। এই তাগিদের গতিবেগ ক্ষীণতর হতে দেখেও তারা প্রবন্ধের বিষয় ও ভাষা বদলালেন না হয়তো এ প্রশ্নটা তাদের মনে হয় নি তার পরের যুগটা আরও লক্ষণীয় যখন দেখলাম প্রাবন্ধিকরা ছুটতে লাগলেন সম্পাদকেরই দরজায় নিজেদের প্রবন্ধ নিয়ে সময় মতো। কিন্তু সেখানে সম্পাদকের ইচ্ছার প্রভুত্বই বেশী কারণ দারস্থ প্রাবন্ধিকেরা তাঁদের লেখার ভাষা ও বিষয়ের বিন্দুমাত্র চেহারা পাল্টে দেন নি। আসল কথা সেকালের প্রাবন্ধিক যারা আজকের যুগের

কাগজে সেকালের ছন্দে লেখেন, সে লেখায় বেশীর ভাগ জায়গাতেই তাঁরা তাঁদের লেখার ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেন যে আজকের যুগের পাঠকের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটা বিশেষ রকম দূরের হয়ে পড়েছে।

আজকের যুগে যেসমস্ত প্রাবন্ধিক তৈরী হচ্ছেন তারা অনেকেই মনে করেন যে প্রবন্ধ মানে সেকালের বিষয় কিছু লেখা। কিন্তু আজকের যুগের সমস্যা নিয়েও যে আজকের যুগোপযোগী লেখা যেতে পারে এটা অনেকের ধারণাতেই নেই।

আজকের যুগের উপন্যাসে আছে আজকের সাধ, আজকের যুগের ছোট গল্পেও আছে আধুনিক গল্প। আজকের নাটকেও আছে আজকের সমাজকেন্দ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। আধুনিক শিল্প তার আধুনিক দেহে পরেছে আধুনিক সাজ। আধুনিক গানেও আছে আজকের মনে ভাললাগার সুর। যেখানে বিষয়ের নতুনত্ব নেই সেখানে দেখি পুরোনো বিষয়কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন ভাষায় পরিবেশন করার প্রচেষ্টা। এই আজকের যুগে যদি দেখি যে প্রাবন্ধিকের কলমে কালি জুটছে না, তো সে বিষয় নিন্দে না করে আমাদের দেখা উচিত, যে এই শোচনীয় সমাধির হাত থেকে যদি প্রবন্ধকে বাঁচাতে হয় তো আজকের যুগের পাঠকদের বলে দেওয়া উচিত, যে কেমন লেখা বেশীর ভাগ লোকে চান যার ভেতর দিয়ে তারা আজকের ফ্ল্যাট বাড়ি সমাজের প্রবন্ধও পাবেন আবার আধুনিক ভাষার সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে বহু বিগত শতাব্দীর যাদুঘরে গিয়ে উঠবেন। এ বিষয় মত প্রকাশ করা পাঠকের পক্ষে অতটা সহজ নয় আর সহজ হলেও তার সুযোগ বেশী রকম কম সুতরাং সে করা অনেকটা সহজ কিন্তু সম্পাদক মষ্টার মশাইয়ের মতো উপদেশ দিলে অনেক প্রাবন্ধিকের সেটা অপমান বোধ হতে পারে। 'লেখা ছাপান আর না ছাপান মশাই উপদেশ দেবেন না, ভারি একখানা কাগজের সম্পাদক হয়ে যদি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন তো তাতে আপনার আত্মতৃপ্তি হতে পারে কিন্তু তাই বলে ধরাটা সরা হয়ে যায় না।' সত্যি কথা প্রাবন্ধিকরা তো আর জ্ঞান সব ক্ষেত্রে বিক্রি করাতে বসেন নি, বসেছেন বিতরণ করতে। সেখানে অনেক নির্লোভী প্রাবন্ধিক যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী তারা সে রকম কথা বলতে পারেন বৈকি!

কিন্তু তাঁদের কাছে আজকের যুগের একটা দাবী আছে যে জ্ঞান বিতরণ করা আর জ্ঞান বিতরণ করানোর ভেতরে একটা বড় রকমের তফাৎ আছে সে কথা কে অস্বীকার করা যায় না। পুরোনো কথার বাধন বা গতযুগের প্রকাশ ভঙ্গীর বৈশিষ্ট যদি আজকের পাঠকের কাছে অপরিচিত থাকে, তো, ভাষার দুর্ভেদ্য পাঁচিলটাকে বাদ দিয়ে আজকের ভাষায় যদি তাঁরা সেই পুরানো বিষয়গুলোকে বিতরণ করেন তো, তাতে তাঁদের জ্ঞানের বিন্দুমাত্র অপমান হবে না একথা বলা চলে। জানি সব পণ্ডিত প্রবরদের পক্ষে সেটা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ যে যুগে তাঁরা জন্মেছেন সে যুগের ভাষাকে বাদ দিয়ে তাঁদের চিন্তা ধারাকে আজকের ভাষায় প্রকাশ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু তা না হলে প্রবন্ধ লেখকরা যে সুধু প্রবন্ধবাদী হিসেবেই পরিচিত হবেন, তাঁদের প্রবন্ধ পরিচিত হবে না প্রবন্ধ সাহিত্য হিসেবে।

দ্বিতীয় কথা, প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সুধু হাজার হাজার বিগত বছর বা শত শত শতক কেন্দ্রিক হোয়ে বর্তমান শতককে যদি আলোচনার বিষয় বলে মনে না করা যায় তো সে চিন্তাটা ঠিক নয় বলে

মনে হয়। কারণ চলমান জগত থেকে যদি আমরা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু গুলোকে বেছে নিই তা হ'লে প্রবন্ধের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে আমরা বর্তমান সমাজকে বুঝতে পারব।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বোলতে যে আমরা প্রাচীন সমাজকেই ধোরে নিয়েছি যেখানে বর্তমান ঠিক সম পর্যায় ওঠেনি সে কথা ঠিক নয় বলে মনে হয়, কারণ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বোলতে গতযুগের সমাজকেই বোঝায় না, প্রাবন্ধিকরা প্রতিবাদ করে বলতে পারেন হয়তো যে প্রবন্ধের প্রাণ ধর্ম হল গত যুগের ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে বর্তমান যুগকে দেখানো অর্থাৎ প্রবন্ধ বলবে অতীতের কথা অতীতের ভবিষ্যতকে। অতীত কালের কথা এবং বর্তমান যেদিন ঠিক অতীতের দেহ ধারণ করবে সেই কালের ঘটনা গুলোকে বিশ্লেষণ করাই প্রবন্ধের কাজ। আজকের ঘটনাকে আজকে লেখার কাজ হল দৈনিক পত্রের। একথা অস্বীকার করার যদিও একদিক থেকে উপায় নেই তবু যদি আংশিক ভাবেও মানি তো বলতে হয় যে তার জন্যে বর্তমানের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা না করে দেখা যাক একশো বছরের একটা বিশ্লেষণী খসড়া প্রবন্ধ বলে চালানো যায় কিনা, আর অতীতের ইতিহাসের যাঁরা একান্ত উপাসক তাদের জন্যে প্রকাশিত হোক অতীতকাল আধুনিক ভাষায়।

আজকের পাঠক এবং লেখকরা এসে পড়েছেন, এমন একটা যুগে যে যুগকে বলা হয় 'যুগসন্ধি' অবশ্য যুগসন্ধি কথাটা বিশেষ কোনও যুগের ওপর আরোপ করা চলে না কারণ কাল চলে চিরকাল ধরে এবং সেই চিরকাল তার পথ চলার ছন্দে প্রতিদিন গ্রহণ করে নতুন নতুন রূপ, বিশেষ এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই চলমান যুগের নিত্য বিবর্তনকে আমরা দেখতে পাই কিন্তু সংখ্যা গণনার যে স্থূল দৃষ্টি কোণ আছে সেখানে বিবর্তন ধরা পড়ে পরিবর্তনের রূপে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শতকের বিশেষত্বও নাই সেখানে দৃশ্যমান।

সেই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকের প্রবন্ধগুলো ঠিক আজকের লেখকের জন্যে প্রকাশিত হচ্ছে না।

বিশ শতকের প্রবন্ধ আজ নতুন প্রাণে নতুন রূপে দেখা দিক সে রূপকে বরণ করবে আজকের পাঠকের নয়ন প্রদীপ আর বসাবে তাকে আজকের মনের আসনের ওপরে।

পুঁথি সংগ্রহের শতবার্ষিকী

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৮৬৮ সালে ভারতবর্ষে পুঁথি সংগ্রহ শুরু হয়েছিল স্বীকৃত ভাবে। পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুসূদনের অনেক পুঁথি ছিল। তাঁর পুত্র রাধাকিষেণ তৎকালীন ভারতবর্ষের গর্ভনর জেনারেল লর্ড লরেন্সের বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ সালে লরেন্সকে ভারতের সর্বত্র পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অনুরোধ করে একটি চিঠি লেখেন। লরেন্স এই চিঠির কপি প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকারকে পাঠিয়ে দেন। কেন্দ্রীয় সরকার বছরের চব্বিশ হাজার টাকা এ বাবদ বরাদ্দ করতে সম্মত হন। বাংলায় এর মধ্যে বরাদ্দ হয় ৩২০০ টাকা। এশিয়াটিক সোসাইটির তরফ থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই টাকা নিয়ে পুঁথি সংগ্রহ শুরু করেন। ওরিয়েণ্টাল ল্যাংগুয়েজ-ষ্টাডির জন্য তখন কেবল সংস্কৃত পুঁথিরই সন্ধান করা হত। দীনেশচন্দ্র সেন লিখছেন 'সংস্কৃত পুঁথিরই লোক সন্ধান করিত বাঙ্গালা পুঁথির কোন খোঁজ কেহ লইত না।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বলছেন যে কেবল সংস্কৃত পুঁথি বড়জোর দু একটা প্রাকৃত ভাষার পুঁথির সন্ধান চলত 'কথিত ভাষায় পুঁথি সংগ্রহের জন্য বড় একটা চেষ্টা হয় নাই।'

'এখন দেখা যাউক বাঙ্গালা পুঁথি খোঁজার জন্য বাঙালী কি করিয়াছে।' ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারী হরপ্রসাদ বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হলেন। ১৮৯১ সালে কম্বুলিটোলা লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসবে ভাষণ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ কয়েকটি মুদ্রিত পুঁথি নির্ভর করে দেড়শজন কবির জীবনীও কাব্য আলোচনা করলেন। এর আগে সকলেরই ধারণা ছিল বিদ্যাসাগরই বাংলা ভাষার স্রষ্টা। বহু সমালোচক হরপ্রসাদের এই নতুন জাতের প্রবন্ধকে প্রশংসা করলেন। 'এই সকল সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া আমি ভাবিলাম, যদি ছাপা পুঁথির উপর প্রবন্ধেই এত নূতন খবর পাওয়া গেল; হাতে লেখা পুঁথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কত কি নূতন খবর দিতে পারিব। সুতরাং বাঙ্গালা পুঁথি খোঁজার জন্য উৎকট আগ্রহ জন্মিল।'

এদিকে কুমিল্লা স্কুলের হেডমাষ্টারের কথাও কিছু বলা দরকার। দীনেশচন্দ্র সেন চিরদিনই পুরনো বাংলা ঐতিহ্য রক্তের মধ্যে অনুভব করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সমালোচনায় একটি প্রধান লক্ষণ রচয়িতার 'খাঁটি বাঙালীয়ানা'। এই খাঁটিত্ব যে কি তা নাকি গুপ্ত রসিকেরাই জানেন, প্রথমনাথ বিশী ব্যঙ্গ করেছেন—কিন্তু সেদিন এটাই ছিল অরডার অব দি ডে। এই সুগভীর ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো অতিরিক্ত দেশপ্রেমের বন্যায় খাঁটি বাঙালীয়ানার বিকৃত অনুসন্ধানও হয়েছিল। 'আমাদের সর্ববিষয়ে প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তৎসঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচয় স্থাপন করা উচিত তাহা হইলেই আমরা বর্তমানের উপযোগী সমাজ গঠনের ভিত্তিভূমি পাইব, সেই পরিচয় সাধনের চেষ্টা কি সাহিত্য কি সমাজ সকল দিক দিয়াই প্রত্যেক স্বদেশভক্তের প্রযত্নের বিষয় হওয়া উচিত।'

এরই ফলে দীনেশচন্দ্র সেন বাংলাদেশের অতীতকে তাঁর সাধনার বস্তু করে নিলেন। 'ইংরেজী সাহিত্যের একখানি ইতিহাস ভারতীয় আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে

শুরু করিব—এই সংকল্প করিতেছিলাম। এমন সময় কলিকাতার পীস এসোশিয়েসনের নোটিশ পড়িলাম, বঙ্গভাষাও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণামূলক সর্বোত্তম প্রবন্ধের পুরস্কার একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। আমি বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া এতদিন ঘাটাঘাটি করিতেছিলাম, সুতরাং এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইলাম। এই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।' ঠিক এরই সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের আরেকটি সুদীর্ঘ উক্তি উদ্ধৃত করি 'এই প্রবন্ধ (বঙ্গভাগ ও সাহিত্য) রচনার সময় রতিদেবকৃত মৃগলুব্ধের একখানি প্রাচীন পুঁথি দৈবক্রমে আমার হস্তগত হয় এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত এই যে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি আছে। এই সংবাদ পাইয়া নিজে নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া সঞ্জয়কৃত মহাভারত গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব, রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত্র, রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের মহাভারতোক্ত উপাখ্যান প্রভৃতি বিবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করি।' অর্থাৎ দীনেশচন্দ্র পুঁথি সংগ্রহের কাজ শুরু করেন ১৮৯০ সালে তার 'বঙ্গভাষাও সাহিত্য' প্রবন্ধ রচনা করার সময়। এবং কিছু কিছু পুঁথিও পেয়ে যান। অন্য দিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯১ সালে কম্বুলিটোলার লাইব্রেরী বাৎসরিক অধিবেশনে ছাপা পুঁথি নির্ভর ভাষণ দেন। সেই ভাষণের প্রশংসা সমালোচকের কাছে পেয়ে তিনি বাঙ্গলা পুঁথি সংগ্রহে আগ্রহান্বিত হন। এই জন্যই বোধ হয় দীনেশচন্দ্র সেন অন্যত্র লিখেছেন 'আমি তখন সর্বপ্রথম বাঙ্গলা পুঁথি সংগ্রহকার্য্য অনুরাগী হইয়াছিলাম।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এ ধরণের কোন উক্তি বা লিখিত মন্তব্য পাইনি। শাস্ত্রীমহাশয় তখন সোসাইটির কথা মত সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান করে চলেছেন কিন্তু বাঙ্গালা পুঁথি যে পল্লীতে পল্লীতে তুলটকাগজের খনি খুঁজিলে পাওয়া যায় একথা তখনও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। তখন এই কাজে আমরা (দীনেশ সেন) প্রকৃতির সমস্ত ঝোঁকের সঙ্গে লাগিয়া গেলাম।' দীনেশ সেনের এই ঝোঁকটি বলা বাহুল্য বিশেষণ সাপেক্ষ। তিনি একবার রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন 'পুরাতন জিনিষের প্রতি আমার একটা ঝোঁক আছে, সে ঝোঁকটা বোধ হয় রোগে পরিণত হইয়াছে।' অন্যত্র তিনি লিখেছেন 'বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যে রকম রত্ন মাণিক্য লুক্কায়িত আছে এই বঙ্গভূমির লুপ্ত রত্নের খোঁজে আমার মন উতলা হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইত।' দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর পুঁথি সংগ্রহের ব্যক্তিগত চেষ্টায় দুর্বল হয়ে তখন সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির খ্যাতনামা মেম্বার ডাক্তার হরনলিকে চিঠি লেখেন। 'তিনি (হরনলি) প্রত্যুত্তরে আমাকে বিশেষ ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য অঙ্গীকার করেন; এই সূত্রে মহামোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পত্রদ্বারা পরিচয় হয়।' হরপ্রসাদও লিখেছেন 'শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সোসাইটি তাঁহার চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে পূর্ববাংলায় পুঁথি খোঁজার সুবিধা হইবে বলিয়া আমি আমার ট্রাবেলিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে একবৎসরের জন্য দীনেশবাবুর কাছে রাখিয়া দিই এবং দীনেশবাবুর কথামত বাঙ্গলা পুঁথি খরিদ করিতে বলি। আরও বলিয়া দিই যে দীনেশবাবু উহা যতদিন ইচ্ছা রাখিতে পারেন। দীনেশবাবুর সাহায্যে পরাগলীর মহাভারত ছুটিখাঁর অশ্বমেধপর্ব প্রভৃতি অনেকগুলি

গ্রন্থ খরিদ হয়।' কিন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যগ্রন্থ রচনার পর সোসাইটির অর্থ সাহায্য সম্ভবত ম্লান হয়ে যায়। দরিদ্র হেডমাষ্টারের পক্ষে প্রচুর পয়সার বিনিময়ে পুঁথি সংগ্রহও শক্ত হয়ে ওঠে। এতদিন পুঁথির অবহেলা ছিল বটে কিন্তু অনেক ধনীনন্দন তখন 'কিউরিও' সংগ্রহের নেশাবিলাসে প্রাচীন পুঁথির বাজার দর চড়িয়ে ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু ব্যক্তিগত জীবনে ধনী ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে পুঁথি সংগ্রহ সম্ভব হল। আজকের কলকাতাতেও rare বই দিয়ে যারা আলমারী সাজান তাঁরা বইয়ের দোকানে বেশী দাম দিয়ে বই কেনার বদভ্যাস সৃষ্টি করে গবেষকদের যন্ত্রণার কারণ হয়েছেন। বাধ্য হয়ে দীনেশচন্দ্রকে নগেন্দ্রনাথের কাছে তার পুঁথি সহ গ্রাহক ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল। প্রসঙ্গটি আমরা পরে আলোচনা করছি। এই প্রসঙ্গে পুঁথি অনুসন্ধানের কাজ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। বলেছেনও অবশ্য হরপ্রসাদশাস্ত্রী এবং দীনেশচন্দ্র সেন দুজনেই। প্রাথমিকভাবে এক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও চূড়ান্ত কথা হল বুদ্ধিবাহী দৈহিক পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান স্পৃহা। সোসাইটির কপালে অবশ্য অর্থাভাব ছিল না যারফলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেও টাকার জন্য ভাবতে হয়নি। কিন্তু দরিদ্র শিক্ষক দীনেশচন্দ্র না ভেবে পারেন নি। তবু অর্থ ছাড়াও কতকগুলো দিক ছিল। টুলো পণ্ডিতের দিন তখন অস্তগত। সংস্কৃত ভাষা উদ্বাস্তু। বঙ্গ ও পারস্য ভাষা তখন চলতি সবার উপরে মাথার মণি দিল রাজভাষা ইংরেজী। এর ফলে বাস্তবজ্ঞান বর্জিত দারিদ্র্যাভিমানী ভট্টাচার্যদের দুরবস্থা যে কি মর্মান্তিক হয়েছিল রাজনারায়ণ বসু সেকাল ও একালে তা লিখেছেন। আর্থিকদৈন্যের নিষ্ঠুরতাতেও তাঁদের ন্যায় শাস্ত্রের তর্কবিতর্কও কচকচি থামে নি। শুধু রাশি রাশি মিল জড়ো করলে যে মাথার উপর বাড়ী পড়ো পড়ো হয় অথবা হ্রস্ব দীর্ঘ ছন্দ গাঁথলেও যে হস্তী অশ্ব জোটে না এ বোধটা ছিল পণ্ডিতদের গৃহিনীদের। চন্দ্রশেখর জাতের স্বামীদের মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ তাঁদের চোখে হয়ে দাঁড়িয়েছে কুৎসিত দুর্ভাগা পুঁথিগুলোই। তাই সেগুলো আবর্জনার মত ধ্বংস করতে বেদনাবোধ করেননি তাঁরা। প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর পরিহাস এ দেশের আর্দ্র আবহাওয়াতে প্রকৃতি ঠাকুরাণীও পুঁথির বিরোধী। 'ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুঁথি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন পৈতৃক পুঁথিগুলিকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় দেখিতেন, সর্বদা সেগুলিকে ঝাড়াঝুড়া করিতেন, পুরু কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। ভাদ্রমাসে পুরা রৌদ্র পাইয়া তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না—সেই দিন পুঁথিগুলি রৌদ্রে দিতেন। সমস্তদিন নিজে পাহারা দিতেন। পাছে জল হইলে পুঁথিগুলি ভিজিয়া যায়। সন্ধ্যার পূর্বে সেইগুলিকে পেতেনে সাজাইয়া রাখিয়া তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহার ছেলে ইংরাজী স্কুলে পড়িতে গেল, ক্রমে চাকরী করিতে গেল, পুঁথি পাজির কোন ধার ধারিল না। পৌত্রবধূ বাড়ি আসিয়া দেখিলেন, একজায়গায় কত আবর্জনা রহিয়াছে ছেঁড়া ময়লা কাল ন্যাকড়ায় জড়ান কতকগুলো কাগজ রহিয়াছে, তিনি সেইগুলিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। হয়ত রাঁধিবার সময় কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে সেই ধোঁয়ায় চোখ জ্বলিতে লাগিল, তখন পুঁথি অথবা তাহার পাটার কথা মনে পড়িল; সুবিধা পাইলেন ত একখানা পুঁথি উনানে দিয়া ফেলিলেন অথবা পুঁথির পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া বহুকালের শুষ্ক কাঠের পাটা দুখানি উনানে দিয়া সেদিনকার রান্না সারিয়া লইলেন। ১৯০৪ সালে একবার নবদ্বীপ গিয়াছিলাম; দেখিলাম, একজনের বাড়ীর পিছনে রাস্তার ধারে রাশীকৃত পুঁথির পাতা পড়িতেছে,

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে পাটাগুলি পোড়ান হইয়াছে। বাড়ীর গিন্নী মা সরস্বতীকে পোড়াতে চান না, তাই পুথিগুলি বাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন। যে বাড়ীর গিন্নীর মা সরস্বতীর উপর অতটুকু কৃপা নাই, তাঁহারা পুথির পাতা লইয়া কি করেন অনায়াসে বুঝা যায়।' দীনেশ সেনও লিখছেন 'মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় হইতে সুদূরে দরিদ্র্যের পর্ণকুটীরে যেসব প্রাচীন পুথি কীটগণের করাল দ্রংষ্ট্রাবিদ্ধ হইয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় কি! প্রত্যেকবৎসর কীট অগ্নি ও শিশুগণ কর্তৃক উহারা নষ্ট হইতেছে।' যাইহোক হরপ্রসাদের ট্রাবেলিং পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও দীনেশচন্দ্র সেন দুজনে কিনে তখন পুথি সংগ্রহ সুরু করেন। 'প্রাচীন বাঙ্গলার পুথির অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘরে রক্ষিত; আমাদের সাগ্রহ যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল অনেক সময়েই তাহাদের কুসংস্কারের দৃঢ় ভিত্তি বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহারা কোনক্রমেই পুস্তক দেখাইতে সম্মত হয় নাই; দৈবাৎ পুস্তক ধরা পড়িলে কেহ কেহ ট্যাক্সের ভয়ে অভিভূত নিতান্ত হইয়া পড়িয়াছে।'

যুক্তি বুদ্ধি তর্ক যেখানে ব্যর্থ সেগানে দুটি আদি ও আদিম বস্তু কাজ করে। অর্থ ও তরলতা। অর্থের প্রলোভন ও মনোমোহিনী বটতলার বই। তাঁহার (নগেনবাবুর) পুথি সংগ্রহ অন্যরূপ, তিনি ঘরে বসিয়া পুথি কিনিতেন। যাঁহারা পাড়াগাঁয়ে বটতলার বহি দেখিতে যায়, তারা বইয়ের স্থলে পুঁথি লইয়া আসিত নগেনবাবু তাহাদের নিকট পুথি কিনিতেন।—'লিখছেন হরপ্রসাদ।

'বঙ্গদেশের ধনিগণ ইহার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন, অর্থব্যয় করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।' নগেন্দ্রনাথ লিখিলেন, দীনেশচন্দ্রের পুথি কিনবার প্রয়োজনীয় অর্থ সম্ভবত সোসাইটির ক্ষীণ ভাণ্ডার দিতে পারত না। ধনী নগেন্দ্রনাথবাবু সেই সুযোগও নিয়েছিলেন—'বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের নিবাসী রামকুমার দত্ত নামক এক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে ভৃত্য নিযুক্ত হয়। আমার অভিপ্রায়নুসারে এই ব্যক্তি বাঁকুড়া জেলা হইতে কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনে। এই ব্যক্তি পুস্তক সংগ্রহ কার্য্যে বিশেষরূপ দক্ষ দেখিয়া আমি ইহাকে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথবসু মহাশয়ের অধীনে পুথি সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিই। আমার যে অবস্থা তাহাতে এই সকল পুঁথি কিনিবার শক্তি আমার নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।' নগেন্দ্রনাথবাবু তখন বটতলার ফেরীওয়ালাদের কাছ থেকেও নগদে অনেক পুঁথি কিনছেন। রামকুমারের দ্বারা নগেনদ্রবাবু প্রায় পাঁচশো পুঁথি কেনেন। 'প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার কল্পে নগেন্দ্রবাবু যেরূপমুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াছেন তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।' দীনেশচন্দ্রের মতে নগেনবাবুর সংগ্রহে প্রায় একহাজার পুঁথি ছিল। নগেন্দ্রবাবুর অবর্তমানে এই অমূল্য ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে দীনেশসেন খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। এর আগে রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যক্তিগত সংগ্রহ তার মৃত্যুর পর নষ্ট হয়ে যায়। দীনেশ সেন তাই বলেছিলেন—বাঙ্গলা ভাষার এই দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন নিদর্শনগুলি গভর্নমেন্টের লাইব্রেরী কিংবা কোন অর্থশালী সাধারণ পাঠাগারে সুরক্ষিত থাকা উচিত।

প্রসঙ্গত বলা দরকার নগেন্দ্রনাথবসুর ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রায় এক হাজার পুথি ছিল। তারই অর্দ্ধেক রামকুমার গ্রামে গ্রামে ঘুরে কিনেছিলেন। বাকি পাঁচশো নগেন্দ্রনাথ কিনেছিলেন বটতলার ফেরীওয়ালার কাছ থেকে। তাই ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন 'বটতলার বই-ফেরীওয়ালারা আর

এক মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছে নিজেদের অজ্ঞাতসারে। বাংলা পুথির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভাণ্ডার, যাহা এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি, তাহা ইহাদেরই তিল সঞ্চিত বল্মীক শৈল। এই সংগ্রহ করিয়াছিলেন বিশ্বকোষ সংকলয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু। বটতলার হকাররা পাড়াগাঁয়ে বই বেচিতে গিয়া অনেকসময় নগদ মূল্য না লইয়া ছাপা বইয়ের বদলে পুরানো পুথি লইয়া আসিত। ইহাদের নিকট এইসব পুথি কিনিয়া লইতেন নগেন্দ্রনাথ। এমনি করিয়াই বাঙালীর সংস্কৃতির এই ভাণ্ডারটি উপচিত হইয়াছে।' পুথি সংগ্রহেই কাজ শেষ হয় না। সংগ্রহের পর দরকার সংরক্ষণ। এবং সবশেষে সর্বধাকি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পুথির পাঠোদ্ধার পুথি সাহিত্যের অতীত দর্পণ।

'যিনি প্রাচীন সাহিত্যের পাঠ নির্ণয় করবেন তাঁর সন্ধান লক্ষ্য হবে পুথি, যিনি মুদ্রণোত্তর যুগের সাহিত্যের চর্চায় নিযুক্ত, তিনি অন্বেষণ করবেন মুদ্রিত পুস্তক। দুই অন্বেষণের এক ধরন নয়, দুই সন্ধানে লক্ষ্যে প্রণালীতে কিছু তারতম্য আছে কিন্তু দুরকমের সন্ধানেরই প্রথম কথা সাহিত্যবস্তু-গুলো সংগ্রহ করতে হবে। এই সংগ্রহ কাজ অবশ্য, শুদ্ধ বিচারে সাহিত্যিক নয় কেন না এ কাজ দালাল ও চর লাগিয়ে সম্পন্ন হতে পারে, হয়ও। দীনেশচন্দ্র সেন ও প্রাচ্য বিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বসু লোকমারফৎ অনেক পুথি সংগ্রহ করেছিলেন।'

পূর্ব বর্ণিতভাবে পুথি সংগ্রহ হলেই কাজ শেষ হয় না। এরপর সেই পুথিগুলো মুদ্রণ করতে হবে। বাংলা দেশে পুথি সংগ্রহ এখনও ম্লান। বাংলা সাহিত্যের পুথি সন্ধান এখনো গোড়ায় পর্য্যায়ে চলেছে বলে মনে হয়। অথচ এই সঞ্চিত পুথিগুলোও সব এখনও মুদ্রিত হয় নি। সাহিত্য পরিষদে এ রকম অনেক অমুদ্রিত পুথি ক্রমশ কালের হাতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য পুথি মুদ্রণ সহজ কাজ নয়। মনে করুন এক কৃত্তিবাসের রামায়ণেরই একাধিক পাঠ-পুথি পাওয়া গেল। কথায় বলে সাত নকলে আসল খাস্তা। যখনই যিনি নকল করেছেন তখনই নিজে কিছু কাব্য কণ্ডুয়ন করেছেন—এটা সেযুগের রেওয়াজ ছিল।

এখন এই বিচিত্র পাঠান্তর সমন্বিত পুথিটি মুদ্রণে অভিজ্ঞ জ্ঞানীর প্রয়োজন। এসম্বন্ধে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলেছেন 'এযুগে আবার যখন এই সকল বই (প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ) মুদ্রিত হয় তখন প্রকাশকেরা পণ্ডিত ব্যক্তির হাত দিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া লন। যেখানে পাঠান্তর আছে সেখানে সম্পাদক যে পাঠ তাঁহার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় সেইটিই গ্রহণ করেন।'

এই বিচিত্র সম্পাদনার তিনটি বিকৃতি (১) সম্পাদকের কাব্য কণ্ডুয়ন, যথা দীনেশ সেনের বটতলার রামায়ণ (২) সম্পাদকের রুচি কাঠিন্য, যথা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা। রুচির নামে সম্পাদনা ১৮১৮ সালে Thomas Bowdlerকে family সেক্সপীয়র প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। (৩) সম্পাদকের ভেজাল—এখানে কারও নাম করা অস্বস্তিকর কিন্তু বাংলা দেশে ভেজাল পুথি সাধারণত সম্পাদকেরাই বাজারে চালু করেন। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণও অস্বস্তিজনক। তবে গোবিন্দদাসের কড়চার পুথির নাম নিয়ে যা চালিয়েছিলেন দীনেশ সেন তা বিতর্কমূলক বলেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃত্তিবাসের আত্মকথারও যে পুথি হারাধন দত্ত পেয়েছিলেন তাও ভেজাল মনে হয়। বিভিন্ন পাঠান্তরের ফলাফল বিচার প্রসঙ্গে কৌতুহলী

পাঠকরা অমলেন্দু বসুর কাব্যে পাঠান্তর প্রবন্ধটি পড়তে পারেন। দীনেশচন্দ্র সেনের নাম জড়িয়ে যেসব ভেজাল বাংলা পুথি কথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চলতি সেগুলোর কথা এখানে আর পুনরুল্লেখ করলাম না।

'পুথি খোঁজার কথা বলিতে বলিতে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি।' বাঙ্গলা পুথি খোঁজার রজত জয়ন্তী বছরে হরপ্রসাদ তাঁর ভাষণে এ কথা বলেছিলেন। তবু তিনি সেই সঙ্গেই লিখেছেন 'পুথি কিন্তু ভাল করিয়া খোঁজা হয় নাই। কতদিকে কত দেশে কত রকম পুথি যে পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। নিউটন বলিয়াছেন—আমরা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াইতেছি মাত্র। আমরা এই পুথি সমুদ্রে ততটুকুও করিতে পারি নাই।

আপনাকে জানিতে হইলে দেশেরপুথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায়মনচিত্ত লাগাইয়া পুথি খুঁজিতে হইবে ও পড়িতে হইবে।'

পুথি সংগ্রহের শতবার্ষিকী বছরেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এতথ্য বিন্দুমাত্র ম্লান হয়ে যায় নি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির ভাষণ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম তিনটি সংস্করণের ভূমিকাসহ)— দীনেশচন্দ্র সেন। বটতলার বেসাতি— ডঃ সুকুমার সেন। পাণ্ডুলিপির রোমান্স—বিনয় ঘোষ। কাব্যে পাঠান্তর—অমলেন্দু বসু। নগেন্দ্রনাথ বসু। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

রোহিণী (পৃঃ উঃ ১৩)।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কেন্দ্রীয়, তথা নায়িকাচরিত্র রোহিণী। রোহিণীই রাহুর মত এসে গোবিন্দলাল ভ্রমরের জীবনের সমস্ত সুখ গ্রাস করেছে। রোহিণীই কৃষ্ণকান্তের উইল চুরি করতে গিয়ে কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি করেছে, বা কাহিনীর সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

রোহিণী বিধবা। এইটাই তার অপরাধ। তার রূপ, তার যৌবন সমস্তই বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায় ব্রহ্মানন্দের রন্ধনশালায়। রোহিণীর তাই সুখ-শান্তির সংসার ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক।

রোহিণীকে প্রথম লোভ দেখায় হরলাল। অর্থের লোভে সে ভোলেনি, হরলালের বিধবাবিবাহের প্রতিজ্ঞা রোহিণীকে আশান্বিত করে তুলেছিল। রোহিণীর উইলচুরিও সেই আশার বলে। কিন্তু সেই আশায় আঘাত হেনে হরলাল রোহিণীর সুপ্ত বহ্নিজ্বালাকে তীব্রতর করেছে।

রোহিণীর যৌবন সর্বদাই প্রস্ফুটিত ফুলের মত, ভ্রমরের আশায় উন্মুখ। বারুণী পুষ্করিণীতে তাই সুপুরুষ গোবিন্দালকে দেখে তার মনে রূপোন্মাদনা জাগাই স্বাভাবিক। যেহেতু রোহিণী নারী তাই ভালবাসার পাত্রের মঙ্গলকামনাও মনের মধ্যে জেগে ওঠে। জাল উইল বদ্‌লাতে যাওয়ার পিছনে গোবিন্দলালের প্রতি প্রেমেরই এক রূপ লক্ষ্য করি। কিন্তু এই সময় রোহিণী ধরা পড়ায়, ঘটনার গতি দ্রুত মোড় নিয়েছে। গোবিন্দলালের পরোপকারী মনে, নিজের প্রেমের জাল বিস্তার করার বহু চেষ্টাকরেছে রোহিণী।

রোহিণী ছলনাময়ী নারী। কিন্তু সেই ছলনার জন্য তাকে নীচবৃত্তির স্ত্রীলোকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিড়ম্বিত জীবনের অভিশাপ, স্বাভাবিক সুখভোগের প্রতি সমাজের বিধিনিষেধ, রোহিণীকে ছল-চাতুরীর সাহায্য নিতে বাধ্য করেছে।

তবে রোহিণীর প্রেম, যথার্থ প্রেম হিসাবে কতখানি গ্রাহ্য হতে পারে, সে বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। পুষ্করিণীতে রোহিণী যখন ডুবে মরতে গিয়েছিল, তখনো তার প্রেমে সন্দেহ করবার অবকাশ জাগে নি। কিন্তু গ্রামের লোকের কুৎসা রটনায় যখন সে ভ্রমরকে দায়ী করেছে এবং তার সামনে এসে গোবিন্দলালের দেওয়া ব'লে গিল্‌টি করা গয়না দেখিয়েছে, তখনি আর তার প্রেমের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করা যায় না।

গোবিন্দলালের সংগে রোহিণীর প্রসাদপুরে মিলন কেমনভাবে হলো বঙ্কিম তা বর্ণনা করেননি। কিন্তু প্রসাদপুরের যে জীবন তা' ভোগবিলাসের পূর্ণজীবন। লোকালয় থেকে দূরে শান্তির নীড় নয়। রোহিণী আবার নিশাকরের রূপ দেখে যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছে তাতে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হলেও; রোহিণী চরিত্রের গতি তখন যেদিকে চলেছিল সেদিক থেকে এরূপ সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট রোহিণীর ভোগাকাঙ্খা তখন প্রবল। তাই গোবিন্দলালের হাতে সে মরতে

চায় না। "রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!" (২।৯)।

রোহিণীর মৃত্যু ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে হত্যাকারীর দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। তার মধ্যে প্রধান শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের মতে বঙ্কিম নীতির মুখ রক্ষা করতে গিয়া রোহিণীর প্রতি অবিচার করেছেন, উপন্যাসের দিক থেকে রোহিণীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল না। আজ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে এই বিষয় নিয়ে। তাই বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে বলা চলে—বঙ্কিম রোহিণীর মৃত্যু হঠাৎ ঘটাননি, প্রথমাবধিই রোহিণী এবং গোবিন্দলালকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যাতে ক'রে এ ছাড়া অন্য কোন পরিণাম ভাবা যেত না। ভাবা যায় কি—রোহিণী গোবিন্দলালকে বিবাহ করে সুখে সংসার জীবন যাপন করছে, ভাবা যেত কি রোহিণী সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছে আর গোবিন্দলাল আবার গৃহে প্রত্যাগমন করেছে!

রোহিণীর জীবনের আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সে স্নেহশীলা, কর্তব্যপরায়ণা। পিতৃব্য ব্রহ্মানন্দের বিপদের ভয়ে সে উইলের ব্যাপারটা প্রকাশ্যে জানাতে পারেনি, প্রসাদপুর থেকে সে পিতৃব্যকে অর্থ সাহায্যও করেছেন। রোহিণীর সাহসও অসীম এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তারও সে পরিচয় দিয়েছে।

রোহিণীর অনেক গুণই ছিল। কিন্তু সমাজবিধিকে অমান্য ক'রে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির যে আয়োজন রোহিণী করেছিল, তার বিষময় পরিণামরূপে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল।

লচমণি (দুর্গেঃ ১।১০)॥

বীরেন্দ্র সিংহের অন্তঃপুরের একজন দাসী। তার কাজ বোধ হয় বীরেন্দ্র সিংহের পদসেবা করা।

চিন্তনীয়।

একটা ঢেউ—টয়েনবি কথিত হেরোডিয়ানইজম আন্দোলন যা প্রাচ্যে কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক প্রবর্তিত—ক্রমশ বিস্তীর্ণতায় মিশে ইতিহাসের গতিতত্ত্ব বা সভ্যতাস্ফুরণে কোন বিশেষ জ্যামিতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না হয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে নিজস্ব রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু পাশ্চাত্যরীতি প্রতিফলিত মুসলিম সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রসংগে টয়েনবি-চেতনায় ইতিহাসের বিকৃতি এবং ভাষণের অসত্যতা স্পষ্ট। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে রামমোহনের সচেষ্টতা অনুকরণবাদে বিশ্বাসী বলে প্রমাণিত হয় না। বিদ্যাসাগর, যিনি তৎকালীনযুগের যুক্তিবাদীদের মধ্যে অগ্রগণ্য, যখন সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা থেকে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানসিক যন্ত্রণায় মুখর হয়ে ওঠেন বা এঁদের বিফলতা সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় প্রতীকী হয়ে দাঁড়ায় তখন ইতিহাসের মানদণ্ডে সেই সমস্ত বিফলতা আমাদের সমাজে স্বাভাবিক ঘটনা। যেহেতু ক্ষেত্র ব্যাপক, এবং ইতিহাস আলোচনায় সামাজিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রয়োজনীয় দার্শনিক মতবাদে সমর্থিত ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা—বস্তু ও অবস্তুবাচক ইতিহাস-দর্শন এবং সার্ত্রের দর্শন-চিন্তা, অস্তিবাদ-প্রসংগ, ইতিহাসে কতটুকু প্রযোজ্য, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। ডেকার্টে-সার্ত্রের ব্যক্তি-সত্তা মতবাদ সামাজিক ইতিহাসে কতটুকু ফলপ্রসূ ও বুদ্ধিজীবী মহল অস্তিদর্শন চিন্তায় ব্যক্তি বা সমষ্টিকে কোথায় স্থান দিয়েছে এবং ইতিহাসের মূল্যায়নে এগুলির স্থান কোথায় তা কাউরই অজানা নয়। একটি সভ্যতার আলোকে অপর একটি পুরণো সভ্যতার নতুন করে গড়ে ওঠার ইতিহাস, যা টয়েনবি জিলেটিজম এবং হেরোডিয়ানইজম আন্দোলনে প্রত্যক্ষ করেছেন তা শুধু মুশলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেন এশিয়ার অনেক সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের মধ্যেই দেখা গেছে। তবে পশ্চিমী সভ্যতাস্পর্শে আলোকস্ফুরণের অর্থ এই নয় যে এশিয়া হঠাৎ পশ্চিমময় হয়ে উঠল, ভুলে গেল তার কৃষ্টি-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান। বলা যেতে পারে, মানুষের বৈজ্ঞানিক-চেতনার চারদিক ঘিরে যে দীর্ঘদিনের অনভ্যাস ও অত্যাচারে অন্ধকারময়তার সৃষ্টি হয়েছিল তার ওপর বাইরের আঘাত অন্ধকারকে ভেঙ্গে আলোকিত করেছে। এতো ইতিহাসেরই নিয়ম। এ নিয়মের পুনরাবৃত্তি হয়। তবে পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার মত নির্দিষ্ট নিয়মে নয়, ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়েই ইতিহাস এগিয়ে চলে। কিন্তু পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে প্রাচ্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে এ তথ্য কতটুকু সত্য তা ভেবে দেখা উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারত ইতিহাসে বুদ্ধিবাদ এবং নতুন চেতনার জন্মে য়ুরোপীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও একটি জিনিষ কাউরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না যে এ সময়েই প্রাচীন বিজ্ঞান-দর্শন-চিন্তার সূত্রপাত হয় নতুন পথে। ইতিহাসে এ ঘটনা প্রথম নয়।—অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় ইতিহাসে বুদ্ধিবাদ নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে, যদিও মন্তেস্কু এবং হিউম ছিলেন বুদ্ধি সম্পর্কে

সন্দিগ্ধ। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই যুক্তিবাদ, সংকীর্ণ রোমান্টিকতা বা বায়বীয় রীতির পরিবর্তে, সাধারণতঃ, ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু এতো আলো কোথা থেকে এলো! য়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবর্তন কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি? না অগ্রগতির ইতিহাস?—আমাদের দেশের চোখ ফুটল উনবিংশ শতাব্দীতে। রামমোহন, এবং তৎকালীন যুগের কয়েকজন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শন শিক্ষার প্রসারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তবে এটাকে কি হেরোডিয়ানইজম আন্দোলনের পর্যায়ে ফেলা যায়? টয়েনবি চিন্তিত পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার কি আমরা একেই বলব? আসলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ সহজ সাধ্য নয়।—হিসেবে ব্যবসায়িক মন্যতার অভাবের দরুণ স্পষ্টতই সামাজিক বিবর্তনবাদে আমাদের দেশের সৌভাগ্য-সূর্যের কথা বলতে উৎসাহ বোধ করছি। কারণ, শিল্প-সংস্কৃতিগত পরিবর্তনই শুধু নয়, সামাজিক বিবর্তনের সংগে সংগে আর্থনীতিক সুবিধার ফলে সমাজে নতুন বিত্তলোভী বিত্তবান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়—তারই গ্রামের ভাগ্যবিড়াম্বিত শোষিত জনগণ, যারা সার্ফ বা পেজান্টদের মতো, গোটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও সমাজের মেরুদণ্ড। পশ্চিমের দুয়ার খুলে যে সভ্যতার আলো অভ্যর্থিত, গৃহীত হয়ে উদ্ভাসিত, এবং সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনে আর্থনীতিক বৈষম্য প্রকট হয়েছে তাতে লাভ লোকসানের হিসেব বা উভয় সভ্যতার আলো বিনিময়ে দেনাপাওনার চুল চেরা হিসেব অসম্ভব ব্যাপার।

তৎকালীন যুগের অভিজাত বুদ্ধিজীবীগণের সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অতিমাত্রায় উৎসাহ, বেশীর ভাগ সময়ের সামান্যতম কাজ দেখিয়ে নির্বিকার স্থিতপ্রজ্ঞোচিত ব্যবহারে শ্রেণীর দ্বন্দময়তায় অবিচলিত, শুধুমাত্র কয়েকটি সংস্কার এবং রোমহর্ষক ইংরেজী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাণ্ডিত্য অর্জনে এবং য়ুরোপীয় হাবভাবের নকল সুসভ্য, কিন্তু সমাজসভ্যতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর, এবং আরো কয়েকজন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় শিক্ষিত এবং পণ্ডিত ছিলেন। সামাজিক পটপরিবর্তনে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার সংগত উত্তর প্রসংগে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষণীয়। সমাজতত্ত্ববিদগণ, সাধারণতঃ, ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, অনেক সময়ে সমাজ-চরিত্র বিষয়ক উক্তিতে অনভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট, এ জন্যই সমাজ-বিবর্তনে ইতিহাসের ভূমিকা সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক-ও আলোকচ্যুত হয়ে এমন উক্তি করে বসেন যা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। তাই প্রাচ্যে প্রতিবিম্বিত এবং আলোকিত পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা প্রসংগে টয়েনবির মন্তব্য অগ্রহণীয় এবং অযৌক্তিক। তবে কিছুটা প্রভাব বা মিল যে আছে তা অস্বীকার কে করে! উভয়েই উভয়ের কাছে ঋণী সে বিষয়ে দ্বিরুক্তি করার সঙ্গত কারণ নেই। বর্তমান পৃথিবীতে নিজস্ব আলোকে আলোকিত সুসভ্য সমাজ ব্যবস্থা কোন দেশে আছে কিনা তা জানা নেই, প্রত্যেকদেশের সভ্যতায় অন্যদেশীয় সভ্যতার প্রভাব বা প্রচ্ছায়া, সাধারণতঃ, পরিলক্ষিত।—আমাদের সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, উল্লেখনীয় সমাজ সচেতনতা—সমাজতাত্ত্বিকদের মতে—দেশবাসীর মানসিকতার প্রসারের ফলে সম্ভব হয়েছিল তা অনস্বীকার্য, কারণ, যদিও পালবংশীয় বা মুঘল আমল কিছুটা এনলাইটেন, কিন্তু ইংরেজ রাজত্বকালে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েই আমাদের সমাজে

একটা বিরাট পরিবর্তন এলো। এই পরিবর্তনে বিপর্যস্ত আর্থনীতিক ভিত্তিভূমি ভিন্ন-রূপ গ্রহণ করল—ভূস্বামী সৃষ্ট সামাজিকস্তর বিন্যাসে আর্থনীতিক পরিস্থিতি, ব্যক্তির অর্থ উপার্জনের স্বাধীনতা, পাশ্চাত্য প্রভাবিত নতুন সমাজ-ব্যবস্থার ফল সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতাস্পর্শে আমাদের সমাজে এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে, তা অনস্বীকার্য। তবে পশ্চিমী আলোকে আলোকিত প্রাচ্য, এমন উক্তি—যা পশ্চিমদেশীয় কোন কোন ঐতিহাসিক করেন—তা সম্পূর্ণভাবে মেনে নেব কি করে!—সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এলো ইংরেজ প্রবর্তিত রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার নীতির মধ্যদিয়ে। আমলাতান্ত্রিক সভ্যতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, আর্থনীতিক চাপে নিষ্পেষিত সাধারণ কৃষক-শ্রমিক শ্রেণী এবং বিত্তলোভী বিত্তমান সম্প্রদায়ের সহাবস্থান, আশ্চর্যজনক। আর এই আশ্চর্য জনক রীতি আজও আমাদের সমাজে টিঁকে রয়েছে। আমাদের দেশের সামাজিক প্রথায় পশ্চিমী প্রভাব এবং হস্তক্ষেপের ফলে আর্থনীতিক সংকটের গভীরজলে ডুবে যেতে লাগলাম এবং পাশ্চাত্যসভ্যতার খোলসটাকে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সভ্য-শিক্ষিত বলে চিৎকার করতে শুরু করলাম।—বস্তুতঃ আমরা যে নব্য সভ্যতায় সুসভ্য হয়ে উঠলাম সেটাই কি পাশ্চাত্য সভ্যতার রূপ! পাশ্চাত্য সভ্যতার আসল রূপটিকে আমরা কেন প্রাচ্যের কোন দেশেই কি সমস্ত ঠিক বুঝতে পেরেছে? তেমনি প্রাচ্য-সভ্যতা কৃষ্টি সংস্কৃতি বিজ্ঞান-ও অনেকাংশেই পাশ্চাত্যবাসীর কাছে অবোধ্য, দুর্বোধ্য এবং ধূসর।

মুশলিম সমাজে পশ্চিমী সভ্যতার বিকাশে টয়েনবি কথিত, এবং দৃষ্ট, দুটি আন্দোলন প্রথা—জিলেটিজম এবং হেরোডিয়ান ইজম—পশ্চিমী অস্ত্রে পশ্চিমী-সভ্যতা বিস্তারে বাধা এবং পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ—বিশেষ স্থান অধিকার করলেও এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে টয়েনবির চিন্তা অনেকাংশে ভ্রান্ত। একটি সভ্যতা, যা গোটা পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থায় না কি গ্রহণযোগ্য, ব্যাপকতার মধ্যে স্বাতন্ত্র বজায় রাখবে কি করে? কারণ যা সকলের গ্রহণীয় এবং গৃহীত তাতো সকলেরই নিজস্ব! বস্তুতঃ পক্ষে 'সভ্যতা'র সংজ্ঞা স্পষ্ট নয়। বরঞ্চ বলতে পারি—কিছু নতুন আদব-কায়দা শিক্ষা করেছি। পাশ্চাত্য-সভ্যতায় প্রাচ্য আলোকিত বলাটা মূর্খতার পরিচায়ক এই কারণেই যে, আমরা সকলেই জানি—পশ্চিমী দেশগুলিতে সভ্যতার আলো ফুটবার আগে চীন এবং ভারতবর্ষে সভ্যতার বিস্তার হয়; তাই প্রাচ্য-সমাজব্যবস্থা অম্লান প্রাচীন-সভ্যতার গৌরবে গৌরবান্বিত। তবে যেটুকু গ্রহণ করেছি তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে পশ্চিম থেকে আনীত উপহার এবং দেয়া-নেয়ার মধ্যেই ভারতবর্ষের মহান ঐশ্বর্য্য বর্তমান। আসলে ঐশ্বর্য্য সভ্যতায়, সভ্যতায় দেশীয় রূপ পরিস্ফুট—যা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক দৃষ্ট—এবং প্রাচীন যুগীয় সমাজব্যবস্থার অগ্রগতির ইতিহাস, যা উন্নত সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করে, মধ্যযুগে সভ্যতা বিস্তার কিছুটা স্তিমিত, অন্তত বলতে পারি যে, গাণিতিক নিয়মে সমাজের অগ্রগতি—অন্যান্য দেশের সংগে সমান তালে তাল রেখে চলা—সম্ভব হয়নি, সম্ভব-ও নয়, কারণ স্পষ্ট—অবশ্য যে-যুগ বিভাগ, প্রাচীন মধ্য, করলাম তাতে বিশ্বাসী নই, কারণ ইতিহাসের বা সমাজতাত্ত্বিক নিয়মে এ ধরণের যুগ বিভাগ অ-বৈজ্ঞানিক, কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থেই ঐতিহাসিকগণ হয়ত বলেন।—সমাজে গতি, গতিময়তায় সুস্পষ্ট সামাজিক রূপ অনেকটা নিয়ম মাফিক আবর্তিত চক্রের ন্যায়; স্থানু স্থবির নয়। অর্থাৎ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য

সভ্যতার বিনিময় হচ্ছে। শুধুমাত্র পাশ্চাত্য-সভ্যতার আলোকে প্রাচ্য আলোকিত নয়। তার নিজস্বতা আছে। যেটা অগ্রহণীয় তা অগ্রাহ্য করেছে—এটাই নিয়ম। নিয়মের ব্যতিক্রমে মানসিক অশান্তি এবং দুর্বিসহ সামাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব, সাধারণত, স্বাভাবিক ঘটনা।

প্রশ্ন ওঠে আজকের সভ্যতা প্রসংগে—এটা পাশ্চাত্য সভ্যতা, না সুপ্ত এবং প্রায় লুপ্ত প্রাচ্য-সভ্যতার পুনর্বিকাশ? প্রাচীন যুগে সভ্যতার বিস্তার, যদিও খণ্ডিত এবং নির্দ্দিষ্ট এলাকায় প্রায় সীমাবদ্ধ, প্রাচ্যেই হয়েছিল। বিজ্ঞানের অত্যুন্নতি, সমাজে প্রতিফলিত আলো পৃথিবীর সভ্য সামাজিক মানুষকে পথের সন্ধান দিয়েছে। আজকের সভ্যতায় পৃথিবীর প্রত্যেকটি সভ্য-সমাজের দান অনস্বীকার্য। বর্তমান সমাজ-সভ্যতায় আন্তর্জাতিকতা-ই পরিলক্ষিত।

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

মাটি ছেড়ে মহাকাশে॥ গোলোকেন্দু ঘোষ। বিচিত্রা প্রকাশন, ১৮ রামনাথ বিশ্বাস লেন কলিকাতা-৯ : মূল্য ২-৫০ পঃ

প্রথম যেদিন স্পুটনিক আকাশপথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীকে পরিক্রমা আরম্ভ করেছিল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সেদিন সারা পৃথিবী বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হয়েছিল। সেই থেকে আমরা কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশচারীদের গগণচারণার সংবাদ প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি। এখন আমরা এ সংবাদে আর হতবাক হই না। আমাদের প্রতীক্ষা এখন কবে গ্রহান্তরে মানুষ যাবে। মানুষের অবিস্মরণীয় এই কীর্তি এক দিনেই সম্ভব হয়নি। এর পিছনে আছে যুগ যুগ ধরে মানুষের আকাশে ওড়ার কল্পনা এবং সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার অক্লান্ত প্রচেষ্টা—যেটাকে আমরা আকাশে ওড়ার ইতিহাস বলতে পারি।

মানুষের আকাশে ওড়ার ইচ্ছে বহুদিনের, পাখির ওড়া দেখে মানুষ মনে মনে ঈর্ষা করেছে। মানুষ পাখির অনুকরণে ওড়ার চেষ্টা করেছে প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে। কিন্তু ডানা-মানুষ ভাসাতে পারেনি আকাশে কারণ শরীরের ওজনের অনুপাতে পাখির ডানার প্রসার বেশী। সেই কারণে অনেক বেশী বাতাস কেটে তার পক্ষে ভেসে থাকা সম্ভব হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি প্রথম বাতাসের গতি ও পাখি কি করে ওড়ে সে সম্বন্ধে গবেষণা করেন, তারপর বেবিলী সাহেব জানালেন যে উপযুক্ত বড় ডানা নাড়াবার শক্তি মানুষের হাতের পেশীতে নেই। সুতরাং মানুষ পাখির মত ডানার সাহায্যে উড়তে পারবে না।

মহামতি নিউটন আমাদের জানিয়ে গেছেন কেন আমরা সহজে মাটির টান কাটিয়ে উঠতে পারিনা, অল্প বয়স থেকেই প্রকৃতির নানা রহস্য তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল, গোটা সৌর জগৎটা চলছে কি নিয়মে? এই সব বিজ্ঞানের রাজ্যে তিনি যে সব অমূল্য জ্ঞান দিয়ে গেছেন তার তুলনা নেই। দীর্ঘ চুরাশী বছরের জীবনে তিনি বিজ্ঞানের ভাণ্ডার অপরিসীম দানে ভরিয়ে গেছেন, তারমধ্যে সবথেকে বড় হল সৌরজগতের নিয়মকানুন ব্যাখ্যা।

আপেল মাটিতে পড়ে মহাকর্ষের টানে, এই মহাকর্ষই হ'ল মানুষের আকাশে ওড়ার প্রধান বাধা, বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, যার ভার যত বেশী তার আকর্ষণও তত বেশী। আবার আকর্ষণের মাত্রা নির্ভর করে পরস্পরের দূরত্বের উপর। পৃথিবী থেকে যত উপরে ওঠা যাবে, আকর্ষণের মাত্রাও তত কম হ'বে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন পাহাড়ের চূড়ায় জিনিষের ওজন পাহাড়ের পাদদেশের ওজন থেকে কম। পৃথিবী থেকে চার হাজার মাইল উপরে উঠলে দেখা যাবে যে, জিনিষের ওজন সিকিভাগ হয়ে গেছে। সুতরাং পৃথিবী থেকে উঁচুতে এমন জায়গা পাওয়া সম্ভব যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ আর কাজ করে না। ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে যাত্রা যদি করা

যায় তাহলে পৃথিবীর মহাকর্ষ কাটানো সম্ভব। মানুষকে তার বাহনে এই প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করে মহাকর্ষ কাটানোর জন্য অক্লান্ত সাধনা করতে হয়েছে। উপযুক্ত বাহনের জন্য করতে হচ্ছে বহুরকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীরা বেলুন নিয়ে পরীক্ষা চালান। তাঁরাই প্রথম আকাশে ওড়েন এবং মানুষের আকাশে ওড়ার কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। তারপরে নানা পরিবর্তন ও উন্নত পরিকল্পনায় তৈরী হল জেপেলিন ও পরে উড়োজাহাজ। এয়ারশিপ এবং জেপলেন তৈরী করায় জর্মানী হয়ে উঠল সবার সেরা। কিন্তু পর পর দুর্ঘটনার পর এয়ারশিপ ও জেপেলিনের জনপ্রিয়তা কমে আসতে থাকে। পাশাপাশি এরোপ্লেনের উন্নতি হ'ল যথেষ্ট। শুধু বাতাসে ভাসা নয়, আকাশে ওড়া নয়, আকাশে ইচ্ছামত উড়ে বেড়ানোর সাধ মিটলো এরোপ্লেনে।

বিজ্ঞানজগতে রাইট ব্রাদার্সের অবদান অসাধারণ। পাখির ওড়ার ও ভারসাম্য রাখার কৌশল তাঁরা নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করলেন, তাঁরা প্রপেলার চালিত এরোপ্লেন তৈরী করলেন এবং চিরভাস্বর রইলেন। এরোপ্লেন আজ আর যেন কিছুনা। পৃথিবী জুড়ে বিমান চলাচলের এত প্রসার হয়েছে এবং বিমান ও ইঞ্জিনের এত উন্নতি হয়েছে যে ভাবতেও অবাক লাগে। জেট ইঞ্জিনের উদ্ভব হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বিমানপথে জেট বিমান ব্যবহৃত হচ্ছে।

জেট ইঞ্জিনে বাতাসকে বহুগুণ আয়তনে বাড়িয়ে দেয়। তা প্রচণ্ড বেগে পিছন দিয়ে যখন বেরোয় তখন দেয় সামনের দিকে ধাক্কা। রকেটও এগোয় গ্যাসের ধাক্কায়। রকেটে থাকে জ্বালানী এবং গ্যাস উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ব্যবস্থা। মহাকাশ পথে রকেটের উপযোগিতা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ হলেও এর গতিবেগ পঁচিশ হাজার মাইলের বেশী হওয়া চাই। এবং তা হলেই পৃথিবীর মহাকর্ষ কাটানো যাবে। আমেরিকান বিজ্ঞানী গডার্ড প্রথম তিন পর্যায়ী রকেট আবিষ্কার করে এই পথের সন্ধান দেন। এই তিন পর্য্যায়ী রকেটের সাহায্য নিয়েই স্পুটনিক প্রথম আকাশে উঠে পৃথিবী প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী ভি-টু রকেট বার করেছিল। এ ব্যাপারে ওয়ার্নার ফন ব্রাউন-এর অবদান অসীম, পরে তাঁরই নেতৃত্বে আমেরিকার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করেছিল। রুশ বিজ্ঞানী ৎসীওল্‌ভস্কী সম্পূর্ণ আত্মপ্রচেষ্টায় মহাকাশচারণার নানা বিষয়ে দীর্ঘ ৪০ বৎসর গবেষণা করে বড় বড় সমস্যার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। তিনিই প্রথম বলেন বারুদ প্রভৃতি কঠিন জ্বালানী দিয়ে প্রয়োজনীয় নিষ্ক্রমণ বেগ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যা ত আছেই, আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার্ট হাচিংস গডার্ড প্রথম তরল জ্বালানী ব্যবহার করে মহাকাশ চারণার ইতিহাসের সূত্রপাত করেন।

পাখির ওড়া দেখে একদা যে মানুষ ঈর্ষা করে এসেছিল, গগণচারী হবার স্বপ্ন দেখে এসেছিল, রকেটরূপ বাহন তার করায়ত্ত। এই বাহনের সাহায্যে বর্তমান প্রচেষ্টা মানুষের সশরীরে চাঁদে উপস্থিত হওয়া। কিছুদিন আগে এ্যাপেলো-৮ তিনজনকে নিয়ে চাঁদ পরিক্রমা করে এসেছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন চাঁদে হয়ত খুবই নিকট ভবিষ্যতে মানুষ সশরীরে উপস্থিত হ'বে—এ বিষয়ে সন্দেহ করার আর কোনও কারণই নেই। যে দেশের অভিযাত্রীই অবতরণ করুননা কেন সমগ্র মানবজাতি হবে সেই গর্বে গর্বিত।

চাঁদের বুকে ঘুমোনোটা হবে খুব আরামের। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম হওয়ায় শরীরে উপর চাপ হবে কম। রক্তের চাপ কম হবে সেইজন্যে হৃৎপিণ্ডের কাজ করতে হবে কম। সেখানে বায়ুমণ্ডল কম। সেখানে বায়ুমণ্ডল নেই বলে শব্দতরঙ্গ একজনের কথা অন্যের কানে পৌঁছে দিতে পারবে না, কথা-বার্তা চলবে বেতারের মাধ্যমে। চাঁদে আলোর অভাব নেই। পৃথিবীর ১৪ দিনে চাঁদের এক দিন। পৃথিবীর দিনের আলোর তুলনায় চাঁদ আলো পাবে শতকরা কুড়ি ভাগ বেশী। রাত্রে পৃথিবীর প্রতিফলন বেশী হওয়ায় পূর্ণিমায় আমরা যে আলো পাই তার ৮০ গুণ বেশী পাবে চাঁদ পূর্ণ পৃথিবীর রাত্রে। এই আলো বই পড়ার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু খালি চোখে চন্দ্রবাসী দেখতে পাবে না। তাকে কোনও আবরণের মধ্যে দিয়ে দেখতে হবে। চাঁদের আসল রূপ বর্ণনা করলে হয়ত অনেক কবিই প্রেরণা হারাবেন। চাঁদের ত্বক একঘেয়ে ও ম্লান, শ্যামলিমার কণামাত্র নেই। কোন বর্ণ বৈচিত্র্য নেই, এমনকি দিনের বেলাতেও আকাশ সেখানে কালো। আকাশে নক্ষত্ররাজি অনেক উজ্জ্বল। চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখতে হবে সাদাটে আকাশ রঙের একটা চক্র। ভূপৃষ্ঠের কোন খুঁটিনাটি দেখা যাবে না।

পৃথিবী থেকে খাদ্য সরবরাহ করে মানুষদের চাঁদে বেশী দিন রাখা যাবে না, চাঁদের মানুষদের শরীর থেকে যে সব পদার্থ নির্গত হবে' তা থেকে লতাগুল্মের সাহায্যে অক্সিজেন উদ্ধার করা যাবে এবং বেশ কিছু খাদ্যও সরবরাহ করা যাবে।

চাঁদের দেশের মানুষের পদার্পণের সংবাদ প্রথম যেদিন আমরা পাব সেদিন আমরা এই সাফল্যের সংবাদে বোধহয় বিস্ময়ে অভিভূত হবনা। তার কারণ আমাদের মানসিক প্রস্তুতি।

পাখির অনুকরণে মানুষের ওড়ার চেষ্টা থেকে শুরু করে আজকের মহাকাশ অভিযান পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞান ইতিহাস রচনা করেছেন শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি অত্যন্ত সহজ, সরল ও সরসভাবে আলোচনা করা হয়। উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলি সম্বন্ধে পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টি করা। জনসাধারণের মানসিক গঠন বিজ্ঞান ভিত্তিক করার প্রয়োজনীয়তা সমস্ত উন্নত দেশগুলি উপলব্ধি করেছেন। সুষ্ঠুভাবে বেতার, টেলিভিশন, সিনেমা, কার্টুন এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাদের এ অবিরাম প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বিজ্ঞানের নিরস বস্তুগুলিকে সরল, সহজ ভঙ্গীতে সকলের মধ্যে পৌছে দেওয়া ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞানে আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা আমাদের এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষে নিতান্তই সামান্য। যদিও বংলাদেশে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ প্রচেষ্টা নগণ্য যদিও প্রশংসার্হ। স্থানীয় ভাষায় এ জাতীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনা যত বেশী হয় ততই মঙ্গল। সেইদিক থেকে শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ রচিত 'মাটি ছেড়ে মহাকাশে' গ্রন্থটি বাংলাভাষায় সার্থক সংযোজন বলা যেতে পারে। এঁর বলার ভঙ্গীটি মনোরম ও ঝরঝরে অনেক ইতিহাস ও দুরূহ বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সহজে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন স্বল্প পরিসরের মধ্যে। কিন্তু যে স্কেচগুলি এবং ছবিগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি আরও পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করা যেত।

নির্মলেন্দু সান্যাল

পরিবার পরিকল্পনা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান

অশোকা গুপ্ত

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতবাসীর যেখানে গড় আয়ু সীমিত ছিল ২৭।২৮ বৎসর সেখানে আজ কুড়ি বৎসর পরে গড়পড়তা আয়ু সীমা হয়েছে চল্লিশের কোঠার উপর। মৃত্যুর হার বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর হার যেখানে ভয়াবহ ছিল, সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষার উন্নতি হওয়ায় শিশু মৃত্যুর হারও কমে গেছে। মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হওয়ায় এবং মৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় আজকের ভারতবর্ষে আমরা প্রাক্ স্বাধীনতার যুগের চেয়ে শারীরিক ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে অনেক বেশী ভালো থাকব মনে করা যেত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা হয়নি। দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন মৃত্যুর হার কমে গেল ও আয়ুরকাল বেড়ে গেল, তেমনি দেশের জনসংখ্যাও আগের চেয়ে বহুগুণ বাড়ল। এই সংখ্যা বৃদ্ধিতেও হয়ত কোনও ক্ষতি হত না যদি সঙ্গে সঙ্গে সকলেই দেশের সমৃদ্ধির সমান ভাগ পেত ও যথেষ্ট খাদ্য উৎপন্ন হত। এদিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সমাজসেবীরা। ১৯৪৭।৪৮ সালে নিখিল ভারত নারী সম্মেলন উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে যখন দেখেন যে এক একটি পরিবারে ৮।১০ জন লোক অথচ তাঁদের দাঁড়াবার স্থান নেই, আবার একবছরের মধ্যেই নূতন শিশু জন্ম নিচ্ছে, তখন ১৯৪৮ সালে সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। তখন একাজ করা সহজ ছিল না। মধ্যবিত্ত সমাজে ও শিক্ষিত সমাজে যদিও বা পরিবার সীমিত করবার শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা চলত, কিন্তু যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে প্রয়োজন, সেখানেও মহিলা কর্মীদেরও এমনকি মহিলা ডাক্তারদেরও কাজ করা কঠিন ছিল। ঢাকুরিয়াতে নিঃ ভাঃ নারী সম্মেলন তখন প্রথম পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলেন ও কাজ সুরু হয়।

১৯৪৯ সালে বাংলা দেশে মারোয়াড়ী সমাজের কয়েকজন অগ্রণী সমাজসেবী মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনায় একটি ক্লিনিক খোলেন।

অল্ইণ্ডিয়া ফ্যামিলী প্ল্যানিং এসোসিয়েশান এর পত্তন হয় ১৯৫১-৫২ সালে। ১৯৫২ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক রাজ্যে এই সংস্থা তাঁদের শাখা স্থাপন করে কাজ শুরু করলেন। যেহেতু এ বিষয়ে জনশিক্ষার কাজ সুরু হয়েছিল বম্বেতে, সেজন্য মহারাষ্ট্রেই পরিবার পরিকল্পনার কাজের বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়। অন্যান্য এলাকায় বেসরকারী প্রচেষ্টা প্রধানত শহরেই আবদ্ধ ছিল। কোন কোনও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে যেমন জামসেদপুরের লৌহও ইস্পাত কারখানায় ও মাতৃমঙ্গল ও প্রসূতিমঙ্গল কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার শিক্ষা দেওয়া সুরু হয়।

এর পর ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ্ সারা ভারতব্যাপী প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে সমাজ কল্যাণ পরিকল্পনা রূপায়নী সমিতি গঠন করেন। এই রূপায়নী সমিতি

বেসরকারী মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তাঁরা মেয়েদের মধ্যে কল্যাণমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করতে গিয়ে দেখেন যে, প্রত্যেকটি মা অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে এত বিব্রত, ব্যস্ত ও ক্লান্ত যে কোনও শিক্ষামূলক কর্মসূচীই অল্পবয়স্ক বধূ বা গৃহিনীদের মধ্যে নেওয়া যায় না। নিতান্ত যে বালিকা সেও পারে ছোট ছোট ভাইবোনদের সামলাতে। তার স্কুলে যাবার সময় নেই, খেলারও সাথী তার ছোট ছোট ভাইবোন। যখন তারা ঘুমোয়, তখন সে মাকে সাহায্য করে, মাঠে খাবার নিয়ে যায়, নয় মায়ের প্রসবের সময়ে রান্না বান্না করে। সারা দেশেই মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি এজন্যে বহুলাংশে পিছিয়ে আছে। এছাড়া মায়ের স্বাস্থ্য, বাপের সন্তানকে শিক্ষা দিতে অক্ষমতা এসব তো আছেই। তখনকার দিনে গ্রামে গেলে বা কলোনীতে গেলে একটা কথা খুব শোনা যেত—'একজন মানুষ, দশজন, খাওয়ানিয়া কেমনে চলবে?'—তা নয়ত খাটতে একজন, খেতে বারজন কেমন করে চলে?"

এই নিয়ে সমাজ সেবীদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত দুর্গাবাই দেশমুখ ১৯৫৭ সালের কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ডের সর্বভারতীয় সভানেত্রীদের কনফারেন্সে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিবার পরিকল্পনা উপদেশটার সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং তখনই স্থির হয়, যে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে জেলায় জেলায় অবৈতনিক বেসরকারী সমাজ সেবীকে এই কাজে লাগাতে হবে। তাঁহারা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও সভাসমিতিতে গিয়ে জনসাধারণের কাছে সীমিত পরিবারের ও সুখী পরিবারের চিত্র তুলে ধরবেন, যাতে তাদের অর্থসঙ্গতি অনুসারে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র ও সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে আগ্রহান্বিত হন? এইভাবে অবৈতনিক কর্মীরা গত ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। এখনও করে যাচ্ছেন। সমাজ কল্যাণ বোর্ডও আবার ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় সারা ভারতে সমাজকল্যাণ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে এক এক এলাকার একটি করে কেন্দ্র খুলেছেন, তাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী আছেন একটি স্বেচ্ছাসেবী কর্মী আছেন যারা বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে পরিবারের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করেন আবার সন্তান পালন, সন্তানধারণকালে প্রসূতির প্রয়োজনীয় এসবও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আবার দম্পতি যদি কোন পরামর্শ চান তার জন্য কোথায় যেতে হবে সে পরামর্শও দিয়ে থাকেন।

পশ্চিমবাংলায় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের অধীনে ২৫টি কেন্দ্র আছে। সবগুলিই বহু দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। স্থান নির্বাচন সরকারী ও বেসরকারী কর্মীদের একত্র আলোচনার মাধ্যমেই হয়। এরা সরকারী সাহায্য পান এছাড়া সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেমন বেসরকারী প্রসূতি সদন, হাসপাতাল কিংবা মহিলা সমিতি এঁরাও পরিবার কল্যাণের শিক্ষণীয় দিকটি তাঁদের সভ্যা বা ছাত্রীদের মধ্যে প্রচারের ভার নিয়েছেন। একমাত্র পশ্চিমবাংলায় ফ্যামিলী প্ল্যানিং এসোসিয়েশান এরই কলিকাতা শাখায় ১৫টি ক্লিনিক আছে। বর্তমানে এরাও যথেষ্ট সরকারী সাহায্য পান।

মোটের উপর একথা বলা যায় যে বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে জনশিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়েছিল, সরকারীভাবে তৃতীয় পরিকল্পনা থেকে তা'তে জোর দেওয়ার ফলে প্রচার ও সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সুষ্ঠু অগ্রগতি হয়েছে।

পশ্চিমবাঙ্গলায় পরিবার পরিকল্পনাপক্ষ পালনের তাৎপর্য

এস. আর. দাস

পরিবার পরিকল্পনা আজ আমাদের জাতির অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। দ্রুতজনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের উন্নয়নের পথে যে সকল প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে তাকে দূর করার আগ্রহে আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার নিয়ন্ত্রণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সমগ্র দেশ ও দেশবাসীর ভবিষ্যৎ এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির প্রশ্নও এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। সমস্যাটি সম্বন্ধে আমরা সবাই সজাগ এবং পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য আমরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করেও চলেছি।

তবুও মাঝে মাঝে নতুন করে সঙ্কল্প গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। নূতন করে অনুপ্রাণিত হতে হয়। যে কোন দিবস উদ্‌যাপনের প্রকৃত সার্থকতা সেইখানে। এই উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আমরা নূতন প্রেরণাই সঞ্চয় করিনা। আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে তীব্রতর এবং উদ্দেশ্যকে নিকটতর করারও সুযোগ পাই। পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত ও সাফল্যমণ্ডিত করার আগ্রহে, এই কারণেই, প্রতি বছর আমরা পরিবার পরিকল্পনাপক্ষ উদ্‌যাপন করে থাকি। এ বছরেও ২রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে পরিবার পরিকল্পনাপক্ষ পালনের আয়োজন করা হয়েছে।

এই উপলক্ষে পরিবার পরিকল্পনাপক্ষ উদ্‌যাপনের তাৎপর্যটি আমরা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সকলেই জানি, ভারতবর্ষ অনুন্নত ও দরিদ্র দেশ, খাদ্য সঙ্কট ও বস্ত্র সঙ্কট আমাদের নিত্য সঙ্গী শিক্ষা সমস্যা, গৃহ সমস্যা ও বেকার সমস্যায় এখনো এদেশ জর্জরিত। পরিকল্পনাবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা যে আমরা যথাসাধ্য করিনি, তা নয়। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরে নানা গঠনমূলক কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে। অতীতের অনেক জঞ্জাল ইতিমধ্যে আমরা দূর করতেও পেরেছি। কিন্তু তবুও যে আমাদের অর্থনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি, তার কারণ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের অগ্রগতির হার খুবই সামান্য। উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে মৃত্যু হার আমাদের দেশে অতি দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যদি আমরা যথাযথভাবে প্রসারিত করতে পারি তাহলে মৃত্যুর হার আগামী কয়েক বছরে আরো অনেক হ্রাস পাবে। ফলে আমরা যদি স্বেচ্ছায় ও সকলের সহযোগিতায় জন্মহারকে পরিকল্পনামত কমিয়ে না আসতে পারি, তা'হলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা দিন দিন তীব্রতর হবে।

দেশের বর্তমান পটভূমিকায় এই কারণেই পরিবার পরিকল্পনাকে সর্বজাতীয় ভিত্তিতে জাতীয় পরিকল্পনারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় সম্পদকে সর্বাধিক সমাজ কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যেই এই জন্মহার নিয়ন্ত্রণের আয়োজন দেশের সম্পদ ও সন্ততির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে

জন্মহারকে পরিকল্পনামত কমিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচীতে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়া হয়েছে এমনি লক্ষ্য মাত্রায় পৌছিবার সময়ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যমাত্রার দিকে ইতিমধ্যে আমরা কতটা অগ্রসর হয়েছি, বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কী কী বাধার সম্মুখীন হয়েছি, কোন পথে চললে আমাদের সাফল্য আরও ত্বরান্বিত হবে, তার একটা বার্ষিক খতিয়ান এই কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গত বছরে বাস্তবক্ষেত্রে আমরা সে সব অসুবিধা অনুভব করেছি, বর্তমান বছরে আমরা কিভাবে তার প্রতিকার করতে চাই, কিভাবে অধিকতর উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে আরও ঐকান্তিক ভাবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা লক্ষ্যমাত্রায় পৌছিতে পারি তা নির্ধারণও পরিবার পরিকল্পনাপক্ষ উদ্‌যাপনের আর এক উদ্দেশ্য।

পরিবার পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই কল্যাণের পরিকল্পনা। জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা এবং দেশব্যাপী সীমিত পরিবারের মনোভঙ্গী গঠনের উপরই এর সাফল্য নির্ভর করছে সেজন্য এই কল্যাণব্রতী পরিকল্পনায় বাণী ও আদর্শকে দেশের দূর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌছে দেওয়া আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। আর এই কল্যাণ হচ্ছে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করতে সকলেই যাতে উদ্‌বুদ্ধ হয়, তার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনই পরিবার পরিকল্পনাকে সাফল্য মণ্ডিত করার পথ।

এর জন্য চাই উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের সঙ্গে দেশবাসীর অধিকতর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। পরিবার পরিকল্পনাপক্ষ উদ্‌যাপনের সময় এই দুইটি দিকেই যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে একদিকে যেমন জনসাধারণকে এই পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং কর্মসূচী সম্বন্ধে সচেতন করার আয়োজন করা হয়েছে; অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম, উপযুক্ত পরামর্শ, উপদেশ ও সহায়তা যাতে সহজ লভ্য হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। আশা করা যায়, এই দ্বিমুখী ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চারিত হবে এবং সীমিত পরিবারই যে আধুনিক জীবন পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ"—এই নীতি অধিকতর সংখ্যক জনসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করবে।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, পরিবার পরিকল্পনার মহান দায়িত্ব পালনে শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, বিভিন্ন জনহিতকর বেসরকারী সংস্থা এবং জনকল্যাণকামী নেতৃবৃন্দকেও একাজে অগ্রণী হতে হবে। তাঁদের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে এবং পরিবার পরিকল্পনা-কর্মীদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কর্তব্য শেষ করি।

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 January '69 (0·50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ষোড়শ বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৭৫

অব্যর্থ কবচ

আমি আপনাদের একটা কবচ দেবো। যখনই কোন সন্দেহ উপস্থিত হবে অথবা যখন আত্মচিন্তা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠবে তখন নিম্নলিখিত কৌশলটি প্রয়োগ করুন। আপনি যে দরিদ্রতম এবং অসহায়তম মানুষটিকে চেনেন তাঁর মুখ চিন্তা করুন এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আপনি যে কাজ করার কথা চিন্তা করছেন তা, সেই মানুষটির কোন উপকার সাধন করবে কিনা। সে কি এই ব্যবস্থায় কোন রকমভাবে উপকৃত হবে? সেই ব্যবস্থা কি তাঁকে তাঁর নিজের জীবন বা ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এনে দেবে? অন্য কথায় বলতে গেলে সেই ব্যবস্থা কি পরিণামে অন্নহীন ক্ষুধার্তকে খাদ্য এবং আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ আত্মচেতনাহীনকে স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন এনে দেবে? তাহলেই আপনারা দেখবেন যে আপনাদের সন্দেহ এবং আত্মচিন্তা দূর হয়ে গেছে।

মহাত্মা গান্ধী

MAHATMA
GANDHI
BIRTH CENTENARY
OCT. 2.1968 TO
FEB. 22.1970
महात्मा
गांधी
जन्म शताब्दी
अक्तूबर 2.1968 से
फरवरी 22.1970

EXPORT QUALITY
এখন আপনাদের জন্যও পাওয়া যাচ্ছে!
সুলেখা®
এক্সিকিউটিভ কালি
এতে সলভেন্ট এস-১০০ আছে
পার্মানেন্ট ব্লু-ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, লেডি ব্লু ও জেট ব্ল্যাক
ওয়াশেবল রয়েল ব্লু, এমারেল্ড গ্রীন ও স্কারলেট রেড
BLACK EXECUTIVE INK Sulekha
EXECUTIVE INK
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২
Progressive/SW-34

ষোড়শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ইতিহাস চর্চার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ইতিহাস চর্চার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কি বা কি হওয়া উচিত, এসম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, বিষয়টি অত্যন্ত বিতর্কমূলক। আর বিতর্কমূলক বলেই প্রথমে আমাদের এর "সংজ্ঞা" সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক বিদ্বানদের মতামত আলোচনা করা প্রয়োজন।

"ইতিহাস" শব্দটি এসেছে ইতিহ+আস ; ইতি হ (এবং কিল) আস্তে ইতিহাসঃ। এর অভিধান গত অর্থ হচ্ছে—উপদেশ পরম্পরার আধার ; যা' উপদেশ পরম্পরারূপে আছে ; লোক-ক্রমাগত কথা ; পূর্ববৃত্তান্ত, প্রাচীন কথা। ইংরেজী "History" শব্দটি এসেছে গ্রীক ভাষা হতে। গ্রীক ভাষায় এর অর্থ হল—মানবজাতির উৎপত্তির সময় হতে তাদের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান। আর অতীত কথন শাস্ত্রের প্রাচীনতম ভারতীয় নাম-ই "ইতিহাস"। ইতি-হ-আস—"এইরূপই ছিল (বা ঘটেছিল) এই নিরুক্তিগত অতীতের সব কিছুই "ইতিহাস"-এর পর্যায়ভুক্ত। প্রাচীনকালের সকল ঘটনার সঙ্গেই "ইতিহাস"-এর সম্পর্ক। অবশ্য প্রাচীন বিদ্বানেরা এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সবসময় যে অনুসরণ করতেন না তার প্রমাণও রয়েছে। অথর্ববেদ-এ "ইতিহাস" শব্দের উল্লেখ থাকলেও শব্দটির অর্থ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই।

যাস্কের নিরুক্তিতে "দেবানী ও শান্তনু", "বিশ্বকর্মন ভৌবন" প্রভৃতির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে "ইতিহাস"-রূপে। শতপথ ব্রাহ্মণ-এ দেবাসুরের যুদ্ধকে আংশিকভাবে "ইতিহাস"-এ এবং আংশিকভাবে "পুরাণ-"এ কথিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তৎসহ ঐ কলহের বিবরণকে অসত্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। "বৃহদ-দেবতা"-তে 'পূর্বে যা ঘটেছিল' তাকে 'ইতিহাস' (ইতিহাস পুরাবৃত্ত) বলা হলেও শতক্রতুর এক কাহিনীকে 'ইতিহাস' রূপে চিহ্নিত

করা হয়েছে। এই গল্প রচয়িতা উর্বশী ও পুরূরবা'র এক কাল্পনিক গল্প সম্পর্কে স্পষ্টতই জানাচ্ছেন যে পরস্পরের আহ্বান উদ্দেশ্য করে যে আখ্যান রচিত হয়, সেইআখ্যানকে যাস্ক মনে করেন 'সংবাদ', কিন্তু শৌনক মনে করেন 'ইতিহাস'। অতএব তদানীন্তনকালে 'ইতিহাস'কে পুরাবৃত্ত বলে গ্রহণ করা হ'লেও সাধারণ গল্পকেও 'ইতিহাস আখ্যা দেওয়া হত।

সম্ভবতঃ নিরুক্ত বা শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকালের পূর্বেই "ইতিহাস" শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। সত্য নয় এমন বহু বর্ণনাও "ইতিহাস" নামে প্রচলিত হতে থাকে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা "মহাভারত"-এ বহু উপদেশমূলক গাথা, কাহিনী ও গল্পাংশ ইতিহাসরূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাক্ষেত্রে এক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসঙ্গত করা যেতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণ, আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র, শাঙ্খ্যায়ন-গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন রচনায় বা অন্য কোনও বিশেষ ক্ষতির পর "ইতিহাস" শ্রবণের নির্দেশ রয়েছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদ-এ পঞ্চম বেদ-রূপে অভিহিত হয়েছে "ইতিহাস-পুরাণ" (ইতিহাস ও পুরাণ)। অতএব সমসাময়িক কালে "ইতিহাস-বেদ" বা "ইতিহাস-পুরাণ" নামক এক শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"-তে "ইতিহাস"-এর সংজ্ঞার বিবর্তনের সম্ভবতঃ পরবর্তী স্তর প্রকাশিত। সেখানে "ইতিহাস"-পুরাণ; ইতিবৃত্ত, উদাহরণ, আখ্যায়িকা, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র-রূপে ব্যাখ্যাত। ব্যক্তিবিশেষ ও ঘটনাবলীর বর্ণনা, কাহিনী, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা প্রভৃতিও আবার কৌটিল্যের মতে "ইতিহাস"-এর অন্তর্গত। ডঃ হাজরার মতে 'পুরাণ'-সাহিত্যের মূলের সন্ধান রয়েছে "পারিপ্লব আখ্যানে"। প্রচলিত ধারণানুসারে প্রতিটি পুরাণে পাঁচটি বিষয়—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত বা বংশানুকীর্তন-এর আলোচনা থাকা উচিত এবং বংশানুচরিত অধ্যায়ে চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি বংশের রাজাদের তালিকা পাওয়া যায়। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে আধুনিক কালের ক্রমপঞ্জী ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এগুলি প্রাথমিক প্রকাশ।

বৈদিক সাহিত্যের বিবিধ রচনায় "ইতিহাস-পুরাণ" কথার উল্লেখ ইতিহাস ও পুরাণের নিবিড় সম্পর্কের প্রাচীনত্বকেই প্রকাশ করে। "উদাহরণ শব্দের অর্থ "প্রাকৃত বিষয়ের উপপাদক দৃষ্টান্ত'' অথবা "মীমাংসাদি ন্যায়োপন্যাস বিষয়ক শাস্ত্র''। "ইতিবৃত্ত" হচ্ছে অতীত ঘটনাবলী; আর "আখ্যায়িকা'' হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। দুটি বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য হচ্ছে "ধর্মশাস্ত্র" ও "অর্থশাস্ত্র"। এই সব রচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, এমন কি অর্থনৈতিক আলোচনাও সন্নিবেশিত।

'মহাভারত'-এ (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৪০০-খ্রী ৪০০) 'ইতিহাস'-এর উপদেশাত্মক বৈশিষ্ট্যই সবিশেষ প্রকাশিত। বেদান্তর্গত যে গাথা নারাশংসীগুলি ভারতীয় মহাকাব্য-গাথার সূত্রপাতের সূচক হিসাবে পরিগণিত, সেগুলি রাজা ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের অতীত জীবনের কর্ম ও ঘটনার প্রশংসাগীতি হিসাবেই রচিত। "ইতিহাস'' সম্পর্কীয় কৌটিলীয় ধ্যানধারণার একেবারে প্রাথমিক সংস্করণের সঙ্গে এগুলির যোগাযোগ থাকাও বিচিত্র নয়। ভারতীয় চিন্তাচেতনায় "ইতিহাস'' বিস্তার ধর্মীয় তাৎপর্য যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত তা' মনু'র পিতৃ-শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে 'ইতিহাস' আবৃত্তির

নির্দেশ থেকে সুস্পষ্ট। আবার কৌটিল্যের "ইতিহাস" সম্বন্ধীয় সর্বাত্মক সংজ্ঞাও ভারতীয় সাহিত্যে প্রচারিত।

মধ্যযুগেও এইসব চিন্তা-চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করি। নবম শতকের জিনসেন-এর "আদি-পুরাণ"-এ বলা হয়েছে যে "পুরাণ নামক ধর্মীয় সাহিত্য ইতিহাস রূপে কথিত।" আরও বলা হয়েছে, "শ্রুতির বচন অনুসারে ইতি-হ-আসীৎ অর্থাৎ পূর্বে এইরূপই ঘটেছিল তা'ই ইতিহাস বলে কথিত হওয়া উচিত। ঋষিগণ একেই ইতিবৃত্ত বা ঐতিহ্য বলে উল্লেখ করে থাকেন।"

'অমরকোষ' রচয়িতার মতে 'ইতিহাস' শব্দটি 'পুরাবৃত্ত'র অর্থাৎ অতীত ঘটনাবলীর সমার্থক। রাজতরঙ্গিনী রচয়িতা কহ্লণ পূর্ববর্তী 'কবিগণ' প্রদত্ত অতীত বিবরণীর স্খলিত অংশগুলিতে সত্য ঘটনার কথা "যোজনা" করাকে স্বীয় উদ্যমের কারণ বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি আরও বলছেন যে, অতীত বিবরণী রচনার বিষয়ে যে গুণবান ব্যক্তি বিচারকের ন্যায় রাগদ্বেষ নিরপেক্ষ হতে পারেন, তিনিই শ্লাঘ্য। প্রসঙ্গত তিনি পূর্বসূরী সুব্রত, ক্ষেমেন্দ্র, ছবিল্লকর, হেলরাজ প্রমুখের রচনাবলীর তুলনামূলক সমালোচনাও করেছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি লেখ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক উপাদানও তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি সপ্তম শতকের পূর্বের স্বদেশীয় কাহিনীকে যখন পুনর্গঠন করতে গিয়েছেন তখনই নিবিষ্ট হয়েছেন কিম্বদন্তী ও উপকথায়। কর্মফল, যুগবাদ, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাস তাঁর সৃষ্টির মূল্য ব্যাহত করেছে।

আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতে এক ধরণের আদি ইতিহাসবিদ্ ছিলেন। আরও দেখি, পুরাণের রাজবংশানুচরিত—অংশে রাজাদের তালিকা। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি "নিকটবর্তীযুগের সজ্জনদের চরিতাবলীর" ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু এ পর্যন্ত উদ্ধৃত প্রসঙ্গ থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ভারতে কহ্লণ ব্যতীত (তাও আংশিক) আর কোন রচনাকার-ই নিরপেক্ষ মতবাদ ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে সক্ষম হন নি।

এবার বহির্ভারতের বিদ্বানদের মতামতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। মিশরের ফারাওদের প্রশস্তিকাররা তাদের যশোগাথা গেয়েছেন। আসুরীয় কাহিনীতেও একই প্রয়াস লক্ষ্য করি। আবার খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকের জনৈক Manetho নামক মিশরবাসীর রচনায় এবং বেরোসোস নামধেয় ব্যাবিলন-বাসীর রচনায় নিরপেক্ষ বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তির পর্যাপ্ত পরিচয় বিদ্যমান। আধুনিক মতানুসারে 'ইতিহাস' লেখার সম্ভাব্য সূত্রপাত হয় হিরোডোটাস-এর (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শঃ) রচনায়। তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে গ্রীসের সঙ্গে পারস্যের যুদ্ধ (ম্যারাথন, থার্মোপাইলি ও সালামিস্-এর যুদ্ধ) এবং সেই সব যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের বিবরণ। তবে বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য, সামাজিক ও নৈতিক চিন্তা-ধারণাও সেখানে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। হিরোডোটাস্-এর তুলনায় থুসিডাইডস-এর (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০-৩৯৯) রচনা নীরস ঘটনাপঞ্জীতে সমাকীর্ণ হলেও "পিলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাস" একখানি বিখ্যাত রাজনৈতিক গ্রন্থ। নির্ভুল তথ্য ও তারিখ এবং সব ঘটনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিতুস্ লিভিউস লিভি (খ্রীঃ পূঃ ৫৯-খ্রীঃ ১৭ অঃ) রচিত "রোম নগরীর ইতিহাস"-এর আবার বৈশিষ্ট্য হল বিশদ বর্ণনা। যাই হোক, এইসব রচনাকারদের (ঐতিহাসিক) রচনা স্বয়ংপূর্ণ হয় নি এই

কারণে যে, তাঁদের ইতিহাসে ব্যবহৃত তথ্যাবলী যাচাই করবার জন্য কোন বিজ্ঞান সম্মত পন্থা অনুসৃত হয় নি এবং ঘটনাবলী ও তাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণই ছিল এইসব রচনার বিষয়বস্তু। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি এই পন্থা-ই অনুসৃত হয়েছে অপরাপর ঐতিহাসিক রচনায়।

প্রশ্ন উঠবে, আমরা কার ইতিহাস-চর্চা এবং রচনা করব। অবশ্যই আমরা মানুষের ইতিহাস চর্চা করব। লিখব তার পৃথিবীর বুকে তৎপরতার কথা। ঈশ্বর কর্তৃক এই পৃথিবীতে খ্রীঃ পূঃ ৪০০৪ অব্দে প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল, এমন ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীর বুকে মানব তৎপরতার ইতিহাস চর্চা ও রচনা করব না। ক্যাণ্ট, হার্শেল, লায়েল এবং ডারুইন-এর রচনা আজ সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত করেছে যে পৃথিবীতে জগৎ আদিম রূপ থেকে বছরের বিবর্তনের পথে চলতে চলতে বর্তমান পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজিত হতে না পেরে বসুধাপৃষ্ঠ থেকে তাদের বহু চিহ্ন আবার লুপ্তও হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ভূতাত্ত্বিক প্লিস্টোসিন কল্পে, আনুমানিক দশলক্ষ বছর পূর্বে মানব-সদৃশ্য প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে এই পৃথ্বী-বুকে। তারপর বিবর্তনের পথে চলতে চলতে বর্তমান স্থানে সে অবস্থান করছে। মানুষকে বাদ দিয়ে, অন্যান্য প্রাণীকুলের, বৃক্ষরাজির, ভূতত্ত্বীয় পরিবেশের—এই বিবর্তনের কাহিনী যখন মানুষ বর্তমানে চর্চা এবং রচনা করে তখন তা' এক এক বিদ্যার অধীন হয়। অতএব যখন আমরা কেবল মানুষের কাহিনী চর্চা ও রচনা করব—তখন তা "ইতিহাস" বিষয়ের অন্তর্গত হলেও পৃথিবীর প্রাণী, বৃক্ষ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই "খণ্ডিত"। মূলতঃ "ইতিহাসের অন্তর্গত সবই। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কেবল "মানুষ"।

পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত মানুষের তৎপরতা সম্বন্ধে জানার বিষয় প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যেদিন শ্রম করে কোন কিছু সৃষ্টি করল—সেইদিনই বিশেষভাবে চিহ্নিত হল "মানুষ"-এ। সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি—সময়ের দিক থেকে তারও বহু সহস্র বছর পূর্বের সেই মানুষের তৎপরতা "প্রাগৈতিহাসিক" কালের অন্তর্গত। প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানের দৌলতে বস্তুনিষ্ঠ নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেই মানুষের অবিনশ্বর কালজয়ী সৃষ্টির বিচার বিশ্লেষণ করে সেই ভিত্তির উপর তার প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারার পরিচয় প্রকাশ করা যায়। ইতিহাসের যে রূপটি পূর্বে প্রাচীন বিদ্বানদের মন্তব্য উদ্ধৃতিকালে প্রকাশিত হয়েছে—তা থেকে সুস্পষ্ট যে তা প্রধানতঃ রাজনৈতিক। এক শাসকের সঙ্গে অপর শাসকের কূটনৈতিক খেলা আর সৈনিকের বীরত্বের কাহিনী। সঙ্গে থাকে ধর্মগুরু আর ধর্মসংস্থার কথা, রাজনৈতিক সংস্থার বিবরণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী। প্রসঙ্গতঃ থাকে প্রতি যুগের কিছু আর্থিক অবস্থা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা ললিতকলা সম্পর্কে কিছু কথা। এইসব বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক যুগটি এ পর্যন্ত রাজনৈতিক মানদণ্ডে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে নামকরণ হয়েছে রাজবংশ, ধর্মসংস্থা বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীরূপে। অতএব এইসব বিবরণ পাঠ ও রচনাকালে মানুষের কাছে সংস্কার নিরপেক্ষ কোনও তুলনামূলক বিচারের মানদণ্ড প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু এইসব রাজা, সৈনিক, কোনও শিল্পী বা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ তো সমষ্টিগত মানুষের কাছে অতি মুষ্টিমেয়। সেই শতকরা নব্বই ভাগেরও

বেশী মানুষকে বাদ দিয়ে স্বল্পজনের তৎপরতার কাহিনী চর্চা ও অনুশীলন তো "ইতিহাস"-এ সেখানে অনুপস্থিত। অতএব সমগ্র মানুষের ইতিহাস চর্চা ও রচনার জন্য যে প্রচেষ্টা সেই সুপ্রাচীন অলিখিত, অনথিভূত কালের—তা প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ধার করা যেতে পারে। মার্ক্সীয় পদ্ধতি প্রয়োগ (অবশ্যই অন্ধভাবে নয়) সেখানে অপরিহার্য।

প্রত্নতত্ত্বের দৃষ্টিতে "সংস্কৃতি" হচ্ছে কতকগুলি বাহ্যলক্ষণের সমষ্টি। যেমন—প্রস্তরের যন্ত্র, তাম্র বা ব্রোঞ্জে নির্মিত উপকরণ, লৌহ-নির্মিত উপকরণ ইত্যাদি। প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমে আজ ইহা সুপ্রকাশিত যে প্রত্ন প্রস্তর যুগের নিম্নস্তরে অমসৃণ প্রস্তর-অস্ত্র (যন্ত্র) মানুষে ব্যবহার করেছে, কিন্তু অস্থির যন্ত্র তখনও অনাবিষ্কৃত; শিকারকে বিদ্ধ করবার মত ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের কৌশলও তদানীন্তন মানুষের অবিদিত; এমন কি, মৎস ধরার কৌশলও অজানা। এই স্তরের মানুষের কঙ্কালে আধুনিক জাতিগুলির পূর্বপুরুষের অর্থাৎ Homo-Sapiens-এর কোন পরিচয় মেলে না। মানুষের জীবন-ধারণের তখন একমাত্র উপায় হচ্ছে শিকার। প্রত্নপ্রস্তর যুগের উচ্চস্তরে হোমো স্যাপিয়েন্স-এর আবির্ভাব হয়েছে, উন্নততর অমসৃণ-প্রস্তর ও অস্থি-যন্ত্র'র প্রচলন হয়েছে, মৎস্য-সংগ্রহের কৌশলও মানুষের জানা। বেধক অস্ত্র এই কালেরই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। বহুক্ষেত্রে মানুষকে জীবনযাপন করতে হত গুহায়, অতএব গুহা-ভল্লুক ছিল শিকারের বস্তু। বলগা-হরিণও শিকার করা হয়েছে, এমন প্রমাণ সুলভ। প্রত্নপ্রস্তর যুগের উভয় স্তরেই মানব-নির্মিত শিল্পদ্রব্যের প্রধান নমুনা হচ্ছে প্রস্তর ফলক।

প্রসঙ্গতঃ প্রাগৈতিহাসিক মানবজীবন চর্চার ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা স্মরণ যোগ্য। মানুষ বাঁচার তাগিদেই প্রস্তরযন্ত্র নির্মাণ করেছে। তার বুদ্ধিবৃত্তির তথাকথিত বিকাশ অর্থাৎ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র নির্মাণের কৌশলের এবং আকৃতিরও বিবর্তন হয়েছে। মানবজীবনের সেই দিনগুলির আচার আচরণ এবং সামগ্রিক পরিচয় প্রাপ্তব্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেই বিশ্লেষিত হয়ে চর্চা করা যেতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রারও বিবর্তন অতিক্রান্ত কালের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে। মানব-জীবনযাত্রাপ্রণালী তার সৃষ্ট যন্ত্রের প্রকাশনার ভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি যুগের প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান প্রকাশ করে যা ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে অবশ্যই গ্রহণীয়। ভূগর্ভ থেকে সংগৃহীত প্রত্নবস্তু সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ভূতত্ত্বের প্লিস্টোসিন পর্যায়ে প্রত্নপ্রস্তর যুগকে স্থাপন করা যায়। এর পরবর্তী হচ্ছে মধ্যপ্রস্তর যুগ, আরণ্য পরিবেশের দ্বারা চিহ্নিত এবং ভূতত্ত্বের আধুনিক (recent) পর্যায়ে উন্নীত সাংস্কৃতিক স্তর। এই সময়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শামুকের খোসা (shell) আহরণ, মৎস্য ধরার জন্য ব্যবহৃত বড়শী, শিকারে ব্যবহৃত ফাঁদ এবং মৃৎপাত্র। শুধু তাই-ই নয়, প্রত্নপ্রস্তর ও মধ্যপ্রস্তর যুগকে মানব-জীবনের বন্যদশা বা খাদ্য সংগ্রহের পর্যায়রূপে চিত্রিত করা যায়।

নব্যপ্রস্তরযুগের মানুষ কৃষির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন, পশুপালন, হস্তের দ্বারা মৃৎপাত্র নির্মাণ এবং মসৃণ প্রস্তরের উপকরণ ব্যবহারে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। স্পষ্টতই প্রকাশমান হচ্ছে মানুষের কারিগরি কৌশলের এবং উৎপাদন কৌশলের বিবর্তনের পদ্ধতি। মানুষ চাষ করেছে কোদাল দিয়ে। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ছিল যব ও গম। ধান্যকেও আমরা সমসাময়িক না হলেও পরবর্তী পর্যায়ে ফেলতে পারি। গো, মেষ, শূকর প্রভৃতি ছিল পালিত পশু।

ব্রোঞ্জযুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কৃষিকর্ম হতে হস্তশিল্পের পৃথকীকরণ। এই সময়ে এমন একদল মানুষের সাক্ষাৎ মিলেছে। যারা নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করেনা। অর্থাৎ এঁরা সর্বক্ষণের বিশেষজ্ঞ কর্মী। সামাজিক উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই এমন ঘটনা সম্ভব। নব্যপ্রস্তর যুগ পর্যন্ত এরূপ ব্যবস্থার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি। ব্রোঞ্জযুগেই প্রথম মানুষ ব্যবহার করেছে চক্রযুক্ত শকট। প্রচলন হয়েছে মৃৎশিল্পে কুমারের চাকার। এই যুগের শেষভাগ থেকে লাঙ্গল চাষের প্রচলন হয় এবং লৌহযুগে তা দ্রুত উৎপাদন কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতি লাভ করে। নিঃসন্দেহে কোদাল চাষ থেকে এই লাঙ্গল চাষে বিবর্তন তথা বিশেষ দশায় উপনীত হওয়া মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সবিশেষ পরিবর্তন এনেছে। উৎপাদনক্ষেত্রেও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটেছে। বৃহত্তম ভূখণ্ড কর্ষণ যোগ্য হওয়ায় উৎপাদন হয়েছে পরিমাণে অনেক বেশি।

ব্রোঞ্জ যুগেই যুদ্ধোপযোগী রথের প্রচলনের ফলে অশ্বের প্রয়োজনীয়তা মানুষের কাছে অনুভূত হয়েছে। অবশ্য প্রাপ্তব্য তথ্য থেকে বলা যায় যে, ব্রোঞ্জের ব্যবহার থেকেই মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্থাৎ বিবর্তন সর্বত্র সমানভাবে হয় নি এবং বর্বরদশার অবসানও ঘটে নি।

ব্রোঞ্জ পর্বের পরবর্তী হচ্ছে লৌহ-যুগ। এইকালে মানুষ নানাবিধ লৌহ উপকরণ নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করেছে এবং কারিগরি কৌশলের এই পরিবর্তন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দশা অপেক্ষা আরামদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। লাঙ্গল লৌহ নির্মিত ফলাযুক্ত হওয়ায় কৃষিকর্ম হয়েছে সহজতর।

বক্ষমান আলোচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক কালের ক্রমকে দেখান হয়েছে তিনটি যুগ নির্দেশ করে। প্রস্তর-যুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ এবং লৌহ-যুগ। আবার সমাজতাত্ত্বিক ক্রম হচ্ছে বন্যদশা, বর্বরদশা এবং সভ্যতা। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, প্রত্নপ্রস্তর যুগ ও মধ্য প্রস্তরযুগ বন্যদশার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং নব্যপ্রস্তরযুগ উপনীত হয়েছে বর্বর দশায়। বন্য দশার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে খাদ্য অন্বেষণে তথা আহরণে; আর বর্বরদশার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে খাদ্য উৎপাদনে। ব্রোঞ্জ-যুগে কোথাও কোথাও হয়েছে লিপির প্রচলন, আবার কোথাও কোথাও মানুষ বর্বরদশা অতিক্রম করেনি। লৌহযুগেও তেমনি প্রত্যক্ষ হয়, এক অঞ্চলে বর্বরদশা বিরাজিত, অন্য স্থানে সভ্যতার সূচনা।

বর্তমান যুগের বহু খ্যাতনামা ভাববাদী ঐতিহাসিকের সংজ্ঞার সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের "সভ্যতা" বিষয়ক সংজ্ঞার কোনও মিল নেই। "সভ্যতা"র সূচনা হল মানুষের লিপিজ্ঞান আবিষ্কারের মাধ্যমে। অবশ্য "সভ্যতা"র প্রকাশক আরও কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশিত হওয়া উচিত। যেমন স্থিতিশীল জীবন, গৃহনির্মাণ এবং খাদ্য উৎপাদন। আমেরিকার "মায়া" (Maya) ইণ্ডিয়ানরা "সভ্য" এই কারণে যে, বর্ষপঞ্জী ও চিত্রলিপির ব্যবহার তাদের জানা। কিন্তু বাস্তব সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা নব্যপ্রস্তরযুগের দশা তখনও অতিক্রম করে নি। লাঙ্গলের মাধ্যমে কৃষির পদ্ধতি এবং চক্রযুক্ত শকট নির্মাণের কৌশলও তাদের অজানা।

প্রত্নতত্ত্বের ভাষা স্বীকার করলে, বাস্তব সংস্কৃতির স্তর হচ্ছে প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ এবং লৌহযুগ। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে মানসিক সংস্কৃতি ও চর্চা করতে হবে। সংস্কৃতি ও সমাজ—পরস্পরসাপেক্ষ ধারণা। সংস্কৃতির সর্ববিধ ক্রমবিবর্তন দেখিয়ে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব

সামাজিক বিষয়ের প্রতিই কেবল মনোনিবেশ করে। তার মধ্যে পড়ে ক্লান, গোষ্ঠী, পরিবার প্রথা, ম্যাজিক, ধর্মবিশ্বাস, ট্যাবু প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা।

এ পর্যন্ত লিখিত, ঐতিহাসিক কালেরও বহু পূর্বের মানুষের বিষয় যা আলোচিত হল—তা' মানুষের সৃষ্টির উপাদানের কতকগুলি বিশিষ্টতার পরিপ্রেক্ষিতেই। মানুষের সমষ্টিগত জীবনের বিবর্তন—সেই প্রত্নপ্রস্তর যুগ হতে কিভাবে চলেছে—মানুষের ইতিহাস চর্চা ও রচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই আলোচনার বিষয়। সোভিয়েট নৃবিজ্ঞানীরা এই বিবর্তনের পর্যায়কে কয়েকটি যুগে ভাগ করেছেন। প্রথম হচ্ছে—প্রাগ-গোত্র সমাজ, তারপর গোত্র বিভক্ত সমাজ, তারপর শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, সর্বশেষ মর্গান-কথিত সভ্যতার স্তর। এঁদের মতে প্রত্নপ্রস্তর যুগের উচ্চস্তরের মাতৃশাসিত গোত্রের পরিচয় মেলে। নব্যপ্রস্তর যুগে পিতৃশাসিত গোত্র দেখা দিয়েছে এবং ধাতুযুগে ক্রমশঃ গোত্র সংগঠন ভেঙ্গে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে মাতৃশাসন প্রমাণের কোন উপায় নেই। অনেক সময় মাতৃকা-মূর্তির মধ্যে মাতৃ-শাসনের ইঙ্গিত অনুসন্ধান করা হয়। তা কিন্তু সঠিক নয়। প্রত্নপ্রস্তর যুগের উচ্চস্তরে নরম প্রস্তর বা গজদন্ত দ্বারা নির্মিত মাতৃকা-মূর্তি এবংনব্যপ্রস্তর যুগে মৃৎ বা প্রস্তর বা অস্থি-নির্মিত মাতৃকা মূর্তিগুলির সৃষ্টির মূলে উর্বরতা-মূলক ম্যাজিক বা জাদু অনুষ্ঠান। নারীর উৎপাদিকা শক্তিতে প্রাচীন মানবের ছিল অটুট বিশ্বাস। নারীমূর্তিতে অলৌকিক ম্যানা-শক্তি বাস করে, অতএব জাদুঅনুষ্ঠান দ্বারা সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সর্ববিধ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এমন একটা বিশ্বাস তদানীন্তনকালে পোষণ করা হত। এমন কি বর্তমান কালেও এই ধরণের আচার অনুষ্ঠান আমাদের দেশে দুর্লভ নয়।

নব্যপ্রস্তর যুগে মৃতের সঙ্গে গো-ধন সমাহিত করার রীতি প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব গৃহপালিত পশু'র ব্যক্তিগত মালিকানা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। বরং ব্রোঞ্জযুগীয় নিদর্শনে গৃহ-সংলগ্ন গো-শালার অস্তিত্বসূচক নিদর্শন থেকে গো-ধনের উপর পারিবারিক বা ব্যক্তিগত মালিকানার আভাস পাওয়া যায়। শ্রমের মাধ্যমে মানুষ শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করেছে সেই প্রস্তর যুগেই। বিজ্ঞানের উৎসও ঐ শিল্পবিদ্যা থেকে। মৃত্তিকার উপকরণে পাত্র'র নির্মাণ সুস্পষ্ট ভাবে দেখায় কার্য ও কারণের অবিচ্ছেদ্যতা, গর্ডন চাইল্ড-এর মতে—এই নিয়মই হচ্ছে বিজ্ঞানের ভিত্তি। অতএব ধর্মবিশ্বাস বা ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় নি—এই তথ্যটি মানুষের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ স্মরণ যোগ্য।

প্রাগৈতিহাসিক অর্থাৎ লিখিত ইতিহাসেরও পূর্বকালের মানুষের জীবন প্রবাহ সম্পর্কে চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বিষয়ে এ পর্যন্ত বাস্তব নিদর্শন থেকে কিছু কিছু আলোচনা করা হল। কিন্তু মানবতৎপরতার পরিচয়-প্রকাশ ক্ষেত্রে মার্কসীয়-প্রণালীও অবশ্য প্রকাশযোগ্য। মানুষের তৎপরতা অনুশীলন কালে দেখতে হবে, উৎপাদন শক্তিগুলির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কগুলি কতখানি জড়িত। আবার উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো কতখানি এবং কিভাবে নিরূপিত হচ্ছে। ক্রম অনুসারে প্রাগৈতিহাসিক মানব জীবন থেকে সভ্য মানব জীবন চর্চার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, নতুন উৎপাদনের যন্ত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে মানুষ উৎপাদন প্রণালীটির পরিবর্তন তথা বিবর্তন ঘটিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তন ঘটেছে সামাজিক সম্পর্কগুলিরও। আরও দেখি অর্থনৈতিক

কাঠামোর উপর অবস্থান করে আইন-গত তথা রাজনৈতিক সৌধ। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক চেতনা। ইউরোপ ভূ-খণ্ডে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব জীবনের ইতিহাসের পটভূমিকায় উৎপাদন সম্পর্কগুলি হতে পারে নিম্নরূপ। প্রথম, আদিম সাম্যবাদের পরিবেশে যৌথ সম্পর্ক ; দ্বিতীয়, প্রাচীন রোম ও গ্রীসের পরিবেশে প্রভু ও দাস-এর (গোলাম) সম্পর্ক ; তৃতীয়, মধ্যযুগের ইউরোপ সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাসের সম্পর্ক ; চতুর্থ, বর্তমান কালের পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্পর্ক এবং পঞ্চম, আগামীকালের যৌথ সম্পর্ক। এইগুলিকেই সংক্ষেপিত করা যায় প্রাক-বিভক্ত সমাজ, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ এবং আগামী কালের শ্রেণীহীন সমাজ-এ। প্রসঙ্গতঃ ভারতের মানুষের যে সমাজ-জীবন, তার ইতিহাসের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। বৈদিক আমলের কৌমতান্ত্রিক পরিবেশে শ্রেণী-বিভাগ-এর প্রমাণ রয়েছে। রয়েছে কর্ষিত ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানারও প্রমাণ। উত্তরকালে এই কৌমতন্ত্র বিলুপ্ত হয় নি, অথচ দাস প্রথা (গোলামী প্রথা) ও সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। অতএব প্রাচীন ভারতের সামাজিক ব্যবস্থায় এগুলির এক অদ্ভুত সমন্বয় প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছে। আরও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ভারতে কোনকালেই উৎপাদন প্রণালী হিসাবে দাস (গোলামী) প্রথার উদ্ভব ঘটে নি। বরং বৈদিক আমলের অন্তিমকাল থেকে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো বহুলাংশে বর্ণভেদের আকার গ্রহণ করেছে। আর, ভারতে পূর্ণাঙ্গ সামন্ততন্ত্র কখনও কখনও কোন অংশে বিকশিত হলেও উপরাজতন্ত্রের দিকেই ছিল তার প্রধান ঝোঁক। মার্কস-এর মতানুসারে ভারতের সনাতন প্রথা হচ্ছে গ্রাম্য ব্যবস্থা। সর্বশেষ, ভারতে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত কোন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য শোষিত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে নি। ভারতে যে এত গৃহযুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, বিপ্লব, বিজয় অভিযান, দুর্ভিক্ষ ঘটে গিয়েছে, সেগুলির দ্বারা উচ্চকোটি মানুষের জীবনে (এবং নিম্নকোটিরও কিছু কিছু) রদ-বদল ঘটলেও সামাজিক বিবর্তনে দু'টি স্তর, সরল বা জটিল কৌমতন্ত্র এবং ক্রম-বর্ধমান বর্ণভেদই আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। বক্ষমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনজীবনের ইতিহাস আলোচনাকালে আমাদের দেখতে হবে, যে বিবর্তনের ছক ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। অতএব সরলরেখিক বিবর্তনবাদের নীতি অনুসারে এই পার্থক্য তথা ব্যতিক্রম ব্যাখ্যাত হতে পারে না। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আরও স্মর্তব্য যে মার্কসীয় পদ্ধতিতে অর্থনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আলোচনায় অর্থনৈতিক পরিবেশ নিয়ে বহুল অতিশয্যওপ্রকাশ পেয়েছে। সে সম্পর্কীয় বিশ্লেষণে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিকতা হচ্ছে প্রথম বিবেচ্য বিষয়। এখানে মার্কসীয় প্রণালী অবশ্যই প্রয়োগ-যোগ্য। তথ্য সংগ্রহ, বাস্তব প্রয়োজনের কার্যকরণ সম্পর্ক, জীবিকার বিচার প্রভৃতি মানুষের সমষ্টিগত তথা সামাজিক আলোচনায় অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু দেশভেদে তাদের লক্ষণের প্রকাশও ভিন্ন হয়। দেখা দেয় অঞ্চল ভেদে মানবীয় আচরণের পার্থক্য। অতএব সকল দেশের ইতিহাসকে একটি মাত্র যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কিছুতেই বিচার করা চলতে পারে না।

মানুষের উপাদান গত ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি তথা বিবর্তনের এমন এক দশাকে "সভ্যতা"

নামে অভিহিত করা যেতে পারে যখন মানুষ কেবল লিপি-ই আবিষ্কার করে নি, সে শিকার, মৎস্য-সংগ্রহ এবং বন্য মূল ও ফল সংগ্রাহকের পর্যায় অতিক্রম করে খাদ্য উৎপাদকের দশায় অবস্থান করেছে। একটা নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপনও করেছে। করেছে কৃষির পত্তন, পশুকে গৃহে পালন, মৃৎপাত্র নির্মাণ। এমন কি বৃহদায়তনের মন্দিরাদি স্থাপত্যেরও সূচনা। মানুষ যখন কৃষির প্রচলন করল তখনও বীজ থেকে কেন শস্য জন্মায়—তা তাদের অজানা। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ফসল বৃদ্ধির কামনায় সে যাদু অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় সমাজ-জীবনের বহু আচার-এর পত্তন ঐকালেই। ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে সেইসব আচার অনুষ্ঠানের তথা ধর্মীয় রীতি-নীতির বিবর্তনের কাহিনী অবশ্যই আলোচনার যোগ্য। যখন আমরা "বসুমাতা" (Mother Godess) সম্পর্কীয় আলোচনা করব, তখন প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করব তার আদিম উদ্দেশ্য কি ছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই মাতৃকা-চর্চার আদিম উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি। ভিন্নভাবে বলা বলা যায়, যেকোনও প্রকারে উৎপাদন বৃদ্ধি। স্পষ্টতই নারী সন্তান জন্ম দিয়ে উৎপাদিকা শক্তি প্রকাশ করে, অতএব নারীমূর্তি হচ্ছে উর্বরতা-ম্যাজিকের প্রধান অবলম্বন। প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকেই মাতৃকা-চর্চার নিদর্শন প্রকাশ হলেও নব্যপ্রস্তর যুগ বা ব্রোঞ্জ যুগের পূর্ব পর্যন্ত লিঙ্গ-যোনি-প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয় নি। অতএব বাস্তব নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে—মাতৃকা-বিশ্বাস থেকে এই লিঙ্গ-যোনি-চর্চা আধুনিক কিনা। লক্ষ্য করলে আরও দেখা যাবে, আদিম বিশ্বাসে নারীর প্রজনন-শক্তিতে আস্থা সূচিত হয়েছে, কিন্তু প্রজননে পুরুষের অংশ সম্বন্ধে ধারণা বিকশিত হয়েছে পরবর্তী-কালে। উর্বরতা-ম্যাজিক এবং তৎসংশ্লিষ্ট মাতৃকা-চর্চা নিকট প্রাচ্য প্রমুখ সভ্যতাগুলিতে কতখানি স্থান দখল করেছে, মানুষের শ্রমের মাধ্যমে জীবনযাত্রা প্রণালীর বিবর্তনের ইতিহাস অনুশীলন-অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। এখানে কিছু কিছু ভারতীয় নিদর্শন উপস্থিত করা যায়। সংস্কৃত "গো", ইরাণীয় "গেউস" এবং গ্রীক ভাষাগত "গে" (Gaea) উর্বা-নারী-রূপিণী পৃথিবীকেই প্রকাশ করে। ঋগ্বেদে দ্যাবা পৃথিবী মিথুনরূপে কল্পিত। "দৌ" হচ্ছেন পিতা এবং "পৃথিবী" হচ্ছেন মাতা। অতএব ঋগ্বেদীয় আর্যরা মাতৃকা চর্চার সঙ্গে পরিচিত ; তবে মূর্তিপূজক ছিলেন, এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুপস্থিত। মাতৃতান্ত্রিক সামাজিক সংগঠন ছিল বলেই বহির্বৃত্তের আর্যদের মধ্যে মাতৃকা চর্চার বিকাশ হয়েছে, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখের এই সিদ্ধান্ত উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই সংশোধনযোগ্য। পুনরুল্লেখ প্রয়োজন যে, মাতৃকা-চর্চার মূল কথাই নারীর উৎপাদিকা শক্তিকে সমৃদ্ধিলাভের জন্য প্রয়োজনে লাগানো, সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর প্রাধান্য নয়। মাতৃকেন্দ্রিক ও পিতৃকেন্দ্রিক উভয়বিধ সামাজিক পরিবেশেই উর্বরতা-ম্যাজিক বিকশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, দেবীপূজক বঙ্গে নারীর সামাজিক মর্যাদা কোনকালেই খুব উচ্চ ছিল না। তান্ত্রিক বামাচারের মধ্যেও উর্বরতা-ম্যাজিকের বিবিধ লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়, এর অন্তর্গত যৌন-সমাচার সভ্যতার একটি বিশেষ দশার কাহিনী। বিষয়গুলি এইভাবেই বিশ্লেষিত হতে পারে।

একদল পণ্ডিত বলেন, ম্যাজিক বিশ্বাসের বিলুপ্তি ঘটে সভ্যতার পর্যায়ে এসে এবং জাদুক্রিয়া একান্তই বন্য ও বর্বর অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়। কিন্তু বাস্তব-প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্টরূপে বলা যায় যে, প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে ধর্মবিশ্বাস ছিল বহুলাংশে জাদু-মিশ্রিত এবং বহুপ্রকার

জাদু-প্রতীকও সেখানে ব্যবহৃত হত। হিন্দু পূজা পার্বণে ম্যাজিক উপকরণ প্রত্যক্ষ করে সেটি যে বন্য দশা বা বর্বর দশা এমন কথা কিছুতেই বলতে পারি না। ঋগ্বেদীয় "মায়া" ব্যক্তি-প্রযুক্ত ছলনা কৌশল বা জাদুশক্তি। আর বেদান্তের মায়া নৈর্ব্যক্তিক প্রপঞ্চ মূল অঘটন ঘটন পটীয়সী জাদুশক্তি। আবার শাক্ত বিশ্বাসের মহামায়াও জাদুশক্তি ব্যক্তিত্ববিশিষ্টা, পরম সত্তার মর্যাদায় আরূঢ়া।.. এই ক্ষেত্র চর্চার কালে অপ্রাকৃত জাদুবিশ্বাস-এর দিকে মননশীলতার পরিণতি কিভাবে ঘটেছে তা আলোচিত হতে পারে মাত্র। ক্রমবিকার তথা ক্রমবিবর্তন এবং বহিঃপ্রভাবের ফলে সাংস্কৃতিক রূপান্তর কিভাবে ঘটে "হোলি" তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই উৎসবের আদিরূপ হচ্ছে কৃষিগত ম্যাজিক অনুষ্ঠান, অথচ বর্তমানে তাতে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব প্রবৃষ্ট। সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের বিষয় আলোচনাকালে এই সব বিষয়ের উপর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত জোর দিলে নিরপেক্ষতা লঙ্ঘিত হবে।

নগর সভ্যতার আবির্ভাবকাল থেকে মানুষের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশেষভাবে অনুশীলন যোগ্য। আমাদের এতদ্বিষয়ক আলোচনা ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। যাই হোক, প্রাচীনযুগের বাস্তব-উপাদানের মধ্যে লিখিত কোনও নথী প্রত্নতত্ত্বের দ্বারা সমর্থিত হলে মানুষের তৎপরতা প্রকাশের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধা দূর হয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে, একাধিক লিপির প্রমাণ, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার প্রভৃতি ও একটি রাজবংশ বা আঞ্চলিক সেইসব ক্ষমতাশালী ভারতীয় রাজাদের বিবরণ প্রকাশের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ফলে অনেকেই উপকথা প্রভৃতি থেকে অসম্ভবরকম কষ্টকল্পিত কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন। অলিখিত কালের তথ্য ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় কিছু উদ্ধার করা যায় মাত্র। মানুষের তৎপরতা, কালানুক্রম অনুযায়ী, উৎপাদন আদি পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। মানুষ নিজেকে তৈরী করেছে যন্ত্র ব্যবহার করে, ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির উপর ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করে সুষ্ঠভাবে বসবাসের মাধ্যমে। বাস্তব পরীক্ষাদির মাধ্যমে যে কৃতকার্যতা অতীতে সেই জনসমষ্টির জীবনে তুলনীয় ভাবে হঠাৎ তথাকথিত অগ্রগতি বা বিবর্তন (অর্থাৎ পরিবর্তন) এনে দিয়েছে—তা তো সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিটি মৌলিক অবিষ্কারের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

স্মর্তব্য, কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান তার সৃষ্ট উপাদান অপেক্ষা কখনই আরও উন্নত হতে পারে না। বিশেষ করে মানুষ যখন অর্ধ বন্য দশার খাদ্য সংগ্রাহকের পর্যায় থেকে খাদ্য উৎপাদকের পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে। এই কাল-ই তো "প্রাগৈতিহাসিক"—লিখিত ইতিহাসের পূর্বের। অতএব কেবল লিখিত তথ্যেরে সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ-ই মানুষের ইতিহাস নয়, বরং তার প্রতিটির সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের কালের সংযোগ সাধন। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অবশ্য লক্ষণীয় হল, যে কোনও প্রাচীন সাহিত্যের উপস্থিতিই সমাজের শ্রেণী বিভাগকে নির্দেশ করে কি না। সবচেয়ে প্রাচীনকালের সাহিত্যের অর্থই একটি মন্দির আবির্ভাবের পূর্বাবস্থা, পুরোহিত-তন্ত্র, নগর জীবন, উৎপাদন-ক্ষম শ্রেণীতে বিভক্ত বিভিন্ন সমাজ এবং স্বল্পসংখ্যক উদ্বৃত্ত ভোগকারী। শেষোক্তরাই লিপিগুলির রচয়িতা, ঐতিহাসিক অবশ্যই তা অনুশীলন করবেন। উৎপাদকের সাহিত্য-সৃষ্টির অবসর কতখানি তা দেখতে হবে। গৃহ, কবরে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি, যন্ত্র এবং উৎপাদন সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি যা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাপ্ত

হন—সাধারণতঃ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সম্পর্ককে প্রকাশ করছে। আর এগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিবরণের বিষয় (Ethnography)।

একদল পণ্ডিতের ধারণা, ধর্ম, অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় আচার প্রভৃতি অনুশীলনের উপর মনোযোগ আমাদের ইতিহাস থেকে বহুদূরে নিয়ে যাবে। ইহা সার্বিক সত্য নয়। এগুলি তো মানুষের মানসিক চিন্তা-চেতনার এক বিশেষ দশার প্রকাশ। এদের সঙ্গে মানুষের জীবন নির্বাহের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ যে রয়েছে তা ভারতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলেই প্রতীয়মান হবে।

লাঙ্গলের ব্যবহারকারী কৃষিজ গ্রাম্য অর্থনীতি কৌমতান্ত্রিক ভারতে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্যায় রূপে চিহ্নিত। মানুষের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে দেখতে হবে—এদের বৃহত্তর রূপের মধ্যে কি কি বিবর্তন তথা পরিবর্তন এসেছে, কতখানি সাজুয্য সামগ্রিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান, সেই দশায় ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন তথা অর্থনৈতিক ও মানসিক জীবনের পরিচয় কেমন। সমষ্টির বিবর্তন তথা পরিবর্তনই হচ্ছে গুণ (Quality)-এর বিবর্তন তথা পরিবর্তন। ভারত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যুগ তথা রাজবংশীয় কাল—মৌর্য, সাতবাহন, গুপ্ত—চিহ্নিত হয়েছে মৌলিক গ্রাম্য সমাজের গঠন ও ব্যাপ্তির এবং নতুন নতুন বাণিজ্য কেন্দ্রের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে। অতএব কেবল কে রাজা ছিল—ইহাও যেমন দেখতে হবে (সর্বাধিক জোর দিয়ে নয়), তেমনি খাদ্য উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়েও মনোযোগী হতে হবে। কারণ উদ্বৃত্ত সম্পদ প্রভৃতির অধিকারী যে রাজা তাঁর রাজত্ব, চাল চলন বীরত্ব প্রভৃতি তো কৃষি পদ্ধতির উন্নত অনুন্নত ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। দেখতে হবে গোষ্ঠী-জীবন ভেঙ্গে সমাজ-জীবনের বির্তনে শ্রেণীর ভূমিকা কি কি এবং কতখানি। ধাতু কোথা থেকে এল। উদ্বৃত্ত ফসলাদি কখন রপ্তানী হতে আরম্ভ হল। ক্ষুদ্র প্রস্তরযুগীয় আচার অনুষ্ঠানের বিবর্তনের কারণ কি। সর্বশ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও পর্যন্ত প্রস্তর-যুগীয় দেবতাদি পূজা পাওয়ার কারণও অনুসন্ধান করতে হবে। লক্ষ্য করলে প্রতিভাত হবে, রাজবংশের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, সুবৃহৎ ধর্মীয় উত্থান প্রভৃতি প্রধানতঃ উৎপাদন-ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বিবর্তন তথা পরিবর্তনকেই নির্দেশিত করে।

প্রস্তরযুগেও কিছু কিছু শ্রমের বিভাগ যে হয়েছে তা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে জানতে পারি। প্রাকশ্রেণী-বিভক্ত সমাজের গঠন বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে আচার অনুষ্ঠান ও উৎসর্গ-প্রথার উদ্ভব হয়েছে কি না। যাদু বিশ্বাস থেকে ধর্ম, নৃত্য, গ্রাফিক আর্ট; কবিতা সঙ্গীত প্রভৃতির সৃষ্টি হলে কালানুক্রম অনুসারে তার বিবর্তন ও রূপের পরিচয়ও প্রকাশ করতে হবে। পদ্ধতিমাফিক কৃষিকাজ ও পশুবৃত্তির কামনার মূলে যদি বলি-প্রথা থাকে—তাও প্রকাশ করতে হবে।

স্থিতিশীল সৃজনধর্মী সমাজে পুরোহিত গোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ তৎপর হয়েছে তাদের তুষ্ট করতে। আদিম দশায় পুরোহিত ছিল গোষ্ঠীর নেতা, ক্লানের প্রধান বা কুলপতি-শ্রেণীর জন্য উৎসর্গীকৃত একজন বিশেষ চিকিৎসক। গোষ্ঠী থেকে কিভাবে শ্রেণীর তথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের ইতিহাস রচনাকালে তা দেখতে হবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আমাদের ঐ মত প্রকাশের সুযোগ দেয় যে নগর পরিকল্পনা ভারতে

ঋক্‌বেদ পূর্ব কালে। নব্য প্রস্তরযুগের মানুষ প্রস্তর যন্ত্র দ্বারা বিশাল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য পরিষ্কার করতে পারেনি; বিশেষ করে গাঙ্গেয় অববাহিকার পলল-মৃত্তিকায়। অতএব মরুভূমির মত ভূ-পরিবেশ কৃষি সৃষ্টি করে বলে যে ঐতিহাসিক মত দেন, সেটি যাচাই করে দেখতে হবে। সম্ভবতঃ সেখানে উদ্বৃত্তও পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্ভব। ইহাই আবার মানুষকে কাঠ ও ধাতুর মতন উপাদান অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করেছে, বিশেষ করে নদীপথে বিনিময়ের মাধ্যমে। নদীই আবার বর্বর পশুর বিপক্ষেই উপযুক্ত প্রতিরক্ষার কাজ করে। অতএব এমন সব ভূ-খণ্ডের মানুষ যে বর্বর মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কুশলী হবে না, তা ধরা যেতে পারে। যাই যোক, সিন্ধু বা হরপ্পা মহেঞ্জোদরো, ঝোর প্রমুখ সভ্যতার আলোচনাকালে দেখতে হবে, কিভাবে বিশাল নগরের খাদ্য কৃষকরা উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে যোগান দিয়েছে। বিভিন্ন শীলে অঙ্কিত জন্তুর চিহ্নাদি প্রাক্‌-কৃষিদশার শিকার-করা অঞ্চলের আদি টোটেম হিসাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে কিনা, বিশ্লেষণ করতে হবে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নথীভূত তান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রবর্তন উপরিউক্ত সভ্যতার শিল্পকলায় কতখানি বিদ্যমান, তাও আলোচিত হওয়া উচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে তদানীন্তন কালের কৃষি-পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাই না। অতএব দেখতে হবে—লাঙ্গল ছিল কিনা। সমাজে কোন্ কোন্ শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, সেরকম নজীর খুঁজতে হবে। মানুষ সভ্যতার পর্যায়ে এসেছে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, লিপি আবিষ্কার করার ফলে। মানুষের বহু তদানিন্তন অভিজ্ঞতা সে লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছে। এই লিপি আবিষ্কারের মূলে রয়েছে সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা।

মাতৃকা-চর্চা প্রসঙ্গে পূর্বে ঋগ্বেদীয় মানুষের কিছু চিন্তাধারার পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। দেখা যায়, ঋগ্বেদীয় আর্যরা খাদ্য উৎপাদনের পর্যায়ে অবস্থান করেছেন। অতএব তাঁরা বন্যদশা অতিক্রম করেছেন। অবশ্য তাঁদেরও বন্যদশা ছিল, কিন্তু তারিখ নির্ণয় করা আজ সুকঠিন। ভাষার নজীর বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, ইন্দো-ইউরোপীয় নৃ-গোষ্ঠীগুলি বন্যদশা অতিক্রম করে বর্বর দশার উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছে। তাদেরই একাংশ হচ্ছেন বৈদিক আর্যরা। ঋগ্বেদ রচনাকালে আযরা পশুপালন বা কৃষির উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন, এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু ইহাও ঠিক যে আর্যদের যাযাবরত্ব যতদিন বিদ্যমান ছিল, ততদিন তাঁরা প্রধানতঃ পশুপালক ছিলেন। আবার ঋগ্বেদে কৃষির অস্তিত্ব-সূচক প্রমাণ থেকেও বলা যায় তাঁরা কৃষিকর্মও অবগত ছিলেন। শ্রম-বিভাগ তথা শ্রেণী বিভাগও বিকশিত হয়েছে এই কালে, (অবশ্য তারও পূর্বের প্রমাণ হরপ্পা প্রভৃতির নিদর্শন থেকে সুস্পষ্ট) তাব প্রমাণও ঋগ্বেদে বিদ্যমান। অনুশীলন করলে দেখা যাবে, শাসক, যাজক ও কৃষক এই তিন শ্রেণী আদি বৈদিক যুগেই আবির্ভূত হয়েছিল। অতএব ঋগ্বেদীয় সমাজ প্রাগ-বিভক্ত শ্রেণীহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ক্রয়-বিক্রয় এবং বিনিময় প্রথারও প্রচলনও এইকালে হয়েছে। অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তিও আছে। কিন্তু ঋগ্বেদীয় সমাজ-সংগঠনের দিকে দৃষ্টি দিলে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব কতখানি স্বীকার করা যায়—তা' দেখতে হবে। মর্গানের বিবর্তন-ছকে কৌমব্যবস্থার মূল উপাদান হচ্ছে যৌথনীতি, কৌমের বিলোপ হলেই ব্যক্তিতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। তাহলে ঋগ্বেদীয় সমাজ কৌমে বিভক্ত এবং এই সমাজের বিধিবিধান ট্রাইব্যাল হওয়াই উচিত। অন্ততঃ 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' ধ্বনিতেই সেই যৌথ আদর্শ বিঘোষিত।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যাবে, ঋগ্বেদীয় কৌম সংগঠন আদিমতার পর্যায় বহুপূর্বেই অতিক্রম করেছে। এই সংগঠনের সূচক হচ্ছে 'জন'। কৌম কয়েকটি ক্ল্যান বা 'গোত্র'-তে বিভক্ত। অবশ্য ঋগ্বেদীয় গোত্র হচ্ছে গোশালা। গোত্রের পরবর্তী অর্থ কিন্তু 'ক্ল্যান'। ঋগ্বেদীয় ক্ল্যান সম্ভবতঃ কয়েকটি কুল বা পরিবারে বিভক্ত ছিল। ঋগ্বেদীয় কৌমতন্ত্রে যৌথ চেতনাও জাগরুক ছিল, কিন্তু তার পরিধি সীমিত হয়েছিল সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বীকৃত ব্যক্তিগত অধিকারের দ্বারা। এই কালের রাজারা কৌমের উপর কর্তৃত্ব করেন। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রকাশও লক্ষ্য করি। কিন্তু কোন কোন কৌমে আবার রাজা নির্বাচিতও হয়েছেন (বিশঃ রাজানাং বৃণানাঃ)। প্রচলিত ধারণানুযায়ী এই 'রাজন' কে রাজা বলা উচিত নয়, কিন্তু অসম বিকাশ (uneven development) ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। বৈদিক মানুষের কৌমতন্ত্র বেদোত্তর কালেও ছিল। আরও জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করেছে মাত্র। সম্ভবত ভারতীয় ইতিহাসে কোন কালেই কৌমতন্ত্র ও সামন্ত তন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক কৌমতন্ত্রে সামন্ততন্ত্রের শৈশবস্থা-ই প্রকাশ পেয়েছে। ইন্দ্র দেবতার আচরণে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি তান্ত্রিকতা পরিস্ফুট। ব্রাহ্মণ স্পতি হচ্ছেন গণপতি বা একটি গণের পরিচালক, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না। অতএব বৈদিকোত্তর যুগের গণসংগঠনে কৌমতান্ত্রিক পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর কতখানি অস্তিত্ব ছিল—সেটাও দেখতে হবে। অসম বিকাশের কথা মনে রেখে এই কালের বিভিন্ন গণ ও সঙ্ঘের সামাজিক ব্যবস্থাকে বিচার করে দেখতে হবে। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে, বৈদিকোত্তর যুগের কৌমরাষ্ট্রকে সম্মুখে রেখে ঋগ্বেদীয় কৌম সংগঠন বিষয়ক আলোচনা করা গেলেও কোনরকম সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে না। ঋগ্বেদীয় কৌমে সম্ভবতঃ রাজতন্ত্রই সুপরিচিত রীতি এবং উচ্চকোটির শ্রেণী ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছে। আঞ্চলিক কৌমতন্ত্রের পরিবেষ্টনীতে উন্নততর সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় উপনিষদের ব্রহ্মবাদ এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তি। একথাও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। মহাবীর ও বুদ্ধ কৌমের নামেই পরিচিত। মহাবীর জ্ঞাতৃক-পুত্র বা জ্ঞাতৃক-কৌমের মানুষ, গোত্র 'কাশ্যপ'। বুদ্ধ শাক্যপুত্র বা শাক্য-কৌমের মানুষ, গোত্র হচ্ছে গৌতম। বর্তমান আলোচনা থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, ঋগ্বেদীয় আর্যদের কৌমতন্ত্রকে আমরা আদিমস্তরে সন্নিবেশিত করতে পারি না। কারণ আর্য-বিশ্বাসের ছন্দোবদ্ধ বিবরণ রয়েছে ঋগ্বেদে। আর এই সাহিত্যসৃষ্টি কোনও আদিম নৃগোষ্ঠীর কাছে প্রত্যাশিত নয়। বিবর্তিত যে সংস্কৃত সাহিত্য তাও ব্রাহ্মণ, তাদের পৃষ্ঠপোষক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-চিহ্নিত মানুষের সৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন, ঋক-মন্ত্রে উল্লিখিত 'পুরাণী-গাঁথাই উত্তরকালের সঙ্কলিত পুরাণগুলির আদ্যরূপ। পূর্বেই শতপথ ব্রাহ্মণ-এ 'ইতিহাস' ও 'পুরাণ'-এর উল্লেখ দেখান হয়েছে। অতএব রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের জনশ্রুতিগুলি ঋগ্বেদীয় কালের সমসাময়িক। ঋগ্বেদে উল্লিখিত কয়েকজন রাজার নামও পুরাণে সংরক্ষিত। সেকারণে, বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ঋগ্বেদীয় ও তৎপরবর্তীকালের বিষয়। পুনরায় মধ্যপ্রাচ্যের মিতানীদের সঙ্গে ঋগ্বেদীয় আর্যদের সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা আজ সুপ্রমাণিত। মিতানীদের লিপিজ্ঞান ছিল এবং রাজতন্ত্রও সেখানে প্রচলিত। অতএব তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ঋগ্বেদীয় আর্যদের সাংস্কৃতিক স্তর উন্নতই ছিল। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য যে ঋগ্বেদের প্রাচীন ও অর্বাচীন অংশগুলির মধ্যে কালের ব্যবধান যথেষ্টই

বিদ্যমান। কিন্তু অর্বাচীন রচনার অন্তর্ভুক্ত নাসদীয় সূক্ত, পুরুষসূক্ত, দেবীসূক্ত, বিবাহ সূক্ত প্রভৃতি যে ধরণের মানসিক উৎকর্ষ সূচিত করেছে তার জন্য প্রস্তুতি বহু পূর্ব থেকেই হয়েছিল; অবশ্যই ভারতের মানুষের ইতিহাস অনুশীলনকালে তার পরিচয় যথাযথরূপে প্রকাশ করতে হবে। দেখতে হবে, কিভাবে স্থানীয় পরিবেশের দ্বারা বৈদিক আমলে এবং উত্তরকালে নিয়ন্ত্রিত বিবর্তন ঘটেছে। দেখতে হবে বহু দেববাদ থেকে অদ্বৈতবাদের দিকে চিন্তার পরিণতি, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম থেকে বৌদ্ধ-ধর্মের উৎপত্তি প্রভৃতি ঘটনা। এগুলি তো বিবর্তনেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু পুনর্জন্মবাদের মধ্যে বাস্তবিকই কতখানি বহিঃপ্রভাব রয়েছে, আদৌ আছে কিনা তাও অনুশীলন করতে হবে।

ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে আর্য-গোত্র সংগঠন বিষয়ে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ-যোগ্য। বৈদিক সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। প্রথম দিকে ব্রহ্ম, ক্ষত্র ও বিশ—এই তিন শ্রেণীর অবস্থান অনুমান করা যায়। ব্রহ্ম—পুরোহিত, ক্ষত্র—শাসক এবং বিশ—কৌম-গত কৃষক, বা শিল্পী জনসাধারণ। পরবর্তী কালে শূদ্র বা দাস-শ্রেণীর অভ্যুদয়। এই শ্রেণী বিভাগ কর্ম বা জীবিকাগত, জন্মগত নয়। বর্ণ হচ্ছে জন্মগত সামাজিক বিভাগ। বৈদিক সমাজে জন্মগত জাত সম্ভবতঃ ছিল না। আদিতে ক্ল্যান-গোষ্ঠীতে কর্ম-গত শ্রেণীবিভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বৈদিক আমলে ঠিক জন্মগত জাত হিসাবে বিবেচিত হত না। কোন কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বর্ণে প্রবেশ করত। ক্ষত্রিয়েরাও ব্রাহ্মণবর্ণে প্রবেশ করত। এই ব্যবস্থা শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই পরিচায়ক। আদিতে ক্ল্যান-সংগঠনে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে অনুপ্রবেশ ঘটত। ঋগ্বেদীয় ক্ল্যানই উত্তরকালে গোত্র-রূপে প্রকাশিত। এই ক্ল্যান সংগঠন জন্মগত বর্ণ ভেদের পূর্ববর্তী সামাজিক ব্যবস্থা। বৈদিক আমলে শেষভাগে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতাও শুরু হয়। এগুলিই class -struggle-এর প্রাথমিক যুগ। গোত্র-ব্যবস্থাও ঐ জন্মগত বর্ণভেদের পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থা। কিন্তু বর্তমান কালের গোত্র পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ একেবারেই ভিত্তিহীন।

আর্য বিস্তৃতি সম্পর্কে অনুশীলনকালে কিভাবে তাঁরা বাস করতেন, দেখতে হবে। অনুশীলন করতে হবে কিম্বদন্তী। যজুর্বেদীয় বসতি স্থাপনকারীরা কোন অবস্থায় রয়েছে। পূর্বাভিমুখে আর্যদের অগ্রগমন ট্রাইব বা কৌম ও রাজবংশের লক্ষণ ও প্রকাশ কিভাবে হয়েছে। নূতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের কারণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাইরে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর আচার আচরণ, খাদ্য-উৎপাদন পদ্ধতি এবং বাণিজ্য-প্রভৃতিও অনুশীলন করতে হবে। নূতন পদ্ধতি খাদ্য-উৎপাদন ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বেশি মানুষ জন্মালেও পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করা যায়—জন্মসংখ্যা বৃদ্ধি পায় —সে-সব বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুশীলনের সুযোগ কতখানি, এ প্রশ্নের সমাধান অবশ্যই কাম্য।

বৈদিক আমলের শেষ দিকে আর্যদের মধ্যে নগর-জীবনের সূচনা হয়েছিল, প্রাপ্তব্য তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়। ঋগ্বেদীয় কাল হতেই দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যা-গণনা, জ্যোতিষচর্চা, পদ্যছন্দের সঠিক ধারণা, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি সূচিত হয়েছে। উর্বরতা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি আদিম সমাজে হলেও সে সম্পর্কে বিচার প্রবণতা দেখা দিতে পারে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের একটা বিশেষ উন্নত পর্যায়ে, বৈদিক

সাংস্কৃতির মান নির্ণয়কালে এই বিষয়গুলি উপেক্ষিত হতে পারে না। মূলতঃ বৈদিক সমাজে কৌমতন্ত্র, শ্রেণীবিভাগ, ম্যাজিক-বিশ্বাস ও দেবতত্ত্ব একসঙ্গে জটপাকিয়ে রয়েছে। অগ্র-পশ্চাতের প্রশ্ন উঠলে বহু অসঙ্গতি প্রকাশ পাবে। কৌমতন্ত্রের মধ্যে দর্শন তত্ত্ব প্রত্যাশিত নয়; তাহলে উপনিষদকে উপেক্ষাই করতে হয়, কারণ উপনিষদ রচয়িতারা গোত্রের মাধ্যমে পরিচিত। ঋগ্বেদে দেবতত্ত্বর প্রাধান্য সুবিদিত অথচ পরবর্তী গ্রন্থ অথর্ববেদে ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাসের প্রাধান্য। স্থানীয় পরিবেশের বিষয়গুলি উপেক্ষা করে জয়সওয়াল প্রাচীন ভারতের গণ-রাষ্ট্রগুলির মাঝে গ্রীকনগর রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করেছেন। ইতিহাস চর্চারক্ষেত্রে এই ধরণের সরলীকরণের প্রবৃত্তি অবশ্যই বর্জনীয়।

আর্যদের পর কালানুক্রম অনুযায়ী কিভাবে 'একরাষ্ট্র'-র উদ্ভব হল, দেখতে হবে। গ্রাম্য অর্থনীতির গঠন-পর্যায়ে প্রথম ভারতীয় সাম্রাজ্য 'মৌর্য'দের পরিচয় কি। সমসাময়িক সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে অন্য কোনও রাষ্ট্রের পরিচয় প্রকাশ সম্ভব হয় কি না। ভারত সম্পর্কীয় গ্রীক-বিবরণীও আলোচিত হওয়া উচিত। অশোকের সমাজ-সংস্কার, দেশের অর্থনৈতিক পরিচয় প্রভৃতি লিপি অনুশীলন করে প্রকাশ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দেশের উচ্চকোটির দ্বারা লিখিত বিভিন্ন দান-পট্টলি অর্থাৎ তাম্রলিপি, শিলালিপি প্রভৃতি সমাজের শাসক তথা সুবিধাভোগীদের তদীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে লিখিত হলেও মানুষের জীবন তথা ভৌগলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস অনুশীলনক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। তার ভিতর থেকেই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বৃহত্তর মানবজীবন সম্পর্কে (সম্পূর্ণ না হলেও) বহুল তথ্য আহৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও অনুশীলন করতে হবে। যাই হোক, অর্থশাস্ত্রের যথার্থতা বিচার করতে হবে। দেখতে হবে প্রাক-অশোককালীন রাজ্য ও শাসন, শ্রেণীর গঠন, উৎপাদনের ক্ষমতা। মৌর্যদের পর কৃষক সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস কিরকম ছিল, শ্রেণী ও গ্রাম, মনুস্মৃতি, ধর্মের বিবর্তন তথা পরিবর্তন সমসাময়িক ধর্মীয় শিল্পকলার সামাজিক পরিচয়; উৎপাদক গোষ্ঠীর পরিচয় ও অবস্থা, বাণিজ্য, সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক কাজ-এর পরিচয় প্রকাশ করতে হবে। আমরা জানি, চতুর্থ চতুর্বর্ণ বিভাগ শ্রেণী সংগঠনের প্রকাশক। মনু থেকে দেখতে হবে—বিভিন্ন শ্রেণী সমাজে কোন কোন সুযোগ-সুবিধা পেত, কি ধরণের বৃত্তি ছিল। বাণিজ্যপ্রধান নগরের উচ্চকোটি মানুষের চিন্তাধারার পরিচয় ও সামাজিক মূল্য জাতক-গল্পগুলির কতখানি, বিচার করতে হবে।

উপরের পর্যায় থেকে সামন্ততন্ত্রের কিভাবে আবির্ভাব হয়েছে তা অবশ্যই অনুশীলন যোগ্য। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে, সম্রাটদের অধীনস্থ একাধিক স্থানীয় শাসকও ছিল এবং এইসব অধস্তন শাসকরা অনেকেই গোষ্ঠীর প্রধান (tribal chief)। এইকালে গ্রাম্য ও বর্বর জীবনে বিবর্তন তথা অগ্রগতি (বৃদ্ধি) হয়েছিল কিনা, গুপ্ত ও হর্ষদের কালে ভারত, ধর্ম ও গ্রাম্য বসতির অগ্রগতি তথা পরিচয় কি—তা প্রকাশ করতে হবে। ভূমি'র ক্ষেত্রে সম্পত্তি-বিষয়ক কি চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে, গ্রাম্য শিল্প ও কারিকর (শ্রম শিল্পী) প্রভৃতি জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ, অবশ্যই তার দিকে দৃষ্টি হবে। পর্য্যালোচনায় প্রত্যক্ষ হবে বড় বড় নগরের বিলুপ্তির মাধ্যমে নূতন নূতন বন্দর-নগরীর উত্থান ও রাজধানীতে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ। পার্শ্ববর্তী রাজতন্ত্রের পতনের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় যে

বিবাদ করত তা শশাঙ্কের আমলের ঘটনাপঞ্জীর বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট হবে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় হল গ্রাম্য সংস্কৃতি এইকালে বিশেষভাবে স্থানীয় খাদ্য সংগ্রাহকদের উপর ছাপ ফেলেছে।

সামন্ততন্ত্র শক্তিশালী হলে শাসক ও মানুষের রীতিনীতির বিবর্তন হয়। প্রয়োগ হয় একাধিক বিধিনিষেধ। সামন্ততন্ত্র হয় বণিকের পৃষ্ঠপোষক, সৃষ্টি হয় সামন্ত-তান্ত্রিক ভূ-স্বামীর একাধিক শ্রেণী। আর এই শক্তিই রাজা ও প্রজার অন্তর্বর্তী প্রকৃতই মূল শ্রেণী। বাণভট্ট বা ঐ শ্রেণীর লেখকের রচনা থেকে যে ভূমির অধিকার বা রাজার তাতে কর্তৃত্ব সম্পর্কে বিশেষ কিছু আমরা পেতে পারি না তার কারণ উচ্চকোটির ক্ষত্রিয় পর্ষদ ও ব্রাহ্মণরা কৃত্রিম ভাষার আশ্রয়ে রচনা করেছেন তাঁদের গ্রন্থ। বৃহত্তর 'জন'দের কথা রচনার সুযোগ তাঁদের ভাষায় কোথায়? যাই হোক, গুপ্তদের শক্তির উৎস কোথায়? গোষ্ঠী বা শ্রেণী সম্প্রদায়ের দ্বারা তা সংরক্ষিত ছিল কি না—ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অবশ্যই তা' দেখতে হবে।

কোনও প্রাচীন লিখিত নথী তথা পুঁথির বিবরণ থেকে অন্ধভাবে জন-জীবনের চিত্র প্রকাশ করাতেও ভুল তথ্য প্রকাশের সম্ভাবনা যথেষ্ট। কুলপঞ্জী তথা ঘটকারীকা'র উপর অতিরিক্ত আস্থাবান নগেন্দ্রনাথ বসুর রচনার মূল্য আধুনিক বিদ্বানেরা কিভাবে নস্যাৎ করেছেন, তার কাহিনী আমাদের সুবিদিত। বিভিন্নকালের মুদ্রা কেবল ধাতুজ্ঞান ও শিল্পরীতি সম্পর্কেই মানুষের পরিচয় প্রকাশ করে না, রাষ্ট্রের এবং পরোক্ষে সাধারণ মানুষের অর্থ নৈতিক বিষয় সম্পর্কেও আলোকপাত করে। অতএব এইসব কালের মানুষের ধ্যান-ধারণা, রীতিনিতি এবং অন্যান্যক্ষেত্রে কর্মতৎপরতার প্রকাশ প্রত্নতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, মুদ্রা, লিপি প্রভৃতির প্রমাণ থেকে প্রকাশ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ওঠে—মানুষের ইতিহাস চর্চার সার্থকতা কিছু কি আছে? কিছু কি সেই চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়? এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

ইতিহাসকে দেখবার দুটি ধরণ আছে। স্বল্প-পরিসর কয়েকটি বছর-সংক্রান্ত দলিলপত্র ইত্যাদি সমস্ত নজীর সংগ্রহ করে সীমাবদ্ধ সেই সময়টুকুর একটা প্রামাণ্য বিবরণী লিখবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ হবে তা'খণ্ডিত ও আংশিক। অনুসন্ধিৎসু মানব-মন এতেই তৃপ্ত নয়। সম্পূর্ণ একটি বড় যুগ, দেশ বা সমাজ বিশেষের সম্পূর্ণ ছবি, এমন কি সমস্ত মানবজাতির বিশাল অভিজ্ঞতা নিয়ে অনুশীলনের প্রণবতাও স্বাভাবিক। প্রাপ্তব্য উপাদান ছাড়াও বিশ্লেষণী প্রতিভা, তুলনামূলক আলোচনা এবং কল্পনাশক্তির এখানে প্রয়োজন। কিন্তু, ফিশারের মতে 'ইতিহাস' ঘটনা-পরম্পরার স্রোত মাত্র, তার কোনও রূপ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রমই। আবার টয়েনবি'র মত অনেক ঐতিহাসিক আশা প্রকাশ করেন যে, ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলী এবং তার ফলাফল বিচার করে আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ নির্দেশ করবে। অতএব তাঁরা বিনা বিচারে স্বীকার করেন যে অনুরূপ ঘটনাচক্রের ফলও অনুরূপ হবে। এই মনোবৃত্তির ফলেই একটি মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, 'ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি হয়'। ডঃ মজুমদারের মতে অতি সাধারণ ভাবে এবং আংশিক পরিমাণে হয়ত একথা সত্য' কিন্তু কোনও বিশেষ সমস্যার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য নয়। কোনও জাতি পরাক্রান্ত শত্রুর কাছে কখনও কখনও সহজেই বৈশ্যতা স্বীকার করে। কখনও মরণপণ সংগ্রাম করে, আবার কখনও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। অতএব সুপরিচিত

কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলেই ঐতিহাসিক নজির অনুসারে তার ফলাফল ও অতীতের নির্দেশানুসারে হবে—ইহা স্বীকার করা যায় না। সেকারণে অতীত ইতিহাসের সাহায্যে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করা কেবল কষ্টসাধ্য-ই নয় অবৈজ্ঞানিকোচিত-ও।

'নিঃয়ন্ত্রণ' মতবাদ বলে—পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে মহাকালের সমস্ত ঘটনাই কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায় এবং ইতিহাসের ধারা (অতীত ও ভবিষ্যৎ) অনন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত। আর 'ইতিহাসবাদ' হচ্ছে সেই বিশ্বাস যা' হ'ল—পৃথিবী নিয়ন্ত্রাধীনএবং ইতিহাসের ভবিষ্যৎ ধারা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণবাদকে স্বীকার করলে 'মৌলিক নৈতিক বিচারে অস্তিত্ব থাকবে না, নীতিবোধের মৌলিক ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করা হবে, অতীত সম্পর্কে আমাদের বিচারশক্তি বিকৃত হবে এবং স্বাভাবিক চিন্তাধারার অতি সাধারণ ধারণা ও শ্রেণীকে উপেক্ষা করা হবে।'

শুধু তাই নয়, কার্য কারণ সম্বন্ধীয় নিয়ম স্বীকার করে নিলেও মানবিক জ্ঞান বিষয়ক নিছক কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কারণেই ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা অসম্ভব। কোনও আসন্ন ঘটনাসম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করলে সেই সম্ভাব্য ঘটনা ভবিষ্যৎবাণী দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু ইতিহাস-এর কাজ কেবল মানুষ নিয়ে, আর প্রকৃতি বিজ্ঞান কেবল প্রাকৃতিক তত্ত্ব নিয়ে কাজ করে। অতএব ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎবাণী অবৈধ, কারণ মানবতত্ত্ব বিষয়ক নিয়মাদি নিরঙ্কুশভাবে সর্বত্র গ্রাহ্য নয়। ইতিহাসবাদীরা আরও বলেন, মানবিক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ভবিষ্যৎবাণীর সম্ভাবনাকে স্পষ্টতই সীমান্বিত করেছে। কিন্তু পপার বলেন—"ইতিহাস ধারার এমন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেই যার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎবাণী করা যেতে পারে। সুতরাং ইতিহাসবাদী পদ্ধতির মূল লক্ষ্যই ভ্রান্ত এবং ইতিহাসবাদ ধোপে টেকে না।"(১)

ঘটনার সমস্ত কারণ পরীক্ষিত হয়েছে কিনা তদ্বিষয়ে কখনও সুনিশ্চিত নই বলে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে কার্য করণ সম্বন্ধীয় নিয়মকে আমরা একেবারে বাতিল করতে পারি না। আবার যদি সমস্ত জ্ঞাত পারস্পরিক সম্পর্ককে কার্যকারণ সম্বন্ধীয় নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়, তা হলেও দাবী করা যায় না যে, কার্য কারণ সম্বন্ধের নিয়ম "প্রমাণিত" হয়েছে। সেখানে তখন আবির্ভাব হবে তর্কশাস্ত্রের আরোহণের সাধারণ সমস্যাগুলি। কাজেই কার্য কারণ সম্বন্ধের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।

অতএব আমরা দেখছি, মানবিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ভবিষ্যৎবাণীর পরিধিকে বহুল পরিমাণে সীমাবদ্ধ করেছে। অতীত ইতিহাসের সকল তথ্য সংগ্রহের অক্ষমতা থেকে আংশিকভাবে এই সীমাবদ্ধতার উদ্ভব হয়। কিন্তু সেখানেও এই সক্ষমতাকে জয়ের জন্য চেষ্টা চালানো কর্তব্য। পপার বলেছেন—ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ প্রবণতা (মহাকালে কোন কোন ঘটনার ক্রমাগ্রগতি) লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য কোন নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায় না। আর নিয়মের ভিত্তিতে আমরা বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি, তবে কেবলমাত্র কতকগুলি প্রবণতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না।

বক্ষমান আলোচনা থেকে এই মত প্রকাশ করা যায় যে, ভবিষ্যৎবাণীটাই পরিবর্তনশীল

তার মধ্যে অন্যতম স্থিতিস্থাপক হিসাবে গণ্য হতে পারে। ঐতিহাসিক অতীতকে নিরপেক্ষভাবে জানতে চান। অতীতে যেভাবে ঘটনাগুলি ঘটেছিল, ঠিক সেইভাবেই তিনি প্রকাশ করবেন। কিন্তু মানব-বিজ্ঞান এত জটিল উপাদান দিয়ে তৈরী যে একযুগের সাথে আর এক যুগের কোন বিষয়েই তুলনা করা চলে না। আর ইতিহাস-এ কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই এবং তা থেকে আমরা কোনও "রেডিমেড" শিক্ষাও পেতে পারি না। প্রকৃত প্রস্তাবে, "ইতিহাস" থেকে সমষ্টিগত মানবজীবনে যত সমস্যার উদ্ভব হয়, তাদের বিষয়ে এক ব্যাপক অভিজ্ঞতাই লাভ করি। অতীতের কোনও ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে ঐতিহাসিককে সেইযুগের মানুষ বলে নিজেকে মনে করে তদানীন্তন প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা নিতে হবে। এক কথায় ভূতাত্ত্বিক যেমন ভূগর্ভের স্তর বিশ্লেষণ করে অতীতে পৃথিবীর বুকের ভূতাত্ত্বিক ঘটনাসমূহ যথাযথরূপে প্রকাশ করেন, ঐতিহাসিকেরও কর্তব্য ভূতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিসম মানব-জীবন, তার তৎপরতা আদি মহাকালের বিশাল ব্যাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্থান কাল পাত্রের ঊর্দ্ধে নিরপেক্ষ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকাশ করা। ঐতিহাসিক কতখানি সেই কাজে সফল হবেন, তা নির্ভর করবে তাঁর সতর্ক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে আহৃত তথ্য পরিবেশনের উপর।

১। Sir Esaya : Historical Inevitability (London. 1955) P. 77

বিস্মৃত জননায়ক—রামগোপাল ঘোষ

নারায়ণ দত্ত

"১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের একদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল যে, "গত রবিবারে আমার ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী, দুইজনে একখানা গাড়িতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন; এমন সময় উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয়, এবং উভয়ে খ্রীষ্টান হইবার জন্য ডক্ সাহেবের (মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডফ) বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া, অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সে-বার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ্ সাহেবের নিকটে গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, "আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয়বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খ্রীষ্টান করিবেন না।" কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গতকল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন।" এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল। (১)

"অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিলেন।" এই সাংঘাতিক ঘটনা দেখে, শুনে বিচলিত হয়ে উঠল সেকালের বাঙালী হিন্দুসমাজ। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন দেবেন্দ্রনাথ। তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধ লিখলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ মিশনারীদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা গাড়ী করে' বাড়ী বাড়ী ঘুরতে লাগলেন। মহর্ষি তাঁর আত্মচরিতে লিখছেন—এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ওদিকে রামগোপাল ঘোষ;—আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম।' দেবেন্দ্রনাথের এই উল্লেখ থেকে রামগোপালের সামাজিক পরিচয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজা রাধাকান্ত দেব ও সত্যচরণ ঘোষাল যেমন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা ও হিন্দু আচারে নিষ্ঠাবান্; অপর দিকে ডিরোজিয়ান নব্যবঙ্গের প্রতিনিধি ছিলেন রামগোপাল। এটি ১৮৪৫ সালের ঘটনা।

রামগোপালের এই প্রতিনিধিত্ব কিছু আকস্মিক নয়। বরঞ্চ এক ধারাবাহিক ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়ে—বহু প্রবাহে পরিপুষ্ট হয়ে রামগোপালের এই পরিচয় জাতীয় নবজীবনের মহাসাগরে এসে পরিণতি লাভ করেছিল। রামগোপালের সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক কোন জীবনী নেই। নবযুগের আলোকে তাঁর বিচিত্র কর্মজীবন বিচারের অপেক্ষা রাখে। তবু নানা সূত্রে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তারই ওপর নির্ভর করে এই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে। যতদূর জানা যায়, রামগোপালের—সেকালের নব্যবঙ্গের আদ্যপীঠ—হিন্দুকলেজে পড়বার কোন আশাই ছিল না। রামগোপালের বাবা গোবিন্দচন্দ্র ঐ সব ব্যাপারে রক্ষণশীল ছিলেন। এবং ছেলেকে হিন্দু কলেজে পড়বার মত আর্থিক ক্ষমতাও বোধ করি তাঁর ছিল না তবু একটা নাটকীয় ঘটনার ফলে দেখা

গেল রামগোপাল হিন্দুকলেজের সারি সারি গথিক খিলানের নীচু দিয়ে বই বগলে একদিন পড়তে চলেছেন। রামগোপালের জীবনের ব্রাহ্মলগ্নে এই উল্লেখযোগ্য স্থচনাটি সম্ভব হ'ল যে ব্যক্তির চেষ্টায় তিনি হচ্ছেন কলকাতার স্মলকজেস্ কোর্টের একদা তৃতীয় জজ। নাম হরচন্দ্র ঘোষ। হরচন্দ্র রামগোপালের সম্বন্ধে ভগ্নিপতি। শোনা যায় তাঁর বিয়ের বাসরে কয়েকটা ছড়া কাটা নিয়ে হরচন্দ্র রামগোপালের কাছে হেরে যান। হরচন্দ্র ছেলেমানুষ রামগোপালের এই উপস্থিতবুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যান এবং তার পড়াশুনার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেন। যখন শোনেন যে রামগোপালের পড়াশুনা শারবরণ সাহেবের স্কুলে বা মতান্তরে স্থানীয় কোন পাঠশালায় হচ্ছে, তখন তিনি তাঁর প্রতিভাধর শ্যালকটিকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দিতে বদ্ধপরিকর হন। শোনা যায়, গোবিন্দচন্দ্রের মত করাতে হরচন্দ্রকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অবশ্য রামগোপাল নিজেও ব্যতিব্যস্ত করতে ছাড়েন নি। তবে শেষমেশ রজার্স বলে এক সাহেব কিং হামিলটন কোম্পানীর কর্মচারী—রামগোপালের কলেজের মাইনে দিতে রাজী হলে তবেই তাঁর কলেজে ঢোকার স্বপ্ন সফল হয়। (৪) বলাবাহুল্য রামগোপাল হরচন্দ্রের মান রেখেছিলেন। সেখানে তিনি টপ করে নাম করে ফেলেন এবং ম্লেয়ার সাহেবের নজরে পড়ে যান। তখন আর তাঁর মাইনে লাগে না। ফোর্থ ক্লাসে পড়তে পড়তে তাঁর লেখা একটা প্রতিযোগিতামূলক রচনা পরীক্ষকদের এতই ভালো লাগে যে তাঁরা তাঁর ডবল প্রমোশনের স্থপারিশ করেন। এই সময়ে তাঁর বিশিষ্ট সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় আর প্যারীচরণ দে।

কিন্তু যে বিশিষ্ট মানুষটির সংস্পর্শে এসে এই সময়ে রামগোপালের মনে প্রবল নাড়া লাগে, তিনি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও। এই বিদ্রোহী ডিরোজিওর নেতৃত্বে হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতিকে নিয়ে সপ্তাহে দু'বার করে সাহিত্য সভা হত হরচন্দ্র ঘোষের বাড়ী। এই সভাকেই বিখ্যাত অ্যাকাডেমিক এসোসিয়নের পূর্বসূরী বলা যায়। এই এ্যাসোসিয়েশনের সভা বসত মাণিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়ী। এবং এখানেই আসলে ভারতের ভাবী ডিমোস্থেনিস রামগোপালের জন্ম হয়। এই এ্যাসোসিয়েশন সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মশায় লিখেছেন—'তিনি (ডিরোজিও) রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি প্রিয় ছাত্রদিগকে লইয়া Academic Association নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন; এই সমিতিতে সর্ববিষয়ে স্বাধীনতার মন্ত্র ঘোষিত ও প্রচারিত হইত। রামগোপালের বাল্যবন্ধু রামতনু এ সম্বন্ধে একটা গল্প বলেছেন। বলেছেন যে একবার লকের দর্শন সম্বন্ধে রামগোপাল মন্তব্য করেন যে লকের মাথা প্রবীণের কিন্তু বুলি নবীনের অর্থাৎ আর কি লক মনোবিজ্ঞানের শক্ত শক্ত তত্ত্ব একেবারে জলের মত বোঝাতে পারেন। এই কথা ডিরোজিওর খুব ভালো লাগে। এবং এ থেকেই এই দুই দিকপাল পরস্পর পরস্পরের আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন —একাডেমিক এসোসিয়েশন যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি (রামগোপাল) তাহার সভ্যগণের মধ্যে একজন অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। এইখানেই তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির প্রথম বিকাশ হইল। তিনি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ইংরাজীতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিলেন। এখান হইতেই

তাঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ডিরোজিও ছাড়া এই এ্যাসোসিয়েশনের পিছনে যেসব বিশিষ্ট ইংরেজরা ছিলেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন ডেভিড হেয়ার, ড'ব্লিউ-ড'ব্লিউ বার্ড আর সার্ এডওয়ার্ড রায়ান। এখানেই রামগোপালের একটি বক্তৃতায় বার্ড সাহেব এমনি চমৎকৃত হ'ন যে তিনি ডিরোজিওকে রামগোপালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে বলেন। এবং এইভাবে বাঙলাদেশের ভাবী ডেপুটিগভর্নরের সঙ্গে রামগোপালের পরিচয় ঘটে যায়।

রামগোপালের প্রতিভার উন্মেষ হয় এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশনে। কিন্তু বিকাশ 'সোসাইটি অফ দি এ্যাকুইজিসন অব জেনারেল নলেজ'—বা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জন সভা'য়। এবং এই সভায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এর পিছনে অবশ্য এই অন্তবর্তীকালে রামগোপালের আর্থিক মর্যাদালাভ ও উন্নতির দিকটা অনুল্লেখিত থাকা ঠিক হবে না। বোধকরি, এ'ধারণা করা অন্যায় হবে না, বাঙালী জীবনে সকল অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকল জেহাদের পুরোভাগে রামগোপাল যে দাঁড়াতে পেরেছিলেন, তার পিছনে ছিল তার আর্থিক সঙ্গতি। গরীবের ছেলে রামগোপাল তাঁর পড়াশুনা শেষ না করেই কারবারে ঢুকে পড়েন। তার জন্যে বাঙলাদেশ হয়ত কোন মস্ত 'জিওগ্রাফারকে' হারিয়েছে কিন্তু পেয়েছে লণ্ডন-বার্মা-পর্যন্ত প্রসারিত আর-জি-ঘোষ এণ্ড কোং-এর প্রতিষ্ঠাতাকে। পেয়েছেন সেকালের ক্ষুব্ধ বাঙালী জন মানসের প্রতিভূ রামগোপালকে।

যোশেফ নামে এক ইহুদী সাহেব আসেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য ব্যবসা ফাঁদা। বিলেত থেকে আসবার সময় সেকালের নামকরা ব্যবসায়ী কলভিন এণ্ড কোং-এর মিস্টার এণ্ডারসনের নিকট পরিচয়পত্রও নিয়ে এসেছিলেন। এবং এখানে এসে কোথায় যাই কোথায় যাই ভাবতে ভাবতে সর্ব ঝামেলাত্রাতা ডেভিড্ হেয়ারের শরণাপন্ন হলেন। হেয়ার সাহেবকে বললেন, কলকাতার একজন চালু উঠতি ছেলেকে দিতে। যার উপর তিনি নির্ভর করতে পারবেন। হেয়ার সাহেব ঠনঠনের রামগোপালকে দিলেন। সাহেব জাতে ইহুদী। শুধু কথায় ভেজবার লোক নয়। বাজিয়ে নিলেন। রামগোপালকে বললেন, বাপুহে, একটা কাজ কর দেখি। বাঙলাদেশে জেলা ধরে ধরে কোথায় কি কত উৎপন্ন হয়—কতটাই বা ভারতবর্ষে লাগে কতটা যায় বাইরে তার একটা ফিরিস্তি তৈরী কর দেখি। তখনও রামগোপালের গায়ে কলেজের গন্ধ লেগে রয়েছে। কিন্তু তিনি পেছবার ছেলে নন। শোনা যায়—এমন চমৎকার একটা রিপোর্ট তৈরী করে দেন সাহেবকে, যে সে তো একেবারে তাজ্জব। যাইহোক অচিরে কলুটোলার হরিমোহন সরকার হলেন যোশেফ সাহেবের বেনিয়ান। আর রামগোপাল তার সহকারী।

এইটে সুরু। এবং ক্রমে ক্রমে রামগোপাল যোশেফের এতই বিশ্বাসভাজন হয়ে পড়লেন যে যখন যোশেফ বিলেতে ফেরৎ গেলেন তখন আর কেউ নয় রামগোপালকেই তাঁর কারবারের সর্বময় কর্তৃত্বভার দিয়ে গেলেন। যোশেফ ফিরে এসে কেলসেন সাহেবের সঙ্গে ভাগে কারবার সুরু করলেন। এই নতুন ব্যবসায় বেনিয়ান হলেন রামগোপাল। তবে এই কারবার বেশিদিন টেকেনি। আর যখন ভেঙে গেল রামগোপাল কেলসেনের কারবারে ভিড়লেন। এ'কাজ তিনি নিজের বুদ্ধিতে করেন নি। কয়েকজন সাহেব বন্ধুই খুব সম্ভব তাঁকে এই পরামর্শ দিয়ে থাকবেন। যাই হোক, কেলসরের

বেনিয়ান হিসেবেই রামগোপাল সুদিনের মুখ দেখেন। যাকে বলে একেবারে ফেঁপে গেলেন। যাকে বলে 'রোলড্ ইন প্রসপারিটি'। কালক্রমে রামগোপাল কেলসেন সাহেবের পার্টনার হয়ে পড়েন। নূতন কোম্পানীর নাম হয় কেলসেন এণ্ড ঘোষ কোম্পানী। কয় বছর ঘুরতে না ঘুরতে কেলসনের সঙ্গে রামগোপালের আবার কাটানছেঁড়ান হয়ে যায়।

এরপর রামগোপাল তাঁর নিজস্ব কারবার—আর-জি ঘোষ এণ্ড কোং খোলেন। এই ব্যবসা বাঙালীর লক্ষ্মী সাধনার ইতিহাসে এক বিশেষ পদক্ষেপস্বরূপ। কেননা এর বিলেতে একটা ব্রাঞ্চ ছিল। আকিয়াবেও ছিল। রামগোপালের মৃত্যুর পর তাঁর 'অবিচিউআরি' লেখবার সময় হিন্দু প্যাট্রিঅট (চ'ব্বিশে ফেব্রুয়ারি, আঠারশ' আটষট্টি) এই প্রতিনিধির সম্বন্ধে লেখেন—'দিস ওয়াজ দি ফাস্ট ইনসট্যান্স অফ হাউস অফ বিজিনেশ উইথ ইয়রোপ এসটা'ব্লিশড্ বাই এ নেটিভ অব ক্যালকাটা' এর মূলে অবশ্য ছিল আণ্ডারসেন নামে এক অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর বন্ধুত্ব। তিনিই রামগোপালকে এই প্রতিষ্ঠানটি বিলেতে স্থাপনা করতে সাহায্য করেন।

সেকথা থাক। রামগোপাল যখন আর্থিক উন্নতির এক প্রশস্ত বনিয়াদে দাঁড়িয়ে—সেই সেই সময় মুখ্যত তাঁর এবং তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাধারণ জ্ঞানোপার্জনী সভার পত্তন হ'ল। এই সভার প্রথম অনুষ্ঠান হয়—বাবু রামকমল সেনের দাক্ষিণ্যে তাঁর সংস্কৃত কলেজ হলে বারই মার্চ তারিখে সন্ধ্যা সাতটা। অন্ততঃ তার যে অনুষ্ঠানপত্র সাধারণ্যে বিলি করা হয়, তাতে সে কথা লেখা ছিল। এই অনুষ্ঠানপত্রে কলকাতার বিশিষ্ট মানুষদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় যোগদান করার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান হয়। তাতে সই ছিল : তারিণী বন্দোপাধ্যায় ও রামগোপাল ছাড়া রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রাজকৃষ্ণ দেব। সেই অনুষ্ঠানপত্রে এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সব দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল : Countrymen, Though humiliating be the Confession, yet we can not for a moment deny the truth of the remark so often made by many able and intelligent Europeans, who were by no means inimical to the cause of native improvemvnt, that in no one department of learning are our acquirement otherwise than extremely Superficial……We have never sincerely regretted the want of an institution which should be the means of prompting frequent mutual intercourse among the educated HindOos, and of exciting an emlation for mental excellence.

এই পত্রে দুঃখ করে বলা হয় : There is at present no occasion whereby we are called upon to congregate on an extensive scale for the purpose of mutual improvement and whence we may receive an impetus for applying ourselves to useful studies. Is it not then desirable to unite to such a laudable pursuit by which the bonds of fellowship may be strengthened, the acquision of knowledge promoted and the sphere of our usefulness extended? উনবিংশ শতকের সেই যুগসন্ধিকালে বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সূক্ষ্ম বিকাশসূত্র এইসব বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্টতঃই ধরা

পড়ে। শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক উন্নতির কারণে পারস্পরিক ভাব বিনিময় সৌহার্দেওর বন্ধন দৃঢ়তর করা এবং পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার অবকাশ বৃদ্ধি করা—প্রভৃতি উদ্দেশ্য খোলাখুলি ভাবেই সেদিন লেখা হয়েছিল এবং সকলকে উদ্বুদ্ধ করে ডাকদিয়ে বলা হয়েছিল : We can not believe that in such a cause coldness will be manifested by any person that entertains the best regard for his own improvement or breaths any love for his own country.

এই সভায় রামগোপালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা লালনপালন করে এবং সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় এই সভায় ধর্মকে আলোচ্য বিষয়বস্তু থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে রাখা হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য থেকে খুশি হতে পারেন নি। এবং এই সভার রাজনৈতিক মতামত সেকালের মানদণ্ডে এতই উগ্র হয়ে ওঠে যে কাপ্তেন ডি-এল-রিচার্ডসন পর্যন্ত নাকি বলেছিলেন যে তিনি বিদ্যার এই মন্দিরকে বিদ্রোহের আস্তানা—'ডেন অফ ট্রেজন' হতে দেবেন না। তখন এই সভার অনুষ্ঠান হ'ত হিন্দু কলেজে। আর রিচার্ডসনের এই আক্ষেপোক্তির কারণ—দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্জের একটি বক্তৃতা। সেই সভার নায়ক তখন তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী। সেকালের এই উগ্র রাজনৈতিক মতালম্বী তরুণদের নিয়ে সেকালের ষ্টার কাগজে বহু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হ'ত।

রামগোপালের রাজনৈতিক প্রতিভার প্রজাপতি গুটিপোকার খোলস ছেড়ে পাখা মেলল বোধ করি বালাখানায়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে। অনেকেই জানেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেত থেকে আসবার সময় জর্জ টমসনকে সঙ্গে করে আনেন। ইনি একজন সেকালের লিবারেল নেতা। ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে এর বিদ্রোহ মানবসমাজকে সচকিত করে তোলে। আর এঁকে নিয়েই সেকালের বাঙালীর নতুন রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা দানা বাঁধতে থাকে। শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন—'জর্জ টমসন এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র ডিরোজিওর শিষ্যদল তাঁহার চারিদিকে আবেষ্টন করিলেন। রামগোপাল তাঁহাদের অগ্রগণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।' শ্রীরামপুরের মিশনরী কাগজ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লিখলেন—দেয়ার আর থানডারিং এ্যাট টু এণ্ডস্ এ্যাট বালা হিশার অনন্ত ওয়েস্ট এণ্ড এ্যাট ক্যালকাটা ফৌজদারী বালখানা।'

সে যাই হোক, রামগোপালের রাজনৈতিক ধ্যানধারনা তাঁর বক্তৃতাগুলিতে স্পষ্ট। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ বোধকরি ব্ল্যাক এ্যাকটস এর সমর্থনে তাঁর বক্তৃতা। এর জন্যে তাঁকে সাহেবদের কাছে অনেক হেনস্থা সহ্য করতে হয়েছিল। বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির ভাইসপ্রেসিডেণ্ট ছিলেন তিনি। সাহেবরা চক্রান্ত করে তাঁকে এই পদ থেকে অপসারিত করে। অবশ্য বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সাহেবদের এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করে নিজেই পদত্যাগ করেন। সাহেব সিসিল বীডনও রামগোপালের এই অবমাননার প্রতিবাদ করে এগ্রিকালচার সোসাইটি ছেড়ে দেন।

এখন ব্ল্যাক এ্যাকটস ব্যাপারটা কি? অনেকটা ইলবার্ট বিলের মত। যাকে নিয়ে হেমচন্দ্র কবিতা লিখেছেন—'গেল রাজ্য গেল মান, হাঁকিল ইংলিশম্যান—' অনেকটা তাই। আঠারশ' উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ সালের গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় কতকগুলো খশড়া আইন আসে।

তাতে ভারতবর্ষের সাহেবদের এদেশের কোন লোকদের সঙ্গে মামলা হলে তাদের কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতের আইনে বিচারের সুপারিশ করা হয়। এতে আইনের চোখে কালা ধলার তফাৎ ঘুচিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে দিশী লোকের ইংরেজদের অত্যাচার থেকে রেহাইও 'হতে পারত। কিন্তু হ'ল কই? সাহেবরা তো খাপ্পা! ব্রিটিশ ভারতে ঝড় বয়ে গেল। রামগোপাল দেশবাসীর সমর্থনে এগিয়ে এলেন তাঁর—'এ ফিউ রিমার্কস অন সারটেন ড্রাফট এ্যাকটস কমনলি কল্‌ড ব্লাক এ্যাকটস' প্যাম্পলেটে লিখলেন—I have now to enter into the discussion of the most important feature of the question, namely, the justice and necessity of subjecting Europeans to the jurisdiction of the Mofussil criminal courts.

…Glaring as the injustice may appear, it is but trival when we recall to mind the insults and out rages which the Europeans inflict with impurinty upon his native neighbours whom he emphatically calls the "Black" or the "Niggrs"… (It) is to tell him (the Indian) he must bear and be content that the Englishman is a superior being, that he can not be touched...He is privileged being.

গ্রাণ্ট সাহেব এই পুস্তিকা পড়ে লিখেছিলেন—'উড নট অ্যাট ফার্স্ট বিলীভ ভাট ইট ওয়াজ এ্যান আনঅ্যাডেড প্রোডাকসন অব এ নেটিভ।'

এর পরে এল চার্টার এ্যাক্ট। এটাও ভারতবাসীদের মরণ-বাঁচনের ব্যাপার। শিক্ষিত বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী অধ্যায়। জন কোম্পানী ভারতবর্ষে ও প্রাচ্য খণ্ডে বাণিজ্য করার জন্যে রাজার কাছ থেকে যে চার্টার বা সনদ লাভ করে, ঠিক ছিল, প্রতি বিশ বছর অন্তর পার্লামেণ্টে তা নতুন করে পাশ করিয়ে নিতে হবে। আঠার শ' তেত্রিশ সালে যখন এই সনদ পাশ করান হয় তা নিয়ে বাঙলাদেশে অনেক কাণ্ড হয়ে যায়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই নিয়ে অনেক বক্তৃতা করেন সোরগোল তোলেন। আঠারশ' তেপ্পান্ন সালে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি সার চার্লস উডের নেতৃত্বে আবার যখন সেই সনদ হাউস অব কমনসে-ও পাশ করার পালা এল, এই নিয়ে হুলুস্থুলু বেঁধে গেল কলকাতায়। আর সোরগোল মানেই নবজাগ্রত বাঙালীর তখন সভা করা। উনত্রিশে জুলাই। টাউন হলে বসল সভা। সভাপতি রামকান্ত দেব বাহাদুর। প্রধান বক্তা রামগোপাল। সেকালের কাগজে সেই সভার বিবরণ পড়ে তাজ্জব লাগে। হলের ভিতরেও তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। এমন কি সিঁড়িতে পর্যন্ত লোকে উঠতে পারেনি, এত ভিড়! সারা শহর ভেঙে পড়েছিল। তিন থেকে দশ হাজার লোক জমেছিল সেদিন টাউন হলে।

আর দেশবাসীর, শিক্ষিত বাঙালীর স্বার্থরক্ষার সেই সভায় বক্তৃতা করলেন রামগোপাল। রামগোপাল বললেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কালা আদমীকে ঠাঁই দিতে হবে। সিভিল-সার্ভিসে বাঙালীকে প্রতিযোগিতায় বসতে দিতে হবে। কালা হাকিমদের মাহিনে বাড়িয়ে দিতে হবে। কালক্রমে সত্যেন ঠাকুর প্রমুখেরা যে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার অন্যতম নিয়ামক হতে পেরেছিলেন—বাঙালীর কর্মজীবনে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করতে পেরেছিলেন, সেই বদ্ধদ্বারে

রামগোপালই সেদিন সজোরে কড়া নেড়ে বলেছিলেন, 'খোলো দ্বার'। রামগোপালের বক্তৃতা এতই সারগর্ভ অথচ মনোগ্রাহী হয়েছিল যে অমন ঠাণ্ডা স্বভাব স্থির মানুষ রামকান্ত দেব বাহাদুরও তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে রামগোপালকে বুকে না জড়িয়ে পারেন নি। 'শুধু ঘরে লোক নয়' তাঁর বাগবৈদগ্ধ লণ্ডনের টাইমস কাগজের বিশেষ প্রশংসা কুড়োয়।

অবশ্য এরও অনেক আগে ১৮ শ' চুয়াল্লিশ সালে যখন বড়লাট হার্ডিঞ্জ এডুকেশন রেজলিউশন পাশ করেন যে সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সংবাদ প্রভাকরে লেখেন—'বিজ্ঞবর গভর্ণর জেনারেল শ্রীযুক্ত লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব স্কালার-দিগের নিমিত্ত পরীক্ষা করণের নিয়ম নির্দেশ পূর্বক কলিকাতা গেজেটপত্রে এরূপ ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে 'যে সকল ছাত্র বিলক্ষণরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিবেন, শিক্ষাকৌন্সিলের সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদর্শনপূর্বক কলিকাতা গেজেট পত্রে সেই ছাত্রদিগের নামসকল ছাপাইয়া দিবেন, এবং কোনস্থানে গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন কর্মকারণের পদশূন্য হইলে তাঁহারাই নিযুক্ত হইবেন।' রামগোপাল ও কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিরা ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনে পঁচিশে নভেম্বরের এক সভায় বাঙালীর হয়ে এই আইনকে স্বাগত জানান। এবং হার্ডিঞ্জের যখন বড়লাটগিরি থেকে অবসর নিলেন, সে সময় তাঁর মর্মর মূর্তি স্থাপনের একটা প্রস্তাব এনে বাঙালীর কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেন।

শিক্ষা বিস্তারে রামগোপালের দানও কিছু কম নয়। নিজের পড়াশুনার অসুবিধার কথা মনে করে তিনি নিয়মিতভাবে হেয়ার বা হিন্দুস্কুলে গিয়ে সেখানকার মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার দিয়ে আসতেন। বেথুন স্কুলে তিনি নিজের মেয়ে হেমলতাকে হাতধরে দিয়ে এসেছিলেন। শিক্ষা ছাড়া অবহেলিত অত্যাচারিত দেশবাসী নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারবে না এবং শিক্ষাই যে জাতীয় মুক্তির পথে অন্যতম প্রধান পাথেয় রামগোপাল বার বার সে সত্য জাতির কাছে তুলে ধরেছিলেন। বাঙলা ভাষায় 'ইতিবৃত্ত' রচনার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। তিনশ' টাকা প্রথম পুরস্কার; একশ' টাকা দ্বিতীয়। সে টাকা রামগোপালই দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। উনবিংশ শতকের সদ্যজাগ্রত বাংলার সব কিছু প্রগতিমূলক কাজেই রাগোপালকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়।

কিন্তু রামগোপালের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ছিল কি? বলা বাহুল্য, শিক্ষিত বাঙালীর উন্মুক্ত-কৃপাণ বিদ্রোহবাণী উচ্চারণের তখনও সময় আসে নি। তবু তরুণ গরুড় সম এক মহৎ ক্ষুধার আবেশ তখন তাকে পীড়িত করছিল। ইংরাজী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ডিরোজিও শিষ্য নব্যবঙ্গ তখন তার মানব অধিকার সম্বন্ধে সজাগ। এবং তাই তার দাবী তখন ইংরেজদের সঙ্গে সমানভাবে টক্কর দেওয়া। নানা দিক দিয়ে এক equality। 'ব্ল্যাক এ্যাকট'র ওপর রামগোপালের রচনা থেকে এই সত্য উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। মধ্যপন্থী নরম রাজনীতিজ্ঞ রামগোপাল লিখছেন—

I am induced to take this step not from any vains idea of turning what appears to be the current of public opinion among the independent British Community—not from any feelings of defiance against the energetic demonstrations of Englishmen—much less from any desire of notoriety, but from a

sincere anxiety to place in their true light the opinions I hold, that no misunderstanding may exist among my European friends.

...Let me not be told therefore that I desire to offend them (European); on the contrary I seek and value their support and co-operation.

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে। বাঙালী সমাজের প্রতিনিধি রামগোপাল কোন লড়ায়ে নামতে চাইছেন না; এবং যেটুকু সংগ্রামের সামিল হয়েছেন, তাও লিবারেল ইংরেজদের সঙ্গে নিয়ে। 'আবেদন নিবেদনের' দ্বারা তাঁরা তখন এগোচ্ছেন, যার মূলদাবী হচ্ছে, বিজয়ীরা যেন বিজিতদের সমঅধিকার স্বীকার করে নেন। এই পুস্তিকার শেষে রামগোপাল ভারতবর্ষের উদারনৈতিক ইংরাজ ও বিলেতের সমভাবাপন্ন মানুষদের কাছে এই বলেই আবেদন করেছিলেন—

Will they (Englishmen) read with complacency the sentiment which dictates the proud assertion that unequals shall not be equal. On the contrary, will not the generous and noble sons of Britian feel arhamed of their countrymen of India who are anxious perpetuate an invidious distinction and preserve their exalted positions at the expense of their native fellow subjects.

রামগোপালের জীবনের শেষ বড় বক্তৃতা হচ্ছে নিমতলার শ্মশান রক্ষার জন্যে। সাতই মার্চ। আঠারশ' চৌষট্টি। সোমবার। কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় বক্তৃতা দিলেন রামগোপাল। কলকাতার নিমতলার শ্মশান তোলা চলবে না। তাতে তিনি অনেক জটিল আইনের প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তাঁর বক্তৃতায় যে রাজনৈতিক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, রামগোপালের রাজনৈতিক মানসিকতা বুঝতে সেটা অবশ্যই সাহায্য করবে—

Bewrare how in that place of contentment, you spread discontment far and wide, beware how in the place of that gratitude, you sow the seeds of ingratitude in the hearts of a vast population.

তবে এর মানে এই নয়, দেশের সমগ্র জনসাধারণের দুঃখ, তাদের ওপর নানা অত্যাচার— তাঁরা বুঝতেন না। হার্ডিঞ্জ-এর শিক্ষা সংস্কার-এর পক্ষে বক্তৃতায় তিনি লিখেছিলেন—......

Educate the people and you will find them man fully resisting the oppressions of the Zeminder. Educate the people, and they will cease to be victimised by the Darogas. Educate the people and they will burst those fetters bv which they are now Tramped and trampled upon.

স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, নিগৃহীত দেশবাসীর জন্য বেদনার অভাব ছিল না, বাঙলার সেই বিস্মৃত জননায়কের মনে, কিন্তু যে পথে তাঁরা সেই নিষ্ঠুরতার হাত থেকে খুঁজেছিলেন সেটা মধ্যপন্থীর নরম রাজনীতির!

দীনবন্ধু তাঁর সুরধুনী কাব্যে রামগোপাল সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

প্রবল রসনা রামগোপাল গম্ভীর
স্বদেশ রক্ষার ভীম, সদা উচ্চশির
অসমসাহসে ভরা অন্যায়ের অরি,
সভ্যতার সেনাপতি কল্যাণ কেশরী।

দীনবন্ধুর দেওয়া এই অভিধা, কিছু স্তুতিপাঠ নয়। নানা দিক দিয়ে রামগোপাল ছিলেন স্বদেশরক্ষার ভীম। প্রতাপ মজুমদার মহাশয় তাঁর লেখা কেশব সেনের জীবনীতে রামগোপালকে বলেছিলেন রামমোহনের 'next generation of men,' বলেছিলেন 'was perhaps prominent representive of his class.'

ঠিক তাই। বহুযুগধরে স্বাতন্ত্র্যহীনতার অন্ধকার গুহায় কাটাবার পর উনবিংশ শতকের বাঙালী তখন এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অপমানিত মানবতার জন্য গভীর এক বেদনা বোধ নিয়ে নতুন বাঙালী তখন আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্যে নিজেকে ভাস্বর দেখতে চাইছিল। আর সেই বোধকে রূপ দিয়েছিলেন—নিঃসন্দেহে স্বীকৃত—থিয়োডার ডিকেন্সের 'লিডার অফ দি হিন্দু কমিউনিটি'—রামগোপাল ঘোষ।

উল্লেখপঞ্জী

(১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী

(২) রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

লরেন্স ফষ্টর (চন্দ্রঃ ১।২)

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে লরেন্স ফষ্টর খলচরিত্ররূপে অঙ্কিত হয়েছে। বঙ্কিমের কল্পনা বাস্তবানুগ ছিল। শচীশচন্দ্র বঙ্কিমের জীবনীতে যেসব ইংরেজের আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে কুখ্যাত মরোস সাহেবকে ফষ্টরের কাঠামো ব'লে অনুমান ক'রলে ভুল হয় না।

"বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথাকার ফ্যাক্‌টর বা কুঠিয়াল।" (১।৩)।

শৈবলিনীকে অপহরণকালে ফষ্টরের দুর্বৃত্তসুলভ মনোভাব ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তারপর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ফষ্টরকে হীনবল ক'রে, কাপুরুষরূপে অঙ্কিত করেছেন। রামচরণের গুলিতে সে আহত হয়েছে। দীর্ঘকাল চিকিৎসায় সে সুস্থ হলেও, তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। তার চাকুরিও যায়। ক্রমে সে ইংরেজের শত্রুতা করবার জন্য নবাবসৈন্যদলে যোগ দিতে আসে। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হওয়ায় নবাবের রোষদৃষ্টিতে পড়ে। নবাবের শাস্তিদানের কথা শুনে সে ভীরুর মত আতঙ্কিত হয়। তার চরিত্রে ইংরেজের কোন দৃঢ়তাই নেই। উপন্যাসের শেষদিকে যুদ্ধের কোলাহলে ফষ্টর যেমন উপন্যাস থেকে হারিয়ে গেছে, তেমনি উপন্যাসের প্রথম দিকে ফষ্টর পাঠকের মনে দানা কেটে বসলেও, শেষপর্যন্ত তেমন গুরুত্ব আরোপ করতে পারেনি।

ললিতলবঙ্গলতা (রজনীঃ ১।২)॥

লবঙ্গলতার বাইরে বিষ, কিন্তু হৃদয়ে অফুরন্ত অমৃত সঞ্চিত। সে মুখরা, কিন্তু হৃদয়হীনা নয়। তাই সে রজনীকে 'কানী' বলে যেমন গালাগাল দেয়, তেমনি ডবল পয়সা দেবার বদলে টাকা দিয়ে সাহায্য করে।

লবঙ্গলতার মধ্যে কৌতুকপ্রবণতা একটু অধিক। তাই প্রথম যৌবনে প্রেমমুগ্ধ অমরনাথকে কৌতুক করে চরম শাস্তি দিয়েছিল, পিঠে 'চোর' লিখে দিয়ে। কৌতুক করে বৃদ্ধ স্বামীকে জ্বালাতন করতে বাধে না। স্বামীর চুলে কলপ দিয়ে, নাক ডাকলে ছ 'জোড়া নূপুর পায়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে তোলাই তার স্বভাব, তার আনন্দ।

কিন্তু স্বামীর প্রতি তার কর্তব্যনিষ্ঠার অন্ত নেই। যেহেতু ইহজন্মের মত স্বামীর সংগে তাঁর গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে সেজন্য পরপুরুষে তীব্র অনাসক্তি। এমনকি অমরনাথের বেদনায় তার মন যখন আবেগে তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়, তখনই সে তীব্র কশাঘাতে নিজেকে সচেতন করেছে— সে একজনের বিবাহিতা। কিন্তু তবুও সে অমরনাথকে ভুলতে পারে নি।

লবঙ্গলতা মিত্র পরিবারের গৃহিণী। তাই সম্পত্তি নষ্ট হবার আশঙ্কায় শঙ্কিত। সেই সম্পত্তি বাঁচাবার চেষ্টা করেছে পুত্র শচীন্দ্রের সংগে রজনীর বিবাহ দিয়ে। এর জন্য তার রজনীর গৃহে

যেতেও বাধেনি।

লবঙ্গলতা রজনীর সংগে অমরনাথের বিবাহ বোধহয় সহ্য করতে পারত না। তাই অমরনাথের পূর্বকথা বলে দেবে বলে তাকে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু অমরনাথ যখন নিজেই রজনীকে সে কথা বলবে বলেছে, তখন সে মুগ্ধ হয়েছে। অমরনাথ যখন কলকাতা ত্যাগ করার সংকল্প করেছে, তখন লবঙ্গলতা তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে।

উপন্যাস মধ্যে রজনীর প্রেমিকাসত্তা প্রচ্ছন্ন। প্রধানতঃ সে বাঙালীঘরের বধূ ও গৃহিণী। সর্বোপরি সে মাতা। নিজ পুত্র না থাকলেও বয়স্ক সপত্নীপুত্র শচীন্দ্রের প্রতি তার স্নেহের অন্ত নাই। এই মাতৃমন্ত্র দীক্ষা নিয়েই লবঙ্গলতা দৃঢ়হাতে অমরনাথকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে।

লুৎফ-উন্নিসা (কপাঃ ২।১) ॥
দ্রঃ মতিবিবি।

লেফ্‌টেনান্ট্‌ ব্রেনান্‌ (দেবীঃ চৌঃ ৩।১) ॥
ইনি হরবল্লভের সহায়তায় দেবী চৌধুরাণীকে ধরতে এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ ইংরেজচরিত্র বীরত্বে, ও সাহসিকতায় অসাধারণ। ইনিও দেবীর সামনে যেমন ভয় পান না, তেমনি দেবীর কাছ থেকে বিদায়কালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পথ খরচাও গ্রহণ করেন নি।

শচীকান্ত (কৃঃ উঃ ২।৫) ॥
গোবিন্দলালের ভাগিনেয়। সম্ভবতঃ শৈলবতীর পুত্র। সে গোবিন্দলালের শুষ্ক উদ্যান সজীব করেছিল, এবং ভ্রমরের সুবর্ণময়ী প্রতিমা নির্মাণ করেছিল। গোবিন্দলালের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ও তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করে শচীকান্ত মহত্ব দেখিয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ (রজনী ১।২) ॥
রজনীর প্রেমিকা হিসাবে শচীন্দ্রনাথের গুরুত্ব অধিক। কিন্তু চরিত্র হিসাবে উপন্যাস মধ্যে সে তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারে নি। শচীন্দ্রের বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপ ঐশ্বর্য সবই আছে। সে সাধারণ মানুষের মনোবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। রজনীকে তার ভাল লাগতে পারে, কিন্তু ভালবাসার কথা সে চিন্তাই করে নি। কারণ সে কানা। তাই রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের একটা সহানুভূতি দেখা যায়। রজনীর বিবাহ দেবার চেষ্টাও এই সহানুভূতিরই প্রকাশ।

শচীন্দ্রনাথের মনে সন্ন্যাসীর প্রভাবের দ্বারা যেভাবে রজনীর প্রতি প্রেমের সঞ্চার করা হয়েছে, তাতে এরূপ প্রেমের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। তবে বঙ্কিম প্রথমাবধি শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিলেন। শচীন্দ্র যেই জানতে পারল রজনীই তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তখন তার মনে রজনীর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

শচীন্দ্রের আর একটি গুণ—সে নির্লোভ। রজনীর সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে তাই তার আপত্তি

ছিল না। শচীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতাবোধও কম নাই। অমরনাথের ঋণ সে চিরদিন রেখেছে।

শচীসুত শ্রেষ্ঠী (যুগঃ ১ম পরিঃ) ॥
পুরন্দরের পিতা।

শশিশেখর ভট্টাচার্য (দুর্গেঃ ২।৬) ॥
অভিরামস্বামীর পূর্বনাম। (দ্রঃ অভিরামস্বামী)

শান্তশীল (মৃণাঃ ২।৭) ॥
শান্তশীল নবদ্বীপ রাজদরবারে চৌরোদ্ধরণিক-এর কাজ করে। কিন্তু আসলে সে পশুপতির সাহায্যকারী গুপ্তচর। পশুপতির সে ডানহাতের স্বরূপ। কাজের উপযুক্ত বুদ্ধি সে ধরে। হেমচন্দ্রের মত বীরকেও সে কৌশলে বন্দী করে। পশুপতির মধ্যে তবু ধর্ম ও দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু শান্তশীল নিতান্তই স্বার্থপর চরিত্র। তাই "শান্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে আপন চতুরতা ও কর্মদক্ষতা দেখাইয়া যবনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা শীঘ্রই সে মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল।" (মৃণাঃ পরিশিষ্ট)।

শান্তি (আনন্দঃ ১।১৬) ॥
"শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান।"

শান্তি ছেলেবেলায় পিতার কাছে মানুষ হয়েছে এবং পিতার টোলের ছাত্রদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে এমনকি পুরুষদের মত সে কাপড় পরত। তারপর শান্তির পিতার মৃত্যুর পর, জীবানন্দ তাকে অনুগ্রহপূর্বক বিবাহ করে বাড়ীতে নিয়ে এল। কিন্তু বিবাহের পরও শান্তির পুরুষালি ভাব গেল না। তখন তার ওপর সুরু হল শ্বশুর-শাশুড়ীর নির্যাতন। তার ফলে শান্তি একদিন গৃহত্যাগ করল। সন্ন্যাসীদের সংগে দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়ে, বাইরে বিপদের আশঙ্কা দেখে আবার শান্তি শ্বশুরবাড়ীতে প্রত্যাগমন করল। কিন্তু শাশুড়ী তাকে স্থান দিল না। তবে জীবানন্দ শান্তিকে গ্রহণ করল। সেই প্রথম শান্তি অনুভব করল যে তার "বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিষ।"

এটিকে শান্তি চরিত্রের ভূমিকা বলা যেতে পারে। উপন্যাসটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশের সময়, বা প্রথম কয়েকটি সংস্করণে এ কৈফিয়ত ছিল না। পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিম এটি নূতনভাবে সংযোজিত করেন। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম 'পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে' লেখেন—'তৎসম্বন্ধে (শান্তির সম্বন্ধে) যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া দেওয়া গেল।'

বলা বাহুল্য, উপন্যাস মধ্যে শান্তির যে পুরুষালী কার্যকলাপ দেখান হয়েছে, তা' সাধারণ বধূর চরিত্রে দুর্লভ। তাই বঙ্কিম এই পরিচ্ছেদটি সংযোজিত ক'রে শান্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্যটিকে বিশ্বাস যোগ্য করে তুলেছেন।

শান্তির অশ্বারোহণ, শান্তির যুদ্ধক্ষেত্রের আচরণ, তার নবীনানন্দরূপে সন্তানসেনাগণের মধ্যে বিচরণ ইত্যাদি পুরুষোচিত ভাব আছে। তবে প্রথমদিকে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনাকে বঙ্কিম পরবর্তী সংস্করণে বর্জন ক'রে শান্তির স্ত্রী অভিধাকে অনেক পরিমাণে বজায় রেখেছেন।

শান্তির সঙ্গে জীবানন্দের সম্পর্ককে রহস্যময় বলে মনে হতে পারে। প্রথম দিকে যখন জীবানন্দের সঙ্গে শান্তির সাক্ষাতের পূর্বে নিমাই তাকে সাজাতে বসল, তখন তাকে সাধারণ দুঃখী বাঙ্গালী বধূরূপেই দেখি। স্বামী পরিত্যক্তা শান্তি কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গে সহজ রঙ্গরসে মত্ত হয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে তার দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেল। সে কিছুতেই ঢাকাই শাড়ী পড়তে রাজী হল না। ছেঁড়া কাপড় পড়েই জীবানন্দের সামনে গেল। বোধহয়, স্বামীর অবহেলার অভিমানে সে এ কাজ করেছিল। কিন্তু যখনি জীবানন্দের মতিভ্রম দেখতে পেল, তখনি সে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। কঠোর হস্তে নিজের হৃদয় দৌর্বল্য দমন ক'রে স্বামীকে কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করেছে।

এমনি সর্বত্রই দেখি শান্তি চরিত্রের দু'টি দিক। মনে তার স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি, সংসার করবার সুখস্বপ্ন, কিন্তু বাইরে তার প্রচণ্ড দৃঢ়তা, কর্তব্য কর্মে দারুণ নিষ্ঠা। এই কোমলে কঠোরে শান্তি চরিত্র এত শান্ত রূপিণী।

শান্তি সত্যানন্দকে জানিয়েছে যে সে সন্তানধর্মে দীক্ষা নিয়েছে।—শান্তি 'কেন আমি আপনার দক্ষিণ হস্ত (জীবানন্দ) বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামী সন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী যে ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।' (২১৭)

পরপর উদ্ধৃত উক্তি দু'টি পরস্পর বিরোধি ব'লে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয় শান্তির এই উক্তি বৃহত্তর ধর্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। শান্তি শিখেছে, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে কেমন ক'রে বিসর্জন দিতে হয়। স্বামীর ভুল সে দেখিয়ে দেয়, কিন্তু স্বামীর স্বাধীন চিন্তাকে প্রভাবিত করে না।

শান্তি এবং জীবানন্দ পাশাপাশি থাকলেও তারা কখনো হৃদয়ের কোন দৌর্বল্য দেখায়নি। কিন্তু জীবানন্দের মৃত্যুর পর শান্তি যখন স্বামীর শবদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন বঙ্কিমের সংহত বর্ণনার ভিতর থেকেও এক নারীহৃদয়ের হাহাকার শোনা যায়।

জীবানন্দের পুনর্জীবন প্রাপ্তির পর শান্তি আর গৃহধর্মে ফিরে যেতে চায়নি। সে হিমালয়ের উপরে কুটীর প্রস্তুত ক'রে দেবতার আরাধনায় দিন কাটাবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? আসলে দেশের মঙ্গলকার্যে যারা একবার জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদের পুনরায় সংসারের গণ্ডীতে টেনে আনতে বঙ্কিম চাননি। মহেন্দ্র-কল্যাণীর বিপরীতে বঙ্কিম এঁকেছেন

শান্তি-জীবানন্দকে। উভয় দম্পতিই স্বামী স্ত্রীর আদর্শ। এক দম্পতি সংসারের মধ্যে থেকে দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করেছে, অন্য দম্পতি দেশের কাজের জন্য সংসার-জীবনকে তুচ্ছ করেছে। স্ত্রী-ই স্বামীর পূর্ণ শক্তি। উভয়ের সমন্বয়সাধনেই কর্মজীবনের সফলতা।

এই শান্তিকেই আমরা আবার অন্যরূপে দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে দেখি।

শাহ আলম (রাজ: ৮।৮) ॥
উপন্যাসে নামোল্লেখ মাত্র আছে।

শাহবাজ খাঁ (দুর্গে: ১।৩) ॥
ইনি পাঠান আবিষ্কৃত বঙ্গদেশ উদ্ধার করতে এসেছিলেন বলে উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে।

শাহ সাহেব (সীতা: ১।১) ॥
ইনি একজন মুসলমান ফকির।

শ্যামচাঁদ (সীতা: ৩।৯) ॥
দ্রঃ রামচাঁদ।

শ্যামাসুন্দরী (কপা: ২।৬) ॥
'নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা; তাহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা; কেননা, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।'

শ্যামাসুন্দরী সাধারণ বাঙালীঘরের পরিহাসকুশলা রমণী। তার দুঃখ স্বামী তাকে ভালবাসে না। কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে সে ভালবাসে, তার সুখ চায়, দাদার মনোরঞ্জনের জন্য সে বৌদির অযত্ন রূপরাশিকে সযত্নে মার্জিত করতে চায়!

শ্যামাসুন্দরী এবং কপালকুণ্ডলার মধুর সম্পর্কের মধ্যে সেকালের ননদ-ভাজের ছবিটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীর উপস্থিতির অন্যতর উদ্দেশ্য আছে। শ্যামাসুন্দরী স্বামী পরিত্যক্তা হলেও স্বামীর প্রতি তার আকর্ষণ তীব্র। তাই সে কপালকুণ্ডলার মনোভাব বুঝতে পারেনা। কপালকুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরীর কথোপকথনে তাদের স্বামী সম্পর্কিত মনোবৃত্তির পার্থক্যটি ধরা পড়েছে!

শেষপর্যন্ত শ্যামাসুন্দরীর জন্যই কপালকুণ্ডলার সর্বনাশের পথ প্রস্তুত হল। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করার জন্য মধ্যরাত্রে যে ঔষধ দরকার, কপালকুণ্ডলা তা' এনে দিতে সম্মত হল। এর পরিণাম সম্বন্ধে সংসারবুদ্ধিসম্পন্না শ্যামা যে সচেতন ছিল তা' তার সাবধানবাণী থেকে বোঝা যায়। কিন্তু কপালকুণ্ডলার জেদের মুখে তার যুক্তি ভেসে গেল।

উজবেক কবি-নাট্যকার—উইগান

সমগ্র সোভিয়েতের শিল্প সাহিত্যে যদি উজবেকিস্তানের জায়গা দিতেই হয়, তবে দেখা যাবে তার অধিকৃত এলাকা কম নয়। সে এলাকায় শিল্পের শাখা প্রশাখা সংক্ষিপ্ত নয়, বরং দীর্ঘ প্রসারিত। মূলতঃ এ দেশের শিল্প সাহিত্যে জীবনের তন্ময়গত অর্থকে বড় কোরে দেখা হয়েছে। স্বাদেশিক সমস্যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমস্যার সম্বন্ধ স্থাপন করে একটা নৈয়ায়িক দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে মানুষের জীবন যন্ত্রনার কেন্দ্রীয় শিকড়কে পরীক্ষা করা হয়েছে। মানুষের আলোর পথ এসেছে সেই বিন্দু থেকে।

এই শতকের গোড়ার দিকে উজবেক সাহিত্যে কিছু তরুণ লেখকের আবির্ভাব হয়। তার মধ্যে এ যুগের প্রতিভাশালী উইগান অন্যতম। উইগান ছিল এক মজুরের ছেলে। বারো তেরো বছর বয়সে তিনি উজবেক স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি Tashkent Teachers Training School-এ শিক্ষা লাভ করেন। এর পর গ্র্যাজুয়েট হলেন Samarkand Pedagogical Academyতে ১৯৩০ সালে।

উইগান ছাত্রাবস্থায় প্রথম কবিতা লেখা সুরু করেন। সেই সময় থেকেই তার কবিতার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। উজবেকিস্তানের জীবন প্রবাহে তার উৎসাহ ছিল অদম্য এবং কবিতার মধ্য দিয়ে সে সাধারণ মানুষের পরাক্রমশালী শক্তিকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা Dzhan Temir। এই কবিতাটি এদেশের লোক কাহিনীর উপরে রচিত। তার এই কবিতার নায়ক ছিল এক রাখাল—Dzhan Temir। সে একা, নিরাশ্রয় এবং জীবনের সামান্যতম আনন্দটুকু থেকেও বঞ্চিত। পাহাড়ে সে বছরের পর বছর দিন কাটায় আর ধনী জমিদারের পালিত পশুর পাহারা দেয়। সেখানে আদিগন্ত প্রকৃতি ছাড়া আর কোন বন্ধু ছিল না। তার ব্যথার ভাগী ছিল সেই সবুজ উপত্যকা আর রং বেরংয়ের পাখী।

এই কবিতায় নায়ককে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে মাত্র। কিন্তু সেখানে কবি যেন এক নিভৃত কৌশলে সেই নায়কেরই জায়গায় বসে প্রচ্ছন্নভাবে স্বগত আলাপে ব্যস্ত। সে দেখতে পেলো সমস্ত পৃথিবীজুড়ে এক অবিচারের ঝড় বইছে। সঙ্গে সঙ্গে সে একথাও জানলো যে জমিদার ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম ছাড়া মানবতা, ন্যায় পরায়ণতা, স্বাধীনতা কিছুই বাঁচতে পারে না। এই কবিতার শেষাংশে কবি বর্ণনা করেছেন কিভাবে হাজার হাজার Dzhan Temir সংগ্রামের মুখে এগিয়ে এলো এবং জমিদারকে নিঃশেষ করে নিজেদের অধিকারে নিয়ে এলো সেই দেশকে। সেই অধিকার, মানুষের অধিকার। উজবেক তথা সোভিয়েত সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কৃতি এই Dzhan Temir কবিতাটি। এই কবিতাটি রুশীয় কবি ভিক্টর গুসেভের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছিল। কবিতাটি ঘটনায় প্রাচীন হলেও সারমর্মে আধুনিক।

উইগানের সাম্প্রতিক কবিতাগুলোতে দেখা যায় যে কবি যেন তার সেই উত্তেজনাময় অতীতে ফিরে গেছেন। যেখানে উত্তেজনা ছিল, তবুও যুদ্ধের বিভীষিকা ছিল না। তার অনেক কবিতাই ঐতিহাসিক উপাদানে পরিপুষ্ট। Land of Sun কবিতাটি প্রথম উজবেক মহিলা প্যারাসুটিষ্টকে (বাসারত) নিয়ে লিখেছিলেন। বাসারতের মধ্যে কবি এক উদ্ভিন্ন প্রাণশক্তি লক্ষ্য করেছেন। কেননা তার প্রাণশক্তি ভেঙে দিয়েছিলো অতীতের মরচে পড়া কুসংস্কারকে। উইগান বিশ্বাস করতেন যে সমগ্র সোভিয়েতের যে কোন বিমান চালকের চেয়ে বাসারত কম নয়।

গীতি কবিতা এবং আখ্যানকাব্যও উইগান কম লেখেন নি। যদিও সবগুলো নিরঙ্কুশভাবে সার্থক নয়। কারণ অনেক জায়গায় বাস্তবতা, চরিত্র চিত্রণ বিঘ্ন হয়েছে, তবুও সামগ্রিক বিচারে উইগানের কবিতা উজবেক সাহিত্য ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েতে উইগানের লেখনী ক্রোধে, উত্তেজনায় বেগবান Not a step back কবিতাটি এই সময়কার শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতাটিতে স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং ফাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। এই যুদ্ধের বছরগুলোতে উইগানের কাব্যচক্র টারবাইনের মত তীব্র বেগে ঘুরতে থাকে। যে সব মহিলা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এই চক্রের অনেক কবিতাই তাদের উৎসর্গ করা হয়েছিলো।

উইগান কয়েকটি সার্থক নাটকও লিখেছিলেন এই সময়ে। তার মধ্যে Mother নাটকটি অন্যতম। সেই সংগে ইজাত সুলতানভের সহায়তায় Navoi নামে একটি কাব্য নাটকও লিখেছিলেন।

Navoi নাটকটি ঐতিহাসিক বাগ্ময়তার ফসল। এই নাটকটিতে নাট্যকার একজন কবির এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর এক চিন্তানায়কের ছবি এঁকেছেন। Alislier Novoiর চেষ্টা ছিল সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম করা। কিন্তু তার সেই দেশ হিতৈষী প্রচেষ্টা Shahর কোন সমর্থন পায় না। তাই তার একাই এ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল।

উইগান ও সুলতানভ Novoir প্রণয়ী Guliর চরিত্রটি কাব্যময় করে তুলেছেন। প্রত্যেকটি দৃশ্য এক অত্যাধুনিক শিল্পচেতনার মোড়কে আঁকা হয়েছে। এ নাটকে Guli শুধু কোমল স্বভাবী প্রণয়ীই নয়, তার মধ্যে ছিল এক অসাধারণ বলিষ্ঠতা এবং আত্ম বিশ্বাস। Novoiকে সে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়েছিলো। কিন্তু মৃত্যুতে সে ছিল অপরাজিত। তার গর্ব, সে এক মহান্ কবির জন্য জীবন দিতে পেরেছে।

যুদ্ধের পরে উইগানের কবিতা এক নতুন আসন পেলো। তার বিভিন্ন সংকলন প্রকাশিত হোল : Gift, Uzbekistan, Song of peace, Life calls ইত্যাদি।

তাঁর প্রত্যেকটি কবিতাই এক গভীরচারী অর্থে অনুপ্রবিষ্ট। তাঁর ভাবনা বিস্তৃত কিন্তু কবিতা বিষয়াঙ্গিকে, আবেগে সংক্ষিপ্ত এবং সুমিত।

যুদ্ধের পূর্বেকার নাটক Khurriyat অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। Khurriyat চরিত্রের (যৌথ খামারের এক মহিলা কর্মী) অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এই নাটকের অন্তর্গত গতিশীলতা নাট্যকার অসাধারণ নৈপুণ্যের সংগে সংঘটিত করেছেন। এছাড়া লেনিনের আদর্শের ভিত্তিতে

তিনি Friends নামে একটি নাটক রচনা করেন। Khurriyat নাটকেরমতই এই নাটকে উইগান কতকগুলি সমকালীন প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। Kanial yashen এই নাটককে প্রশংসা কোরে বলেছেন —'মানুষ তন্ময় সাহিত্যে একজন মনের মানুষকে খুঁজে পেতে চায়, তারা গ্রন্থে অথবা মঞ্চে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের দেখতে চায়, অন্ততঃ যাঁরা বলিষ্ঠ উৎসাহী এবং নির্ভীক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার কোরলে উইগানের এই নাটকটির জনপ্রিয়তা, বাঞ্ছনীয়। এ নাটকে Khaidar চরিত্রটি প্রগতিশীল মানুষের সর্বোত্তম গুণগুলো নিয়ে উপস্থিত।'

উইগান উজবেক তথা রুশীয় সাহিত্যের একজন সর্বজন স্বীকৃত কবি নাট্যকার। তার সাহিত্যকর্ম সাধারণতন্ত্রের সাহিত্যমানের সমকক্ষ। সত্যিকারের একজন সোভিয়েত শিল্পী হিসেবে উইগানের সাহিত্যের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

ভবেশ দাস

অন্ধকারের জানালা—বিদ্যুৎ মৈত্র। ৭৮, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। তিন টাকা।

গত দুই শতকের মধ্যে বাংলা কবিতার আদর্শগত ও উপাদানগত অনেক রদবদল হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের ব্যাপকতা এবং শিল্প সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন মানুষের মনকে জটিল থেকে জটিলতর ক'রে তুলেছে। ফলে কাব্য আগে যেখানে ছিলো কেবল সহজ আলঙ্কারিক প্রতিবিম্ব অথবা জীবন ও জগতের গূঢ় ও অগূঢ় রীতিনীতির মানসিক সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া, তখন তা অসংখ্য প্রত্যাশিত চিন্তার ধারার জালে আচ্ছন্ন একই বক্তব্যের বহু-অর্থ সমন্বয়ী এবং অপ্রয়োজনীয় আবেগের বর্জনে সংক্ষিপ্ত। এখন কবিতার অর্থ কেবলমাত্র কবির প্রত্যয় সম্ভারেই সমৃদ্ধ নয় কবিতার নিজস্ব আদর্শ রক্ষা করেও এবং রসের বিবাদী-অনুবাদীর নিয়ম লঙ্ঘন না করেও তা পাঠকের বিভিন্ন ধরনের চিত্তবৃত্তির বাঞ্ছিত অর্থ ও বক্তব্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এখানেই কবিতা আধুনিক, কোন সময়ের পরিমাপ করে আধুনিক নয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অর্থের সীমা লঙ্ঘন করে কবিতা যখন সমষ্টির বিভিন্ন ধাঁচের মনের ভিন্ন-ভিন্ন প্রত্যয় ভাবাপন্ন অর্থের পরিমাপে নিজেকে সাজিয়ে নিতে পারে তখনই তা আধুনিক। এজন্য কাব্যগঠনে অনেক বাহুল্য বর্জন প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে, অনেক বলা-নাবলার মোহাচ্ছন্ন অন্ধকারে তাকে ঢেকে রাখতে হয় এবং বক্তব্যের সন্নিকটস্থ কোন শব্দ বা ভাবের প্রয়োগে ও চিত্রকল্প-শব্দকল্পের ব্যবহারে তাকে আরও গভীর ও পরিব্যাপ্ত অভিব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলতে হয়। এ হ'লো সমকালীন কাব্যধারার একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা। বিদ্যুৎ মৈত্রের 'অন্ধকারের জানালা' নিঃসন্দেহে এ পর্যায়ের কাব্য নয়; আধুনিক ও অনাধুনিক কাব্যের সন্ধিক্ষণের কাব্য মাত্র।

কাব্যগ্রন্থটিতে কবির একই চেতনা প্রবাহিত। সন্তানহীনা পাগলিনী যেভাবে তার হারানো ছেলেকে খুঁজে বেড়ায়, পাবেনা জেনেও খোঁজে, বিদ্যুৎ মৈত্রের কবিতাগুলিও তেমনি হতাশার দীর্ঘশ্বাসে ক্লিন্ন হয়েও আলোকের সন্ধানে তৎপর। তারা যেন অন্ধকারের জানালা খুলে অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে বেড়ায়।

কবি মনোজগতের সন্ধানী, যেখানে থাকে সত্যের উপলব্ধি। কবির ভাষায় সেখানেই আছে এক অপূর্ব পৃথিবী | আর অনন্ত আকাশ | পরম নিঃশ্বাস। কিন্তু বর্তমান বস্তুময় জগৎ ও জীবন ধারা সে সত্যোপলব্ধিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কবির বক্তব্যে তাই আধুনিক বস্তুবাদী জীবনের বিরুদ্ধে নীরব অভিমানক্ষুব্ধ অভিযোগ সুস্পষ্ট। আধুনিক মানসের প্রকৃতি বিমুখতা এবং কৃত্রিমতার প্রতি মানুষের মোহাক্লিষ্ট অনুরাগ কবিকে একান্তই ব্যাথাতুর করে তোলে। কবির অভিযোগ, জীবনের যে সারল্যটুকু মানুষ আর জগতের মধ্যে একসময় ছড়িয়ে ছিলো তা আজ কেবল স্মৃতিতে সীমাবদ্ধ। মেটিরিয়ালিজম্-এর আগমনের ফলে মানুষের মনের এহেন সারল্যবিমুখতায় বিক্ষুব্ধ

কবির বক্তব্য ম্যাথিউ আর্নল্ড-এর 'ডোভার বীচ' কবিতাটি মনে করিয়ে দেয়।

সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিতে রোমান্টিক নস্টালজিয়া পরিস্ফুট।—১। এর চেয়ে ভাল হ'তো ঘুমায়ে পড়িলে | কিংবা ফিরে গেলে | কোন এক সুপ্রাচীন আঁধারে। (সমীক্ষণ)। অথবা, ২। মেলে দিয়ে মন | খুঁজে পাবো খুঁজে খুঁজে | হৃদয়ের বন | সেখানেতে নেই থাক | টারম্যাক। (আর এক পৃথিবী)।

মোট দ্বিচত্বারিংশ কবিতার সংকলনের মধ্যে বিশেষভাবে নির্বাচিত কয়েকটি বাদ দিলেও 'অন্ধকারের জানালা' নাম কবিতাটি প্রশংসনীয়। 'বিশল্য করণী'র মধ্যে বৌদ্ধ উপকথা অ্যালুশন থাকায় কবির অভিব্যক্তি পূর্ণ প্রস্ফুটিত।

ছন্দের ক্ষেত্রে কবির পয়ার প্রীতি গ্রন্থের প্রায় সমগ্র শরীর জুড়ে। ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে তাঁর মানসিকতা কেমন যেন উদাসীনতায় অবসিত। গ্রন্থনা সাধারণ।

শোভন গুপ্ত

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপলোক ॥ রামজীবন আচার্য। প্রকাশক : শ্রী মঞ্জু আচার্য ; কালিন্দী, মেদিনীপুর। মূল্য : সাত টাকা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্যক্‌ভাবে পরিচয় সাধনের জন্য বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় তথ্য এই সব শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে আছে ভারতীয় বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ। ভারতের সমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থই রচিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। এর দ্বারা অনুমান করা সম্ভব হয় যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যেমন সুপ্রাচীন তেমনি সুবিশাল কিন্তু এই ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ঐকান্তিক প্রয়াস বাংলা ভাষায় তেমন লক্ষ্য করা যায় না। অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ যে সমুন্নতির পর্যায়ে সমাসীন সেজন্য জননীস্বরূপা এই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কাছে তার ঋণের তুলনা নেই। আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস পাশ্চাত্য ভাষায় দুর্লভ নয়। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সমূহের তত্ত্ব গভীরতা, কবি কালিদাসের কাব্য-নাটকাদির রস-মদিরতা ও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অলৌকিক আধ্যাত্মিকতায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গভীরভাবে অভিভূত হন এবং সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন করে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের রূপলোক ও ভাবলোক সাধারণ্যে উদ্ঘাটন করেন। ম্যাকসমূলার, ম্যাকডোনেল, কীথ্, ভিন্টারনিৎস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের রচনাকর্মই তার সাক্ষ্য দেয়। অথচ ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে সে তুলনায় সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন অতি সামান্যই হয়েছে যা আমাদের লজ্জায় সংকুচিত করে।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকশ্রেণীতে সাম্মানিক বাংলা ও ঐচ্ছিক বাংলার অন্যতম পত্র

হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অবশ্য পাঠ্যরূপে অনুমোদিত হয়েছে। অতি বিলম্বে ঘটলেও সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দৃষ্টিপাত অভিনন্দনীয়। ফলে, বাংলা ভাষাভাষী অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস জানার কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। কিছু সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক বাংলাভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এই ব্রত-সাধনার ফসলস্বরূপ অধ্যাপক রামজীবন আচার্য আমাদের উপহার দিয়েছেন 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপলোক' গ্রন্থটি। সুদূর বৈদিককাল থেকে সুরু করে বিংশ শতাব্দীর বর্তমানকাল পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচিতি প্রদান করেছেন। অধ্যাপক আচার্য্যের গ্রন্থটি যেভাবে আলোচিত হয়েছে তা নিম্নরূপ : বৈদিক সাহিত্য। মহাকাব্য : রামায়ণ মহাভারত। পুরাণ সাহিত্য। গ্রন্থকাব্য। ঐতিহাসিক কাব্য। গদ্যকাব্য। চম্পূ সাহিত্য। উপাখ্যান সাহিত্য। গীতিকাব্য। দৃশ্যকাব্য—নাটক। সংস্কৃত সাহিত্যের নারীকবি ও তাঁহাদের কবিতা। অলংকার ও সাহিত্যতত্ত্ব। দর্শন। বিবিধ। গ্রন্থটি ছাত্রদের উপযোগী করে বিশেষভাবে লিখিত হলেও সাধারণ পাঠক সমাজও এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন এবং প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের একটি আনুপূর্বিক পরিচয় যে লাভ করবেন সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গ্রন্থটি সুধীসমাজে সমাদৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

অধীর দে

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 February '69 (0'50) Central Regd.No. 2602/57 SAMAKALIN

ষোড়শ বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৭৫

সমকালীন

মেয়েদের
ত্বক-সৌন্দর্যের
গোপন রহস্য

প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিহার্য
কুসুম-কোমল, পাপড়ি-পেলব, যৌবন সুলভ, লাবণ্যময় ত্বক—
এইতো সাধনা বিউটি ক্রীমের সবচেয়ে বড়ো অবদান
সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশপত্র

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্রের ভূতপুর্ব
অধ্যাপক।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

খাঁটি জিনিস চান?

তাহলে এগমার্কা দেওয়া জিনিস কিনুন।

যাঁরা খাঁটি জিনিস চান তাঁরা সব সময়েই ঘি, মাখন, তেল, মধু, মসলা এবং কৃষিজাত অন্যান্য জিনিস কেনার সময় এগমার্কা দেওয়া জিনিসই কিনতে চান।

গত বছর প্রায় ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের দুগ্ধ ও কৃষিজাত দ্রব্যাদিতে এগমার্কা দেওয়া হয়।

৮২ কোটি টাকারও বেশী মূল্যের এগমার্কা দেওয়া দ্রব্যাদি রপ্তানি করা হয়।

সুসজ্জিত পরীক্ষাগারগুলিতে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার পর সরকার থেকে এই সরকারি গ্যারান্টি এগমার্ক দেওয়া হয়।

এগমার্ক—গুণ ও বিশুদ্ধতার নিদর্শন

68/482

Statement in Form IV of the Registration of News papers (Central) Rules, 1956.

SAMAKALIN

1.	Place of Publication	Calcutta.
2.	Periodicity of its Publication	Monthly.
3.	Printer's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
4.	Publisher's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringeee Road, Calcutta.
5.	Editor's Name	Anandagopal Sengupta.
	Natianality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
6.	Name and address of individuals who own the newspapers and partner or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Anandagopal Sengupta. *Proprietor.* 24, Chowringhee Road. Calcutta-13.

I, Anandagopal Sengupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd.) A. G. SENGUPTA.

Dated, 1st March, 1969. *Signature of Publisher.*

ষোড়শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ফাল্গুন তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ডাঃ কালিদাস নাগ

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী কলিকাতার অপর দিকে শিবপুরের (হাওড়া) এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে কালিদাসের জন্ম হয়। কালিদাসের বাল্যকালেই তাঁর পিতা মতিলাল নাগ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। মতিলাল কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত ছিলেন, এই জন্য বাল্যকাল হইতেই কালিদাস রবীন্দ্রনাথের স্নেহস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য পান। শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌সটিটিউশন হইতে এণ্ট্রান্স ও কলিকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে বি-এ পাশ করার পর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কালিদাস ইতিহাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ইহার পর কালিদাস স্কটিশচার্চ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কলেজে যুবক কালিদাস অধ্যাপকরূপে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহলে গ্যালে শহরের মহীন্দ্র কলেজে অধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়া কালিদাস সিংহলে যান। দুই বৎসর পর তিনি ইউরোপে যান এবং গবেষক-ছাত্ররূপে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার জন্য প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় অতি প্রসিদ্ধ। এখানে কালিদাস ডাঃ সিলভাঁ লেভি, ব্লুমফ্ প্রভৃতি দিকপাল ভারতবেত্তা পণ্ডিতদের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন। প্রায় চারি বৎসর এখানে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট্' অর্জন করেন। ফরাসী ভাষাও তিনি ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ও প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি'র উপর তাঁর গবেষণা নিবন্ধটি ফরাসী ভাষাতেই লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল (Les theories diplomatiques et l' de l inde ancienne et l'arthacastra, Paris, 1923)। তরুণ কালিদাসের এই গবেষণা নিবন্ধটি ডাঃ সিলভা লেভি প্রমুখ প্রবীণ ভারত-বিদ্‌দের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করিয়া ছিল। প্যারী

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট্' পাওয়াতে কালিদাসের পক্ষে উচ্চ বেতনে অধ্যাপকের চাকুরী লাভের পথ প্রশস্ত হয়, ইউরোপের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই ভাল চাকুরী পাইবার সম্ভাবনাও ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কালিদাসকে চিনিতেন, তিনি কালিদাসকে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি" বিভাগে লেক্চারার পদ নিতে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস তাঁহার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সার আশুতোষের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। দেশে ফিরিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী গ্রহণ করেন। তিরিশ বৎসরের অধিক কাল এই পদে সমাসীন থাকিয়া ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়া তাঁহার যে আর্থিকক্ষতি হইয়াছিল তাহার জন্য কালিদাস কোনো দিন ক্ষুব্ধ বোধ করেন নাই। কালিদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ও ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার এই পরিচয়টি তাঁহার বিরাট কর্মচঞ্চল মহিমান্বিত জীবনের ভগ্নাংশ মাত্র।

কালিদাস যখন প্যারীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখন জেনেভায় আন্তর্জাতিক নৈতিক কংগ্রেসে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব তাঁহাকে দেওয়া হয়, এই কংগ্রেসে তাঁহার ভাষণের বিষয় ছিল "Humanisation of history" (জুলাই-আগষ্ট, ১৯২২)। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কালিদাস সুইজারল্যাণ্ডের লুকার্ণোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সংসদে ও প্যারীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক কংগ্রেসেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ফ্রান্সে অবস্থানকালে ডাঃ নাগ বিখ্যাত ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর স্নেহ লাভ করেন। রোলাঁকে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করার কার্যে কালিদাসের অনেকখানি প্রভাব ছিল। রোলাঁ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধী জীবনীগুলি সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলি রচনায় রোলাঁ তাঁর নাগ ভাইএর (Brother Nag) প্রেরণাই শুধু পান নাই, সহায়তাও পাইয়াছিলেন একথা তিনি স্বীকারও করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় কালিদাসের ইউরোপে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথও ইউরোপ ভ্রমণ করেন, অনেক স্থানে কালিদাস কবির সঙ্গী ছিলেন। এই সময়ে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ এবং বিশ্বভারতী লাইব্রেরীর জন্য ফরাসী ভাষায় পুস্তক সংগ্রহ করার জন্যও কালিদাস বহুপরিশ্রম করেন। প্যারী বাসের সময় কালিদাস রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন (Cygne 1923)।

দেশে ফিরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর কালিদাস বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক প্রবাসী-মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যা সুলেখিকা শ্রীমতী শান্তা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

১৯২৪ এর এপ্রিল-জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ চীন ও জাপান ভ্রমণ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত এই দুই দেশের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সৌহার্দ্য পুনঃ স্থাপনই কবির অভীষ্ট ছিল। কবির আহ্বানে কালিদাস তাঁহার এই সাংস্কৃতিক যাত্রার সাথী হন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতেই কালিদাসের এই ভ্রমণের ব্যবস্থা সাধিত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের বিষয় অবলম্বনে কালিদাস পরে একটি পুস্তক রচনা করেন। (Tagore in China & Ceylon, 1944)। কবিগুরু তাঁহার

চীন-জাপান ভ্রমণ শেষ করিয়া অন্যান্য সঙ্গী সহ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কবির আশীর্বাদ ও অনুমতি লইয়া কালিদাস ইন্দো-চীন ও ইণ্ডোনেশিয়ার অর্থাৎ প্রাচীন চম্পা, কম্বোজ, শ্যাম, জাভা, সুমাত্রা ও বালি-দ্বীপ ভ্রমণে বহির্গত হন।

সুদূর অতীতে বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার ও প্রভাবের বিষয়টি প্রধানতঃ ফরাসী, জার্মান ও ডাচ্ ভারত-বিদ্‌দের আপ্রাণ চেষ্টায় উদঘাটিত হইয়াছে। সিলভ্যাঁ লেভি এইসব পণ্ডিতদের মধ্যমণি। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কালিদাস প্রাচীনভারতের ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্টহন, লেভির শিষ্যত্ব তাঁহার প্রাচীন ভারতের পুরাবৃত্তের প্রতি আকর্ষণ আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিল। ইউরোপের নানা প্রত্ন সংগ্রহশালায় দ্বীপময় ভারতে প্রাপ্ত ভারতীয় সভ্যতার নানা নিদর্শন কালিদাসের পূর্বদৃষ্ট ছিল। দ্বীপময় ভারত ভ্রমণকালে এইসব দেশের ভারত প্রভাবিত পুরাকীর্তিগুলি এবং জনমানসে ভারতীয় প্রভাবাশিষ্টের নিদর্শনগুলি দেখিয়া কালিদাস বিস্ময়াভিভূত অবস্থায় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দ্বীপময় ভারত-প্রত্যাগত প্রিয় অন্তরঙ্গ শিষ্য কালিদাসের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণ শুনিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই দেশ গুলি দেখার জন্য অধীর হইয়া পড়েন এবং ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গী সহ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই দেশগুলি দেখিয়া আসেন। এই ভ্রমণের ফলে কবির নিকট হইতে বঙ্গসাহিত্য "জাভা যাত্রীর পত্র" ও কয়েকটি অনবদ্য কবিতা লাভ করিয়াছে।

দ্বীপময় ভারত ভ্রমণান্তে এইসব দেশ এবং চীন, জাপান, মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রসার ও প্রভাব সম্বন্ধে নানামুখী চর্চার উদ্দেশ্যে কালিদাস ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন সমধর্মী বন্ধুর সহযোগিতায় বৃহত্তর ভারত পরিষদ (Greater India Society) নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের 'পুরোধা' বা সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি মনীষিরাও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ উপেন্দ্র ঘোষাল, ডাঃ বিজন রাজ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নিরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী প্রভৃতি ধুরন্ধর পণ্ডিতবৃন্দও অতি উৎসাহ সহকারে এই প্রতিষ্ঠানভুক্ত হন। বৃহত্তর ভারত পরিষদের উদ্যোগে বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ইহারা সকলেই উল্লেখ যোগ্য গবেষণা করেন এবং এইগুলি নিবন্ধ অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পরিষদের উদ্যোগে "জার্ণাল অফ্ দি গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি" নামে একটি তথ্যবহুল সাময়িক পত্র ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের সম্পাদনায় দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, কালিদাস ছিলেন এই জর্ণালের যুগ্ম-সম্পাদক। এই পত্রিকায় ডাঃ নাগের বহু মূল্যবান রচনাও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকার অন্যান্য ঐতিহাসিকের লেখা নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধ ডাঃ নাগের লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধের সঙ্গে ডাঃ নাগের "Greater India (১৯৬০) পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। ভারত বিদ্যাচর্চার বহু উপাদান এই বইটি হইতে প্রাপ্তব্য। "বৃহত্তর ভারত পরিষদ্" প্রতিষ্ঠার পর ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ নাগকে "বৃহত্তর ভারত" বিষয়ে বক্তৃতার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। এই উদ্দেশ্যে কলিদাসকে ভারতের নানা প্রান্তে যাইতে ও ভাষণ দিতে হইয়াছিল। বৃহত্তর ভারত পরিষদ্ স্থাপনের ফলশ্রুতি রূপেই আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে এসম্বন্ধে পঠন

পাঠনের ব্যবস্থা হয়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে "রাসবিহারী ঘোষ ফেলোশিপ" বৃত্তি লইয়া কালিদাস ইউরোপ ও আমেরিকায় যান। এই ভ্রমণের মধ্যে কালিদাস কিছুদিন জেনেভায় লীগ্ অফ নেশন্সের সহায়কের (Collaborator) কাজ করেন। পরে তিনি নিউ ইয়র্কের আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক অধ্যাপক (Visiting Professor) নিযুক্ত হন। ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের সময় কালিদাসও তাঁহারসঙ্গে থাকিয়া বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে তাঁহার সহায়তা করেন। নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালিদাসের অধ্যাপনার বিষয় ছিল "ভারতীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতি"। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি হারভার্ড, ইয়েল, কলম্বিয়া, পেনসিলভেনিয়া শিকাগো প্রভৃতি ১৫টি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রশান্ত মহাসাগরে সংলগ্ন দেশগুলিতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার ও প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

দুই বৎসর বিদেশে অধ্যাপনান্তে দেশে ফিরিয়া কালিদাস আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তারপর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় আন্তর্জাতিক পি, ই, এন্ কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া তিনি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হাওয়াই (Hawai) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিভাগ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি "হিন্দুধর্ম" সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এই সময় তিনি ফিলিপিন বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই বৎসরই তিনি হনলুলুর Pan-Pacific Union এর অন্যতম ন্যাস রক্ষক (Trustee) মনোনীত হন। ১৯৩৮ এ ডাঃ নাগ অষ্ট্রেলিয়ার সিড্নী শহরে ব্রিটিশ কমন ওয়েলথ্ কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কয়েক বৎসর তিনি দেশেই ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে শত্রু জাপানের সহিত মিত্রতা সন্দেহে বৃটিশ সরকার কালিদাসকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখেন। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কালিদাস কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির 'সেক্রেটারী' পদের দায়িত্ব ভার বহনকরেন।

১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে মিনেসোটার হিলফাউণ্ডেশন পরিচালিত এশীয় সভ্যতা সংস্থার পরিদর্শক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কালিদাস আবার আমেরিকায় যান। দেশে ফিরিয়া ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জাপান যান এবং স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিরূপে জাপানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সংসদে যোগদান করেন। জাপান হইতে পূর্বদৃষ্ট দ্বীপময় ভারত আর একবার ভ্রমণ করিয়া সিঙ্গাপুর মালয়ের পথে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার কিছুদিন পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৫ পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও কর্মজীবন হইতে কালিদাস অবসর গ্রহণ করেন নাই। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে কালিদাস "ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর লিবারেল ক্রিশ্চিয়ানিটি এণ্ড্ ফ্রীডম্" প্রতিষ্ঠান আয়োজিত বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের যোগদানের জন্য শিকাগোয় গিয়াছিলেন। এখানে ধর্মসম্মেলনের একটি শাখায় তাঁহাকে সভাপতির আসনে বরণ করা হইয়াছিল। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে U. S. S. R. Academy of Sciences এর আমন্ত্রণে ডাঃ নাগ মস্কো শহরে অনুষ্ঠিত International Congress of Orientalist এর পঞ্চবিংশ

অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন।

ডাঃ নাগের বিশ্ব পরিক্রমার উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুধাবন করিয়া দেখা যায় যে তাঁহার ভ্রমণ শুধু ইউরোপ আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা এক বা একাধিকবার ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, সিংহল, মালয়, জাভা, সুমাত্রা, বালি, ফিলিপিন, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া এমনকি আফ্রিকারও নানাস্থানে তাঁহার যাতায়াত ছিল। প্রায় তিনযুগ ধরিয়া পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণের দ্বারা ডাঃ নাগ ঐ সব দেশের ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে ভারতবর্ষের শিল্পকলা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাণী প্রচার করেন। শুধু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথাই তিনি প্রচার করেন নাই, রামমোহন রবীন্দ্রনাথ গান্ধী প্রভৃতি নবীন ভারতের যুগপুরুষদের মর্মবাণীও তিনি বিশ্ববাসীর কাছে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল তখন ভারত সম্বন্ধে বহির্বিশ্বে এই প্রচার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন পররাষ্ট্রে মৈত্রী বন্ধনে কালিদাসের এই অক্লান্ত বিশ্ব পর্যটনও বিশেষ শুভ-কর হয়। ভারত পরাধীন থাকা কালে ভারতের বাহিরে ভারতের মর্যাদাবৃদ্ধির জন্যে বিদেশে ভ্রমণ ও বক্তৃতাদির দ্বারা জনমত গঠনে কালিদাসের ন্যায় তাঁর সমকালীন আর দুই বাঙ্গালী সন্তানের প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য। এই দুই জনের মধ্যে একজন পরলোকগত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, আর একজন বর্তমানকালের জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন ইঁহারা পরাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক রাজদূতরূপে বিদেশে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন।

ভারতের সভ্যতা যে বিছিন্ন একটি সভ্যতা নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার একটি বিশেষ অভিব্যক্তি, তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া কালিদাস এই ধারণাটি লাভ করেন। সমগ্র বিশ্ব ভারতের ঘনিষ্ঠ হইবে এবং ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের আত্মীয়তা লাভ করিবে এই আদর্শের রূপায়নে কালিদাসের জীবন নিয়োজিত হইয়াছিল। ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মৈত্রী দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ডাঃ নাগ কিছুকাল 'India and the world' নামে একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা পরিচালনা করেন (1932) দেশ বিদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি মূলক অনেক আলোচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রোঁলার ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত মনীষিরাও এই পত্রিকার লেখক ছিলেন।

কালিদাস কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সবিশেষ স্নেহপাত্র ও আস্থাভাজন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারাকে যাঁরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কালিদাস ছিলেন সেই মুষ্টিমেয়দের অন্যতম। দেশের মধ্যে এবং বিদেশে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে তাঁর সাধনা অক্লান্ত ছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কবির সপ্ততিবর্ষ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। এই উপলক্ষ্যে কবির উদ্দেশ্যে বিশ্বের মনীষীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি পূর্ণ যে পুস্তকটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তাহার পশ্চাতে ডাঃ নাগের পরিকল্পনা ও যথেষ্ট পরিশ্রম ছিল (Golden Book of Tagore, 1931)। কবির জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবেও তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল। কালিদাস গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারও স্নেহলাভ করেন। গান্ধীজীর অহিংস নীতি প্রচারেও তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। কালিদাস শুধু রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর আদর্শ প্রচারের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই। অতীত ভারতের বেদ, উপনিষদ রামায়ণ, মহাভারত, হইতে আরম্ভ করিয়া একালের

রামমোহন, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ ও কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহামানবদের ভাবনাগুলিরও তিনি প্রচারক ছিলেন। চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন হইতে আধুনিক ভারতের প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা এবং চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন্ প্রভৃতির কথাও তিনি বহির্বিশ্বে প্রচার করেন। বিদেশের আলবেরুনি, আভিসেনা প্রভৃতি মধ্যযুগের জ্ঞান সাধকদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সেক্সপিয়র, মলেয়রে গেটে, রোলাঁ প্রভৃতি মনীষীদের সাধনার সঙ্গে তিনি দেশবাসীকে যুক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন নানাস্থানে প্রদত্ত বক্তৃতার মাধ্যমে এবং "মডার্ণ রিভিউ" "ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ওয়ার্ল্ড" ও "প্রবাসীতে" লিখিত রচনার মাধ্যমে। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে রোলাঁর যে বিপুল জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা তার পশ্চাতে ছিল কালিদাসের রোলাঁর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। পুরোমাত্রায় স্বদেশপ্রেমিক হয়েও ডাঃ নাগ ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। ভারতের অনুগত নাগরিক হয়েও তিনি ছিলেন বিশ্বনাগরিক। ভারতসাগরের তীরে বসিয়াই যেন তিনি সপ্তসিন্ধুর কলরোল শুনিতেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যেখানে যাহাকিছু মহৎ ও সুন্দর কালিদাস তাহা উপভোগ করিতেন এবং সকলকে সেই আনন্দের ভোজে নিমন্ত্রণ জানাইতেন। বক্তৃতা ও রচনা ছিল তার আধার। কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা তাঁর উদার ও মহৎ ভাবনাকে খণ্ডিত করিতে পারে নাই।

পৃথিবীর নানা দেশের এবং ভারতবর্ষের নানা পত্র পত্রিকায় ডাঃ নাগের লেখা অজস্র রচনা বিকীর্ণ হইয়া আছে। তাঁহার লেখা পনরটিরও অধিক পুস্তক আছে। যে সব রচনার কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে সেগুলি ব্যতীত বাকী কয়েকটির মধ্যে এই নামগুলি উল্লেখযোগ্য Tolstoy and Gandhi 1950, Art and Archaeology abroad 1937, India and the Pacific world 1941, India and the Middle East 1954 New Asia 1947, Discovery of Asia 1957, স্বদেশও সভ্যতা (২৫ শ সং—১৯৬১, সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ প্রভৃতি। উপরিউক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত Discovery of Asia গ্রন্থে ডাঃ নাগের বিশ্বসভ্যতায় এসিয়ার দান সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত মূল্যবান আলোচনা আছে। বর্তমান কালের গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি ইহাতে পরিবেশিত হইয়াছে, এশিয়া সভ্যতার নিদর্শক উপকরণগুলি কিভাবে কোথায় রক্ষিত আছে এই পুস্তকে তাহারও উল্লেখ আছে। বার বার এশিয়া মহাদেশের নানা প্রান্তে পর্যটন করিয়া এশীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কালিদাস কি প্রভূত পরিমাণ তথ্য ও জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। কালিদাসের পরিণত জীবনের সাধনা প্রসূত Discovery of Asia বইটিকে এশীয় সভ্যতার একটি "বিশ্বকোষ" বলা যাইতে পারে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা আমন্ত্রণ, ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্বৎসংস্থার অধিবেশনে সভাপতির পদ লাভ ব্যতীত কালিদাস তাঁহার জীবনে নানা সম্মানে ভূষিত হন। ফরাসী একাডেমির সদস্যত্ব লাভ পৃথিবীর যে কোন মনীষীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, কালিদাস এই সম্মান লাভ করেন। স্বদেশের এশিয়াটিক সোসাইটির তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯৪২-১৯৪৬)। স্বাধীন ভারতের রাজ্যসভায় তিনি রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য ছিলেন (১৯৫২-৫৭)। রাষ্ট্রনায়ক ও ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতিদ্বয় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, প্রভৃতি কালিদাসকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ১৯৩৭ এ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল

নেহেরুর উদ্যোগে দিল্লীতে যে এশিয়ান রিলেসন্স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাহার কার্যক্রম নির্দ্ধারণে জওহরলাল কালিদাস নাগের সর্ববিধ সহায়তা গ্রহণ করেন। বিশ্বের বিদ্বৎ মণ্ডলীতেও ডাঃ নাগের একটি বিশিষ্ট সম্মানের আসন ছিল।

ডাঃ নাগের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল তাঁহাদের পক্ষে বলা বড় কঠিন যে মানুষ কালিদাস বড় ছিলেন না পণ্ডিত কালিদাস বড় ছিলেন। প্রিয়দর্শন ডাঃ নাগকে দেখা মাত্রই দর্শকের মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদ্রেক হইত আর পরিচয় হওয়া মাত্রই পরিচিত জন তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ মিত্র সুলভ ব্যবহারে আকৃষ্ট হইতেন। মানব-প্রেমিক কালিদাসের ভদ্র ব্যবহার ছিল অকৃত্রিম, বাহ্যিক ছদ্মবেশ নয়। ছাত্র অথবা গবেষক তাঁহার কাছে সাহায্যার্থী হইয়া কখনও হতাশ হইতেন না, নিজে কোন কারণে সাহায্য করিতে অক্ষম হইলে যিনি সাহায্য করিতে পারেন তাঁহার কাছে সাহায্যার্থীকে পাঠাইয়া দিতেন, যিনি সাহায্য করিতে পারেন তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া দিতেন, অথবা নিজেই যোগাযোগ করিতেন। সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনে কেহই তাঁহার কোন রকম সাহায্য চাহিলে তিনি সাধ্যমত এমনি সাহায্য দিতেন। গবেষক, সাহিত্যিক ও ছাত্রদের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ ছিল, ইঁহাদের উৎসাহ দিতে তাঁর ক্লান্তি ছিলনা। বাঙ্গলার প্রবীণ-নবীন বহু সাহিত্যিকের তিনি পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন, নিজে সাধারণ অর্থে সাহিত্যিক না হইলেও দেশের ও বিদেশের কথা ও কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। তথ্য ও পাণ্ডিত্যের চাপে তাঁহার রসবোধ শুষ্ক হইতে পারে নাই। ডাঃ নাগের মধ্যম ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র কল্লোল গোষ্ঠীর একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। ইঁহার অকাল মৃত্যু হয়। গোকুল নাগের সতীর্থদের অনেকেই আজ বাঙ্গলা সাহিত্যের মহারথী। ইঁহারা সকলেই ডাঃ নাগকে অগ্রজের সম্মান দিতেন। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কালিদাসের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বাঙ্গলা ভাষাতেও তিনি সুলেখক ছিলেন।

কবিগুরু তাঁহার একটি কবিতায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন "বীর্য দেহ, ক্ষুদ্র জনে না করিতে হীন জ্ঞান" কবির এই আকাঙ্খা ডাঃ নাগেরও ছিল। তাঁহার নিকট কেহ 'ক্ষুদ্র' ছিল না—সকলকেই তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। শিক্ষক সমিতির পাণ্ডা, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, সভাসমিতির উদ্যোক্তা, সমাজ ও জন কল্যাণ মূলক সংস্থার কর্মী এমনি সব বিভিন্ন আদর্শের মানুষকে নানা বিধ সাহায্যের জন্য কালিদাসের গৃহে আসিতে দেখা যাইত। নিরভিমান, উদার হৃদয় কালিদাস নাগ সাধ্যমত সকলেরই প্রার্থনা পূরণ করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকা কালে কালিদাস অনেক দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের আর্থিক সাহায্য এমনকি আহার বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সভাসমিতির আহ্বান ডাঃ নাগ গুরুতর শারীরিক পীড়ার কারণে ছাড়া অন্যকারণে প্রত্যাখ্যান করিতেন না। দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিমূলক সকল প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণকে কালিদাস নিজের নৈতিক কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। আচারে আচরণে এবং মানসিকতায় ডাঃ নাগের মত স্বাধীনতা সম্পন্ন বিদগ্ধ পুরুষ সমাজে অল্পই দেখা যায়। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর দক্ষিণ কলিকাতায় অবস্থিত রাজা বসন্ত রায় রোডস্থ নিজ ভবনে ডাঃ কালিদাস নাগ পরলোক গমন করেন।

কবি ও নাট্যকার ভারতেন্দুর বাংলা পদ

রামবহাল তেওয়ারী

'বণিকের মানদণ্ড' রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল সর্বপ্রথম বাঙলায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নবালোকে প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পেরেছিল বাঙালীর মানস-লোক। উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই বাঙালীর চিন্তা-জগৎ কর্মজগৎ এবং ভাবজগতে পশ্চিমের ঢেউয়ের সুস্পষ্ট আঘাত অনুভূত হতে শুরু করে। এই অনুভূতির বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের মধ্যভাগে। বহুসংখ্যক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের-মৃদুমধুর, তীক্ষ্ণ-তীব্র আলোকচ্ছটায় বাঙালীর হৃদয়-আকাশ ভাস্বর এবং সুশোভিত। বিশেষ করে বাঙালীর সাহিত্য যেন স্বর্ণযুগের দ্বারদেশে এসে পৌছে গেছে। এই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয়দশক পর্যন্তও হিন্দী সাহিত্যাকাশে পাশ্চাত্যের নবালোক-স্পর্শ ঘটেনি। সাহিত্যের প্রবাহ পুরোনো খাদেই ঘুরে ঘুরে যেন হাঁফিয়ে উঠেছে। সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনও যেন নিঃস্তরঙ্গ এবং গতানুগতিক। এই সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থারও সঠিক প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটেনা, কারণ সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশেষ কোনো যোগই ছিল না। সুতরাং বলা যায়—পাশ্চাত্য-শিক্ষা সভ্যতা ও সাহিত্যের প্রভাবে বাংলায় যখন কাব্য নাটক ও উপন্যাস সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে দ্রুত পরিবর্তিত মানুষের চিন্তাধারার প্রতিফলন সুস্পষ্ট করে তুলেছে, হিন্দী-সাহিত্য সরোবর তখনও নিঃস্তরঙ্গ। প্রাচীন ভাবধারা মধ্যযুগের সমৃদ্ধির স্মৃতিকে সম্বল করে সাহিত্য-রথের রশি আঁকড়ে ধরেছিল। সাহিত্যের না ছিল গতি না ছিল মুক্তি।

খ্রীষ্টিয় ১৮৬৫ অব্দ। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক, মধুসূদনের কাব্য ও নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের প্রবাহ সমন্বিতভাবে বাংলাদেশে অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, বাঙালীর জীবনে এনে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা। সব-মানার দল সাধাধাণ মানুষের মনের সংস্কারের ভিতেও লেগেছে নাড়া। এই সময় এক মাহেন্দ্রক্ষণে হিন্দী-সাহিত্যের আধুনিকতার অগ্রদূত ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটল। ভারতেন্দুর পূর্বপুরুষদের মধ্যেও কারও কারও সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতেন্দুর জন্ম হয় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে কাশীতে। তাঁর পূর্বপুরুষগণ দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন এবং মুঘল আমলে সাহাজানের দ্বিতীয় পুত্র শাসুজার সঙ্গে তাঁরা তৎকালীন বাংলার রাজধানী রাজমহলে এসে বসবাস করেন। পরে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে উঠে আসায় তাঁরা মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। তাঁর বংশধরেরা শেষে কাশীতে উঠে গিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। এই বংশের উত্তরপুরুষ গোপালচাঁদ ছিলেন একজন কবি। এই কবির সন্তান হলেন হরিশ্চন্দ্র। (১) অল্প বয়সেই মাতৃপিতৃহীন হয়ে বালক হরিশ্চন্দ্র বিমাতার শাসনে-তাড়নে বড় হচ্ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিবারটি তীর্থ পর্য্যটনে বের হয়ে বাংলাদেশ হয়ে জগন্নাথপুরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বিমাতার সঙ্গে বিবাদের ফলে কিশোর হরিশ্চন্দ্র বর্ধমানের নিকট

হলেন দল ছাড়া। কৌতূহলী মন নিয়ে বালক হরিশ্চন্দ্র বর্ধমান রাণীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল পদব্রজে ভ্রমণ করে বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি এবং বাংলার সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যতটুকু পরিচিত হলেন, তা তার বিস্তৃত পরিচয়লাভের স্পৃহাকে প্রজ্জ্বলিত করতে সাহায্য করল বিশেষভাবে। এই সময় বাংলা ভাষায় লেখা উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'বিধবা বিবাহ নাটক' বইটি বালকের চোখে পড়ে। সম্ভবতঃ নাটকের নামটি বালকের মনে এমনই অদম্য কৌতূহলের উদ্রেক ঘটায় যে, সম্পূর্ণ অ-জানা ভাষায় লেখা হলেও বালকটি বইটি কিনে ফেলে এবং আরও আশ্চর্যের বিষয়—সে অপরের বিনা সাহায্যেই আন্দাজে অক্ষর ঠিক করে পুরো নাটকটি পড়ে ফেলে। এই নাটকের পাঠ হরিশ্চন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি এবং ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাওয়ার জন্য উদগ্রীব করে তুলল। ঐকান্তিক সাধনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় অচিরেই হরিশ্চন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন ভালো পাঠক এবং বোদ্ধা হয়ে উঠলেন। নবীন বাংলা সাহিত্যের প্রগতিতে তাঁর মন হল বিস্ময় বিমুগ্ধ। বাংলার জনমানসের নবজাগৃতি তাঁর হৃদয়কে করল অভিভূত। হিন্দী সাহিত্যের প্রাচীনধর্মিতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং কূপমণ্ডূকতার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তুলনা করলেন বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের। হিন্দী সাহিত্য জগতে বাংলার মতো প্রগতিশীল সাহিত্যধারার অভাব বালকের মনকে নাড়া দিল। এই অভাব পূর্তির সাধনায় তিনি ব্রতী হলেন। তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনেই (৩৪ বৎসর ৪ মাস : জন্ম ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৫০ ও মৃত্যু ৬ জানুয়ারী ১৮৮৫) হরিশ্চন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অনলস প্রচেষ্টায় হিন্দী সাহিত্যের মননে চিন্তণে বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং প্রকাশভঙ্গীতে নূতনত্ব বিধান করলেন, ভাষাকে করলেন যুগোপযোগী—সুন্দর সার্থক এবং মধুর। হিন্দীকবিতার বাহন 'ব্রজভাষা'কেও প্রাচীন অব্যবহার্য শব্দভার থেকে মুক্ত করে, তার জড়ত্ব ঘুচিয়ে সরল প্রাণবন্ত এবং গতিশীল করে তুললেন। সাহিত্য সাধারণ মানুষের বস্তু হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষ ও সাহিত্যের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল এতদিনে তার অবসান ঘটল।

হিন্দী সাহিত্যে আধুনিকতার অগ্রদূত ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র তাঁর প্রতিভা এবং কর্মকুশলতার সাহায্যে হিন্দী সাহিত্য জগতে যে যুগান্তর আনলেন তার প্রেরণার মূল লৎস বাংলা সাহিত্য—একথা বলাই বাহুল্য। বাংলা নাটকের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয়। বাংলা নাটকের ভাব-ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী তাঁকে এমন প্রভাবিত করে যে, বাংলা নাটকের অনুবাদের সাহায্যে তিনি হিন্দী সাহিত্যের উন্নতিবিধানকল্পে সর্বপ্রথম অগ্রসর হন। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কাব্য-কাহিনী 'বিদ্যাসুন্দর' অবলম্বনে রচিত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের সুললিত হিন্দী গদ্যে অনুবাদ প্রকাশ করলেন হরিশ্চন্দ্র ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই অনুবাদ কর্মের জন্য সম্ভবতঃ তিনি 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যকাহিনীটি পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে অনূদিত নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় একটি উক্তি স্মরণীয়, 'বাংলাদেশে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সুপরিচিত।... প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় এই কাহিনীটি নিয়ে বাংলাভাষায় একটি কাব্য লিখেছেন, তাঁর কাব্যটি এত উপাদেয় যে, বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তার সঙ্গে সুপরিচিত। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই কাব্যটি অবলম্বন করে যে নাটকটি রচনা করেন তারই ছায়া অবলম্বনে আজ থেকে পনের বৎসর আগে এই নাটকটি রচিত হয়েছে।" বাংলা নাটকের ছায়ানুকরণের কথা বলা হলেও নাটকটি যে

একটি সুন্দর অনুবাদ কর্ম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে নাটকে ব্যবহৃত গানে ছায়ানুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। এর পর তিনি কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাংলা নাটক 'ভারতমাতা' হিন্দীতে অনুবাদ করেন, 'ভারতজননী' (১৮৭৭) নাম দিয়ে। এই ধরণের তৃতীয় অনুবাদ হল একটি প্রাচীন বাংলা নাটকের অনুবাদ 'সত্য হরিশ্চচন্দ্র'। বাংলা নাটক ও প্রহসন পাঠের ফলে হরিশ্চন্দ্রও যে সমাজ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তা বুঝতে পারা যায় তাঁর বৈদিকী 'হিংসা হিংসান ভবতি' এবং 'অন্ধের নগরী' প্রহসন দুটি থেকে। এ দুটি প্রহসন রচনার প্রেরণা তিনি সম্ভবতঃ মধুসূদন দত্তের 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন দুটি থেকে পেয়েছিলেন। হিন্দী সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি ও নাট্যকার ভারতেন্দুর কবিতার একদিকে বৈষ্ণবপ্রেম-প্রবাহ বিদ্যমান অপরদিকে নাটকে ও প্রহসনে সমাজ-সংস্কারকের ভাবটিও সক্রিয়। এই প্রসঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসকার রামচন্দ্র শুক্লের একটি উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'ভারতেন্দুর বিকাশ দ্বিমুখী। তাঁর একটি সত্তা পদ্মাকর ও দ্বিজদেবের অনুগামী, বৈষ্ণবধারায় নিস্নাত এবং ভক্ত জীবন মালা' রচনায় নিযুক্ত। অপর সত্তাটি মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের অনুগামী; স্ত্রী শিক্ষায় ও সামাজিক সংস্কারে উৎসাহী, মন্দিরের ভণ্ড পুরোহিত এবং ভণ্ড ভক্তদের কঠোর সমালোচক।'

হিন্দী-ভারতীর যোগ্য সাধক উদারচেতা হরিশচন্দ্র হিন্দীর সমৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র অনুবাদের পন্থা নির্দেশ করে এবং কয়েকটি অনুবাদকর্ম সম্পূর্ণ করেই নিরস্ত হন নি, তাঁর অনুগামীদেরও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতিবিধানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর 'প্রাচীন হিন্দী নাটক' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'যদিও হিন্দীতে দশ-বিশটা নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু তবু আমি বলব যে, এখনও এ ভাষায় নাটকের বড় অভাব। আশাকরি কালে আরও নাটক লেখা হবে এবং সমৃদ্ধশালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা জ্যেষ্ঠাভগিনী বাংলার অক্ষয় রত্নভাণ্ডার এর সাহায্যে হিন্দীভাষা খুব উন্নতি করবে।

ভারতেন্দুর বাস্তবোচিত 'দূরদৃষ্টি' এবং শুভ কামনা ক্রমশঃ সফলতার দিকে অগ্রসর হয়েছে তাঁর সহযোগী ও অনুগামীদের সহায়তায়। তাঁরা বাংলা কাব্য নাটক, গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতির অনুবাদ করা ছাড়াও যথাযোগ্য সাহায্য নিয়েছে তাঁদের রচনায়। এই ভাবে বাংলা সাহিত্যের 'অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডার' সে যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ অবধি ভারতেন্দুর বাণীকে সফল রূপ দিয়ে চলেছে।

ভারতেন্দু বাংলা কাব্যের হিন্দী অনুবাদ করেননি। কিন্তু তাঁর হিন্দী কাব্যে বাংলা প্রভাব দুর্নিরীক্ষ নয়। বাংলা শব্দ, শব্দবিন্যাস কৌশল এবং প্রকাশভঙ্গি এমনকি বাংলা ছন্দও যে তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন নাটকে ব্যবহৃত কবিতায় ও গানে এবং অন্যান্য কাব্যে ও পদে।

বাংলা কাব্য পাঠও আলোচনার সময় বাংলা কবিতার 'পয়ার' ও 'ত্রিপদী' বন্ধের উপযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন এবং হিন্দী কবিতা রচনায় পয়ার ও ত্রিপদী প্রয়োগের প্রয়াস পান। বাংলা পয়ার বন্ধে তিনি কতগুলি হিন্দী কবিতা রচনা করেছিলেন, আজ আর তা জানবার

উপায় নেই। তবে তার সম্পাদিত 'হরিশ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা' পত্রিকার ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যায় (অক্টোবর ১৮৭৪) তাঁর রচিত একটি কবিতা 'প্রাতঃ সমীরণ' প্রকাশিত হয়। কবিতাটি ৮॥৬। মাত্রার মিশ্রকলাবৃত রীতির পয়ার বন্ধে রচিত। বাংলা ছন্দে হিন্দী উচ্চারণ সর্বত্র সুবেক্ষিত হয় নি, কিন্তু মৃদু মধুর শব্দের বিন্যাসে প্রভাতের বায়ুর স্নিগ্ধতা অনুভবযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রথম প্রয়াসে পরিপূর্ণ সাফল্য আশা না করাই ভালো। তা সত্ত্বেও কবির এই প্রচেষ্টা যেমন দুঃসাহসিক তেমনি ঐতিহাসিক। বাংলা ছন্দে রচিত হিন্দী কবিতায় সম্ভবতঃ এইটিই প্রাচীনতম নিদর্শন। কবিতাটির প্রারম্ভিক এবং শেষের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করবার লোভ সম্বরণ করা গেল না।—

মন্দ মন্দ আয়ে দেখো প্রাত সমীরন
করত সুগন্ধ চারো ওর বিকীরন।
গাত সিহরাত তন লগত সীতল
রৈন নিদ্রালস জন-সুখদ চঞ্চল।
নেত্র সীস সীরে হোত সুখপারৈ গাত
আরত সুগন্ধ নিয়ে পবন প্রভাত।

* * *

প্রলয় পীছে সৃষ্টিসম জগত লখায়
মানো মোহ বীত্যো ভয়ো জ্ঞানোদয় আয়।
প্রাত পৌন লাগে জাগ্যো করি 'হরিচন্দ'।
তাকী স্তুতি করি কহো য়হ 'রঙ্গছন্দ'।

—ভারতেন্দু গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড (নাগরী প্রচারিণী সভা) পৃ ৬৮৬-৮৯

কবিতাটির প্রথম পৃষ্ঠায় নীচে লেখা আছে ফুটনোট : হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা খণ্ড ২, সংখ্যা ১ (অক্টোবর ১৮৭৪ ইং) মে প্রকাশিত। ইসকা ছন্দ বঙ্গলা কা পয়ার হৈ।

বাংলা সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে কবিচিত্তের মোহ ঘুচেছে, জ্ঞানোদয় হয়েছে, বঙ্গসাহিত্যরূপ প্রভাতবায়ু নিশা শেষে সুপ্ত কবিচিত্তকে জাগিয়ে তুলেছে,—যেন তারই স্বীকৃতি ঝংকৃত হয়েছে এই 'বঙ্গছন্দে' রচিত ৮৬ পংক্তির দীর্ঘ কবিতাটিতে।

পয়ার বাংলার সুপ্রাচীন এবং সুপ্রচলিত ছন্দোবন্ধরূপে স্বীকৃত কিন্তু উনিশ শতকের পূর্বে হিন্দী কবিতায় পয়ারের ব্যবহার পাওয়া যায় না। সুতরাং হিন্দী কবিতায় প্রথম বাংলা ছন্দ ব্যবহারের কৃতিত্ব ভারতেন্দুর। হিন্দী কবিতায় বাংলা মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির পয়ারবন্ধ ব্যবহার করেই তিনি সন্তুষ্ট হননি। বাংলার শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণ বা অনুকরণেও তিনি কয়েকটি পদ রচনা করেন। ভারতেন্দুর 'প্রেমতরঙ্গ' (সং ১৯৩৪) কাব্যটিতে 'অথ বাংলাগান' নামে চিহ্নিত ৪৬টি এবং অন্যত্র আরও একটি মোট ৪৭টি বাংলা পদ পাওয়া যায়। পদগুলি আড়াই থেকে দশ পংক্তি পর্যন্ত দীর্ঘ। বাংলা পদের মত কয়েকটি পদ ভণিতা যুক্ত। ২৯টি পদ ভণিতা হীন, ১০টি পদে 'চন্দ্রিকা', ৩টিতে হরিশ্চন্দ্র (হরি চন্দ) এবং বাকী ৫টিতে যুগপৎ 'হরিশ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা' নামের উল্লেখ দেখা যায়।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের চিন্তাধারায় এবং সাহিত্যকর্মে বাংলা সাহিত্যের প্রভাবের কথা হিন্দী সাহিত্যে বহুবার আলোচিত হলেও বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ আলোচনা করেছেন একমাত্র ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, তাঁর 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান' নামক বইটিতে। তবে ভারতেন্দুর বাংলাপদবিষয়ক আলোচনা হিন্দী অথবা বাংলা কোনো ভাষাতেই হয় নি। সুতরাং এই আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

'প্রেমতরঙ্গের' ৪৭টি বাংলা পদের বিষয় বস্তু হল—প্রেম ভক্তি, বিরহ বেদনা এবং আত্ম নিবেদনের আকুতি। কোনো কোনো পদে যেমন মানবিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিরহ-বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে, অন্যান্য পদগুলিতে তেমনি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ও কাহ্ন, বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের আভাস খুঁজে পাওয়া বিচিত্র নয়। আবার রামপ্রসাদী সুর ও ভাব ঝংকারের অনুরণন অনুভব করা যায় দু'একটি পদে। বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে পদগুলির ছন্দোরীতি ও ছন্দোবন্ধ বৈচিত্র্য ও লক্ষণীয়। ছন্দালোচনার সময় মনে রাখতে হবে যে পদগুলি গেয়। সুতরাং আপাতভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্রাধিক্য বা মাত্রাভাব অর্থাৎ ছন্দ পতন থাকলেও গাইবার সময় তা সহজেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

আলোচ্য ৪৭টি পদের ১৩ ও ১৬ সংখ্যক পদ দুটি দলবৃত্ত রীতিতে রচিত। রামপ্রসাদী ঢঙে রচিত ১৩ সংখ্যক পদটির দ্বিতীয় পংক্তির প্রথমে একটি অতিপর্ব থাকায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির শেষ পর্বটি ৫ মাত্রার হওয়ায় ধ্বনিবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে।—স্তবকটি ১ টি একপদী ও ২টি দ্বিপদী নিয়ে গঠিত।

মন কেন রে ভাব এত।
ওই যে দিবানিশি ভাবছ বসি
যেন বুধি হয়েছে হত
এতেক ভাবনা কিসের কারণ
হবে বুঝি পাগলের মতো।

ভারতেন্দু গ্রন্থাবলী (২য়) প্রেমতরঙ্গ, ১৩

১৬ সংখ্যক পদটি দলবৃত্ত রীতিতে রচিত হলেও ঠিক মতো বাংলা বিভক্তি ব্যবহার করে লিখলে এটি সরল কলাবৃত্ত রীতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ২, ১৭, ২১, ২৪, ৪৩ ও ৪৫ সংখ্যক পদগুলি সরল কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর বিভিন্ন রকমের সমন্বয়ে স্তবকগুলি গঠিত। একটি তুলে দিচ্ছি—

প্রাণনাথ, নিদয় হয় বিদায় চেওনা।
তোমা বিন প্রান, নাহির'বে প্রান।
কিসে পাব ত্রান আমায় বল না।
আমি হে অবলা তাহাতে সরলা
বিরহ-জ্বালা, প্রানে সবে না ॥

প্রেমতরঙ্গ—২

প্রথম পংক্তির প্রথমে একটি অতি পর্ব। একটি একপদী ও দুটি দ্বিপদী পংক্তির দ্বারা পদটি গঠিত। পরপর তিনটি পর্বে মিল বিন্যাসে ধ্বনি মাধুর্য চমৎকার হয়ে উঠেছে। একপদীটির প্রথম ওশেষ দ্বিপদীর শেষের দুই পর্বে ৫ মাত্রা, অন্যত্র প্রতিপর্বে ৬ মাত্রা।

দুটি দলবৃত্ত, ৬টি সরল কলাবৃত্ত এবং অবশিষ্ট ৩৯টি পদ মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। এই শ্রেণীর অধিকাংশ পদই দ্বিপদী ও চৌপদীর মিশ্রণে গঠিত। একটি উদাহরণ—

নব প্রেমে প্রেমী হোতে কর বাসনা।
বল বল ওরে প্রান মোরে বল না।
এই প্রেমে প্রেমী হোলে মম চিন্তা জাবে চলে,
ঈহাতেঈ যাবে মোর হৃদি বেদনা ॥
তোমায় পাব জন্মান্তরে এই আশা হৃদে করে
প্রান যাবে আর জাবে হৃদি জাতনা।

প্রেমতরঙ্গ-২৭

দুটি দ্বিপদী ও দুটি চৌপদী পংক্তির সমন্বয়ে পদটি গঠিত, দ্বিতীয় চৌপদীটির প্রথম পদের প্রথম পর্বটি পঞ্চমাত্রিক; অন্যান্য সর্বগুলি যথানিয়মে চতুর্মাত্রিক। মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির অন্য একটি পদ—

নিভৃত নিশীথে সঈ ও বাঁশী বাজিল
পুরিত করিয়া বন, ভেদিয়া গগন ঘন
ঝাঁপাইয়া সমীরন, মধুরবে গাজিল।
স্তম্ভিত প্রবাহনীর, তাড়িত ময়ুর কীর
ঝংকারিয়া তরুগন একতান সাজিল।
'হরিশ্চন্দ্র' শ্যাম, বাঁশী—স্বর কামদেব ফাঁসী
কুলবধূ শুনিয়াঈ, আর্য-পথ ত্যাজিল ॥

প্রেমতরঙ্গ : ৪১

প্রথম পংক্তিটি পয়ারবন্ধে রচিত। অর্থাৎ দ্বিপদী। পরের পংক্তি তিনটি ৩১ মাত্রায় চৌপদী।

দু একটি (২৩ ও ৪৭ সংখ্যক) এমন পদও মেলে যাতে মিশ্র কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। ২৩ সংখ্যক পদটি দেখুন—

একবার ভাব ওরে মন।
শেষের সে দিন তব নিকট এখন ॥
দিনদিন হীন বল মন হয়েছে দুর্বল।
রোগের অতি প্রবল ভয়ে ভীত হয়েছে জীবন ॥

প্রেমতরঙ্গ : ২৩

এখানে শেষ চরণটি দলমাত্রিক রীতিকে পয়ারবন্ধে রচিত (৪।৪।।৪।২) এবং প্রথম চরণ কয়টি মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। ৪৭ সংখ্যক পদটির প্রথম পংক্তিটি দলবৃত্তে রচিত বলা যায়।

মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে প্রতি পর্বে ৪ মাত্রা হয়—এইটিই সাধরণ নিয়ম। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বাঙালী কবিদের রচনায় এই রীতির কবিতার পর্বে ৬ মাত্রারও ব্যবহার দেখা যায়। রবীন্দ্রকাব্যে অনুরূপ ৬ মাত্রা পর্ব খুঁজে বের করা অসম্ভব নয়। প্রেমতরঙ্গের ৯ সংখ্যক পদটিতে মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ৬ মাত্রার পর্বের ব্যবহার পাওয়া যায় যেমন—

হায়, বিধি এত মোরে কেন নির্দয়
অমূল্য রতন করিয়া অর্পণ
কেন গো হরন তাহারে করায়।
মম-প্রান-ধন হৃদয় রতন
রমণী মোহন কোথায় গো যায়।

—প্রেমতরঙ্গ ৯

প্রথম পংক্তির প্রারম্ভে অতিপর্ব, অপর দুই পংক্তির পর্বে পর্বে এবং পদে পদে ও পংক্তিতে পংক্তিতে মিল বিন্যাসের ফলে ধ্বনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। ২০ ও ২৮ সংখ্যক পদ দুটিতে ৪ ও ৬ মাত্রার পর্ববিন্যাস দেখা যায়।

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলা কাব্য ও ছন্দে অবাঙালী কবি হরিশ্চন্দ্রের দক্ষতা যেমন বিস্ময়কর তেমনি আনন্দ ও উৎসাহব্যঞ্জক। তবে বাংলার বাইরে ভিন্ন পরিবেশে অবস্থানের ফলে মাঝে মাঝে তাঁর পদের ভাব ভাষা ও ছন্দে অস্পষ্টতা, জড়তা ও ভ্রান্তি প্রকট হয়ে পড়েছে। পদগুলিতে কবি বাংলা অন্তঃস্থ 'য', মূর্ধণ্য 'ণ', এবং 'ই'র বদলে যথাক্রমে 'জ' 'ন' এবং 'ঈ' ব্যবহার করেছেন। কবি নিজে হিন্দীভাষী, সুতরাং হিন্দীর কর্কশ দৃঢ় উচ্চারণ যে বাংলা পদের অনুকূল নয় তা বুঝতেন; হিন্দীভাষীর মুখে পুরোপুরি হিন্দীর মতো উচ্চারিত হলে বাংলার 'কোমলকান্তপদাবলী'র স্বভাবমাধুর্য এবং ধ্বনি-সুষমা সম্পূর্ণ রক্ষিত না-ও হতে পারে, হয় তো সেই কারণে কবি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তা সত্বেও উচ্চারণ বিপর্যয় ও অসতর্কতা জনিত ভুল ত্রুটি ক্ষেত্রবিশেষে স্বাভাবিক কারণে থেকে গেছে। পদগুলিতে সাধু বাংলার ব্যবহার থাকলেও ভাষার প্রবণতা যে চলিত বা কথ্য গদ্যের দিকে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা ছন্দের ঐশ্বর্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে, বাংলা পদ রচনায় বিভিন্ন রীতি ও বিবিধ বন্ধ ব্যবহার, অতিপর্ব এবং সুনিপুণ মিল বিন্যাসের দ্বারা ছন্দবৈচিত্র্য সম্পাদন, একজন অবাঙালি কবির পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।

অনেকে মনে করেন ভারতেন্দু রচিত বলে কথিত এই ৪৭টি বাংলা পদের অধিকাংশ তার রচিত নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় ১৫—হইতে২০টি পদে 'চন্দ্রিকা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চন্দ্রিকা' একটি উপনাম বা ছদ্মনাম। এই 'চন্দ্রিকা' নামধারিণী কোনো বঙ্গদেশীয় মহিলাই অধিকাংশ পদ রচনা করেন। এই প্রসঙ্গটি আলোচনাকালে ভারতেন্দুর দৌহিত্র ব্রজরত্ন দাস রচিত 'ভারতেন্দু, হরিশ্চন্দ্র' নামক কবিজীবনী গ্রন্থটির উপর নির্ভর করাই সঙ্গত মনে হয় এই জীবনী-গ্রন্থটির একটি অধ্যায়, 'চাঁদ মেঁ কলঙ্ক' থেকে জানা যায় 'চন্দ্রিকা' একজন বঙ্গদেশীয় কুলীন মহিলা। তাঁর প্রকৃত নাম 'মল্লিকা'। তিনি হরিশ্চন্দ্রের আশ্রিতা ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের

প্রভাবে এবং সহায়তায় তিনি এত ভালো হিন্দী আয়ত্ত করেন যে, 'রাধারাণী', 'সৌন্দর্যময়ী' এবং 'চন্দ্রপ্রভা পূর্ণপ্রকাশ' নামে তিনটি বাংলা উপন্যাসের হিন্দীতে অনুবাদ করেন। 'চন্দ্রিকা' ছদ্মনামে তিনি বাংলায় পদও রচনা করেন। 'প্রেমতরঙ্গ' গ্রন্থে তাঁর চল্লিশেরও অধিক পদ সংগৃহীত হয়েছে। আবার এক গ্রন্থের 'কাব্য' শীর্বক অধ্যায়ে ভারতেন্দু কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'প্রেমতরঙ্গ' একটি বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ। তাতে ১৪৮টি পদ আছে। ৪৬টি বাংলা পদ আছে, সেগুলিতে 'চন্দ্রিকা' ছদ্মনামের উল্লেখ আছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রেমতরঙ্গে বাংলা পদ আছে ৪৭টি, ৪৬টি নয়, সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আবার সব পদগুলিতে 'চন্দ্রিকা নামের উল্লেখ নেই, বরং কয়েকটিতে 'হরিশ্চন্দ্র' নামের উল্লেখ আছে সে কথাও বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে ব্রজরত্ন দাস মহাশয় দু'বার দুরকম মন্তব্য করেছেন—সুতরাং তাঁর মন্তব্যে অল্পাধিক ভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে বলা যায়।

মল্লিকা রচিত বাংলা পদের সংখ্যা 'চল্লিশেরও অধিক' তাঁর এই মতটি সাধারণ ভাবে মেনে নিলেও স্বীকার করতে হয় যে অন্ততঃ কয়েকটি পদ হরিশ্চন্দ্রেরও রচিত। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের প্রতিভার একটি প্রধান বিশেষত্বের কথা আপনি এসে যায়। অজানা অচেনা ভাষা শিখে নিয়ে সেই ভাষার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করে তার সাহায্যে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টাই হল তাঁর প্রতিভার সেই দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষার দক্ষতা এবং কবিতা রচনার কথা না বললেও চলে, গুজরাটী, মারবাড়ী (রাজস্থানী) এবং পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যে সম্যক দক্ষতা অর্জন করে তিনি ঐ সমস্ত ভাষাতেও কবিতা রচনা করেছেন। ভারতেন্দু গ্রন্থাবলীতে এই ধরণের বিভিন্ন ভাষার কবিতার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। হিন্দী কবিতাতেও তিনি ঐ ভাষাগুলির ছন্দ ব্যবহারের পরীক্ষা করেছেন। অতএব বলা যায় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যিনি স্বচ্ছন্দে কবিতা রচনা করিতে পারেন বাংলায় পদ রচনা তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়। বিশেষ করে যিনি কবি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন, এবং বাংলা ভাষায় ও ছন্দে যাঁর অধিকার সন্দেহাতীত। মল্লিকা নাম্নী বাঙালী মহিলার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা যেমন ভালোভাবে হিন্দী শিখতে এব বাংলা গ্রন্থ হিন্দীতে অনুাদ করতে উৎসাহিত এবং উদ্যোগী হতে সাহায্য করেছিল, ঐ মহিলার সাহায্যে আরও ভালোভাবে বাংলায় দক্ষতা অর্জন করে, বাংলায় পদ রচনায় অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহিত বোধ করা কবির পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। হরিশ্চন্দ্র বাংলা হরফ স্বাভাবিক ভাবে লিখতে অনভ্যস্ত হলেও দেবনাগরী হরফে বাংলা লেখায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর গৃহচিকিৎসক ডঃ ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরীকে অল্প সময়ে লেখা, একটী দীর্ঘ পত্রের (অধুনা লুপ্ত) উল্লেখ করা যায়। পত্রটির ভাষা বাংলা কিন্তু লিপি দেবনাগরী।

পদগুলির বিষয়বস্তু, শব্দপ্রয়োগ, এবং ভণিতা ভিত্তি বিবেচনায়, 'হরিশ্চন্দ্র' ভণিতাযুক্ত ৩টী এবং ভণিতাহীন ২৮টির অধিকাংশ পদ হরিশ্চন্দ্রের রচনারূপে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। ভণিতাহীন পদগুলির ভাষার শৈথিল্য, শব্দের দুর্বলতা ভিন্নার্থে শব্দ প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ (যেমন নিবেদন বা প্রার্থনা অর্থে অকিঞ্চন' শব্দের প্রয়োগ) হিন্দী শব্দের ব্যবহার (যেমন—'বরষা'র স্থলে 'বরখা') ই, 'য' ও 'ণ' প্রভৃতির বদলে যথাক্রমে 'ঈ', 'জ' ও 'ন' প্রয়োগ—প্রভৃতি কোনো বাঙালি মহিলার না হয়ে হিন্দীভাষী অবাঙালি কবির হওয়ার

সম্ভাবনাই সমধিক। এবং সেইটিই স্বাভাবিক। সুতরাং আমরা মনে করতে পারি যে, ,প্রেমতরঙ্গের' ৪৭টী বাংলা পদের অধিকাংশই ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র রচিত। এই পদগুলি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দী সাহিতের যোগসূত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিজের হৃদয়ের যোগ স্থাপন করে নাটক কবিতা ও ছন্দের মাধ্যমে বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের এক অক্ষয় যোগসূত্র স্থাপন করেই ভারতেন্দু স্থির থাকেন নি। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সেকালে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের কারো কারো সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় সৌহার্দ্য প্রভৃতি স্থাপনেরও তিনি সকল প্রচেষ্টা করেছিলেন। সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতীয় সভার সঙ্গে ভারতেন্দুর যোগ ছিল। জাতীয় সভার তহবিলে তিনি বিশেষ সাহায্য প্রদান করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বারানসীতে আসেন তখন ভারতেন্দু তাঁর যথোচিৎ 'সৎকার' করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের বিলক্ষণ সদ্ভাব, প্রীতি এবং সাদৃশ্য ছিল। এঁদের একজন অপরের প্রতিভা, মানমর্যাদা উদারতা, ভাষা-ভক্তি এবং দেশহিতকর কর্ম, সম্বন্ধে সম্যক রূপে অবহিত ছিলেন। উভয়েই নিজ নিজ আধুনিক ভাষার প্রথম সার্থক শিল্পীরূপে পূজিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় মাতা ভগবতী দেবীকে কাশীবাসের উদ্দেশ্যে কাশীতে পৌছে দিতে আসেন। সেই সময় ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হয় তা দৃঢ় সখ্যতায় পর্যবসিত হয়। ভারতেন্দু বিদ্যাসাগরকে কয়েকটি গ্রন্থ উপহার দেন। বিদ্যাসাগর তাঁর 'শকুন্তলা'র ভূমিকায় (প্রথম সংস্করণ) লিখেছিলেন, 'আমার অভিজ্ঞান শকুন্তল-এর প্রয়োজন, এই কথা জানা মাত্র এই সৌম্যমূর্তি অমায়িক নিরহঙ্কার, বিদ্যোৎসাহী দেশ হিতৈষী যুবকটি যে স্নেহ এবং উৎসাহের সঙ্গে আমার হাতে পুস্তকটি অর্পণ করল, তা কি আমি কোনো কালে ভুলতে পারি।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর শকুন্তলা গ্রন্থটি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে উৎসর্গ করেন এবং তাঁর হাতে নিজে দেবার জন্য আবার কাশীতে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃদেবী কাশীতে ভারতেন্দুরই তত্ত্বাবধানে থাকতেন। অতএব বিদ্যাসগর ও ভারতেন্দুর পারস্পরিক হৃদ্যতা যে কতখানি নিবিড় ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীতে ডাক্তারী করতেন। তাঁর মাধ্যমে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভারতেন্দুর পরিচয় ঘটে। ভারতেন্দু হেমচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ভারতেন্দু কলকাতায় গেলে উভয়ের মধ্যে সাহিত্য চর্চার আসর বসত। ভারতেন্দুর 'ভারত-ভিক্ষা' কবিতা হেমচন্দ্রের কবিতার অনুবাদ, তাঁর অপর কয়েকটির রচনাতেও হেমচন্দ্রের প্রভাব দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজ সিংহ' উপন্যাসটির অনুবাদকর্ম শুরু করলেও সমাপ্তি করতে পারেন নি ভারতেন্দু। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচীব (রেজিষ্ট্রার) নবীনচন্দ্র রায় প্রভৃতি স্বদেশ, সমাজ ও সাহিত্য-প্রেমী বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে ভারতেন্দুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ভারতেন্দু কলকাতায় গেলে প্রায়ই একজন প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণকারের ঘরে উঠতেন। সেখানেও শিক্ষিত বিদ্বান এবং সাহিত্যপ্রেমীদের আসর জমে উঠত।

সুতরাং বলা যায় ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র মাত্র ৩৪ বৎসরের জীবনে একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা হিন্দী সাহিত্যের জন্ম অসাধ্য-সাধন করে গেছেন। তিনি একাই একটি বিরাট যুগ। বাংলা সাহিত্যে যা অনেকের প্রচেষ্টার ফলে এসেছে, ভারতেন্দু স্বীয় অদ্ভুত প্রতিভা এবং কর্মকুশলতার দ্বারা হিন্দী সাহিত্যে একক ভাবে তা আনতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, সফলতাও অর্জন করেছেন বিভিন্নক্ষেত্রে। তাঁর সফলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি হল বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন। বর্তমানে এই উভয় সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা এবং 'দেওয়া-নেওয়া'-সম্প্রসারণের মূলে হরিশ্চন্দ্রের কৃতিত্বের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে অবশ্য স্মরণীয়।

১। দ্রঃ ব্রজরত্ন দাস কৃত 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র' (১৯৪৮) পূর্বকথণ

দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটির কবিতা

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি টেনিসন, ব্রাউনিং এবং ম্যাথু আর্নল্ড যখন নিজ নিজ কবিতার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতিভাসিক সত্যকে সমালোচকের চুলচেরা দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করছিলেন তখন দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি এবং অন্যান্য প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিরা নন্দনতত্ত্বকেই তাঁদের কবিতার অন্যতম আশ্রয় করে তুলবার চেষ্টা করছিলেন। জীবনে সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁদের যে উপলব্ধি তাকেইতাঁরা অন্যান্য অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে স্থান দিয়ে অভিব্যক্ত করে তুলছিলেন।

প্রি-র‍্যাফেলাইট গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি তাঁর সারাটি জীবন সমুদ্র আকাশ কিংবা নারীর সান্নিধ্যে সৌন্দর্যের অভিসারেই যাত্রা করে ফিরেছেন। আর্নল্ড ও ক্লাউকে যে ধর্মবোধ ও জীবনজিজ্ঞাসা এবং সামাজিক সমস্যাগুলি অহরহ অস্থির করে তুলেছিল তার দিকে সর্বদাই মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন আমাদের এই আলোচ্য কবি রসেটি। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাজনীতিকে কখনোই শ্রদ্ধা জানান নি তিনি। তাই অনেক সময় অনেকেই বলতে চেয়েছেন যে, রসেটির কাব্যশরীরে বাইরের বাতাস লাগে নি। বলতে চেয়েছেন যে, কবি রসেটি রুদ্ধঘরের মধ্যে থেকেই তাঁর কবিতা রচনা করেছেন।

এই প্রতিদিনকার পরিচিত পৃথিবীর বাসাতে তিনি নিশ্বাস নিতে চান নি, আপন ভগিনীর মতন ধর্মের পবিত্র বনে বিচরণ করেন নি। ফলে তিনি দেখেছেন যে তাঁর শ্বাসরোধ হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরই সৃষ্ট সেই হস্তিদন্ত মিনারের প্রাচীর তাঁকে ঘিরে রেখেছে।

পৃথিবীর সঙ্গে এই অসহযোগের মনোভাব এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের গহনে আত্মমগন তাঁকে, বলাই বাহুল্য, আর্নল্ড কী ব্রাউনিং এর মতন কিংবা অন্যকোন ভিক্টোরীয় কবির মতন বহুমুখীন সাফল্য ও পরিপূর্ণতা দান করে নি। পৃথিবী তাঁর কাছ থেকে কোন শুনবার মতন বাণী লাভ করে নি। প্রধানতঃ মধ্যযুগের ইতালীয় কবিদের কাব্যপাঠ্য যদিও তাঁকে শিল্পবিপ্লবোত্তর ইংলণ্ডের কুশ্রীতা ভুলতে সহায়তা করেছিল তথাপি ইংলণ্ডের মানুষ পরিবর্তে তাঁর কাছ থেকে কোন মহৎ উচ্চারণ শোনেন নি। কোন আদর্শ সফল করার উদ্দেশ্য, কোন মতামত ব্যক্ত করার ইচ্ছা,—কোনটাই তাঁর ছিল না।

রসেটি কোন ভবিষ্যৎ বক্তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সংসারাভিজ্ঞ উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী শিল্পী। কদাচিৎ তিনি কোন কিছুর অর্থ অনুসন্ধানে ইচ্ছুক ছিলেন। পরন্তু সব কিছুরই বর্ণ ও শব্দ ছিল তাঁর উৎসাহের বিষয়।

যেহেতু রসেটি এই পৃথিবীর উষ্ণতা এবং বাস্তবিকপক্ষে বাস্তবতা বিবর্জিত ছিলেন তাই তাঁর বিচরণের (কাব্যভাবনার জগত) ক্ষেত্রটিও ছিল সীমাবদ্ধ। বাইরের বাতাসকে উপেক্ষা করে তিনি জীবনকে দেখতে পান নি সম্পূর্ণরূপে। তাঁর কবিতা তাই ভালোয় মন্দোয় আলোয় আঁধারে, আনন্দে অশ্রুতে সমন্বিত জীবনের দর্পণ নয়।

এমনকি তাঁর হৃদয়ানুভূতি আর্দ্র, ঘনীভূত জীবনের নিকেতনেও তাঁর ভাষা অতিমাত্রায় সুশিক্ষিত ; তাঁর অন্যান্য কবিতায় তিনি প্রকৃতির কাছ থেকে অঞ্জলি গ্রহণ করেছেন। কদাচিৎ। তার কারণ প্রকৃতির সম্বন্ধে জেনেছিলেন তিনি অল্পই। তাঁর কাব্যজগত বলতে আমরা বুঝি এক অদ্ভুতের উষ্ণজগত, সেখানে জোর করেই ফোটানো হয়েছে ফুল ; যেখানে গন্ধবহ মলয়ে মন সহসা মেতে উঠে এক অসহ তীব্রতায়। এই জগত হলো মায়ার জগত এবং মায়াবিনীরাই এ জগতের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

সন্দেহ নেই, রসেটির এই জাগতিক বিচ্ছিন্নতাই তাঁর কবিতাকে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দগামীতা দানে বিরত ছিল। তাঁর কবিতা পাঠে সাধারণ পাঠক বা পাঠিকার মন কদাচিৎ তাই উদ্দীপ্ত হয়। পরিচিত পীঠস্থান, স্পৃশ্য অনুভূতি কোনটাই লাভ করা যায় না তাঁর কবিতায়।

নির্দ্ধারিত সীমায় সীমিত হওয়া সত্বেও রসেটি ছিলেন একজন সুনিশ্চিত এবং ত্রুটিহীন শিল্পী। তাঁর মতন জীবনের সূক্ষ্ম বিষয় ও বক্তব্যকে কবিতার ক্যানভাসে রমণীয় করে তুলতে এবং বিমূর্ত কল্পনাকেও চিত্রবহ করে তুলতে তাঁর সমকালীন কিংবা প্রাক্তনদের মধ্যে কেউই ছিলেন না। এইদিকে তিনি একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

রসেটি মেজাজের দিক দিয়ে ছিলেন মধ্যযুগীয় এবং প্রাক্তনদের থেকে অধিকাংশেই সফলকাম শিল্পী ; তাঁর মধ্যে মানবিক উপাদান, রূপানুরাগ এবং অতীন্দ্রিয়বাদ ইত্যাদি নানা প্রকারের বৈচিত্র্য সমন্বিত হয়েছিল।

তাঁর কবিতার অতিন্দ্রিয় চিন্তা কোলরিজের সঙ্গে একই সুরের উচ্চারণের বিষয় নয়। শতাব্দীর স্বর্ধ কোলরিজ যা প্রথম দিকে উচ্চারণ করেছিলেন রসেটি তা উচ্চারণ করছেন আরও অনেকদিন পরে। প্রতিদিম প্রতিমুহূর্তের বাস্তবসমস্যার টানা পোড়েনে ইংরেজীভাষার কবিতা যেকালে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল সেকালে রসেটিই তাকে মুক্তি দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় জগতের আকাশে নক্ষত্রের নিরালোকে। তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদ টেনিসন বা ব্রাউনিংয়ের মতন ধর্মীয় উপাদান বিশিষ্ট নয়। তাঁর এই অতীন্দ্রিয় কল্পনা ছিল একজন যথার্থ শিল্পীজনোচিত—যেই কবি শিল্পীটি চেয়েছিলেন অর্দ্ধালোকিত, আধচেনা জগতের ভাব ও অনুভূতির দুয়ারটিকে ধীরে ধীরে মেলে ধরাতে।

স্বীয় কল্পনাকে অর্দ্ধ-অভিব্যক্ত, অর্দ্ধ আলোকিত ভাব কল্পনার আলোকে বিশিষ্ট বাক্যে রূপভাস্বর করে তুলবার যে কী আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল রসেটির তা' এই নীচের ছত্রগুলি থেকেই লক্ষণীয় :

(ক) Girt in dark growths, yet glimmering with one star.

(খ) Wards, whose silence wastes and kills.

(গ) The spacious vigil of the stars.

রসেটির সবচেয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা ব্লেসিড ড্যামজেল—একটি স্বর্গকল্পনায় ভরপুর স্নিগ্ধরসের কবিতা। এর মধ্যে যে সব সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি ধরা পড়েছে তা' সচরাচর কোন কবিতাকে লক্ষ্য করা যায় না। এর মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতার সুসহ প্রকাশভঙ্গিমা লক্ষ্য করা যায় তা' রসেটির পরবর্তীকালের বহু অলংকৃত চিত্রেও আমরা আবিষ্কার করতে পারব না।

স্বর্গের সুবর্ণমণ্ডিত অর্গলের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ব্লেসিড ড্যামজেল :—

"From the fixed place of Heaven he saw
Time like a pulse shake fierce
Through alı the worlds. Her graze still strove within gulf to pierce
Its path ; and now she spoke as when
The sun sang in their spheres."

ব্যাপ্তির চিন্তা উপরের ছত্রগুলিতে সুন্দররূপে বিধৃত হয়েছেন। রহস্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টিতে রসেটির সঙ্গী হলেন কোলরিজ ; আর রূপমনোরম সৃষ্টিতে তিনি সবচেয়ে কীটসেরই কাছের মানুষ। কখনো কীটসের মতন এক একটি আশ্চর্য ছত্র রসেটিও সৃষ্টি করে ফেলেছেন—

"And her far seas moar as a single shell."

রসেটির কাব্যে যাঁরা জীবনদর্শন খোঁজ করতে যেয়ে হতাশ হয়েছে তাঁরা যদি একটু ক্ষমাপ্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে তাঁর কাব্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যর দিকগুলি অন্বেষণ করেন তাহলে অবশ্যই দেখবেন যে রসেটির কাব্যে লভ্যাংশ তাঁদের বড় কম নয়।

রসেটির কাব্যে যে চিত্রধর্মিতা রয়েছে তা' এক অর্থে অতুলনীয়। কীটসের কাব্যের চিত্রকল্পের ইঙ্গিত রসেটির কবি প্রাণকে উদ্দীপ্ত করেছিল সম্ভবত। প্রি-রাফেলাইট আন্দোলনের পুরোধা রসেটি তাই চিত্র সমাবেশে তাঁর কাব্যকে করেছেন অদ্ভুত অলংকৃত। কিন্তু এই অলংকারের ভারে পীড়িত নয় তাঁর কাব্য। কেননা, পুব র‍্যাফেলাইটরা তাঁদের কাব্যে রূপকল্পের এবং অনুভূতির সমাবেশ করেছেন ঠিক যেমন করে জাপানীরা সাজায় ফুল ; যাতে প্রতিটি ফুল তাদের অস্তিত্ব এবং সৌরভ বজায় রাখতে পারে।

রসেটির কাব্যের চিত্রকল্প কীটসের থেকেও সার্থক কোথাও কোথাও। তার কারণ রসেটি ছিলেন মূলতঃ একজন চিত্রকর। তাঁর অনুভূতি ও কল্পনা সবই এসেছিল রঙের পাত্র থেকে। একজন চিত্রকর ছাড়া আর কেইবা আমাদের নীচের পংক্তিগুলির মতন এমন সব আশ্চর্যছত্র উপহার দিতে পারতেন ?

"The blessed damozel leaned out
From the **golden bar** of heaven
She had **three lilis** in her hand
And the stars in her hair was seven."
"And the souls mounting up to God
Went by her **like thin flames.**"

এই রেখাঙ্কিত ছত্রগুলিতে মধ্যযুগের পরিচিত তুলির স্পর্শধন্য সব প্রতীক আবিষ্কার করা দুরূহ ব্যাপার নয়। অত্যাধুনিক বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত কবিতা জেনীতেও দেখা যায় যে কবি চিত্রকল্পসৃষ্টির আবেগ সম্বরণ করতে পারেন নি। সেখানেও ফ্লোরেন্টাইন শিল্পীদের আঁকা চিত্রাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, যেহেতু ছবির সঙ্গে কবিতাকে তিনি সম্পৃক্ত করে

তুলেছিলেন, সেইজন্য তাঁর কবিতাকেও ছবির থেকে পৃথক করে ভাবা যায় না। এ লাস্ট কনফেসানে লালরঙের সমাবেশে একটি হত্যার দৃশ্যকে উজ্জ্বল সফলরূপে অঙ্কিত করেছেন রসেটি।

শেলী ও ব্রাউনিং রঙের বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে অনবদ্য ছিলেন এবং রসেটির সঙ্গে তাঁদের পার্থক্যটি কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নয়। এই ব্যবধানকে মাত্রা চেতনার দ্বারাই অনুভব করতে হবে। রোসম্যারী বা ব্রাইডস প্রেলিয়ুডের চিত্রকল্পকে কীটসও কোনদিন খর্বকায় করে দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

নীচের এই ছত্রগুলি :—

> Over her bosom, that lay still,
> The Vest was rich in grain,
> With close pearls wholly overset :
> Around her throat the fastenings met
> Of Chovesayle and mantlet"

অথবা—

> Her arms were laid along her lap
> With the hands open

সম্ভবতঃ ভিক্টোরীয় যুগের যে কোন কবির রচনাতেই দুর্লভ।

দার্শনিক মননের সঙ্গে মিশ্রিত তাঁর কাব্যের চিত্রধর্মিতা, বলাই বাহুল্য, অতিমাত্রার দীর্ঘসঞ্চারী এবং ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজীকাব্যের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

রসেটির কবিতার মূল্য বৈশিষ্ট্য হলো—নন্দনতত্ত্ব; বিলসিত অনুভূতির রসান্বিত সুপ্রকাশ যা তিনি সৌন্দর্যের রূপ নিকেতনেই খুঁজে পেয়েছিলেন। এই ধরনের ধুলোতে নয়, এক দূর নক্ষত্রের আলোয় রসেটি তাঁর কবিতার কমলকুঞ্জকে নির্মাণ করেছিলেন তাঁর আশ্চর্য শিল্পীমনের কল্পনাতে— রঙ ও তুলির ব্যবহারে। মধ্যযুগের রোমান্সের স্বপ্নালোকিত পথে রসেটি অন্বেষণ করেছেন কখনো বা তাঁর কবিতার বিষয়কে; কিন্তু এই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা স্কটের সঙ্গে একই সুরে উচ্চারণের বিষয় নয়।

রসেটির কাব্যে যদিও নন্দনতত্ত্ব, চিত্রধর্মিতা, অতীন্দ্রিয়বাদ, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা ইত্যাদি নানা বিষয় সমন্বিত হয়েছিল তথাপি তাঁকে আমার কোনদিনই ব্যক্তিত্বে ভাস্বর স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নির্ভীক কবি কণ্ঠ বলে মনে হয় নি।

কবিতা, তাঁর কাছে ছিল বহুসমস্যা কণ্টকিত জীবন প্রাঙ্গন থেকে পলায়নের নিভৃত এবং নিশ্চিত বাতায়ন। কবিতার আশ্রয়ে তিনি জীবনানুগ হতে পারেন নি।

কি শুনেছি আমরা রসেটির কবি কণ্ঠ থেকে ?

না। কোন ভবিষ্যত বক্তার প্রজ্ঞাময় বাণী নয়। কোন সেবক বা কর্মীর শপথ উচ্চারণ নয়। আদর্শবাদীর প্রতিশ্রুতিও নয়। তিনি ছিলেন সতত স্বপ্নচূড়ায় আসীন, নন্দনতত্ত্বেরই শিল্পী। আগামী দিনের কবিদের কেউ তাঁকে পূর্বসূরীর শ্রদ্ধা জানাবেন কিনা, বড়ই সন্দেহ হয়। কেননা

আজকের কবিরা যে অশ্রান্ত জীবন কল্লোলে—মাঠে ময়দানে, বাজারে, বন্দরে, ক্ষেতে খামারে, কলে, কারখানায়, ডকে, জেটিতে তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু অন্বেষণ করে ফিরছেন। ডাক দিয়ে বলছেন—স্বপ্ন চূড়ার থেকে নেমে এসো সব·········

রসেটির কি কোনদিনই পেয়েছিলেন তাঁর কল্পনার স্বপ্ন চূড়া থেকে নেমে আসতে ?

বর্তমানকাল রসেটির কবিতা পড়ে বারবার এই প্রশ্নই রাখবে। আর জানিনা, বড় সন্দেহ হয়, রসেটির কবিতা গবেষক অনুসন্ধিৎসু পাঠক ছাড়া আর কখনোই অধিক পাঠকের পঠনীয় হয়ে, মহাকাল ও বিপুলা পৃথিবীর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে দীর্ঘজীবী হবে কি না ? ?

॥ ঋণস্বীকার ॥

১। A History of English Literature—A· Comptou Rickett,

২। The Pelican Guide to English Literature (From Dickens to Hardy) Vol—6 Edited by Boris Ford.

৩। The Literature of the Victorian Era—Hugh Walker.

৪। A Critical History of English Poetry—Griersen and Smith.

বেদান্ত ও বিজ্ঞান

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

মানুষ চিরদিনই অজানাকে জানতে চেষ্টা ক'রেছে জানা জিনিষের সাহায্য নিয়ে। অন্ধকারে প্রাণের প্রদীপের ক্ষীণ আলোটুকুর রশ্মি ধ'রে পথ চলা তার স্বভাব। জানা পথ দিয়ে চলতে চলতে যখন সে নতুন পথের সন্ধান পায়, সত্যকে যেদিন সে উপলব্ধি করে সে দিন সে বলে ওঠে—আমি জেনেছি সেই মহানপুরুষকে, তুমিও জানত চেষ্টা কর—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্…' এই মহাবাক্যটি যেমনআধ্যাত্মিক জগতে প্রযোজ্য তেমনি গবেষণামূলক যে কোন বিষয়েই প্রয়োগ করা যেতে পারে। বেদপুরুষকে এতোদিন ধ'রে জানতে চেষ্টা করা হয়েছে কত উপমা, উদাহরণ, গল্প ও সাধারণ কথার ভেতর দিয়ে—তার মধ্যে এসেছে আমলকী, তপ্ত কুঠার, রথ অশ্ব সারথি, গাড়ীর চাকা, এক সরা জল, পশু-পক্ষী আরও কত কি। আধিকারিক পুরুষ ভেদে যে যেমন মানুষ সে সেই রকমভাবে এগিয়ে গিয়েছে—নিজেকে খুঁজতে বেরিয়ে প'ড়েছে সেই দেশের সন্ধানে সেখানকার মাটির মিঠে গন্ধ, প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভ, পরম শান্তির অশরীরী স্নেহময় আহ্বান তাকে পাগল ক'রেছে।

আজ আমলকী ফল, তপ্তকুঠার, রথ ও সারথির যুগ চ'লে গেছে বহুদূরে। মানুষের ইতিহাস আজ এতো এগিয়ে গেছে যে অতীতের ঘটনাগুলোর আর ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও শোনা যায় না। একদিকে শুধু অনাদি অতীত অন্যদিকে অজানা এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ। চঞ্চল বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্ত এতো তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে—চোখ ধাঁধাঁন তার গতি, মনে হয় বর্তমান ব'লে কিছু নেই। আজ থেকে একশো বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভাবতেও পারতেন না অন্তরীক্ষ পরিভ্রমণ ক'রে মানুষ আবার সশরীরে পৃথিবীতে ফিরে আসবে, সঙ্গে নিয়ে আসবে অনাবিষ্কৃত এই মাটির পৃথিবীর অন্তরালের সংবাদ—যে সংবাদ শুধু রোমাঞ্চকরই নয় পরম বিস্ময়কর এবং তার অনুভূতি ঠিক তেমনিই স্বসম্বেদ্য যেমন কতকটা আত্মানুভূতির।

বেদান্তে মানুষ জেনেছিলো অন্তরীক্ষকে সর্বগ্রাসীরূপে (গীঃ—গীরণাৎ)। তাকে বলা হয়েছিল চতুষ্কল ব্রহ্মের দ্বিতীয়পাদ ধ্যানমগ্ন মৌনীর মনের নিস্পন্দ নীরবতা। প্রজাপতি একবার ধ্যানস্থ হ'য়ে তাঁর রচিত বিশ্ব পরিকল্পনার ওপর মন সংযোগ করলেন এবং স্থির করলেন পৃথিবী থেকে অগ্নিকে, অন্তরীক্ষ থেকে বায়ুকে আর দ্যুলোক থেকে আদিত্যকে নিংড়ে নিতে হবে। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। অন্তরীক্ষথেকে বায়ু অন্তর্হিত হ'লো, দ্যুলোক থেকে সূর্য ও পৃথিবী থেকে অগ্নি—পৃথিবী, শীতলাভব। অন্তরীক্ষ অষ্টবসুর এক বসু। এইতো হ'লো মোটামুটিভাবে অন্তরীক্ষ সম্বন্ধে উপনিষদ ও শ্রুতির কথা। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সারা পৃথিবীতে দাপাদাপি ক'রে তৃপ্ত না হ'য়ে এখন অন্তরীক্ষ ভ্রমণ ক'রে গ্রহ উপগ্রহে লাফিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু স্বতন্ত্র।

অন্তরীক্ষ যে নিবাত, নিষ্কম্প, শান্ত ও গভীর তমসাচ্ছন্ন এ সংবাদ তাদের আছে কিন্তু আজ

তাদের প্রয়োজন নতুন সত্য উপলব্ধির। অন্তরীক্ষযানে ঘুরে বেড়িয়ে আজ নতুন পথের যাত্রীরা জেনেছে, শূন্য অন্তরীক্ষতেই শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার, তাপের অপরিশ্রান্ত বিকিরণ, ছোট বড় গ্রহ নক্ষত্রের অগুন্তি টুকরো-টাকরা সারাক্ষণ ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে—আছে সেখানে চুম্বকের টান—বৈদ্যুতিক শক্তির উত্তাল তরঙ্গ। আজকের দিনের শ্রুতির উল্লেখ করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকের নতুন আবিষ্কারগুলো বাদ দিলে চ'লবে না। শ্রুতিবাক্যের সঙ্গে বিরোধ কিছু নেই কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রয়োগশালার সত্যগুলো যদি শ্রুতিবাক্যের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে তাতে সত্যই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে, সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। প্রশ্ন হ'তে পারে জড় জগতের সত্যের সাথে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জগতের মিল কোথায়? তার উত্তরে আমি বলব—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—যিনি এই জগতের শাসনে সমর্থ পরমাত্মা পরমেশ্বর। তিনি প্রত্যগরূপে সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে থেকে সমস্ত জগৎ যথা নিয়মে শাসিত ও পরিচালিত করছেন। এই জীব জগৎ, এই পৃথিবী, পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ, চন্দ্র, সূর্যগ্রহ তারা, নদনদী গিরিবর সবই যদি তিনিই হন তখন বেদান্ত ও বিজ্ঞানে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ কেন প্রতিষ্ঠিত হবে না? যেখানে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন সম্ভব হবে না আমি বলবো আজ যে কথা বলা সহজ বলে মনে হচ্ছে না কাল কাল যে তা বলা যেতে পারে না তা নয়। তবে আবার একথাও সত্যি—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপ নেয়া—তর্কের দ্বারা তাঁর প্রতি মনমতি হবে না, পরমাত্মার দর্শন হবে না কারণ তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে অবাঙমনসো গোচরম্।

অনাদি অতীতের জানি না কোন অজ্ঞাত দিনটি থেকে আরম্ভ হয়েছিলো বেদান্ত দর্শনের ক্রমবিকাশ,—সেদিন হয়ত বিজ্ঞহানের জন্মই হয় নি। ভারতের কৃষ্টি ও সাধনার ধর্ম ও দর্শন গ'ড়ে উঠেছিলো কতক পরিমাণে এই মাটির পৃথিবীকে অবহেলা ক'রে, সবই মায়া—সবই ভুল এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করে এবং পরমাত্মা পরব্রহ্মের অস্তিত্বকে প্রথম থেকেই স্বীকার ক'রে নিয়ে। অথর্ববেদে বা আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে তার প্রাধান্য প্রকাশ পায় নি আত্মশক্তি ও আত্ম চর্চ্চার আপ্রাণ সাধনার প্রভাবে। বৈদিক যুগে আরণ্যক শিক্ষাকেন্দ্র গুলিতে শুধু শিক্ষা দেওয়া হতো ব্রহ্ম বিদ্যার পন্থা ও তার অনুশীলন। অনেক খোঁজাখুঁজি করলে শুক্রাচার্য্যের মত রাসায়নিকের দুই একটা উদাহরণই পাওয়া যাবে কিন্তু পাশ্চাত্য ইতিহাসে এমন মনীষী ব্যক্তিদের উল্লেখ পাওয়া যাবে যাঁরা একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দু'ধারার মাঝে একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাওয়া যাবে—প্রাচ্য জ্ঞানের অনুশীলনে বিজ্ঞানের হাত ধ'রে চলা পছন্দ করে নি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলনে তেমনি দর্শনের নির্দ্দেশ ও সঙ্কেত গুলোকে অবহেলা ক'রেছে। বহুদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ধর্ম্ম ও দর্শনকে বাদ দিয়ে চ'লেছে। আজও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মধ্যে দুই ভাবের ভাবী রয়েছেন—একদল বিজ্ঞানকে ধর্ম্ম ও দর্শনকে বিজ্ঞানের অনুশীলন থেকে স্বতন্ত্র রাখতে চান আর একদল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। তাঁদের বিজ্ঞানে চরম অনুশীলন তাঁদের অন্তর্মুখীন করেছে। এনে দিয়েছে তাঁদের মনে এক অশরীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস। আজ মনে হয় আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হ'য়েছি যখন বিজ্ঞান ও দর্শনের মিলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রদীপ শিখার ক্ষীণ রশ্মি দিয়ে সূর্য্যের পরিচয় করান যেমন বাতুলতা তেমনি আধুনিক বিজ্ঞান

যতই উন্নত হোক তার সাহায্য নিয়ে দর্শনের সত্যগুলিকে ব্যাখ্যা করা বা দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়কে অনুভব করা এক বিড়ম্বনা। বিজ্ঞানের নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই বিশ্বের বা মানবের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরিপূর্ণতায় ভরা আলেখ্য রচনাতে সে সক্ষম হয় নি। বৈজ্ঞানিক আজও সন্দেহের চোখে দেখে—ওঁ পূর্ণ মদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব শিষ্যতে—র মন্ত্রকে। বিজ্ঞানের চলবার ধারাটা হ'লো অংশ থেকে পূর্ণতার দিকে, দর্শনের পূর্ণ থেকে অংশের দিকে। বিজ্ঞান পূর্ণতা সম্বন্ধে কিছুই বলতে চায় না, পূর্ণতা তার কাছে ধারণার অতীত। পূর্ণতাকে জানতে পারা যায় কিনা সে বিষয়ে বিজ্ঞান যথেষ্ট সন্দিহান। সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর যদি ইন্দ্রিয়াতীত এবং বিশ্বাতীত হন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাঁকে জানতে চেষ্টা করা ব্যর্থতারই নামান্তর, সুতরাং ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে চলাই ভালো—এই হ'লো সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানের মত। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অবশ্য যাঁরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ যেমন জেমস্ জীন, স্যর আর্থার এডিংটন, স্যর জগদীশচন্দ্র বোস, আইনষ্টাইনের মত স্বতন্ত্র। এরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং এদের বিশ্বাসের ভিত্তি হ'লো বিজ্ঞানের প্রয়োগশালার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি।

বিজ্ঞানের ঈশ্বর ও দর্শন না মানার মূলে আর এক যুক্তি আছে। ঈশ্বর যদি এই বিশ্ব রচনার কারণ হন এবং কার্য্য কারণ সম্বন্ধের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে যদি তিনি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকেন তাহলে জগতের প্রতিটি জিনিষের থেকে তিনি স্বতন্ত্র নন এবং কার্য্য ও কারণের মধ্যে তিনিই বিদ্যমান। কার্য্য ও কারণ, পূর্ব্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ, পন্থা ও পরিণতি এই সসীম পৃথিবীর রাগ-রাগিণী সুতরাং ঈশ্বরও সসীম। তিনি যদি সসীম পৃথিবীর বস্তু হন অসীমত্বের সঙ্গে তাঁর তাহলে সম্বন্ধ হ'তে পারে না অতএব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া উচিৎ। বস্তুত এ যুক্তি ভ্রমাত্মক তাঁকে বলা হ'য়েছে তিনি কার্য্য কারণাতীত। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আছে ও বটে আবার নেই ও—দুটাই সত্য। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্লেষণের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়ে, মনে করছেন যেন কিছু অজানা বস্তু এবং অচেনা অংশ র'য়ে যাচ্ছে যা ঠিক ঠিক বলা সম্ভব হচ্ছে না।

দার্শনিক স্পীনোজা বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর পৃথিবীর বহির্বস্তু নন এবং এখানকার প্রত্যেকটি জিনিষের সাথে তাঁর সম্বন্ধ রয়েছে। ঈশ্বরই সত্যবস্তু এবং প্রকৃতির অন্তরালে তারই অস্তিত্ব বিদ্যমান।

আইনষ্টাইন একবার বলেছিলেন "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন প্রকৃতির শৃঙ্খলার ও সুসংবদ্ধ ছন্দের মাঝে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও প্রয়োগ ক্রিয়ার আধার হলো এই বিশ্বাস যে এই পৃথিবীর চলার গতি, ছন্দ তাল সুনিয়ন্ত্রিত কোথাও বেতালা বেসুরো নয় এবং সকলেরই বোধগম্য। আকস্মিক ঘটনার এখানে স্থান নেই।" বিজ্ঞানাচার্য—আইনষ্টাইনের এই উক্তির পর মনে হয় প্রকৃতির মনে যেন কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে, বিশ্বে যা কিছু ঘটছে, এ যেন তার চেতন মনের ক্রিয়া। আইনষ্টাইনের ঈশ্বর যেন কতকটা বেদান্তের "তমীশানং বরদং দেবমীড্যম্" এর কাছাকাছি এসে পড়েন অর্থাৎ—'হে প্রভু, তুমিই সেই ঈশান যিনি সারা বিশ্বকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালিত করছেন।

পূর্ব যুগের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে স্বীকার করতেন না এই ভাবধারাটি বহুকাল প্রভাবিত করেছে বিজ্ঞান জগতকে। কিন্তু ভৌতিক বিজ্ঞান ও গ্রহনক্ষত্র বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণাগুলি যেন বিশ্ব প্রপঞ্চের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চায়, আর চায় বিশ্বরচনার মূলাধার মহদিচ্ছাকে উঁচু ক'রে তুলে ধরতে। হয়তো বা এই প্রচেষ্টার মূলে আছে বিজ্ঞানের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি। যেমন ভৌতিক বিজ্ঞানে বহু যায়গায় উল্লেখ করা হয় শক্তি শব্দটির কিন্তু কোথায় সে বৈজ্ঞানিক যে ব্যাখ্যা করবে এই শক্তি কে ?

আর এক কথা—একদিন ছিলো যে দিন ভৌতিক বিজ্ঞানের দম্ভ ছিল যে সে আমাদের বসবাসের এই গ্রহটির ও সৌর জগতের অনেক কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারে। তার অনুভূতি পূর্ণতার পর্যায় উঠে গেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেলো 'তার দাবী মিছে এবং অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। তার দৃষ্টিভঙ্গী আংশিক। ধরা যাক সে একটা তুইশো ইঞ্চি প্রতিফলক যন্ত্র দিয়ে বিশ্বের বাঁকা রেখার পরিধিকে সে দেখেছে, (perijohery of the cosmos) কিন্তু তার দেখার মাঝে বহু না দেখা জিনিষ রয়ে যাচ্ছে কারণ তার যন্ত্রটা মাত্র তুইশো ইঞ্চির, যদি সেটা ধরা যাক, পাঁচশো ইঞ্চির হ'ত তাহলে অনেক না দেখা, জিনিষও ধরা প'ড়ে যেতো। ভৌতিক-বিজ্ঞান আর বস্তুর পূর্ণতার ছবির সন্ধান দিতে অক্ষম।

আজ ভৌতিক-বিজ্ঞান গবেষণার আধারের ওপর নির্ভর ক'রে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ব্যাখ্যা করবে ইলেকট্রনের আচার-ব্যবহার, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—"ইলেক্ট্রনের সংখ্যা কত ?" সে বলবে—'তা নিয়ে কি দরকার' ? কি নিয়মে ইলেকট্রনের কার্যকলাপ চলতে থাকে সেটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক।

তেমনি ক'রেই ভৌতিক বিজ্ঞান বলতে পারবে না মহজাগতিক রশ্মির কস্‌মিক রশ্মির উৎপত্তির কথা। এ এক অজানা শক্তি। জগতে এমন কোন বস্তু বা প্রাণী নেই যার ওপর প্রভাব নেই। কিন্তু এই রশ্মির যথাযথ স্বরূপ কি আজ বিজ্ঞান বলতে পারে না।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে জৈবশক্তি যাকে বেদান্তে প্রাণ-শক্তি বলে অর্চনা করা হয়েছে সে যে কেবল খাদ্যপ্রাণ থেকে শক্তি আহরণ করে তা নয়, ভৌতিক শক্তি ও রাসায়নিক শক্তি থেকেও আহরণ করে অথচ আজপর্যন্ত প্রাণশক্তির ব্যাখা বিজ্ঞান করে উঠতে পারে নি। আমাদের এই দেহ অসংখ্য জীবকোষ দিয়ে তৈরী। জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন জীববিজ্ঞানের ইতিহাস কোন এক অজ্ঞাত দিনে সৃষ্ট হয়েছিলো। এই জীবকোষ-কণা নিয়ে আসে প্রাণের স্পন্দনের সংবাদ যতদিন সে ছিল 'একেবাহম্ দ্বিতীয়া কা মমাপরা' সেদিন নাকি মৃত্যু ছিলো না এই পৃথিবীতে। পরে এলো 'একংহম্ বহুস্যাম' এর এষণা এই জীবকোষকণা এক থেকে বহু হলো। আজ জীবদেহে অপূর্ব শিল্প সম্পদ ও কর্মতন্ত্রের উদ্ভাবনী শক্তি লক্ষ লক্ষ জীবকোষের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রত্যেকটি জীবকোষ একএকটি ছোট কারখানা। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন দেহের মধ্যে জীবকোষের মিছিল যতদিন অব্যাহত ও অপ্রতিহত থাকে ততদিনই আমাদের জীবন। যেদিন তারা ছত্রভঙ্গ হয় মৃত্যু এসে ডাক দিয়ে যায় আমাদের কানে। এই জীবকোষের একটিকে আলাদা করে নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় কিন্তু কোন সে বৈজ্ঞানিক যে আজ বিশ্লিষ্ট জীবকোষকে পুনর্গঠিত ক'রে দেবে ?

কার ও কি সে তত্ত্ব জানা আছে ?

এই জীবকোষগুলিতে ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে 'পাবক কুণ্ড' (মিটোফণ্ড্রিয়া) যার কাজের তালিকা হলো জীবকোষে প্রবিষ্ট চিনির কণাগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা এ, টী, পী (এডিনোসীন ট্রাইফসফেট) নামক এক রাসায়নিক পদার্থ নির্মাণে শক্তি—সরবরাহ করা আর খাদ্যকণাগুলিকে শক্তিতে পরিণত করা। বৈজ্ঞানিকেরা আজও নির্বাক 'মিটোফণ্ড্রিয়ার শেষের কর্তব্য সাধন সম্বন্ধে। এমন বহুবিষয় আছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পরিধির বাইরে। তবুও আমি বলব যতটা ও যেখানে সম্ভব দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলন হোক। তাতে দর্শনের সত্যগুলিরই পুষ্টি সাধন হবে।

আজকের যুগে বেদান্ত ও বিজ্ঞানের কাছাকাছি আসার প্রয়োজন কেন ? বেদান্তদর্শন যতই শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, এবং বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় যতই নির্বিবাদ অকার্য যুক্তি সম্পন্ন হোক না কেন, দর্শনের তত্ত্বগুলিকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে ঘষে নিলে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রথমদিকের সন্দেহ ও সংশয়গুলির নিরাকরণ হয় তাছাড়া এপথের পথিক যারা তাঁদের একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও থাকা দরকার। যে ক্ষেত্রে 'করতল আমলকবৎ' প্রত্যক্ষের কথা বলা হয়েছে সেখানে প্রমাণ প্রতি পদে পদে পেলে ভাল হয়—তাতে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। আত্মজ্ঞান লাভ করতে চেষ্টা করা অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার তো কিছু নয়। আমার মনে হয় মানুষের ইতিহাসের যে কোন ছবিতে—যদি দর্শনের আঁচড় পড়ে থাকে তাকে বিজ্ঞানের রং ফলিয়ে একটু ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে নেওয়া ভালো। পৃথিবী নশ্বর তো বটেই কিন্তু জানতে দোষ কি ভৌতিক বিজ্ঞান এই পৃথিবী সম্বন্ধে কি বলতে চায়। এই ভাবে যদি অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে মানুষ কোনদিনই অন্ধবিশ্বাসের ও কুসংস্কারের খপ্পরে পড়বে না।

একদিন ছিলো যখন বিজ্ঞানদর্শনের বিষয়গুলিকে অবাস্তর ও কাল্পনিক মায়াজাল ব'লে উড়িয়ে দিতো, আজ তার এই জগৎ সম্বন্ধে নূতন কথা বলার দিন এসেছে, আজ সে পেতে চায় দর্শনের মাঝে তার প্রশ্নের উত্তর এবং আজ সে দেখতে চায় দর্শনকে তার সাথী রূপে । প্রকৃতির মধ্যে আজ বিজ্ঞান দেখতে পেয়েছে স্পষ্ট দু'টী রূপ, একটী গুণের অপরটী পরিমাপের, একটী অন্তর্মুখীন বস্তু অপরটী বহির্মুখীন। বহির্মুখী প্রকৃতির রূপের পরিচয় বিজ্ঞান কিছু পরিমাণে জানে কিন্তু তার গুণের পরিচয় বিশেষ জানা নেই।

আর একটি ভাববার কথা এই যে বিজ্ঞান ও দর্শনের আধার হ'লো মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। দার্শনিক নিজের মত ক'রে প্রকৃতিকে দেখেছে, পেতে চেষ্টা করেছে তার বাস্তবিক রূপকে, বিজ্ঞান করতে চায় তার বিশ্লেষণ। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কোথাও বা পার্থক্য আছে কোথায় আছে মিল। এই পার্থক্য ও মিলের সামঞ্জস্য প্রয়োজন নয় কি ?

এতক্ষণ বেদান্ত ও বিজ্ঞান নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হলো। বেদান্ত ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। জীবন কেবলমাত্র গতিশীল বস্তু নয়, যার মাঝে শুধু দেখতে পাওয়া যাবে সংঘর্ষ আকর্ষণ এবং ঘাত প্রতিঘাত। মানুষ যেদিন বিজ্ঞানের বিশ্লেষণকারী ধারাটি নিজের মানসিক গতির ওপর প্রয়োগ করতে শিখলো সেদিন জন্ম হলো মনোবিজ্ঞানের।

যেকোন বিজ্ঞানের কার্যকারণ সম্বন্ধ ও তার পরিণতি আমরা বাইরে থেকে দেখতে পারি এবং তার মাপজোপ অঙ্ককষে বার করতে পারি কিন্তু মনের ক্রিয়ার যতই হিসাব-নিকাশ নিতে বসি না কেন ঠিক ঠিক তার হদিশ পাওয়া বাইরে থেকে সম্ভব হয় না। আমার মনের মধ্যে যা ঘটছে আমি যদি প্রকশে না করি বাইরে থেকে আমাকে দেখে অন্যে কতটুকু তার সন্ধান পাবে ?

ছান্দোগ্য উপনিষদে মনের উৎপত্তি অন্ন থেকে বলা হয়েছে। ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্ম অংশ হলো মন—'অন্নস্যাশ্যমানস্য যো অণিমা তন্মনো ভবতি।' তৈত্তিরীয় উপনিষদে মহামুনি ভৃগু মনকেই ব্রহ্মরূপে জেনেছিলেন কারণ মন থেকেই জীবজগতের সৃষ্টি, মনেতেই তাদের স্থিতি এবং মৃত্যুর পর মনের মধ্যেই পুনঃ প্রবেশ। চিন্তাই হলো সকল কাজের জনক। সেজন্যই হয়তো মহামুনি মনকেই ব্রহ্ম বলে ধরে নিয়েছিলেন। ছান্দোগ্য বলেন মনেতেই বাসনা ও সঙ্কল্প, সন্দেহ শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা ধৃতি ও অধৃতি, শালীনতা, মেধা ও ভয়ের বাসস্থান।

পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা ভিন্ন। তাদের বেশীরভাগ কারবার মানুষের স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্ক নিয়ে। দেহযন্ত্রের পুরাপুরি জ্ঞান না থাকলে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান বোঝা শক্ত। স্থানান্তরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করা যেতে পারে। এখন এইটুকু বলা যেতে পারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথায় নুনের পুতুল সাগর মাপতে গিয়ে একাকার না হওয়া পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়েই 'অবাঙমনসো-গোচরম' পরব্রহ্মের পথে বিচরণ করাই ভালো তাহলে অনেক জটিলতার সহজে সমাধান হতে পারে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও দর্শনের পারস্পারিক সম্বন্ধ নিয়ে বিশেষ কিছু কাজ হয় নি তাই মনে হয় এক আর একের মিলনে হয়তো একই বস্তুর পূর্ণরূপের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে—যদি তা না হয় হয়তো তৃতীয় বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে যা মানুষকে আনন্দ দেবে।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

শ্রী (সীতা ১১)॥

'আনন্দমঠে'র শান্তি, 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্লর ক্রমপরিণতি রূপে শ্রী সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু এই শ্রী পূর্বোক্ত দু'টি উপন্যাসের উল্লিখিত নারীচরিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে স্বতন্ত্র। শান্তি এবং প্রফুল্লর মত শ্রী'র জীবনেরও প্রধান বিষয় হল স্বামীপ্রেম। কিন্তু শান্তির ক্ষেত্রে যেখানে স্বামীর ব্রতের প্রতি আনুগত্য বৈরাগ্যের মাঝেও সুখের সন্ধান দিয়েছিল, প্রফুল্লের নিষ্কামসাধনা যেখানে স্বামীগৃহে এসে তৃপ্তিলাভ করেছিল, সেখানে শ্রীর স্বামী প্রেম বিপরীতমুখী স্রোতে প্রবাহিত হয়ে সীতারামের জীবনের ট্রাজেডিকে তীব্রতর করেছে।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামীর কাছ থেকে শ্রীর পলায়নী মনোবৃত্তির পিছনে একটি দৈব ঘটনাকে কাজে লাগিয়েছেন। গঙ্গারামের প্রাণরক্ষাকল্পে শ্রী সীতারামকে নিঃসংকোচে অনুরোধ করেছে। তখনো স্বামীর প্রতি তার বিরাগ অপেক্ষা একটা অভিমানের ভাবই বর্তমান ছিল। গঙ্গারামের পলায়নের পর সীতারাম যখন শ্রীকে নিরাপদে শ্যামপুরে পৌঁছে দিতে চেয়েছে, তখন শ্রী অভিমানের বশেই বলেছে—"এত কাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজিও কাটিবে।" (১৬) কিন্তু যখনি শ্রী সীতারামের কাছে শুনলো যে তার কোষ্ঠী গণনা করে জানা গেছে সে প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণ হবে এবং যেহেতু স্ত্রীর কাছে স্বামীই প্রিয়জন তখনি অন্ধকারের মধ্যে পলায়ন করেছে। স্বামীর প্রতি ভালবাসাই শ্রীর পলায়নের কারণ।

সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর সান্নিধ্যে এসে শ্রী বাহ্যিক সন্ন্যাসিনীবেশ গ্রহণ করলেও অনেকদিন পর্যন্ত স্বামীকেই প্রাণের ঠাকুর করে রেখেছিল। জয়ন্তীর সংগে কথোপকথনে স্বামীর প্রতি শ্রীর ভক্তিই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল শ্রীর হৃদয়ে ধর্মভাব জেগে উঠেছে। সীতারামের স্থান অনেকটা দখল করে নিয়েছেন ঈশ্বর। এই পরিবর্তনের ইতিহাস বঙ্কিম দেননি, তার ফলেই অনেকে অভিযোগ করেন শেষ বয়সে বঙ্কিমের ধর্মচেতনা উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার সাহিত্যমূল্য ক্ষুণ্ণ করেছে।

যে স্বামীর প্রাণহত্যার ভয়ে শ্রী পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, সেই শ্রীই আবার পরবর্তীকালে ধর্মভাবে ভাবিত হয়ে যুক্তি দিয়েছে—"মারিবার কর্তা একজন—যে মরিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন।" (২.৮)

এই মনোভাব বজায় রেখেও শ্রী যদি সীতারামের কল্যাণের জন্য, সীতারামের প্রতি কৃপা বর্ষণ করত তাহলে অনেকটা সামঞ্জস্য থাকত। কিন্তু শ্রী তখন নিষ্কামধর্মের শুষ্ক তত্ত্বমাত্রে পরিণত হয়েছে। আবার সীতারামের সামনে রূপের ডালি সাজিয়ে রেখে সীতারামের তৃষ্ণা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এর জন্য দায়ী অনভিজ্ঞতা—সংসার অনভিজ্ঞতা এবং সন্ন্যাস অনভিজ্ঞতা। এই শ্রীই

আবার সীতারামের সর্বনাশের শেষ সময়ে ফিরে এসেছে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে।

শ্রীর চরিত্রের এই পরিবর্তনের স্রোত, বঙ্কিম তাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত করতে পারেন নি। তার ফলে শ্রীচরিত্র যতটা আরোপিত রূপক মনে হয়, ততটা স্বাভাবিক হয় নি।

শ্রীর চরিত্রের একদিকে স্বামীপ্রেম, অন্যদিকে ভ্রাতৃপ্রেম। গঙ্গারামকে রক্ষা করার জন্য সে বারবার চেষ্টা করেছে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও গঙ্গারাম বেঁচে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শ্রী-ই গঙ্গারামের মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

শ্রীকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন, সংসারধর্ম থেকে কিংবা স্বামীর পথ থেকে স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন পথে চলতে থাকে তাহলে সংসারে শ্রীর অভাব দেখা দেয়।

শ্রীনাথ (চন্দ্রঃ ২।৪) ॥

শ্রীনাথ সুন্দরীর স্বামী। "শ্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখন কখন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন।" শৈবলিনীর অপহরণকালেও তিনি শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন এবং শৈবলিনীকে উদ্ধারের জন্য সুন্দরীর সংগে নৌকা পর্যন্ত গিয়াছিলেন। গৃহস্থ বধূ সুন্দরীর বাইরে বেরোন সম্বন্ধে পাঠকের সন্দেহ না জাগাবার জন্যই বঙ্কিম শ্রীনাথকে সর্বদা সুন্দরীর সংগে সংগে রেখেছেন।

শ্রীমতী (বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ) ॥

"শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থকন্যা দাসীভাবে তাঁহার (সূর্যমুখীর পিতার) গৃহে থাকিয়া সূর্যমুখীকে লালন-পালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ।" (৬ষ্ঠ পরিঃ)

"শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।" (৬ষ্ঠ পরিঃ)।

শ্রীশচন্দ্র মিত্র (বিষঃ ৫ম পরিঃ) ॥

কমলমণির স্বামী। "শ্রীশবাবু প্লওর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হৌশ বড় ভারি—শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান। শ্রীশচন্দ্রও কমলমণির মত সদাহাস্যময়—তা' নাহলে স্ত্রীর চাপল্য শোভা পাবে কেন? শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে বড় ভালবাসে। তাই লোকে তাকে স্ত্রৈণ বলে। কিন্তু তাতে তার বড় ক্ষোভ নেই।'

কমলমণির পরামর্শদাতা হিসাবে শ্রীশচন্দ্রের উপস্থিতি। নগেন্দ্রকে শ্রীশচন্দ্র বড় ভালবাসতেন। সূর্যমুখীর খবর দানকালে নগেন্দ্রের উন্মত্ততা দেখে তিনি তাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দান করেছেন।

শের আফগান (কপাঃ ৩।১) ॥

ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু এ উপন্যাসে উল্লেখমাত্র আছে। তিনি মেহেরউন্নিসার স্বামী।

এখানে "শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্দ্ধমানের কর্মাধ্যক্ষ।"

শৈবলিনী (চন্দ্রঃ উপক্রমণিকা ১) ॥
'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ভাগীরথী যেমন আগাগোড়া কলকলতানে প্রবাহিত হয়েছে, শৈবলিনীও তেমনি সেই স্রোতস্বিনীতে ভাসমান পদ্মের মতই হাসিকান্নার লীলাচাপল্যে এই উপন্যাসের প্রাণরূপে অধিষ্ঠিতা। এ উপন্যাসের নায়িকা শৈবলিনী।

বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে কিনা—এ প্রশ্ন বঙ্কিমের মনকে আলোড়িত করেছিল, আর তারই দ্বন্দ্বসংকুল পরিচয় শৈবলিনীচরিত্র। একদিকে বঙ্কিমমানসের রোম্যান্টিক সৌন্দর্যকামনা শৈবলিনীকে প্রতাপের কৈশোরপ্রেমিকারূপে অঙ্কন করেছে, অপরদিকে আদর্শবাদী বঙ্কিমমন সমাজের অমঙ্গল কামনায় নির্দয়ভাবে শৈবলিনীকে সাজা দিয়েছে। লেখকের এই মানসদ্বন্দ্বের যুপকাষ্ঠে শৈবলিনী বিধ্বস্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে শৈবলিনী যথেষ্ট মধুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই বাল্যপ্রণয়ের মধ্যেই বঙ্কিম শৈবলিনীর ট্র্যাজেডির অংকুর নিহিত রেখেছেন। প্রতাপ শৈবলিনীকে বিয়ে করতে পারবে না জেনেও ভালবেসেছিল, কিন্তু শৈবলিনীর আশা ছিল প্রতাপকে বিয়ে করার। অর্থাৎ একজনের প্রেম—ঐহিক বাসনামুক্ত, তা' প্রেমের আত্মদানেই নিঃশেষিত, ভোগাসক্তিহীন ; অন্যজনের প্রেম—মাটির পৃথিবীতে ঘর বেঁধে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষার নিয়োজিত। তাই প্রতাপ মরার জন্য অসঙ্কোচে ডুবে যেতে পারল, শৈবলিনী পারল না। গঙ্গাবক্ষে প্রতাপের সংগে ডুবতে না পারার পাপেই, শৈবলিনীকে জীবনব্যাপী হাবুডুবু খেতে হয়েছে।

চন্দ্রশেখরকে বিবাহের ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীচরিত্রে নিতান্ত সাধারণভাবেই সংস্থাপিত করেছেন। বরং চন্দ্রশেখরকে মাঝে মাঝে শৈবলিনীর প্রতি অবহেলা করার জন্য আত্মদংশন করতে দেখা গেছে, কিন্তু শৈবলিনী এ সম্বন্ধে নির্বিকার। বরং ভীমা পুষ্করিনীতীরে সুন্দরীর সংগে রসিকতা ও লরেন্স ফষ্টরের সংগে কথোপকথন থেকে মনে হয় শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সংগে গৃহজীবন আর দশটা বাঙালী মেয়ের মতই কাটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু লরেন্স ফষ্টরের অপহরণ শৈবলিনীর জীবনের গতি পরিবর্তিত করে দিল। শৈবলিনীর হৃদয়ে যে প্রতাপ এতদিন সুষুপ্ত ছিল, সেই প্রতাপকে পাবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা যে কত বেশি অবাস্তব, কত বেশি প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ তা সে পরে বুঝতে পেরেছে।

শৈবলিনীর ভাগ্যবিপর্যয়ে এই বহিরঙ্গ আলোড়ন ইন্ধন জুগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অন্তরের পাপপ্রবৃত্তিও তার ট্র্যাজেডিকে গভীরতর করেছে।

শৈবলিনীচরিত্র বিদ্যুৎ বা অগ্নির সঙ্গেই তুলনীয়। উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্না, এই নারী স্বামীগৃহ থেকে অপহরণের পরই আগুন জ্বালিয়েছে। দ্রুত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে শৈবলিনীচরিত্র জটিল হয়ে উঠেছে। প্রতাপের সংগে মিলিত হবার জন্য, শৈবলিনী নবাবের মুখোমুখি হয়েছে, ছিপ নিয়ে ভাগীরথীতে উজান বেয়েছে, শেষ পর্যন্ত দয়িতের সংগে সন্তরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে।

'চন্দ্রশেখরের' পূর্ববর্তী উপন্যাসে এরকম সক্রিয় নায়িকা আর বঙ্কিম আঁকেন নি। পরবর্তীকালে দেবীচৌধুরাণীতে এর চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। সীতারামের শ্রীও যথেষ্ট সক্রিয়।

শৈবলিনীচরিত্রের প্রতি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়েছে তৃতীয় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমস্ত কল্পনাশক্তি নিয়োজিত করেছেন এই পরিচ্ছেদ বর্ণনায়। এমন সংহত বর্ণনা ও কথোপকথনের মধ্যে এমন অনাবিল সৌন্দর্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। এখানেও বাল্যকালের মত—সেই নদী, সেই সন্তরণ, সেই প্রতাপ-শৈবলিনী, সেই একই কাল—("বৎসরে কি কালের মাপ।" কিন্তু শৈবলিনীর মন আজ পরিবর্তিত হতে চলেছে।

"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ ?"

প্র। আমি।

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য আছে—বল আছে—কীর্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—আমার কি আছে প্রতাপ ?

প্র। কিছু না—আইস তবে দুইজনে জলে ডুবি।

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে, তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি ? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন ? প্রকাশ্যে বলিল, "তীরে চল।"

তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল। শৈবলিনী টানিল প্রতাপ উঠিল।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব ?

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল—বলিল, "প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমায় শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।" (৩।৬)

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের এখানেই সমাপ্তি হ'লে উপন্যাসটির উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পেত। শৈবলিনী চরিত্রের এখানেই পরিণতি। তার ট্র্যাজেডিও এখানেই গভীরতর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নীতিবিদ বঙ্কিমচন্দ্রের কলম থামল না। শৈবলিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের তিনি নিদারুণ বিধান দিলেন—নরকের স্বপ্নদর্শনে এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির দ্বারা। শুধু তাই নয়—প্রকারান্তরে প্রতাপের মৃত্যুর জন্য বঙ্কিম শৈবলিনীকেই দায়ী করেছেন। তারপর চন্দ্রশেখরের সংগে শৈবলিনীকে গৃহে পাঠিয়ে দিয়ে পাঠকচক্ষে শৈবলিনীচরিত্রকে হেয় করে দিয়েছেন। আসলকথা, শেষের দিকে প্রতাপের প্রেমের মহত্ত্ব বঙ্কিমের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। শৈবলিনীচরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় শাস্তি হয়েছে—লেখকের এই উপেক্ষা।

শৈলবতী (কৃঃ উঃ ১।১)॥

কৃষ্ণকান্ত রায়ের কন্যা। উপন্যাসে কেবলমাত্র নাম উল্লিখিত হয়েছে।

সখী (কৃ: উ: ১।৯) ॥
কৃষ্ণকান্তের গৃহের "একজন যুবতী চাকরানী।"

সত্যানন্দ ঠাকুর (আনন্দ: ১।১১) ॥
আনন্দমঠের সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ হয়েও সত্যানন্দ 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অনেকটা যেন দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। গতি তাঁর সর্বত্র, প্রত্যেক সন্ন্যাসীর গতিবিধি তাঁর নখদর্পণে, লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অসীম এবং পাণ্ডিত্যে তিনি অসাধারণ। একাধারে এই সমস্ত গুণের বিকাশে তাঁর চরিত্রটি অলৌকিক মর্যাদা লাভ করেছে।

শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত সত্যানন্দের সৌম্যমূর্তি প্রাচীন আর্যঋষিদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্তানসেনা সকলেই তাঁকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে। সত্যানন্দ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বলসঞ্চয় করলেও কখনও তাঁকে বলপ্রয়োগ করতে দেখি না। অথচ এই সত্যানন্দই ইস্পাতের ধনুকে গুণ দিতে সমর্থ।

শান্তি ও কল্যাণীর প্রতি মমত্বপূর্ণ ব্যবহার সত্যানন্দের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার পরিচায়ক। সত্যানন্দ গোপনে যেভাবে ভবানন্দের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছেন এবং ধীরানন্দকে দিয়ে তার পরীক্ষা নিয়েছেন তাতে তাঁকে যথার্থ দলনায়ক বলা যেতে পারে। তবে তাঁর আচরণের মধ্যে কিছু রহস্যময়তা সঞ্চারিত করা হয়েছে। মহেন্দ্রের সংগে তাঁর কারাগারে অবস্থান ও মুক্তি তাদের মধ্যে অন্যতম। এর দ্বারা সত্যানন্দকে আমরা ঠিক মানবচরিত্র বলে মনে করিতে পারি না।

সত্যানন্দ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। তাই জীবানন্দ সত্যানন্দকে সিংহাসনে আরোহণ করার কথা বললে—"সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন,—"ছি। আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি—আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না।" (৩।১২)

কিন্তু সত্যানন্দের পথ যে ভ্রান্ত একথা চিকিৎসক, যিনি সত্যানন্দের প্রেরণা, এসে বলেছেন। শেষ পর্যন্ত সত্যানন্দ মহাপুরুষের হাত ধ'রে ধর্মক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করেছেন।

সত্যানন্দ idea বা ভাবমাত্র। সে idea দেশভক্তির, সে idea কর্মনিষ্ঠার। তাই—"জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন।" (৪।৮)

সতীশচন্দ্র (বিষ: ১৩ পরি:) ॥
শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির পুত্র সতীশচন্দ্র তাদের আনন্দধামের যোগসূত্র। এই ছোট্ট ছেলেটিকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্কিম যে বাৎসল্যরসের স্ফুরণ ঘটিয়েছেন, তা সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্যে বিরল।

সন্ন্যাসী (রজনী ৩।৬)॥
রজনী উপন্যাসের সন্ন্যাসী যেমন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, তেমনি পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি নামচালা-হাতচালা ইত্যাদি তুকতাকের পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের অবতারণা করেন। তিনি শচীন্দ্রের মনে রজনীর ধ্যান অনুপ্রবেশ করান। তাঁর সর্বাপেক্ষা অলৌকিক কীর্তি রজনীর অন্ধত্ব মোচন।

সর্বধন বণিক (মৃণাঃ ১।৪)॥
মৃণালিনী যখন লক্ষ্মণাবতী নগরীতে হৃষীকেশের বাড়ীতে ছিল, তখন 'লক্ষণাবতী নগরীর প্রদেশান্তরে সর্বধন বণিকের বাটীতে হেমচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন।'

সমরু (চন্দ্রঃ ৬।৪)॥
"ওয়াইস্ সম্বর নামে একজন সুইস বা জার্মান মীরকাশেমের সেনাদলমধ্যে সৈনিককার্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল" উদয়নালার শিবিরে এই সমরুর কাছে ফষ্টর গিয়েই নবাবের হাতে ধৃত হইয়াছিল।

এটি ঐতিহাসিক চরিত্র। এঁর প্রকৃত নাম ওয়াল্টার রাইন্হারড (Walter Reinhard)। ১৭২০ খ্রীঃ এর জন্ম হয়। কথিত আছে তিনি একজন জার্মান কসাইএর পুত্র। এক ফরাসী জাহাজে নাবিকরূপে ভারতে এসে তিনি ফরাসী সৈন্যবিভাগে কাজ গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় সমুনর (Sumner) বা সমর্স্ (Somers)। ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী, অযোধ্যার নবাব, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসেম প্রভৃতি বহুজনের অধীনে কাজ করেন। অনেকে বলেন ইনি অশিক্ষিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ-এর ৪ঠা মে আগ্রায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সরফরাজ (আনন্দঃ ১।১)॥
'আনন্দমঠে'র ঘটনাকালে রাজস্ব আদায়ের কর্তা রেজা খাঁর সরফরাজ হবার কথা হয়েছে।

সরফরাজ খাঁ বাংলার একজন নবাব। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র। মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দিন নিজে সুবাদরী গ্রহণ করে পুত্রকে দেওয়ান করেন। ১৭৩৯ খ্রীঃ সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অলস, অকর্মণ্য ও দুশ্চরিত্র। ১৭৪০ খ্রীঃ নবাব আলিবর্দির সংগে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

স্বরূপচন্দ্র জগৎশেঠ (চন্দ্রঃ ২।৬)॥
দ্রঃ জগৎশেঠ।

উপন্যাসে উপেক্ষিতা

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বল্পতম স্থান জুড়ে আছে রূপসীর চরিত্র। আখ্যায়িকায় কোন ভূমিকা নেই তার। প্রভাবও নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের অবহেলা এবং উপেক্ষা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে সকলের দৃষ্টির আড়ালে। পাঠকের কৌতূহল অথবা সমালোচকের অনুসন্ধিৎসা পর্যন্ত দাবী করে না সে। পার্শ্বচরিত্র হিসাবেও তার মূল্য অনুপস্থিত। নিতান্তই নগণ্য তার পরিচয়।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সে চন্দ্রশেখরের প্রতিবেশী ভগ্নী, সুন্দরীর সহোদরা, প্রতাপের পত্নী। প্রণয়িনী সে নয়। কিংবা পুরুষের বন্ধু বা সহচরীও নয়। পরিবারস্থ সামান্য লোকের মত গৃহ আশ্রিত প্রাণী। এক কথায় রূপসী চন্দ্রশেখর উপন্যাসে সর্বসুখ বঞ্চিতা প্রতাপের স্ত্রী। জলবুদ্বুদেরমত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হলেও তাকে কখন তুচ্ছ করা যায় না। নিঃসন্দেহে ভাবনা জাগায় অন্তরে।

উপন্যাসের পৃষ্ঠায় একবার মাত্র আবির্ভূত হয়েছে প্রতাপের গৃহকোণে, বলতে পারি বিনা কারণে। কোন প্রয়োজন ছিল না তার সেখানে। তবু প্রতাপের জীবনকাহিনী সূত্রে বিধৃত করে লেখক তাকে উপস্থাপিত করেছেন, দিয়েছেন, পাঠককে তার পরিচয়। উপন্যাসে সে অনুপস্থিত থাকলে 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থের কোন ক্ষতি হত না। উপন্যাসে কোন জটিলতা সৃষ্টির কাজে তার কোন দরকার হয় নি। এমন কি তাকে দিয়ে প্রতাপের চরিত্র অথবা জীবন কিছুরই সংশোধন হয় নি। একটি অতিরিক্ত চরিত্র সংযোজন হয়েছে তাকে দিয়ে। জীবনের সারিতে তাকে আনার জন্যই কেবল উপন্যাসে উপেক্ষিতা সে।

আখ্যায়িকার দিকে তাকালেও বোঝা যাবে বঙ্কিমচন্দ্র রূপসীর প্রতি অবিচার করেছেন বেশী। উদ্ধৃতি উল্লেখ করলেই বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে।

'সুন্দরী' চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর নির্বাসন বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইলেন।

কিঞ্চিৎপরে মাথা তুলিয়া প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, 'এতদিন আমাকে একথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন ?

* * *

পরদিন প্রতাপ এক পাচক ও ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।...প্রতাপ কোথায় গেলেন প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, 'আমি চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সন্ধান করতে চলিলাম, সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।'......

সুন্দরী কিছুদিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া শৈবলিনীকে গালি দিল।...

একদিন রূপসী বলিল—তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্ম দৌড়োদৌড়ি করিয়া মরিতেছ কেন?

সুন্দরী বলিল 'তার মুণ্ডপাত করিব বলে—তাঁকে যমের বাড়ী পাঠাব বলে—তার মুখে আগুন দিব বলে' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রূপসী বলল—দিদি তুই বড় কুঁদুলী।

সুন্দরী উত্তর করিল, 'সেই'ত আমায় কুঁদুলী করেছে।'

সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে রূপসীর মোট স্থান এইটুকু। তারপর, দ্বিতীয়বার তার আর সাক্ষাৎ মেলেনি। রামায়ণের উর্মিলার মত সে নিঃশব্দচারিণী। অব্যক্ত বেদনা বুকে করে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মিছিলে হারিয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোন স্বতন্ত্র স্বত্বা দেন নি তাকে। এমনকি রক্তমাংসের প্রাণ পর্যন্ত নয়। সে যেন একটা নিষ্ক্রিয় প্রাণহীন মাংসপিণ্ডের পুতুল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় দেখলে একথা সহজেই মনে হবে। বন্ধুর আচরণে আহত সুন্দরীর যে অন্তর জ্বালা ধূমায়িত হয়ে উঠেছে রূপসীর মধ্যে (শৈবলিনী তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও) তার প্রকাশ কৈ? সংসার রঙ্গমঞ্চে তাকে নির্বাক সৈনিক বলে মনে হয়।

রূপসীর জন্য লেখকের কোন সহানুভূতি বা সমাদর পর্যন্ত নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের যা সম্পূর্ণ নিজস্ব, রূপসী তা থেকেও বঞ্চিত। বঙ্কিমসাহিত্যের পাঠক-মাত্রেই জানেন, নারীরূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য বলতে পারি। রূপসীর বেলায় তার ব্যাতক্রম দেখি, অনন্যা সে নয় বলেই কি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী নীরব?

রূপসীর প্রতি লেখকের ঔদাসীন্য তুলনাহীন। চিরকালীন জীবন-প্রণালীর সারিতে আর পাঁচজনের মত সে আসেনি। (উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে তা সপ্রমাণিত হবে।) এসেছে লেখকের উপেক্ষা আর অনাদরের অপমান নিয়ে। রূপসীর ভূমিকা থেকেই বুঝতে পারি প্রতাপ তাকে পত্নীত্বের আসন দিয়েছে কিন্তু ভালোবাসার জায়গা ছাড়েনি। শৈবলিনীর জন্য তার সবটাই তুলে রেখেছে। এখানে পরহিত ব্রত কেবল ছলনা মাত্র। আসলে, প্রকাশ তৃষ্ণায় আর্ত প্রতাপ। কাজের মধ্যে দিয়ে, সেবার ভেতর দিয়ে আপনাকে সে মেলে দিতে চায় শৈবলিনীর মধ্যে। সেই শৈবলিনী বিপদাগ্রস্ত শুনে উৎকণ্ঠিত প্রতাপ তার অনুসন্ধানে অগ্রসর। কিন্তু এক্ষেত্রে রূপসীর কোন ভূমিকা নেই। প্রতাপ তাকে সাক্ষীগোপালের মত ব্যবহার করেছে। প্রতাপের প্রণয়-মূঢ়তার পরিণাম দেখানোর উদ্দেশ্য লেখকের সার্থক। কিন্তু রূপসীর নারীত্ব হয়েছে দশজনের মাঝখানে অপদস্ত। যদিও নেপথ্য উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে অতি কৌশলে এই ভূমিকাটুকু সম্পন্ন করা যেত। রূপসীকে হেয় প্রতি পন্ন করবার জন্য, তাকে অনাদর দেখানোর জন্য, প্রতাপের গৃহে সংকীর্ণ স্থানটুকু নির্দ্দেশের জন্য রূপসীর প্রয়োজন ছিল না। প্রতাপের আচরণই ব্যক্ত করেছে সব। রূপসী কোন অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা দেয় না। কিংবা তার আবির্ভাব পাঠককে অভিভূত করে না। এ অবস্থায় স্বামীকে দিয়ে এই উপেক্ষাটুকু দেখানোর জন্যেই কি দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে রূপসীর সৃষ্টি করেছেন বঙ্কিম? লেখকের এই অশ্রদ্ধার জন্য উপন্যাসে সে উপেক্ষিতা।

প্রতাপের অবহেলা তাকে নিস্পৃহ করে। অধিকার বলে তাই সে কিছু দাবী করে না। এমন কি ঝগড়া-ঝাঁটি করে মান-অভিমান করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সুন্দরীর কুঁদুলী স্বভাবের জন্য সে

বিরক্ত বোধ করে। আচরণ দেখে তাকে রক্তমাংসের জীবন্ত মেয়েমানুষ বলে সন্দেহ হয়। তার মধ্যে কোনরকম সপত্নীগত বিদ্বেষ, বিক্ষোভ, প্রতি-নায়িকা মনোভাব কিছু নেই। প্রেমের অমৃত আস্বাদনের জন্য প্রতাপ যে পাগলেরমত শৈবালিনী সন্ধানে যায় এজন্য তার মাথাব্যথা নেই। দেহের রক্ত-কণিকাগুলো পর্যন্ত চঞ্চল হয় না তার। প্রতাপের উদ্ধত যৌবনের তাপটুকু হৃদয় দিয়ে কিংবা দেহের স্পর্শ দিয়ে অনুভব করারও লোভ নেই তার। রূপসীর এই নিষ্ক্রিয় প্রাণহীনতা লেখকের মানসিকতার ফলশ্রুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোবৃত্তির অন্তরালে রূপসী চরিত্র অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। রূপসীর ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের এর চেয়ে বড় উপেক্ষার আর কিছু নেই। নারীত্ব থেকে বঞ্চিত সে। তরুণ তরুণীর মধ্যে অনাদিকাল ধরে যে হৃদয়ের আকর্ষণ চলেছে রূপসীর জীবনে সে আশীর্বাদ বা অভিশাপ কোথায়? অন্ধকার গৃহকোণে নিষ্প্রভ দীপশিখা।

রূপসী চরিত্রে প্রণয় বঞ্চিতা চির তৃষিতা যে নারীহৃদয় রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে অবহেলা করেছেন। এমন কি তাঁর দাম্পত্য প্রেমের ফরমূলাও অপ্রযোগ রয়েছে তার বেলায়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস দাম্পত্য প্রেমই মানুষের চূড়ান্ত ও চরম নির্ভর। কিন্তু সে প্রেম'ত এখানে অবলম্বনহীন, আশ্রয়হীন। রূপসীর কোনো নির্ভর ছিল না। শৈবলিনীর সংগে যতপ্রকারের মিলন বা সাক্ষাতের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হলে আত্মহত্যায় বদ্ধপরিকর সে। রূপসীর প্রতি মায়া, মমতা, দায়-দায়িত্ব কর্তব্য বিস্মৃত সে। হৃদয়ে একবারও অনুভব করেনি তাকে। অন্তর তার শৈবালিনীময়। প্রতাপের আত্মহত্যার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে গর্ব করেন, রূপসীর বেলায় মানুষের প্রতি মানুষের সামান্য মমতাটুকু দেখাতেও বঙ্কিম-মানসিকতা কুণ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পসৃষ্টির দুর্বলতা রূপসীকে উপন্যাসে উপেক্ষিতা করেছে। অপর পক্ষে, প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের যে আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক অনুসৃত, এখানে যে তাও উপেক্ষিত সে কথা বলা বাহুল্য।

পরিশেষে বলা যায়, রূপসী পায়নি লেখকের করুণা, সমাদর, সহানুভূতি সহৃদয়তা। জীবনব্যাপী শূন্যতা তার সম্বল। শূন্যতার অনুভূতি তার হৃদয় সম্পদ। আত্মসুখের নিকষ পাথরে মানুষ যাচাই করে তার সফল প্রাপ্তিকে। রূপসী তার ব্যতিক্রম হয়েও উপেক্ষিতা। তাই পাঠক উপন্যাসে তার 'কোথায় উদয়াচল আর কোথায় অস্তাচল' ভাবতে বিস্মৃত হয়।

দীপককুমার চন্দ্র

আমি একা এবং সে ॥ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ—কলিকাতা-২৯

কবিতা সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নে কবি ও সমালোচকগণ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হলে তাঁদের একটিমাত্র উত্তর সমস্ত সমস্যাকে নির্মূল করে দেয় এই বলে যে, কবিতা অনুভূতির ব্যাপার কবিতা-বোধ চর্চার ফসল। আসলে 'কবিতা' যাই হোক না কেন দুর্জ্ঞেয়তাই যে কবিতার মূলমন্ত্র নয় এবং হতে পারে না তা' সর্বজন স্বীকৃত। রিলকের 'কবিতা' সম্পর্কে কি ধারণা বা অ্যারিষ্টটল কবিতা সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন সে সম্পর্কে আলোচিত হলেও কবিতার সংজ্ঞা আজও সুস্পষ্ট নয়। কারণ কবিতা কোন বিশেষ রূপ-রীতির দাস নয়। স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, প্রবহমান নদীর মত কবিতার রূপ-রীতি ভাববৈচিত্রও প্রবহমান। আর এই প্রবহমানতাই কবিতার প্রাণ।—আধুনিক কবিতা সম্পর্ক বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্যের আলোকে এই সত্যই উদ্ভাসিত যে, বাংলা আধুনিক কবিতার সমস্যা দুর্বোধ্যতায় নয়—সমস্যাটা গ্রহণের। আজকের কবিতায় যে-নতুন রীতি ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে এ কথা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে কবিরা বাগানে নতুন ফুল ফোটাতে উৎসুক।

অনেকেরই ধারণা, চিত্রকল্প ধ্বনি এবং শব্দব্যবহারই কবিতা। কিন্তু আসলে তা নয়। কবিতা কবির অভিজ্ঞতা এবং যুগ-চরিত্রের উপরও অনেকটা নির্ভরশীল। কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ হিসেবে যদিও একালকে চিহ্নিত করা হয় তবু মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে আধুনিক বাংলা কবিতার একটা চরিত্র গড়ে উঠেছে।

জীবনের বাস্তব দিককে নিয়ে কবিতা রচনার রেওয়াজ কল্লোল যুগ থেকে শুরু হলেও পাশাপাশি কবিতার আরেকটি রূপের, রোমান্টিকতার, চর্চা হয়েছে। আজকের কবিতা বাস্তবের পটভূমিকায় রচিত হলেও রোমান্টিকতা দূরের ব্যাপার নয়। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ 'আমি একা এবং সে' কবির রোমান্টিক মনের সুচারু ভাষ্য। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকায় নিজেই বলেছেন: 'বাস্তব-বিমুখ জীবন যেমন মূল্যহীন, রোমান্টিকতাকেও তেমনি জীবন থেকে দূরে রাখার প্রয়োজন নেই। 'আমি একা এবং সে' সেই সুর সমন্বয়েরই সিমফনি।' কবি বাস্তব বিমুখ না হলেও মনপ্রাণে যে রোমান্টিক তা' তাঁর রচনাতেই প্রতিবিম্বিত। মোট তেত্রিশটা কবিতা নিয়ে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত। এ থেকে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের তিন বছরের কাব্যসাধনা সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা জন্মে।

অরুণবাবু অতিমাত্রায় রোমান্টিক। এবং জীবনানন্দ দ্বারা প্রভাবিত। তা' ছাড়া তিনি অনেক সময়েই জটিল চিন্তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। কখনো চিন্তার মুক্তিপথে এসে নতুন করে আবর্তে পড়েছেন এবং 'চাঁদের লাভাতে ডোবা মৃতের শিবিরে' পৌঁছে 'মেঘ ছম ছম

আলোর বারান্দায়' হারিয়ে গেছেন। দুই নম্বর কবিতার শেষ দুই পংক্তি 'শ্রাবন্তীর কারুকাজ তুচ্ছ যার কাছে | মন যার কোণারক : 'হাজার বছর'—জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'এরকথা মনে পড়িয়ে দেয়। কখানো কবি স্বেচ্ছায় নির্বাসনে গিয়ে হারিয়ে যান দুপুরের বিষণ্ণতায়। 'আমি কাল নির্বাসনে যাব : | উধাও সমুদ্রের বুকে | ডিঙি ভাসিয়ে কোন দ্বীপে' (তিন নং)। 'অচেনা পাখীর ডাকে | অদেখা পাখিণী কোন | ইথারে কাঁপন তোলে।' 'দূরের স্বপ্নের হ্রদে কখন বিলীন'' কবি যখন মালতীর ভীরু হাত ধরে তখন 'ব্যাথার সেতার গুণ গুণ সুর তোলে'।' কবির পরিমিত ভাষণের জন্য কয়েকটি কবিতা আমাদের আশান্বিত করেছে। কোন কোন কবিতায় শব্দচয়নে তিনি দক্ষতা দেখাতে পারেননি। কয়েকটি চিত্রকল্পও আমাদের ভালো লেগেছে। সাউণ্ড এবং কালার এফেক্টে কবি অনেকাংশেই সার্থক। এই গ্রন্থের শেষ (৩৩ নং) কবিতা আমাদের কাছে কোন উপহার আনে না।

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'আমি একা এবং সে' সামগ্রিকভাবে ভাল লেগেছে। কবির স্ব-অঙ্কিত প্রচ্ছদপট সুরুচি এবং শিল্পীমনের পরিচায়ক। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

অন্য কোনো মুখ ॥ শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য। কলকাতা-২০। দু'টাকা।

ট্রাম-বাসের শব্দ-মুখর ব্যস্ততায় নয়, শহরতলীর কোন নিভৃত জানালায় 'অন্য কোন মুখ' নিরীক্ষণ করছিলাম। কবিতা-পাঠ পরিবেশ নির্ভর, এ কথা সহজ স্বীকৃত। তবু পরিবেশ হীনতায় কবিতা আস্বাদনে বিমুখ হয়ে কবি-হৃদয়ের প্রতি অবিচার করি আমরা, এমন দৃষ্টান্তও কম নয়।

আধুনিক মননের কাছে যা কাম্য, যুগ-যন্ত্রণার রূপায়ণ, তার দাবী নিয়ে পড়তে গেলে কবি শান্তিপ্রিয় আমাদের কিঞ্চিৎ নিরাশ করবেন। সমস্ত জটিলতা থেকে দূরে সহজ মানবিক অধিকার নিয়ে বাঁচতে চান তিনি। ফলতঃ তাঁর কবিতাগুলি ছোট ছোট স্নিগ্ধ সরোবর, তাতে আবর্ত নেই, পঙ্কিলতা জমা হয় না।

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার আত্যন্তিক সরলতা বাক-চাতুর্য নির্ভর কবিতা-রচনার দিনে ব্যতিক্রম, কিন্তু যে সরলতা গ্রামের মেয়েটির মতো সহজ অথচ দু'চোখে রহস্যের ইশারা আঁকা আমরা কবির কাছে সেই কবি-ভাষার প্রত্যাশী। যেমন 'আড়াল' কবিতায়,

না না থাকুক
ওটুকু আড়াল
বুকের বসনটুকু থাকুক
নিঃশ্বাসে মোর
আগুন-সম দাহ।

ভাষায় এহেন সরলতা আমাদের মনকে টানে, কিন্তু বেশীদূর নিয়ে যেতে পারে না।

বইটির প্রচ্ছদ অঙ্কনে রুচিশীলতার পরিচয় আছে। এঁকেছেন শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট ॥

রমাপ্রসাদ দে

কবিতা '৬৬ ॥ সম্পাদনা : মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। পরিবেশক : তুষার প্রকাশনী। কলিকাতা-৬। তিন টাকা ॥

একটি বছরের বাংলা কবিতার সামগ্রিক চেহারাকে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বর্তমান কাব্য সঙ্কলনে। মুখবন্ধে সম্পাদক অবশ্য বক্তব্য রেখেছেন যে 'বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গত এক বছরের পত্রপত্রিকায় আশ্রিত যে সমস্ত কবিতা আমার ভালো লেগেছে, মনকে নিঃসংশয়িত ভাবে নাড়া দিয়েছে, এমনকি অনেক সময় যা মননের সলতেকেও উস্‌কিয়ে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছে সেই সমস্ত কবিতাই আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সংকলনে গ্রহণ করেছি। অতি সম্প্রতিকালে যেখানে কবি ও কবিতার সংখ্যা প্রচুর, সেখানে কোনো একজন কবির একটিমাত্র কবিতা নির্বাচনের মাধ্যমে কবি-চরিত্রকে তুলে ধরা অসম্ভব জেনেও এরই মধ্যে যে বিশেষ একটিকে এক বছরের প্রকাশিত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে তাকেই সংকলনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছি। তবে এতে করে কবিচরিত্র খুব বেশী পরিষ্কার না হলেও একটি বছরের কবিতার সামগ্রিক চেহারা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট হবে'।

সর্বসমেত একাশীজন প্রবীন ও নবীন কবির কবিতা চয়ন করে একটি বছরের কবিতার সামগ্রিক চেহারাকে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন সম্পাদক। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে হঠাৎ এবং কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে '৬৬ সালের কবিতা নিয়ে সংকলন? বক্তব্যে অবশ্য কালসীমা সম্পর্কে যে কথা নিবেদিত হয়েছে তা খুব সুস্পষ্ট নয়। বিশেষত পাঠক যদি সংকলনটির সামগ্রিক কাব্যাস্বাদনে প্রয়াসী হন।

প্রতিষ্ঠিত বহু কবির পাশাপাশি অনেক অতি তরুণ কবিদের রচনা বর্তমান সংকলনে দেখতে পেয়ে উৎসাহিত হয়েছি। প্রতিষ্ঠিত কবিদের রচনার পাশাপাশি তরুণদেরও সম মর্যাদায় সংকলিত করায় বাংলা কাব্যের একটি বিশেষ সময়ের আবহাওয়া পাঠকমনে প্রতিফলিত হবে। কবিতা নির্বাচনের ব্যাপারে, মনে হয়, সম্পাদক খুব পরিশ্রমী হন নি। কেননা, অনেক কবি ঐ সময়ে আরো ভালো কবিতা লিখেছেন—যা হয়তো উদ্যোগী চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকবে। ফলে অনেক অ-কবিতা অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছে। যদিও কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পাদকের ভালো লাগা মন্দলাগার ব্যাপার আছে, তবু নিবেদন করবো, আগামী উদ্যমে তিনি এই বিষয়ে পরিশ্রমী হলে ভালো ফল লাভ করবেন। অন্ততপক্ষে একটা বিশেষ সময়ের একটি ভালো কবিতা সংকলন পাঠক লাভ করবেন—সেইটেই আমাদের প্রত্যাশা ॥

ইন্দ্রনীল সেন

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিশীলনরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

সমকালীন

ষোড়শ বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৭৫

দোলনার ছুটি

খোকার বয়স তিন বছর; ওর দোলনাটি অবশ্য ওর চাইতে একদিনের ছোট। ওদের জীবন প্রায় অচ্ছেদ্য ভাবেই সুরু হয়েছিলো। খোকা যখন আস্তে আস্তে বড় হতে সুরু করলো তখন দোলনায় শুয়ে ঘুমোনোটা ওর আর পছন্দ হচ্ছিলো না। ও নিজেকে অনেক বড় বলে মনে করতে লাগলো, কাজেই দোলনায় শোয়া ছেড়ে দিলো। দোলনাও ছুটি পেলো। তবে খোকা তার এই পুরানো সঙ্গীকে অন্য রকমভাবে ব্যবহার করার উপায় বের ক'রে ফেললো। দোলনাটা ওর ছবির বই, ব্যাট, পুতুল ইত্যাদি রাখার জায়গা হয়ে গেলো। মা বললেন "দেখো খোকার কত জিনিস; ও কত খুসী।" বাবা বেশ গর্ব্বের সঙ্গে হেসে বললেন "দোলনাটাকে অনেক দিনের ছুটি দিয়ে আমরা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিনি কি?" হ্যাঁ; ওরা সত্যিই বুদ্ধিমান।

বুদ্ধিমান বাবা মা পরিকল্পনা করেই পরিবার গঠন করেন। পরিবার পরিকল্পনার অর্থ শুধু কম ছেলে মেয়ে হওয়াই নয়, বাবা মা যখন সত্যিই আর একটি সন্তানের জন্য তৈরী হন তখনই শুধু সন্তান লাভ করাটাও পরিবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সন্তান জন্ম এখন আর দৈবের ওপর নির্ভরশীল নয়। পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিতে আপনি ইচ্ছানুযায়ী সন্তান লাভ করতে পারেন। বিনামূল্যে পরামর্শাদির জন্য আপনার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

davp 68/441

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

ষোড়শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

চৈত্র তেরশ' পঁচাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ভারতের জনগণনা ১৯৬১

ভল্যুম ১৬, পার্ট ৭ বি (ii)

পি, আর জি ১৬৩ (বি) (ii) (এন) পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীঅশোক মিত্র. আই সি এস কর্তৃক সম্পাদিত এবং ভারত সরকার কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া, ও হুগলী জেলার গ্রামে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা বৈচিত্র্যে ভরা বিবিধ পূজা-পার্বণ ও মেলার বিপুল তথ্যরাজি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দেশকে জানতে হলে জানতে হবে গ্রামকে, যে গ্রাম এখনও বেঁচে আছে তার পূজা-পার্বণ ও মেলায়। সেদিক থেকে এই গ্রন্থ অতুলনীয়।

ডিমাই কোয়ার্টো ৮½"×১১¼" সাইজে ৮০৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই গ্রন্থে ১৬টি মূল্যবান মানচিত্র, ৭৬টি মন্দিরাদির আলোকচিত্র এবং বহু রেখচিত্র সন্নিবেশিত। মূল্য : ১৪'৫০ টাকা মাত্র।

প্রথম খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

—প্রাপ্তিস্থান—

গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া পাবলিকেশন্‌স সেলস্ ডিপো

৮নং, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-১

এবং

অন্যান্য অনুমোদিত এজেণ্ট

davp 68/676

চৈত্র
তেরশ' পঁচাত্তর

ষোড়শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

নিবেদিতার ভারতবর্ষ

শিশিরকুমার দাশ

নিবেদিতা যে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই ভারতবর্ষ থেকে চিরকালের জন্য না হলেও বহুকালের জন্য আমরা নির্বাসিত। সেই ভারতবর্ষ ইতিহাসের ধূসরতায় অবলুপ্ত নয়; তা বর্তমানের মতই সত্য, তবে বর্তমানের মত প্রত্যক্ষ নয়। ভারতবর্ষের বহু কবি মনীষী নিজ নিজ প্রতিভার প্রকৃতি অনুযায়ী ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছেন—কেউ তার প্রাচীন যুগের মধ্যেই জীবনসাধনার চরমতম রূপকে লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই সন্ধান করেছেন ভবিষ্যতের আশা; কেউ অনুভব করেছেম পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মধ্যে দিয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই অখণ্ড কালপ্রবাহে গাঁথা। অতীত যতই রমণীয় হোক, তার পুনরাগমন ঘটে না। একই নদীতে একই বারই স্নান করা যায়। নিবেদিতা অতীত ভারতবর্ষকেই একমাত্র ভারতবর্ষ মনে করেননি।

নিবেদিতার ভারতবর্ষ বর্তমানের দীনদরিদ্র ভারতবর্ষ তারই অন্তরালে তার বিচিত্ররূপ, তার আপাত অনুর্ব্বর মাটিতে অতীতের মহিমার স্পর্শ, ভবিষ্যৎ শস্যের জন্ম সম্ভাবনা। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন, "এই সাহিত্যের মধ্যে থাকবে অতীতের বাণী, বর্তমানকে তা রূপান্তরিত করবে; আর তার মধ্যে নিহিত থাকবে ভবিষ্যতের আশা।" এই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কালপ্রবাহে ভাসমান অনন্ত ভারতী মূর্তিটির সন্ধান করেছেন নিবেদিতা। এই সন্ধানে যা কিছু আপাততুচ্ছ, ক্ষুদ্র বলে মনে হতে পারে, নিবেদিতা তাকেও বাদ দেননি, কারণ কে বলতে পারে ভারত জীবনের কোন সত্যটি তার মধ্যে লুকিয়ে আছে! ভারতবর্ষের নদীনদ, পাহাড়পর্বত, গ্রাম জনপদ; তার গোধূলি, তার নৈশ

নিস্তব্ধতা, তার জনপ্রবাহ, ভিক্ষুক, তীর্থযাত্রী, অসহায় নরনারী সবই তাঁর ভারত সন্ধানের পথের উপকরণ। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি পেয়েছেন গভীরতর সত্য—সব তুচ্ছতা, দীনতা ও নানা বিরোধিতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এমন একটি সূত্র যাতে গেঁথে নিয়েছেন ভারতবর্ষের নানারূপের পুষ্পস্তবক।

ভারতবর্ষের গোধূলি নিবেদিতার চোখে কত মূল্যবান। ভারতীয় কবিদের কাব্যে গোধূলির রহস্য, গোধূলির কোমল মাধুরীর কথা আমরা কতবার শুনেছি। রাত্রির কাছে দিনের আত্মসমর্পণের শান্তি, কর্মচঞ্চল জীবনের রক্তিম অবসানের কারুণ্য কবিকাব্যে বন্দিত। ভারতীয় সাধনসংগীতে গোধূলি পরিণত হয়েছে এক প্রতীকে, আলো থেকে অন্ধকারে, এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে যাত্রা করার সন্ধিলগ্ন। নিবেদিতা গোধূলির মধ্যে এই দুটি দিকই খুঁজে নিয়েছেন নিজের মতন করে। তাঁর Kali the Mother বই-টিতে লিখেছেন, "ভারতবর্ষে এই সময়কে বলা হয় 'কালের মোহানা", দিনের আলো ও রাত্রির ছায়া প্রায় একসঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়।......... 'gloaming' শব্দটির সঙ্গে আমাদের কত গভীর অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে—অন্ধকার ছায়ার শিহরণ, ঘরে ফেরার মাধুর্য, ঘুম জড়ানো চোখে শিশুর হাসি। ঠিক সেই রকম নানা অনুভূতি জড়িয়ে আছে ভারতীয় ভাষায় 'গোধূলি' শব্দটিতে।

"এই পার্থক্য কত স্পষ্ট। দূরে, মাঠের ওপারে গোপবালকেরা তাদের গোরুগুলি নিয়ে রাত্রের মত ঘরে ফিরছে। রৌদ্রদগ্ধ পথে তাদের পায়ের ক্ষুরে ধূলো উঠে পেছনে যেন মেঘের মত দেখাচ্ছে। গোঠের মেয়েটিকে মাঠের মধ্যে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে, সবই দ্রুত ম্লান হয়ে আসে, সমস্ত বাতাস যেন ধুলোয় ভরে গেছে।" গোধূলি শব্দটির সঙ্গে এত অনুষঙ্গ জড়ানো। নিবেদিতার মনে 'গোধূলি' এমন গভীর ছাপ ফেলেছিল যে নানা জায়গায় গোধূলির কথা বারবার বলেছেন। Cradle Tales of Hindusthan (১৯০৭) এর মধ্যে একটি গল্প বলতে বলতে গোধূলির কথা এনেছেন। গোধূলির সঙ্গে এসেছে গোপবালক আর গাভী। কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণায় নয়, কাব্যের উজ্জ্বলতায় নয়। ভারতবর্ষের জীবনের কাহিনী বলতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে গোধূলি বড় তাৎপর্যময়। এক পরিত্যক্ত জনবিহীন মাঠের রাখালবালকদের গল্প। কয়েক হাজার বছর ধরে তাদের জীবন স্রোত একই গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, বাইরে নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও গ্রামীণ জীবনের পুরাতন ধারা আজো বহমান। "দিনের বেলায় ঘাস খাওয়াবার জন্য তাদের মাঠে নিয়ে যেতে হয়, কোন হিংস্র জন্তু এসে যাতে আক্রমণ না করে, কিংবা পথ ভুল করে তারা অন্যত্র চলে না যায়, সেজন্য একজনকে সঙ্গে যেতেই হয়। তাদের গলায় বাঁধা থাকে ঘণ্টা, তাদের চলার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজে, যেন বলতে থাকে 'এখানে আছি,' 'এখানে আছি'। আর যখন তাদের গাঁয়ে ফেরার সময়, কী সুন্দর দৃশ্য তখন।

"একজন গোপবালক মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে তাদের ডাকে, আর একজন গোরুদের পেছনে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়; তারা এখান ওখান থেকে ধীরে ধীরে আসে, কখনও বা পথের ধারে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসে। রাখালেরা যখন দেখে সবাই এসে গেছে তখন তারা ঘরের দিকে যাত্রা করে—একজন সামনে, একজন পেছনে। আর তাদের মাঝখানে গাভীর দল।

তাদের ক্ষুরের আঘাতে রৌদ্রতপ্ত পথ থেকে ধুলো উঠতে থাকে মনে হয় যেন তারা এক ধাবমান মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছে, সেই ধুলোর গায়ে লেগে থাকে অস্তরবির রশ্মিআভা। ভারতবর্ষের লোক এই মুহূর্তটিকে বলে গোধূলি।"

গোধূলি অবসানের কাল। দিবাবসানেই ভারতবর্ষের অবকাশ। The Indian Sagas প্রবন্ধে কেমন করে ভারতবর্ষের মহাকাব্য কাহিনীর জন্ম হল অনুমান করতে গিয়ে নিবেদিতা ঘুরে ফিরে এসেছেন আবার 'গোধূলি' প্রসঙ্গে। "দক্ষিণের গভীর ও দ্রুত অন্ধকারের চেয়ে উত্তরের দীর্ঘস্থায়ী গোধূলি এই ধরণের কাহিনী বিকাশের উপযোগী। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে ভ্রাম্যমান কথকদের চারিদিকে সন্ধে বেলায় দালানে বা আঙিনায় গোল হয়ে বসেছে পুরুষেরা, মেয়েরা বসেছে আড়ালে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছে মনোহরণ কাহিনী।"

গোধূলির ছায়া ক্রমশই অন্ধকারে লুপ্ত হয়। নিবেদিতার চোখে ভারতবর্ষের রাত্রিগুলির অপরূপতা ধরা পড়ে। "ভারতীয় রাত্রিগুলিকে কখন ভোলা যায় না। বিশালব্যস্ত, গভীর অন্ধকার। বিরাট কোমল নক্ষত্রের আলো এক অজনা দীপ্তিতে জ্বলে আর কাঁপে; দূর পথচারী কোন রাত্রির মুশাফিরের কণ্ঠে ঈশ্বরের নামে নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। কিংবা শূন্য প্রান্তরে প্রহরে প্রহরে শোনা শৃগালের দীর্ঘস্থায়ী ডাক। চাঁদের আলো যেন তালের পাতায় নিস্তব্ধ কথা কয়, কৃষ্ণছায়া ফেলে। গম্ভীর কৃষ্ণরাত্রি যেন তার চেয়েও সুন্দর। সমস্ত বস্তুর অন্ধকারে বিলগ্ন সত্তা ও তাদের মৌনতা চিত্তের ওপরে এক বিশাল মাতৃত্বের অনুভব বয়ে আনে।" (The web of Indian life)

দিগন্তব্যস্ত অন্ধকার ও নিশীথিনীর নীরবতাকে তিনি যে চোখে দেখেছেন সেই চোখেই দেখেছেন নিকষকৃষ্ণা কালী-কে। "তাঁর পিঠের ওপর লুটিয়ে পড়েছে কালো চুলের রাশি; হাওয়ার মত কিংবা বলা যায়, কালের মত, তারই স্রোতে বস্তুপুঞ্জ ভেসে চলেছে।......তিনি ঘনশ্যাম, যেন কোন বিশাল ছায়ার মত কালো, জীবনমৃত্যুর ভয়াল বাস্তব রূপের মতই তিনি নগ্না।"

শুধু গোধূলি ও রাত্রি নয়, নক্ষত্রগুলিও নিবেদিতার ভারত সন্ধানের সহায়। সারা পৃথিবীর মানুষেরাই প্রাচীনকাল থেকে এই তারা-দের নিয়ে কত ভেবেছে, কত গল্প রচনা করেছে। ভারতবর্ষও নানা বিচিত্র কাহিনী সৃষ্টি করেছে। সপ্তর্ষি, কালপুরুষ, শুকতারা-কে নিয়ে নানা গল্প। কিন্তু সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে ধ্রুবতারা। ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য একটি বালকের একাগ্রতার কাহিনী সৃষ্টি করেছে ভারতবর্ষ। নিবেদিতা ধ্রুব কাহিনী প্রসঙ্গে বলেছেন "হিন্দুমনকে যেটি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিল সে এই নক্ষত্র খচিত আকাশ নয়, বরং ঐ নক্ষত্রগুলি আর বিশেষ করে ঐ অচঞ্চল ধ্রুবতারা। আশ্চর্য এই তারা!"

তারপর এসেছে পাহাড় ও নদীর কথা। পাহাড় ও নদী—এই দুই নৈসর্গিক অস্তিত্ব ভারতবর্ষের মানুষের প্রাত্যহিক ও ধর্মীয় জীবনে স্থান করে নিয়েছে। হিমালয় শুধু নগাধিরাজ নয়, তা দেবতাত্মা। গঙ্গা শুধু জলধারা নয়, জননী। কালিদাসের কথা মনে রেখেই নিবেদিতা হিমালয়ের বর্ণনা করেছেন, "সমস্ত রাত্রি আকাশের গায় অন্ধকার দেবদারুগুলির কম্পিত শীর্ষ দেখা যায়, বসন্তে ফুটে ওঠে বন্য গোলাপ ও ডালিমের লালফুল। চারিদিকে সুন্দর তরুরাশি,

সরস ফল আর বন্য কুসুমের অপ্রগলভ সমাবেশ—তাতেই পাখি ও পশুর আনন্দ। রুক্ষ পর্বতের শিখরে তুষারের কী শোভা, নীচের জঙ্গলের মতই সুন্দর।" এই হিমালয়, ভারতীয় কাব্য কাহিনীর পটভূমি, উমার খেলাঘর, শিবের সাধনক্ষেত্র, বসন্তসনাথ মদনের লীলাভূমি, রতিদেবের শ্মশানশয্যা, উমার তপস্যা প্রাঙ্গণ, শঙ্কর ও অন্নপূর্ণার সংসার।

নিবেদিতা আবার লিখছেন, "তুষারাবৃত হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে অগ্নিপূজারী আর্যরা দুটি ধারণার মধ্যে ঐক্য খুঁজে পেলেন। হিমালয়ের মত শুভ্র অগ্নিশিখা কি অবিরতই চিরন্তন তুহিনের ভস্মরাশি ভেদ করে আকাশস্পর্শী চূড়ার মত উঠছে না? এ কথা খুবই ভাবা যায় যে ঐ তুষার মৌনি গিরিচূড়া তাঁদের ভালবাসার প্রধান সামগ্রীকে পরিণত হয়েছিল। জগতের উর্দ্ধে কী নিস্তব্ধ, তার শীতলতা কী ভয়াল, সে কতদূর তবুও ভাষার অতীত সুন্দর—তারা কার মত? কেন—তারা ভস্মাচ্ছাদিত ধ্যান নিমগ্ন নীরব, নিঃসঙ্গ মহাসন্ন্যাসীর মত। তারা স্বয়ং মহাদেব শিবের মত।" শিব ও হিমালয় একাত্ম।

নিবেদিতা লক্ষ্য করেছেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য যেখানে বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে সেখানেই ঈশ্বরের পদস্পর্শ ঘটেছে এই হল ভারতীয় চিন্তার একটি দিক। নায়েগ্রা জলপ্রপাত যদি ভারতবর্ষে হত তাহলে তার নিকটে হোটেলর পরিবর্তে অবস্থিত হত মন্দির; সৌখীন ভ্রমণকারীদের বদলে যেখানে হত তীর্থযাত্রীদের সমাগম। উত্তর বোম্বাই-র জঙ্গলাকীর্ণ কেশরী গুহায় একটি পাহাড় কেটে বৌদ্ধরা তৈরী করেছিলেন একশ-আটটি কক্ষ। যেদিকেই প্রকৃতির রূপ সবচেয়ে মনোরম, যেখানেই সমুদ্র ও বনরাজির মিলনের শোভা সেখানেই তৈরী করা হয়েছে সোপানাবলী, একটি করে উপবেশনের স্থান। দু'হাজার বছর আগেও প্রকৃতি যেমন সুন্দর ছিল আজও তেমনই সুন্দর। আজও সেই স্থান সাধকের ধ্যানের ক্ষেত্র। নিবেদিতা লিখছেন, বৌদ্ধরাও এই ভাবে দেখেছিলেন, মুসলমানেরাও কালক্রমে প্রাচীন স্থানের মহিমাকে স্বীকার করেছেন, তাঁদের মহিমান্বিত ব্যক্তিদের সমাধিস্থ করেছেন সুন্দর স্থানে। ইলোরা সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছেন, "কিন্তু কেন এইস্থানকে প্রথম নির্বাচিত করা হয়েছিল? যে কোনদিন শিশিরসিক্ত ভোরে জেগে ওঠেনি, যে কখনও সমুদ্রের মত ব্যাপ্ত প্রান্তরের ওপারে তাকায়নি শুধু সে-ই এই প্রশ্ন করতে পারে। যদি পৃথিবী এমনই থাকে, তবে চিরন্তনকালের জন্য ইলোরা এক আশ্চর্যস্থান হয়ে থাকবে যেখানে ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের রহস্যের বিপুল প্রভাব দেখা দিয়েছিল।"

Foot falls of Indian History-র মধ্যে অজন্তার বর্ণনায় নিবেদিতা নির্জন পর্বত, ক্ষুদ্র পার্বত্য স্রোতস্বিনী, তরুসমাচ্ছন্ন পথের কথা বলতে বলতে আবার ফিরে এসেছেন এই কথায়: ঐ পরিবেশ সন্ন্যাসীর পক্ষে আদর্শ। ধাবমান জলস্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি, জলপ্রপাতের নির্ঘোষ তার সঙ্গে প্রাচীন স্তোত্র ও মন্ত্রের ধ্বনি মিশে সন্ন্যাসীর কানে এক অনন্ত সংগীত বাজাত। গোধুলিতে বাজত ঘণ্টা, প্রদীপ নিয়ে শোভাযাত্রা হত, ধূপ জ্বলত, পবিত্রজল ছড়ানো হত। গরমের দুপুরে পত্র পল্লবের কম্পনের মধ্যে শান্ত মন্থরতার ইঙ্গিত। অশোকের দুই শতাব্দীর আগে এই ছিল অজন্তার জীবন। গঙ্গা সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছেন, গঙ্গার প্রতি হিন্দুদের আকর্ষণের সঙ্গে কোন আধ্যাত্মিক বা Occult প্রেরণা নেই।" দুপাশের মানুষের কৃতজ্ঞতাবোধ জীবনের স্বাভাবিক

প্রেরণায় গড়ে উঠেছে। গঙ্গার মানবীকরণের মূলেও একই প্রেরণা। নিবেদিতা লিখেছেন, গঙ্গা—"সে কি আমাদের জীবনদায়িনী নয়?······দার্শনিকের চোখে সে জীবনপ্রবাহ, অপ্রতিহত গতিতে ছুটে চলেছে পরমের দিকে। পথিককে যে বলেছে বারাণসীর কথা, তুষারমৌলি হিমালয়ের কথা; বয়ে আনছে শিবও জগৎজননী উমা হৈমবতীর কাহিনী স্মৃতি। সেই বয়ে আনছে ভারতীয় খৃষ্টের ও গঙ্গার শাখা যমুনার তীরের বৃন্দাবনের কুঞ্জবনের রাখালবালকের সঙ্গে তাঁর যৌবনের খেলায় স্মৃতি। আর ইতিহাসের ছাত্রের কাছে গঙ্গা যুগযুগান্ত ধরে ভারতীয় চিন্তা ও সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন স্রোত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার প্রবাহপথে মানুষের জীবনের মধ্যে তাৎপর্য ও ঐক্যের সূত্ররচনা করেছে; আর ভবিষ্যতের কাছে বহন করে নিয়ে চলেছে অতীতের অসীম সম্ভাবনার বাণী। আর যে তাকে ভালবাসে গঙ্গা তার কাছে মানবী। আমরা যারা গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বহুদূরে সরে এসেছি তাদের এ ব্যাপার বোঝা কঠিন। কিন্তু কলকাতার সংকীর্ণ রাস্তায় বসবাস করার পর কল্পনা পুনর্জাগত হয়; চাঁদের অস্তগমনে তখন মনে হয় আচ্ছাদিত চরণে সেলিণি চলেছেন অশ্বারোহণে; ভোরের আকাশে বোঝা যায় এ্যাপোলোর আবির্ভাব, দিবসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ জল পৃথিবী যেন জীবন্ত সত্তার মত কথোপকথন করে।"

নিবেদিতা যে ভারতবর্ষকে দেখেছেন সে-দেশকে তিনি শুধু তার নদীপর্বত মাঠ—প্রকৃতির রূপের মধ্যেই সন্ধান করেননি। করেছেন সাধারণ মানুষের জীবনে। তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর মনে হয়নি তাঁর। The Master as I saw him গ্রন্থে কাশ্মীরের বর্ণনা দিয়েছেন। তার পপলার বীথি, অমবান্থফুলের রক্তিম ঐশ্বর্য, তার গ্রীষ্মদিনের নীলাভ ফুল, আইরিনা পূর্ণ ছোট পাহাড়! তার চন্দ্রালোকিত রাত্রে পাকা শস্যে ভরা মাঠের ধারে গ্রামবাসীর খেলা, মুসলমানদের সমাধিস্থলগুলি, নদীর ধারে যখন গোধূলি নামে তখন লোমশ ছাগলের পাল নিয়ে মুসলমান রাখলদের বাড়িফেরা, আপেল বনের ছায়ায় আসন বিছিয়ে সন্ধ্যার নামাজ পড়া—এ সবই কাশ্মীরের সৌন্দর্য। নিবেদিতার ভাষায় "সত্যিই। আমার মন বলে উঠছে সৌন্দর্যের কোন শেষ নেই। শেষ নেই।" কাশ্মীর বর্ণনায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। চীনার গাছের নীচে এক বৃদ্ধা, তার পরণে রক্তাক্ত পরিচ্ছদ, মুখে অবগুণ্ঠন। গাছের তলায় বসে সে চরকা কাটে। বিবেকানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মা তোমার ধর্ম কি? তার সমস্ত মুখ গর্বে ও আনন্দে ভরে উঠল, তার বার্দ্ধক্যনমিত কণ্ঠস্বরে ফুটল বিজয়ের উল্লাস, স্পষ্টভাবে সে বলল, আল্লার মেহেরবাণী; আমি মুসলমান।" নিবেদিতা এই ছবিটিকে মনে রেখেছেন। ধর্মানুরাগ মানুষকে কী করে শক্তি দেয় তিনি জেনেছেন। নিবেদিতা সাধারণ মানুষের নানা ছোট মুহূর্তের মধ্যে ভারতবর্ষের জীবনতত্ত্বের রহস্যকে উদ্ভাসিত হতে দেখেছেন। ভিক্ষুকদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন একটি তাৎপর্য। তারা লোকসংগীত ও কবিতার ধারক। ভারতের দেবতা মহাদেবও ভিক্ষুক।

Religion and Dharma গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন, ভারতবর্ষে "শিল্পের পুনর্জন্ম চাই। কিন্তু এখন যা হচ্ছে সেই ইউরোপীয় শিল্পের করুণ অনুকরণ নয়।······শিল্পের নবজন্ম অবশ্যই হবে, কারণ আজ যে নতুন উপকরণ পেয়েছে—সে উপকরণ ভারতবর্ষ স্বয়ং। মাদ্রাজের সমুদ্র উপকূলের পথে ঐ ছিন্নবাস পরিহিত চলমান পারীয়ার সৌন্দর্য যদি ব্রোঞ্জের উপর ফুটে উঠত, আর তা যদি জগতকে

উপহার দেওয়া যেত! যদি সমুদ্রের তীরে উষালগ্নে পূজারতা ঐ নারীর মূর্তি যদি ধরা পড়ত রং-এ! হায় যদি পেন্সিলের ছন্দে রূপায়িত হত ভারতীয় শাড়ির অপরূপত্ব, ঐ মন্দিরের, গ্রামের শান্ত জীবন, গঙ্গাতীরের নরনারীর আসা-যাওয়া, শিশুদের খেলা, গাভীদের কর্মরত জীবন, তাদের মুখগুলি!" নিবেদিতা চেয়েছেন এইখানে ভারতশিল্পকে তার উপকরণ খুঁজতে হবে। ভারতীয় জীবনে মধ্যেই প্রকৃত ভারতবর্ষ। আর সেই ভারতবর্ষের সন্ধান পেলে বিশ্বজননীকেও চেনা যায়—যিনি ভারতজননী—জননী। তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা লিখেছিলেন—

We hear them, O Mother
Thy footfalls
Soft, soft, through the ages
Touching earth here and there
And the lotuses left on thy footprints
Are Cities histories
Ancient scriptures and poems and temples
Noble strivings, stern struggles for Right

নিত্যশুনি, হে জননী
তোমার চরণধ্বনি,
যুগ থেকে যুগান্তরে লঘুপদ ভরে
ধরিত্রীকে তোমার চরণ স্পর্শ করে
তোমার পায়ের চিহ্নে পদ্মের মতন
জাগে জনপদ পুরাতন
জাগে শাস্ত্র, দেবালয়, বিকশিত গান
ধর্মের কঠিন দ্বন্দ্ব, উদ্যম মহান ॥

ইয়ংবেঙ্গল যুগ ও বঙ্গসংস্কৃতি

শিবপ্রসাদ হালদার

শতাব্দীর লোকাচার ও জীর্ণ সংস্কার ধর্মের উপর রামমোহন রায় যে আঘাত হানিলেন, তাহার প্রতিক্রিয়া উনবিংশ শতকের বাংলা দেশে গভীর প্রবাহের সৃষ্টি করিল। তাঁহার জীবনে জীবন লাভ করিয়া সকল দেশ জাগিয়া উঠিল। বস্তুতঃ তাঁহার একক সাধনায় বাংলা দেশের অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয় নাই, যদিও এই বিপ্লবের প্রধান হোতাই তিনি। যে স্বাধীন চিন্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল, তাহাই দেশ জাতির শুষ্ক অরণ্য ভূমিতে দাবানলের সৃষ্টি করিল। রক্ষণশীল সম্প্রদায় তাহাতে ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ সুরু করিল, আর প্রগতি উপাসক তরুণসম্প্রদায় তাহাতে চিত্তের সাধর্ম্য খুঁজিয়া পাইল। পশ্চিমী প্রভাব যখন এ দেশে ধীরে ধীরে দৃঢ় হইতেছে, সেই সময় তরুণমনের জাগ্রত জিজ্ঞাসা একদিকে যেমন তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি অন্য দিকে ইংরেজী শিক্ষাকে মুক্তি দীক্ষারূপে বরণ করিয়াছে। এই নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ সম্প্রদায়ের সাধন ক্ষেত্র হইল হিন্দু কলেজ। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মূলতঃ ইহাই পশ্চিমী বাতাসকে এদেশে সঞ্চারণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করে। ইহার সহিত আরও দুইটি প্রতিষ্ঠানকে স্কুল বুক সোসাইটি নানাভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারে সহায়তা করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সমসাময়িক কালের উত্তপ্ত চিন্তা বহু পত্র পত্রিকা সৃষ্টি করিয়াছে এবং কলিকাতার নগর জীবনে রাতারাতি নব যুগবার্তার ডাকহরকরা হইয়াছে। উপনিষদের নচিকেতার মন্ত্র লাভের মত অমৃত লাভের পরম উপায় সন্ধান করিয়া সেদিন কলিকাতায় বহুবিধ সংস্কৃতি চক্র গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তা যাহা ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রবাণীর মত অমোঘ ও প্রত্যয়দীপ্ত, একটি জ্ঞানান্বেষণের অভীপ্সা যাহা নানাবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উপজীব্য একটি সামাজিক প্রত্যক্ষবাদ যাহা একান্তভাবে ঐহিকমুখী তাহাই এই যুগের শিক্ষিত মানসের দৃষ্টিভঙ্গী। হিন্দুকলেজ তীর্থ ভারতী হইয়া সেই দিন এই উজ্জীবন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে।

ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন, "হিন্দু কলেজ ও রামমোহন একে অপরের পরিপূরক। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং তরুণ ছাত্রগণ ডিরোজিওর বহ্নি স্পর্শ লাভ না করিলে রামমোহনের আর্বিভাব অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হইত বলিয়া মনে হয়।" (১) বস্তুতঃ উক্তিটি ঐতিহাসিক সত্য সমর্থিত। হিন্দু কলেজ ও ডিরোজিও এক সংগেই উচ্চারিত হয় এবং রামমোহন যেমন সমাজের বৃহত্তর পটভূমি হইতে সংস্কারের প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, ডিরোজিও তেমনি হিন্দু কলেজকেই সেই সাধন পীঠরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধন ধর্মে উভয়ের পার্থক্য থাকিলেও সংস্কার মুক্ত চিন্তাধারায় উভয়ের ঐক্য আছে। রামমোহনের বীজ উষর ক্ষেত্রে পতিত হইত, যদি না ডিরোজিও ভাববন্যায় বাংলার মনোভূমিকে উর্বর রাখিতেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করিয়াছেন। এই স্বল্প কয়েক বৎসরে তাঁহার শিক্ষাদান হিন্দু সমাজএর ভাবধারা

পরিবর্তনে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হইয়াছিল। সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং সত্যানুসন্ধান ছাত্রদের প্রধান গুণ এবং তাহার কাছে College boy was a synonym for truth—হিন্দু কলেজের প্রকোষ্ঠে তিনি যে শুধু সফল শিক্ষকতারই পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে, ছাত্রদের মধ্যে তিনি একটি মহৎ চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ঘটাইয়াছেন, তাঁহার অন্যতম ছাত্র রাধানাথ সিকদার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা যাহা সমাজের শিক্ষিতদের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যাহা ভারতবর্ষের হিতকর না হইয়া যায় না—এ সকলের মূলে ছিলেন তিনিই।" (২) আবার এই চিন্তাধারা সুপ্রযুক্ত হইবার আরও একটি কারণ ছিল। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাবধারা, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শনের সকল দিক ক্রমে ক্রমে এখানকার ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। টম পেইনের Age of Reason এবং Right of man তাহাদের একেবারে সম্মোহিত করিয়াছিল। অতিরিক্ত চাহিদায় Age of Reasonএর মূল্য তো বহুগুণ বাড়িয়াই গেল।

যে স্বাধীন চিন্তা ও সত্যানুসন্ধান ডিরোজিওর শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল, তাহা—শিক্ষায়তনের বাহিরে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া সমাজ জীবনে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিল। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে পদার্পণ করিয়া "চুম্বকে যেমন—লোহাকে টানে, সেইরূপ প্রথম চারি শ্রেণীর বালককে আকৃষ্ট করিয়া লইলেন।" (৩) কলেজের পাঠগৃহ ছাত্রদের স্বাধীন চিত্তবৃত্তি বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয় দেখিয়া তিনি আপন বাসভবনেও নানা বিষয় আলাপ আলোচনা করিতেন। ইহারই ফলে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে "অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। সমসাময়িক কালের হিন্দু কলেজের অগ্রণী ছাত্রবৃন্দ এই সভায় বিতর্ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন এবং উর্দ্ধতন রাজপুরুষগণ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণও মাঝে মাঝে তাহা শ্রবণ করিতে আসিতেন। সভাপতি ডিরোজিও সমূহ আলোচনা বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ করিতেন। ডিরোজিরও জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ড এই—সভার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

"Free will, free ordination, fate, faith, the sacredness of truth, the high duty of cultivating virtue, and the meanness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God, and the arguments for and against the existance of the Deity as these have boen set forth by Hume on the one side and Reid, Dugald Stewart and Brown on the other, the hollowness of idolatry and the—shams of the priesthood, were subjects which stirred to their very depths the young fearless, hopeful hearts of the leading Hindoo Youths of Calcutta" (৪)

হিন্দু কলেজে তরুণদের যে স্বাধীন চিত্তোন্মেষ, এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনে তাহার পরিণতি। এই সভা একটি জীবন্ত প্রেরণা হইয়া যুবকবৃন্দকে দেশীয় রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মূলে কুঠারঘাত করিতে উদ্বুদ্ধ করিল। প্রচলিত হিন্দুধর্মের উপর ডিরোজিও শিষ্যগণের কালাপাহাড়ী মনোভাব জাগিয়া উঠিল। তাঁহাদের কাছে

"The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic

of many debates ; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state and it was these resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people" (৫)

এই যুক্তিপন্থী চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধরূপে প্রকাশ করিবার জন্য এসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ 'পার্থিনন' নামে ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যাটি ১৮৩০—খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। এদেশীয় জনমণ্ডলী তাহাতে যথেষ্ট বিপন্ন বোধ করিলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষও এই উগ্র চিন্তাধারা সমর্থন করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা হইতেই প্রচার রহিত করিলেন।

"সেই কাগজে এতদ্দেশীয়দিগের আরাধনা আচার বিচার ব্যবহারাদি বিষয়ে দোষোল্লাসকরণে তৎপ্রকাশদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছিল কিন্তু ধর্মের প্রভাবে বালকের বালকত্ব প্রকাশ হইতে পারিল না কেন না বালকেরা প্রায় সর্বদাই কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়। পিতা পিতামহাদি প্রতিপালক বা শিক্ষকের বিজ্ঞপ্তি হইলে অবশ্যই তৎকর্মে নিবারিত ও তাড়িত হয় পার্থনন পত্রের বিষয়ে তাহাই হইয়াছে অর্থাৎ আমরা শুনিলাম ধর্ম সভাজনিত ভয়ে ভীত হইয়া বালকেরা ঐ কাগজ করিতে নিরস্ত হইয়াছে ইহাতে পার্থননের যেমন উত্থান অমনি পতন হইল।" (৬)

বস্তুতঃ ডিরোজিওপন্থীদের এই ভাবধারায় হিন্দু সমাজ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেননা, এই তরুণ সম্প্রদায়ের পদচারণা ছিল প্রাচীন রীতিকে উৎখাত করিয়া। পার্থিনন কাগজে ইহার অঙ্কুর দেখা যায়। পার্থিনন আগামী কালের বিপ্লবের বার্তাবহ। এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালের বেঙ্গল স্পেক্টেটর এর সাক্ষ্য :

"উক্ত ডিরোজিও সাহেবের অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য হিন্দু সমাজ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়া হিন্দু ধর্ম স্বরূপ বৃক্ষের মূলে প্রথমত অস্ত্রাঘাত করেন, উক্ত বালকেরা সকল প্রকার উত্তম, রীতিনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সরল ও নিষ্কপট অন্তঃকরণের মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য প্রীতি তদ্বৃদ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে তদ্দৃষ্টে সকলেরই অনুমান হইয়াছিল। হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতিবর্ত অতি শীঘ্র পরিবর্তন হইবেক, ধর্ম সভার সভ্যগণের এতদ্গুরুতর ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন সফল হয় নাই।"

ডিরোজিও এই সর্বাত্মক প্রভাব হইতে ছাত্রদের মুক্ত করিবার জন্য কলেজ কমিটির হিন্দু সভ্যগণ বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহাদের মুখপাত্র হইলেন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ রামকমল সেন। দেশীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ডিরোজিওকে কলেজে প্রতিষ্ঠিত থাকা তিনি অনিষ্টকর বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। ডঃ উইলসন এবং হেয়ার সাহেব ডিরোজিওর পক্ষ সমর্থন করিলেও এদেশীয় সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন। ফলে অধিকাংশ সদস্যের মতে তাঁহাকে পদচ্যুত করা স্থির হইল। (৮)

ডিরোজিওর বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ডঃ উইলসন এ দেশের লোকের অভিযোগগুলি তুলিয়া ধরিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন :

Do you belive in God ? Do you think respect and obedience to Parents as

part of moral duty? Do you think the inter-marriage of brothers and sisters innocent and allowable? (৯)

ডিরোজিও সব অভিযোগই দৃঢ় প্রত্যয়ের দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। বিশেষতঃ নাস্তিকতার প্রশ্নে তাঁহার উত্তর গভীর আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় বহন করে। তিনি বলিলেন:

আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে ছেলেদের ধর্মে বিশ্বাস যদি টলিয়া থাকে, তাহার জন্য অপরাধ আমার নহে। তাহাদের মনে প্রত্যয় জন্মানো আমার সাধ্যাতীত এবং যদি কয়েকজনের আস্তিক্যহীনতার জন্য আমাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তবে অপর সকলের জন্য আমার কৃতিত্বও স্বীকার করা উচিত।......আমি মানুষের অজ্ঞতা ও মতের অহরহ পরিবর্তন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন, নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেও আমি কোন নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করি না। সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা আমাদের মনে এরূপ ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে যে, কোনরূপ গোঁড়ামী করিবার সাহসই আমার নাই। (১০)

বস্তুতঃ হিন্দু কলেজ, একাডেমিক এসোসিয়েশন, পার্থিনন সংবাদপত্র ইত্যাদিতে সংযুক্ত থাকিয়া এবং স্কুল কলেজের ছাত্রদের নিকট সাপ্তাহিক অধিবেশনে নীতি ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা করিয়া ডিরোজিও তরুণ সম্প্রদায়ের অন্ধ আস্তিক্যবিশ্বাসটি শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। নিজে সংশয়বাদী হইয়া শিষ্যকুলকে ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে সংশয়ী করিয়া তুলিয়াছেন। আর ইহারই অনুক্রমে অপরিণত চেতনায় চিন্তা, বোধ ও বুদ্ধির প্রমত্ত অহংকারে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী এদেশের যাবতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে।

কেবল ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ সংসর্গের ছাত্র সম্প্রদায় যে ধর্ম ও সামাজিক নীতি বিষয়ে সংস্কার মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা নহে। এই ছাত্রদের প্রভাবে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে সর্বক্ষেত্রেই ছাত্রসমাজ আচার নিষ্ঠা সম্পর্কে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে সুরু করিল। পান ভোজন হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা উপাসনার সর্বক্ষেত্রে এই তরুণ সম্প্রদায় যে উগ্র স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র সমাজ বন্ধনটিই শিথিল হইবার উপক্রম হইয়াছিল। "সে সময় সুরাপান করা কুসংস্কার ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রমপূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারকদলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। (১১) উপনয়নাদি সামাজিক সংস্কার এর উপর তাঁহাদের তীব্র বিদ্বেষ ছিল। তাহারা উপনয়ন ত্যাগ করিতে চাহিত এবং সন্ধ্যা আহ্নিকের পরিবর্তে ইলিয়ড হইতে আবৃত্তি করিত! রাস্তাঘাটে মুণ্ডিতমস্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলে তাহারা নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া তার স্বরে ঘোষণা করিত। (১২) সংবাদ প্রভাকরের সাক্ষ্যে পাওয়া যায় একজন গৃহস্থ পুত্রকে লইয়া কালীঘাটে ৺জগদম্বা দর্শনে আসিলে তাঁহার শিক্ষিত পুত্র আরাধ্যা মাতৃদেবীকে 'গুড মর্ণিং' বলিয়া সম্ভাষণ করিল। (১৩) এই শিক্ষিত সম্প্রদায় পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিল।

বাংলার সাংস্কৃতিক আকাশে ডিরোজিও ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বল্প কয়েক বৎসরের পুচ্ছ তাড়নায় তিনি বাংলার মনোজগতের এক বিপ্লব বাধাইয়া গেলেন। তাঁহার স্বাধীন

চিন্তাধারা সমাজের বৃহৎ ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইয়াছিল। স্বল্প হইলেও তীক্ষ্ণধী এক ছাত্রসমাজ তাঁহার ভাবধারাকে বহন করিয়াছে। ডিরোজিওর মত ইহারাও সমাজ ও ধর্মসংস্কারে মন দিয়াছেন। ইতিপূর্বে রামমোহনের দ্বারা এই সমাজ সংস্কারের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে: কিন্তু তাঁহার সহিত ডিরোজিওর ভাব প্রবর্তনার পার্থক্য আছে। এ সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন:

"সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁহার (রামমোহনের) প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজের বহিরঙ্গ মাত্র স্পর্শ করিয়াছিল, কয়েকজন ধনী ও জমিদার শিষ্য প্রশিষ্য ছাড়া আর কেহ তাহা বড় একটা সমর্থন করেন নাই। এই হেতু তাহা সমাজের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষা এইখানেই সমর্থক। তাঁহার শিষ্যদল ধনী বা জমিদার নহেন, সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত। একারণ ইহারা ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা ক্রমশ: সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। (১৪)

এই ডিরোজিও পন্থীদের জীবনধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম ও সামাজিক নীতিবোধের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ইহাদের অগ্রগণ্য কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় হিন্দু কলেজে এবং একাডেমিক এসোসিয়েশন ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসেন। শিক্ষাদীক্ষা ও পানাহারে তিনি এদেশীয় রীতিনীতি অবলম্বন করিতেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর Reformer কাগজ বাহির করিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তিনি ঐ বৎসরেই মে মাসে Inquirer কাগজ বাহির করিলেন। এই কাগজে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিতেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি বিদ্বেষ তাঁহার অন্তরে বহুদিন ছিল। (১৫) এই সময় আলেকজাণ্ডার ডাফ, টমাস ডিয়ালট্রি প্রভৃতির উদ্যোগে খৃষ্টধর্ম প্রচারের নবপর্যায় সুরু হয়। তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে নিষেধ করিতেন। কৃষ্ণমোহন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যাইতেন এবং তাঁহাদের সহিত আলোচনা বিতর্ক করিতেন। শুধু তিনি নিজেই নহেন, তাঁহার বন্ধুগোষ্ঠী তাঁহারই মত ধর্ম ও নীতি বিষয়ে অহিন্দুজনক আচরণ করিতেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহার অনুপস্থিতিতে কয়েকজন বন্ধু তাঁহার বাড়ীতে নিষিদ্ধ মাংস আহার করিয়া পার্শ্ববর্তী বাড়ীতে ফেলিয়া দেন। প্রতিবেশীগণের অভিযোগে তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন। (১৬) তাঁহার তীব্র হিন্দু বিদ্বেষের হয়ত ইহা ও একটি কারণ।

Inquirer ছাড়াও তিনি 'Persecuted' নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখেন। ব্রাহ্মণ সমাজের দৌরাত্ম্য ও তাহাদের চরিত্র শিথিলতার উন্মোচন করাই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন হিন্দুধর্মের রক্ষক সমাজে আচার অনুষ্ঠানে শৈথিল্য আসিয়াছে এবং তাঁহারা তথাকথিত নাস্তিকদের প্রতি দোষারোপ করিলে ও স্বধর্মের বিচারে তাঁহারাই দোষী প্রতিপন্ন হইবেন।

কৃষ্ণমোহনের ধর্মীয় জীবনের পরিণতি তাঁহার খৃষ্টধর্মে দীক্ষা। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তিনি ডাফের নিকট খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। সেই যুগের প্রগতিশীল ছাত্রদের মুখপাত্ররূপে কৃষ্ণমোহন ধর্মবিষয়ে শেষ মীমাংসা করিয়াছেন।

হিন্দুধর্মের উপর তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ষড়দর্শন গ্রন্থে। তাঁহার মতে বেদ অপৌরুষেয় নয় এবং তিন উপাধি বিশিষ্ট এক ঈশ্বরের পরিচয় হিন্দুশাস্ত্রে বিকৃত হইয়াছে, উহার শুদ্ধতাবস্থা কেবল বাইবেল শাস্ত্রেই আছে। (১৮) কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যায় তিনি হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা বাইবেলকেই প্রামাণিক বলিয়া মনে করিয়াছেন।

কৃষ্ণমোহন খৃষ্টধর্ম গ্রহণে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করিয়া স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহ দিয়া, সর্বার্থ সংগ্রহ মহাকোষ প্রণয়ন করিয়া তিনি তদানীন্তন কালের বিদগ্ধ মনীষী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। আবার তিনি ধর্ম ও সমাজের মূল নীতির উপর কুঠারাঘাত করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাকে 'কেষ্টোবান্দা'রূপ অবজ্ঞার আখ্যাও পাইতে হইয়াছে।

শুধু কৃষ্ণমোহনই নহেন, ইয়ং বেঙ্গল যুগের একটি বিরাট গোষ্ঠী বৈপ্লবিক চিন্তাধারায়, স্বাধীন চিন্তাবোধে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও সংস্কারের উপর আঘাত হানিয়াছেন। রামগোপাল ঘোষ, তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণমল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার প্রভৃতি সেই যুগের অগ্রণী যুবকবৃন্দ ডিরোজিওর নিকট স্বাধীনতার ও সংস্কার মুক্তির দীক্ষা লইয়াছিলেন। ইহাদের স্বাধীন চিন্তা একদিকে উনবিংশ শতকের বাংলা দেশে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগাইয়া দিয়াছে অন্যদিকে সমাজে সংস্কার মুক্তির প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার Political thought গ্রন্থে ইহাদের রাজনৈতিক ভূমিকার কথা আলোচনা করিয়াছেন। রামমোহনের পরোক্ষ উত্তর সাধক হিসাবে এবং ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ শিষ্য হিসাবে ইহারা বাংলা দেশে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র বপন করেন। ইহাদের ভূমিকা শুধুমাত্র ভাঙন এবং নাশন নয়, বহু কল্যাণাত্মিকা শক্তিরও ইঁহারা পরিচর্যা করিয়াছেন। প্রত্যেকটির মূলে একটি প্রবল সত্যান্বেষণ ইঁহাদের অনুপ্রেরণা দিয়াছে। রামগোপাল ঘোষের জ্বালাময়ী বক্তৃতা সেদিন স্বদেশী ও বিদেশী বিদগ্ধ মনীষীদের উচ্চকিত করিয়া দিয়াছিল। বৈষয়িক ক্ষেত্রে কৃতী পুরুষ, অপূর্ব বন্ধুবৎসল রামগোপাল ঘোষ উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের এক মহান চিন্তানায়ক। তাঁহার পিতা সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি যেন বলেন হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ বিরুদ্ধ আচরণ তিনি কিছুই করেন না। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আপনার অনুরোধে আমি সর্ববিধ কার্য করিতে এবং সকল ক্লেশ সহিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মিথ্যা বলিতে পারিব না। (১৯) আবার রসিক কৃষ্ণ মল্লিক জুরি কার্যে যখন উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "I don't belive in the sacredness of the Ganges."

তখন দেশের লোক চমকিয়া উঠিয়া ছিল। বেঙ্গল হরকরায় এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয় যে রসিককৃষ্ণ এই বলিয়া শপথ লইতে আপত্তি করিয়াছেন যে, তিনি উহা বুঝেন না এবং কোন ধর্মেই তাঁহার আস্থা নাই। কিন্তু রসিককৃষ্ণ এইরূপ উক্তির মধ্যে কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা পরিষ্কার করিয়াছেন :

"আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, কোন ধর্মেই আমার আস্থা নাই, একথা আমি বলি নাই। অন্যপক্ষে, আমি বিচারপতির নিকট স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম ঈশ্বরের কাছে আমার পবিত্র দায়িত্ব আছে এই জ্ঞানেই আমি এ জগতের কার্য করি। আমি এখানে বলিতেছি যে, এক

ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস কাহারও অপেক্ষা কম নহে। সকল প্রকার শপথেরই আমি বিরোধী এই উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাকে মাত্র দুই রকম শপথের কথাই বলা হইয়াছে : কাজেই আমি সর্বপ্রকার শপথের বিরোধী এরূপ কথা উঠিতেই পারে না। আমি অবশ্য বলিয়াছিলাম যে, পণ্ডিতের কথা আমি বুঝি না। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। তিনি সংস্কৃতে এমন কিছু আবৃত্তি করিতেছিলেন যাহা আমার নিকট প্রায় অবোধ্য। (২০)

বস্তুতঃ রসিককৃষ্ণ সম্বন্ধে গঙ্গার পবিত্রতায় অবিশ্বাসী ভাবিয়া একটি ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ আছে। তিনি যে সংস্কারের নিগড় ভাঙিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য ছিল।

'ইয়ং বেঙ্গল' যুগ বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়। রামমোহন ডিরোজিওর মত মহান চিন্তানায়কদের নিকট মন্ত্র দীক্ষা লইয়া তাঁহারা জীবন পরিক্রমা সুরু করিয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ারের মত উদার মনীষীকে তাঁহারা বন্ধু ও উপদেষ্টারূপে পাইয়াছিলেন; হিন্দু কলেজের শিক্ষায় তাঁহাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী আসিয়াছে ও সংস্কার মুক্তি ঘটিয়াছে। একাডেমিক এসোসিয়েশনের মত সংস্থায় তাঁহারা কর্ম জীবনের সূচীপত্র রচনা করিয়াছেন; জীবন জিজ্ঞাসার ব্যাপক অনুশীলনী ঘটিয়াছে 'লিপি লিখন সভা', 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জন সভা' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিতে। তিমিরাম্ন বিরাট শক্তির অধিকারী হইয়া তাঁহারা বাণীমন্ত্র প্রচার করিয়াছেন পার্থিনন, জ্ঞানান্বেষণ Hesperus, Enquirer, Hindu Pioneer, Quill, Bengal Spectator—প্রভৃতি পত্র পত্রিকা মারফৎ। আবার কর্মজীবনে তাঁহারা বিভিন্ন জনে রাজ পুরুষরূপে, শিক্ষাবিদরূপে, ন্যায়াধীশরূপে, সাহিত্যিকরূপে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। স্বক্ষেত্রে ও সকর্মে থাকিয়া তাঁহারা দেশ জাতি ও সমাজ সম্বন্ধে যে চিন্তা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা বহু সমাজ মঙ্গল কর্মসূচীর অধিনায়ক। নির্জিত দেশ জাতির বন্ধন মোচনের তাঁহারা প্রথম বৈতালিক। তাঁহাদের জীবন ও যুগ সাফল্য ও ব্যর্থতার যুগ্ম ইতিহাস।

এই সমস্ত কারণে বাংলার নবজাগরণে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একটি প্রত্যক্ষ ভূমিকাকে স্বীকার করতে হয়। আবার এই নবজাগরণে একটি ধর্মীয় উপাদান আছে। ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সেদিক হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য।

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী শুদ্ধ আস্তিক্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নয়, আবার পুরোপুরি নাস্তিক ও তাঁহারা ছিলেন না। দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর মতই তাঁহারা ধর্ম ও অধ্যাত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সংশয়বাদী ছিলেন। ধর্মীয় পরিবেশে সুস্থ ও প্রাণদ কিছু থাকিলে হয়ত তাঁহাদের সংশয় কাটিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহারা দেখিয়াছেন সংস্কার ও আচারবদ্ধ ধর্ম ও নীতি। হিন্দুসমাজের এক ক্ষয়িষ্ণু অধ্যায়ের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের সংশয়ী মন অবিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। চিত্তের প্রবাহে হিন্দু ধর্মের গূঢ় অন্তররহস্যকে তাঁহারা বুঝিতে চাহেন নাই, লোকাচার ও লোকরীতি আশ্রিত কোনরূপ সংস্কার বা পৌরাণিক চেতনাকে তাঁহারা আমলই দিতে চাহেন নাই। যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য থাকিত হিন্দুধর্মকে বোধ ও বুদ্ধির আলোকে বিচার করা, (to summon Hinduism to the bar of their reason) তাহা হইলে তাহা একেবারে গৃহদাহে পর্যবসিত হইত না। আবার তাঁহারা যে খৃষ্টধর্মের অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট

হইয়া স্বধর্ম ত্যাগ কিংবা পরধর্ম গ্রহণে তৎপর হইয়াছিলেন, তাহাও নহে। ধর্মকে তাঁহারা অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিতেই দেখেন নাই। ডঃ দাশগুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন, "যুবকগণ যে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে মিশনারিগণের অনুসরণ করিতে চাহিতেছিল, তাহা মুখ্যত খ্রীষ্টীয় ধর্মের মহিমা নয়, তাহা ভারতবর্ষে তাহার যে বাহন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা, তাহারই মহিমা। (২১) এইখানেই রামমোহনের সহিত ডিরোজিও পন্থীদের মূল পার্থক্য। রামমোহন হিন্দুধর্মকে সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যেও লোকহিত কামনা প্রত্যক্ষ ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি ধর্ম ও শাস্ত্রের সত্যকে অবলম্বন করিয়াই সংগ্রাম করিয়াছেন। তাহাতে যেমন খৃষ্টধর্মের নৈতিকদিক আসিয়াছে, যেমন হিন্দুধর্মের বেদান্ত আশ্রিত অদ্বিতীয়দের চিন্তা আসিয়াছে, তেমনি আসিয়াছে ইসলামের একেশ্বর সাধনা। বিভিন্ন প্রভাব স্বীকার ও স্বীকরণের মধ্য দিয়া তিনি আপন মতামত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি দৃঢ় প্রতীতির উপর তিনি বরাবর আস্থা রাখিয়াছেন। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী সেদিক দিয়া যান নাই। তাঁহারা সংস্কার করিতে গিয়া উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছেন। Calcutta Christian observerএ তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

"(They) have at once renounced both in theory and practice the whole system of Hindusim, pure and impure, ancient and modern, Vedantic and Pauranic ; and who being thus left in a region of vacancy as regards religion, have announced themselves to the world as free enquirers after truth". (22)

রামমোহন যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্মের লোকাশ্রয়ী রূপটি স্থান পায় নাই, দার্শনিক রূপটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজ তাহাতে বিচলিত হইলেও তাহার সভ্যতাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই ; কিন্তু ডিরোজিও পন্থীরা আবেগ দিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্মের দার্শনিক বা লৌকিক কোন রূপটিই গৃহীত হয় নাই। হিন্দু সমাজের সমগ্র সৌধটিই তাহাতে ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে তাহাই প্রতিরোধ করিবার জন্য রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিবিধ আয়ুধ রচনার আয়োজন দেখা যায় ॥

১। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলাসাহিত্য—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৮২

২। ১০। ১৪। ২০ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—যোগেশচন্দ্র বাগল পৃঃ ১২৬

৩। ৫। ৮। ১১। ১২। ১৫। ১৬। ১৯ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। ২য় সং। শিবনাথ শাস্ত্রী

৪। Quoted in History of Political Thought—Dr. B. B. Mazumdar P 86

৬। ৭। ১৩। ১৭। সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১০৪

৯। The Indian Awakening and Bengal—N. Bose P.44

১৮। ষড়দর্শন সংবাদ—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫২২

২১। আমাদের পরিচয়—ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত পৃঃ ১৬৮

২২। Calcutta Christian observer হইতে উদ্ধৃত বাংলার জাগরণ কাজী আবদুল ওদুদ পৃঃ ৫৮

প্রবন্ধের মুখ-বন্ধ

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

যুক্তিভিত্তিক বক্তব্যকে গুছিয়ে (সাজিয়ে নয়) পেশ করলেই বলা যেতে পারে প্রবন্ধ। 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন' অর্থে এই 'ক্রম' ভিত্তিক গোছানকেই বোঝাই। আমার বক্তব্য সমর্থনযোগ্য না হতেও পারে কিন্তু তা যেন এলোমেলো না হয়। অবশ্য আবেগলালিত অন্যান্য রচনাতেও অসংলগ্নতা আদরণীয় নয়। মাতালের বিচ্ছিন্ন প্রলাপ ছাড়া অ-সংবদ্ধতার কোথাও স্থান নাই। কিন্তু আবেগের ক্ষেত্রেও কলমের তোড়, মনের উচ্ছাস এবং কবির বোধ-বেগগুলো এক অনির্দেশ্য সূত্রে গাঁথা থাকলে পাঠকের সুবিধা। প্রবন্ধের মধ্যে নীরস গদ্যের কর্কশ তর্কাবশেষ সর্বদাই সহজদাহ্য হয়ে থাকে। যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যে মাথার—ঘিয়ের ছোঁয়া পড়লেই আগুনের শিখা পণ্ডিতের শিখা ছুঁয়ে যায়। প্রবন্ধের এই নীরস প্রেমিসের স্রোত কেবল এক শ্রেণীর বুদ্ধিবাহী জীবের 'পাঠ্য' বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের প্রতি অনীহা তো কেবল ছাত্রদেরই নয়—সারাদিন 'গরু চরিয়ে' অধ্যাপকের ক্লান্ত মননও এতে গররাজী হতে পারে। অর্থাৎ কঠোর শুষ্ক প্রবন্ধের পাঠক যে অধ্যাপক শ্রেণী, তাঁরাও একদিনের ক্যাজুয়াল লীভে দস্তুরমত 'প্রস্তুতি' নিয়ে বসলে তবেই পড়তে পারবেন 'প্রবন্ধ'। অথচ 'প্রবন্ধ'কে-তো অযথা যুক্তিজালের জট জন্মালে সর্বাঙ্গ বদ্ধ থাকতে হবেই!

প্রবন্ধও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতই ভাষাবাহী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যাবে মুদ্রিত সাহিত্য, বাংলা গদ্য, এমনকি মূল বাংলার মুদ্রিতরূপও একই সঙ্গে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে বাংলা প্রবন্ধের সৃষ্টিরও শুভলগ্ন মিলে গেছে। এর আগে ভাষা ছিল সাধু সংস্কৃত ও কথিত গ্রাম্যবাংলা। বস্তুত শেষেরটিতে বড় জোর ছড়া চলতে পারে কিন্তু সতীদাহ-বিরোধী শাস্ত্র-প্রমাণবাহী বক্তব্য পেশ করতে তার কোন যোগ্যতাই নেই—বিশুদ্ধ পয়ারেও সতীদাহ-বিরোধী বক্তৃতা চলত কিনা সন্দেহ। অতএব নান্য পন্থা হিসেবে সংস্কৃত শাস্ত্রের কোটেশনের সঙ্গে তৈরী বাংলা-গদ্যগঠনেও রামমোহন সংস্কৃতকেই আদর্শ গ্রহণ করলেন। তাই বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই সহোদর মাত্র। অর্থাৎ মুদ্রিত বাংলাসাহিত্যে বাংলা গদ্য বাংলা প্রবন্ধ এই স্রোতটি একই লগ্নে শুরু হয়েছে। এর ফলে বাংলা প্রবন্ধে সংস্কৃতভাষা বন্ধনরীতি লালিত্য (ইফ এনি) সবই সংস্কৃতের পথ ধরে এসেছে। তাই রামমোহনের প্রবন্ধগুলো পড়তে গিয়ে কনভেশন গড়ে উঠছে সাধুভাষাই বুঝিবা প্রবন্ধের রীতি। রামমোহনের প্রবন্ধ সংস্কৃতেরই নামান্তর প্রথম দিকে। কিন্তু এর ফলে প্রবন্ধ মানেই সংস্কৃত ভাষা নয়, বাংলা গদ্যেরও জন্মও ঠিক তখনই হয়েছে বলে এই বিপত্তি। গুপ্তকবি যতই বলুন দেওয়ানজীর ভাষা জলের মত তরল। প্রমথ চৌধুরীর কথাই ঠিক। রামমোহনের ভাষা সর্বদা পূর্বপক্ষকে বৃত্ত করে অন্ধের মত ঘোরে। বীরবলের মত সহজ সরল তীক্ষ্ণ-স্পষ্ট নয়। বস্তুত এটা একটা এ্যাকসিডেণ্টাল কো-ইনসিডেন্স। বাংলা ভাষার লিখিত রূপ তখনও অজানা গদ্যে। সদ্য ভাঙনধারা সংস্কৃতেই তার অবলম্বন। উপরন্তু, ঐতিহাসিক কারণে প্রথমদিকেই বাংলা ভাষায় প্রবন্ধের প্রয়োজন পড়েছিল বেশী। কিন্তু তার মানে যে প্রবন্ধ মাত্রকেই

সেই মৃত সংস্কৃত শুদ্ধ ব্যাকরণের বিধবা সহধর্মিণী হয়ে থাকতে হবে চিরদিন তা নয়। মনে করুন সে যুগে নতুন উপন্যাসগুলোও প্রথমদিকে 'তুমি বিনা অন্ধকার' ভেবে সংস্কৃতের বাঁধানো রাজপথেই হাঁটতে চেয়েছে। শ্রীরামপুরের কেরী সাহেব কেরাণীদের দেশীয় ভাষা শেখাতে 'কথোপকথন'কে স্বীকৃতি না দিলে উপন্যাসেরও দুরবস্থা হয়ত এই হত! কিন্তু জীবনরসে জারিত হয়ে উপন্যাস তার নায়ক নায়িকার মৌখিক ভাষাকে স্বীকার করেছে পরে। সংস্কৃতের কুৎসিত কূপমণ্ডুকতার শিকার হয়ে প্রবন্ধই শুধু সীমাবদ্ধতার গ্লানিতে গড়িয়ে গেল বুঝি।

যুক্তিবদ্ধতা ও লালিত্য পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইদানীংকালের কয়েকটি রম্য রচনা। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ তাঁর সনেটের মতই তীক্ষ্ণ উজ্জল ঘন নীরেট অথচ তাতে বীরবলী লালিত্যেরও অভাব নেই। প্রবন্ধের প্রথম ও প্রধান গুণ যে সিদ্ধান্তের পথে যুক্তির সিঁড়ি রেখে উত্তরণে—তা অস্বীকার না করলেই প্রবন্ধ প্রবন্ধ। প্রবন্ধ মানেই বিপত্নীকের শুষ্কতা নিশ্চয় নয় যদি তাতে বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য করে পেশ করা হয়ে থাকে। এক ধরণের টুলো পণ্ডিত সংস্কৃত চাবুকের কল্যাণে প্রবন্ধকে চিরদিনই রুক্ষ করে রাখতে চেয়েছেন বলেই জ্ঞানী গুণীরাও প্রবন্ধকে মনে করতেন কয়েকজনের জন্যই সংরক্ষিত। পাছে কয়েকজন বহিরাগতও প্রবন্ধ বুঝে ফেলেন এ জন্যেই সাধুভাষার মোড়কে তাকে জুড়ে রাখার অপচেষ্টা চলেছে। প্রবন্ধ যেদিন চলিত ভাষার কালাপানি পেরুল সেদিনই সে জাতিচ্যুত হয়ে গেল এতদিনের 'প্রবন্ধকার'দের কাছে। নিছক 'রম্যরচনা' হয়ে গেল প্রবন্ধ। আবার বলি ললিত লবঙ্গলতা না হোক অতীতের খোয়াড়ী কেটে প্রবন্ধকে উল্টোরথের পিছু টান করাতেই কি সার্থকতা! প্রবন্ধ সুসংস্কৃত হোক ক্ষতি নেই—সংস্কৃত হতেই হবে কেন। বহু ব্যয় করে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে তার সঙ্গে পুরণো প্রথার অন্ধ অনুকরণে 'পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ত্রুটি মার্জনীয়'টুকু লেখা কেন? প্রবন্ধের মত বাংলা পত্র সাহিত্যেরও এই দশা! কোন এক বিম্বিসার অতীতে অ-পটু ভাষাতে, চিঠি লেখা হয়েছে বলেই আজ বাংলাভাষার সুগঠিত যৌবনেও তার অন্ধ কার্বন করায় কি অমৃত বর্ষণ হবে?

কয়েকজনের সংস্কৃতে বাঁধা না থেকে প্রবন্ধ যে চলিত ভাষার আটপৌরে পোষাকে সর্বজনের দুয়ারে হাজির হলো এতে আন্তরিক জাত্যাভিমান ছাড়া 'একঘরে' প্রবন্ধের আর উপায় কি? অথচ কয়েকজন 'ভঙ্গকুলীন' সম্পাদকীয় ও নিকষকুলীন 'ফোর্থপেজ' প্রবন্ধ ছাড়া এর কোন সার্বিক চাহিদা নেই। এঁরা থাকুন ক্ষতি নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আর সব প্রবন্ধকেই 'চটুলরম্যরচনা' গাল দিয়ে যাঁরা এক নতুন সিডিউলকাষ্ট শ্রেণী গঠন করতে চাইছেন তারা প্রবন্ধেরই ক্ষতি করছেন। প্রবন্ধকে সেই সর্বজনগ্রাহ্যতার স্বর্গে জাগরিত করা দরকার যাতে গৌড়জন সহজে আনন্দে তার মধু পান করতে পারে। নীরস পাঠ্যপুস্তকের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়তার ভীতি প্রবন্ধকে উজ্জল নাটক নভেলের পাশে ম্লানভাবে হাজির করুক কোন শুভানুধ্যায়ীর তা কাম্য হওয়া স্বাভাবিক নয়। কি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখবেন! পৃথিবীর যে কোন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সাহিত্য বিজ্ঞান বাণিজ্যের বিষয় নিয়েই হয়ত স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে শুধু এই বিষয়টি ছাড়া। আপনি কি নিয়ে লিখবেন তা স্বয়ং ভগবানের পক্ষেও বলে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং বলা যেতে পারে কি কি প্রসঙ্গে লিখবেন না, আপনি যে বিষয়ে পুরো এবং স্পষ্ট জানেন না সে বিষয়ে লিখবেন না। লিখলেও

ঠিক যতটা জানেন ততটাই লিখবেন, আপনার জানার অসম্পূর্ণতা সর্বাগ্রে স্বীকার করে। অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের তাই মত। কিন্তু এ মত সর্বজন স্বীকৃত নয়। নিরপেক্ষ মননের প্রাথমিক শর্ত স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও মানেন নি। আপনার প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য থাকা উচিত নয়। সুন্দরী যুবতীও যদি অনর্থক বকবক করেন তাঁর দন্তরুচি কৌমুদী আপনাকে আনন্দ দেবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনাকে সর্বদা নাক ধরেই এগিয়ে চলতে হবে। এতে ভারবাহী পশুবিশেষের মত পাঠকের মনেও একঘেয়েমীর ক্লান্তি আসতে পারে—আপনার যুক্তিবিন্যাসের সিঁড়ি অনুসরণে তাঁর বুদ্ধির কারেন্ট ফেল করতে পারে। অতএব সরলতা বজায় রাখবেন—বাসর ঘরে শ্যালিকার আদি খেউড় নয়—সনেটের স্মিত রস। সংস্কৃতে সুন্দরী নারীর উচ্চ হাসি নিন্দনীয় কিন্তু কি সংস্কৃতে কি বাংলা প্রবন্ধের যুক্তির ঘোড়ানো সিঁড়ির মোড়ে মোড়ে অপরিচিতার কৌতুকের কটাক্ষ ঝিলিক নিঃসন্দেহে প্রবন্ধের রস বাড়িয়ে দেয় অনেকগুণ। প্রবন্ধের সঙ্গে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে নির্মল শুভ্র সংযম এই স্মিত রস এনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। গুরুদেব তাই বলেছেন "যে পরিস্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি।" *ঠিক* কতদূর হাস্যরসের সীমানা তা স্বভাবসিদ্ধ রসিকের অনুভবে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে—সুসঙ্গতির সেই সুখসীমা তাঁরা কখনই অস্বীকার করেন না। 'বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস পায় না। কেবল তাহার সৌন্দর্য ও রমণীয়তাই বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সর্বাংশের প্রাণ ও গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। বিয়েবাড়ীতে হালুইকর তার মশলার ব্যাপারে, দেখবেন সর্বদা মনে রাখে তরকারীর নিজস্ব গুণগুলোর কথা। অর্থাৎ আপনি যদি কোন গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখতে বসেন অবশ্যই এই 'রসের' পরিমাণ 'মাত্রামত' কয়েক ডোজ চড়িয়ে দেবেন কিন্তু 'পরশুরাম ও শিবরামের রস রচনার তুলনা' প্রবন্ধে আপনাকে অবশ্যই সংযত হতে হবে। কোন কিছু অতিরিক্ত হয়ে গেলে প্রবন্ধকারকেই অতিরিক্ত মনে হতে পারে। প্রবন্ধ রচনার চেয়েও শক্ত অন্যের রচিত প্রবন্ধ পড়া অ-প্রস্তুত অবস্থায়। আপনি অন্যের অন্যান্য রচনা ট্রামে-বাসেই রড্ ধরে পড়তে শুরু করতে পারেন কারণ 'abrupt begining' সেখানে একটা গুণ। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে 'প্রস্তুতি' আবশ্যক। প্রস্তুতি শুধু আপনার পরিবেশে পারিপার্শ্বিকে নয়—প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতিতেও। ইতিপূর্বে অনাঘ্রাত কোন কুসুমের গন্ধ আপনি যতই প্রস্তুত হয়ে শুঁকতে থাকুন লাভ নেই। অতএব প্রবন্ধ-উপযোগী মনন সৃষ্টি করুন। এর জন্য সবার আগে প্রয়োজন আপনার মনের ওপর নিয়ন্ত্রণশক্তি গড়া। দশদিন আগেও যদি আপনি একটি আদিরস ঘটিত বই পড়ে থাকেন তবে তারপর আর প্রবন্ধে মন বসাতে পারবেন না। আপনার যুক্তিবাহী মনকে তরল ও শিথিল করাতেই আনন্দ যাদের তাদের সঙ্গে তো প্রবন্ধের আত্মীয়তা নেই! আপনি উপন্যাসের পাশাপাশি একটি ছোট গল্পও পড়তে পারেন কিন্তু একটি হিন্দী ছবি দেখে আসার পরই প্রবন্ধ পড়তে পারেন না। সংস্কৃত 'পাঠ্য' জিনিষে পড়ার জন্য 'প্রস্তুতি'র বিধান দিয়েছে। হয়ত এই জন্যই। চঞ্চলচিত্তে প্রবন্ধ পড়লে প্রবন্ধের অনুসরণ দেবতারও কম্মো নয়। দশসেরী 'কালজয়ী' উপন্যাসের দু-দশ পাতা ওভারসাইট হলেও হ্রাস বৃদ্ধি না হতে পারে কিন্তু প্রবন্ধকারের একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও খেয়াল না

রাখলে আপনি মূল সূত্র থেকে সমূলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারেন। 'পরিবেশ' ও 'মনোনিবেশ' প্রবন্ধ পাঠের প্রাথমিক শর্ত। সাহিত্যকর্ম আপনার মানসজাত সন্তান—অবশ্য সন্তানের ক্ষেত্রে কিন্তু যে তত্ত্ব প্রযোজ্য পুরোটা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সর্বদা সর্বথা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে গল্প উপন্যাসের ওপর রচয়িতার নিয়ন্ত্রণ তেমন বজায় থাকে না। কাহিনীর নিজস্ব তোড়ে নায়ক নায়িকার স্বভাব ধর্মে রচনা কতকটা নিজস্ব মোমেণ্টামে এগোতে থাকে। বরঞ্চ লেখক সেখানে নিজের মত চাপাতে গেলেই বঙ্কিমচন্দ্রের মত ব্যর্থ, কাহিনীর প্লট টুইষ্ট করতে গেলেই 'অবাস্তব' কাহিনীর রচয়িতা! কিন্তু প্রবন্ধ আপনার মনের বাগানে সযত্নে সাজান ফুললতা। সন্তান হলেও যে ষোড়শবর্ষেও আপনার নিছক কুমারী কন্যা। শাসন শিথিল করলেই সে হয়ত স্বাভাবিকতার বিপথে চলে যেতে পারে। সযত্ন লালনের সঙ্গে শাসনের বেড়া বাঁধন না করলে সে শিথিল অসংলগ্না। তাই গল্পের গুলি ঢালুপথে গড়িয়ে দিলেই লেখকের' নিচিন্ততা হলেও প্রবন্ধের শেষ পূর্ণচ্ছেদ রচনার মুহূর্ত পর্য্যন্ত প্রবন্ধকারকে সদাসতর্ক থাকতে হবে!

শিথিল ভাষা ও বক্তব্য ভঙ্গীকে 'ললিত' ছন্দ ভেবে অনেকেই লালায়িত হন। কিন্তু গুরুদেব বলেছেন, 'সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃংখল জনতাকে সুবিভক্ত সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন।' অর্থাৎ বিদ্যাসাগর গদ্যকে শুধু বাঁধুনী দেন নি। দিয়েছেন প্রবন্ধোপযোগী দৃঢ় গাঁথুনিও!

প্রবন্ধে সাধারণত কয়েকটি করোলারী ছাড়া থাকবে একটি মাত্র মূল সিদ্ধান্ত। বক্তা কোন পরিচিত পরিবেশ থেকে তার নতুন প্রমাণবাহী নতুন সিদ্ধান্ত পথে যাত্রা শুরু করবেন। বলাবাহুল্য সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত নতুন অথবা অপরিচিত। মনে করুন কেউ প্রবন্ধ লিখতে চান পৃথিবী আগামীকালই ধ্বংস হবে প্রমাণ করার জন্য বা হনলুলুতে কোকিল ডিম পাড়ে না প্রমাণের জন্য। বলাবাহুল্য তথ্য ও সিদ্ধান্ত দুইই আকস্মিক ও পূর্বে অপ্রমাণিত অর্থে অপরিচিত। লেখক সেক্ষেত্রে একটি পরিচিত প্রারম্ভের ইঙ্গিত ধরলেই পাঠক 'ধাক্কা' সামলে নেবেন। কোকিল যে কাকের বাসায় ডিম পাড়ে এই অতি পরিচিত তথ্য দিয়ে তিনি 'আন্তরিকতা'র নান্দীমুখ করতে পারেন। বলাবাহুল্য এই প্রথমারম্ভটুকুর আরেকটি উদ্দেশ্য পাঠকমনে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। পাঠকের আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টিতে অবশ্য প্রথম অনুচ্ছেদের দায়িত্ব অসীম। কিন্তু কৌতুহলী ও অনাগ্রহী পাঠকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির কৃতিত্বও এখানেই। রসায়নের কোন জটিল গিঁট উন্মোচনে আপনার হয়ত উৎসাহ কম আপনি ও ধরণের কোন প্রবন্ধ পড়তে চান না—কিংবা আকর্ষক প্রথম লাইনটি পড়ে প্রতারিত হতে চান না। এই জন্যেই প্রবন্ধের সুস্পষ্ট নামকরণ স্বচ্ছ বর্গীকরণ। বর্তমান রীতি অনুযায়ী প্রবন্ধের শুরুটা এমন আকর্ষক ও 'সাধারণ' (general) হতে হবে—যাতে সে বিষয়ে অনাগ্রহীও নিছক লেখার লাবণ্যে প্রবন্ধের জালে ধরা পড়েন চোখ বুলোতে গিয়েই মজে যেতে পারেন। যেহেতু পাঠক কতকগুলো বোধেরই বাণ্ডিল এবং সদ্যসাক্ষরের মত কয়েকজন আবার আদিম চাহিদারই শুধু সওদা করতে চায় তাই এদের সবারই মন মজাতে লেখক 'আকর্ষক' লাইনে এ ধরনের রস ঢালতে চান। এরই ফলে অধুনা যুবতীর কটাক্ষ সম্বল 'হলুদ'

প্রবন্ধের সৃষ্টি। তবু সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তাই প্রবন্ধের প্রথম প্যারাকে অনেকেই বিদেশী কসমেটিকস্ বা সংস্কৃত অঙ্গরাগে এনামেল করতে চান। লাবণ্যের গোড়ার কথা কিন্তু 'আন্তরিকতা' প্রসাধন নয়। রূপ যদি প্রবন্ধের নিজস্ব দেহগত না হয়—'ছেঁচকি বিশেষে ফোড়ন বিশেষের উপযোগিতা' হয় তার নিছক ধার করা কিছু বাঁধানো বুলি বসিয়ে দিলে বোঝা যাবে সেগুলো নিছক বাঁধানো দাঁতেরই দান। প্রবন্ধের প্রারম্ভে বক্তব্যের 'ধার ফোটাতে তাই 'বদহজমী' কোটেশন করা আজ অচল।

লালিত্য ও শিথিলতা এক বস্তু নয়। নারীর যৌবন ও প্রবন্ধের অবয়ব উভয়ক্ষেত্রেই এতথ্য প্রযোজ্য। সংস্কৃত বা ইংরেজী কোটেশন কণ্টকিতা 'চিররুগ্না' প্রবন্ধকে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ করতে পারেন কিন্তু লেখক নিজের জারক রসে কোটেশন মকরধ্বজকে জারিত করে তবে প্রবন্ধের মূলধনীতে তাকে ভায়েট হিসেবে সঞ্চালন করলে প্রবন্ধে যৌবনের সৌরভে আরও মোহময়ী হয়ে উঠতে পারে। চীনে মেয়েদের ক্ষেত্রে পায়ের রূপই নারীকে অপরূপ করলেও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফুট নোটস পথি বিবর্জিতা। কারণ চীনে মেয়েরা পা ও বাংলা প্রবন্ধের পাদটীকার বিস্তার যতই ছোট ততই সুন্দর, থামলেই মিষ্টি। মেয়ের বিয়েতে বংশপঞ্জী যেমন নীরস 'মাষ্ট', প্রবন্ধের ক্ষেত্রে কুলকারিকা ঠিক ততটা আবশ্যিক নাও হতে পারে। কারণ প্রবন্ধ কুলীনকন্যার মতই তার ধর্মে ও বক্তব্যে উপরিউক্ত তথ্য কিছুটা প্রমাণ করে বই কি। প্রবন্ধের মধ্যভাগও সিংহের কোলের মতই সুঠাম হওয়া শ্রেয়। সুগঠিতা নারী দেহের মত Slainder waist প্রবন্ধেরও গুণ। মনে রাখবেন, এখানে এসে পাঠক আর পিছিয়ে যেতে পারেন না। তিনি absorbed, আবার একটু পরেই তাকে ভারী নিতম্বের মুখোমুখী হতে হবে। সাধারণতঃ প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত থাকে সেখানেই। সরু কোমরের স্বচ্ছতা পাঠকমনকে আগামী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়। অনেকেই এখানে 'যাহোক কিছু'র ফটোষ্টাটের ব্লক রাখতে চান। কিন্তু মাত্রাভারী হলে পাঠকের মাথা ভারী হয়ে উঠতে পারে 'সিদ্ধান্ত গ্রহণে' সুস্থ মন গঠনের যা পরিপন্থী। ফটোষ্টাটের প্রয়োজনীয়তা যেন নিছক গোটছড়ার মত পাছা পেড়ে শাড়ীর অলংকার না হয়ে ওঠে। মোটামুটি প্রবন্ধ ও নারীদেহ উভয়েরই প্রসাধনের নামে অপ্রয়োজনীয় শিথিলতা কাম্য নয় শুধু বক্তব্যের বাঁধনে নয় চোখ ভোলান ভাষা ভঙ্গীতেও আট সাঁটো বন্ধনটাই জরুরী।

তবে কি প্রবন্ধের মধ্যে সেই পুরনো 'বুর্জোয়া' একঘেয়েমী ফুটে উঠবে না! ভারী বিষয়ের কথা যে ভারী ভাবেই বলতে হবে এরই বা মানে কি। উইসডম কি স্মাইলিং মুডে হতে পারে না! বস্তুত বিষয়বস্তুকে অহেতুক গৌরব দিয়ে অর্থাৎ What I say মনে রেখে এবং How I say কে ভুলে গেলে পাঠক হারাতে হবে। আপনার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হয়ত পাঠকের পক্ষে জরুরী কিন্তু প্রবন্ধ না পড়ে তিনি সেটা জানবেন কি করে! আপনি কি হারাইতেছেন এতো অনেক ইচ্ছুক পাঠকও প্রবন্ধ না পড়ে জানতে পারেন না। অর্থাৎ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু শুধু সরবরাহ নয় সরসভাবে পরিবেশনের পরিবেশও প্রবন্ধকারের দায়িত্ব। বলা বাহুল্য এই মতান্তরের ফলেই একান্নবর্তী দুই সহোদর দুই হাঁড়িতে ভাগ হয়েছে। গুরুদেবও প্রবন্ধকে দুভাগে বিষয়—গৌরবী ও বিষয়ী-গৌরবীতে পার্টিশন করে দিয়েছেন। যুদ্ধোত্তর ব্যস্ত বাঙালী বিষয়ী-গৌরবীর আত্মগামী প্রবন্ধে যদিবা আকর্ষণ বোধ করেছে কিন্তু বহুজনের জনপ্রিয় প্রবন্ধের জাত মজে সে হয়ে গেছে 'রম্যরচনা'।

যতই ফরাসী রীতির 'বেল ল্যাং' একথা আউড়ে প্রমথ চৌধুরীর আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা হোক না দেশ জুড়ে কিন্তু 'আপনি পায়ে ফুল ফোটাতে' এমন রম্যরচনাকারের সংখ্যা বেশী নয়। কখনও কোথাও তা বেশী হতেও পারে না। প্রবন্ধের 'জাত খেয়ে, তাকে 'জনপ্রিয়' হবার পরামর্শ বোধকরি তাই শ্রেয় নয়। বাংলাসাহিত্যে জীবিকাযুদ্ধে ক্লান্ত মননে তরলতার লালা-স্রোত এসেছে কিন্তু বহুজনের দরজায় মিছিল করে হাজির হবার দায়ে প্রবন্ধকেও সেই তরল আলতারই শামিল হতে হবে এ কাজের কথা নয়, বরং 'বাজে কথার ফুলের চাষ'।

রবীন্দ্রনাথ বীরবলী মজলিশী মেজাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেও নিজে কখনও পঞ্চভূতের নিচে নেমে প্রবন্ধ রচনা করেন নি পত্র-সাহিত্যে ছাড়া। আর পঞ্চভূতের মত ভারী প্রবন্ধ রচনায় ঐটুকু রোমান্টিক 'আন্তরিকতা' দস্তরমত 'মাষ্ট'। অলিভার ওয়েণ্ডল হোমসের অটোক্রাট অব ব্রেকফাষ্টের টেবলের অনুসরণে পঞ্চভূতেও গুরুদেব ভাষার এক নূপুর নিক্বণে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন কিন্তু বৈঠকী কায়দায় নামেন নি। আমি 'অন্তর' রম্যরচনার নিন্দা করছি না বরং বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের গুরুগম্ভীর সমাজশাসিত উপন্যাসের ঘনঘটায় এই loose Sally of mind নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়েছিল। তাছাড়া ভূদেব—বিদ্যাসাগরের কঠোর প্রবন্ধের কিছু 'প্রতিষেধক' ও প্রয়োজন, কিন্তু সুবে বাংলা জুড়ে যখন গল্প কবিতা নাটক উপন্যাসে তরল 'হলুদ' আলতারই মিছিল তখন বিষয় গৌরবের ভারবাহী মুটে প্রবন্ধেও অনর্থক শিথিলতা বোধ করি শ্রেয় নয়। বিশেষত যাঁরা নিত্য 'ব্রীজ' খেলেই অভ্যস্ত তাদের এ 'গাধা পিটোপিটি' খেলার সরলতায় দম বন্ধ হয়ে আসতে পারে।

বলতে হয়ত কঠোর শোনায়, পাঠকের যৌবন-যোগ্যতা ছাড়া প্রবন্ধের রস উপভোগ সম্ভব নয়। কলকাতা-দিল্লীর ট্রেনজার্নির একঘেয়ে ক্লান্তি ঘোচাতে আপনি হয়ত জাসুনী কাহানীর টনিক ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু প্রবন্ধ পাঠ নিজেই একটা পরিশ্রম। নাটক উপন্যাসের ইনবিটুইনের রিলাকসেশন সে হতে পারে না। সে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও 'আকলসেড়ে'। সতীনারীর মতই প্রবন্ধ সতীন ঘৃণা করে চায় সৎ একচক্ষু পাঠক। প্রবন্ধ পাঠকের ঢাউস উপন্যাস রক্ষা করাকে ঘৃণা করে না কারণ ভালর শত্রু 'মন্দ' নয় বরং আরও ভাল প্রবন্ধ। এখানে প্রবন্ধ ব্যতিক্রম হয়ে বোনসতীনকে আদর করে আসন ছেড়ে দেয় বিনা গ্লানিতেই।

নিটোল অভিমানে গাল ফুলিয়ে সংস্কৃত গোঁসাঘরে প্রবন্ধ যতই সংকুচিত হতে থাকবে গল্পউপন্যাসের আলকাতরা-তরলতায় ততই শিথিল—জবজবে হবে পাঠকমন। স্কুল কলেজের সক্রিয় মনগুলোও অভাবে বাধ্য হয়ে এই সবই পড়বেন 'পড়বারমত' প্রবন্ধ না পেয়ে। অর্থাৎ সেই অনির্বচনীয় সার্কাসট্রিকের সরুতারে হেঁটে যেতে হবে প্রবন্ধকে। সে অযথা লঘুতায় আপন গৌরব যেমন স্পষ্ট করবে না তেমনি ভারসাম্য বজায় রেখে এক বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে। শুনেছি, উত্তর পঞ্চাশের এমনি এক সার্বিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আজকের দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতা 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' হয়েও লোক প্রিয় পরিচিত সর্বত্রগামী। জনপ্রিয়তার এই নীরব বিপ্লবে এবার প্রবন্ধকেও নামতে হবে কারণ পাঠকমনের অন্দরমহলে সর্বদাই একটা প্রবন্ধ পিয়াসী মন বাসা বাঁধা থাকে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে। পাঠক মনকে তাঁর এই বোধ সম্পর্কে সজাগ করার দায়িত্ব যেমন প্রবন্ধের আকর্ষণীয়তায় তেমনি সেই জাগ্রত ক্ষুধাকে তৃপ্তকরার কৃতিত্বও

প্রবন্ধের বিষয় গৌরবে। অর্থাৎ পাঠকও যেমন প্রস্তুত হবেন সহজ বোধ্য—অন্তত সহজ পাঠ্য সাবলীল প্রবন্ধ পড়তে, প্রবন্ধকারও তেমনি অপ্রস্তুত থাকবেন না প্রয়োজনীয় পরিবেশনে। পাঠক ও প্রবন্ধকারের এই নীরশব্দ সমঝোতাতেই আগামী যুগের প্রবন্ধ পাঠের এক নতুন শ্রেণী রচিত হতে পারে। সংকোচনের ম্লান অভিমান নয়—বিস্তৃতির বেড়াজালেই প্রবন্ধ. পাঠককে 'শৃণ্বন্তু' মন্ত্রে আহ্বান করতে হবে। আর উপেক্ষিতা মৃতপ্রায় প্রবন্ধের সেই হবে সার্বিক মুক্তি সংগ্রাম।

একা শিল্পীরই দান নয় পুরো সৃষ্টি, গাহিতে হবে দুই জনে। পাঠক-প্রবন্ধকারের এই যৌথউদ্যমে তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের সাফল্য সুনিশ্চিত। একদা টেকস্‌ট বুকের অন্তর্ভু'ক্ত হবার মরিচীকাগ্রস্ত প্রবন্ধকার হয়ত তাঁর প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চিন্ত হতে পারেন কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে 'প্রবন্ধ' যেজন্য অপেক্ষাকরতে পারেনা। আর যে কোন রচনার মতই প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও হাতে-গরম সর্বিক এ্যাপ্রিসিয়েশনই কাম্য—সর্বজনের লোনা ঘামের সংস্পর্শে আবার দুশ্চিন্তায় যিনি ছুৎমার্গ বজায় রেখে প্রবন্ধকে কেবল উচ্চমার্গেই বাজাতে চান তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি—করেনত বটেই প্রবন্ধরও সর্বজনীন চাহিদাসৃষ্টির পাহাড়ী পথে ফুলের বদলে অনর্থক কতক গুলো কাঁটাই ছিটিয়ে দেন।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

সাগরবৌ (দেঃ বৌঃ ১।৩)
ব্রজেশ্বরের তৃতীয় পত্নী সাগর-বৌয়ের হৃদয় সাগরের মতই বিস্তৃত। কোন মালিন্যই তাতে স্থান পায় না। হাসির উচ্ছ্বাস ধারায় স্বভাবতঃই সে সকলকে মাতিয়ে তোলে। সাগর বড়লোকের মেয়ে। বয়সেও বালিকা। কিন্তু স্বামীগৃহে তার কোন নির্দিষ্ট স্থান না থাকার জন্য তার হৃদয়ে বেদনার অন্ত নেই। একটি কথায় সাগর তার মনের বেদনাকে প্রকাশ করেছে—"আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মত—তাকে তোলা থাক্‌ব, দেবতার ভোগে কখনও লাগিব না।"

সাগর সহানুভূতিশীল ও পরদুঃখকাতর। নিজের বঞ্চনার বেদনা দিয়ে সে বুঝেছে প্রফুল্লর না পাওয়ার বেদনা কতখানি। তাই সে স্বামীর সংগে প্রফুল্লের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

সাগর পরিহাসপ্রিয়। তাই নয়ানবৌকে ক্ষেপাতে সে খুব ভালবাসে। ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছেও তার আবদারের অন্ত নেই।

সাগর শুধু চলনসই নয়, সে তেজেও পরিপূর্ণা। ব্রজেশ্বর সাগরের পিতার কাছে অর্থ না পেয়ে রাগ প্রকাশ করলে সাগর স্বামীকে অনুরোধ করেছে আর একদিন থাকবার। কিন্তু ব্রজেশ্বরের পদাঘাতে—'কুপিত ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "কি ? আমায় লাথি মারিলে ?" তারপর সাগরের প্রতিজ্ঞা ও দেবীর সহায়তায় ব্রজেশ্বরর পা টেপানতে তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু স্বামীকে সাগর যথার্থ ভক্তি করে ও ভালবাসে। তাই স্বামীকে দিয়ে পা টেপানর পর অনুশোচনায় দগ্ধ। —"মুখে ঢাকা দিয়ে সাগর কাঁদিল—সেই মুখরা সাগর টিপিয়া টিপিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, চুপি চুপি ভারি কান্না কাঁদিল।"

উপন্যাসে সাগর যতখানি দিয়েছে, ততখানি পায় নি।

সাগরের বাবা (দেঃ বৌঃ ২।৩)

ভদ্রলোকের বাস্তববুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। তাই তিনি কন্যার জন্য সঞ্চিত অর্থ জামাইকে দিতে রাজী আছেন, কিন্তু ব্রজেশ্বরের পিতাকে নয়। তিনি টাকাই চেনেন, মেয়ের সুখ নয়। তাই তিনি জামাইকে "রুক্ষভাবে বলিলেন, তোমার বাপ বাঁচিলে আমার মেয়ের কি ? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে—শ্বশুর বাঁচিলে দুঃখ ঘুচিবে না।"

সাগরের মা (দেঃ বৌঃ ২।৩)
সাগরের মা জামাইয়ের রাগ কমাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

সার ওয়ালটার রালে (দেঃ বৌঃ ১।৯) দ্রঃ ওয়ালটার রালে।

সাময়িকপত্র প্রসঙ্গ ঃ ১৩৭৫ সালের কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা

বর্তমানে বাংলাসাহিত্যে সাময়িকপত্রের আসর বেশ সরগরম। যদিও সামগ্রিক বিচারে কোন একটি পত্রিকাকে প্রশংসা জানানো অসম্ভব, তবুও নানা বৈচিত্র নিয়ে নিত্যনূতন পত্রিকার আবির্ভাব ও প্রচলিত পত্রিকাগুলির মানোন্নয়নের প্রতিযোগিতা প্রশংসাব্যঞ্জক। এর মধ্য থেকেই আমরা ১৩৭৫ সালের কয়েকটি সাহিত্যপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করছি।

অচিন্ত্যনীয় অচিন্ত্য

কথাসাহিত্য পত্রিকা প্রতি বৎসরই কয়েকটি বিশেষসংখ্যা প্রকাশ করে সাধুবাদ পেয়ে থাকেন। এবছরেও তাঁরা শ্রাবণ ১৩৭৫ সংখ্যাটি "শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সংবর্ধনা"র জন্য চিহ্নিত করেছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্তও বাংলাসাহিত্যে মৃত সাহিত্যিকদের তর্পণ করা হত। জীবিত লেখকদের দিকে হয়তো কেউ কেউ দু'একটা প্রবন্ধ ছুড়ে মারতেন, তাও সমালোচনার ভঙ্গীতে। তাঁদের নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থরচনা, এমনকি বিশেষ সংখ্যা পত্রিকার প্রকাশ ছিল দুর্লভ। বর্তমানে তার ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোলযুগের আলোড়নসৃষ্টিকারী লেখকদের অন্যতম। প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্য বুদ্ধ এই তিনটি নাম একদিন প্রাচীনপন্থীদের যেমন বিরূপতার ইন্ধন হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি নবীনদের বরমাল্য হয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার, এককালের তথাকথিত অশ্লীল গল্পলেখক অচিন্ত্যকুমার, কয়েকটি বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের মালিক অচিন্ত্যকুমার, পরবর্তীকালে যে 'পরমপুরুষ' অচিন্ত্যকুমার হবেন তা কে জানত? দু'টিই তাঁর বিপরীতমুখীনতার চূড়ান্ত। দুই প্রান্তেই রয়েছে আলোড়ন—একপ্রান্তে বই বিক্রি না হয়ে মুখে মুখে নিন্দার, অন্যপ্রান্তে প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই রেকর্ড বিক্রী ও প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হবার।

অথচ একদিন এই লেখকের ভাগ্যেই জুটেছিল কত না অবহেলা। পত্রিকার দরজা থেকে কেবলই ফেরৎ আসে কবিতা। শেষপর্যন্ত তিনি নিলেন ছদ্মনাম নীহারিকা দেবী। সংগে সংগেই 'প্রবাসীর' মত তৎকালীন কুলীন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ। অনেকেই যখন 'নীহারিকা'র প্রেমে পড়ার জন্যে ব্যস্ত, তখন অচিন্ত্যকুমার স্বমূর্তি ধরলেন।

গল্প উপন্যাসলেখক অচিন্ত্যকুমার শুধু কবিই নন, কিশোর সাহিত্যের স্রষ্টা, ভক্তিমূলক সাহিত্যের রচয়িতা, 'কল্লোল যুগের' মত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগ্রন্থের জনক ও সর্বোপরি ক্রিকেট সাহিত্যের রসোত্তীর্ণ লেখক।

এ হেন অচিন্ত্যকুমারের কিছু না কিছু লেখার সংগে আধুনিক পাঠকের পরিচয় থাকলেও

মানুষটির সংগে পরিচয় অনেকেরই নেই। 'কথাসাহিত্যে'র এই সংখ্যাটিতে আছে তার আয়োজন। অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধীয় রচনাগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) জীবনী ও স্মৃতিচারণ (খ) অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যকৃতিত্ব (গ) শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বলাবাহুল্য প্রথমোক্ত বিভাগটিই অচিন্ত্যকুমারকে জানার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্যবান। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের পূর্ণাঙ্গজীবনীরচনার দায়িত্ব কেউ নেন নি। কেবলমাত্র গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের "জীবনের সমগ্রতা ও অচিন্ত্যকুমার"—এ কিছুটা চেষ্টা আছে।

"যদিও তাঁর পিতা রাজকুমার সেনগুপ্ত মশাইএর বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার পালং থানার দাসট্টা গ্রামে, তিনি নোয়াখালিতে ওকালতী করতেন। অচিন্ত্যকুমারেরও নোয়াখালিতেই জন্ম হয় ২রা আশ্বিন, (ইংরাজী ১৯০৩ সেপ্টেম্বর)। তাঁর মাতার নাম হেমলতা। তাঁর ছয় ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে বর্তমানে চার ভাই এবং তিন বোন জীবিত। তাঁর বড় ভাই জিতেন্দ্রকুমার হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। পবিত্রকুমার এবং কল্যাণকুমার ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে স্বস্বক্ষেত্রে যশস্বী।...অচিন্ত্যকুমারের বাল্যকাল নোয়াখালিতেই কেটেছে। ১৯১৬-তে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং ১৯১৮-তে কলকাতায় দাদার কাছে এসে সাউথ সুবার্বান স্কুলের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন।"

১৯২১-এ প্রবাসীতে তার প্রথম কবিতার প্রকাশ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বাঁকালেখা'র প্রকাশ ১৯২২। ১৯২৬-এ ইংরাজিতে এম. এ. পাশ। ১৯২৯-এ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯২৯-এই বহরমপুরে মুন্সেফী চাকরী। ১৯৩০-এ নীহারকণাদেবীর সঙ্গে বিবাহ। "অচিন্ত্যকুমার ১৯৩৮ অবধি মুন্সেফীর পর উন্নততর পদে বহাল হন। তিনি ১৯৫৮-তে আলীপুরের জেলা-জজের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য তারপর আরও দু'বছর আইন কমিশনের স্পেশাল অফিসার হিসেবে তাকে কাজ করতে হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৬০-এ তিনি সত্যিই সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।"

অচিন্ত্যকুমারের জীবনীর এই রেখাচিত্রে প্রাণসঞ্চার করেছেন, তাঁর অন্তরঙ্গ কয়েকজন স্মৃতিচারণার মাধ্যমে। তার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। গম্ভীর অথচ বীর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অচিন্ত্যকুমারের চরিত্রটি এঁদের লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলিতে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা যথেষ্ট আছে তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কিশোরসাহিত্য, ভক্তিসাহিত্য সবই আলোচিত হয়েছে। কি একমাত্র শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধটি ছাড়া যথার্থভাবে অচিন্ত্যকুমারে সাহিত্যকৃতির আলোচনায় কেউ অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয় না।

কতকগুলি লেখা আছে যেগুলি নিতান্তই সম্পাদকের তাগিদে প্রেরিত। তাতে রচয়িত নাম ছাড়া অচিন্ত্যকুমারের প্রতি শ্রদ্ধার কোন পরিচয় নেই। এ জাতীয় রচনা ছাপার কে সার্থকতা নেই। তৃতীয়শ্রেণীর লেখাগুলি গদ্যে বা কবিতায় অচিন্ত্যকুমারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধে আলোচনায় পরবর্তীকালের গবেষকদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

সংখ্যাটি। আধুনিক পাঠকদেরও হতাশ করবে না। বরং বলা ভাল সাধারণ পাঠকেরাই বেশি রস পাবেন এই সংখ্যায়। বিপুলায়তন এই সংখ্যাটির মূল্য মাত্র—১·২৫। এই সংখ্যাতে অচিন্ত্যকুমারের প্রথমদিকের লেখা গল্প "দুইবার রাজা"র পুনর্মুদ্রণ পাঠকদের আনন্দ দেবে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমারের গ্রন্থের তালিকাও আছে।

কর্মযোগিনী লীলা রায়

বর্তমান যুগে যে সমস্ত মহিলা নেত্রী অনলস কর্মসাধনার দ্বারা দেশের ও দশের মঙ্গলকামনায় ব্রতী শ্রীমতী লীলা রায় তাঁদের অন্যতম। সামাজিক ক্ষেত্রেই তিনি কেবলমাত্র কর্মযোগিনী নন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর কর্মের আসন পাতা। তার প্রমাণ বহন করছে ৩৩ বৎসর ধরে জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদনা। লীলা নাগের জন্ম হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর, আসামের গোয়ালপাড়া শহরে। তাঁর পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন ও পরে এস. ডি. ও. হন। যোগ্য পিতার যোগ্যা কন্যারূপে লীলা নাগও বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় ইংরাজীতে লেটার ও মেডেল পেয়ে পাশ করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩ সালে ইংরাজীতে এম. এ. পাশ করেন। সে বছর অন্যান্য যাঁরা পাশ করেছিলেন তাঁর মধ্যে অনিল রায় অন্যতম। এই অনিল রায়ের সঙ্গে তিনি যেমন বিপ্লবজীবনে অংশ গ্রহণ করেন, তেমনি পারিবারিক জীবনেও তাঁকে পতিত্বে বরণ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে লীলা রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রবর্তিত পথেরই পথিক। স্বাধীনতালাভের পরেও তাঁর কর্মের অবসর ঘটেনি। অবশেষে ৬৮ বছর বয়সে সেরিব্রেল আক্রমণে তিনি মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। এমনি অবস্থায় "জয়শ্রী"র ১৩৭৫ সালের শারদীয় সংখ্যাটির প্রকাশ ঘটল "লীলা রায়—উনসত্তরতম জন্মবার্ষিকী সংখ্যারূপে। বর্তমান বছরের সমস্ত শারদীয়া সংখ্যাগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে এটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছে। এই সংখ্যার সম্পাদনা করেছেন— 'জয়শ্রী'র সহযোগী সম্পাদক— সুনীল দাস।

সম্পাদক স্বীকার করেছেন—"জয়শ্রী ও সুভাষচন্দ্র" এবং "জয়শ্রীর বিজয়িনী ভূমিকায়" প্রবন্ধদু'টি সময় এবং স্থানাভাববশতঃ প্রকাশ করা যায়নি। কিন্তু তৎসত্বেও লীলা রায়ের বহুমুখী জীবনের পরিচয় যথাসম্ভব এই সংখ্যাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া লীলা রায়ের কতকগুলি রচনার সঙ্গেও এখানে পাঠকদের সাক্ষাৎ ঘটবে। এই সংখ্যায় যাঁদের দেওয়া ফুলে সাজি ভরানো হয়েছে তাঁরা হলেন—নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, ডঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রভাকর মাঝি, মণীশ ঘটক, ডঃ শশধর সিংহ, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র বাগল, শিবদাস চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, প্রীতি চট্টোপাধ্যায়, সুষমা সেনগুপ্ত, অশ্রুকণা সেন, ডঃ সুকুমার দত্ত, নিশীথনাথ কুণ্ডু, বীণা ভৌমিক, প্রভা দত্ত, ডাঃ অরুণকুমার নন্দী, বুদ্ধদেব বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, সুশীল রায়, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী, বিভা সরকার, বিজয়কুমার নাগ ও বিজনকুমার সেনগুপ্ত।

তিনটাকা দিয়ে এই সংখ্যা "জয়শ্রী" সকলেরই ঘরে রাখা উচিত।

মানবাত্মায় বিশ্বাসী কার্লমার্কস

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত "এক্ষণ" নামক দ্বিমাসিক পত্রিকাটি ইতিমধ্যে বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। এই পত্রিকারই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় শ্রাবণ ১৩৭৫-এর যুগ্ম সংখ্যাটি "কার্লমার্কস" বিশেষ সংখ্যারূপে চিহ্নিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপলক্ষ কার্ল হাইনরিখ মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্তি ।

মার্কস বোধ হয় এ যুগের সর্বাপেক্ষা আলোচিত দার্শনিক। তাঁর সমাজতন্ত্রবাদী মতের প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিশ্বে আলোড়ন এনেছিলেন। তার কারণ তাঁর মতামত একদিকে যেমন ধনিক শ্রেণীর শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিল, অন্যদিকে তেমনি নিপীড়িত মানুষকে এক স্বর্গলোকের চাবিকাঠি ধরিয়ে দিয়েছিল। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ইংরেজপ্রেমিক লেখকগণও সেযুগে মার্কসের মতবাদকে অনেক ক্ষেত্রে সমর্থন জানিয়েছেন। বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মার্কসের মতবাদের উপর ভিত্তি করেই নানা সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। কিন্তু দুঃখের কথা আমাদের দেশে মার্কসইজম নিয়ে যত হৈ-চৈ করা হয়, পড়াশোনা ততটা করা হয় না। দু'একটা মূল কথা নিয়ে আমরা নিজেদের খেয়ালখুশীমত ব্যাখ্যা করি মাত্র, প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করি না। সেদিক থেকে বর্তমান সংখ্যাটি বাঙালী পাঠকদের উপকারে আসবে।

এই সংখ্যায় সন্নিবেশিত কার্লমার্কস সম্বন্ধীয় রচনাগুলি সুপরিকল্পিত এবং বিন্যাসের দিক থেকে একটি মূল্যবান গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। দেশী এবং বিদেশী লেখকদের সুবিপুল সমাবেশ ঘটেছে এখানে। প্রথমে সন্নিবেশিত হয়েছে মুরারি ঘোষ লিখিত 'কার্ল হাইনরিখ মার্কস' নামধেয় জীবনটি। সবশেষে সন্নিবেশিত—কার্লমার্কসের জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী, কার্ল মার্কসের রচনাবলী ও বাংলায় মার্কস-চর্চার দিকনির্ণয় প্রভৃতি সংকলনগুলি মূল্যবান।

তাছাড়া প্রবন্ধগুলিও বিষয়বৈচিত্র্যে কি পরিমাণে ব্যাপক তা তালিকা থেকেই প্রকাশ পাবে। কার্লমার্কসের ধর্মচিন্তা | সোমেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কার্লমার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব | হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারত প্রসঙ্গে কার্লমার্কস | সুনীল সেন, অপরিচিত মার্কস | জন লুইস, মার্কস ও একালের মানবতাবাদ | অ্যাডাম শাফ, মার্কস্‌বাদ ও মার্কসবাদী | শ্যামল চক্রবর্তী, মার্কসবাদ ও বিজ্ঞান | প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্কস এবং সর্বহারা শ্রেণী | পাল সুইজি, দ্যস কাপিটাল ও আমি | ক্রিস্টোফার হিল, মার্কস ও মানবসত্তা | গৌতম সান্যাল, কার্লমার্কস ও অ্যালিয়েনেশন | সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে | ব্যারোজ ডানহাম, মার্কসবাদের সমালোচনা | দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মার্কসবাদ ও বিপ্লব | অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, মার্কস ও আধুনিক অর্থনীতি | অমিয় দাশগুপ্ত, 'বুর্জোয়া' অর্থশাস্ত্রে মার্কসীয় প্রভাব | মার্টিন ব্রনফেনব্রেনার' মার্কসের ক্যাপিটাল | মরিস ডব, কার্লমার্কস ও নির্গমতত্ত্ব | অমলেন্দু গুহ, সুন্দর ও কার্লমার্কস | অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কার্লমার্কসের কবিতা | সমর সেন অনূদিত, মার্কসবাদ ও সার্ধ শতাব্দী | রজনী পাম দত্ত, 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে | দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিজ্ঞান ও সমাজ | জোসেফ নীডহাম।

তিনশত ষাট পৃষ্ঠায় এই মূল্যবান গ্রন্থটির মূল্য মাত্র তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সর্বভারতীয় কবিতা।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত "একক" কবিতা পত্রিকাটি সাতাশ বছরে পদার্পণ করল। বৈশাখ আষাঢ় ১৩৭৫ 'সর্বভারতীয় কবিতা' সংখ্যাটিতেও যথেষ্ট নিষ্ঠা ও যত্ন প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য-দু'টাকা মাত্র।

এই সংকলনে প্রধান প্রধান ভাষাগুলির যাঁদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা দেওয়া হল—

মালয়ালম : বালামানি আম্মা ; জি শংকর কুরুপ
তামিল : আল বলিয়াপ্পা , কা না সুব্রামানিয়ম্
সিন্ধী : ঈশ্বর চন্দর ; পরশরাম জিয়া
কাশ্মীরী : অমীন কামিল ; দীননাথ 'নদিম'
হিন্দী : প্রেম শংকর , ধর্মবীর ভারতী
উর্দু : ফজল তবিস ; কাজী সালিম
ওড়িয়া : নিত্যানন্দ মহাপাত্র ; জানকী বল্লভ মহান্তি
কন্নড় : কে ভি পুনাপ্পা 'কুভেম্পু' ; চন্দ্রশেখর পাতিল
মারাঠী : ডি ভি সিরওয়াদকর (কুমাগ্রজ) ; পি এস রেগে
তেলেগু : শ্রী শ্রী ; নিখিলেশ্বর
পাঞ্জাবী : মোহন সিং ; অমৃতা প্রীতম্
নেপালী : ভবানী ভিক্ষু ; সুশ্রী পারিজাত
কোঙ্কণী : বি বি বোরকর ; আর ভি পণ্ডিত
ভারতীয় ইংরাজী : নিসিম ইজিকিয়েল ; কমলা দাস
গুজরাটি : রাজেন্দ্র শাহ ; জ্যোৎস্না মিলন
অসমিয়া : বীরেশ্বর বড়ুয়া, দিনেশ গোস্বামী
বাংলা : প্রেমেন্দ্র মিত্র ; বিষ্ণু দে
মনিপুরী : চন্দ্রকুমার শর্মা
রাজস্থানী : সুরেশচন্দ্র ভার্গব
মৈথিলী : ভুবনেশ্বর সিংহ

কবিতাগুলি ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই মুদ্রিত হয়েছে। অনুবাদকদের মধ্যে হয়েছেন—অনন্তকুমার দত্ত, সুজাতা প্রিয়ংবদা, মলয় ঘোষ, অসীমকৃষ্ণ দত্ত, দামোদর দে, সন্তোষকুমার অধিকারী, মুকুল সেনগুপ্ত, ডঃ নরেন্দ্রনাথ মিশ্র, নচিকেতা ভরদ্বাজ, পল্লব সেনগুপ্ত ও শুদ্ধসত্ত্ব বসু। অনুবাদকদের অনেকসময় যেমন মূল ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করতে হয়েছে, তেমনি আবার ইংরাজী থেকেও বাংলাভাষার অনুবাদ করতে হয়েছে। অনুবাদগুলি সাবলীল।

যে সমস্ত কবিদের কবিতা সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় না। উদাহরণ হিসাবে সুরেশচন্দ্র ভার্গব-এর একটি রাজস্থানী কবিতা 'এঁটো পাতা' সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল।

"এই ধরণীর বক্ষ থেকে
কত যে মানুষ করেছে আনন্দ লুণ্ঠন,
আর কত যে মানুষ
অনন্দ লুণ্ঠন করবে ভবিষ্যতে ;
কিন্তু সামান্য একটি এঁটো পাতার জন্যে
যেমনি কুকুরে কলহ করে,
মানুষ তেমনি কলহে মত্ত—
বৃথাই এই ধরণীকে 'আমার আমার' করে।"

অবশ্য আঙ্গিক ও মননে কিছু কিছু অত্যাধুনিক কবিতাও আছে। যেমন কা. না. সুব্রমানিয়ম্ এর 'পরিস্থিতি' নামক তামিল কবিতাটি—

"উপনিষদের পরিচিতি,
সে
টি. এস. এলিয়টের
চোখে।
এবং কবিগুরুর—
পূর্বতন
সেই এক
পাউণ্ডের
দৃষ্টিতে।" ইত্যাদি।

অথবা ঈশ্বরচন্দর-এর "ব্রাকেট" নামক সিন্ধী কবিতাটি—

"আকাশ—
একটি ডেণ্টাল-পেপার,
তার উপরে তারাগণ—
যেন কোন শিক্ষানবিশ কম্পোজিটরের কম্পোজিং
বিক্ষিপ্ত—এদিক-ওদিক!
আর—
চাঁদের ক্ষীণ রেখা
কোন স্পেশাল ন্যুজে দেওয়া একটি ব্রাকেট,
আর সেখানে
অন্য কোন ব্রাকেট না থাকা,

হয়তো,
শিক্ষানবিশ কম্পোজিটরের গলদ
না হয় প্রুপ-রিডরের।
(+) (−)
অন্ধকার রাত—
ফটোগ্রাফারের ডার্ক-রুম,
যেখান থেকে—
এক একটি নেগেটিভ্
সকাল হতে-হতে,
পজেটিভ্ হয়ে বেরিয়ে আসছে !"

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিষ্ণু দের কবিতা দু'টির ইংরাজী অনুবাদ কৌতূহলোদ্দীপক এবং এগুলি সম্ভবতঃ কবিদেরই অনূদিত। সঙ্কলনে সন্নিবেশিত কবিদের পরিচিতিও দেওয়া আছে।

তাছাড়া এই সংখ্যাতে ডাঃ প্রভাকর মাচওয়ের "Modern Indian Poetry" নন্দগোপাল সেনগুপ্তের "The Unity of Literature"—এই ইংরাজী প্রবন্ধ দু'টি উপযোগী হয়েছে।

চিরনবীন বুদ্ধদেব

একই বছরে 'কল্লোলযুগে'র দু'জন বিশিষ্ট লেখক সম্বন্ধে বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ ঘটেছে। আশা করি আগামী দিনে কোন পত্রিকা-সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করবেন। জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত 'কলকাতা' পত্রিকাটি এ বছরেই প্রকাশিত হয়েছে। তারই সপ্তম ও অষ্টম (ডিসেম্বর ১৯৬৮, জানুয়ারী ১৯৬৯) যুগ্ম সংকলনটি—'বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা"রূপে প্রকাশিত হয়েছে। উপলক্ষ্য কবির ষষ্টিতম জন্মদিবস। এই সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন অরুণকুমার সরকার ও নরেশ গুহ।

বর্তমান সংখ্যাটির দোষগুণ সম্পর্কে সম্পাদকদ্বয় যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা দরকার, কারণ এর মধ্যেই সংকলনটির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত।

'বুদ্ধদেব বসু বাংলাভাষার তরুণতম কবি ছিলেন আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগে। এ-মাসে তাঁর বয়স ষাট পূর্ণ হ'লো, এখনো, আমাদের বিশ্বাস, বাংলাসাহিত্যে আধুনিকতার সমবয়সী হ'য়েও তিনি আজও আমাদের তরুণতম লেখক। তাঁর সাহিত্যকীর্তি একদিক থেকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যেরই একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস। একদা যে-কিশোর কবির রচনা পরীক্ষা ক'রে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় হয়েছিল 'কেবল কবিত্বশক্তি মাত্র নয়, এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েছে, একদিন প্রকাশ পাবে', চল্লিশ বছরব্যাপী অবিরাম সাহিত্যকর্মের শেষে আজও দেখা যাচ্ছে তিনি এক তুমুল বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, যা শুধু একথাই প্রমাণ করে যে প্রতিভার জঙ্গমতা তাঁকে আমাদের আরামপ্রদ অভ্যাসে পরিণত করার বিরোধী। তাঁর গুণগ্রাহীদের তুলনায় বীতরাগীদের সংখ্যা

বোধকরি কম নয়। কিন্তু এই নিরলস বিশুদ্ধ শিল্পী যে সম্প্রতিকালের বাংলাদেশের সব চাইতে জীবিত লেখক একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখায় তাঁর সৃষ্টিশীল উৎসাহ একমাত্র অন্য যাঁকে মনে পড়িয়ে দেয় তিনি রবীন্দ্রনাথ।

শুধুমাত্র রচনার বিপুলতার কথা স্মরণ করলেও তাঁকে আমরা দোষ দিতে পারতুম না যদি তিনি নিছক নিজের লেখাতেই নিবদ্ধ রাখতেন নিজেকে। অথচ এই লেখকশোভন আত্মমগ্নতা তাঁর স্বভাবে নেই। যা-কিছু সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত। মাতৃভাষার নিরাপত্তা কি শিল্পীর স্বাধীনতা, কবিত্বের মর্যাদা অথবা কবিতার গুণগ্রাহিতা, তার জন্য কোনো ত্যাগ, কোনো ক্লেশ স্বীকারই তাঁর কাছে কখনো অতিরিক্ত নয়। তাই রাজনৈতিক বা দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে বনিবনা না হ'লেও কোনো যথার্থ শিল্পীকে তিনি অস্বীকার করেননি; সাহিত্যের বিচার করেননি গোষ্ঠীর গণ্ডিমানা বিধানে। সব প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য ক'রে, স্বেচ্ছায়, স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়ে শিল্পের এবং শিল্পীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত দেখিয়েছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর নিজের বিষয়ে আলোচনার তবু যে স্বল্পতা দেখা যায় তার প্রধান হেতু এই যে শিল্পী আর সমালোচক তাঁর মধ্যে অভিন্ন হ'লেও নিজের লেখার আলোচনা রুচিবর্হিভূত। এই ত্রুটির কথা মনে রেখে, বুদ্ধদেব বসুর ষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর বিচিত্র পথগামী সৃষ্টিশীলতার এবং প্রভাবপ্রসারী ব্যক্তিত্বের মোটামুটি একটা পরিচয় উপস্থিত করার ইচ্ছে থেকেই বর্তমান সংকলনের জন্ম। সময়ের স্বল্পতাবশত, এবং স্থানাভাবেও বটে, পরিকল্পনার মতো অনেক কিছুই করা গেলো না। বুদ্ধদেবের ছোট গল্প, তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা সম্পাদক এবং শিক্ষক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় প্রায় অনুল্লেখিত র'য়ে গেলো ব'লে আমরা লজ্জিত। বিবেচক পাঠক এ-সব অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি এই ভেবে হয়তো ক্ষমা করবেন যে বুদ্ধদেবের সৃজনীশক্তি আর উদ্ভাবনী প্রতিভায় এখনো এতটুকু ভাঁটা পড়েনি, ভবিষ্যতে তাঁর বিষয়ে আরো বিস্তারিত গ্রন্থ প্রকাশের তাই অবকাশ রয়েছে। আমরা শুধু একটি উপলক্ষ রচনা ক'রে তাঁর প্রতি আমাদের নমস্কার জানালুম।"

সম্পাদকদ্বয়ের উল্লিখিত দোষ-ত্রুটিগুলি ছাড়াও সবচেয়ে যে ত্রুটিটি পীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছে, সেটি হল বর্তমান সংকলনে বুদ্ধদেবের কোন জীবনীর স্থানাভাব। বুদ্ধদেবের সব পরিচয়ই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি না তাঁর জীবনের ন্যূনতম ঘটনাগুলি পাঠকদের সামনে থাকে।

বর্তমান সংখ্যায় বিন্যস্ত বুদ্ধদেব বসু, সম্বন্ধীয় লেখাগুলির মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত। এগুলি অগ্রজ সাহিত্যিকদের দ্বারা বুদ্ধদেবের স্বীকৃতি। এর মধ্যে রয়েছে—রবীন্দ্রনাথের 'নবীন কবি' অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'বন্দীর বন্দনা', জীবনানন্দের 'দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণের প্রতি', প্রমথ চৌধুরীর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ও সতেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'অশ্লীলতার কাব্য ?'

যে প্রবন্ধগুলির মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুরটি ধ্বনিত তার মধ্যে রয়েছে—বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক নরেশ গুহকে লেখা চিঠি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু', কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর 'কবিতা-র সাত বছর'। এছাড়া-অশোক মিত্রের 'দূরে এসে ভালো থাকি', অম্লান দত্তের 'বিশুদ্ধ শিল্পী বুদ্ধদেব', সন্তোষকুমার ঘোষের 'শীতের কাছে প্রার্থনা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি মূলতঃ বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে আত্মচিন্তা মাত্র। বাকি প্রবন্ধগুলি বুদ্ধদেব বসুর

সাহিত্যালোচনার বিভিন্ন দিক।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের "যে আঁধার আলোর অধিক প্রসঙ্গে" বুদ্ধদেবের একটি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা। বুদ্ধদেবের বসুর বহু কাব্যগ্রন্থ থেকে মাত্র একটির আলোচনা নিতান্ত খণ্ডিত বলেই মনে হয়। বিশেষতঃ এতে সমালোচকদের পাঠে অনীহার কথাই স্মরণ করায়। তবে শ্রী দাশগুপ্তের কাছে এই কাব্যগ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, যেহেতু এই গ্রন্থের "প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কবিতায় একটি আবহাওয়াগত পরিবর্তন ঘটেছিলো। যাঁদের আজকাল 'পঞ্চাশের কবি' বলা হয়, তাঁদের অনেকই এই গ্রন্থের দ্বারা জন্মান্তরিত হয়েছিলেন।" শঙ্খ ঘোষ "ছন্দের বারান্দা"য় সুন্দরভাবে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ছন্দের মূল সুরটি ধরার চেষ্টা করেছেন। নিরুপম চট্টোপাধ্যায় "শ্লীলতা অশ্লীলতার অবান্তর প্রসঙ্গে" অনেক পরিশ্রম করেছেন। বিভিন্ন পাঠাগারে ধর্ণা দিয়ে বুদ্ধদেবের তথাকথিত অশ্লীল পুস্তকের প্রথম সংস্করণে পাঠকদের দাগানো অশ্লীল অংশ ও সরল মন্তব্যগুলির আলোচনা বিপুল কৌতুকাবহ। এ জাতীয় প্রবন্ধ সচরাচর চোখে পড়ে না।

এছাড়া আছে—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বুদ্ধদেব বসুর ছোটোদের লেখা", অমিয় দেবের "দর্পণে দুই মুখ"-এ নাটকের আলোচনা, অরুণকুমার সরকারের "বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ"। স্বপনকুমার মজুমদার "বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থপঞ্জি"র কালানুক্রমিক বিবরণ দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর মোট একশো চল্লিশটি গ্রন্থের পূর্ণ বিবরণ এসে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সবশেষে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি বইটি মূল্যবান হলেও আর্থিক দিক থেকে তিনটাকা মূল্য না হলেই ভাল হত, বিশেষ করে সম্পাদকগণ যখন স্বীকার করেছেন বিজ্ঞাপনের কল্যাণে তাঁদের পরবর্তী কয়েকসংখ্যার পাথেয় যোগাড় হয়ে গেছে।

অশোক কুণ্ডু

দেশে বিদেশে পরিবার পরিকল্পনা

ডাঃ কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর সব চিন্তাশীল লোকই আজ দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও জনবিস্ফোরণের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ায় আশঙ্কিত। আগের দিনে এই বৃদ্ধির হার যেমন ছিল অল্প আবার জনবলের প্রয়োজনও ছিল বেশী। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে প্রয়োজন হল সুস্থ সবল ও শিক্ষিত মানুষের। সংখ্যার চেয়ে যোগ্য লোকের চাহিদা এখন বেশী। তাই সকলে ভাবছে পরিকল্পিত পরিবারের কথা যার মাধ্যমে সমাজ ও দেশ লাভ করবে এ যুগের উপযোগী সন্তান।

বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বাড়ছে। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে আমরা ছিলাম ৫০ কোটি ৪০০ বছর পরে আরও ১১০ কোটি লোক বেড়ে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তা দাঁড়াল ১৬০ কোটিতে। আর ১৯৬৫ সালে এই লোকসংখ্যা হ'ল ৩৩০ কোটি অর্থাৎ মাত্র ৬৫ বছরে লোক বাড়ল ১৭০ কোটি। পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলিতে এই বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—ভারত পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশগুলির কথা যাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে শতকরা আড়াই থেকে তিন অর্থাৎ প্রতি ১০০ জনে আড়াই থেকে ৩জন লোক বাড়ছে। প্রতিবৎসর ইউরোপের গড়পড়তা বৃদ্ধি শতকরা ১এরও কম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ১·৬। অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলি জনসংখ্যার চাপে পড়ে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিতে আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারছে না। প্রকৃতির হাতে এর সমাধান ছেড়ে না দিয়ে এই সব দেশের কর্ণধার ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এগিয়ে এসেছেন জনবিস্ফোরণের মহামারী থেকে দেশকে ও সমাজকে বাঁচাবার জন্যে।

ভারত

প্রথমেই ভারতের কথা আলোচনা করা যাক। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৪৫ বৎসরে আমাদের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসায় সুযোগ ইত্যাদি সমান হারে বাড়ানো সম্ভব হয় নি। এ সব ভেবেই ভারত সরকার প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই পরিবার পরিকল্পনার কাজ সরকারীভাবে সুরু করেন এবং এ কাজে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই কাজ অনেক ব্যাপক হয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চস্তরে আছে পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রীসভা কমিটি যা এই পরিকল্পনার মূল নীতি নির্ধারণ করেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রীসভা ও স্বাস্থ্য সচিবালয়ে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর। একজন উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিভাগের অধিকর্তা তাঁর অধীনে কাজ করছে বিভিন্ন বিভাগ যেমন পরিকল্পনা, বাজেট জনশিক্ষা, প্রশিক্ষন, গবেষণা, পরিবহন

বিতরণ ও জননিয়ন্ত্রণ বিভাগগুলি। ভারতীয় পরিকল্পনা লক্ষ্যভিত্তিক ও সময় ভিত্তিক। লক্ষ্য স্থির হয়েছে যে দশ বছরের মধ্যে ভারতের জন্মহার হাজারে ৪১ থেকে ২৫এ নামিয়ে আনা হবে। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মত বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই লক্ষ্যমাত্রার উপর। জনশিক্ষার মাধ্যমে ও জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি সকল যোগ্য দম্পতির কাছে সহজলভ্য করে এই লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রচেষ্টা চলছে। নানাবিধ বেসরকারী সংস্থাও এই কাজের জন্যে সরকার থেকে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে শতকরা ২'৮ অর্থাৎ ভারতের চেয়ে কিছু বেশী। পাকিস্তানে পরিবার পরিকল্পনার কাজ সরকারীভাবে স্বরু হয় ১৯৬৫ সালের জুন মাসে। লক্ষ্য হচ্ছে ১৯৭০ সালের মধ্যে অর্থাৎ ৫ বছরে জন্মহার হাজার ৫০ থেকে ৪০এ নামিয়ে আনা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এই পরিকল্পনারূপায়নের ব্যয় বহন করছে। কেন্দ্রে আছে পৃথক ভাবে গঠিত পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা। সেটি কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা উপদেষ্টা মণ্ডলীর পরামর্শে পরিচালিত। ডাক্তার ও নার্সের অকুলান থাকায় পাকিস্তানে বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত ম্যাট্রিক পাশ মহিলাদের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে! আপাততঃ তার ফল ভালই। ভারতের মত সেখানে ব্যাপক জনশিক্ষার মাধ্যমে এর প্রচার চলেছে।

দক্ষিণ কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়ায় তিন কোটি লোকের বাস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা বছরে প্রায় ২'৮। ১৯৬১ সালের মে মাসে সামরিক বিপ্লবের পরই এখানে পরিবার পরিকল্পনা সরকারী অনুমোদন পায়। লক্ষ্য স্থির হয় যে ১৯৭১ সালের মধ্যে জনবৃদ্ধির হার শতকরা ২'৮ থেকে ২তে নামিয়ে আনা। এখানকার মাতৃ ও শিশুমঙ্গল সংস্থা এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার কাজ জড়িত। স্বাভাবিক কাজের সঙ্গে শুধু প্রতি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন অতিরিক্ত পরিবার পরিকল্পনা মহিলাকর্মী যুক্ত আছেন এই কাজের জন্যে।

জাপান

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে জাপানের অভূতপূর্ব সাফল্য আমাদের সকলের প্রেরণার বিষয়। ১৯৪৯ সালে এখানকার জন্মহার ছিল হাজারে ২১'৪ জন আর ১৯৬৩তে সেই হার নেবে দাড়ায় ৯'৫এ অর্থাৎ মাত্র ১৪ বছরের ব্যবধানে জন্মহার অর্ধেক কমেছে। এখন জাপানের জন্মহার এশিয়া মহাদেশে সবচেয়ে কম—শতকরা ১এরও নীচে। কেমন করে তা সম্ভব হয়েছে? আমরা আজ জন্মনিয়ন্ত্রণের যে সব পন্থাগুলি গ্রহণ করেছি, জাপান তা সবই করেছে। এছাড়া ১৯৪৯ সালে সেখানে গর্ভপাত আইনসম্মত হয়েছে।

আমেরিকা

এবার আলোচনা করা যাক পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ। এখানকার মাথাপিছু আয় আর যে কোন দেশের তুলনায় বেশী। কিন্তু এখানেও সরকারীও বেসরকারী পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনায় কাজ এগিয়ে চলেছে। ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অন্ততঃ ২০টিতে সরকারী স্বাস্থ্যদপ্তর থেকেই এই কাজ চালান হচ্ছে। ১৯৫৯ সালে আমেরিকান পাবলিক হেলথ এসোসিয়েশান যখন পরিবার পরিকল্পনাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করল তখন থেকেই আস্তে আস্তে সেখানকার বিভিন্ন ষ্টেটের স্বাস্থ্যদপ্তরগুলি সক্রিয়ভাবে এই কাজ সুরু করে। মাতৃ ও শিশুমঙ্গল সংস্থার মাধ্যমে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই কাজ চলে এবং উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে মিশেও বহু কাজ করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীর মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়াও অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মপন্থা আছে যেমন পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা, বিবাহের আগে ও পরে পরামর্শ দান, শিশুকল্যাণ ও মাতৃকল্যাণমূলক কার্যসূচী

বৃটেন

এবার বৃটেনের কথায় আসা যাক। বেসরকারী পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনার কাজ এখানে অনেক দিন থেকেই চলছে। কিন্তু সরকারী সমর্থন এসেছে অল্পদিন। এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে শতকরা ০'৭। রক্ষণশীলতা সত্বেও ১৯৬৭ সালের জুন মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টে আইন পাশ হয়েছে যে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে সামাজিক ও স্বাস্থ্যর কারণে ন্যাশন্যাল হেলথ সার্ভিস কাউন্টির স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে জননিয়ন্ত্রণের উপদেশ ও পন্থাগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও বিতরণ করা চলবে। উন্নতিশীল ও উন্নত সব দেশেই পরিবার পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রসংঘেও জন্মনিঃয়ন্ত্রণের ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকার করেছে উন্নতিশীল। দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই সেখানের জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও বেশী। মোট জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে চীনের পরেই ভারতের স্থান। ভারতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বব্যাপক। সারা পৃথিবী লক্ষ্য করছে কি করে আমরা এই বিশাল পরিকল্পনাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-ভারতের পক্ষে একটি জরুরী কাজ

ডাঃ এস. চন্দ্রশেখর

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার গুরুত্ব কতখানি ?

১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ৫২ কোটিরও বেশী। এর অর্থ পৃথিবীর প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন ভারতের নাগরিক। পৃথিবীর ভূমিভাগের মাত্র ২'৪ শতাংশের অধিকারী হয়ে ভারতকে বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার ১৪ শতাংশের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রতি দেড় সেকেণ্ডে একটি করে শিশুর জন্ম হয়—বছরে মোট জন্ম সংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতিহাজারে জন্মহার ৪১ জন। প্রতি বছর প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে—অর্থাৎ প্রতিহাজারে ১৬ জন। এইভাবে প্রতিবছর জনসংখ্যা বাড়ে ১ কোটি ৩০ লক্ষ। এটা অষ্ট্রেলিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার সমান। প্রতিবছর ২'৫ শতাংশেরও বেশী হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে এই শতকের শেষে জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হবে।

কলেরা, ম্যালেরিয়া এবং বসন্তের মত সংক্রামক রোগকে প্রায় নিয়ন্ত্রনাধীনে আনা হয়েছে। এদের দূরীকরণের ব্যবস্থাদি কার্যকরী হচ্ছে। স্বাস্থ্যাবস্থার এই ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের আয়ুর পরিধি ১৯৫০ সালে যেখানে ছিল ৩২, ১৯৬৮ সালে বেড়ে ৫১-এ এসে পৌঁছেছে।

ভারতের অর্থনীতির নিরবচ্ছিন্ন দুর্যোগের প্রধান কারণ হচ্ছে অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে ১৮ কোটি ২৭ লক্ষ।

অন্যান্য অনুন্নত দেশের মত ভারতও দেখেছে যে, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিদ্যার ধারাকে যত তাড়াতাড়ি উন্নত করা যায় খাদ্যোৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তত তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। এর অর্থ হচ্ছে মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রিত করলে জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়—কিন্তু খাদ্যোৎপাদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। সুতরাং প্রতিহাজারে জন্মের হার ৪১ থেকে কমিয়ে ২৫-এ এমনকি ২০-এ নিয়ে আসার সরকারী ঘোষণা সত্বর কার্যকরী করা দরকার। বাস্তবিকপক্ষে জনসংখ্যাই ভারতের প্রধান সমস্যা।

পশ্চিমের দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধি কমেছে; কিন্তু ভারতের উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পউন্নয়নের পূর্বেই জন্মহারকে কমাতে হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়নক্ষেত্রের সমস্ত জাতীয় লাভই নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং অর্থপূর্ণ উন্নয়ন করতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রিত করতেই হবে। একমাত্র ভারতেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ে এবং স্থানীয়ভাবে পরিবার পরিকল্পনাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমের অধিকাংশ উন্নত দেশেই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বেসরকারী ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে সম্পূর্ণ সরকারীভাবে জাতীয় পর্যায়ে এটাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

জনসংখ্যা

আমরা আমাদের দেশে এক সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি—যদিও এর জন্য যেসব পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন যেমন শিক্ষিত, সমাজ সচেতন জনসংখ্যা এবং উচ্চ পর্যায়ের শিল্পউন্নতি—সেগুলি এখানে নেই। একইভাবে প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও আমরা একটি সমাজ বিপ্লব রূপায়িত করতে চলেছি। কারণ, পরিবার পরিকল্পনা ভারতীয় নারীদের মধ্যে জাগরণ এনেছে—এনেছে পরিবারের আয়তন ও লালনপালনের জন্য এক আত্ম নির্ধারিত দায়িত্ব—আর এনেছে পরিবারের লোকদের মধ্যে এক নতুন সহৃদয় সম্পর্কবোধ যেমন : স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে ; মাতা-পিতা এবং সন্তানের মধ্যেও।

নারীদের এই সমস্যা বুঝাতে পারলে অনেক সমাজ সমস্যার আমরা সমাধান আনতে পারব। সমাজ বিজ্ঞানীরা আজ মানুষের সমষ্টিগত ব্যবহার পদ্ধতিও বদলাতে সক্ষম।

দেশের সামাজিক আবহাওয়ার পরিবর্তন আনতে হবে এবং আনতে হবে নীরব সমাজ বিপ্লব—তবেই পরিবার পরিকল্পনার সাফল্য আসবে।

যেহেতু এই বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে নারীদের দৃঢ়বদ্ধ প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছার ওপর—আমাদের দেশের নারীদের জৈবিক মুক্তিকে নিশ্চিত করা দরকার। কোন মেয়েরই ২০ বা ১৮ বছরের পূর্বে এবং কোন ছেলেরই ২৫ বা ২১ বছরের পূর্বে বিয়ে হওয়া উচিত নয়। ছোট পরিবার দম্পতিদের আদর্শ হওয়া উচিত এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোন সন্তানের জন্ম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক শিশুকেই নাগরিক জীবনের মৌলিব প্রয়োজনের নিরীখে পেতে হবে, অন্যথায় নয়। পরিবার পরিকল্পনাকে বিবাহিত জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ না করলে নারীদের শারীরিক মুক্তি সম্পূর্ণ হবে না। যে সমাজ এখনও তার সব দুঃস্থ নাগরিকএর সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি—তার উপর অথবা অনিচ্ছুক আত্মীয়স্বজনের উপর নারীদের বোঝা স্বরূপ হতে বাধ্য করা একটা নৈতিক অন্যায়। যে কোন অবস্থায়ই নারীকে অর্থোপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাও অন্যায়। এর অর্থ এই যে, প্রতিটি মেয়েকেই তার সামর্থ্যও ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষা ও শিক্ষণ দেওয়া দরকার। ফলে প্রয়োজন হলে সে অর্থউপার্জন করতে পারবে।

শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন দরকার সন্তান সংখ্যাকে সীমিত রাখা, তেমনি দরকার দুটি সন্তান জন্মানোর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান যাতে থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা। মানব দেহের উর্বরতা ও দেশের ভূমির উর্বরতার মধ্যে, মানুষের চাহিদাও লব্ধ সম্পদের মধ্যে এবং মৃত্যুনিয়ন্ত্রণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে অবশ্যই সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

ষোড়শ বর্ষ ১৩৭৫ মে ১৯৬৮—এপ্রিল ১৯৬৯

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র

. Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 April '69 (0'50) Central Regd. No. 2602/57 SAMAKALIN